বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক

ডক্টর গীতা সেনগুপ্ত এম. এ., পি-এইচ্. ডি,
সিনিয়র ডিপ্লোমা (নাটক)
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগের অধ্যাপিকা

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯ ॥

VISSVA RANGALAYA O NATAKA

by Dr. Gita Sengupta.

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮২

গ্রন্থালংকরণ : গ্রন্থকর্ত্রী

প্রচ্ছদপট শিল্পী : শ্রীতরুণ দাস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্রোডাকৃশন্‌ সিণ্ডিকেট

প্রকাশক : শ্রীমতী গায়ত্রী সেনগুপ্ত
১১ বি, ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
:৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

ও পরমারাধ্যা মাতৃদেবী

৺সরযূবালা সেনগুপ্তের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী এবং অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য মশায়ের ছাত্রী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্তের পরম নিষ্ঠা, শ্রম, যত্ন ও অভিনিবেশের ফল এই গ্রন্থটি। এটি নাটক ও অভিনয় শিল্পের এমন একখানা বাংলা বই যা পড়ে প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পৃথিবীর রঙ্গালয় নাটক ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য আয়ত্ত করতে পারা যাবে।

এই গ্রন্থটির যা বিষয়বস্তু তাতে আমার কোনো বিশেষ অধিকার নেই অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। তথ্য হিসাবে অল্পস্বল্প যা জানা আছে তা মানবেতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে। এ গ্রন্থের ভূমিকা রচনার অধিকার সত্যই আমার নেই।

বাংলা সাহিত্য এখন ক্রমশঃ বহুমুখী, বিচিত্রমুখী হচ্ছে, এই লক্ষণ শুভ, সন্দেহ নেই। পৃথিবীর রঙ্গালয় ও নাটক সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হ'লো, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি; এবং লেখিকাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বইখানা নাট্যবিষয়ক ব্যক্তিদের কাজে তো লাগবেই, সাধারণ পাঠক পাঠিকারাও বইখানা পড়ে নানা তথ্য জানতে পারবেন।

নীহাররঞ্জন রায়

নিবেদন

এই গ্রন্থ মানব-সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা "নাটক" নিয়ে রচিত হল। সভ্যতার আদি উন্মেষকালেই নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের সর্বদেশে সর্বকালেই এই মহান্ শিল্প কত না বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের ও কালের নাট্যকার, নাটক ও তদ্দেশের তৎকালের মঞ্চবৈশিষ্ট্যগুলি আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এবং তারি সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি সেই বিশেষ নাটক সেই বিশেষ মঞ্চে কিভাবে উপস্থাপিত হত। নাটককে সাহিত্য হিসেবে এবং মঞ্চশৈলীকে কারুশিল্প হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে, কিন্তু তাতে "থিয়েটার" কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। "থিয়েটার" অর্থই হল নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় কৌশলের একটি সম্মিলিত রূপ। অভিনয় কৌশল নিয়ে স্থানাভাবের জন্যই আমি এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারিনি। দেশে দেশে, কালে কালে অভিনয় কৌশলেরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে এবং নির্দিষ্ট রীতিনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। যেমন আমাদের নাট্যশাস্ত্রকার ভরতই নানান স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে তার লোকধর্মী অভিনয় পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—আবার নন্দিকেশ্বরের "অভিনয় দর্পণে" পেয়েছি বিভিন্ন "মুদ্রা" দ্বারা ভাবপ্রকাশের নাট্যধর্মী রীতি। থিয়েটারের অপর দু'টি অপরিত্যাজ্য উপাদান নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসই আমি এখানে তুলে ধরেছি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। কোথাও বা দেখা গেছে নাটকের গঠনরীতির ক্রমবিকাশ ও জটিলতা রঙ্গমঞ্চকে জটিলতর এবং উপকরণবহুল করে তুলেছে—অর্থাৎ মঞ্চকে পরিবর্তিত করেছে, যেমন মধ্যযুগের মিস্ট্রি নাটকে যখন বাইবেলের বহু বিচ্ছিন্ন কাহিনী এসে একই সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল তখন যুগপদ্দৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ বা বহু স্থান নির্দেশক স্টেশন-সমূহের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার দেখতে পেয়েছি বহু ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের উপায় উপকরণ ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নাটকের গঠনশৈলীকে করেছে নিয়ন্ত্রিত —যেমন গ্রীসে অর্কেস্ট্রা বৃত্তের সঙ্গে স্কেনে-বিল্ডিং সংযুক্ত হওয়ার ফলে নাটকের "স্থান" ও গঠনরীতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। রঙ্গমঞ্চের

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও ব্যবধানগুলি আমি বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

অন্যদিকে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ কোনটিই বিশেষ দেশ, কাল এবং সমাজ নিরপেক্ষ নয়। জীবনের যে কাব্যময় শিল্পরূপ আমরা প্রাচ্যে পেয়েছি তা পাশ্চাত্যে পাইনি—ট্র্যাজেডির যে সুগভীর মহত্ত্ব আমরা গণতান্ত্রিক আথেন্সে দেখেছি তা যুদ্ধাভিলাষী সাম্রাজ্যলিপ্সু রোমে দেখিনি। এ ছাড়াও বিশেষ দেশ ও কালের বহু রীতি-নীতি, প্রচলিত প্রথা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা নাটক ও মঞ্চপদ্ধতি উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। অতএব বিষয়ের পটভূমিকা হিসেবে বিশেষ দেশকালের সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং তাদের শিল্প চেতনা চিত্রিত করতে হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এই গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ করা হল।

এ কথা সত্য যে, বিশ্ব সাহিত্যে নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে এবং মঞ্চশিল্প ও প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ও সন্তোষজনক বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই নাটক ও রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন অধ্যায় ধরে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে আবার সামগ্রিক ইতিহাসও রচিত হয়েছে। তবে এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের বাংলা ভাষায় বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এবং নাটকের একখানিও বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে যুগ ব্যাপী নাট্যশিল্পের যে বিশাল পরিধি তার অতি ক্ষুদ্র অংশই তুলে ধরতে পেরেছি। প্রত্যেক দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নানান উত্থান পতন চলে। তার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সমুন্নত শীর্ষে উপনীত হওয়ার পর পতনের কালেও ধারা কিন্তু কখনই অবলুপ্ত হয় না—কোন না কোন ভাবে টিকে থাকে। এই সমস্ত বিস্তৃত ইতিহাস কিছুই প্রায় আমি আলোচনা করতে পারি নি। এমন কি প্রধান প্রধান যুগগুলিরও মুখ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মাত্র তুলে ধরতে পেরেছি—তার বেশি নয়। এর যে কোন একটি যুগের নাটক অথবা রঙ্গমঞ্চ নিয়ে বৃহদাকৃতির একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অতএব আমার রচনার অসম্পূর্ণতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য আগেই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত বিদেশী গ্রন্থের চাইতে আমি এ গ্রন্থে প্রাচ্য দেশীয় ধ্রুপদী থিয়েটারের অংশ বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থের শেষে "বঙ্গদেশ" নামে একটি

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে, এটিকে এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট বলা চলে—বিশ্ব পরিক্রমার পর স্বদেশে ফিরে আসা।

আমার পরম সৌভাগ্য বশতঃই বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিকে আমি শিক্ষক রূপে পেয়েছি। যখন নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত আকাদেমির (বর্তমান রবীন্দ্র ভারতী) নাটকের ছাত্রী ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র চৌধুরী, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ, মঞ্চবিদ্ সতু সেন প্রভৃতি নাট্যক্ষেত্রে দিক্‌পালদের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাঁদের সস্নেহ শিক্ষা লাভ করেছিলাম। দীর্ঘকাল ধরে আমাকে এ গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে—সে সময়ে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ব্যক্তিগত নাট্যবিষয়ক অতি মূল্যবান গ্রন্থাগারের দ্বার আমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছেন, তা ছাড়াও যখনি যে বিষয়ে জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি তাঁর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ ও আলোচনায় পথ দেখতে পেয়েছি। আর অধ্যাপক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় কাজের বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য তো করেছেনই তারো চেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন আমার মানসিক ধৈর্য ও কর্মপ্রেরণাকে অটুট রাখতে। যখনি থামতে চেয়েছি, হতাশ হয়ে পড়েছি তখনি তিনি কঠিনে-কোমলে কত কথাই না বলে মনকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। আজ আমার কাজ শেষ হল "বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক" গ্রন্থরূপে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুদ্রিত হল কিন্তু আমার এ দু'জন পরম শুভার্থী অধ্যাপক কেউই আর এ জগতে রইলেন না—এ গ্রন্থখানা তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারলাম না এ বেদনা আমার চিরকালই থাকবে।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ভাষা সমস্যা আমাকে বিশেষ বিব্রত করে তুলেছিল, কারণ এতে গ্রীক, রোমান, জার্মান, ফরাসী, ইতালি প্রভৃতি সর্বদেশের নাটক, নাট্যকার ও মঞ্চ-স্থাপত্যের নাম রয়েছে—সেগুলোর বাংলা উচ্চারণ কি ভাবে করা হবে দীর্ঘকাল তার সমাধান খুঁজে পাইনি। আমি নিজে ভাষা বিশেষজ্ঞ নই তাই বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতদেরই শরণ নিতে হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ফাদার্ আঁতোয়ান্ এই গ্রন্থের গ্রীক, রোমান, ফরাসী ইত্যাদি বহু নামের উচ্চারণ দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ঠিক করে দিয়েছেন। স্বল্প পরিচয়েও তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন তা সত্যই আমাকে অভিভূত করেছে। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ছাড়াও অগণিত শব্দের উচ্চারণ নির্ণয়ে সাহায্য

করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজয় সেন—তিনি এমনি একজন লোক যাঁর কাছে কুণ্ঠাহীন ভাবে যে কোন অনুগ্রহের জন্য হাত পাতা যায়, তেমনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শর্বরীভূষণ পুরোকায়েত—এঁদের আশীর্বাদ আমার চিরকাম্য। এতদ্‌সত্ত্বেও জানি বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে সেই জন্যই প্রতিটি নামের পাশে ইংরেজী হরফে তা আবার লিখে দেওয়া হল। একে Roman Script বলব না, কারণ তার সবগুলো সাংকেতিক চিহ্ন আমি প্রেসে পাইনি। যেগুলো পেয়েছি এবং সংযোজিত করতে পেরেছি তা বইতে দিয়েছি, সহৃদয় পাঠক নিজগুণে ভুল ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন।

গ্রীক নামে বহুক্ষেত্রে একবচন এবং দ্বিবচন বা বহুবচনে ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়—যেমন "পেরিয়াকৃতোই"—"পেরিয়াকৃতোস্"। এগুলি অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলে উল্লেখ করতে হল। এছাড়াও কয়েকটি শব্দের বানান এক হলেও অর্থবোধের সুবিধার্থে আমি ভিন্ন উচ্চারণ প্রয়োগ করেছি—একটি গ্রীক উচ্চারণ অন্যটি প্রচলিত ইংরেজী উচ্চারণ। যেমন গ্রীক মঞ্চের অভিনয় বৃত্তকে যেখানে বোঝান হয়েছে সেখানে দেওয়া হয়েছে "অর্‌খেস্ত্রা" আবার যেখানে যন্ত্রশিল্পীদলকে বুঝিয়েছে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে "অর্‌কেস্ট্রা"। আবার গ্রীক গায়কদলকে যেখানে বুঝিয়েছে সেখানে বলা হয়েছে "খোরাস", আর একতান-সঙ্গীতে প্রয়োগ করা হয়েছে "কোরাস"।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীতরুণ দাস এবং গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীমতী গায়ত্রী সেনগুপ্ত, এঁদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের কর্মীবৃন্দ এ গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে যে সহযোগিতা করেছেন এবং যত্ন সহকারে কাজ করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই—ধন্যবাদ জানাচ্ছি জিজ্ঞাসা প্রকাশনীর শ্রীযুক্ত শ্রীশ কুমার কুণ্ডু মহাশয়কে সাগ্রহে এই গ্রন্থেব ভার গ্রহণ করার জন্য। বহু কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে এ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি—

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

গীতা সেনগুপ্ত

॥ বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক ॥

সূচীপত্র

॥ চিত্রসূচী ॥

পৃষ্ঠা

বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক

॥ আদিম যুগ ॥

পৃথিবীর যেখানেই আদিকাল থেকে মনুষ্যসভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেছে, সমাজজীবন গড়ে উঠেছে, সেখানেই কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার মৌলিক দাবী মিটবার পরেই মানুষ কোন না কোন প্রকার আত্মপ্রকাশ বা অবকাশ যাপনের জন্য আনন্দ উৎসবের পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায়ই যে সর্বশিল্পের বিভাজন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অথবা পূর্ণ পরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল একথা বলা যায় না। ক্রমবিবর্তনের পথেই বিভিন্ন শিল্পের বিভাজন ঘটেছে—প্রাথমিক উপাদান সুপরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিশু বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পল্লবিত মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

আদিম নৃত্য, গীত থেকে আরম্ভ করে গ্রীক ট্র্যাজেডির মহান্ ঐতিহ্য, আবার বর্তমান যুগের নাটকের মনোবিশ্লেষণ ও চিত্রধর্মিতা কিংবা বৈজ্ঞানিক মঞ্চ পরিকল্পনা, এরই মধ্যে এসেছে কত পর্যায় কত ভাঙ্গাগড়া, কি অনন্ত বৈচিত্র্য।

আহার্য ও বাসস্থান সংগ্রহের পর আদিম মানুষ যখন একটু অবকাশ মুহূর্ত পেল তখন সে তা আনন্দ উৎসবে, আবেগ অভিব্যক্তিতে প্রাণময় করে তুলতে চাইল—সে নাচল—ছন্দোবদ্ধ তালে তালে—সেই হোল তার প্রথম শিল্প সৃষ্টি। যখন সে দেহভঙ্গির মাধ্যমে নিজের গভীর ভাবরাশি ব্যক্ত করতে চাইল তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার মধ্যে এল ছন্দোময়তা। বিশ্ব প্রকৃতিই তাকে শিখিয়েছিল এই ছন্দ, তাল। সে দেখেছে জলের উপরে ঢেউএর প্রবাহে সুশৃঙ্খল নিয়ম। দেখেছে মাঠের উপর হাওয়ার নাচন, দেখেছে চন্দ্র, সূর্যের উদয় এবং অস্ত; শুনেছে নিজের অন্তরে হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দোময় ধ্বনি, তাই সে যখন নাচল প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চেই নাচল ছন্দে, সুরে, তালে।

আদিম মানুষের সর্বপ্রকার শৈল্পিক প্রচেষ্টারই মূলে রয়েছে অনুকরণ প্রবৃত্তি। এই অনুকরণ প্রবৃত্তিই মানব সভ্যতার উষাকাল থেকে প্রতিনিয়ত বিচিত্র পথে তার সারথি হয়েছে। প্রারম্ভিক সময়ে মানবের নাট্য প্রচেষ্টা

ছিল অতি সরল। তাদের কোন লিখিত নাটক ছিল না, কোন পরিকল্পিত কাহিনীও ছিল না—রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ তো সুদূরপরাহত। তাই মানবের আদি প্রচেষ্টাকে আমরা "নাট্যাভিনয়" বলতে পারি না, বলতে পারি নৃত্যগীতানুষ্ঠান অর্থাৎ জীবনের আঙ্গিক ও বাচিক অনুকৃতি—এই অনুকৃতি ছিল কেবলমাত্রই "অভিনয়"।

দার্শনিক আরিস্তোতল গ্রীক নাটকের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর "পোয়েটিক্স" গ্রন্থের প্রথম চারিটি অনুচ্ছেদেই "অনুকৃতি" বা "ইমিটেশন্" কথাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বহুদিক দিয়ে বহু উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে আমরা দুটি বাক্যকে নাট্যাভিনয় আরম্ভের মূলসূত্র হিসেবে উদ্ধৃত করছি। আরিস্তোতল বলেছেন—

"অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি মানুষের মধ্যে আশৈশব দেখা যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের অন্যতম পার্থক্য হল যে, সে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুকরণশীল প্রাণী ; এবং অনুকরণের সাহায্যেই সে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করে। অনুকৃত বিষয় দেখে যে আনন্দলাভ তাও স্বাভাবিক ও সার্বজনীন।"[১]

মানুষের এই বিশেষ গুণ বা প্রবণতাটি অত্যন্ত শক্তিশালী। কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে এই গুণ মানবকে প্রবল আনন্দ বিতরণ করতে পারে। আদিকাল থেকে পিতামাতাও শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য এই অনুকৃতি গুণটির আশ্রয় নিয়েছেন। এই শক্তিটি আছে বলেই আমরা হাঁটতে চলতে কথা বলতে, এক কথায় স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে শিখি।

নাটকের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে মানুষের এই অনুকরণ প্রবণতাকেই জানতে হবে। এই সাধারণ প্রবণতাটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসমভাবে প্রকাশিত হলে যথেষ্টই প্রতিদান পায়। অনুকৃতি বিদ্যা যথেষ্ট অভ্যাস দ্বারা আয়ত্তাধীন করে নিলে, তার সাহায্যেই অগণিত লোককে গভীর ও নির্মল আনন্দ বিতরণ করা যেতে পারে। মানুষ বিভিন্ন জিনিসেরই অনুকরণ করতে ভালবাসে কিন্তু সে সর্বাধিক ভালবাসে তার চারপাশের অন্যান্য মানুষের এবং পশুপক্ষীর আচরণ অনুকরণ করতে। বস্তুর অনুকরণের ক্ষেত্রে সে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রূপকে

ফুটিয়ে তুলেছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সে অন্য মানুষের আচার, আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি, এমন কি কথা বলাকে পর্যন্ত অনুকরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলে। এ ছাড়া সে যে সমস্ত ঘটনা দেখেছে বা কল্পনা করেছে তাকেও অনুকৃতির দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে চায়। এর সর্বনিম্ন রূপ পাই আমরা শিশুর অন্য চরিত্রকে আত্মগত বলে বিশ্বাস করে (make believe) সেইরূপ আচরণে। তাই অভিনয় জড়িয়ে আছে ছোট্ট সেই মেয়েটির সঙ্গে যে মা সেজে মায়ের মত হয়ে ছোট্ট তার পুতুলটিকে দুধ খাওয়ায়। আর এরি থেকে কিছু উন্নত রূপ আমরা পাই আদিম মানুষের শিকার নৃত্য, জাদু নৃত্য, ধর্মীয় আচাব, অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে। মূলতঃ অনুকরণ করার এবং জীবনের অনুকৃতি দেখার আনন্দই সভ্য মানুষকে নাটক লিখতে, অভিনয় করতে এবং রঙ্গালয়ে ভিড করে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

মানুষের এই অনুকরণ দক্ষতা থেকেই তার মধ্যে প্রথম অভিনয় প্রচেষ্টা এসেছে এবং আদিম সরল গঠনভঙ্গির নাটকেরও উদ্ভব হয়েছে। প্রথম



আদিম অ্যারিণা

অবস্থায় মঞ্চের কোন প্রশ্নই ছিল না—সে যখন যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আপন মনোভাব অভিব্যক্তির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলত তাই তখন হত তার মঞ্চ। স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীর অন্যরা চারিপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কেউ বা

গাছের উপর উঠে, কেউ বা কোন উঁচু পাথরে বসে এই আদি অভিনয় দেখত—দর্শকরা বৃত্তাকারে দাঁড়াত বলেই প্রাথমিক এই অভিনয় ক্ষেত্রকে বলা যায় "আদিম অ্যারিণা" (Primitive Arena)।

প্রাথমিক নাটককেও আমরা গঠনরীতির দিক দিয়ে নাটক না বলে বলব নাটকের কয়েকটি মৌলিক উপাদান।

সর্বপ্রথমে মানুষ তার পরিবর্তনক্ষম দেহ ও কণ্ঠস্বর নিয়ে পশুপক্ষীর অনুকরণ করেছিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্রথম অভিনয় করে, কখন, কোথায়, কি ভাবে করেছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল কল্পনার সাহায্যে তার প্রচ্ছদপটখানা সরিয়ে দিতে পারি। যদি সেই গুহাবাসী মানবের একরাত্রির সঙ্গী আমরা হই, হয়ত দেখব রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, গুহার সম্মুখে আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসেছে গোষ্ঠীর সবাই। শিকারে সেদিন তারা সফল হয়েছিল, আগুনে ঝল্‌সে সেই মাংস তারা আহার করেছে। যারা শিকার করতে গিয়েছিল এখন তারা সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা করছে সেদিনকার অভিজ্ঞতা, ভাষা তাদের অত্যন্ত দুর্বল সামান্য কয়েকটা শব্দ মাত্র, সুতরাং দেহভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গিই তাদের অভিব্যক্তির প্রধান উপায়। তাদের একজন সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গিয়ে উৎসাহে, আনন্দে লাফিয়ে উঠল—সামনে পড়েছিল সেই পশুর রক্তমাখা চামড়াটা, সেটাকেই গায়ে জড়িয়ে পশু সেজে সেই ঘটনার অনুকৃতি করতে গেল—আর কয়েকজন শিকারী হয়ে তাকে হত্যা করবার জন্য তাড়া করল, ঘিরে দাঁড়াল—তখনি নাটকের জন্ম হল। তারা তাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি পরিচয় হারিয়ে এক আশ্চর্য উপায়ে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে গেল, হল নাটকীয় চরিত্রের সৃষ্টি।

ক্রমশঃ তারা গাছ পালায় আচ্ছাদিত হয়ে তাদের অনুরূপ আচরণ অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। গ্রীক ক্লাসিকাল নাটকে যে প্রাথমিক উপাদান "দিথ্যুরাম্ব" সঙ্গীত তা দেবতা দিওন্যুসাসের উদ্দেশ্যে গীত হয়েছিল। এই দিওন্যুসাসের অন্যতম নাম হল "বাক্‌খাস" বা মদ্যদেবতা। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের মধ্যে এই 'বাক্‌খাসে'র মূর্তি দেখা যায়—সর্বাঙ্গে আঙ্গুর লতা জড়িত এক সুকুমার তরুণ মূর্তি, গায়ে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সরস দ্রাক্ষা ফল। বাক্‌খাসের কাহিনীর মধ্যেও তার এই রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। উৎসবকালে শোভাযাত্রায় বাক্‌খাসের রূপসজ্জা গ্রহণেরও প্রথা ছিল।

গুহাবাসী মানব আহরণজীবীর যুগ কাটিয়ে হল শিকারজীবী। সে তার জীবনযাত্রা চালাতে সুরু করল পশু শিকার দ্বারা। সে যদি তার এই শিকারের উপর অকস্মাৎ পেছন থেকে লাফিয়ে এসে পড়তে না পারত, যদি পশুর সঙ্গে তাকে মুখোমুখি যুদ্ধে নামতে হত, তবে সে যে পশুকে হত্যা করবে তারি একটি মৃত পশুর চামড়া গায়ে দিয়ে ছদ্মবেশে যুদ্ধে নামত। সে তখন সেই পশুর গতি প্রকৃতি পর্যন্ত অনুকরণ করে লাফাতে থাকত। যেমন এস্কিমোরা ফারের পোষাক এবং সূচোলো মস্তক-আবরণ পরে লাফিয়ে সীলমাছের সুষমাহীন চলার অনুকরণ করে বরফের উপর দিয়ে শিকার করতে এগোয়, এ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। "প্লেইনো ইণ্ডিয়ানরা" মোষের চামড়া পরিধান করে চার হাত পায়ে মোষের দলের দিকে এগোত এবং বাছুরের মত তারস্বরে চিৎকার করে দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এরপরে শিকারীদের জাদু প্রয়োগ বিশ্বাস দেখা দিল তারা মৃত শিকারটি সামনে রেখে নাচতে সুরু করল, যে কারণেই হক তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি বাসা বেঁধে দাঁড়াল যে যদি তারা যে পশুগুলিকে শিকার করতে চায় তাদের অনুকরণে আচরণ করে, এবং আর একদল শিকারী সেজে তাদের হত্যা করবার অভিনয় করে, তবে দলে দলে শিকার সে এলাকায় আসবে, শিকারেও তারা কৃতকার্য হবে। তবে একেবারে প্রারম্ভিক যুগে—আদিম অধিবাসীরা কেবলমাত্র পশুর অভিনয়ই করত, শিকারী সাজত না, ক্রমশঃ দেখা যেতে লাগল নৃত্যে শিকারী ও শিকার উভয়ই উপস্থিত হয়েছে। এর ফলে নৃত্যভঙ্গিমা অধিক উদ্দেশ্যমূলক এবং নাটকীয় সংঘাতময় হয়ে উঠল।

পুরানো পাথর যুগের কয়েকটি গুহায় স্তূপাকার ভালুকের হাড় পাওয়া গেছে। দেখে মনে হয় কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি সাজানো হয়েছিল। হয়ত সেগুলি কোন একটা জাদু বা ম্যাজিক পালনের জন্যই ওভাবে সাজানো হয়েছিল। সাইবেরিয়ার অধিবাসী শিকারীদের মধ্যে "ভালুক উৎসব" বলে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। শিকার করার পরে তারা সেই ভালুকটির সামনের দুটি থাবা মাথার উপরে তুলে এক বেদীর উপরে বসিয়ে দিত—তারপর কয়েক রাত চলত উৎসব। শিকারীরা প্রথমে ভালুকটিকে প্রণাম করে উদ্দাম নাচগান সুরু করত এবং ভালুকের গা থেকে মাংস কেটে খেত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে ভালুকের প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করে ভবিষ্যতেও সে যাতে তাদের প্রতি সদয় থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে এই আবেদন জানান হচ্ছে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এবং বিভিন্ন অভিযাত্রীদল আমাদের অনেক অনুকৃতি জাদু বা "সিম্‌প্যাথেটিক্ ম্যাজিক্" (Sympathetic Magic)-এর প্রমাণ ও উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আফ্রিকার কোন কাফ্রি হয়ত যে পশুকে তারা শিকার করতে চায় তারি ছদ্মবেশে পশুর মতই চার হাত পায়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, আর তার সঙ্গীরা শিকার কালের চিৎকার করতে করতে তাকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা কবার ভাণ করে। পশুচরিত্রের অভিনেতা তখন মাটির উপর পড়ে গিয়ে মৃত পশুর অভিনয় করে।

উত্তর মিশৌরীব "ম্যান্‌ড্যান্ ইণ্ডিয়ানদের" (Mandan Indians) মধ্যে "মহিষাগমন" নৃত্য বা "বাফেলো ডান্স" অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গোষ্ঠীর দশ, বারোজন লোক মহিষের লেজ, মাথা, শিং ইত্যাদি লাগিয়ে মহিষ সেজে বৃত্তাকারে নৃত্য সুরু করে এবং কয়েকটি শিকারী তাদেব অনুসরণ করতে থাকে। এই অনুষ্ঠান তারা দিনের পর দিন চালাতে থাকে যতদিন না আশেপাশের বনভূমি থেকে সংবাদ সংগ্রাহকরা মহিষাগমনের কথা জানায়। "নিউ ব্রিটেনে" দেখা যায় পাখীদের প্রেমনৃত্যানুষ্ঠান, তাদের ধারণা এর ফলে পাখীদের প্রজনন এবং জন্ম সংখ্যা বাড়বে ফলে তাদেব খাদ্য সরবরাহও বাড়বে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই বোধ হয় বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ মনুষ্যসমাজ। তারাও এই ধরণের বিস্তৃত নাটকীয় অনুষ্ঠান করে এবং শিকারের খেলা খেলে। তাই আমরা যখন দেখি দক্ষিণ ফ্রান্স ও স্পেনের গুহা গভীরে নেয়নডার্থাল মানুষ হাতী, জলহস্তী, সিংহ, বাইসন, এবং হরিণ অঙ্কিত করে রেখেছে—সেখানে শিকারীর হাতে পাথরের বর্শাও দেখি। দেখা যায় এই অঙ্কিত দেহটি হরিণেব কিন্তু পায়ের পাতা মানুষের —অতএব বোঝা যায় সেই পুরাতন পাথর যুগেও মানুষ পশুচর্মে আবৃত হয়ে পশু আগমন এবং শিকার নৃত্য কবত—তাদের মধ্যেও এই জাদু ক্রিয়ার বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃতির সম্পদ যেমন তাদের জীবনধারণে অপরিহার্য ছিল, তেমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির সামনেও তারা ছিল অসহায়, ভীত, শঙ্কিত। ক্রমশঃই স্বাভাবিক নিয়মে তারা প্রবল পরাক্রমশালী কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির

অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে লাগল। সর্ববস্তুর মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বকে বলা যায়—আত্মা। আত্মা শুভ ও অশুভকারী দু'রকম আছে। বাইসন কিংবা ভালুকের আত্মা তাদের প্রতি সদয় বলেই—তারা তাদের অন্নদাতা, রক্ষাকর্তা। ক্রমশঃ তারা ভাবতে সুরু করল এই রক্ষাকারী জীবেরাই তাদের পূর্বপুরুষ তারা তাদের বংশধর এই ভাবেই আবির্ভাব হল "টোটেমিজম্"-এর। শ্রীযুক্ত অমল দাশগুপ্ত তাঁর "মানুষের ঠিকানা" গ্রন্থে আদিম মানুষদের নাচ গান প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"—ভাষাবিদ্ পণ্ডিতরাই আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ভাষাতেই কামনার সঙ্গে গানের খুব নিকট একটা সম্পর্ক আছে। যেখানেই কোন কামনার কথা উঠেছে সেখানেই গান করার কথা বলা হচ্ছে।······পুরানো পাথর যুগে মানুষের কামনা কী ছিল? কামনা ছিল খাদ্যের। শিকারও সংগ্রহ যাতে প্রচুর পরিমাণে হয় সেজন্য মানুষ ···· ম্যাজিকের আশ্রয় নিত।······সবাই মিলে নেচে গেয়ে কামনা সফল হবার একটা ছবি ফুটিয়ে তোলা। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে সেই পুরানো পাথর যুগে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদেই গান গাইত আর নাচত।"[২]

সমাজে তখন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল যৌথ ভোগদখল। আমরা জানি যখনি একদল মানুষ যৌথভাবে কোন কাজ করে তখনি তারা গান গেয়ে গেয়ে কাজের মধ্যে ছন্দ এবং তাল বজায় রাখে। এখনো পথের পাশে প্লাম্বার মিস্ত্রিরা যখন টিউবওয়েলের নল বসায় তখন তাদের কাজের মধ্যে একটা আশ্চর্য ছন্দ দেখা যায়, কান পাতলে অর্থহীন কতকগুলি কথার একটানা সুরও শোনা যায়। নানা রকম হাড়ের, শিং-এর চামড়ার বাদ্যযন্ত্রও তারা সেই আদিকালেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল।

এই সমস্ত জাদু প্রয়োগকে আদিম মানুষের জীবনে "ধর্ম" না বলে "বিজ্ঞান" বলাই সঙ্গত। বিজ্ঞান বলছি এইজন্য যে এর মধ্যে সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক একটি উদ্দেশ্য ছিল—তা হল প্রকৃতির বিধানকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমাদের বর্তমান নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে তা অবিশ্বাস্য হলেও তারা বিশ্বাস করত যে জাদুবিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা পূর্বপুরুষের আত্মা, প্রাকৃতিক শক্তি এবং রোগভোগের উপরে—কর্তৃত্ব বিস্তার করা যায়।

"ধর্মে"র আবির্ভাব তখনি হল বলা যায় যখন মানুষ কৃষিকর্ম করতে সুরু করল। কৃষিসভ্যতা যখন স্থায়ী হল তখন বর্ষায়, বসন্তে, শস্যবপনকালে,

শস্যসংগ্রহকালে—এমনি ঋতুতে ঋতুতে উৎসব অনুষ্ঠান হতে লাগল। যার নিদর্শন আজো গ্রামীণ সভ্যতায় পাওয়া যায়। এই ধারাই হল শিল্পের লৌকিক ধারা। এই যুগকে বলা হয় 'বহুদেববাদের যুগ' বা 'প্যানথিয়ন যুগ'। প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তির পিছনেই আলাদা আলাদা দেবতার অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

সূর্যালোকের দেবতা, বর্ষণের দেবতা, পৃথিবীর দেবতা, মদের দেবতা, জলের দেবতা, শস্যের দেবতা—তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে পূজা উপচার পেতে লাগল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে পূর্বেকার জাদু প্রয়োগের—বিশেষ করে "সিম্প্যাথেটিক্ ম্যাজিকের" যথেষ্ট প্রভাব ছিল—কিন্তু সেখানেই শেষ হল না, তারা "সূর্যালোক বা সুবর্ষণের" জন্য দেবতাদের কাছে "প্রার্থনা" জানাতে সুরু করল। শুধু হাতে আবেদন নিবেদন করলেই কেউ আর খুশী হয় না—তার জন্য চাই আয়োজন, অনুষ্ঠান। ভাষাও তখন খানিকটা গড়ে উঠেছে—প্রার্থনা সঙ্গীতের সঙ্গে এই সমস্ত দেবতাদের ঘিরে নানান লৌকিক কাহিনীরও উদ্ভব হতে লাগল—সেগুলোও অনুষ্ঠানে নৃত্যসহ গীত হত। এই জন্যই পৃথিবীর সর্বত্রই নাটক মন্দির ও পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক অবস্থায় গভীরভাবে সংলগ্ন ছিল।

লুমিস্ হ্যাভেমায়ারের (Loomis Havemeyer) বিংশ শতকের এক রিপোর্টে আছে যে, ইউরোপের কোন কোন অংশে বর্ষণহীন মরুশুষ্ক দিনে, একটি লোক হয়ত গাছের উপরে উঠে চতুর্দিকে জল ছিটিয়ে দেয় এবং অন্যরা বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য বড় দুটি পাথর ঘর্ষণ করে শব্দ তোলে, আর মাঝে মাঝে মশাল জ্বেলে বিদ্যুৎ চমকায়। একেও আমরা "সিম্প্যাথেটিক্ ম্যাজিকের" পর্যায়ে ফেলতে পারি। অ্যামাজন এবং নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটান একই সঙ্গে তাদের জীবনে শিল্প, বিজ্ঞান এবং ধর্মের স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

'পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের' (Pueblos Indian) মধ্যে হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যময় এক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। অনুষ্ঠানের সুরুতে তাদের মধ্যে একদল "বর্ষা আগমনের" নৃত্য করে। নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ পায় স্তরে স্তরে মেঘ জমা হয়ে উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রনির্ঘোষিত হচ্ছে, এবং পরিশেষে বৃষ্টি এল। শান্ত, সুস্নিগ্ধ বর্ষণ পৃথিবীকে সিক্ত করে দিল। এরপরে দ্বিতীয় আর একদল বীজবপন ও শস্য বৃদ্ধির নৃত্য করল।

তৃতীয় দল আধিব্যাধি ও মৃত্যুকে বিতাড়ন করল, পৃথিবী সুখ ও সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠল। এই অনুষ্ঠানেরই আর একটি অংশে থাকে তাদের পূর্বপুরুষ ও দেবতাদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী এবং পুরাকথার সঙ্গীত-নৃত্য। উৎসবের বেশির ভাগ অংশই কিন্তু দেবস্থানের অভ্যন্তরে অতি গোপনে হয়, বাইরের কোন দর্শকই সেখানে উপস্থিত থাকবার অধিকারী নয়। পরিদর্শকরা শেষের দু'দিনের সাধারণ অনুষ্ঠানই মাত্র প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ানরা অভিনয়ের বহু আহার্যিক বস্তুও ব্যবহার করে। যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখোশ, পুতুল, কাঠের ডাণ্ডালাঠি, বালির রং ইত্যাদি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানটিরই মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে অনুকূল দৈবশক্তি আনয়ন করা। তারা তাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ জাতীয় বীর এবং দেবতাদের কাছে যখন প্রার্থনা জানায়, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তখন একদল হয়ে ওঠে সেই দেবগাথা এবং কিংবদন্তীর নৃত্যশিল্পী বা অভিনেতা, অন্যদল হয় তার গীতিকার বা নাট্যকাহিনী রচয়িতা এবং তার অভিনয় ক্ষেত্র হয় দেবস্থান, বীরবেদী বা মুক্ত প্রাঙ্গণ। আদিম মানুষের নৃত্যাভিনয়ের (থিয়টোর) চেয়েও পুরাতন ছিল মুখোশ। কিন্তু আদিম শিকারী প্রথম যে মুখোশটা পরেছিল তা ছদ্মবেশের প্রয়োজনেই হক বা "সিম্প্যাথেটিক্ ম্যাজিকের" জন্যই হক সেটা ছিল কেবলমাত্র একটা পশুর মাথা ও চামড়া। তাকে মুখোশ না বলে মুখোশের নামান্তর মাত্র বলা চলে। মানুষের উদরপূর্তির পরেও অন্য উদ্দেশ্য ও আকাজ্ক্ষা রয়ে যায়। তাই পশুচামড়া ব্যবহার করতে গিয়ে সে ইচ্ছা প্রণোদিত ভাবেই খাঁটি মুখোশ তৈরী করতে বসল। ক্রমে এটা হয়ে উঠল তার একটা অস্ত্র, তার কলাকৌশলের প্রকাশ—সৌন্দর্য ও শক্তির বিধায়ক। এই ধরণের শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত মুখোশ আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন মহাদেশের সাদা, কালো, পীত বর্ণের সকল শ্রেণীর মানুষই ব্যবহার করছে। দুটি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই আদিম মানুষের জীবনে মুখোশের ব্যবহার ধর্মীয় প্রথা হিসেবে যুক্ত হয়েছে। সে বিশ্বাস দুটিকে বলা যায় সর্বপ্রাণবাদ বা অ্যানিমিজম্ এবং গোষ্ঠী চিহ্ন বা "টোটেমিজম্।" আদিম মানুষের পূর্ব-পুরুষের পূজারতি থেকেই "প্যাশান প্লে" অর্থাৎ সত্যকার নাটকের সৃষ্টি হয়েছে—সেখানেও মুখোশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিল।

আদিম পৃথিবীতে মানুষ বিশ্বাস করত যে তার চারপাশে ঘিরে যে বিচিত্র বস্তুপুঞ্জ রয়েছে তারা প্রাণহীন নয় তাদের মধ্যে শক্তির অধিষ্ঠান রয়েছে। সেই প্রাণশক্তিকে বলা যায় "অ্যানিমা" (Anima) বা "আত্মা", মানুষ নিজেও সেই প্রাণশক্তিরই আধার স্বরূপ। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মাটা তার দেহ ছেড়ে যায় সত্য কিন্তু তারা বিশ্বাস করত তা একেবারে বিলীন হয়ে যায় না—তা গিয়ে আশ্রয় নেয় কোন অদ্ভুত আকৃতি পাথর বা কাঠের ·টুকরোর মধ্যে। এই জিনিসগুলি তখন দৈবশক্তির আধার হয়ে ওঠে। একটা মানুষের মধ্যে যে আত্মা থাকে তা যখন মৃত্যুর পরে, কোন গাছ বা পাথরের আশ্রয় নেয় তখন তা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং মানব সমাজের পরম হানিকর হয়। এই আত্মাকে আর হত্যা করা যায় না এবং সে ইচ্ছা করলেই অন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে—আকার পরিবর্তন করতে পারে। এই সমস্ত ভৌতিক আত্মা যখন ক্রমশঃই প্রাধান্য যুক্ত হয়ে উঠতে লাগল তখন তার পূজারী তথা জাদুবিদ্‌দেরও দৈবশক্তির অধিকারী হতে হল। তারা আত্মার সঙ্গে কাজকারবার চালাবার জন্য মুখোশ তৈরী করে নিল। মুখোশটিই হয়ে উঠল তাদের বর্ম। মুখোশের বিচিত্র এবং ভয়ংকর আকারের অন্তরালে তারা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজে পেল—এবং ভৌতিক আত্মাদের প্রতি শক্তিশালী জাদু প্রয়োগ করতে লাগল।

দ্বিতীয়তঃ আদিম মানুষের জীবনে সর্বপ্রিয় বিশ্বাস ছিল "টোটেমিজম"-এ। কোন পশুপক্ষীর আকৃতি তারা গোষ্ঠীর চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করল। সেই পশু তখন তাদের আত্মার এক সুন্দর নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠল। এই বিশ্বাস থেকেই আদিম উপজাতিরা তাদের গোষ্ঠী চিহ্নের পশুর মুখোশ পরে তারি আচরণে নৃত্য করত এবং কাঠ খোদাই করে বা মাটি দিয়ে এই পশুর মূর্তি নির্মাণ করত। এই পশুর নিরাপত্তার সঙ্গেই তারা নিজেদের নিবাপত্তা সংযুক্ত কবে নিল। তাই আমবা দেখতে পাই যতদিন পর্যন্ত মানুষ কৃষিকর্মের দিকে হাত বাড়ায়নি ততদিন তাদের নাট্যানুষ্ঠানে পশু ও পশুমুখোশের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু যখন থেকে মানুষ ভূমিকর্ষণ সুরু করল তখন থেকেই তার জীবনে পশুপালন ও শিকারের একাধিপত্য সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। পশুজীবনের সুবিস্তৃত অনুকরণ স্পৃহাও বাহুল্য হয়ে দাঁড়াল। তবু কোন প্রথা বা ঐতিহ্যই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় না—তাই পশুমুখোশ প্রাধান্য হারালেও জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেল না। আমরা জানি "ওসিরিস্ প্যাশান্ প্লে"র অভিনেতারাও বিভিন্ন পশু পক্ষীর মুখোশ পরে নিত। গ্রীসের জাতীয় বীরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যখন প্রাথমিক খোরাসের নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয় তখন তাতে পুরোহিতের ছাগচর্ম ও মাথা পরিধানের প্রথা ছিল। এ থেকেই গ্রাক নাটকের স্বর্ণযুগেও "সাত্যুর" ও "কমেডি" নাটকের অভিনয়ে কিম্ভূতকিমাকার পশু-মুখোশের ব্যবহারের রীতি এসেছিল। কিন্তু ট্র্যাজেডি নাটকের অভিনয়কালে পশুমুখোশ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এতে থাকত গভীর বিষাদময় ভাবদ্যোতক মুখোশ। গ্রাক ট্র্যাজেডির নায়ক, নায়িকা, দেবচরিত্র সকলেই মুখোশ ব্যবহার করত। গ্রীক নাট্যাভিনয়ে "থেস্‌পিস্‌ই" সর্বপ্রথম খোরাস থেকে প্রধান চরিত্রটি আলাদা করে আনেন। এই থেস্‌পিস্ প্রথম যুগে চরিত্র অভিনয়ের জন্য নিজের মুখে সাদা রং-এর প্রলেপ মাখিয়ে নিতেন। উত্তর-কালে লাগাতেন "পুরস্লেইন্" নামে একপ্রকার জংলা লতাপাতা থেঁতো করে, সর্বশেষে তিনি ব্যবহার করেছেন "লিনেন"-এর মুখোশ। আইস্খ্যালস্ প্রথম থেকেই ছাঁচে ঢালাই করা এবং অঙ্কিত মুখোশ ব্যবহার করেছেন। মিশরের ওসিরিস্ উপাখ্যানে দেবোপম জাতীয় বীরচরিত্র এবং দেবতারা মুখোশ পরত, শত্রুপক্ষীয়রা মুখোশহীনভাবে অভিনয় করত। যেমন দেবতারা এবং হোরাস্ (Horus) বাজপাখীর মুখোশ পরত, "থোথ" (Thoth) এবং "ইবিস্" (Ibis) ও পাখীর মুখোশ পরত। আর "অনুবিস" (Anubis) গরুর মাথা ব্যবহার করত। জাপানের "ক্লাসিকাল" নাটকেও আমরা বহু উন্নত ধরণের মুখোশ দেখেছি। মুখোশ দেখেছি ভারতের "কথাকলি" নৃত্যে। কথাকলি নৃত্যে মুখের উপর খুব পুরু করে সাদা প্রলেপ মাখিয়ে তার উপর রামায়ণ চরিত্রের বিভিন্ন মুখাবয়ব তৈরী করা হয়। এ যাবৎকাল মানুষ বহু বিচিত্র জিনিস দিয়েই মুখোশ তৈরী করেছে। যদিও কাঠই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়, তবুও তারা চামড়া, খনিজদ্রব্য, পাথর, কচ্ছপের খোলা, কাদামাটি, কাপড়, পোড়ামাটি, চট, নারকেলের ছিবড়া, পাখীর পালক—এমন কি মানুষের মাথার খুলি দিয়ে পর্যন্ত মুখোশ তৈরী করেছে। আদিম জাতিগুলির মধ্যে নিগ্রো এবং এস্কিমোদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মুখোশের ভাস্কর্য শিল্পী বলা যায়। ছয়শত বছর ধরে জাপানীরা কাঠ বাঁকিয়ে "নো" নাটকের মুখোশ তৈরী করেছে। "মায়া", "টেলটেক্‌স্" এবং "অ্যাজটেক্‌স্" জাতিরা মুখোশকে অত্যন্ত শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌন্দর্যভূষিত

করে গড়ে তুলত। তাদের মুখোশের উপাদান ছিল, "অবসিডিয়ান", "জাড", "গ্রানাইট" ইত্যাদি পাথর, কখন বা কাঠ বাঁকিয়ে তার উপর উজ্জ্বল পাথরের মীনা করেও মুখোশ তৈরী হত।

দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা ইঙ্গিতধর্মী চিহ্ন ও নক্সায় গোল-ঢাক্না যুক্ত চামড়ার চোঙ্গাকে অঙ্কিত করে নিত, অনেক সময় আয়তাকার চামড়ার টুকরোয় বা ব্যাগেও মুখোশ অঙ্কিত করে তাদের উৎসবকালে ব্যবহার করত। এই মুখোশ পরে তারা নিজেদেরই দেব প্রতীক বা তার দূত বলে কল্পনা করে নিত। কৌতুক অঙ্গাভিনেতারা মূল নাটকের দৃশ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকত না তারা কালো রং মেখে, খয়েরি রংএর চামড়া, রাস্তার ধূলো এই সব দিয়েই অঙ্গসজ্জা করত।

উৎসব অনুষ্ঠানেই কেবল যে মুখোশ ব্যবহৃত হত তা নয়—ক্যানাডার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে, এবং "আ্যালাস্কায়" পুরো মুখোশ নাটকেরই অভিনয় হতে দেখা যায়। অধিবাসীদের জীবন অগণিত নদী এবং উপকূলের জলপথে মাছ ধরা ও আনন্দ ক্রীড়ায় ভরা ছিল। ফলে এই প্রদেশের রেড ইণ্ডিয়ানরা কোথাও স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারত না, তাই তারা কৃষিজীবী মানব সভ্যতার দ্বারদেশেও পৌঁছতে পারেনি—মৎসশিকারী ও পশুশিকারীর স্তরেই রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আজো বহুপ্রকার গোষ্ঠীর প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত কথা কাহিনী রয়ে গিয়েছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইণ্ডিয়ানরা দেবতাকে পশুরূপে এবং পশুকে দেবতা রূপে ভাবে; এবং মানবকে উভয়, দৈবী ও পাশব ভাবের প্রতীক বলে ধরে নেয়। তাই এই ইণ্ডিয়ানরা এমন মুখোশ তৈরী করে যা নৃত্য শিল্পী প্রয়োজনে দেবতা মানব ও পশু এর যে কোন চরিত্রের অভিনয়ে ব্যবহার করতে পারে। এদের বহু প্রচলিত পুরাকাহিনীর একটি হল—কি করে সর্বপ্রথম প্রধান দৈবশক্তি উড়ে পৃথিবীতে নেমে এসে একটি মানুষ হল। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইণ্ডিয়ানরা একটিমাত্র মুখোশ দ্বারাই সমগ্র নাটকটি অভিনয় করত। প্রথমে যখন দেখা যেত তখন মুখোশটা বড়, কালো এবং গোলাকৃতি দেখাত। এটা ছিল দেবতাদের বা সৃষ্টির পূর্বেকার মহাশূন্যতার ইঙ্গিতময় প্রতীক, একটা তারে টান দিয়ে এই কালো গোল মুখোশটা কোণাকুণিভাবে ভাগ করে খোলা যেত; তারি মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেরিয়ে পরত একটা পাখীর মাথা ও চঞ্চু, তৃতীয়বারে এই মুখোশটাও ভাঁজ

হয়ে সরে গিয়ে একটা মানুষের মুখ দেখাত। আবার চতুর্থ মুখোশ এসে প্রথম প্রভাতের নাটকীয় আবির্ভাব ঘটাত। পেছনের দিকে ভাঁজকরা দুটি পাখা ছিল রাত্রির প্রতীক। পাখা দুটি খুলে যেত এবং সুবৃহৎ পাখীর চঞ্চু-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ সূর্যদেব এসে উপস্থিত হতেন। নৃত্যশিল্পী তখন আর একটি তার ধরে টান দিত এবং সূর্যের মুখোশটা উঠে গিয়ে তার অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসত সূর্যপুত্র আলোকের মুখোশ।

বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও ইউরোপীয়রা বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় এবং "পেগান" উৎসবে মুখোশ পরিধান করেছে। ইতালীয় "কমেদিয়া দেল্ আর্তে"-এর অভিনয় শিল্পীরা কোথাও বা অর্ধমুখোশ কোথাও পূর্ণমুখোশ ব্যবহার করেছে। অভিনয় মানেই ভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা—মুখোশও সেই ভিন্ন আরোপিত চরিত্র।

আদিম মানুষের আর এক ধরণের জীবনবিশ্বাস তাদের নাট্যেতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে। বালকরা যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন তাদের গোষ্ঠীমন্ত্রগুলিতে তথা দায়িত্বশীলতায় দীক্ষা দেওয়া একটি অতি পুরাতন আচার (রিচ্যুয়াল), এ অনুষ্ঠানটি হত শিক্ষামূলক।

কোন কোন অষ্ট্রেলীয় উপজাতির মধ্যে এই শিক্ষা ১৫ বা ২০ বছর বয়স ধরেও পর্যায়ক্রমে চলে। অনুষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরে বালকদের মনে ধীরে ধীরে ভয় সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর গোপনীয়তা রক্ষা করতে শেখানো হয় এবং বয়োবৃদ্ধ সমাজজ্যেষ্ঠদের মানতে বাধ্য করা হয়। তারপরে বালকরা একটা নাটকীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে—তারা তাদের পূর্বপুরুষদের, তাদের গোষ্ঠীর রক্ষক জীবজন্তুদের এই অনুষ্ঠানে জানতে পারে। তখন তাদের শেখানো হয় ভর্ৎসনাপূর্ণ সতর্কতা-মূলক কথোপকথন—তারা শেখে কি করে গোষ্ঠীর নীতি,—ধর্মের বাঁধাধরা পথে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে জীবনযাপন করা যায়।

এই দীক্ষানুষ্ঠানে প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক শিক্ষাদানই অবশ্য প্রবল —কিন্তু সেটি মূলতত্ত্বের বহিরঙ্গ মাত্র। এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য দিওন্যুসাস্ ও ওসিরিসের পুরাকাহিনীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবেই সম্পর্কিত। তাদের কাহিনীর মধ্যে আছে একবার তারা মরল, —তারপর আবার পুনর্জীবন লাভ করল। যেমন করে বিশ্বপ্রকৃতি হেমন্তের শেষে, শীতের প্রারম্ভে ঝরে যায়, শুকিয়ে যায়, মরে যায়—আবার পুনর্জীবন

লাভ করে ফলে ফুলে, শস্যে পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে বসন্ত সমাগমে। বছরে ছ'মাস চলে প্লুতোর অন্ধকার রাজত্বে প্রসারপিনার নির্বাসনকাল। ধরিত্রী তখন ফলহীন, ফুলহীন, জলহীন, আবার একসময় ধরিত্রী মাতার বুকে প্রত্যাবর্তন করে কন্যা প্রসারপিনা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে দিক্‌বিদিক, মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গরিমা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। প্রাচীন গ্রীসে এবং অন্যান্য বহুদেশে এই সামাজিক দীক্ষানুষ্ঠানের মূলতত্ত্ব হল—দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকটির মধ্যে "বালকের" মৃত্যু হল—এই মৃত্যু একজন পূর্ণমানবের জন্ম দিয়ে গেল—সে "দ্বিজত্ব" প্রাপ্ত হল। এই মৃত্যু ও পুনর্জীবন অনেক সময় প্রতীকের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়, কখন বা সেগুলি হয় বাস্তবানুগ অভিনয়। অতি প্রাচীন গ্রীসে এই ধরণের দীক্ষাকালে নাটকীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে "অলিম্পিয়ায়" একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত, তার মধ্যে বিজয়ী দেবসম সম্মানের অধিকারী হতেন।

তিব্বতে এবং চীনে কিছুকাল পূর্বেও সতর্কতাসূচক নাটকের সাহায্যে শুধু বালকদেরই নয়, পূর্ণবয়স্কদেরও অন্যায় আচরণের কি ভয়াবহ পরিণতি তাই শিক্ষা দেওয়া হত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এব মঞ্চ নির্মিত হত এবং অভিনেতৃগণ হতেন মন্দির পুরোহিতরা। এই নাট্যাভিনয় একদিকে যেমন ছিল উপদেশমূলক অন্যদিকে তেমনি ছিল আনন্দবিধায়ক। উজ্জ্বল বর্ণের অত্যন্ত জমকালো পোষাক তারা পরত, আর যে মুখোশ ব্যবহার করত কখন তা হত সুন্দর, কখন ভয়ংকর, কখন কিম্ভূতকিমাকার তারা নানান অঙ্গভঙ্গি দ্বারা দর্শকদের মনে একশত কুড়ি রকমের নরকের বিভীষিকা সৃষ্টি করত; বিভিন্ন অপরাধের ছিল বিভিন্ন নরক। এই সমস্ত সংস্কার ও বহিরাবয়বের ভয়ংকরতা বাদ দিলে এর মধ্যে নাটকের সুনিশ্চিত পদক্ষেপ দেখা যায়। এমন কি শ্রেণীবদ্ধ উৎপীড়ন দৃশ্যের ভয়াবহতা প্রশমিত করবার জন্য—অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক রহস্য পরিহাসও থাকত, তার ফলে ভয়াবহ দৃশ্যবহুল শিক্ষা সহনীয় হয়ে উঠত, দর্শকদের মনেও তা পরিষ্কার ছাপ ফেলতে পারত।

এই সমস্ত পুরোহিত ও জাদুবিদ্‌দের মধ্যেই একদল চিকিৎসাবিদ্ বলে প্রাধান্য পেতে লাগল। তারা নানান ডাকিনী, যোগিনী বিদ্যার প্রয়োগ এবং ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি করত। এও ছিল কতকগুলি বিস্তৃত অনুষ্ঠান এরও মধ্যে পাওয়া যায় নাটকীয় উপাদান। এরই একটি পরিণত রূপ পাই

আমরা "অ্যাবিডাস্ প্যাশান্ প্লে"তে—"আইসিস্" যখন বৃশ্চিকদংশনাহত হোরাসের চিকিৎসা করছেন।

এতক্ষণ আমরা আদিম মানুষের জীবিকা, ধর্ম, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এইটুকুই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি যে কোথায় কেমনভাবে নাটকের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ নৃত্য-গীত, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে। গোড়াতেই আমাদের একথা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যে মঞ্চের চেয়েও নাটক প্রাচীন। নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে আগে—এবং নাটকের প্রয়োজনেই ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে মঞ্চ—মঞ্চ যখন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এল তখন আবার সে প্রভাবিত করেছে নাটককে। "থিয়েটারের" ইতিহাস মানেই "নাটক" এবং "রঙ্গালয়" এই উভয়ের ইতিহাস।[৩]

পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় আমরা যা পেয়েছি তা নাটক নয়—নৃত্য এবং গীতানুষ্ঠান—নাটক হতে হলে আর একটি উপাদানের সংযোগ অপরিহার্য তা, হল "কাহিনী"। নৃত্য বা আঙ্গিক অভিনয় এবং গীতের সঙ্গে কাহিনীর সংযোগ একদিনেই হয়নি, হয়েছে ধীরে ধীরে। প্রথমে কাহিনী ছিল আভাসে, ইঙ্গিতে, ভাঙ্গাচোরা, অসমাপ্ত, সংক্ষিপ্ত—ক্রমশঃ তা হয়েছে সুগ্রথিত। এই কাহিনীর গ্রন্থন কি ভাবে অতি সহজ সরলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারি কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। নানান ছন্দোবদ্ধ নৃত্য থেকেই এসেছে মূক অঙ্গাভিনয়। আদিম মানুষ তখন অন্য লোকের বা পশুর কিংবা কোন দেবতার চরিত্র বৈশিষ্ট্য অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলত, তাদের সংলাপ ছিল না—এইভাবেই প্রকাশ করত তারা তাদের অন্তরভাব। "ড্রামা" (Drama) শব্দটি মূলতঃ গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত, এর মানে "আই ডু" (I do) বা আমি করি। প্রারম্ভে তার অর্থ ছিল "এ থিং ডান্" (A thing done)—যে কাজটা করা হয়েছে। তার মানে এখানে "ড্রামা" শব্দের সঙ্গে আমরা মঞ্চে যাকে "আঙ্গিক" অভিনয় বলি, যার ইংরেজী অর্থ "অ্যাক্শন" (Action) তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই "অ্যাক্শন" নিঃসন্দেহে এসেছে নৃত্য থেকে। "নৃত্য"ই ছিল আদিম মানুষের ভাষা নৃত্যের তালে ছন্দে সামান্য একটু ভুল হলেও তার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হত।

অস্ট্রেলিয়ার এক আদিম উপজাতির মধ্যে "ক্যানু ডান্স" (Canoe

Dance) বা দাঁড় বাওয়ার নৃত্য প্রচলিত আছে। নারী এবং পুরুষরা তাদের সারিতে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ায়, তাদের হাতে থাকে লাঠি দাঁড়েরই বিকল্পস্বরূপ। তাদের দেহ যখন সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে হাতের লাঠিও তখন সমস্ত দলের একই সঙ্গে তালে তালে নৌকোর দাঁড়ের মতো উঠতে নামতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ দলটা পূর্ণগতিতে ঘুরতে সুরু করে তখন তারা একটা বেতালা দাঁড় ফেলে আনন্দ উৎসবের রসভঙ্গ করে না। সমগ্র নৃত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে জলের বুকে নৌকো ভাসিয়ে ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলে এগিয়ে যাওয়া—প্রথম মানুষের অভিযাত্রার একটি দৃশ্য। এর সঙ্গে কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বা কোন বাস্তব প্রয়োজন বোধের সম্পর্ক নেই। এটা মানবসমাজের একটা নবোদ্ভূত অভিজ্ঞতার "গল্প"। এই ধরণের ভাবাবেগের অভিব্যক্তি থেকেই একদিন মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার আনন্দে নেচেছিল এবং অনুকরণ করেছিল, যার ফলে পরবর্তীকালে লঘু হাস্যরসাত্মক ও শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল।

আদিম মানুষের "শিকার নৃত্য" এবং "যুদ্ধনৃত্যের" মধ্যে অনেক সময় হয়ত "ক্লাউনের" চরিত্র দেখা যেত। সে হয়ত খুব আড়ম্বর করেই সজোরে তীর ছোড়ে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তার একটাও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয় না। এদিক ওদিক ছুটে যায় কিংবা মিত্রপক্ষকেই কুপোকাত করে। এছাড়া পশুপক্ষীর অনুকরণেও প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করা হত।

প্রেমের মূকাভিনয়ই গ্রাম্যজীবনের দ্বৈতসঙ্গীতে এসে পৌঁছেছে। আদিম উপজাতিগুলির কাছে পশুশিকার এবং যুদ্ধ জয় যেমন জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল তেমনিই তাদের অশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল জন্ম রহস্য। মানুষ যে দুটি প্রাথমিক সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে আসে—আত্মবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষা—জন্ম, শস্যোৎপাদন, শিকার ইত্যাদি তারি সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই মানুষের অবকাশ মুহূর্তের আনন্দ উৎসবেও এরাই স্থান পেয়েছে সর্বপ্রথম। প্রেমাভিনয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাদের অতি প্রিয় এক কাহিনী। তা হল: এক যে ছিল মানব সে এক মানবীর রূপগুণের বড় ভক্ত ছিল, অতএব সে তাকে পেতে চাইত এবং যখন তখন প্রেম নিবেদন করত, আবেদন নিবেদন জানাত। আর মানবীটি? সে ছিল বড় ছলনাময়ী সলজ্জ হাসি হেসে সে সরে যেত, ফিরিয়ে দিত। তারপরে একদিন মানবীটি হার মানল—তাদের মিলন হল। এ ধরণের অভিনয়ের সঙ্গেও কিন্তু ধর্ম ও

সংস্কারের প্রভাব ছিল যথেষ্ট—এরই সঙ্গে উৎপাদন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির সম্পর্ক ছিল গভীর।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 'যুদ্ধনৃত্য' প্রত্যেক আদিম উপজাতির মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধনৃত্য দ্বারা তারা দেবতাদের খুশি করত এবং নিজেদের দুঃসাহসিক যুদ্ধোদ্যম সমবেতভাবে প্রত্যক্ষ করত। কিন্তু ক্রমশঃ তার মধ্যে মানবিক আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চারিত হতে লাগল, এবং তা এক সময় গোষ্ঠীগত প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে উন্নত হয়ে প্রাথমিক নাট্যশিল্পের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। এই ধরণের নাটকীয় ভয়, বেদনা, বিস্ময়ের সন্ধান আমরা পাই ছোটখাট দু'একটা যুদ্ধ বা শিকার নৃত্যে। যেমন: এক যোদ্ধা যখন তার পায়ের কাঁটা তুলছিল, অসতর্কভাবে এসে পেছন থেকে আর এক যোদ্ধা তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল—কিন্তু মুহূর্ত পরে হত্যাকারী পরম বেদনা ও বিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে, যাকে সে হত্যা করেছে সে তার শত্রু তো নয়ই, উপরন্তু ভাই। আবার যেমন,—এক শিকারী এক পাখী শিকার করল; সে যেন তার ভুল বুঝতে পেরে বিলাপ সুরু করল তখন সেই মৃত পাখীটি উঠে সুন্দরী এক নারীরূপে তার হাতে ধরা দিল।

ক্রমশঃ মানুষের জীবন ও জীবন সমস্যার মধ্যে জটিলতা আসতে লাগল। সে আর কেবল যুদ্ধ ও শিকার নিয়েই ব্যস্ত রইল না। পুরোহিততন্ত্রেরও একাধিপত্যে চিড় খেলো। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী নৃত্যের মধ্যে আসতে লাগল—তার মধ্যে নাটকীয় উপাদান বাড়ল। এবং নৃত্য থেকে নাটক আলাদা সত্তা নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করল। নাটক ধর্মীয় তন্ত্রমন্ত্র ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে দাঁড়াল, এবং মানুষের অবকাশ মুহূর্তকে ভরে তুলতে লাগল বিচিত্র গল্পে, গানে, গাথায়, ইতিহাসে, দর্শনে—কত সুখ দুঃখের ভাবাবেগে। এই নাটককে দৃশ্যরূপ দেওয়ার জন্যই এগিয়ে এল "রঙ্গালয়" এবং তার বহু কলাকৌশল। নাটক এবং রঙ্গালয় উভয়ই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ এবং তার সৌন্দর্য মূল্যের উপর একান্তই নির্ভরশীল।

॥ মিশর ॥

মিশরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজতে যেখানেই মাটি খোঁড়া যায় সেখানেই পাওয়া যায় কেবল কবরখানা। প্রাচীন শহর ও গ্রামের চিহ্ন বিশেষ নেই। মিশরীয়রা মনে করত জাগতিক মৃত্যুতেই মানুষের শেষ হয় না তারপরে সুরু হয় অনন্তজীবন, তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনটাকে তারা তুচ্ছ ভেবেছে—জীবিত রাজার বাসভূমির চেয়ে মৃত রাজার কবর ভূমিকে করে তুলেছে আরো অনেক-অনেক বেশি আড়ম্বরময়। পণ্ডিতরা মিশরের নাম দিয়েছেন "কবরের দেশ"। কারণ মিশরের সমাজজীবন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক যে কোন নিদর্শন ও বিবরণের জন্যই আমাদের এই কবরভূমির সাক্ষ্য প্রমাণের কাছে যেতে হবে। মিশরের অতীতখানা বক্ষে লিপিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে পিরামিড—পিরামিডের সেই লিপির নাম—'পিরামিড টেক্স্‌ট্‌স্‌' (Pyramid Texts)। এই পিরামিড টেক্স্‌ট্‌স্‌-এ লিখিত বিবরণ থেকেই জানা যায় প্রাচীন মিশরের নাট্যপ্রচেষ্টা।

মিশরে ৫০০০ হাজার বছর পূর্বেই নাটক সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। আদিম মানুষের নাট্যপ্রচেষ্টায় কাহিনীর খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ থাকলেও এ ধরণের সুগঠিত এক কাহিনী ইতিপূর্বে আর গড়ে ওঠেনি। এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় চার হাজার অব্দেও মিশরে সুগ্রথিত না হলেও নাটকীয় কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করেছিল বলে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে প্রায় চার পাঁচ শ্রেণীর নাটক ছিল। প্রায় ৫৫টি নাটকের রূপ পিরামিড ও প্রাচীন মিশরীয় অভিজাতদের কবরভূমিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে এর অনেক নাটকই পিরামিড সৃজনেরও বহুপূর্বে রচিত হয়েছিল—কারণ বহু ক্ষেত্রে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশ এবং কে কোন চরিত্র অভিনয় করেছিলেন তাও লিখিত রয়েছে।

(ক) "পিরামিড টেক্স্‌ট্‌"-এর কাহিনী থেকে যে নাট্যরূপ পাওয়া যায় তার প্রথম শ্রেণীতে আছে কোন রাজা বা অভিজাত ব্যক্তির স্বর্গারোহণ ও পুনর্জীবন লাভের কাহিনী। এই মৃত শাসনকর্তাদের চরিত্রগুলি তৎকালীন রাজা বা পুরোহিতদের দ্বারাই সুঅভিনীত হত। এখানে অভিনেতারাই সেই চরিত্রের প্রতীকরূপ বলে স্বীকৃত ছিলেন। অনেক সময় এই মৃত রাজাকে "ওসিরিসের" (Osiris) চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন করেই দেখা হত

এবং জীবিত রাজাকে ভাবা হত ওসিরিস্ পুত্র হোরাস্ (Horus) বা সৌরদেবতা।

(খ) মিশরে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে "রাজাভিষেক উৎসব নাটক" (Coronation Festival Play) এই শ্রেণীর সর্বপ্রাচীন যে নাটক পাওয়া যায় সেটা লিখিত হয়েছে খ্রীঃ পূঃ ৩১০০ অব্দে পিরামিড টেক্স্‌ট্ লেখা হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পরে। এই নাটকগুলি ফারাওদের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। আবার অনেক সময় যদি কোন ফারাও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে রাজ্যশাসন করতেন তবে তিনি তাঁর রাজ্যশাসনের স্মরণ জয়ন্তী উৎসব করতেন। এই উৎসবে যে নাটকের অভিনয় হত তার নাম ছিল "হেব-সেড্" (Heb-Sed) বা রাজ্যাভিষেক-জয়ন্তী নাটক।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যানুষ্ঠান হল রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানো। এই রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানোকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র রকম নাটকীয় অনুষ্ঠানেরই শুভাগমন হয়েছে। কতকগুলি চিত্রাক্ষরের মধ্যে "আইসিস্" (Isis) কি করে "হোরাসের" কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত করেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। আইসিসের জাদুবিদ্যার গুণে বৃশ্চিক দংশন থেকে হোরাস্ নিরাময় হয়ে উঠেছিলেন। এই কাহিনী এবং অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণ নাটকীয় গুণ সম্পন্ন।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী হল মিশরের প্যাশান প্লে (Passion Play) এ সম্পর্কে আমরা যা পিরামিড টেক্স্‌ট-এ পাই সম্ভবতঃ তা মিশরীয় নাটকের ক্রমবিবর্তনের শেষ যুগের উদাহরণ।

এই প্যাশান প্লের (Passion Play) মধ্যে যথার্থই প্রচুর নাটকীয় গুণাবলী ছিল। এর মধ্যে অ্যাকশ্‌ন (action) ছিল, ছিল জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব (Conflict) ছিল একটি দেবতা বা দেবোপম চরিত্র এবং তাকে ঘিরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা একটি কাহিনী। এই প্যাশান প্লের এক ধারাই আজো প্রবাহিত হয়ে চলেছে জার্মানীর সুবিখ্যাত "ওবেরমেরগাউ" (Obermmergau)[১] গ্রামে ও মধ্য-ইউরোপের কোন কোন সহরে। ওবেরমেরগাউতে খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী নিয়ে প্রতি দশবছর অন্তর এই প্যাশান প্লে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যাশান প্লে-ই সভ্যতার দুই আদি ক্ষেত্র মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় আরম্ভ হয়েছিল এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল "অ্যাবিডাস্

প্যাশান প্লে” (Abydas Passion Play) অথবা ওসিরিস্ প্যাশান প্লে। পিরামিড টেক্স্‌ট্-এ এই প্যাশান প্লের কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিবরণ ও কিংবদন্তী মিলিয়ে অ্যাবিডাস্ প্যাশান প্লের কাহিনীটি এইরূপ ছিল বলে মনে হয়।

মিশরে ওসিরিস্ ছিলেন এক দেবত্বে উন্নীত বীরচরিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে শস্যদেবতা, বৃক্ষদেবতা, উর্বরতার দেবতা এবং জীবন ও মৃত্যুর দেবতা, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনে জন্ম হয়েছিল ওসিরিসের। ওসিরিস্ পৃথিবীতে নেমে এলেন। জঙ্গলের জীবন থেকে মানুষদের ডেকে এনে আইন ও শৃংখলায় তাদের বেঁধে প্রথম সাম্রাজ্যের স্থাপনা করলেন। ওসিরিস হলেন তাদের রাজা। তাঁর ভগ্নী এবং স্ত্রী ছিলেন “আইসিস্”।

আইসিস সেই জনসমাজকে কৃষিকর্ম করতে শেখালেন। ওসিরিসের এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু ছিলেন—তিনি ওসিরিসেরই ভ্রাতা, নাম ‘সেট্’ (Set) বা মৃত্যু। এই মৃত্যুর সঙ্গে জীবন ও উর্বরতার দেবতা ওসিরিসের বাধল প্রচণ্ড সংগ্রাম। যুদ্ধে সেট্ জয়ী হলেন এবং ওসিরিস্‌কে একটা কফিনে ভরে পেরেক মেরে ঢাকা বন্ধ করে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দিলেন। এদিকে আইসিস্ দেশে দেশান্তরে ওসিরিস্‌কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তার এই ভ্রমণের পথেই জন্ম হল পুত্র ‘হোরাসের’ (Horus)। হোরাস্ হলেন সৌরদেবতা। বহু দুঃখ কষ্টের পথ পার হয়ে এসে আইসিস্ ওসিরিসের দেহ আবিষ্কার করলেন। সে দেহ তখন ভ্রাতা সেট্ নীলনদের জল থেকে তুলে চৌদ্দটা টুকরো করে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। আইসিস্ এবং পুত্র হোরাস্ একে একে সমস্ত দেহখণ্ডগুলিই খুঁজে পেলেন, আইসিস্ সেগুলো একত্রিত করে ভিজে মাটির উপর রেখে তাঁর ডানা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন—“রাজা ওসিরিস্” এবার “দেবতা ওসিরিস্” রূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলেন—এবং তারপর থেকে পাতালের অধিরাজ হয়ে বাস করতে লাগলেন।

পিরামিড টেক্স্‌টের গায়ে আমরা এই প্যাশান প্লের মঞ্চ নির্দেশক ও চরিত্র অভিনেতাদের উল্লেখ পাই। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১৮৮৭ থেকে ১৮৪৯ অব্দের মধ্যে রাজা তৃতীয় য়ুজারট্‌সেন (King Usertsen III) তার কর্মচারী আই-খার্-নেফার্টকে (I-Kher-nefert) অ্যাবিডাসে দেবতা ওসিরিসের জন্য একটি নূতন মন্দির-বেদী নির্মাণ করতে পাঠিয়েছিলেন। এই রাজকর্মচারী আই-খার্-নেফার্টই অ্যাবিডাস প্যাশান প্লের প্রথম নাট্য-

পরিচালক ছিলেন। আমরা এই নাটকের কোন লিখিত রূপ না পেলেও আই-খার্-নেফার্ট এই ওসিরিস্ নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে কি কি দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তার এক বিস্তৃত বিবরণ পাই। ওসিরিস্ নাটক সম্পর্কে খুঁটিনাটি বহু তথ্য দিয়ে এই বিবরণ তিনি নিজেই পাষাণে উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন। সেখানে আমরা জানতে পাই খার্-নেফার্ট কি করে, কত কৌশলে ওসিরিসের নৌকোখানি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আর কি রকম জমকালো সুদৃশ্য পোষাক ও অলংকার অভিনেতারা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিজেও চমৎকার পোষাক ও অলংকার পরিধান করে নাটকের প্রধান চরিত্র, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওসিরিস্ পুত্র হোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি খুঁজে খুঁজে ওসিরিসের দেহ-খণ্ডগুলি সংগ্রহ করেন এবং সেই দেহ সসম্মানে অ্যাবিডাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই নাটকীয় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হতে বহুদিন সময় নিত। কারণ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নাটকটির অভিনয় হত। কিংবদন্তীর প্রকৃত স্থানগুলিই নাটকে মঞ্চের স্থান অধিকার করত।

অ্যাবিডাস্ প্যাশান প্লে প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হত। শুধু অ্যাবিডাসেই নয়—অন্যান্য নগরীতেও হত। কোথাও হত মূক অভিনয় আবার কোথাও অত্যন্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করত। রাজপৃষ্ঠপোষকতা থাকায় অ্যাবিডাসের অনুষ্ঠানই হত সবচেয়ে আড়ম্বরযুক্ত।

অ্যাবিডাস্ প্যাশান প্লের সুরুতে অ্যাবিডাসের রাজপ্রাসাদ থেকে এক শোভাযাত্রা বের হত। এই শোভাযাত্রায় পুরোহিত, রাজন্যবর্গ, অভিনেতা, জনসাধারণ, কৃষক সকলেই থাকত, শোভাযাত্রার মাঝখানে থাকত ওসিরিসের পুণ্য "তরণীখানি" যে তরণীতে করে তিনি শত্রু বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। খার্-নেফার্ট নির্মিত এই তরণীখানি এখনো বার্লিন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। শোভাযাত্রায় এই নৌকাখানিকে ওসিরিসের অনুচরেরা ঘিরে চলত। অ্যাবিডাস্ প্যাশান প্লেব পুরো নাট্যানুষ্ঠানটি ১৮ দিন ধরে চলত। শোভাযাত্রা খানিকটা এগিয়ে আসার পরে শত্রুরা ওসিরিসের নৌকো আক্রমণ করত। নৌকো থেকেও প্রতিরোধ আসতে থাকত। এইভাবে শোভাযাত্রা মন্দির পর্যন্ত এগিয়ে যেত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওসিরিস্ মন্দির থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতেন কিন্তু তিনি তারপরেই আবার কবরে ফিরে যেতেন। তখন সমবেত জনতার বিলাপ ও ক্রন্দনে

আকাশ মুখরিত হয়ে উঠত। শোভাযাত্রা আবার রওয়ানা হত এবং পথে দু'পক্ষের যুদ্ধ বাধত। যুদ্ধে অনেক অভিনেতাই প্রবলভাবে আহত হতেন। প্রকৃত যুদ্ধবন্দীদেব নিয়ে এসে এই অনুষ্ঠানে হত্যাও করা হত। এবার শোভাযাত্রার অভিনেতারা ওসিরিসের বিচ্ছিন্ন দেহখণ্ডগুলি তিনদিন ধরে খুঁজতে থাকতেন প্রতিদিনই অবিশ্যি এক একটি কৃত্রিম যুদ্ধানুষ্ঠানও চলত।

যখন এই বিচ্ছিন্ন দেহখণ্ডগুলি আবার পাওয়া যেত তখন শোভাযাত্রা আবার গঠিত হত এবং বিপুল আড়ম্বরে দেহাবশেষ বহন করে তারা এগিয়ে যেত ওসিরিসের কবরভূমির দিকে। রাজদেবতার এই কবরভূমিটা ছিল তাঁর মন্দির থেকে দেড়মাইল দূরে। এরপরে সেট্ ও তার বাহিনীর সঙ্গে ওসিরিস্ পুত্র হোরাস্ বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হত। শেষ পর্যন্ত ওসিরিসের দলই হত্যাকারীদের নিধন করে জয়ী হত। সম্ভবতঃ এই শেষ যুদ্ধ সকাল-বেলাই হত। এবারে শোভাযাত্রা যেখান থেকে তাদেব যাত্রা সুরু করেছিল সেই রাজপ্রাসাদেই ফিরে আসত। রাজপ্রাসাদে এসে ওসিরিসের জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অংশগুলি অভিনীত হত। ওসিরিস্ পুনরুজ্জীবিত হয়ে দেবরূপে আবির্ভূত হতেন। আর সেই পুণ্যতরণীখানি পুনরুদ্ধারের ঐতিহ্য বহন করে দর্শকদের আনন্দ দিত। এইভাবে ওসিরিস্ বিরহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা ও মহাপ্রয়াণের বিলাপ ধ্বনির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে এগিয়ে চলেছিল নাটক—ওসিরিস্ প্যাশান প্লে। এর অভিনয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে তার রঙ্গমঞ্চে কোন কৃত্রিমতা ছিল না—তা ছিল প্রকৃত বাজপ্রাসাদ, রাজপথ, মন্দির, গ্রাম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।[২]

॥ প্যাশান প্লের বিভিন্ন পর্যায় ॥

১। রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা—

২। ওসিরিসের "তরণী"—অনুচর বেষ্টিত।

৩। নৌকো—আক্রমণ—যুদ্ধ।

৪। ওসিরিসের পুনরুজ্জীবন—উল্লাস।

৫। আবার কবরে অন্তর্ধান—বিলাপ—ক্রন্দন।

৬। যুদ্ধ।

৭। ওসিরিসের অনুসন্ধান—বাধা ও যুদ্ধ।

৮। দেহাংশের পুনঃপ্রাপ্তি-উল্লাস।

৯। শবানুগমন—শোক।

১০। ওসিরিস্ পুত্র হোরাসের সঙ্গে "সেট্"-এর যুদ্ধ—হোরাসের জয়।

১১। ওসিরিসের পুনরাবির্ভাব॥

এতে দেখি দৃশ্যপটহীন বাস্তব পটভূমিতে অভিনয়। —রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ — পথ — মন্দির — কবরস্থান ··· অভিনয়ের স্থান। অভিনয়ের জন্য নির্মিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা রঙ্গগৃহ ছিল না। অভিনয় ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অভিনয়ে উৎসাহ, যুদ্ধ, বিলাপ ও উল্লাস প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল।

কৃষিদেবতার পুনরুজ্জীবনের কাহিনী নিয়ে মিশরের এই প্যাশান প্লের ধারাই ক্রমশঃ ছড়িয়ে পরে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ক্রীট প্রভৃতি ইউরেশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্রগুলিতে এবং পরিক্রমা করে এসে পৌঁছয় গ্রীসে—সুরু হয় নাটকের জয়যাত্রা।

সিরিয়ার এই প্যাশান প্লের কাহিনী গড়ে উঠেছে "তাম্মুজ্" (Tammuz) বা আদোনিস্ (Adonis) চরিত্র অবলম্বন করে।

তাম্মুজ্ ছিলেন জল ও শস্যের দেবতা—তিনি মেসোপটেমিয়ার নদীগুলিকে অফুরন্ত জলধারায় প্লাবিত করে রাখতেন। সিরিয়ায় এই তাম্মুজের মৃত্যুকে স্মরণ করে নারীরা কাতর বিলাপে দিক্‌বিদিক ধ্বনিত করে তুলত। দেবতা তাম্মুজের প্যাশান প্লেতে শস্যসম্পদ মরে যাওয়া, ঝরে যাওয়ার বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠত, এই বেদনার মধ্যে একটি পরম আশ্বাস ছিল—এই রিক্তা ধরণী একদিন আবার দেবতার পুনরাবির্ভাবে শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই অনুষ্ঠানে একটি পাত্র মাটিতে পূর্ণ করে তার উপরে ফুল ও শস্যের বীজ বপন করা হত তারপরে আট দশ দিন ধরে তাকে উষ্ণ আবহাওয়ায় রেখে জল সেচন করা হত, বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে উঠত কিন্তু গাছের শিকড় বেশিদূর যেতে পারত না বলে কিছুদিন পরেই আবার শুকিয়ে যেত। সেগুলি মৃত তাম্মুজের সঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিয়ে সিরিয়াবাসীরা সর্বহারার ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলত।

বহু পৌরাণিক কাহিনীতেই ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্যাবিলনিয়ায় ইস্থার (Isthar) ছিলেন পৃথিবীর

উর্বরতা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর ইস্থারের তরুণ রূপবান স্বামী ছিলেন "তাম্মুজ্"। কিন্তু তাম্মুজের ভাগ্যই ছিল এমন বেদনাময় যে প্রতিবছরই তাকে মরতে হত—এবং মৃত্যুর পর নিরানন্দ জনহীন পাতালপুরীতে বাস করতে হত। ইস্থার তার সন্ধান কবতে করতে যেতেন সেই পাতালপুরীতে—আর এমনি করে ইস্থারও হারিয়ে যেতেন সেই পূর্ণ বিলুপ্তির মাঝে। এই প্রবল সমস্যার কথা দেবরাজ "এয়া"র (Ea) কানে উঠল তিনি পাতাল দেবীকে পরাজিত কবে তাম্মুজ্‌কে মুক্তি দিলেন, ইস্থারও উঠে এলেন পৃথিবীর বুকে।

ব্যাবিলনিয়ার এই পুরাকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে গ্রীসেব উপকথা। গ্রীসে তাম্মুজের নাম হয়েছে "আদোনিস্", দেবী "আফ্রোদিতে"[৩] বা 'ভেনাস্' প্রবলভাবে ভালবেসেছিলেন তরুণ আদোনিস্‌কে। তিনি তখন আদোনিস্‌কে লুকিয়ে রাখলেন একটি ছোট্ট কাসকেটের মধ্যে আব সেটি জমা রাখলেন পাতালের রাণী "পের্সেফোনের" (Peısephone) কাছে। কিন্তু প্রিয় সখীই শত্রুতা করলেন—পের্সেফোনে নিজেই এই সুন্দর তরুণকে দেখে এমন মোহিত হয়ে গেলেন যে তাকে আর আফ্রোদিতের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। এবারে সৌন্দর্য, জীবন ও ভালবাসার দেবী আফ্রোদিতে মুক্তিপণ দিয়ে আদোনিস্‌কে মৃত্যুর দেবী পের্সেফোনের হাত থেকে উদ্ধার করতে পাতালে নেমে এলেন। কিন্তু জীবনের দেবী হেরে গেলেন মৃত্যুর দেবীর কাছে। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ "জেউস্" (Zeus) এসে ঝগডা মেটালেন। শস্যোৎপাদনের সঙ্গেই আদোনিসের সময়কে তিনি ভাগ করে দিলেন—বছরেব অর্ধকাল তিনি থাকবেন পৃথিবীর বুকে বাকি অর্ধকাল থাকবেন পৃথিবীর নিচে নিরানন্দ পাতালপুরীতে।

গ্রীসের পুরাকাহিনীর সঙ্গে ব্যাবিলনীয় কাহিনীর ধ্বংসশেষের খুবই মিল আছে। গ্রীসেও পুনরুজ্জীবনের চেয়ে তাম্মুজ্ বা আদোনিসের মৃত্যু এবং বিরহই বড হয়ে উঠেছে। যুদ্ধদেবতা 'আরেজ' বা মার্স (Ares or Mars) বন্যশূকরের ছদ্মবেশে আদোনিস্‌কে হত্যা করেন। মার্স ছিলেন আফ্রোদিতের স্বামী। পত্নীর এই সুন্দর কিশোরটির প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখে ঈর্ষাকাতর হয়েই তিনি আদোনিস্‌কে হত্যা করলেন। প্যাশান প্লের মধ্যে এক নিষ্পাপ তরুণকে হত্যা করার জন্য অপরাধী হলেন এই আরেজ।

আলেক্জেন্দ্রিয়ায় গ্রীক আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর তাদের মধ্যে একটি অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। এই অনুষ্ঠানে আফ্রোদিতে ও আদোনিস্‌কে দুটো আসনে বসানো হত। আর তাদের চারপাশে ঘিরে সাজিয়ে দেওয়া হত পাকা ফসল, সতেজ বৃক্ষ শাখা, কেক ইত্যাদি। তারপর উৎপাদনের এই দুই প্রেমিক দেবতার মহা আড়ম্বরে আনন্দ ধ্বনির মাঝে বিবাহ দেওয়া হত। পরের দিনই কিন্তু আদোনিসের মৃত্যু হত। তখন স্ত্রীলোকেরা চুল ছিঁড়ে অনাবৃত বক্ষে বিলাপ করত। এই অনুষ্ঠানের শেষ সঙ্গীতে বলা হত যে আদোনিস্ আবার জীবিতের ভূমিতে ফিরে এসেছেন।

ওসিরিস্ এবং তাম্মুজের প্যাশান প্লে—থিয়েটারকে কাহিনী ও অভিনয় উৎকর্ষের দিক দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেল। আদিম উপজাতীয়দের উৎসব অনুষ্ঠানে ছিল নৃত্য, গীত এবং পশুর চামড়া ও মুখোশ পরে মূকাভিনয়। কিন্তু যখন প্যাশান প্লেতে দেব কাহিনী এবং দেব-চরিত্র এসে যুক্ত হল তখন অনুষ্ঠান হল দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সুবিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান এসে সম্মিলিত হতে লাগল। এল সমারোহপূর্ণ প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, মূর্তি, অঙ্গাভিনয়, মূকাভিনয়, অভিনয়ের বিভিন্ন আহার্যিক* উপাদান ইত্যাদি। ওসিরিসের যে নৌকোকে শত্রুরা আক্রমণ করেছিল সেই মঞ্চোপকরণ (Stage Props) ও এল। অভিনয়ের মঞ্চ যদিও প্রকৃতিনির্দিষ্ট কিংবদন্তী কথিত স্থানগুলিই বেশির ভাগ হত তবুও স্থান নির্দেশক কিছু কিছু দৃশ্যাবলীও এসে গেল।

আদিম নাটকীয় অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন যে জাদুকর বা পুরোহিত তিনিই ক্রমশঃ মঞ্চ পরিচালক হয়ে উঠলেন। কালক্রমে এই প্যাশান প্লের অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রচুর দক্ষতা ও শ্রমসাধ্য কাজ হয়ে উঠল—ফলে তা পুরোহিত শ্রেণীর হাত থেকে সেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারত যে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তাদেরই হাতে এসে গেল পুরোহিত শ্রেণী ধীরে ধীরে নাট্যাভিনয় থেকে একেবারে দূরে সরে গেলেন। তাঁদের অগ্রাধিকার এইটুকুই ছিল যে তাঁরা হয়ত মঞ্চের কাছাকাছি বিশেষ আসনে বসতে পারতেন। যেমন দিওন্যাসাসের অনুষ্ঠানে রাজপুরুষদের মত পুরোহিতদেরও সংরক্ষিত আসন ছিল। কিন্তু তাঁরা প্রকৃত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন না বা নাটকও লিখতেন না।

প্যাশান প্লের আর একটি নাটকীয় বৈশিষ্ট্য হল—এর যে নায়ক চরিত্র

তিনি একজন নির্দিষ্ট নামধারী দেবোপম ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন। ফলে নাট্যাভিনয় ব্যক্তিচরিত্রের অভিনয়ের দিকে আর এক পা' এগিয়ে এল। পরবর্তীকালের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপের জন্য বাকি রইল আর দুটি মাত্র উপাদানের সংযোগ। তা হল আর দেব-চরিত্র নয়—দোষে গুণে ভরা পুরোপুরি মানব চরিত্রের নায়ক যে "নট টু গুড এণ্ড নট টু ব্যাড" (Not too good & not too bad) অর্থাৎ—খুব ভালও নয় আবার খুব মন্দও নয়। এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল কথোপকথনের সাহায্যে হৃদয়ভাব প্রকাশ করা আর দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করে তোলা।

এই শেষ ধাপের মানবচরিত্রের জন্য আমরা মিশর বা সিরিয়ার দিকে তাকাব না কারণ সেখানে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র এতই প্রবল ও স্বেচ্ছাচারী ছিল যে সে পরিবেশে পরিপূর্ণ মানবতাবাদ বিকশিত হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হয়নি। তাই আমরা এবার তাকাব গ্রীসের দিকে, আথেন্‌সের গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে যদিও ক্রীতদাসদের অস্থিমজ্জা সজ্জিত ছিল তবুও সে পরিবেশ মোটের উপরে মানবতাবাদ বিকশিত হওয়ার অনুকূল ছিল। অন্য দিকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও চরিত্র যতই, সঙ্গীত ও বিবৃতি ছেড়ে কথোপ-কথনের সাহায্যে প্রকাশিত হতে লাগল—ততই মঞ্চ আঙ্গিকও হতে লাগল অগ্রসর।

আদিম মানুষ, মিশর, সিরিয়ার নাট্য বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা আলোচনা করে এলাম। সুদূর অতীতের আথেন্‌স ও গ্রীস থেকে সুরু করে বর্তমান যুগের থিয়েটার প্রচেষ্টার যে অবিচ্ছেদ্য ধারা—আমাদের এখন দেখতে হবে আদিম মানুষের সেই ইন্দ্রজাল বা ভোজবিদ্যা, তাদের মুখোশ, গোষ্ঠী জন্তু প্রতীক বা বয়ঃপ্রাপ্তির দীক্ষা, এগুলির সত্যই পরবর্তীকালের পূর্ণরূপ নাট্যপ্রচেষ্টায় কোন অবদান আছে কিনা? সত্যই কি প্রাগৈতিহাসিক সমাজজীবনে বা মিশর, সিরিয়ার প্যাশান প্লেতে এমন কোন উপাদান ছিল যা দিয়ে নাট্যাভিনয়ের যে বিকশিত রূপ গ্রীক ট্র্যাজেডি তার প্রকৃত উৎস ব্যাখ্যা করা যায়? এক সময় আদিম জগতের মানুষগুলির কাছে যা অতি প্রিয় আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান ছিল আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা হয়ত বহুভাবেই নিন্দনীয় হবে—আমাদের কাছে সেগুলি প্রায়শঃই যেমন অদ্ভুত তেমন বিকৃত, নিষ্ঠুর এমন কি পাশব বর্বরতাপূর্ণ। আবার তাদের কতকগুলি আচরণ আছে যার আভ্যন্তরীণ ও বহিরবয়বগত

কোন সৌন্দর্যই আমরা অস্বীকার পেতে পারি না। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রেই সভ্যতার পটভূমিতে তারা আপন সংস্কৃতির পরিশিষ্ট যে চিহ্নগুলি রেখে গেছে তার মধ্যে কলাকৌশলের চাইতে শিল্পবোধ ও শিল্পনৈপুণ্যই প্রধান হয়ে রয়েছে। মানুষের মধ্যে সেই শিল্প সম্ভার কেমন করে এল সভ্যতার ইতিহাসে সে এক পরম বিস্ময়। ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীসের "আত্তিক্ থিয়েটারের" (Attic theater) মূল বীজ কোন গোপন মাটিতে সুপ্ত হয়েছিল—সেই উৎস সন্ধানে দুটি পথের সন্ধান পাওয়া যায় তারা যদিও পরস্পর বিরোধী কিন্তু এক সঙ্গমে এসে পরস্পর মিলেও যায়।

দিওন্যুসাস্ ও ওসিরিসের পুরাকাহিনী থেকে গ্রীক নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল, এই প্রথম কারণ ছাড়াও আর একটি কারণের কথাও উল্লেখযোগ্য—তা হল গ্রীসে জাতীয় বীরদের পূজার ধারা। এই বীরেরা দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না—এঁরা ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও রাজারা। আমাদের স্বদেশী যুগে রাজপুত বীরগাথা যেমন গাওয়া হয়েছে এবং সম্মান পেয়েছে তেমনি ধরণেই আত্তিক্ গ্রীসে প্রচলিত ছিল জাতীয় বীরগাথা। এই কাহিনী হয়ত প্রথম গীত হয়েছিল যুদ্ধনৃত্যকালে। এই নৃত্য আদিম মানবের অনুকৃতি জাদুরই (Sympathetic Magic) সমতুল্য ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে এই নৃত্যের ফলে শত্রুর নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে—তাছাড়া সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যেও এই কাহিনী শুনে যুদ্ধবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠত। গ্রীসে আমরা জানি যে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় এই জাতীয় বীরদের কবর ভূমি ঘিরে গাওয়া হত এই শোকগাথা। এই গাথা কাব্য এবং দিওন্যুসাসের উৎসব নৃত্য ও গীত যখন মিলিত হল—তখনই হল প্রথম নাট্য কাব্যের জন্ম। দৃশ্যত: এই দুটি ধারা ভিন্ন হলেও মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের পথে একীভূত হয়ে গিয়েছে। কারণ প্রাচীন সংস্কারে জাতীয় বীর ও দেবতারা অনেক সময়ই একই আসনে বসেছেন। যদিও জাতীয় বীরেরা জীবিতকালে মনুষ্যদেহধারী বীরই ছিলেন। রাত্রির দেবতা, আকাশের দেবতা, প্রথম সৃষ্টির দেবতা—প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর দেবতারাও আলাদাই ছিলেন। এছাড়াও বহু সংখ্যক দেবতা আছেন যাঁরা মর্তজীবন সমাজের প্রধান হিসেবে এবং বীরহিসেবেই যাপন করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে দেবতার অমর জীবন লাভ করেছেন। খানিকটা অবতারবাদের মতই যাঁরা মানুষ হয়েও সম্পূর্ণই মানুষ নন। তেমনিই গড়ে উঠেছে ওসিরিস্ ও দিওন্যুসাস্ কাহিনী।

॥ গ্রীস ॥

গ্রীক ট্র্যাজেডির উদ্ভব সম্পর্কে রিচার্ড, জি, মলটন তাঁর "দি এন্‌শেণ্ট ক্লাসিকাল ড্রামা" নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন যে,—

: গ্রীক ট্র্যাজেডির উদ্ভব যে মূল উৎস থেকে হয়েছে তা হল "গাথা-নৃত্য" বা ব্যালাড্‌-ডান্‌স। এই মৌলিক উপাদান থেকেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-কর্মের আবির্ভাব। তাই একে বলা যায় সাহিত্যের মূলীভূত উপাদান অর্থাৎ "প্রোটোপ্লাজ্‌ম"। এর মধ্যে আছে কথা, সঙ্গীত এবং অনুকৃত দেহভঙ্গি। এর যোগ্য বিকল্প শব্দ না থাকায় আমরা একে "নৃত্য" নামেই অভিহিত করছি। নারী পুরুষের মিলিত যে আধুনিক নৃত্য প্রাচীন গ্রীসে তা প্রায় অজানা ছিল। চিন্তাকে রূপায়িত করে তুলবার জন্য এ ছিল দেহভঙ্গি যুক্ত এক অনন্য শিল্প। যেমন কথার ক্ষেত্রে—জিহ্বা সঞ্চারিত হয়ে শব্দের সৃষ্টি করে তেমনি নৃত্যে দেহ সঞ্চালিত হয়ে তাকে অর্থবহ করে তুলত। সম্ভবতঃ এ ছিল সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প যে যুগে দেহ পেয়েছিল তার সর্বোন্নত রূপ। :[1]

আদিম মানব সমাজে সহজ মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যে স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য আমরা দেখে এসেছি গ্রীসে বীরগাথা ও দিওন্যুসাসের জাতীয় উৎসবে ভাবাবেগ প্রকাশক সেই স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যের সঙ্গেই এসে যুক্ত হয়েছিল কথা ও সঙ্গীত। নৃত্য, কথা ও সঙ্গীত—এই তিন এর সম্মিলনই হল ব্যালাড্‌ ডান্‌স (Ballad-Dance)। আদিম মানুষের মৌলিক নৃত্য ধারার সঙ্গে যে কথা এসে যুক্ত হল সে ক্রমশঃ তার আদি রূপ বর্জন করে একটি কাহিনী বা কাব্যিক অভিব্যক্তি ধারণ করতে লাগল। এই কাহিনী কাব্যের অনুষঙ্গ হিসেবেই এসে যুক্ত হল সঙ্গীত। সুতরাং এই তিনের মিলনে যে ব্যালাড্‌-ডান্‌সের উদ্ভব হল প্রয়োগ কালে তা একই সঙ্গে নৃত্যের দেহাভিব্যক্তি, কাব্যের আবৃত্তি এবং সঙ্গীতের সুরের সাহায্যে প্রকাশ পেতে লাগল।

এই ব্যালাড্‌-ডান্‌স থেকেই গ্রীক কাব্য-সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারার উৎপত্তি হয়েছে। প্রথম মহাকাব্যের ধারা—সেখানে মানব সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা কথা ও কাহিনীর রূপ পেয়েছে। ব্যালাড্‌-ডান্‌সের গল্পাংশের পরিণত রূপই মহাকাব্য। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে লিরিক

কাব্য। সুগভীর আত্মচিন্তা কল্পনার বিপুল বিস্তার ও বর্ণনাই গীতিকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে প্রকাশ পেয়েছে—যেমন ওড্‌স, সনেটস, হাইম্‌স ইত্যাদি। গীতিকাব্যের মধ্যে ছন্দ, সুর এবং আবেগই প্রধান—তাই এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ব্যালাড্‌-ডান্‌সের 'সঙ্গীত'। এবং তৃতীয় ধারার মধ্যে ব্যালাড্‌-ডান্‌সের-নৃত্য বা দৈহিক অভিব্যক্তিই হয়ে উঠেছে অধিকর্তা। তারি আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে কথা, সঙ্গীত এবং কাব্য। এই তৃতীয় শ্রেণীকে মলটন বলেছেন "নাট্য-কাব্য", তারই মধ্যে ক্রিয়ারূপে চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

এই ব্যালাড্‌-ডান্‌সেরই বহু বিচিত্র প্রয়োগধারার মাধ্যমে তাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও যৌবনের আবেগকে ব্যক্ত করেছে। এখানেই প্রকাশ পেয়েছে তাদের সামাজিক আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামরিক প্রদর্শন, এবং তাদের অবকাশ যাপনের যে কোন প্রচেষ্টা। গ্রীসে এই ব্যালাড্‌-ডান্‌সের বহুবৈচিত্র্যের মাঝে একটি ধারাই পরিপুষ্টি লাভ করে নাটকে রূপায়িত হয়েছে। এই ধারাটি হল দিথ্যুরাম্ব উৎসবের ধারা এই দিথ্যুরাম্ব সঙ্গীত হত দেবতা দিওন্যুসাস্‌ বা বহু পরিজ্ঞাত বাক্‌খাসের (Bacchus) পূজানুষ্ঠানে। এবার আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে দিথ্যুরাম্বের মধ্যে এমন কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা ক্রমবিবর্তনের পথে নাট্যরূপ ধারণ করতে পেরেছে এবং ব্যালাড্‌-ডান্‌সের সার্বজনীন সাংস্কৃতিক ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে হয়ে উঠেছে শুধু মাত্র নাটক।

প্রাচীন গ্রীসে যে সমস্ত অভিজাত দেবদেবীদের পূজানুষ্ঠান হত তাতে যেখানে মন্দিরের ভেতরে দেব-মূর্তি থাকত সাধারণ মানুষ এমন কি পূজারীও সর্বদা সেখানে প্রবেশাধিকার পেত না। সামনের সিঁড়িতে এবং চত্বরে তারা দাঁড়াত, অগ্নিতে খাদ্য উৎসর্গ করত এবং তার উপরে ও চারিদিকে মদ ছড়িয়ে দিত, তারি গন্ধে আহূত হয়ে আসতেন দেবতারা। প্রাচীন ধর্মে দেব কাহিনী এই ভাবেই "মিষ্টিক্‌ ড্রামার" আকারে ব্যক্ত হত। কিন্তু বাক্‌খাস্‌ ছিলেন মূলতঃ লৌকিক দেবতা, বাক্‌খাসের পূজানুষ্ঠান অর্থই ছিল প্রকৃতিরই পূজানুষ্ঠান। সভ্যতার আদি যুগে মানব সমাজে এই বিশ্বপ্রকৃতিই ছিল প্রধান এবং এক বিরাট জিজ্ঞাসা। খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে দেবতা ছিলেন একাত্ম হয়ে। তাই মদিরা এবং উর্বরতার দেবতা দিওন্যুসাসের উৎসবের মধ্যে ছিল এক বন্য উদ্দামতা—এ হল প্রাচুর্যের নৃত্য।

দিওন্যুসাসের উৎসবে যে আবেগময় ব্যাকুলতা প্রকাশ পেত তার সঙ্গে উন্মত্ততার খুব প্রভেদ ছিল না। ব্যালাড্-ভান্‌সের সঙ্গে দিথ্যুরাম্বের প্রভেদই এই আত্মবিস্মৃত ব্যাকুল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই বন্য আবেগের মধ্যেই রয়েছে প্যাশান-এর বীজ। ওসিরিস্ প্যাশান প্লের মধ্যে যে বিচ্ছেদ বেদনা জেগে উঠেছিল সেই সর্বাত্মক বেদনার ধারাই-নাটকের তিনটি মৌলিক উপাদানের অন্যতম এই 'প্যাশান'। এই আবেগময় ব্যাকুলতাই আমরা দেখি পরবর্তীকালের রোমান "সাতুর্নালিয়া" (Saturnalia), ইতালীয় "কার্নিভ্যাল" (Carnival) এবং মধ্যযুগীয় "ফিসট্‌স্ অব্ আনরিজন্"-এ।

শীতে, বসন্তে প্রকৃতির চিরন্তন লীলাখেলায় আদিম মানবসমাজে যে আনন্দোচ্ছলতা জেগে উঠত, দিওন্যুসাসের উৎসব ক্রমশঃ এসে তার প্রধান ভূমিকা অর্জন করল। শীতে মৃত্যু এবং বসন্তে পুনরাবির্ভাব এই নিয়েই গড়ে উঠল দিওন্যুসাসের কাহিনী। গ্রীসের অভিজাত পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে যুক্ত করে তার একটা কাহিনীও গড়ে তোলা হল। এখানেই আমরা পেলাম প্রকৃত নাটকের সম্ভাবনা, নাটকের অন্যতম প্রধান উপাদান একটি সুগঠিত কাহিনী। দিওন্যুসাসকে নিয়ে বিভিন্ন উপকথাজাত কাহিনীই প্রচলিত আছে তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি এইরূপ :

দিওন্যুসাস বা বাক্‌খাস ছিলেন মদিরা-দেবতা। তাঁর পিতা ছিলেন দেবেন্দ্র জেয়ুস এবং মাতা ছিলেন মানবী সেমেলে, কারো কারো মতে পের্সেফোনে (Persephone)—যিনি বসন্ত বা শস্যদেবী। সেমেলের প্রতি জেয়ুসের একান্ত ভালবাসায় জেয়ুস পত্নী হেরা ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে উঠলেন এবং সেমেলের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সেমেলেকে বোঝালেন যে জেয়ুস স্বকীয় বীর্য মহিমায় সেমেলের কাছে কখনই আত্মপ্রকাশ করেন না—কিন্তু জেয়ুসের সে রূপ না দেখালে তার সকল ভালবাসাই বৃথা সুতরাং সেমেলে একবার এই বেশে তাঁকে আসতে অনুরোধ করুক। সেমেলে প্রতারিত হলেন। জেয়ুস অনুরোধ এড়াতে না পেরে যখন প্রণয়িনীর কাছে বজ্রপাণিরূপে উপস্থিত হলেন, গর্ভবতী সেমেলে অকালে পুত্র দিওন্যুসাসকে প্রসব করলেন এবং নিজে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবন হারালেন। অকালপ্রসূত সন্তানকে পালন করবার জন্য জেয়ুস তাকে নিজ উরুর মধ্যে

সেলাই করে রাখলেন কেউ কেউ বলেন তার দুই পায়ের ফাঁকে আশ্রয় দিলেন।

আত্তিকার উত্তরসীমান্তে "এলেউথেরাই" নামে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামে "পাইসিস্ত্রাতাস্" সর্বপ্রথম দিওন্যুসাসের পূজা প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর মন্দির থেকে মদিরা-দেবতাকে বিপুল সমারোহে বার করে এলেউথেরাই-এর পথে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হত এবং বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় ভূমির কাছে উপযুক্ত বেদীর আসনে পূজা করে তাঁকে বসান হত। তাঁর উৎসব হত শীত ঋতুর চারটি মাসে। আমাদের বর্তমান ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ গ্রীসে "রুরাল দিওন্যুসিয়ার" (Rural Dionysia) উৎসব হত। এটাই ছিল মদিরা প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষা সংগ্রহের কাল। তার পরের মাস অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে দ্রাক্ষাকে পেষণ করা হত এই উৎসবের নাম ছিল "লেনাইয়া" (Lenaea)।

ফেব্রুয়ারী মাসে চারিদিকে ফুলের উৎসব লেগে যেত তার নাম ছিল "অ্যান্থেস্ত্রেরিয়া" (Anthestreria) এ সময়ে মদিরার বাক্সগুলি খোলা হত। এই উৎসব তার সর্বোচ্চ ধাপে এসে পৌঁছত মার্চ মাসে। বসন্ত এসে যেত। গ্রীস সমুদ্র তীরের নগরী, সমুদ্রবাণিজ্যের পথ তখন খোলা হত। এবং তখন যে উৎসব হত তাই ছিল দিওন্যুসাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব তার নাম ছিল "সিটি দিওন্যুসিয়া" অথবা "গ্রেট দিওন্যুসিয়া" (Great Dionysia or City Dionysia)।

অলিম্পিকের যে সমস্ত পৌরাণিক দেবতারা তারা জাগতিক সুখ দুঃখের অতীত ছিলেন। কিন্তু লৌকিক দেবতা দিওন্যুসাস্ জীবনের অতি কাছাকাছি রয়েছেন। তাই তাঁর কাহিনীর মধ্যে রয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন বেদনা আর ওরি মধ্যে চকিতে ফুটে উঠেছে আশার ক্ষণপ্রভা—এই দুঃখ দিনেরও শেষ আছে। দিওন্যুসাসের কাহিনী গ্রীক জীবনকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে দিওন্যুসাসের দুঃখ কাহিনী নিয়ে সুভাষিতাবলীও রচিত হয়েছে, তা হল—"দুঃখভোগ সবসময়ই বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে"। ভাগ্যের এই বিবর্তনের মাঝেই ছিল নাটকীয় কাহিনীর বীজ। গ্রীসে প্রচলিত ছিল যে লোকসঙ্গীত দিথ্যুরাম্ব (Dithyramb) প্লেতোর মতে কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুই দরজা। কারণ দিওন্যুসাসের দুইবার জন্ম হয়। দিওন্যুসাসের আর এক নাম ছিল "মেলানাইগিস্" (Melanaigis) অর্থাৎ

কৃষ্ণছাগাজিন পরিহিত দেবতা। গ্রীক "ত্রাগোয়দেইআ" ("tragoedeia" যা থেকে ট্র্যাজেডি 'tragedy' কথার আবির্ভাব হয়েছে) কথারও মূল অর্থ হল ছাগ সঙ্গীত।

দিওন্যুসাসের যিনি পূজারী ছিলেন তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করতেন এবং নিজেকেও ওই দেবতাব সঙ্গে একাত্ম বলেই মনে করতেন। তিনিও অর্ধছাগমানব প্যানেব, জলদেবতা নিম্ফস্ (Nymphs), ফন্স (Fanns) বা "সাত্যুরস্" (Satyrs)-দের মত মুখোশ ও পশুচামড়া পরিধান করতেন—এবং পূজাবিধিকালে বাকৃখাসের তারুণ্য ও দুর্ভাগ্য দুই-এরই সমান অংশভাগী হতেন।

পূজাবীর এই যে ছদ্মবেশ ধারণ এবং মদিরা-দেবতাব অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন—এ কিন্তু মূলতঃ নাটকীয় চরিত্রায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। নাটকেব দুটি উপাদান আমরা পেয়েছিলাম আবেগ এবং বৃত্ত (Plot) এখন পেলাম তৃতীয় উপাদান—চরিত্র।

গ্রীক দিথ্যুরাম্ব ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসবণ কবতে গিয়ে এবপবে আমাদের স্মবণ করতে হয় "আরিয়োনের" (Arion) অবদানেব কথা। তিনিই দিথ্যুরাম্বের গীতিকাব্যের মাঝে নাটকের প্রাণ স্পন্দন জাগিয়ে তোলেন।

মলটন একেই সহজতব ভাষায় ব্যক্ত কবে বলেছেন·· : "দিথ্যুবাম্ব সমবেত সঙ্গীত হয়ে উঠল।···এ হল—অপবিণত নাটকেব সঙ্গে পবিণত গীতিকাব্যের সম্মিলন।" আমরা জানি সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে 'খোরাস' (Chorus) হচ্ছে অন্যতম। কিন্তু এই শব্দটির প্রকৃত উৎপত্তি হয়েছে নৃত্য থেকে। আদিম যৌথ সমাজে সমবেত নৃত্যই ছিল বর্তমান কালের সঙ্গীতের মতই ভাবের প্রধান বাহক।

এই খোরাস লিরিক ব্যালাড-ডান্সেরই (Lyric ballad dances) একটি পরিব্যাপ্ত রূপ। যদিও খোরাসের মধ্যে নাটকের মৌলিক উপাদান কথা, সঙ্গীত এবং দেহভঙ্গি তিনটিই আছে কিন্তু সঙ্গীতই ছিল এর প্রাণশক্তি এবং মূলাধাব। খোরাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য ছিল তিন প্রকার। প্রথমতঃ গ্রাক খোরাস-সঙ্গীতের যা কিছু বিবর্তন তা ঘটেছে এর অরূখেস্ত্রা (Orchestra) বা নৃত্যভূমিকে ঘিরে। এই অরূখেস্ত্রা শব্দটিও কিন্তু বর্তমান সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে বহু প্রচলিত তবে ভিন্ন অর্থে। দিথ্যুরাম্ব সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছিল "কোমাস্" (Comus) থেকে। কোমাস্ অর্থে বোঝাত

ভ্রাম্যমাণ নৃত্যকে। এখানেও খোরাসের সঙ্গে দিথুারাম্বের ব্যবধান—খোরাস তার অর্‌খেস্ত্রা ভুমি ত্যাগ করে কখন যেত না, দিথুারাম্ব দেববেদীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হত। দ্বিতীয়তঃ, খোরাস গাওয়া হত তারের যন্ত্র বীণা (Lyre) সংযোগে আর কোমাসের সঙ্গে সঙ্গত করা হত ফ্লুট বা বায়ুতাড়িত-যন্ত্র বাঁশির সাহায্যে। তৃতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে খোরাসের মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম স্তবক বা ষ্টাঞ্জা (Stanza) বিভাগ দেখতে পাই। এই গ্রীক খোরাসে কাব্যের স্তবকগুলো দুটি দুটি করে গ্রথিত থাকত। পাশাপাশি এই দুটি স্তবককে বলা হত স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফি (Strophe & Antistrophe)। স্ট্রোফি শব্দের প্রকৃত অর্থ হল বৃত্তাকারে ঘুরে যাওয়া। প্রথমে খোরাস অর্‌খেস্ত্রা মধ্যবর্তী দেববেদী থেকে তাদের পরিক্রমা সুরু করত। এই মধ্যবিন্দু থেকে সমুদ্র কল্লোলের মত উদাত্ত গভীর স্বরে খোরাস তাদের গীতিময় কাব্যগাথা গাইতে গাইতে প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে ঢেউএর দোলার মত ঘুরে যেত—এটা হল 'স্ট্রোফি' তারপর 'অ্যান্টিস্ট্রোফি'তে তারাই আবার ঘুরে দেববেদীতে ফিরে আসত। এইখানে দ্বিতীয় স্তবকের আবৃত্তি করা হত। এতে প্রথম স্তবকটি বা স্ট্রোফির অনুরূপ একই ছন্দ, তাল, লয় এবং দেহভঙ্গি থাকত বলেই একে অ্যান্টিস্ট্রোফি বলত। এরপরে দ্বিতীয় 'স্ট্রোফি'তে প্রায়ই কাব্যের ছন্দ পরিবর্তন করা হত। এবারে নৃত্যশিল্পীরা অর্‌খেস্ত্রা বেদী থেকে বাম দিকে আবর্তিত হয়ে যেত। এবং দ্বিতীয় 'অ্যান্টিস্ট্রোফি'তে তারা আবার তাদের পূর্বতন স্থানে ফিরে আসত, এইভাবেই বিরচিত হত একটি 'আওইদে' (Ode) বা দীর্ঘ কবিতা।

প্রাচীন গ্রীকজাতির দুই ধারা "দোরিয়ান" ও "ঈয়োনিয়ান"দের (Dorians & Ionians) সংস্কৃতিগত যে বৈপরীত্য ও অমিল তাই হচ্ছে লিরিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তি খোরাস সঙ্গীতের সঙ্গে দিথুারাম্ব সঙ্গীতের ব্যবধানের ভিত্তিভূমি। বীর দোরিয়ানদের স্থিতধী জাতীয়দেবতা ছিলেন অ্যাপোল্লো (Apollo), তার উৎসব নৃত্যে আমরা পাই দিথুারাম্বের গাম্ভীর্যের সুর। অন্যদিকে ঈয়োনিয়ানদের প্রচণ্ড কাব্য মুখর আবেগ প্রকাশিত হয়েছিল দিওন্যুসাসকে কেন্দ্র করে। আরিয়োনের মহান্ কীর্তি হল এই দুই ভিন্ন ধারাকে সংযুক্ত করা। "আরিয়োন্" নিজে ছিলেন বাক্‌খাসের উপাসনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র "লিসবোর" অন্তর্গত "মেথুামনার" (Methymna) অধিবাসী, অন্যদিকে তিনি গ্রীসের দোরীয় সংস্কৃতির অংশে

বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেন। এবং তিনি নিজে ছিলেন তাঁর যুগের প্রথম লিরিক সঙ্গীতকার।

এজন্যই আরিয়োনের একদিকে দিথ্যুরাম্ব সঙ্গীত, তার বিষয়বস্তু এবং সাতুর অন্যদিকে "লিরিক খোরাস" এই দুই-এর প্রতিই আকর্ষণ ও আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই তিনি এই দুই ধারাকে সম্মিলিত করতে পেরেছেন। দিথ্যুরাম্ব সঙ্গীতকে আবদ্ধ করেছেন অর্কেস্ট্রার বৃত্তভূমিতে। এই দুই ধারার সম্মিলন থেকেই পরবর্তী "খোরাল ট্র্যাজেডির" আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে। আরিয়োনের এই অমর কীর্তি ব্যাখ্যা করে আর. জি. মলটন তাঁর "দ এন্শেণ্ট ক্লাসিকাল ড্রামা" গ্রন্থে বলেছেন—

"এ ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সম্মিলন, বুদ্ধি এবং আবেগের পরিণয়। ছন্দোময় গতির ইতিহাসে এ ছিল স্থিরের সঙ্গে চঞ্চলের এক অপূর্ব সম্মিলন। নূতন অনুষ্ঠানকে এ পূর্ণ শৈল্পিক গভীরতা দিয়ে "খোরাস"এ উন্নীত করেছিল, যার পুণ্যানুষ্ঠানের স্পর্শে অন্তর বিমোহিত হত।"

আধুনিক যুগের প্রধান শিল্প হচ্ছে সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল উপাদান হল অর্কেস্ট্রা। অর্কেস্ট্রা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সম্মিলিত সুর সংলাপ। অর্কেস্ট্রায় তাই আছে তারের যন্ত্র ও বায়ুচালিত বংশীরব। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আরিয়োন্ প্রথম তারের বাদ্যযন্ত্র ও বায়ুচালিত যন্ত্রের মিলিত সুর সৃষ্টি করেন। এই দুই ধারার মিলন ঘটিয়ে আরিয়োন্ যে নূতন প্রাণধারা আনয়ন করলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর সে অবদান বীটোভেন বা ভাগ্নেরের (Wagner) চাইতে কম যুগান্তকারী ছিল না।

আরিয়োন্ দিথ্যুরাম্বের যে নূতন সংস্কৃতরূপ সৃষ্টি করলেন তাকেই প্রথম 'ট্র্যাজেডি' নামে অভিহিত করা হল। গ্রীক ত্রাগোয়দেইআ (Tragoedeia) কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—'ছাগ-সঙ্গীত', আদিম কালের চাষারা ছাগ-চর্ম পরত। এই আদিম পরিধেয় ক্রমে দেবতার উপর আরোপিত হয়েছে। সেইজন্যই দিওনুসাসের ছাগচর্মবেশ। এবং তাঁর পূজাবিধির মধ্যে প্রাচীনতম ধারার যে অশ্লীল রস ছিল তাই ক্রমে 'সাতুর' (Satyr) নাটকে পরিণত হয়েছে। এই সাতুরেরই অন্যতম প্রাচীন নাম ছিল "ত্রাগি" বা "ট্র্যাজি" (Tragi) এবং এর পরবর্তী তিনটি বর্ণ ই. ডি. ওয়াই (Edy) গ্রীক সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা ও. ডি. ই (Ode) অর্থাৎ "আওইদে" এরই অপভ্রংশে তৈরী। কাজেই গ্রীকদের কাছে 'ট্র্যাজেডি' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গীতিকাব্য মুখর "স্যাত্যুর" নাটকের অনুষ্ঠান। এই অর্থ বোধকে অটুট রাখবার জন্য আধুনিক পণ্ডিতসমাজ আরিয়োন্ সৃষ্ট ট্র্যাজেডির উন্মেষকে ট্র্যাজেডি না বলে 'লিরিক ট্র্যাজেডি' নামে অভিহিত করেছেন। এই 'ট্র্যাজেডি' নিঃসন্দেহে একাধিক শিল্পের একটি সম্মিলিত রূপ ছিল। বহিরঙ্গের দিক থেকে ট্র্যাজেডি ছিল গীতিকাব্যময়, আর তার অভ্যন্তরে থাকত মহাকাব্য সুলভ বর্ণনাত্মক একটি বীরকাহিনী, তাতে থাকত সুবিস্তৃত ছন্দ, যতি, লয়, আর তারি সঙ্গে এসে সম্মিলিত হয়েছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের দোলা। কেবল মাত্র প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে এ ছিল নাটকীয় গুণসম্পন্ন। অন্যান্য গীতিকাব্যের মধ্যে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচণ্ড বন্য আবেগময়তায়, এবং বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে নিজেদের আত্মবিলুপ্ত সমবেদনায়। এর মূল প্রবণতাই ছিল ঘটনাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার। এর পরের ইতিহাস হল 'লিরিক ট্র্যাজেডির' মধ্যে নাটকীয় প্রাণবস্তুর ধাপে ধাপে স্বাধিকার বিস্তারের ইতিহাস। অর্থাৎ নাট্যরূপের দিকে অগ্রগতি।

খোরাসের মঞ্চ সেই একই রইল—বৃত্তাকার অর্কেস্ত্রা ভূমি যার মধ্যে অধিষ্ঠিত দেববেদী। কিন্তু ধীরে ধীরে খোরাসের গঠনগত বিবর্তন চলতে লাগল যে বিবর্তন তাকে নিয়ে চলল নাটকীয় রূপ পরিগ্রহের দিকে। আমরা দেখব নাটকের সাহিত্য রূপ যতই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল ততই তার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ শিল্পের জন্য প্রয়োজন হতে লাগল কুশলী অভিনেতা ও মঞ্চ পরিবেশের গঠন বৈচিত্র্য। এইভাবে নাটকের কাব্য-গুণের সঙ্গে তার দৃশ্যগুণ এসে যুক্ত হয়ে তাকে একটি শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ শিল্প করে তুলল। এর পরে আমরা দেখব,—নাটকের কাব্যগুণ এবং তার প্রয়োগশিল্প তথা মঞ্চ শিল্প পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে আবর্তিত হয়ে ক্রমাগ্রগতির দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

একটি কুঁড়ি যেমন করে দল মেলে মেলে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের রূপ গ্রহণ করে তেমনিই আমাদের পূর্বপরিচিত খোরাস ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে পেয়েছিল নাট্যরূপ। এর বিবর্তনের প্রথম ধাপ হচ্ছে সৃষ্টির আদি-পর্বের জেলি মাছের মত—আপনার মাঝে আপনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া। খোরাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হত দুটি সেমি-খোরাসের (Semi-Chorus),

মিলিত ভাবেই খোরাস রূপে তারা 'ওড' গাইত। কিন্তু 'ওড'-এর মধ্যে কোন চরম সঙ্কটময় বা আবেগময় মুহূর্ত যখন আসত তখনি খোরাস বিভক্ত হয়ে 'সেমি-খোরাস' হয়ে যেত, এবং অত্যন্ত দ্রুত লয়ের সংক্ষিপ্ত—মাত্র এক লাইন, দু'লাইনের উত্তর প্রত্যুত্তরে তারা সেই চরম মুহূর্তটির আবেদন আরো তীব্রতর করে তুলত। খোরাসের গতিভঙ্গির মধ্যেও হঠাৎ আনা এক অপূর্ব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হত। দর্শকদের দৃষ্টিসম্মুখে আকস্মিক ভাবেই একটি খোরাস দুটি হয়ে যেত। তার একটি খোরাস মূল গান চালিয়ে যেত, আর একটি ভাগ তখন থেমে গিয়ে তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রশ্নবাণে মূল গায়কদের জর্জরিত করে তুলত। এই ভাবেই সঙ্গীতের সঙ্গে কথোপকথন এসে মিশ্রিত হয়েছিল, আর কথোপকথনই নাট্য আঙ্গিকের মৌলিক উপাদান।

ট্র্যাজেডির মধ্যে এই যে, কথোপকথনের আবির্ভাব হল এ আরো বিস্তৃত রূপ ধারণ করল খোরাসদলের প্রধান পরিচালক "এক্সার্খস্" (Exarch)-এর নাটকীয় ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এক্সার্খস্ শব্দটি খোরাস নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, মাঝে মাঝে খোরাস সঙ্গীত ও নৃত্য দুই-ই থেমে যেত, তখন নায়ক হিসেবে এগিয়ে আসতেন খোরাস প্রধান। তিনি অন্যান্য খোরাস সঙ্গীতকারকদের সঙ্গে কথোপকথন সুরু করতেন। তাতে কাহিনীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি আত্মপ্রকাশ লাভ করত, পরবর্তী অংশে খোরাস আবার সেই বিষয়টি অবলম্বন করে বিস্তৃতভাবে সুর বিকাশ ঘটাত, প্রথম পদক্ষেপের পক্ষে এই প্রগতিটি নিতান্ত অবহেলার যোগ্য ছিল না। মাঝে মাঝে এই নাটকীয় কথোপকথন আসায় আগে যা একটানা একটি মাত্র খোরাস সঙ্গীত বা "ওড" (Ode) ছিল এখন তাই ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট বহুসংখ্যক "ওডস্" (Odes) এ পরিণত হল—একে বিভক্ত করে রাখল উত্তর প্রত্যুত্তরের টুকরো টুকরো অংশ। এখনো কিন্তু ট্র্যাজেডির মধ্যে গীতিকাব্যের অংশই রইল প্রধান হয়ে। আর মাঝের এই নাটকীয় গুণযুক্ত উত্তর প্রত্যুত্তর অংশটিকে মূল অবয়ব থেকে বিচ্যুত অংশ বলে ভাবা হত—এর নাম ছিল—"এপিসোডস্" (Episodes) যা ইংরেজী "প্যারেন্থেসিস্" (Parentheses) কথারই সমার্থবোধক।

পরবর্তীকালের বলিষ্ঠ নাট্যরূপায়ণেও আমরা খোরাস প্রধানের এই প্রাধান্যের সাক্ষ্য পাই।

পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি নাটকগুলির মধ্যে আমরা দেখব যে খোরাস-প্রধানই অন্যান্য নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে সোজাসুজি কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই খোরাস-প্রধান তার ব্যক্তি চরিত্রের নয় সমগ্র খোরাসদলের ঐকীভূত মতামতই প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালের পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডির মধ্যে খোরাস বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলিত রূপ হলেও তারা একটিমাত্র নাটকীয় চরিত্র হিসেবেই কথোপকথন চালিয়েছে—তারা সংখ্যায় বহু হলেও কার্যতঃ ছিল একেরই অস্তিত্বজ্ঞাপক।

॥ থেস্‌পিস্‌ ॥

আরিয়োনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল লিরিক-ট্র্যাজেডি—তাকে সম্পূর্ণ "নাট্য-ট্র্যাজেডির" (Dramatic-Tragedy) রূপ দিল আর একটি প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রচেষ্টা। তিনি হলেন থেস্‌পিস্‌ (Thespis—খ্রী: পূ: সম্ভাব্য ৫৩৫) আরিয়োন্‌ গীতিকাব্যকে নাটকীয় রূপবন্ধে বিধৃত করেছিলেন, আর থেস্‌পিস্‌ সেই নাট্যরূপকে মহাকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। মূল ব্যালাড্‌-ডান্সের উৎস থেকে গীতিকাব্য এবং মহাকাব্যের ধারা আপনার বেগে আপনি পরিবর্ধিত হয়ে এগিয়ে চলেছিল। হোমরের যুগে এসে মহাকাব্য যখন তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছল তখন তার মধ্য থেকে সঙ্গীতের প্রাধান্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে লাগল কিন্তু দেহভঙ্গি সম্পূর্ণ লুপ্ত হল না। মহাকাব্যের প্রারম্ভিক যুগ থেকে এর কাব্য কাহিনী যারা আবৃত্তি করতেন তাদের বলা হত "র‍্যাপসোডিষ্টস্‌" (Rhapsodists) এরা ছিলেন অনেকটা আমাদের কথক ঠাকুরদের মত। যখন এরা কাব্য আবৃত্তি করতেন তখন ছন্দোরক্ষার জন্য হাতে একখানা লাঠি থাকত তা দিয়ে তাল রাখতেন। সকল প্রকার মহাকাব্য আবৃত্তির মধ্যেই নাটকীয় উপাদান থাকত কিন্তু বিশেষভাবে তার অস্তিত্ব দেখা যেত প্যানাথেনাইয়ার (Panathenæa) উৎসবে অনুষ্ঠিত মহাকাব্যের আবৃত্তিতে। এখানে একটি আবৃত্তিতে দু'জন আবৃত্তিকারক যোগ দিতেন। যেমন 'ইলিয়ডের' (Iliad) কোন অংশ হয়ত আবৃত্তি করা হচ্ছে, প্রধান আবৃত্তিকারক আবৃত্তি করতে করতে গ্রীকরাজন্যবর্গের বিবাদ ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন—তখন তিনি কেবল রাজা অ্যাগামেমনোনের (Agamemnon) ভাষণই বলে যেতে লাগলেন অন্য জন এগিয়ে এসে গ্রহণ করলেন, "আখিল্লেসের"

(Achilles) ভূমিকা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাকাব্য ও নাটক অতি কাছাকাছি চলেছে। থেস্‌পিসের অবিস্মরণীয় কীর্তি হল এই মহাকাব্যের আবৃত্তিকারককে ট্র্যাজেডির কাহিনীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য অর্‌খেস্ত্রাভূমিতে এনে ফেলা। ফলে খোরাস-প্রধানের সঙ্গে কথোপকথন চালাবার একজন জোরালো সঙ্গী হয়ে গেল।

থেস্‌পিস্‌ এই যে নাটকে খোরাসের দল ছাড়া আর একজন আলাদা অভিনেতা নিয়ে এলেন, নাট্য-ইতিহাসে এর প্রভাব ও তাৎপর্য বিস্ময়কর। ইনিই হলেন প্রথম অভিনেতা, "অ্যাক্‌টর" (Actor) কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যিনি আবৃত্তিকারকের প্রত্যুত্তর করেন (answering reciter)। প্রথম অভিনেতা এলেও তখনো পর্য্যন্ত নাটকে গীতিকাব্যের প্রভাবই রয়েছে বেশি। কিন্তু এই প্রথম অভিনেতাই লিরিক-ট্র্যাজেডিকে (lyric tragedy) 'ড্রামাটিক্‌-ট্র্যাজেডির' (Dramatic tragedy) দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যা ছিল গীতিকাব্য তাই বিবর্ত্তিত হয়ে, হয়ে উঠতে লাগল নাটক। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথম অভিনেতাই গ্রীক নাট্যভূমিতে মঞ্চের প্রথম আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন। এ সম্পর্কে আর জি. মলটন বলেছেন—"তা ছাড়াও এই অভিনেতাটি খোরাসদলের সভ্য ছিলেন না। সুতরাং অর্‌খেস্ত্রায় তার কোন স্থানও ছিল না। এখানেই হল মঞ্চের বহিস্থ কাষ্ঠপীঠ, যেখানে দাঁড়িয়ে অভিনেতারা বক্তৃতা দেবেন—তারই মূল উৎস।"

থেস্‌পিস্‌ খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫ অব্দে গ্রীসে ট্র্যাজেডি প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় তিনিই ছিলেন নাট্যকার এবং তিনি ছিলেন প্রথম অভিনেতা। কিন্তু সেই প্রাচীনতম গ্রীসে প্রথম রঙ্গমঞ্চটি যে ঠিক কি ধরনের ছিল তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলার মত প্রামাণ্য উপাদান আমাদের কিছু নেই। তবুও তার একটা সম্ভাব্য রূপ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। হোরেসের রচনায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ রূপে ঘোড়া ও গরুর গাড়ির উল্লেখ আছে। এই প্রামাণ্য উল্লেখ থেকেই অনেকে মনে করেন, যে থেস্‌পিস্‌ সম্ভবতঃ খোরাসের মাঝখানে ঠেলা গাড়ির মত একটা কিছু উঁচু পৃথক আসনে দাঁড়াতেন, এবং অর্‌খেস্ত্রার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকরা অভিনয় দেখত। আবার অনেকে মনে করেন তিনি কাষ্ঠপীঠের মত একটা টেবিলের উপর দাঁড়াতেন। এর কোনটাই স্বীকার বা অস্বীকার

করবার মত বলিষ্ঠ প্রমাণ নেই। তবে এটা বোঝা যায় যে থেস্‌পিসেরই মাথায় এই বুদ্ধিটা প্রথম আসে যে কোনো একটা কিছু উঁচু জিনিসের উপর দাঁড়ালে তিনি তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে থাকা খোরাসের মধ্যে উঁচু, প্রধান ও বিচ্ছিন্ন একক হয়ে যান, আর তাতে দর্শকরা তাঁকে বেশি ভাল করে দেখতে ও শুনতে পারে। অভিনেতার পক্ষে দর্শককে এই ভালভাবে দেখানো ও শোনানোর ঐকান্তিক আগ্রহ ও তাগিদ থেকেই জন্ম নিয়েছে সকল প্রকার মঞ্চ। বহু সংখ্যক দর্শক একই সঙ্গে অভিনেতাদের আচরণ ভালভাবে দেখতে পাবে এবং তাদের কথা শুনতে পাবে এই হল মঞ্চ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। শোনা যায় থেস্‌পিস্‌ নাকি খোরাসের দল নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গরুরগাড়ি করে ঘুরতেন এবং অভিনয় করে দেখাতেন। অতএব মনে হয় থেস্‌পিস্‌ খোরাস থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে উচ্চ বেদীর উপর দাঁড়াতেন সেটা ঠেলাগাড়ি বা গরুর গাড়ির মতই কিছু একটা ছিল।

খোরাসের দল এতকাল শুধু কথকের কাজই করত। ঘটনার বিবৃতিই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঘটনার সঙ্গে যারা ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট মঞ্চের উপর তারা কখনও আসতেন না। যা মুখে উচ্চারিত তার গ্রীক প্রতিশব্দ ছিল 'ম্যুথোস' (mythos)। নাটকীয় আকর্ষণবিহীন খোরাসদলকে 'ম্যুথোস' বলা চলে, আর এর বিপরীত অর্থব্যঞ্জক শব্দ হল "এরগোন্‌" (ergon) অর্থাৎ যা কৃত বা সম্পন্ন। এখন আর নাটক অলংকারবহুল বিবৃতিমাত্র রইল না, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাট্যভূমিতে উপস্থিত হতে লাগলেন। এইভাবেই থেস্‌পিস্‌ গ্রীক নাট্য শিল্পকে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করেন। তাঁর সৃষ্ট নট একাধারে অনেকগুলি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতেন। সেই একটি নটই নানা বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন বেশভূষা, মুখভঙ্গি ও মনের বিচিত্র আবেগচাঞ্চল্য একাই অনুকরণ করে প্রকাশ করতেন।

থেস্‌পিস্‌ প্রথম যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর নাটকগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় কোন প্রামাণ্য লিপি পাওয়া যায়নি। তবে প্রাচীন লেখকদের সমালোচনা হতে আমরা থেস্‌পিসের নাটক এবং তার প্রয়োগ শিল্পের বিশেষত্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। প্রধান নটের ভূমিকায় থেস্‌পিস্‌ স্বয়ং অভিনয় করতেন এবং একাই একাধিক চরিত্র অভিনয় করবার জন্য তিনি মুখে প্রথমে সাদা রং-এর প্রলেপ লাগাতেন, পরে লিনেনের মত সূক্ষ্ম একটি বস্ত্রাবরক ব্যবহার করতেন। মুক্ত

আকাশতলে গ্রীকদের অভিনয় হত। দূর থেকে দর্শকদের দেখবার পক্ষে এইরূপ মুখাবরক নিতান্ত অনুপযোগী ছিল না। বরং এই ব্যবস্থাই অঙ্কিত মুখোশের আকারে গ্রাক ট্র্যাজেডিতে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। যা হোক এই নটসৃষ্টির ফলে যে উচ্চ বেদীর উপরে খোরাসের নেতা এতদিন পর্যন্ত অভিনয় করেছেন, এখন তা এই নটের জন্য বিশেষভাবেই নির্দিষ্ট হল। নটের জন্য নির্দিষ্ট এই রঙ্গভূমির নাম হল "লোগেইওন্" (logeion) বা "বেদী"। অর্‌খেস্ত্রা ও বেদীর পশ্চাতে উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ রচিত হল। খোরাস সঙ্গীতের অবসরে বেশভূষা ও মুখাবরক/সময়মত বদলাবার জন্য নট সেই কক্ষে চলে যেতেন। এই বেদী এবং দূরবর্তী ওই ক্ষুদ্র কক্ষটি এগিয়ে এসে অর্‌খেস্ত্রার পশ্চাতে সংলগ্ন হয়েই পরে সেকাল ও একালের রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে আজকাল যে দৃশ্যপট ও পশ্চাদ্‌পট ব্যবহৃত হয় তার প্রারম্ভিক পর্যায় ছিল থেস্‌পিস্ কৃত এই "স্কেনে" বা "ক্ষুদ্র কক্ষ"। এই গ্রীক শব্দ "স্কেনে" হতে ইংরেজী "সিন্" (স্কেনে scene) বা দৃশ্যপটের উৎপত্তি। থেস্‌পিসের স্কেনেতে দৃশ্যপটের কোন বালাই ছিল না। এটা নটের বেশ বা মুখাবরক পরিবর্তনের জন্য একটি ক্ষুদ্র কক্ষ বা শিবির মাত্র ছিল। নাট্য মঞ্চে দৃশ্যপটের প্রবর্তন বহুকাল পরে প্রচলিত হয়েছে।



থেস্‌পিস্ ঠেলাগাড়ির উপর দাঁড়িয়ে অভিনয় করছেন।

থেস্‌পিসের নাটকের প্রয়োগপদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল। প্রথমে নট উচ্চ বেদীর উপর এসে একটি উক্তিতে নাটকের কথাবস্তুর সামান্য পরিচয়

দিতেন। একে প্রস্তাবনা বা 'প্রোলোগ' (Prologue) বলত। তারপরে বেদীর সম্মুখে এসে খোরাসদল ক্রমান্বয়ে সমবেতভাবে কয়েকটি কাব্য গীতিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করত। নট পর পর কতকগুলি চরিত্রের ভূমিকায় কখনো দীর্ঘ বর্ণনামূলক বক্তৃতা করতেন, যে সমস্ত ঘটনা বহু পূর্বে অন্যত্র ঘটে গেছে তা বিবৃত করতেন আর কখনো বা 'খোরাস-গায়কদের নেতার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন।

থেস্‌পিসের নাটকের এই মুখ্য উপাদানগুলিকেই পরবর্তী যুগের ট্র্যাজেডিতে উন্নত অবস্থায় দেখতে পাই।

গ্রীক ট্র্যাজেডির ক্রমোন্নয়নের পথে এরপরে আর একটি উপাদান এসে যুক্ত হল তা হল 'দূতের-ভাষণ' (Messenger's speech) এবং এই ভাষণ নাটকের অন্যান্য বক্তৃতা থেকে কিছু তফাৎ ছিল।

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে দু'টি বিপরীত ধারার প্রবাহ বরাবরই পাশাপাশি বয়ে গিয়েছিল, তা হল দোরিয়ান ও ঈয়োনিয়ান ধারা। একটি গ্রীক উপদ্বীপের অপরটি মহাদেশীয় গ্রীসের ধারা। প্রথমটি "পেলোপন্নেসাস্" (Peloponnesus) এবং অপরটি "আত্তিকা" (Attica) ও "আথেন্‌সের" কৃষ্টির উত্তর সাধনা। আরিয়োন্ এই দুই ধারার সম্মিলনের চেষ্টা করেছেন তারপর আত্তিকার অধিবাসী থেস্‌পিস্, 'পাইসিস্ত্রাতাসের' (Peisistratus) শাসনকালে গীতিকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্য তথা নাটকীয় উপাদানের সংযোগ ঘটিয়ে এই দুই ধারার মিলনকে সার্থকতর করে তুলতে চাইলেন। এর ফলে আমরা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দেখতে পাই যে খোরাল ওডস্ বা সমবেত গীতিকাব্যগুলি রচিত হয়েছে দোরীয় উপভাষায়, আবার নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি রচিত হয়েছে, আথেন্‌সের বা আত্তিক উপভাষায়।

থেস্‌পিসের পর থেকে গ্রাক নাটক ক্রমোন্নতির পথে অতি দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকে। একদিকে যেমন তার অপরূপ শৈল্পিক দীপ্তি বিকশিত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে সে একে একে গীতিকাব্যের আবরণগুলি ত্যাগ করে নাটকীয় সজ্জা গ্রহণ করতে থাকে। এই নাটকীয় সজ্জা গ্রহণের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হল মঞ্চের বিবর্তন। থেস্‌পিসের যুগের ওই একটি মাত্র অভিনয় বেদীই অচির কাল মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত হল। বিরচিত হল পাথর নির্মিত স্থায়ী দৃশ্যসজ্জা, সংকীর্ণ মঞ্চভূমি, প্রশস্ত অর্‌খেস্ত্রাভূমি এবং একটি নগরীর দর্শকদের স্থান দেওয়ার মত বিশাল

প্রেক্ষাভূমি। এইভাবেই আদিম বাক্খাসের পূজা উৎসব থেকে যে খোরাস সঙ্গীতের উদ্ভব হয় তাই এক নূতন শৈল্পিক মাধ্যমে আপনাকে ক্রমবিকশিত করতে থাকে। ট্র্যাজেডি গীতিকাব্য থেকে নাটকীয় রূপের দিকে বিবর্তিত হতে গিয়ে প্রথমেই ধারণ করে মহাকাব্যের ছন্দ। সর্বপ্রথম সাত্যুর তার জন্মক্ষেত্র ব্যালাড্-ডান্সের বাঁধন কাটিয়ে বেরিয়ে আসে। সে গ্রহণ করে আইয়াম্বিক্ ছন্দ (Iambic)। গ্রীক কাব্যে যাকে বলা হয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা "ব্ল্যাঙ্কভার্স" (Blank verse)। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্যই হল এ গদ্য প্রকাশভঙ্গির খুব কাছাকাছি—আর গদ্যই হল কথোপকথনের প্রকৃত ভাষা। সাত্যুরের এই আইয়াম্বিক্ ছন্দ অতি সহজেই তাই ট্র্যাজেডি নাটকের কথোপকথন অংশে অধিকার বিস্তার করে নিল। ওদিকে থেস্পিস্ একজন অভিনেতাকে মঞ্চে আনলেন আর সে প্রয়োজন মত পোষাক পাল্টে দু'তিন বা চার জনের চরিত্রেও অভিনয় করতে লাগল। এছাড়া বহু সংখ্যক মূক চরিত্রও মঞ্চে স্থান পেল। থেস্পিস্ চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে যে মুখোশ পরিবর্তনের রীতি প্রচলন করেন—সেই মুখোশ কেবলমাত্র প্রাচীন রীতিকেই বজায় না বেখে ক্রমশঃ চরিত্রানুগভাবে চিত্রিত হতে লাগল আর ঠিক অনুরূপ ভাবেই মঞ্চে স্থান অধিকার করল এসে দৃশ্যসজ্জা। এই প্রসঙ্গে আর. জি. মলটন মহাশয় তাঁর "দি এন্শেণ্ট ক্লাসিকাল ড্রামা" গ্রন্থে বলেছেন—

"প্রধানতঃ "অ্যাগাথারকাস্" কর্তৃক "পারস্পেকটিভ্" আবিষ্কারের ফলেই গ্রীক থিয়েটার নিখুঁত ভাবে জীবনকে রূপায়িত করবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠল।"

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা এই সত্যেই পৌছলাম যে গ্রীক নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাসে—এক কথায় গীতিকাব্যের উপাদানই নাট্যে রূপায়িত হল এবং ক্রমে তা ট্র্যাজেডি নাটক হয়ে উঠল। এই লিরিক ট্র্যাজেডির মধ্যে যতই নাটকীয় গুণ প্রকাশিত হতে লাগল ততই তার প্রয়োগপদ্ধতি ও মঞ্চশিল্প বিকশিত হয়ে চলল।

ট্র্যাজেডি যখন কেবলমাত্র গীতিকাব্যই ছিল তখন অর্খেস্ত্রা ছাড়া তার আর কোন রঙ্গভূমি ছিল না। দিওন্যুসাসের সম্মানে খোরাস অর্খেস্ত্রা ভূমিতে আদি উৎসবকারীদের মতই হয়ত সাত্যুরের পোষাকে আসত। গীতিকাব্যের ইতিকথাটি রচিত হত দিওন্যুসাসেরই গৌরবোজ্জ্বল কোন কাহিনী নিয়ে—উৎসর্গীকৃত হত তাঁরি উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে থাকত স্তোত্রপাঠ,

সঙ্গীত ও নৃত্য। শান্ত, গম্ভীর ছন্দে রাজকীয় অভিব্যক্তিতে সঙ্গীতকারীরা বাক্‌খাসের গৌরবগাথা গাইত। তারা গাইত তার মহান্ জন্মগাথা—যে জন্মে ছিল জেয়ুসের বিদ্যুৎ দীপ্তি আর সেমেলের মুগ্ধ ভালবাসা। তারপরে পৃথিবী জুড়ে তার বিজয় অভিযান আপনার পূজার প্রতিষ্ঠা কল্লে। সেই সুন্দরকান্তি বিজয়ী বীরের সামনে সকল বিরোধী শক্তি নতশির হয়েছিল। যেমন বাক্‌খাসের অবমাননা করে "পেন্‌থেউস্" (Pentheus) উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—বা তার অনুগামী "দামাস্‌কাস্" (Damascus) পুনর্জীবিত হয়েছিলেন। গায়ক ও শ্রোতারা ভয়ে বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে অমর দেবতার বিরুদ্ধকারী মর মানবদের কাহিনী গাইত আর শুনত।

এই খোরাস সঙ্গীতই ল্যাকুর্গাসের (Lycurgus) ইতিকথা নিয়ে আরো বিস্তৃত রূপ পায়। সে কাহিনীতে আছে—থ্রেসদেশের রাজা ল্যাকুর্গাস্ তাঁর সাম্রাজ্যে বাক্‌খাসের পূজা কঠোর আইন করে নিষিদ্ধ করে দেন। বাক্‌খাস দেশে দেশে নিজের পূজা প্রচার করতে করতে থ্রেস দেশে এসে মানব বেশে স্বয়ং উপস্থিত হন। রাজা এই আগন্তুককে বন্দী করতে চাইলেন—নিরুপায় বাক্‌খাস পালিয়ে এসে সমুদ্র জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু দেবতা দেবতাই—মানব ল্যাকুর্গাস্ তাঁর ক্রোধবহ্নি এড়াতে পারলেন না। দেবতার অভিশাপে দেশে মড়ক ও অজন্মা দেখা দিল—রাজা নিজেও হয়ে গেলেন উন্মাদ। কাহিনীর তীব্রতা আরো ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে চলল—জ্ঞানহীন রাজা নিজ হাতে হত্যা করলেন আপন পুত্রকে। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তাঁর বেদনার উপশম হল আত্মহত্যায়।

অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে ট্র্যাজেডির কাহিনী যখন এই রূপ পেল—মরমানবের সঙ্গে দেবতার এই দ্বন্দ্ব চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে খোরাস আরো কর্ম তৎপর হল আরো জটিলতর হয়ে উঠল। খোরাসের পশ্চাতে মঞ্চ বেদীর উপর বাক্‌খাস ও ল্যাকুর্গাস্ এই দুটি চরিত্রের অভিনেতাকেও দেখতে পাই। কাহিনীর দ্বন্দ্ব ও আবেগ যখন তীব্রতর হয়ে উর্দ্ধরেখায় উঠে আসছে—থ্রেসনগরবাসীরূপ খোরাসের মধ্যেও অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। কেমন করে সামান্য মানব দেবতার উপরে বিজয়ী হবে? উত্তেজিত অস্থির খোরাস আপনা থেকেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল দু'টি সেমি-খোরাসে, অর্‌খেস্ত্রার দুই প্রান্তে দিশেহারা দুই সেমি-খোরাস ঢেউএর দোলার মত মাথা খুঁড়তে লাগল এপাশ ওপাশ। দ্রুত চলল তাদের কথোপকথন—কোন পথে

যাবেন রাজা? কেমন করেই বা আত্মরক্ষা করবেন তিনি? দেবতার সঙ্গে বিরোধ—এর পরিণতি কোথায়? দেবতা সর্বশক্তিমান পার্থিব মানব তাঁর গতিরোধ করবে কেমন করে? উর্ধ্বরেখার চূড়ায় (climax) খোরাসের সঙ্গীত উঠছে। এমন সময় আশ্রয়কামী বাকৃখাস এলেন। বিতাড়িত বাকৃখাস সমুদ্র জলে আত্মগোপন করেন। দ্বিধা বিভক্ত সেমি-খোরাস এবার হল সেই জলধি। বাকৃখাসকে আশ্রয় দিতে তাঁকে ঘিরে আবার তারা বৃত্ত রচনা করে দাঁড়াল এবং ধীর, প্রশান্ত লয়ে একখানি কোমল বস্ত্রাবরণের মত তারা তরুণ দেবতার দেহখানি আবৃত করে দিল। ঢেউএর দল তাঁকে পথ প্রদর্শন করে নিমজ্জিত করে নিয়ে চলল সমুদ্র দেবতার প্রাসাদে। সঙ্গীত আবার কঠিন সুরে বেজে উঠল। দেবতা বিতাড়িত হলেও দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে মানুষের রাজ্যে। খোরাস তাদের ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেহভঙ্গি, গতিভঙ্গি দিয়ে ফুটিয়ে তুলল জলহীন, ফলহীন, শস্যহীন এক উষর ভূমি। আকাশের কোনো কিনারায় এককণা মেঘ নেই। হতাশ্বাস মানবহৃদয়। আবার নৃত্য ছন্দ, সঙ্গীতের সুর পাল্টালো। ল্যাকুর্গাস্ ক্রুদ্ধ, অধৈর্য, সকল সৎপরামর্শ সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। নৃত্যছন্দ আরো ব্যাকুল—উদ্দাম হয়ে উঠল; ল্যাকুর্গাস্ উন্মাদ। খোরাস বুঝতে পারছে পাগল ল্যাকুর্গাস্ তার পুত্রকে চিনতে পারছেন না—বুঝি তাকে হত্যা করতে উদ্যত। খোরাস সংশয়ে, ভাবনায়, আবেগে অধীর, অস্থির হয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে গেল। আবার দুই সেমি-খোরাসের মধ্যে দ্রুত কথোপকথন, চিন্তা আর সংশয়ে তারা আকুল।—ওই উদ্যত তরবারি কি সত্যিই পুত্রের উপরে পড়বে? বাকৃখাসের আঙ্গুরলতার উপরে এত ক্রোধ—সেই ক্রোধে কি নিজের পুত্রকেই আঙ্গুরলতা বলে ভ্রম করবে—তাকে করবে হত্যা? আঃ! অনেক দেরি, অনেক দেরি হয়ে গেল। নৃত্যের ছন্দ আবার শ্লথ হয়ে গেল। রাজা ল্যাকুর্গাস্ আবার স্বজ্ঞানে ফিরে আসছেন। দেবতার প্রতিশোধ এমনি আকারই নেয়—রাজা নিজ কর্মফল ভোগ করছেন। বন্য অশ্ব তার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করে দিল।

এই কাহিনীই যখন ক্রমশঃ পূর্ণ ট্র্যাজেডির রূপ গ্রহণ করল তখন আমরা অর্কেস্ট্রা ভূমির পশ্চাতে মঞ্চ এবং তদুপরি কিছু কিছু মঞ্চসজ্জা দেখতে পাই। এই নাটকটিতে ল্যাকুর্গাসের প্রজারা হল খোরাস। পর পর চলল মঞ্চের উপর অভিনেতাদের অভিনয়—আবার তার পরেই অর্কেস্ট্রা

বৃত্তে খোরাসের "ওডস্"। মঞ্চে ল্যুকুর্গাস্ চাইছেন অজানা আগন্তুককে বন্দী করতে—আগন্তুক দিওন্যুসাস্ অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় নিলেন জলধির—ঢেউএর মত খোরাস এসে তাঁকে আবৃত করে দিল। আবার "ওড" চলল সমুদ্ররাজ্যে দিওন্যুসাসের রাজকীয় অভ্যর্থনা বর্ণনা করে। দর্শকদের মনোযোগ আবার ফিরে চলল মঞ্চে। মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ভাগ্য গণনাকারী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। রাজাকে জানালেন দেশে আগামী অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা। রাজা তাকে অবিশ্বাস করলেন ও বিতাড়িত করে দিলেন। কাহিনী এগিয়ে চলল মঞ্চ থেকে খোরাসের হাতে—অর্‌খেস্ত্রায় খোরাস বেদনাভরা গান গাইল। আবার মঞ্চে রাজার কাছে দেশ জোড়া অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসছে। এইভাবেই একবার মঞ্চে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন, দু' একটি চরিত্র ও দূতদের নাট্যাভিনয়—আবার অর্‌খেস্ত্রায় খোরাস সঙ্গীত। খোরাসদলের আগামী দুর্ভাগ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংশয় এবং শেষে উত্তেজনায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া।

ল্যুকুর্গাসের মতই মানুষ ও দেবতার দ্বন্দ্ব নিয়ে গড়ে উঠেছিল রাজা পেন্‌থেউসের (Pentheus) কাহিনী। তাই আমরা পাই প্রথম স্তরে দেব কাহিনী দ্বিতীয় স্তরে দেব-মানবের কাহিনী ও তৃতীয় স্তরে মানুষের কাহিনী, এই স্তরেই এসেছেন আইস্খ্যুলস্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা।

এই ভাবেই গ্রীক খোরাস সঙ্গীতের সঙ্গে একজন অভিনেতা ও একটি মঞ্চ যুক্ত হয়ে নাটকের প্রাথমিক রূপটি গড়ে ওঠে। ক্রমান্বয়েই আমরা দেখব খোরাস ও খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্য কমে যতই এগিয়ে আসছে কথোপকথনের নাটকীয় রূপ—ততই বাড়ছে মঞ্চের প্রাধান্য, দৃশ্যসজ্জা ও প্রয়োগ শিল্পের জটিলতা। বলা বাহুল্য প্রয়োগ শিল্পের জটিলতা শেষ পর্যন্ত সমাজের বাস্তব সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

দিওন্যুসাসের সম্মানে "সিটি দিওন্যুসিয়া" (City Dionysia) বা "লেনাইয়া" (Lenæa) উৎসবে প্রথম দিকে যে দিথ্যুরাম্ব ও ট্র্যাজিক্ সাত্যুরিক্ এবং কমিক্ নাট্যানুষ্ঠান হত সেগুলির স্থান ছিল অ্যাগোরার (Agora) অর্‌খেস্ত্রা ভূমি। এর প্রধান স্থাপত্য উপাদান ছিল, দিওন্যুসাস্ দেবতার ধর্মীয় অনুষ্ঠান বেদী। এই বেদীর চারপাশ ঘিরে থাকত অর্‌খেস্ত্রা বৃত্ত। যার মধ্যে এসে অভিনেতারা প্রধানতঃ অভিনয় করতেন, গ্রীক দর্শকরাও চারপাশে ঘিরে বেশ আরামেই দাঁড়াতেন বা বসতেন। খ্রীঃ পূঃ

৪৯৯ অব্দে কোন এক অভিনয়কালে কাঠের স্ট্যাণ্ড ভেঙে গিয়েছিল বলে জানা যায়। এতে কোন কোন পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রাথমিক গ্রীক নাট্যানুষ্ঠানগুলি নগরের মধ্যে সমতলভূমিতেই হত। সেখানে বসবার জন্য কোন একপ্রকার কাঠের পাটাতনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তার পরে ভেঙে যাওয়া বা নাট্যাভিনয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার জন্যই হক বা অন্য যে কোন কারণেই হক গ্রীক নাট্যাভিনয়ে দাঁড়াবার ও কাঠের বসবার ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে রঙ্গালয় বিবর্তিত হয়ে পাহাড়ের কঠিন সানুদেশে এসে আশ্রয় নেয়। সেখানে পাথরের গায়ে খাঁজ কেটে বসবার আসনের ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন হেলাসের (Hellas) বহু জায়গায়ই রঙ্গালয় গড়ে উঠবার প্রমাণ থাকলেও ক্লাসিকাল যুগে সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত রঙ্গালয় ছিল আথেন্সের দিওন্যুসাস্ থিয়েটার। এখানেই আইস্খ্যুলস্ সোফোক্লেস্, এউরিপিদেস্ ও আরিস্তোফানেসের নাটকগুলির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই রঙ্গভূমিটি গড়ে ওঠে আক্রোপোলিসের (Akropolis or Acropolis) উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালুতে দিওন্যুসাস্ এলেউথেরেউসের (Dionysus Eleuthereus) পবিত্র পূজাভূমিতে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর ট্র্যাজেডি প্রতিযোগিতার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি এখানেই হয় এবং খুব সম্ভব ষষ্ঠ শতাব্দীর পরিকল্পিত কমেডির অনুষ্ঠানও এখানেই হয়েছিল।

দিওন্যুসাস্-এলেউথেরেউসের এই পূজাবেদীতে আগোরা ও লেনেই-য়োনের প্রাচীনতম উৎসবের মতই প্রথম অভিনয় ক্ষেত্র ছিল খোরাসের জন্য নির্দিষ্ট একটি অর্‌খেস্ত্রা। বর্তমানকালে আমরা অর্‌খেস্ত্রা বলি নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজায় যে বাদকদল তাদের, এই নামানুসারে অনেক সময় আমরা থিয়েটারের একতলাকেও অর্‌খেস্ত্রা বলি। মূলতঃ অর্‌খেস্ত্রা বলা হত গ্রীক রঙ্গালয়ের ক্ষুদ্রমধ্য বৃত্তকে। দিওন্যুসাস্ থিয়েটারের অর্‌খেস্ত্রা ছিল আক্রোপোলিসের পাহাড়ের যে ঢালুতে দেবমন্দির ছিল তার সম্মুখভাগে। আক্রোপোলিস্ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল—নগরীর সর্বোচ্চ ভূমি—যেখান থেকে শত্রুদের আগমন দেখা যেত। আথেন্সের আক্রোপোলিস্ ছিল পাহাড়ের উপরে,[২] মন্দিরের বিভিন্ন খোদাই চিত্র থেকে মনে হয় দিওন্যুসাস্ রঙ্গালয়টি সৃষ্টি হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে। রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা ছিল এইরূপ, পেছনে মন্দির তার সম্মুখে অর্‌খেস্ত্রা আর তারপর থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে আক্রোপোলিসের উচ্চ ভূমি তার গা কেটে

প্রায় বৃত্তাকারে রচিত হয়েছে বসবার আসনগুলি। ফলে দর্শকদের জন্য তৈরী হয়েছিল এক প্রাকৃতিক 'এম্ফিথিয়েটার'। সেই পাহাড়ের নিম্ন প্রান্তে গ্রীকরা তাদের রঙ্গালয়ের দুটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান গড়ে তুলেছিল একটি দিওন্যুসাসের বেদী এবং অন্যটি প্রায় ৯০' ফুট ব্যাসের অর্‌খেস্ত্রা বৃত্ত। ফিকটারের (Fiechter) মতে অর্‌খেস্ত্রার পেছন দিকে ছিল মন্দিরে যাওয়ার সাধারণ পথ—অভিনয়কালে তা বন্ধ থাকত এবং দোরফিল্‌দ (Dorfield) অর্‌খেস্ত্রা পুনর্গঠন কালে এই পথের পশ্চাতে একটি দেয়াল তৈরী করিয়েছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের খাড়া পাশ দিয়ে অর্‌খেস্ত্রা অভিমুখে। পরে অর্‌খেস্ত্রার দু'দিক থেকেই প্রবেশ পথ দেখা যায়—এই প্রবেশ পথকে বলা হত "প্যারোদোস্‌" (Parodos)। এই পথেই খোরাস বা প্রথম অভিনেতা প্রবেশ করেছেন। আইস্খ্যুলসের পরে দ্বিতীয় অভিনেতাও এসেছেন এই পথেই। তারা পোষাক পরিধান করতেন বা পরিবর্তন করতেন একটি ছোট্ট কুটিরে, এটির অবস্থান ছিল প্যারোদোসের বাইরে সম্ভবতঃ এটি পবিত্র কুঞ্জে ঢাকা থাকত। মস্তবড় অর্‌খেস্ত্রা আর তার পাশে খাড়া ঢুকবার পথ এবং পেছনের ছোট্ট দেবমন্দিরটা এই ছিল অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পর্যন্ত দিওন্যুসাসের এলাকার মধ্যে একমাত্র স্থাপত্য। তবে এসময়ও অভিনয়ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাক্ষেত্রের ব্যবধান রেখা সুনির্দিষ্ট ছিল।

॥ আইস্খ্যুলস্‌ ॥

এই অতি নগণ্য উপকরণ কটি নিয়ে আইস্খ্যুলসের বিশ্ববরেণ্য নাটকগুলির প্রথম অভিনয় যে কিভাবে সার্থকতা মণ্ডিত হয়ে উঠত তার যথার্থ প্রমাণ আমাদের জানা নেই। তবুও কল্পনার অভিযাত্রী হয়ে সময়ের ব্যবধানটা সরিয়ে দিয়ে আমরা যদি প্রাচীন গ্রীসে গিয়ে একবার পৌঁছই তবে গ্রীক দর্শকদের সঙ্গে ট্র্যাজেডি প্রতিযোগিতা দেখতে আমরাও যোগ দেব কারণ দর্শকের আসন থেকে নাটককে—তার প্রয়োগশিল্পকে যতখানি গভীরভাবে বিচার করা যায়, রসোপলব্ধি করা যায়, অন্য কোন ভাবেই তা যায় না। গ্রীক নাটকও না হয় কিছুক্ষণ দর্শকের আসনে বসে আমরা দেখব :

—এখন প্রভাত হয়েছে। আথেন্‌সবাসীর এক বিরাট জনতা আক্রোপোলিস্‌ পাহাড়ের অনাবৃত সানুদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। জনতার মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে দাঁড়িয়ে, কেউ হয়ত পাহাড়ের কঠিন

শিলাগাত্রেই পা' মুড়ে বসে পড়েছে। আবার কেউ খুঁটি পুঁতে যে কাঠের বেঞ্চি পাতা হয়েছে তারি উপর বসেছে। তাদের নীচে পাহাড় ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে ছোট্ট একটা মালভূমির দিকে—সেখানে রচিত হয়েছে একটি বৃত্ত আর তার মাঝখানে দেববেদী, অদূরে প্রত্যুষের অস্ফুট আলোকে একটি মন্দিরের রেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

জনতা তখন অধীর, উৎসুক। কয়েকটি দিবারাত্র ধরে উৎসব অনুষ্ঠানে তারা হয়ত শারীরিকভাবে ক্লান্ত। কিন্তু মন তাদের আগ্রহ চঞ্চল, কৌতূহল দীপ্ত। অধৈর্য হয়ে তারা প্রতীক্ষা করছে দিওন্যুসাসের সম্মানে পরবর্তী যে অনুষ্ঠানটি হবে তারি জন্য।

এরপর ফ্লুটে যখন একটি তীব্র মধুর সুর নীচের অস্ফুট অন্ধকার থেকে ছড়িয়ে পড়ল জনতা তখন সম্পূর্ণ নীরব, স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে নীচে দেখা গেল ৫০টি মানুষের মূর্তি। তাদের গায়ে সাদা ঢিলে, ঝোলানো পোষাক আর তার উপরে বিচিত্র এম্ব্রয়ডারী করা। তারা "প্যারোদোস্" দিয়ে নেমে খোরাস বৃত্তের কাছে এল এবং ধীরে ধীরে বেদীর চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। এই দলের মধ্যে একজন রয়েছেন যিনি মূল্যবান পোষাক পরে আছেন। তার পায়ে উঁচু হিলের 'কথুরনাস্' জুতো, মুখে একটি বেদনা মণ্ডিত, গাম্ভীর্যভরা মুখোশ। মুখোশটা তার মাথার উপর দিকে রাজমুকুটের মত উঁচু হয়ে গেছে। উঁচু জুতো, উঁচু মুখোশ, ঢিলে পোষাক তার অবয়বকে আরো অনেকটা দীর্ঘ করে তুলেছে। মুখোশ পরিহিত এই মানুষটিকে তাই অনেক দূর থেকেই দেখা যায় আর তার মুখোশের এমনি কৌশল—যে তার কাব্যের দীর্ঘ প্লুত স্বর সমুদ্র কলধ্বনির মত অনেক দূর পর্যন্ত অনুরণিত হতে থাকে।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর খোরাস সুরু করল :—

"জেয়ুস! তুমিই প্রভু—তুমিই শরণার্থীদের একমাত্র ত্রাতা।
করুণাময়—ফেরাও, ফেরাও তোমার প্রসন্নদৃষ্টি, তোমার
প্রার্থিদের প্রতি। অসহায় তারা যাদের ঝড়ের হাওয়া
আর জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে সুদূরের
ভূমি থেকে।—তারা পার হয়ে এসেছে
এলোমেলো হাওয়ায় বিতাড়িত রাশীকৃত বালুকা স্তর
তরঙ্গ ভঙ্গে যেথায় প্রবাহিত নাইলাসের মুক্তধারা।"৪

খোরাসের একটা অংশ এতক্ষণ গান গাইছিল। নাটকের এটুকু প্রস্তাবনা, এবার দ্বিতীয় দল সুর তুলে নিয়ে পূর্বকাহিনী গেয়ে যেতে লাগল। "এবং বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দানাউস্ আমাদের পিতা ও পথপ্রদর্শক, অশেষ চিন্তার পরে —ভাগ্য পাশার দানের দুটি দুঃখের মধ্যে বেছে নিলেন সহনীয়তমটিকে। আমাদের আদেশ করলেন পালিয়ে যেতে। বায়ু ও সমুদ্র যতই হোক উত্তাল। বিস্তৃত সমুদ্র আমরা দ্রুত পার হয়ে এলাম। আমরা এলাম আরগোসের উপকূলে, থামল আমাদের শ্রান্ত চরণ।"*

আথেন্সের নাগরিকরা তাদের দেশের প্রচলিত কিংবদন্তী জানে—তাই খোরাসের প্রস্তাবনা সঙ্গীতে তারা বুঝে নিল যে, খোরাস বৃত্তের মাঝখানে ঐ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ আকৃতির যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই "দানাউস্" (Danaus) এবং খোরাসের পঞ্চাশজন নারী তারি কন্যা। এই নাটকটির নাম 'হিকেতিদেস্'—এরাই সেই হিকেতিদেস্ বা "দ্য সাপ্লায়্যাণ্ট মেইডেন্স" (The Suppliant Maidens) সকল দর্শকই কিংবদন্তীর এই হতভাগ্য নারীকুলের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা জানে। দানাউস্ ছিলেন আইগ্যপ্তসের (Ægyptus) ভ্রাতা। এঁরা হলেন জেয়ুস ও নিপীড়িতা "আইওর" (Io) সন্তান। আইগ্যপ্তসের পঞ্চাশজন পুত্র দানাউসের কন্যাদের বিবাহ করতে চায়। এই নীতিহীন সম্পর্কে কন্যারা রাজি নয়—তাই আইগ্যপ্তসের পুত্ররা তাদের ভীতি প্রদর্শন করে। দানাউসের কন্যারা ভয়বিহ্বল হয়ে পিতা দানাউসের সঙ্গে জাহাজ চড়ে আইওর মাতৃভূমি আরগোসের (Argos) সন্ধানে বের হয়। এবং আরগোসপতি "পেলাস্গসের" (Pelasgus) কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে।

দর্শকরা কিন্তু জানে এরপর ঘটনার গতি কোনদিকে যাবে। তারা জানে দৃশ্যের পর দৃশ্য অনাবৃত হয়ে কি বেদনাময় পরিণতি এই হতভাগিনী নারীদের অদৃষ্টে লিখিত রয়েছে। সুতরাং কাহিনীর দিক থেকে তারা কোন কৌতূহল কোন নূতনত্ব দাবী করে না। তারা তাদের সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে কবির কাব্য রচনার দিকে। এই অতিপ্রাচীন কাহিনীকে কবিপ্রতিভা কিভাবে বিরচিত করেছে তারি গুণগ্রাহিতা করা তাদের কাজ।

খোরাস ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল—তাদের নৃত্য থামিয়ে বেদীর দিকে এগিয়ে এল। দানাউস্ বেশধারী প্রথম অভিনেতা বৃত্তের একধারে নিঃশব্দে

দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নাটকীয় ক্রিয়া তুলে নিলেন এসে আর একজন অভিনেতা—তিনি রাজার বেশে সজ্জিত মুখোশ পরা। থেস্‌পিস্‌ একজন অভিনেতার প্রবর্তন করেছিলেন আইস্খ্যলস্‌ করলেন এই দ্বিতীয় অভিনেতার প্রবর্তন। এই দ্বিতীয় অভিনেতা হলেন রাজা "পেলাস্‌গস্‌", তিনি খোরাসের অদ্ভুত আকারের পূর্বদেশীয় পোষাক দেখে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন তাদের পরিচয়, আর কেনই বা এসেছে এই আরগিভদের দেশে। খোরাস তাদের সঙ্গীতে পরিচয় ব্যক্ত করে আশ্রয় চাইল পেলাস্‌গসের কাছে। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় শান্ত বাতাসে, জনতার মাথার উপর দিয়ে খোরাস নায়িকার সঙ্গীত ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। "হে ন্যায়ধর্ম: ন্যায় বিচারকারী জেয়ুসের কন্যা! প্রার্থনাকারিণীদের রাণী হে ন্যায়পরতা, দয়া করে দেখো, আমাদের দুর্ভাগ্য যেন তোমার নগরীর উপরে না নিয়ে আসে কোন অমঙ্গল"।[৬]

বিস্ময়ে বিমূঢ় পেলাস্‌গসের উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজাসুজি—

"ব্যক্তিগতভাবে আপনারা আমাকে জানাবেন না কোন আবেদন।
যদি কোন সাধারণ কলঙ্ক চিহ্ন লাগে নগরীর গায়ে,
তবে তা নির্মোচন করবে সর্বসাধারণ।
তাই আমি দেবনা আপনাদের কোন প্রতিশ্রুতি
যতক্ষণ না সুপরামর্শ পাই জনতার কাছে।"[৭]

বোঝা যায় তৎকালীন আথেন্‌সবাসী ছিল গণতন্ত্রবাদী, জনসাধারণের মতামত গর্বভরে গ্রহণ করা হয়—কোন স্বৈরাচারী রাজা তাদের ভাগ্য বিধায়ক নন। এই ভাবেই পুরানো কিংবদন্তীর কথা দর্শকদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত হয়ে যায়। নাগরিকরা নারীদের আশ্রয় দিল। এই পরমভাগ্যে স্বতোৎসারিত হল খোরাস সঙ্গীত কিন্তু মুহূর্তে বিষাদ আর আতঙ্ক ছেয়ে ফেলল তাদের। এই আক্রোপোলিস্‌ পাহাড় গাত্র থেকেই দেখা যায় সমুদ্র—খোরাস যেন আরগোস পাহাড় পার্শ্ব থেকেই দেখল সমুদ্র বক্ষে অনুসরণকারীদের জাহাজ। দানাউস্‌ মঞ্চ ত্যাগ করলেন, কুমারীরা বেদী ঘিরে গভীর বেদনায় ও ভয়ে ক্রন্দনপরা হয়ে উঠল।

কিছু পরেই একটি নূতন চরিত্র এল—আইগুপ্তসের দূত। দূত কুমারীদের বেদী থেকে সরিয়ে আনতে চাইল। চারিদিকে চিৎকার, কাড়াকাড়ি মারামারি পড়ে গেল—হঠাৎ পেলাস্‌গস্‌ এসে উপস্থিত হলেন—

তিনি জানালেন যে, আরগোসবাসীদের বিচারে এই কুমারীদের নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করা চলবে না। দূত ফিরে যেতে বাধ্য হল। খোরাস কৃতজ্ঞ অন্তরে আবেগ ভরে আরগোসবাসীদের, তথা আথেনীয়দের প্রশংসা ধ্বনি তুলল। এই ভাবেই আইস্খ্যালসের প্রথম নাটক "দ্যা সাপ্লায়্যান্ট মেইডেন্‌স" শেষ হল।

কিন্তু আথেন্‌সের সেই দর্শকবৃন্দ উঠল না তারা উদ্‌গ্রীব ভাবে কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল। আবার গভীর নিস্তব্ধতা দর্শকদের ঘিরে ফেলল। আবার নীচ থেকে বাঁশির সুর শোনা গেল—নূতন করে সঙ্গীত বেজে উঠছে। আর একবার সেই খোরাসের কুমারীদল মঞ্চে এসে দাঁড়াল। আবার নূতন একটি নাটক সুরু হল।

কালের কবল থেকে "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্" এর (The Suppliants) এই দ্বিতীয় নাটকখানি রক্ষা পায়নি—কিন্তু তার ঘটনা বিন্যাস যে কি ছিল তার একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। এই ২য় খণ্ডে দানাউসের কন্যাদের আইগ্যাপ্তস্-পুত্ররা ধর্ষণ করে যাচ্ছে। পুরো নাটক কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডেও শেষ হচ্ছে না তারপরে আসছে কাহিনীর তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় নাটক। তাতে এই নারীদের শেষ ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। 'কাহিনীর এই অংশে রয়েছে, কেমন করে এই নারীরা তাদের ঘৃণিত স্বামীদের হত্যা করেছিল। কিন্তু একটি ভগ্নী, হ্যাপেরম্নেস্ত্রা (Hypermnestra) তার নবীন স্বামী "ল্যুন্‌কেয়ুসের" (Lynceus) ভালবাসায় বিচলিত হয়ে হত্যা করতে পারল না। এইখানে নাট্য কাহিনীর গতি সমাপ্ত হল।

এই ভাবেই অনাবৃত পর্বতগাত্রে অপেক্ষমান আথেনীয় দর্শকবৃন্দ এই "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্" নাটকখানি দেখল। এক অদ্ভুত আপাত বিরোধী উপায়ে এই তিনটি নাটকই এক একখানা সম্পূর্ণ একক নাটক হল। আবার "ট্রিলজির" (Trilogy) বৃহত্তম অবয়বে একটি অঙ্ক মাত্র হয়ে রইল।

আইস্খ্যালসের এই "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্" বা "শরণার্থী নারী" নাটকের অভিনয় পর্যালোচনা করে আমরা কতকগুলি সত্যে উপনীত হই। এই অভিনয়ে আমরা যে খানিকটা মঞ্চ নির্দেশ পাই এই মঞ্চ পদ্ধতি আইস্খ্যালস্, থেস্‌পিস্ ও তার অনুগামীদের অনুসরণ করেই পেয়েছেন।

এটাকে আমরা পুরোপুরি রঙ্গালয় হয়ত বলব না। দর্শকদের জন্য যে বসবার আয়োজন তা নিতান্তই অসংস্কৃত, রূঢ়, অভিনেতারাও আলাদা কোন

মঞ্চ পাননি, অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের মধ্যেই তারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁদের পশ্চাদ্‌পটেও প্রকৃতিদত্ত দৃশ্যাবলী ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছিল উন্মুক্ত আকাশ এবং পাহাড়ের নিম্নদেশের সুদূর প্রসারী অপূর্বদর্শন দৃশ্যাবলী। নাটক এখনো তার উৎস দিথুরাম্ব সঙ্গীতের একান্ত নিকটবর্তী রয়েছে। "আঙ্গিক" অভিনয় বা নাটকে "অ্যাক্‌শন" অত্যন্ত কম। দানাউসের এই কন্যারাই খোরাস—নাটকীয় ক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই সমবেত প্রধান চরিত্র (collective protagonist) একক প্রধান চরিত্রের তুলনায় এদের শক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবেই কম। দিওন্যুসাসের উৎসব অনুষ্ঠান থেকে নাটক ক্রমশঃ আলাদাভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সত্য কিন্তু তা এখনো নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের।

এই "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্‌" নাটকের কিছুকাল পরেই অবশ্য অর্‌খেস্ত্রার পশ্চাতে "ষ্টেজ বিল্‌ডিং" (Stage Building) অথবা "স্কেনে" (Scene) এসে গিয়েছিল এবং একটা স্থাপত্যময় গঠন ভঙ্গিমা পশ্চাদ্‌পট হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার আগে "দ্যা সাপ্লায়্যান্টসের" অভিনয় কালেই আমরা গ্রীক থিয়েটারের কতকগুলি প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য পাই। এই সময়ে অর্‌খেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগার একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছিল—অর্‌খেস্ত্রা ও



আইস্খ্যলস্‌ সম্ভবতঃ এইরূপ মঞ্চের জন্যই নাটক লিখেছিলেন।

মঞ্চ ভিন্ন হওয়ার সূচনাও ক্রমে দেখা দিল কিন্তু সব সময়েই মধ্য স্থলের বৃহৎ বৃত্তাকার স্থানটি খোরাসদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একথা তখনো আমরা ভুলতে পারিনি—যে খোরাস থেকেই নাটকের মূল উৎপত্তি এবং যতদিন পর্যন্ত গ্রীক নাটকে ধর্মীয় প্রেরণা ছিল ততদিন পর্যন্ত এই

খোরাসের প্রাধান্য কমে গেলেও নাটক থেকে তা একেবারে বিদায় নেয়নি।

"স্তা সাপ্লায়্যান্ট" নাটকে আমরা যে খোরাসদল দেখেছি তারাই ছিল গ্রাক ট্র্যাজেডি নাটকের মূল উৎস। এদের উদ্ভব হয়েছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান "দিথ্যুরাম্ব" সঙ্গীত থেকে। দিথ্যুরাম্ব তার ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থেকে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল—তার মধ্যে জাতীয় বীর, রাজা ও জনসাধারণের কাহিনী এল। কাহিনীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিথ্যুরাম্বের খোরাস সঙ্গীতকারীদের প্রাধান্যও কমতে লাগল—ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল "চরিত্রাভিনেতারা"। "স্তা সাপ্লায়্যান্টস্" নাটকে আমরা খোরাস অনুষ্ঠানকারীদের সংখ্যা পেয়েছি ৫০ জন—এরাই ছিল সেই শরণার্থিনী নারীরা। এই সংখ্যাটিও দিথ্যুরাম্ব খোরাসের সমপরিমাণ ছিল। কিন্তু ট্র্যাজেডি ধাপে ধাপে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোরাসের বিবর্তন হতে লাগল। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে খোরাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ ছিল যে "টেট্রালজির" (tetralogy) চারটি অংশতেই আলাদা ভাবে এত অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠানকারীকে—উন্নতধরণের সঙ্গীত ও জটিল পদ্ধতির নৃত্য ধারায় শিক্ষিত করে তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল। আইস্খ্যুলস্ই সর্বপ্রথম খোরাসের ৫০ জনের দলকে ৪টি নাটকের জন্য চারটি ভাগে ভাগ করেন, প্রতিটি দল তৈরী হয় ১২ জন করে খোরাস নিয়ে—ফলে মোট খোরাস সংখ্যা হয় ৪৮ জন। শেষ পর্যন্ত এক একটি অনুষ্ঠানে এই ১২ জন খোরাসই বহাল থাকে, এর পর "সোফোক্লেস্" এসে এর সংখ্যা বাড়িয়ে করে দেন ১৫ জন। আইস্খ্যুলস্ খোরাসের সংখ্যা ১২ জন যেমন করেছিলেন বাস্তব প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, সোফোক্লেস্ তেমনি ১৫ জন করলেন শিল্প সৌষ্ঠবের কথা বিচার করে। এই খোরাসের প্রতিটি দলের একজন করে নায়ক থাকত আবার সব কটি দল মিলিয়ে একজন থাকত সাধারণ নায়ক। খোরাসের সংখ্যা যখন ১৫ জন হল তখন এক একটি দলে ৫ জন করে নিয়ে তাদের তিনটি সারিতে দাঁড় করানো হত। যিনি সর্বপ্রধান খোরাস নায়ক হতেন তিনি প্রয়োজন মত নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতেন। ফলে তখন খোরাস সংখ্যা দাঁড়াত ১৪ জন তারা ৭ জন ৭ জন করে অর্ধখোরাস দলে দুই ভাগ হয়ে অর্কেস্ট্রার দুই দিকে স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফিতে ঘুরে গান গাইতে পারত।

খোরাসের এই ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে অ্যালারডাইস্ নিকল মহাশয় তাঁর ওয়ার্লড ড্রামা গ্রন্থে বলেছেন যে—

"গ্রীক নাটক পাঠকালে খোরাসের ভূমিকার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ এর নাট্যিক কার্যাবলীতে যে পরিবর্তনগুলো সুরু হয়েছিল তাই প্রারম্ভে আইস্খ্যলস্ থেকে সমাপ্তিতে এউরিপিদেস্ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির সমগ্র গতির সাক্ষ্য বহন করে।"

"গু সাপ্লায়্যাণ্টস্" নাটকে আমরা দেখেছি যে খোরাসই ছিল প্রধান চরিত্র ও প্রধান অভিনেতা। পরবর্তীকালেও বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন নাটকে হয়ত খোরাসের প্রাধান্য অটুট ছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে—গ্রীক রঙ্গমঞ্চের সাধারণ ইতিহাসে নাটকীয় ক্রিয়া সংঘাতে খোরাস প্রাধান্যের ক্রম হ্রাস একটি লক্ষণীয় বিষয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে খোরাসের প্রাধান্য কখনই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আইস্খ্যলস্ থেকে যে ধারার সৃষ্টি হয়েছিল সেই ধারাই ট্র্যাজেডি নাটকে আগাগোড়া বজায় ছিল—কিন্তু বছরের পর বছর একটু একটু করে প্রাধান্য কমেছে। সুরুতে তারাই ছিল প্রধান অভিনেতা এবং শেষে তারা কেবল রীতিনীতির খাতিরে মঞ্চে উপস্থিত থাকত মাত্র। এই খোরাসের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একক অভিনেতাদের প্রাধান্য বেড়ে যেতে থাকে—আর অভিনেতাদের সহায়ক হিসেবেই মঞ্চের বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি বিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে লাগল।

সর্বপ্রথম থেস্পিস্ নাটককে দিথ্যুরাম্ব থেকে আলাদা করে আনেন, খোরাসদলের বিপরীত দিকে তিনি একজন অভিনেতাকে দাঁড় করিয়ে দেন। নাট্যাভিনয়ে একজন একক অভিনেতা এলেন এ কথা আমরা যখন বলি তখন তার মধ্যে দুটি তাৎপর্য থাকে। ১। প্রথমত: অভিনেতা একজন হলেও ভিন্ন ভিন্ন মুখোশ ও পোষাক ব্যবহার করে তিনি একাই একাধিক নাটকীয় চরিত্রের অভিনয় করতে পারতেন। ২। দ্বিতীয়ত: নিকল বলেন যে, একজন অভিনেতা অর্থে একথা বোঝায় না যে গ্রীক নাটকে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপর কোন নীরব অভিনেতাকেও অভিনয়কালে উপস্থিত করা হয়নি। আমরা অন্তত: এটুকু কল্পনা করে নিতে পারি যে যখন রাজা "পেলাস্গস্" (Pelasgus), "মেনেলাউস্" (Menelaus) বা "অ্যাগামেমনোন" (Agamemnon) মঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন তাঁরা

পার্শ্বচরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এলেন, কারণ এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভব। সুতরাং মঞ্চে এই অনুচরেরা অন্য এক শ্রেণীর মূক অভিনেতা ছিলেন। "দ্যা সাপ্লায়্যাণ্টস্" নাটকে দূতের সঙ্গে একদল যোদ্ধাও মঞ্চে নারীদের কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে অভিজাত চরিত্রগুলি প্রয়োজন মত বহু সংখ্যক নীরব অভিনেতাদের নিয়েই মঞ্চে প্রবেশ করতেন।

থেস্‌পিস্ একজন অভিনেতা এনেছিলেন, আইস্খ্যুলস্ দু'জন আনলেন, ফলে দানাউস্ ও পেলাস্‌গসের দৃশ্যে এবং পেলাস্‌গস্ ও হেরাল্‌ডের দৃশ্যে দেখি শুধুমাত্র দুজন অভিনেতার কথোপকথনই নাটকখানি এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আইস্খ্যুলসের পরবর্তী এবং সমসাময়িক নাট্যকার সোফোক্লেস্ তৃতীয় অভিনেতা আনয়ন করেন। গ্রীকরা এই পর্যন্তই যেতে পেরেছিল এর বেশি নয়। এমনকি বৈপ্লবিক এউরিপিদেস্‌ও এর চেয়ে বেশি অভিনেতা সংযোগের সাহস পাননি। তিনি বক্তা অভিনেতার চরিত্র আর বাড়াতে পারেননি বলেই অভিনয়ের ত্রুটি মেটাবার জন্যই মঞ্চে বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ও প্রচুর ব্যবহার করেন।

সোফোক্লেসের "ওরেস্তেস্" (Orestes) বা "ওরেস্‌থেইয়া" নাটকের প্রথম দৃশ্যে নায়ক ওরেস্তেসের বন্ধু প্যুলাদেস্ (Pylades) মঞ্চে আসেন আবার একেবারে শেষের দৃশ্যে নাট্যকারের একই সঙ্গে মঞ্চে বহুচরিত্রকে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে মেনেলাউস্, ওরেস্তেস্ ও দেবতা অ্যাপোল্লো (Apollo) এই তিনটি চরিত্রই কথা বলছেন এ ছাড়াও মঞ্চে তাঁকে রাখতে হয়েছিল "হেরমিওনে" (Hermione) নামে একটি নারী চরিত্র ও "প্যুলাদেস্‌কে"। নারীচরিত্রটিকে মূক করে রাখায় কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্যুলাদেস্‌কে একেবারে মূক করে রাখা যায় না— আবার তিনটি চরিত্রের বেশি একসঙ্গে মঞ্চে কথাও বলতে পারেন না। সেজন্য নাট্যকার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। যখন "মেনেলাউস্" জিজ্ঞেস করলেন—

"তুমিও কি প্যুলাদেস্ এই রক্তক্ষয়ী কর্মের সঙ্গী ছিলে?"

প্যুলাদেসের উত্তর দেওয়া দরকার কিন্তু কথা বলতে পারবেন না বলেই ওরেস্তেস্ তার হয়ে উত্তর দিল—

"ওর ওই নীরবতাই সম্মতি জানাচ্ছে"।

অতএব আমরা দেখি সেই প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদেরও নাটক রচনার সময় আজকের তুলনায় দায়িত্ব কিছু কম ছিল না—বরং বেশিই ছিল কারণ তাঁদেরই প্রধান অভিনেতা ও পরিচালকের কাজ করতে হত। সুতরাং নাটক রচনাকালে তার সার্থক প্রযোজনার জন্য বাস্তব সুবিধা অসুবিধাগুলি এবং মঞ্চের উপায় উপকরণ সম্পর্কে নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণ করে নিতে হত।

যে সমস্ত সামান্য উপকরণ আইস্খ্যালসের প্রথম দিককার নাট্যাভিনয়ে লাগত তার মধ্যে ছিল একটি অভিনয় বেদী (Altar or tomb), এই বেদীটি অনায়াসেই অর্‌খেস্ত্রার প্রান্তবর্তী পথের উপর তৈরী হতে পারত। এই পথটি প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে নেমে এসেছে, এই পথটির সাধারণ উচ্চতা হত দুই মিটার বা ৬½´ ফুট। এরই ফলে আইস্খ্যালসের দ্বিতীয় নাটক "দ্যা পারসিয়ানসের" (The Persians—৪৭২ খ্রীঃ পূঃ) যখন অভিনয় হয় তখন পারস্যরাজ জারক্‌সেজের (Xerxes) পিতা 'দারিউসের' (Darius) প্রেতাত্মার আবির্ভাব অথবা আইস্খ্যালসের তৃতীয় নাটক "প্রোমেথেউস্ বাউণ্ডে", (Prometheus Bound—৪৭০ খ্রীঃ পূঃ সম্ভবতঃ) প্রোমেথেউসের তিরোধান প্রভৃতি ভৌতিক নাটকীয় ক্রিয়াগুলি অতি সহজেই হতে পারত। এই উঁচু পথটির পেছনে অনায়াসে একটি লোক আত্মগোপন করতে পারত। সুতরাং তার আগমন বা নির্গমন দুই-ই খুব আকস্মিকভাবে হত। পরবর্তীকালে যখন অর্‌খেস্ত্রার পেছনে স্কেনের স্থাপত্য এসে গেল বা যখন পুরোপুরি রঙ্গালয়ই তৈরী হল তখনো এই সমস্ত দৃশ্যগুলির আকস্মিকতা এত মনোগ্রাহী হয়নি।

এখানেই আবার আমরা আর একটি অপূর্ব নাটকীয় দৃশ্য কল্পনা করতে পারি। অর্‌খেস্ত্রার পেছনে এই বেদীর উপর পাহাড়ের গায়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মানব প্রেমী প্রোমেথেউস্। দর্শকরা মুখোমুখি তাঁর যন্ত্রণাকাতর পূর্ণ অবয়বখানি দেখতে পাচ্ছে। আর তারি সম্মুখের অর্‌খেস্ত্রা ভূমিতে দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে খোরাসদল সমুদ্রকন্যা "ওসেনিদরা" (Oceanids) পাহাড়ের গায়ে বদ্ধ সেই বিরাট কালো মূর্তির সঙ্গে শ্বেতপোষাকাবৃত এই হালকা, সমুদ্র ঢেউএর মত সিক্ত, উজ্জ্বল মেয়েরা এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। ককেশাস্ পর্বতের পার্থিব নিরানন্দের মধ্যে জলধারার আনন্দোজ্জ্বল শক্তি প্রোমেথেউসের

কানে মানবজাতির আশার বাণী শুনিয়েছে। "দ্যা সাপ্লায়্যান্টসের" প্রধান চরিত্রগুলিও এই অস্থায়ী উচ্চ ভূমির উপর দাঁড়িয়েই অভিনয় করেছিল বলে মনে হয়।

আইস্খ্যলসের প্রথম তিনটি নাটক ১। "দ্যা সাপ্লায়্যান্ট মেইডেন্স" ২। "দ্যা পারসিয়ানস্" এবং ৩। "প্রোমেথেউস্ বাউণ্ড", এদের আমরা তাঁর প্রথম যুগের নাটক বলতে পারি। এই নাটক কখানা যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তবে আমরা দেখতে পাব যে এগুলির মধ্যে কথোপকথনের চাইতে খোরাসের প্রাধান্যই বেশি। কাহিনীর মধ্যে চরিত্র দ্বন্দ্বের চাইতে বর্ণনার ভাগই বিস্তৃত। "দ্যা পারসিয়ানস্" নাটকখানি তো একেবারেই দ্বন্দ্ব সংঘাত বর্জিত "স্থির" (Static) নাটক। যদিও বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য এবং অভিনবত্ব সে ত্রুটিকে অপনোদন করেছে। এই তিন খানা নাটকের মধ্যেই স্থান হিসেবে কোন না কোন মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশই উল্লিখিত আছে। থেস্পিস্ প্রবর্তিত বেদী এবং অর্কেস্ট্রা, এই মঞ্চ উপকরণটুকুই আইস্খ্যলসের তখন জ্ঞাত ছিল—সুতরাং এই স্বল্প উপকরণেই সার্থক ভাবে রূপায়ণ করা যায় এমন নাটকই তিনি—প্রথম যুগে রচনা করেছেন। কিন্তু এর পরেই মঞ্চের উপকরণ বেড়ে গেল বেদীর পেছনে এসে "স্কেনে" দাঁড়াল। এবং এই বাড়তি উপকরণটুকুর চমৎকার সদ্ব্যবহার দেখতে পাই আইস্খ্যলসের পরবর্তী যুগের নাটকে এবং তাঁর পরেকার নাট্যকারদের রচনায়। বস্তুতঃ আইস্খ্যলসের নাটকই আমাদের কাছে প্রমাণ স্বরূপ হয়ে আছে, যে ঠিক কোন সময়ে স্কেনে স্থাপত্য অর্কেস্ট্রার সঙ্গে যুক্ত হয়।

আইস্খ্যলসের সময়ে অভিনেতারা যে পোষাক ব্যবহার করেছে—পরবর্তী সমগ্র গ্রীক ট্র্যাজেডিতে আমরা সেই একই রকম পোষাক দেখি। এ পোষাকের পরিকল্পনা স্বয়ং আইস্খ্যলসেরই। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেই এই পোষাক হয়। লম্বা হাতাওয়ালা ঝোলানো এই পোষাক সমকালীন আথেনীয়দের চাইতে—অনেক বেশি কারুকার্যময় এম্ব্রয়ডারী করা হত। যখন প্রয়োজন বোধ করত তখন তারা "বার্বেরীয়দের" মত অলংকারও ব্যবহার করত। যেমন "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্" নাটকে আরগোসরাজ পেলাস্গস্ অনায়াসেই বুঝতে পারলেন যে খোরাসের ৫০ জন নারী অন্য কোন সুদূর ভূমি থেকে এসেছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে

তাদের হাওয়ায় দোলায়িত বসন প্রান্তে কোথাও মিশরীয় পরিচ্ছদ ধারার কোন ইঙ্গিত ছিল। এ ছাড়া প্রধান চরিত্রের অবয়বের মাঝে আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য আরো অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হত, উঁচু হিলের 'কথুরনাস্' জুতো এবং "আঙ্কোস্" (Ankos) ব্যবহার করে। আঙ্কোস্ ছিল একটি প্রাচীন পদ্ধতির কেশচর্চা, এতে লম্বা চুলগুলো মাথার উপরদিকে চুড়োর মত করে বাঁধা হত, ট্র্যাজেডির বিরাট মুখোশের সঙ্গে এই কেশচর্চা যুক্ত হয়ে আড়ম্বর ও অভিনেতার দৈর্ঘ্য দুই-ই বাড়িয়ে দিত। ফলে একজন রাজচরিত্রের নায়ক তাঁর অনুচরদের অপেক্ষা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতেন—এবং সমবেত খোরাসের সঙ্গে একটা চমৎকার বৈপরীত্যও এসে যেত।

"দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্" নাটকটি প্রকৃত পক্ষে একটি "ট্রিলজি" (Trilogy) বা ত্রয়ী নাটকের একটা অংশ মাত্র। আমরা একথা জানি যে অন্ততঃ আইস্খ্যালসের সময় থেকেই গ্রীক নাট্যপ্রতিযোগিতায় যে সব নাট্যকার যোগ দিতেন তাঁরা মাত্র একখানা নয় চারখানা করে নাটক লিখে আনতেন। এই নাট্য চতুষ্টয়কে বলা হত টেট্রালজি (Tetralogy)। একটি "টেট্র্যালজিতে" তিনটি ট্র্যাজেডি মিলিয়ে থাকত একখানি "ট্রিলজি" আর থাকত একটি সাত্যুর (Satyr) বা কৌতুক নাট্য।

তত্ত্বের দিক থেকে নাট্যারম্ভে খোরাসের প্রথম প্রবেশ কাল থেকে সুরু করে যে সময়ের মধ্যে নাটক শেষ করতে হবে তা বাধ্যতামূলক ছিল। ত্রয়ী নাটকের এক একখানি একক নাটক এই সময়ের এক একটি অংশ পেত, তারি মধ্যে তাকে নাটকীয় ক্রিয়ার সাহায্যে একটি গল্প বলে যেতে হত। সময়ের এই প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা দু'টি উপায়ে দূর করার চেষ্টা করা হত, "ট্রিলজির" একটি নাটক থেকে অন্য নাটকের মধ্যে বর্তমান কালে একই নাটকের এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কের মাঝে যেমন সময়ের ব্যবধান থাকে তেমনি থাকত। "দ্যা সাপ্লায়্যান্টসের" প্রথম নাটক ও দ্বিতীয় নাটকের মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধান কেটে গেছে এবং তা মিশরে। সময়ের এই ব্যবধানকে তারা কিন্তু অনায়াসে মুছে ফেলতে পারতেন কারণ এই সমস্ত নাটকগুলি বাস্তবানুগ মঞ্চে বাস্তবপন্থায় অভিনীত হত না। এই নাটকগুলি ছিল বর্ণনামূলক 'নাট্যকাব্য'—সুতরাং কল্পনার আধিপত্যে বাস্তবকে দর্শকরা অনায়াসে ভুলে যেত। খোরাস মাত্র কয়েকটি কাব্য স্তবক গান করে

দর্শকদের জানিয়ে দেয় যে রাজা পেলাস্গস্ তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেছেন এবং জনসভা ডেকেছেন, সমস্যার কথা বিস্তারিত বলেছেন, তাদের মতামত জেনেছেন এবং সমুদ্র তীরে আবার ফিরে আসছেন। এতে বোঝা যায় গ্রাক ট্র্যাজেডিতে প্রকৃত সময়ের ব্যবধান রক্ষিত হত না—ছিল একই স্থানে বিভিন্ন সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্রায়িত করার একটি আদর্শ রূপ।

টেট্র্যালজির চতুর্থ অংশ ছিল একটি সাত্যুর নাটক।[৮] সাত্যুর নাটকের গঠন অদ্ভুত ধরণের—গ্রীক রঙ্গমঞ্চের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। এই সাত্যুর সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি—এই শ্রেণীর নাটকের একটি মাত্রই সম্পূর্ণ-রূপ আমরা পেয়েছি। সেটি হল "এউরিপিদেসের" (Euripides) "দ্য ক্যাক্লোপস্" (The Cyclops) সম্ভবতঃ এই নাটকটির প্রথম অভিনয় খ্রী: পূ: ৪১০ অব্দে হয়েছিল। এ ছাড়া "ইখ্নেউতা বা ত্রাকেরস্" (Ichneuta or Trackers প্রায় ৪৬০ খ্রী: পূ:) নামে সোফোক্লেস্ রচিত একখানা অসম্পূর্ণ সাত্যুরও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই দুইখানি নাটক এবং অলংকৃত পাত্রের উপর অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র থেকে মনে হয় যে এই সব নাটকে সাত্যুরের দলই খোরাস সাজত। তারা চামড়ার টুকরো দিয়ে পোষাক তৈরী করত, পেছনে একটা লম্বা লেজ লাগাত। তাদের মাঝখানে নেতা হয়ে দাঁড়াতেন স্বয়ং বৃদ্ধ "সিলেনস্" (Silenus)।[৯] তিনি ছিলেন যৌবনের উদ্দীপনাময় এক বৃদ্ধ সাত্যুর—বাক্খাসের সঙ্গী। বিরল কেশ, চ্যাপ্টা নাক, মাথায় দুটি ছোট্ট শিং—গাধার পিঠে ঘুরে বেড়াতেন।

সাত্যুরের কাহিনী বেশির ভাগই হত কোন দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হৈ হুল্লোড়, আনন্দ উৎসব থাকত, এবং শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হত। "দ্যা ক্যাক্লোপস্" নাটকটিতে রয়েছে হোমরের মহাকাব্যে বর্ণিত "ওদ্যুস্সেউস্" বা "ইউল্যুস্সেস্" (Odysseus or Ulysses) কি করে সেই এক চক্ষু দানব ক্যাক্লোপস্দের হত্যা করেছিলেন তারি কাহিনী। সোফোক্লেসের "ত্রাকেরস্" নাটকটিকে বলা যায়—পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন "রহস্যনাটক" (Detective Drama)। এর মধ্যে খোরাস "অ্যাপোল্লোর" চুরি যাওয়া পশুসম্ভার খুঁজতে বেরিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা "হের্মেস্" (Hermes) কেই অপরাধী বলে আবিষ্কার করল। দিওন্যুসাস্ স্বয়ং ছিলেন এই খোরাস দলের সাত্যুরদের অধিদেবতা।

সুতরাং দিওন্যুসাস্‌ উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রাচীন অবলুপ্ত ঐতিহ্য মিশ্রিত হয়েছিল। তাই ট্র্যাজেডির কবিরাও তাঁদের নাট্য রচনার অংশ হিসেবে এই সাত্যুর লিখে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছেন।

আইস্খ্যুলস্‌ সবশুদ্ধ ৯০খানি নাটক লেখেন তার মধ্যে মাত্র ৭খানি কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র "দি ওরেসথেইয়া বা ওরেস্তেস্‌" (The Oresteia সম্ভবত: ৪৫৮ খ্রী: পূ:) নাটকখানিই ছিল একখানা সম্পূর্ণ "ত্রি-পর্ব" বা ট্রিলজি নাটক। এই ওরেসথেইয়া নাটক ত্রয়ীর মূল কাহিনী রাজা আত্রেউসের (Atreus) অভিশপ্ত বংশকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, এর ভিন্ন ভিন্ন তিনখানা নাটকের নাম ছিল, ১। অ্যাগামেমনোন (Agamemnon) ২। খোয়েফোরই (The Choephori) ও ৩। এউমেনিদেস্‌ (The Eumenides) এ ছাড়া অন্য একটি ট্র্যাজেডির বিচ্ছিন্ন অংশ আমরা পেয়েছি তা হল—"দ্যা সেভেন্‌ এগেইন্‌ষ্ট থেবেস্‌" (The Seven against Thebes—সম্ভবত: ৪৬৭ খ্রী: পূ:)।

গ্রীক ট্র্যাজেডির বিশেষত্ব এই ছিল যে—এর সমস্ত কাহিনীই দর্শকরা পূর্বাহ্ণে সকলে জানত—তাই চরিত্রের উল্লেখ মাত্রই ঘটনা পরম্পরায় কাহিনীটি তাদের মনে উদিত হত। ওরেসথেইয়া নাট্য ত্রয়ীর প্রথম নাটক 'অ্যাগামেমনোন' খানা সুরু হওয়ার আগেও পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের কিছু ইতিহাস আছে।

রাজা "পেলোপসের" (Pelops) ছিল দুই পুত্র "আত্রেউস্‌" (Atreus) ও "থ্যুয়েস্তেস্‌" (Thyestes)। আত্রেউস্‌ ভাইয়ের কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক ভোজসভায় থ্যুয়েস্তেস্‌কে তারি সন্তানের মাংস রান্না করে খেতে দেন—এবং এই পাপের জন্যই রাজা আত্রেউস্‌ এবং তার বংশের উপর দেবতার অভিশাপ নেমে আসে। আত্রেউসের পুত্র রাজা অ্যাগামেমনোন, ট্রয় যুদ্ধে যাত্রাকালে নৌবহর ভাসাবার জন্য দেবতার উদ্দেশে নিজ কন্যা "ইফিগেনিয়াকে" বলি দেন ফলে রাণী ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা" (Clytemnestra) স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। রাজা অ্যাগামেমনোনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে রাণী ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা থ্যুয়েস্তেসের পুত্র "আইগিস্থাস্‌কে" (Ægisthus) আপন প্রণয়ীর আসনে বসান—এবং তার সঙ্গে রাজা অ্যাগামেমনোন ফিরে এলে হত্যার ষড়যন্ত্র

করেন। ট্রয় যুদ্ধের দশ বছর পরে ক্লাতাইম্‌নেস্ত্রা ও আইগিস্থাস্‌ রাজা অ্যাগামেমনোনের প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজ প্রাসাদে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন নাট্য ত্রয়ীর প্রথম নাটকখানার এখানেই সুরু।

আমরা "ওরেসথেইয়া" নাটকখানি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই তার প্রয়োগশিল্প "দ্যা সাপ্লায়্যান্টস্‌" এবং "প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড" নাটকগুলি থেকে অনেকখানিই দূরে সরে এসেছে। আমরা জানি যে "দ্যা সাপ্লায়্যান্টসের" মঞ্চ নির্দিষ্ট স্থান বা "সেট" ছিল মনোরম সমুদ্রতীর আর "প্রোমেথেউস্‌ বাউণ্ড" ছিল ককেশাস্‌ পাহাড়ের পরিত্যক্ত নির্জন ভূমি। এ দুটি প্রাকৃতিক পরিবেশই উন্মুক্ত "আক্রোপোলিসের" পাহাড় ও অর্‌খেস্ত্রা ভূমি নিয়ে রচিত হতে পারত। কিন্তু ওরেসথেইয়া নাট্যত্রয়ীর প্রথম নাটক অ্যাগামেমনোনের সুরুতেই স্থান নির্দেশ দেওয়া রয়েছে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। নাট্যকার স্বয়ং এক্ষেত্রে নাট্যারম্ভে লিখেছেন,—

আরগোস্‌ নগরীতে অ্যাগামেমনোনের প্রাসাদ সম্মুখে দৃশ্যারম্ভ হল। এই প্রাসাদটিই, মঞ্চবেদী ও তার পশ্চাৎবর্তী স্কেনে-গৃহ নিয়ে তৈরী হয়েছে। মঞ্চের সম্মুখ ভাগে রয়েছে অর্‌খেস্ত্রা বৃত্ত আর তার মধ্যস্থলে দেববেদী। সময়: রাত্রিকাল—কেবল রাত্রিকাল নয়, শেষরাত্রি। অস্ফুট উষার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। একজন প্রাসাদরক্ষী ছাদের উপর প্রহরারত। এই রক্ষীর বক্তব্য থেকেই নাটকের বীজ স্থাপনা হল।[১০]

প্রহরী: "হে ঈশ্বর, কবে কখন ক্ষান্ত হবে এই ক্লান্তিকর কাজ, একটি বছর ধরে আমি প্রহরী—অ্যাগামেমনোনের প্রাসাদশীর্ষে। সারমেয়র মত বসে আছি বাহুতে মস্তক রেখে। আকাশের তারারাই কেবল আমার সঙ্গী। আমি জানি, তাদের পরিচয়; কখন তারা ওঠে, কখনই বা অস্ত যায়। এই তারাদলই নিয়ে আসে শীতের শিহরণ ও গ্রীষ্মের আতপ্ততা, কারণ আকাশের ঐ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলির এই ক্ষমতা আছে।

আমি প্রতীক্ষা করে রয়েছি একটি আলোক সঙ্কেতের জন্য। ট্রয় নগরী থেকে বার্তা আসবে আলোর ঝলকের সঙ্কেতে—নগরীর হয়েছে পতন। এ একটি নারীর আশা। এখানে সেই নারীই প্রভু। কিন্তু তার হৃদয় পুরুষের চেয়েও সুকঠোর।

রাত্রির বিশ্রাম আমার জন্য নয়। আমি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণ করে বেড়াই। আমার শয্যা শিশির সিক্ত। স্বপ্ন আমাকে

ছেড়ে গেছে—নিদ্রা আর নেই। কেবল ভীতিই রয়েছে বর্তমান। আমি কখন চোখ বন্ধ করি না। ঘুম পেলে গান করে আর শিষ দিয়ে ঘুম তাড়ান যায়। কিন্তু কোন শব্দ করতে গেলেই আমার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে—নীচে প্রাসাদে যে সব অশুভ ঘটনা ঘটে চলেছে তারি জন্য। এই প্রাসাদে একদিন সবকিছু ঠিক ছিল—কিন্তু এখন নেই।

অহো! আমার হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে একবিন্দু সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় যা আমাকে এনে দেবে মুক্তি। সেই আলোক সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় রয়েছি, যা অন্ধকারের বুক চিরে নিয়ে আসবে শুভ সন্দেশ।"

ক্ষণেক বিরতি। সে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে প্রহরারত। অন্ধকারের বুকে একটি আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। আলোর বিন্দু উজ্জ্বলতর হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নি শিখায় পরিণত হল।[১১]

বিজয়বার্তা নিয়ে আলো এলো—ক্রমশঃ রাজপুরীর মধ্যে আলোক এবং কোলাহল জেগে উঠল। প্রাসাদরক্ষী আর কিছুক্ষণ স্বগতোক্তির পরে বিদায় নিল। এবং তখন "প্যারোদোসের" পথ বেয়ে খোরাস ও ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তে প্রবেশ করলেন। নাটকের নির্দেশ এখানে রয়েছে—

পরিচরবৃন্দ প্রাসাদ থেকে মশাল হাতে এসে প্রবেশ করল এবং বেদীর উপর আগুন জেলে দিল ও সুগন্ধি ধূপ ছড়িয়ে দিল। ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা সহচরীবৃন্দের সঙ্গে প্রবেশ করলেন ও নতজানু হয়ে বেদীর সামনে বসলেন। এক ধার দিয়ে তালে তালে পা ফেলে প্রবেশ করল একদল বৃদ্ধ। ধীর গতিতে বেদী পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে তারা খোরাস উচ্চারণ করে চলল। এই গান চলতে থাকার সময়ে প্রভাত হয়ে আসে।[১২]

এরপরে খোরাসের সুদীর্ঘ "ওড"। খোরাস স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফির জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মঞ্চের দুদিকে সরে গেল—আবার তারা একত্রিত হয়ে দেববেদীর চারিদিকে এসে বৃত্তাকারে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের আচরণে মনে হল না যে তারা রাণী ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রার বেদীমূলে উপস্থিতি জানতে পেরেছে। খোরাস তাদের সুদীর্ঘ "ওড" চালিয়ে যেতে লাগল। ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা তখনও তাদের লক্ষ্য করলেন না, নিঃশব্দে প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করলেন। খোরাসের প্রবেশ ও স্থান গ্রহণের সময় গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যে কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হতে থাকে তা এখন সমাপ্ত হল

ও প্রকৃত খোরাস গীত আরম্ভ হল। সেনাবাহিনীর দুই অধিনায়ক অ্যাগামেমনোন ও মেনেলাউস্ ট্রয় যাত্রার প্রাকালে যে অশুভ চিহ্ন দেখেছিলেন—দুটি ঈগল পাখী একটি শশককে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে—সে সম্পর্কে গান ধরল খোরাস।[১৩]

এই মঞ্চ নির্দেশ থেকে বোঝা যায় "স্কেনে বিল্ডিং" (Scene building) অথবা "স্কেনে" (Skene or Scene) অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহ অর্কেস্ট্রার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ নাট্য বিষয়ের প্রয়োজনে মঞ্চের বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ওরেস্থেইয়ার এই স্কেনে পরবর্তী রঙ্গালয়ের স্কেনে অপেক্ষা অনেক সরল গঠনভঙ্গির ছিল। এই স্কেনের পশ্চাদ্‌পটে ছিল একটি দেয়াল এবং তার সম্মুখে ছিল ঈষৎ উচ্চ একটি বেদী, এই বেদীটি থেস্পিসের আমল থেকেই চলে আসছে। এই দেয়াল ও মঞ্চ বড় বড় থাম দিয়ে অলংকৃত ছিল এবং পেছনের দেয়ালের মাঝখানে প্রবেশপথের জন্য ছিল বিরাট এক দরজা এবং দু'পাশে ছিল ছোট ছোট দুটি পার্শ্বদরজা। মঞ্চের এই বিবর্তনের ফলে এরপর থেকে নাট্যকারেরা তাদের নাটকের পরিবেশ ও স্থান বোঝাতে কোন রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমিই বেছে নিতেন। স্কেনেগৃহের গায়ে দরজাগুলির মধ্য দিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগেরও কিছু ইঙ্গিত দেওয়া চলত। এই সঙ্গে অনিপুণ হলেও কিছু কিছু অঙ্কিত দৃশ্যাবলী মঞ্চে আসতে লাগল। আইস্খ্যলসের পরবর্তী নাট্যকাররা সহজ পথ হিসেবেই পেছনের দেয়াল, দরজা ও স্তম্ভশ্রেণী মেনে নিয়েছিলেন, এবং তাদের নাট্যপরিকল্পনায় সেগুলিকে যথাসাধ্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন।

আইস্খ্যলসের এই বড় বিস্তৃত নাটক ওরেস্থেইয়ার জন্যই প্রথম মন্দির ও প্রাসাদের বৃহৎ স্থাপত্য দেখানোর প্রয়োজন হয়েছিল। অ্যাগামেমনোনের পুত্র ছিলেন ওরেস্থেইয়া বা ওরেস্তেস্, প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিকাল যুগের তিনি ছিলেন অন্যতম "হ্যামলেট"। ওরেস্থেইয়া তার মাতা ক্ল্যতাইম্নেস্ত্রাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। দ্বিতীয় নাটক 'খোয়েফোরই' বা 'তর্পণকারীদল' নাটকটিতে এই মাতৃহত্যার ফলে ওরেস্তেসের উপরে দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হয়। তৃতীয় নাটক "দি এউমেনিদেসে" দেবতার অভিশাপ ভয়ংকর দর্শন ফিউরিদের (Furies) আকার ধরে ওরেস্তেসকে দেশে দেশান্তরে বিতাড়িত করে নিয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত ওরেস্তেস্ শান্তির আশায়,

আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসেন "দেলফিতে" (Delphi) দেবতা "অ্যাপোল্লোর" (Apollo) মন্দিরে। অ্যাপোল্লো তাকে "পলাস্ আথেনীর" কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন,...পলাস্ই হচ্ছেন যুক্তির দেবী। ওরেস্তেস্ ও তার অনুসরণ-কারিণী ফিউরিরা এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে আবার আর এক দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন, যেন তারা বহু পথ অতিক্রম করে পলাস্ আথেনীর মন্দিরে এলেন। পলাসের সম্মুখে দু'পক্ষ বিচারের জন্য তাদের মামলা নিয়ে উপস্থিত "ফিউরিরা" প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় তখন গ্রীক ট্র্যাজেডির যা মূল সত্য তারি উল্লেখ করে নিজেদের দাবী জানালেন।—আমরা তাকে পরিশ্রান্ত করে ধ্বংস করতে চাই;—কারণ রক্ত দিয়েই হয় রক্তের তর্পণ, পুরাতন পাপের বদলে নিতে হয় নূতন যাতনা।[১৪]

সর্বোচ্চ বিচারালয়ে দ্বাদশজন বিচারক দু'পক্ষে সমান সমান ভোট দিলেন, শেষ পর্যন্ত দেবী আথেনী তাঁর "মীমাংসক" ভোটটি ওরেস্তেসের পক্ষে দিয়ে তাকে জিতিয়ে দিলেন, ফিউরিরা ক্ষেপে গেলেন, আথেনী তখন তাদের নূতন ভূমিকায় নূতন সম্মানের আসন নিতে বললেন; বললেন,—তোমরা এখন থেকে প্রতিশোধ-গ্রহণকারিণী আর না থেকে "ক্ষমার দেবী" (Spirits of mercy) বা 'এউমেনিদেস্' (Eumenides) হও। ফিউরিরা তাতে রাজি হলেন এবং এউমেনিদেসের শান্ত, সুন্দর রূপ ধারণ করে মঞ্চ ত্যাগ করলেন। এই তৃতীয় নাটকখানির স্থান তাই আমরা আগাগোড়াই দেখতে পাচ্ছি মন্দির প্রাঙ্গণ।

এই যে অভিনয়-বেদীর সঙ্গে প্রাসাদ ও মন্দির স্থাপত্য গড়ে উঠতে লাগল, বহুদিন যাবৎই পণ্ডিতদের মধ্যে একটা মস্তবড় তর্কের বিষয় হয়েছিল যে এই প্রাথমিক পর্যায়ের স্কেনে, অর্খেস্ত্রা বৃত্তের ভিতর দিকে ছিল না বৃহৎ অর্খেস্ত্রার কিনারায় অর্থাৎ দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত ছিল। এ দু'ধরনের মতেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখান যায়। অর্খেস্ত্রার মাঝখানে যদি মঞ্চ থাকে তবে নৃত্যভূমি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং অর্ধবৃত্তাকারে বসে থাকা দর্শকদেরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার দক্ষিণ প্রান্তের খাড়া পাথরের গা ঘেঁসে যদি সেটের জন্য মন্দির বা প্রাসাদ নির্মিত হয়, তবে তারা লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটা ফাঁসি মঞ্চের আকার সৃষ্টি করে—পশ্চাৎ দেয়াল ও মঞ্চের মাঝেও তাই একটা স্থাপত্য গঠনের দরকার। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি ধরে নেওয়া যায় যে পুরাতন অর্খেস্ত্রা সাধারণ ধারণার

চেয়েও আকারে কিছু ছোট ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে বক্তা ল্যকুর্গাসের সময়ে আক্রোপোলিসের অর্‌খেস্ত্রা বৃত্ত উত্তরদিক থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে আনা হয়—এবং এই সময়েই অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের ব্যাস কমিয়ে ৬৫′ ফুট করা হয়। এই ৬৫′ ফুট ব্যাসের বৃত্তটি ৫০ জন বা তদনুরূপ সংখ্যক দিথুারাম্ব গায়কের পক্ষেও যথেষ্ট বড়ই ছিল। তেমনি ট্র্যাজেডির ১৫ জন খোরাস বা কমেডির ২৪ জন অভিনেতা ও খোরাসের সজীব চলাফেরার পক্ষেও এই অর্‌খেস্ত্রা যথেষ্ট বড়ই ছিল। উপরন্তু পুরানো অর্‌খেস্ত্রার দক্ষিণের খালি পথের উপরও খানিকটা বাড়তি স্থান পাওয়া যেত। সেখানে যে কোন অস্থায়ী প্রাসাদের সেট উৎসব সুরু হওয়ার আগেই তৈরী করে নেওয়া যেত।

খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে বা "ফিকুটায়ের" মতে খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে একটি "স্কেনোথেকে" বা "স্কেনে" (Skenotheke) অর্থাৎ জিনিস পত্রের গুদামঘর অর্‌খেস্ত্রার পেছন দিকে তৈরী হয়। এটাই পরবর্তীকালে অর্‌খেস্ত্রার দক্ষিণদিকে থামওয়ালা প্রবেশপথ হিসেবে খাড়া হয়েছিল। এই স্কেনে পাথরের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকত সেই জন্য স্থপতিদের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের পাহাড়ের গা কেটে এটি তৈরী করতে হত। পশ্চিমে এটা পুরাতন মন্দিরের দিকে প্রসারিত থাকত। এই স্কেনেরই উত্তরদিকের দেয়ালটা অর্‌খেস্ত্রার দক্ষিণদিকে পড়ত—এটাই নাটকের পশ্চাদ্‌পটের কাজ করত। এই দেয়ালের সামনে, অর্‌খেস্ত্রার ঠিক পেছনেই থাকত থেস্‌পিস্‌ প্রবর্তিত বেদী। এই পশ্চাৎ দেয়ালের মাঝখানটাতে থাকত থামওয়ালা একটি মাত্র বিরাট দরজা। স্কেনের ভিতর দিকের হল ঘরটা অভিনয়ের নানান রকম জিনিসপত্রে বোঝাই থাকত যেমন কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের জন্য বীম, সম্মানিত অতিথিদের চেয়ার, সাজপোষাক—এবং পরবর্তীকালে আঁকা দৃশ্যপটও এখানে গুদামজাত হত। মধ্যবর্তী দরজার সম্মুখের যে বিশাল ভিত্তিভূমি—ওখানেই দেব মন্দিরের পীঠস্থান বা রাজপ্রাসাদ সম্মুখের আবৃত প্রাঙ্গণ তৈরী হত, প্রয়োজন হলে এখানে ধাপে ধাপে সিঁড়িও তৈরী করে দেখানো যেত। দ্বিতীয় প্রবেশ পথটাই সম্ভবতঃ ছিল প্রধান প্রবেশ পথ—এটা পবিত্র মন্দির এলাকা থেকে স্কেনের কিনারা ঘেঁসে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে অর্‌খেস্ত্রা অভিমুখে উঠে আসত। মন্দিরের দিক থেকে অর্‌খেস্ত্রা অভিমুখে এই "প্যারোদোই-স্লোপ" (Parodoi-slope)

ধাপে ধাপে উঠে যেত বলেই ক্লাসিক্যাল যুগে একটি প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছিল, তারা অভিনেতার প্রবেশকে বলতেন উর্ধ্বগমন ("to ascend" or "to step up") এবং তার প্রস্থানকে বলতেন নিম্নগমন ("to descend" or "to go down")।

নাট্যাভিনয় যখন হত তখন ট্রিলজি নাটকের এক একটি নাটকের মধ্যে যে সময় পাওয়া যেত অথবা দু'টি উৎসব দিবসের মধ্যবর্তী রাত্রিতে প্রয়োজন মত দৃশ্যপট সামান্য চেষ্টাতেই তারা পরিবর্তিত করে নিতে পারতেন। এবং এই পরিবর্তনের সময় নিঃসন্দেহেই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করত অঙ্কিত দৃশ্যপট। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখি আইস্খ্যলসের প্রায় সমসাময়িক পরবর্তী নাট্যকার সোফোক্লেস্ই সর্বপ্রথম স্কেনোগ্রাফিয়া Skenographia) শিল্প বা দৃশ্যাঙ্কনের প্রচলন করেন এবং এরি উপরে নির্ভর করে দার্শনিক "দেমোক্রিতোস্" (Demokritos) ও "অ্যানাক্সাগোরাস্" (Anaxagoras) রেখাঙ্কিত পরিপ্রেক্ষিতের (linear perspective) নীতি নির্ধারণ করেন।

কোন দেশের নাট্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ অভিনয়কালীন বিশেষ যুগের প্রচলিত স্থাপত্য রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বহির্ভূত কোন রূপ ধারণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আমরা খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর গ্রীক নাট্যশিল্প ও নাটকের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সে যুগের স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ও অলংকরণ শিল্পের বিরাট প্রগতির কথাও ভেবে দেখব। বস্তুতঃ এই শতাব্দীটি ছিল ভাঙ্গাগড়ার কাল ৫ম শতকের শেষে বা ৪র্থ শতকেই গ্রীসের রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ তথা শিল্প সাহিত্য একটি সুসম্পূর্ণ ও পরিণত রূপ ধারণ করে; এই পরিণত অবয়বে কেউই কারো সম্পূর্ণ প্রভাব বর্জিত ছিল না।

॥ সোফোক্লেস্ ॥

আইস্খ্যলসের পরে যখন সোফোক্লেস্ এলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরচনা ও তার প্রয়োগ শিল্পের আঙ্গিকে এক মস্ত বড় পরিবর্তন দেখা দিল। সোফোক্লেস্ আইস্খ্যলস্ প্রবর্তিত দু'জন বক্তা অভিনেতার স্থানে তাদের সংখ্যা তিনজন করলেন—ফলে খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্য আরও অনেক কমে গেল। প্রাধান্য কমলেও তখনো কাহিনীর মূল অংশ খোরাসই গানে গাইত—আর তারি মাঝে মাঝে খুব দ্রুত বেগে অভিনেতাদের কথোপকথন চলত। সোফোক্লেসের নাটকে যখন দু'জন অভিনেতা কথা কইছেন, তখন উপস্থিত

তৃতীয় অভিনেতার উপরে তার ভাবের প্রতিক্রিয়া নাটকীয় ঔৎসুক্য অনেকখানি বাড়িয়ে তুলত। ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অভিনয়ের সুযোগ অনেকখানি বেড়ে গেল—মূল কাহিনীর সঙ্গে বহুপ্রকার ছোট-খাট ঘটনা সংযোগও হতে লাগল। এক কথায় অভিনেতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নাট্যকারদের আরো বিশদভাবে নাটকীয় প্রয়োগ কৌশলের কথা ভাবতে হচ্ছিল।

নাটকে খোরাসই যখন মূল অবলম্বন ছিল তখন নাটকের প্রধান অভিনয় ক্ষেত্রই ছিল "অর্‌খেস্ত্রা ভূমি"। প্রথম দিকে অভিনেতারাও কোন বাধা নিষেধ না মেনে ইচ্ছে মত খোরাসদের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারতেন। কিন্তু যতই অভিনেতার সংখ্যা বাড়তে লাগল—একদিকে যেমন খোরাস হারাতে লাগল তাদের প্রাধান্য অন্যদিকে অভিনেতারা প্রবল হয়ে উঠতে লাগলেন। একক অভিনয়ে "অ্যাক্‌শন" বা নাটকীয় ক্রিয়া প্রধান ছিল। ক্রমান্বয়ে এই "অ্যাক্‌শন" স্কেনে আশ্রয় করেই ঘটতে লাগল। এই সময়ে "স্কেনে" শব্দের অর্থও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হল। স্কেনে অর্থ হল দৃশ্যপট সজ্জিত প্রাসাদোপম গৃহ। বর্তমান সেটেরই প্রতিশব্দ ধরা যায়। এই স্কেনেই এখন হল অভিনেতাদের প্রধান অবস্থান ক্ষেত্র।

"স্কেনে" নামের প্রাচীন অর্থ ছিল অস্থায়ী গৃহ অথবা তাঁবু বা লম্বা কাঠের ঘর। এই যে অস্থায়ী ঘর—এই অর্থটি ইঙ্গিত করে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা কোন একটি প্রচলিত রীতির দিকে। এই রীতিটি হল, প্রতি বছরই উৎসবকালে অভিনয় ক্ষেত্রের পেছন দিকে একটি পশ্চাদ্‌পটের অস্থায়ী দেয়াল তুলতে হত। "ফিক্‌টারের" মতে মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তী এই দেয়ালটি প্রকৃতপক্ষে ছিল "স্কেনোথেকে" বা স্কেনের বহির্ভাগের দেয়াল। গ্রীসে প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্নাবশেষে—অর্‌খেস্ত্রা ও অভিনয় ক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে কাঠের বীমের ভগ্ন প্রান্তভাগের চিহ্ন দেখা যায়। ফিক্‌টার বলেন এটাই ছিল পশ্চাদ্‌পটের স্কেনে গৃহের কাঠামো। তিনি যেভাবে পুনর্গঠন করে দেখিয়েছেন তাতে কাঠামোটা প্রয়োজন মত সংযুক্ত ও বিযুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্‌খেস্ত্রার মাটিতে গর্ত করে এর ভিত্তি গ্রথিত রয়েছে—অভিনয়কালে থিয়েটারের পরিচালকরা এই সুযোগটা নিতেন।

এই প্রচলিত প্রথাটি হেলেনীয় যুগের প্রথম অবস্থাতেও টিকে ছিল। প্রাচীন গ্রীসের এই অভিনয়-ক্ষেত্রটি তৈরী হত একটি কঠিন স্বল্পায়ত বৃত্তাকৃতি

গর্ত্তের মধ্যে। এই গর্ত্তের পেছন দিকে থাকত দেবমন্দির ও উদ্যান আর বাকি তিনদিকে থাকত উচ্চ সোপানাকৃতি আসন শ্রেণী, বর্ত্তমান কালের সার্কাসের রঙ্গভূমির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে—সার্কাসে দর্শকরা উচ্চ আসনে বসে আর খেলা দেখাবার রিং-টি থাকে নিম্নে। বৃত্তের পেছন দিকটাতে থাকত জনপথ—এই পথ দিওন্যুসাসের মন্দির থেকে বৃত্তের পার্শ্ব দিয়ে বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সারা বছর এই পথে লোক চলাচল করত সুতরাং এই পথের উপরে কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল যাতে প্রয়োজন মত কাঠের বীম দিয়ে অস্থায়ী রঙ্গালয় দাঁড় করিয়ে নেওয়া যায়। এই কাঠের বীমগুলি পাথর দিয়ে বাঁধান রাস্তায় উৎসবকালে যাতে অতি সহজেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় সেই জন্য রাস্তার চত্বরের উপর কাটা ছিল তিন সারি চতুষ্কোণ গর্ত্ত। এই গর্ত্তগুলি রাস্তার গাঢ় রং-এর চত্বরের বিপরীত হালকা রং-এর কঠিন শিলা দিয়ে 'ফ্রেমের' মত করে বাঁধান থাকত। এই পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার গর্ত্তগুলিতে নির্দিষ্ট স্তম্ভগুলি দাঁড় করালে এদের মাঝে সম্মুখ দিক দিয়ে তিনটি বিস্তৃত ফাঁক পাওয়া যায়—আর পাশের দিকে যে কোণাকুণি ভাবে স্থাপিত গর্ত্তগুলি সেগুলি পার্শ্বদিকের প্রবেশপথের বা "প্যারোদোসের" চিহ্ন স্বরূপ মনে হয়। যদিও রঙ্গমঞ্চটি বিরাট আকারের তৈরী করা হত—কিন্তু অর্‌খেস্ত্রাটি সেই প্রাচীন আথেন্‌সের মাপের চেয়ে কিছু মাত্রই বড় হত না।

"আক্রোপোলিসে" এসে অর্‌খেস্ত্রা বৃত্ত যে পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করল তার অন্য একটা কারণ রয়েছে। নাটকের উন্নতির সঙ্গে আক্রোপোলিসের ঢালু আরো গভীর ভাবে কেটে আরো গোল করে প্রেক্ষাগৃহের বা অডিটোরিয়ামের আকার বাড়ানোর তখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। দর্শকরা সাধারণতঃ পাহাড়ে ওই ঢালের উপর বসত বা দাঁড়াত, ফলে মাঝের খোলা জায়গায় যাই ঘটুক না কেন তারা উচ্চাসন থেকে তা অনায়াসেই দেখতে পেত। কিন্তু নীচের সমভূমিতে অর্‌খেস্ত্রাকে পূর্ব্বের মত তখন আর একেবারে পূর্ণ বৃত্তে রাখা হত না। বৃত্তের তখন তিনচতুর্থাংশ দেখা যেত—তার অন্য অংশে থাকত মঞ্চ। এই ধরনের বৃত্ত আমরা সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পাহাড় ভূমির গ্রাম্য অভিনয়ে বা রুমানীয়ার চাষীদের সমবেত নৃত্যে বা ইতালির "বালি" (Bali) নৃত্যে দেখতে পাই।

দর্শকরা বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত অভিনয় দেখে। আথেন্সের অভিনয় কালে এবং এই সমস্ত গ্রাম্য অভিনয় ক্ষেত্রে একই ভাবে রাস্তার দুষ্টু ছেলেরা রাস্তার পাশে গাছে উঠে অভিনয় দেখত। এইভাবে আথেন্সে যে নিম্ন ভূমিতে রঙ্গালয় সৃষ্টি হল, তার প্রকৃত নাম হল "থিয়েত্রোন্" (Theatron)—ক্রমশঃ সমগ্র বাড়িখানাই "থিয়েটার" (Theater) নামে অভিহিত হল।

এরপরে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের কাঠের বসবার আসনগুলি ভেঙ্গে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে ধীরে ধীরে পাথর কেটে কেটে গ্যালারীর মত করে বসবার আসন তৈরী হতে লাগল। আথেন্সের দিওন্যুসাস্ থিয়েটারে মাত্র নীচের তিনটি আসনশ্রেণীই অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরানো ছিল।

আথেন্সের পুরো দর্শক আসনকে ঘিরে একটি পাথরের সীমা নির্দেশক দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উত্তর দিকে ভূমি না থাকায় একটি খাড়া পাহাড় কেটে একটি কৃত্রিম গুহার সৃষ্টি করে অভ্যন্তরে স্থান করে নিতে হয়েছে। আর একটা চওড়া প্রাচীন পথ নীচের ঢালুর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসন শ্রেণীকে বিভক্ত করে দর্শকদের আসা যাওয়ার সুবিধার জন্য বৃত্তাকারে চলে গিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটি আবৃত দেয়াল দিওন্যুসাসের ভূমিকে পৃথক করে রেখেছে। পূর্বদিকে এটা একেবারে সমকোণে ঘুরে গিয়েছে। কারণ এখানেই সেটা পেরিক্লেসের 'ওদেইয়োন্' (Odeion) [১৫] এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

আথেন্সে দিওন্যুসাস্ থিয়েটারের দক্ষিণ দিকের সীমারেখা প্রকৃত দেবস্থানের মুখোমুখি ছিল। এটা পাথরের তৈরী ছিল। পরবর্তীকালে এটা একটা ঢাকা বারান্দার মত বর্ষাবৃষ্টির সময় দর্শকদের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল, কতকটা বর্তমান কালে থিয়েটারের বিশ্রামকক্ষের মত। এই হলটা দক্ষিণে দেবস্থানের দিকে বন্ধ ছিল, ফলে থিয়েটার-মঞ্চ বৃহৎ হওয়ায় এটা আকৃতিতেও ছোট হয়ে গেল। এখানে দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি মঞ্চোপকরণও রাখা হত। একদিকে এই গৃহ ও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দেয়াল অন্যদিকে অর্খেস্ত্রা ভূমি এরই মধ্যস্থলে পথের উপর প্রতি বছর উৎসবকালে বিভিন্ন গঠনের অস্থায়ী কাঠের "স্কেনে" তৈরী হতে লাগল।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে স্থায়িভাবে পাথরের স্কেনের ভিত্তি স্থাপিত হল। সেই সৌধের দু'দিকে দু'টি পরিবর্ধিত অংশ ছিল, যার নাম

ছিল প্যারাস্কেনিয়া (Paraskenia)। এটি পেরিক্লেসের নগর পরিকল্পনারই একটি অংশ ছিল। এই "প্যারাস্কেনিয়া" আক্রোপোলিস্ ও তার ঢালুকে অলংকৃত করে তুলেছিল। কিন্তু পেরিক্লেসের অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মতই এটিও তাঁর মৃত্যুর পরেই তৈরী হয়েছিল।

যখন পাথরের এই বড় স্কেনেটি তার দুই পরিবর্ধিত পাখা নিয়ে উঠে দাঁড়াল তখন তার আরো কিছু বেশি স্থানের প্রয়োজন হল। এতএব তাকে পূর্বদিকে পেরিক্লেসীয় যুগের সঙ্গীতাগারের সীমানা দেয়ালের দিকে এগিয়ে যেতে হল, প্যারাস্কেনিয়ার সম্মুখে—মূল মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত যে বর্ধিত মঞ্চাংশের সৃষ্টি হল, তার নাম হল "প্রোস্কেনিয়োন্" (Proskenion) বা প্যারাস্কেনিয়ার সম্মুখবর্তী বারান্দা। এই প্রোস্কেনিয়োন্ই বর্তমান যুগের মঞ্চে "প্রোসীনিয়াম্" (Proscenium) নামে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছে। এখন প্রোসীনিয়াম্ মানে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগের ফ্রেমকে বোঝায়। এই প্রোস্কেনিয়োন্ বা সম্মুখ মঞ্চের উপরের ছাদকে বলা হত "লোগেইয়োন্" (Logeion)। সম্ভবতঃ এই উপরের ছাদটাও মঞ্চের মতই ব্যবহৃত হত। এর উপরে অভিনেতারা কখন কখন অভিনয় করতেন। যদিও এই মতামত নিয়ে বহু উত্তপ্ত বিতর্কেরই অবতারণা হয়েছে তবে প্রমাণাভাবে নিশ্চিত কোন সমাধানে পৌঁছন সম্ভব হয়নি।

প্রাচীন অর্কেস্ট্রা বৃত্ত থেকে ক্রমবিবর্তিত মঞ্চের যে গঠনশৈলী নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হল তার উপকরণগুলি আমরা মূলতঃ তিনটি উৎস থেকেই পেয়ে থাকি। উপকরণের সে উৎসগুলি হল—

১। পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি ও কমেডির গঠনভঙ্গি ও দৃশ্য পরিকল্পনা অনুধাবন করে ধারণা করে নেওয়া।

২। পরবর্তীকালে গঠিত পাথরের স্কেনে ও রঙ্গালয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে ধারণা করে নেওয়া।

৩। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের অঙ্কিত দৃশ্যাবলী ও চিত্রাঙ্কিত ভষ্মাধার থেকে ধারণা করে নেওয়া।

এই সমস্ত উপকরণগুলি অতি সাবধানেই পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ যে কোন একটি নির্দিষ্ট নাটকই বহু বিচিত্র ও বিপরীত পদ্ধতিতেই মঞ্চস্থ হতে পারে।

কাঠের অস্থায়ী মঞ্চ থেকে পাথরের স্থায়ী স্কেনে বহুপ্রকার বৈচিত্র্য ও

সংযোজন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাকে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করাও সম্ভব নয়—কারণ প্রামাণ্য উপকরণগুলির মধ্যে অঙ্কিত ভস্মাধারে প্রকৃত মঞ্চস্থ নাটকের দৃশ্য না থেকে হয়ত নাটকটির গল্পাংশ গ্রহণ করে শিল্পী-অঙ্কিত দৃশ্যও থাকতে পারে আর তা ছাড়া একাধিক উৎস যখন একই সমাধানের পৃষ্ঠপোষকতা করে তখনি কেবল তার সত্যতায় বিশ্বাস করে নির্ভর করা চলে। আমরা প্রথমেই জানতে চাইব যে চতুর্থ শতকে রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত রূপটি কি ছিল, সেখানে এমন কি কি উপাদান ছিল যার নজির পরবর্তী যুগে খুঁজে পাওয়া যায় এবং কতদূর পর্যন্ত আমরা চতুর্থ শতকের অলংকৃত পাত্রকে সে যুগের ও তার পূর্ববর্তী যুগের প্রমাণ স্বরূপ ধরে নিতে পারব।

প্রাচীনতম যে পাথরের স্কেনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তা হল আথেন্‌সে দিওন্যুসাস্‌ থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ, এতে একটা মস্তবড় হল আছে, যার ঠিক মাঝখানে পেছন দিক দিয়ে একটি বেদীর মত পাথরের সমান্তরাল চতুর্ভুজ আছে। এটি নিঃসন্দেহে চতুর্থ শতকে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সহায়তা করত। পঞ্চম শতকে এটাই ছিল মঞ্চের সম্মুখ অংশের সাজঘর। স্কেনোথেকের খুঁটি পুতবার জন্য যে গর্ত সম্ভবতঃ এগুলিই পরে "এপিস্কেনিয়োন্‌" (Episkenion) বা ছাদের উপরের ঘর কিংবা দোতলা তৈরীর কাজে লাগত। এটা অনেকটা "অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস্‌" বা ছোট গৃহের উপরের দোতলার সঙ্গে সংলগ্ন ছাদের মত, অভিনেতা ও খোরাসদের সাজ-ঘরের পাশে সংযুক্ত ছিল। সাজ-ঘরের পাশ দিয়ে এখানে সিঁড়ি উঠে যেত। দু'দিকেরই সম্মুখ ভাগে আয়তাকার গৃহ নির্মিত হত। এই গৃহের মুখ হত প্যারোদোস্‌ এবং অর্‌খেস্ত্রার পার্শ্বস্থিত পথের দিকে, স্কেনের পার্শ্বস্থ গৃহ হিসাবে এর প্যারাস্কেনিয়া নাম তাই সার্থক। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে আমরা স্কেনের দু'পাশে দু'টি প্যারাস্কেনিয়ার অস্তিত্ব দেখতে পাই।

পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে "স্কেনে" এবং তার দু'পাশের দু'টি প্যারাস্কেনিয়াই একতলা হত। এই সম্পূর্ণ স্থাপত্যটি অর্‌খেস্ত্রায় অভিনীত নাটকের পশ্চাদ্‌পটের কাজ করত। এই ধারণাটি লুভর্‌ (Louvre) জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি অঙ্কিত পাত্র থেকে গড়ে উঠেছে। তাতে এউরিপিদেসের "ইফিগেনিয়া" নাটকের একটি দৃশ্য অঙ্কিত আছে। এই পাত্রটির চিত্র থেকে এটা নিশ্চিতই বোঝা যাচ্ছে যে আথেন্‌সের প্রথম দিককার

নাটকে প্যারাস্কেনিয়ায় অভিনয় হত না—অভিনয় হত দুই প্যারাস্কেনিয়ার মধ্যবর্তী অর্‌খেস্ত্রা ভিত্তিভূমিতে ; এই স্থানে 'হেলেনীয়' (Hellenistic) বা 'রোমান্' (Roman) যুগেও কোন মঞ্চ দাঁড় করান হয়নি।

প্রথম দিককার পাথরের মঞ্চ এভাবেই তৈরী হত যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োজন মত তাকে ব্যবহার করা যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে নাট্যসাহিত্য নিয়ে যখন ভাঙ্গাগড়া চলছে তখন অভিনয়ের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হত, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ট্র্যাজেডি ও কমেডি সাহিত্য যখন স্থায়ী রূপ পেল তখনকার অভিনয় উপকরণের সঙ্গে এর কোন মৌলিক তফাৎ ছিল না। কেবল নাটক তৈরী শেষ হওয়ার পরে তার প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে এসেছিল যুগোচিত মার্জনা।

পরবর্তীকালের ট্র্যাজেডিতে অনেক সময় দেখা যায় পর পর দৃশ্যাবলী দেখিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হত। এই জন্য দু'টি স্থাপত্য থাকত, স্থান নির্দেশক দু'টি সেট পর পর দেখিয়ে যাওয়ার জন্য। যদিও ক্লাসিকাল নাট্যতত্ত্বের মধ্যে আমরা স্থান কাল ও ক্রিয়া (Unity of time, place and action) এই তিন ঐক্যের উল্লেখ পাই কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডিতে স্থান, কাল ও ক্রিয়ার এই ঐক্য—যতখানি সুকঠিন ছিল বলে আমাদের ধারণা তা রেনেসাঁস যুগের পণ্ডিত ব্যাখ্যাতাদেরই তৈরী। প্রকৃত নাটকে অনেক জায়গায়ই ছোট বড় ব্যতিক্রম রয়েছে স্থানের ঐক্য তো বহু ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়েছে। একই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশক সেটের প্রয়োজন অনেক নাটকেই পাওয়া যায়। যেমন ইফিগেনিয়া নাটকে দু'টি স্থানদেখা যায়, দেলফিতে অ্যাপোল্লোর মন্দির এবং আথেন্‌সে—আথেনা (Athena) দেবীর মন্দির, কিংবা আরিস্তোফানেসের (Aristophanes) "ফ্রগস্" (Frogs) নাটকে "হেরাক্লেসের" (Herakles) গৃহ এবং "প্লুতো"র (Pluto) প্রাসাদ—এই দুই সেট দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে দু'পাশের দুই প্যারাস্কেনিয়া এবং তার মধ্যবর্তী স্থানের অর্‌খেস্ত্রা সম্বলিত স্কেনে মঞ্চই দৃশ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজন মেটাতে পারত। এখানে মধ্যযুগীয় "মিস্ট্রি" নাটকের রঙ্গালয়ের মতই পরপর একটার পর একটা গৃহে অভিনয় দেখিয়ে যাওয়া যেত। এ যুগের গ্রীক মঞ্চও ছিল বিশাল—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ৬৪ বর্গফুট স্থান জুড়ে তা গড়ে উঠত। এই বিশাল মঞ্চের এক অংশে অভিনয় চললে, অন্য অংশ দর্শকদের চেতনা থেকে অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যেত অথবা

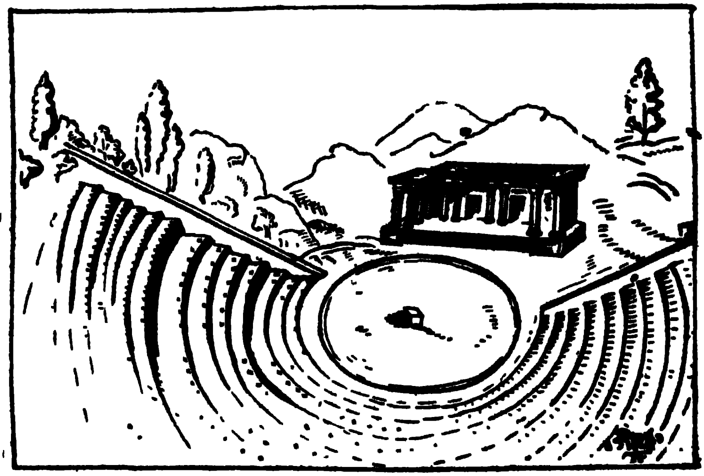
ইচ্ছা হলেই প্যারাস্কেনিয়া বা স্কেনের অপর অংশ পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা যেত।

আবার এটাও সত্য যে সব রকম নাটকের প্রয়োজন বা পরিবেশ এক নয়। অনেক নাটকের নির্দিষ্ট কোন পশ্চাদ্‌পটের দরকার হত না। যেমন আইস্খ্যুলসের প্রথম দিক্‌কার নাটকে বা সোফোক্লেসের (Sophocles) শেষ দিকের লেখা "অয়দিপউস্ কলোনেউস্" (Oedipus Coloneus) নাটকে। অনেক সময় আবার মাত্র একটি গৃহ বা একটি সেটেরই ব্যবহার দেখা যায়। যেমন এউরিপিদেসের "আইওন" নাটকে রয়েছে একটি মন্দির অঙ্গন। আইস্খ্যুলসের অ্যাগামেমনোন ও খোয়েফোরই নাটকে, বা সোফোক্লেস্ রচিত "আন্তিগোনে" (Antigone), "অয়দিপউস্ ত্যুর‍্যান্নস্" (Oedipus Tyrannus) কিংবা এউরিপিদেসের "মিদিয়া" ও "আন্তিগোনে" (Medea and Antigone) নাটকে আমরা দেখতে পাই যে এর মধ্যে স্থান কালের ঐক্য অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। মূলতঃ এগুলোকে এক অঙ্ক, এক দৃশ্য (One Act, one Set) নাটকই বলা চলে। এদের মঞ্চদৃশ্য রচনায় একটিমাত্র প্রাসাদের সেটই ছিল যথেষ্ট। আবার সোফোক্লেসের "আজাক্স" (Ajax) নাটকে এবং এউরিপিদেসের "ট্রোজান্ উইমেন" (Trojan Women) নাটকে আমরা শুধু একটি তাঁবুর ব্যবহার দেখতে পাই। কিংবা সোফোক্লেসের "ফিলোক্তেতেস্" (Philoktetes) নাটক বা আরিস্তোফানেসের "দ্যা বার্ডস্" (The Birds) নাটকে একটি মাত্র গুহার ব্যবহার রয়েছে। এই নাটকগুলির পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের নাটকের জন্য বিভিন্ন ধরনের মঞ্চদৃশ্য বা সেটের প্রয়োজন হত। এ সকল ক্ষেত্রেই মূল মঞ্চের স্থাপত্য-গঠন কিন্তু একই ছিল। প্রোথ্যুরোন্ (Prothyron) সংযুক্ত একটি স্কেনেকে মন্দির বা থামওয়ালা প্রাসাদ, তাঁবু বা গুহা ইত্যাদি বিভিন্ন সেট-এ সামান্য চেষ্টায়ই পরিবর্তিত করা যেত।

॥ এউরিপিদেস্ ॥

এউরিপিদেসের নাটকগুলি পরবর্তী কালের রচনা। এই সময়ে ট্র্যাজেডির ভাঙাগড়া যেমন শেষ হয়েছে ক্লাসিক্ মঞ্চের ভাঙাগড়াও তেমনি শেষ হয়েছে। মঞ্চ অস্থায়ী কাঠের স্কেনে ও স্থাপত্য ত্যাগ করে স্থায়ী পাথরের স্থাপত্যে পর্যবসিত হয়। নাটকের গঠনের দিক দিয়েও পঞ্চম

শতকের খোরাস ও অরুখেস্ত্রার প্রাধান্য অনেক কমে যায়। নাটক চরিত্র বহুল হয়ে ওঠে ও তাদের প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হয় মঞ্চ। মঞ্চোপকরণের সারল্যও কমে আসে—এউরিপিদেসের "দিকায়োপোলিস্" (Dikaiopolis) এবং আরিস্তোফানেসের "লামাখোস্" (Lamachos) নাটকে তিনটি সেটেরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় স্কেনে ক্রমপরিবর্তনের ফলে একটি



সম্ভবতঃ এউরিপিদেস্ এইরূপ মঞ্চের জন্য নাটক লিখেছিলেন।

বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। দু'পাশের দু'টি প্যারাস্কেনিয়া এবং মাঝের স্কেনে গৃহ এতেই পর পর তিনটি দৃশ্য দেখানো চলত। রঙ্গালয়ে স্কেনের স্থায়ী অবস্থান দর্শকসাধারণ ও মঞ্চবিদ্‌দের কাছে আর এক কারণেও একান্ত কাম্য ছিল—তা হল পেছনের স্কেনে গৃহে হাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় রঙ্গালয়ের শ্রুতিগম্যতা (Good acoustics value) অনেক বেড়ে যায়।

নাটকের মধ্যে খোরাসের সমবেত সঙ্গীতের অংশ যত কমে যেতে লাগল—ততই কথোপকথনের অংশ বেড়ে চলল, তারি সঙ্গে আর একটি সমস্যা এসে দেখা দিল তা হল শ্রুতিগম্যতা। খোরাসের সমবেত সঙ্গীত যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত সাধারণ দ্বৈত গদ্যাত্মক কথোপকথন ততদূর পর্যন্ত শোনা যেত না। তাই মঞ্চবিদ্‌দের ভাবতে হল কি করে স্থাপত্য সংগঠনের সাহায্যে শব্দকে সম্ভবমত দূরত্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে

মঞ্চের অংশে যেমন স্থায়ী স্থাপত্য গড়ে উঠল, তেমনি আবার প্রেক্ষাগার আয়তনে ছোট হয়ে এল। আথেন্‌সের যে স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরী হল তার একদিকে রইল প্রেক্ষাগৃহের সীমানার দেয়াল (retiring wall) এবং অন্য-দিকে স্কেনোথেকে এই স্কেনেগৃহ ইতিমধ্যেই পুরানো মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাথরে তৈরী এই স্থায়ী পুরানো দিওন্যুসাস্ মন্দির আর পেছনে সরানো অসম্ভব ছিল বলে প্রেক্ষাগৃহকেই অর্থাৎ "আনালেম্মাতাকে" (Analemmata) উত্তরদিকে সরিয়ে নবাগন্তুক স্থাপত্যাংশ প্যারাস্কেনিয়ার জন্য জায়গা বের করে নিতে হল। এইভাবে ক্লাসিকাল যুগের স্কেনে সুদৃঢ় ভঙ্গিতে দক্ষিণদিক থেকে আক্রোপোলিসের ঢালুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—অর্থাৎ প্যারাস্কেনিয়া প্রেক্ষাগৃহের স্থানে অনুপ্রবেশ করতে লাগল। ফলে প্রেক্ষাগৃহও আকারে ছোট হয়ে পড়ল।

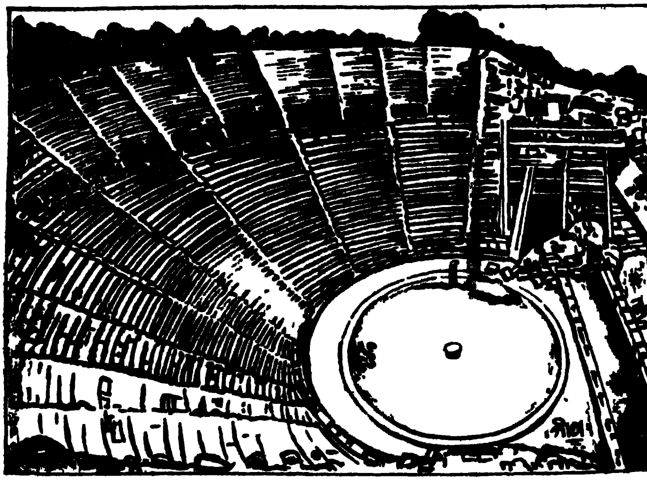
প্রাচীন নাট্যশালার মধ্যে এপিদাউরসের গঠন-শৈলীকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুষম বলা যায়। আথেন্‌সের স্থায়ী রঙ্গালয়ের সঙ্গে পরবর্তীকালের এপিদাউরসের পাথরের রঙ্গালয়ের গঠন-ভঙ্গির দিক থেকে যথেষ্টই মিল ছিল এপিদাউরসের রঙ্গালয়ের স্থাপত্যে প্রেক্ষাগৃহটি সমভাবে বৃত্তাকার ছিল। স্কেনের প্রধান গৃহটি পার্শ্ববর্তী গৃহের একই সমোচ্চ ভিত্তিভূমিতে রচিত হয়েছে। সুসজ্জিত দরজা দিয়ে স্কেনে কোণাকুণি ভাবে প্রেক্ষাগারের স্থায়ী পার্শ্বস্থ সীমানা দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অর্‌খেস্ত্রা আয়তনে ছোট হয়ে গেলেও তখনো পরিপূর্ণ বৃত্তাকারই ছিল। অর্‌খেস্ত্রাকে ঘিরে চুনা পাথরের একটি অনুচ্চ চতুর্বেষ্টনী তৈরী করা হত। অর্‌খেস্ত্রার ঠিক মাঝখানে একটি গোলাকৃতি গর্তে পাথর বসানো থাকত, সম্ভবতঃ এখানে উৎসব আরম্ভের দিন শোভাযাত্রা করে দেবমূর্তি এনে রাখা হত। অর্‌খেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগারের আসন শ্রেণীর মাঝে যাতায়াতের যে পূর্ব প্রচলিত পথ ছিল তাকে গভীর করে একটি জলধারাবাহী নালায় পরিণত করা হয়েছিল এর ফলে রঙ্গালয়টি শীতল হয়ে থাকত। প্রেক্ষাগারের বাইরের দুই প্রান্ত, প্রবেশ পথের বাইরের একাংশকে একটু বেশি ব্যাস নিয়ে ঘিরে থাকত তার মানে, তারা অর্‌খেস্ত্রা ভূমির বঙ্কিম রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হত না। অর্‌খেস্ত্রার দিক্‌কার একেবারে শেষ ও নিম্নশ্রেণীর আসনশ্রেণী সরিয়ে দেওয়া হল এবং সেই বাড়তি অংশটি ঘুরে যুক্ত হল 'প্যারোদোসের সঙ্গে। ফলে একটা মস্তবড় সুবিধা হল যে প্রেক্ষাগৃহের জনতা খুব তাড়াতাড়ি

প্যারোদোসের পথে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত। প্রেক্ষাগৃহের আসন-শ্রেণীর প্রান্তগুলি স্কেনের দিকে মুখ করে কখনই তৈরী হত না এদের মুখ থাকত অর্‌খেস্ত্রার দিকে, অর্‌খেস্ত্রায় যে অভিনয় হত তাই দেখবার জন্য যেন হিসেব করে আসনগুলি পাতা হত। প্রথম দিককার স্কেনে শুধু সর্বনিম্ন বৃত্তের আসনশ্রেণীর দুই প্রান্ত পর্যন্তই বিস্তৃত থাকত। এর ফলে তারা যেন অর্‌খেস্ত্রায় অভিনীত সমগ্র নাটকখানির পশ্চাদ্‌পটেরই কাজ করত। আসনশ্রেণীও তাই বৃত্তাকারে এমন ভাবেই গ্রথিত হত যে অর্‌খেস্ত্রায় যে অভিনয় হচ্ছে তা যেন প্রেক্ষাগারের সর্বাংশ থেকেই পূর্ণাঙ্গ দেখা যায়।

দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করত রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষালয়ের সীমানা দেয়ালের মধ্যবর্তী প্যারোদোস্‌ দিয়ে তারপর তারা বৃত্তাকারে সম্মুখের পথ ঘুরে তাদের টিকিটের মূল্যানুযায়ী যে শ্রেণীর মুদ্রাঙ্কিত থাকত সেখানে গিয়ে আসন গ্রহণ করত। এই আসনশ্রেণী দিয়ে রঙ্গালয়কে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হত। একটি বৃত্তাকার পথ নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর আসন সমূহকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। দ্বিতীয় ভাগের আসনশ্রেণীর বৃত্তের ব্যাস অনেক বড় হত, কারণ সেখানকার উচ্চ সোপানাবলীতে প্রায় দ্বিগুণ আসনের ব্যবস্থা থাকত।

ইতিপূর্বে আথেন্‌সের প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণকালেও এই একই উদ্দেশ্যকে পুরোভাগে রাখা হয়েছিল—যাতে অতি অল্প সময়ে এবং সহজেই প্রেক্ষাগৃহে জনসমাবেশ ঘটতে পারে, আবার সেই জনতা প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আর গণতন্ত্রের যুগ বলে প্রত্যেকটি আসন থেকে যাতে সমভাবে এবং ভালভাবে দেখা যায় সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আথেন্‌সে ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা, অন্য দিকে ছিল ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতিকূলতা—তাই এই মহৎ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারেনি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল "এপিদাউরসের" রঙ্গালয়ে। "এপিদাউরসের" (Epidauros) প্রতিটি সোপান এবং আসন-শ্রেণী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রথিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখেই দর্শকদের পা রাখবার জন্য একটি ঢালু জায়গা থাকত। আসন-সমূহ এত নীচু এবং হেলানো ছিল যে কুশানের কাজ করত। একেবারে সম্মুখের শ্রেণী ছিল পুরোহিত, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি সম্মানিত অতিথিদের

জন্য সংরক্ষিত আসন। প্রথম দিকে এই আসনগুলি বেঞ্চের মত ছিল কিন্তু পরে আলাদা আলাদা সিংহাসনের মত পাথরে তৈরী বৃহৎ আসন তৈরী করে এনে বসানো হয়েছিল। সোপানশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশের ঠিক মাঝখানে আজো সম্মানিত প্রধান অতিথির আসনখানি সাক্ষীস্বরূপ অটুট রয়েছে। এই আসনে উপবেশন করতেন নাটকের যিনি অধিকর্তা দেবতা দিওন্যুসাস্ এলেউথেরেউস্ তাঁরি প্রধান পুরোহিত 'দ্যা লিবারেটর্' (the Liberator), এই আসনের সম্মুখে ছিল পা রাখবার একটি পাথরের চৌকি। চারপাশে ভূমির গর্ত দেখে মনে হয় প্রধান পুরোহিতের এই আসনখানি



এপিদাউরসের রঙ্গালয়-গ্রীস

চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করে অন্যান্য আসন থেকে তফাৎ করে রাখা হত। সিংহাসনের পেছনে খোদিত ছিল সাত্যুর অর্থাৎ অর্ধমানব ও অর্ধছাগের মূর্তি। সম্মুখ অংশে খোদিত ছিল "অ্যারিম্যাস্পি ও গ্রিফিনের" (Arimaspi & Griffin) মূর্তি, এর পাশে ছিল পক্ষযুক্ত বালক "অ্যাগোনের" (Agon)[১৬] মূর্তি, এছাড়া সমস্ত সিংহাসনটি জুড়ে অঙ্কিত ছিল আঙ্গুরলতা। যে দিথ্যুরাম্ব থেকে গ্রীক নাটকের সুরু দিওন্যুসাসের প্রধান পুরোহিতই ছিলেন সেই প্রাচীন যুগে তার প্রথম অভিনেতা। তিনিই এখন নাট্যাভিনয়, মঞ্চ-কুশলী অভিনেতা ও নাট্যকারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসে প্রধান

অতিথির সম্মানিত আসন গ্রহণ করেছেন। আমরা কল্পনা নেত্রে দেখতে পাই যে প্রধান পুরোহিতের এই আসন সম্মুখেই নাট্যকার আরিস্তোফানেসের "দ্যা ফ্রগস্" (The Frogs) নাটকের হাস্যোজ্জ্বল দৃশ্য অভিনীত হত—সে সমস্ত দৃশ্যে দেবতা দিওন্যুসাস্ ও তাঁর পুরোহিত কেউই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ থেকে রেহাই পাননি, এই বিদ্রূপ পুরোহিত উপভোগ করতেন।

"ল্যকুর্গাসের" যুগ থেকেই প্রেক্ষাগার পরিণত রূপ ধারণ করতে থাকে। অর্‌খেস্ত্রা চারদিকে জলের নালা কেটে পুনর্গঠিত হয়, এবং স্কেনো-থেকে সাধারণ অস্থায়ী গৃহ থেকে ক্রমশঃ স্তম্ভবহুল স্থায়ী পাথরের স্থাপত্যের রূপ গ্রহণ করতে থাকে। হেলেনীয় যুগে এই স্থাপত্যই আরো সাড়ম্বর প্রাধান্য পায়। স্কেনে পেছনের অংশে দক্ষিণের পবিত্র দেবভূমির দিকে খোলা রইল—এই প্রাচীন মন্দিরের গায়ে দিওন্যুসাসের কাহিনী চিত্রিত এবং খোদিত হয়ে একটি সুসজ্জিত বিশ্রামাগার তৈরী হল। সেখানে দর্শক সাধারণ নাটকের মধ্যবর্তী বিরামকালে বা বর্ষণ আরম্ভে আশ্রয় নিতে পারত।

গ্রীক নাটকে অর্‌খেস্ত্রার আবির্ভাব ঘটেছিল অতি প্রাচীন "আরখেইক্" (Archaic) যুগে। থিয়েটার অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হল ক্লাসিকাল যুগে। স্কেনে বিল্‌ডিং-এর রঙ্গমঞ্চ বিশেষ পরিণত রূপ পেয়েছিল ক্লাসিকাল যুগের খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে এবং এর ক্রমোন্নতি চলল হেলেনীয় যুগ পর্যন্ত। কিন্তু এই হেলেনীয় যুগ পর্যন্ত অগ্রগতির পরেও গ্রীক রঙ্গালয়ের তিনটি অংশ, অর্‌খেস্ত্রা, স্কেনে ও প্রেক্ষাগার—এরা পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত ও একাঙ্গীভূত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে উঠতে পারেনি। তারা একই উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করল, ক্রমোন্নতির পথে চলল তাদের অগ্রগতি তবুও তারা রইল পরস্পরের প্রতি নিঃসম্পর্ক, উদাসীন।

এই সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়, যে ক্লাসিকাল যুগে মঞ্চের বহু প্রকার উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও মঞ্চ কোথাও প্রেক্ষাগারের ভূমি থেকে উচ্চতর ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এখানে স্কেনে গৃহ অর্‌খেস্ত্রার চেয়ে উচ্চ বেদীতে হলেও পুরো রঙ্গভূমিই থাকত বর্তমান ষ্টেডিয়াম বা সার্কাসের মত নীচুতে এবং দর্শকরা বসত উচ্চ সোপানাবলীর মত আসনে।

"দ্যা হিস্ট্রি অব্ দ্যা গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান থিয়েটার" গ্রন্থে শ্রীমতী মার্গারেট

বীবের বলেছেন, "এ কথা বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্লাসিকাল যুগে উঁচু মঞ্চ বলে কোন কিছুই ছিল না।"[১৭]

এতক্ষণ আমরা ক্লাসিকাল যুগের রঙ্গালয়ের স্থাপত্য গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম, এবার আমরা এযুগের যান্ত্রিক পদ্ধতি ও মঞ্চের কলাকৌশলের অভিনবত্বগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে ক্লাসিকাল যুগের নাট্যসাহিত্যের যে গঠন শৈলীগত বিবর্তন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছিল সে সম্পর্কে কিছু বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নাটকের গঠন শৈলীর বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মঞ্চ ও তার যান্ত্রিক কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিক যাচাই করে নিতে পারব।

পূর্বেই আমরা আইস্খ্যুলস্ ও সোফোক্লেসের নাটকের মধ্যে যে গঠনগত পরিবর্তন এগিয়ে এসেছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি—এবার এই অগ্রগতির আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

গ্রীক নাটকে কথোপকথনের প্রাধান্য ও মঞ্চের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পথিকৃৎ ছিলেন আইস্খ্যুলস্ এবং এই পথেই নাটকের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছেন সোফোক্লেস্ ও এউরিপিদেস্। এ সম্পর্কে নিকল মহাশয় তাঁর "ওয়ার্লড ড্রামা" গ্রন্থে বলেছেন যে,

"আইস্খ্যুলস্ যদি মার্লো হন, তবে সোফোক্লেস্ ছিলেন শেক্সপীয়র।

যদি সোফোক্লেসকে শেক্সপীয়রের সমগোত্র মনে করা হয়, তবে এউরিপিদেস্ তাঁর মোহমুক্ত তীক্ষ্ণ ধীশক্তির দ্বারা প্রায়শঃই আমাদের শ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।"

আইস্খ্যুলস্ থেকে নাটকের ক্রমোন্নতির স্বরূপ নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে খোরাসের প্রাধান্য কমে আসার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। খোরাস সঙ্গীত যতই কমেছে কথোপকথনের অংশ ততই বেড়েছে, কথোপকথনের অংশ যত বেড়েছে অর্খেস্ত্রা ছেড়ে মঞ্চের প্রাধান্যও ততই বেড়েছে। মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কলা কৌশল ও আয়তন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

রিচার্ড জি. মলটন. তাঁর "দি এন্‌শেণ্ট ক্লাসিকাল ড্রামা" গ্রন্থে ক্লাসিকাল যুগের গ্রীক ট্র্যাজেডিকে খোরাস সঙ্গীতের প্রাধান্য হেতু শুধু "ট্র্যাজেডি" আখ্যা দিতে চাননি, উল্লেখ করেছেন "খোরাল ট্র্যাজেডি" (Choral Tragedy) অথবা গীতি প্রধান ট্র্যাজেডি বলে। সমবেত

খোরাসের মুখের ওডগুলি এক একটি গীতিকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আইস্খ্যলসের প্রথম নাটক দ্যা সাপ্লায়্যান্টসে আমরা দেখেছি খোরাল সঙ্গীতের অংশ নাটকীয় কথোপকথনের চেয়ে অনেক প্রাধান্যযুক্ত। কিন্তু এরপর আইস্খ্যলসের ওরেসথেইয়ার কাহিনী নিয়ে রচিত ট্রিলজিতেই আমরা তুলনামূলক ভাবে মঞ্চ এবং কথোপকথনের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য দেখতে পাই। ত্রয়ী নাটকের তিনটি হল ১। "অ্যাগামেমনোন" (Agamemnon) এটি ছিল প্রত্যুষকালের নাটক (Morning play) ২। "দ্যা সেপ্যাল্‌ক্র্যাল্‌ রাইটস্‌ বা খোয়েফোরই (The Sepulchral rites)—এটি মধ্যাহ্নকালের নাটক (Midday play) ৩। দ্যা জেন্টল্‌ গডেসেস্‌ বা এউমেনিদেস্‌ (The Gentle Goddesses) এই তৃতীয়টি ছিল সায়াহ্নকালের (Afternoon play) নাটক।

খোরাল ট্র্যাজেডিতে পর পর সাজানো থাকত নাটকীয় দৃশ্যাবলী যা মঞ্চে অভিনীত হত ও প্রশস্তি সঙ্গীত যা অর্‌খেস্ত্রায় গীত হত। প্রশস্তি সঙ্গীতে মেনে চলা হত খোরাসের সকল সূক্ষ্ম ও জটিল্‌ রীতিনীতি।—সেই হারিয়ে যাওয়া শিল্পকলা যা মনকে বেঁধে রাখত কাব্যে, গানে ও দেহভঙ্গিমায়—সেই শব্দকাব্য, ধ্বনিকাব্য, ও গতিকাব্য যেখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে রূপ পেত।

আর. জি. মলটন গ্রীক ট্র্যাজেডির গঠন ভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন "গ্রীক ট্র্যাজেডি নির্ভেজাল নাটক ছিল না। এতে মিলন ঘটেছিল স্ট্রোফি আকারে রচিত অর্‌খেস্ত্রার খোরাস কর্তৃক গীত প্রশস্তি সঙ্গীত এবং মঞ্চে অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাট্যকাহিনীর। খোরাস ছিল গীতধর্মী ও নাট্যধর্মী উপাদানের বন্ধন সূত্র।"

এই "খোরাস" নাটকের মধ্যে থেকে দু'ধরনের কাজ করত, তারাই ছিল নাটকের ভিতরের দর্শক এবং বাইরের দর্শক। খোরাস যখন নাটকের ভিতরের দর্শকের কাজ করত, তখন তারা হত নাটকের জনতা। যেমন পরবর্তী কালে দেখা গেছে শেক্‌সপীয়রের "জুলিয়াস্‌ সিজারের" রোমান জনতা। অন্যদিকে নাটকের মধ্যে এই খোরাস থাকার দরুণই গ্রীক নাটকে অভিনেতাদের "হ্যামলেট" বা "ম্যাকবেথ" চরিত্রের মত বড় বড় স্বগতোক্তি করতে হত না—খোরাসই তাদের এই প্রয়োজনটা মেটাতে পারত এবং চরিত্রগুলির মানসিক বিশ্লেষণের কাজ করে দিত। খোরাসের

দ্বিতীয় কাজ ছিল নাটকের বাইরের দর্শকের ভূমিকা নেওয়া। নাট্যকার দর্শকদের মধ্যে যে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করতেন, যে নীতির সংঘাত জাগিয়ে তুলতে চাইতেন—খোরাসের কথা এবং আচরণের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়াই ফুটে উঠত।

মূলতঃ গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে সঙ্গীতকারী খোরাসের বহু বিচিত্র ধরনের কাজ ও প্রাধান্য থাকার জন্যই মলটন গ্রীক ট্র্যাজেডিকে খাঁটি নাটক (pure drama) বলে স্বীকার করেন নি—বলেছেন, খোরাল ট্র্যাজেডি। এই খোরাল ট্র্যাজেডির ক্রমশঃ খোরাসের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিই হল খাঁটি ট্র্যাজেডির বা নাটকের জন্ম কথা। আর খাঁটি নাটককে ধারণ করবার জন্যই একটু একটু করে এগিয়েছে রঙ্গমঞ্চ। আইস্খ্যুলস্ থেকে এউরিপিদেসের মধ্যেই খোরাসের আমূল বিবর্তন আমরা বিশ্লেষণ করলে লক্ষণীয় ভাবে দেখতে পাব। কতকগুলি নাটকের একটা ধারাবাহিক হিসেবের মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাব খোরাসের প্রাধান্য ক্রমশঃই কি ভাবে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। যেমন—

১। নাট্যকার—আইস্খ্যুলসের নাটক—"দ্য সাপ্লায়্যান্ট মেইডেন্স" রচনাকাল আনুমানিক—৪৯০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ, নাটকে মোট লাইন সংখ্যা—১৪৬০ তার মধ্যে ৫৫১ লাইন কথোপকথন, এর প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যা ৯০৯ লাইন হল সমবেত খোরাস ও তৎসহ খোরাস নায়িকা এবং উপখোরাসের বাক্‌বিনিময়। খোরাস সংখ্যা কম পক্ষে ৫০ জন—সাপ্লায়্যান্ট মেইডেন্‌রা।

২। এরপরে আমরা নাট্যকার—সোফোক্লেসের একটি মাঝামাঝি সময়কার নাটক ধরছি—আন্তিগোনে (Antigone—The human law and the law of spirit) রচনাকাল ৪৪২ বা ৪৪১ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। তরুণ নাট্যকার সোফোক্লেসের রঙ্গালয়ে প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আইস্খ্যুলসের প্রতিযোগী হিসেবেই। আন্তিগোনে নাটকে আমরা বিস্ময়কর ভাবেই দেখতে পাব যে নাটকে চরিত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং খোরাস সংখ্যা কমে গেছে। খোরাস সংখ্যা মোট ১৫জন। নাটকের চরিত্র—১। আন্তিগোনে, ২। ইসমেনে, ৩। এউরিদাইস্, ৪। ক্রেয়োন্, ৫। হাইমোন্, ৬। তিরেসিয়াস্, ৭। একজন সান্ত্রী, ৮। একজন দূত—মোট ৮টি চরিত্র। নাটকের প্রারম্ভে মঞ্চ দৃশ্যসজ্জার বিবরণ রয়েছে এইভাবে :—থিবিসের রাজা ক্রেয়োনের প্রাসাদসম্মুখ। মাঝখানে একটা বিশাল দরজা যা দিয়ে প্রাসাদ

অভ্যন্তর দেখা যায়। দু'পাশে দু'টো ছোট দরজা। মঞ্চ দৈর্ঘে পশ্চাৎ দেয়ালের সমান। মঞ্চ থেকে তিনটি সিঁড়ির ধাপ নেমে এসেছে অর্কেস্ট্রা ভূমির দিকে। নাটকে মোট লাইন সংখ্যা ১০৭১, খোরাস ২২৫ লাইন—এবং কথোপকথনের সংখ্যা ৮৪৬—খোরাসের তিনগুণেরও বেশি।

৩। নাট্যকার—এউরিপিদেসের নাটক। "আত্রেয়ুস" (Atreus) বংশেরই প্রখ্যাত বিষয় নিয়ে রচিত—"ওরেস্তেস্"। রচনাকাল—৪০৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—এ নাটকে চরিত্র সংখ্যা সোফোক্লেসের চাইতেও বেড়ে গেছে—মোট চরিত্র সংখ্যা—১০ জন এবং আরগিভের মেয়েরা খোরাস। এউরিপিদেসের খোরাস আর মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নেই। নাটকে মোট লাইন সংখ্যা ১৬৯৩, তার মধ্যে খোরাস্ ও সেমি-খোরাসের মিলিত লাইন সংখ্যা ১৭৩, কথোপকথন সংখ্যা ১৫২০ লাইন এ ক্ষেত্রে ক্রম বিবর্তনের আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৪। এর পরে আর একজন নাট্যকারের আর একটি নাটকের আমরা উল্লেখ করব। যদিও তিনি ট্র্যাজেডি রচয়িতা ছিলেন না, ছিলেন "ওল্ড কমেডির" (Old Comedy) রচয়িতা, তবুও এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাটকের গঠনভঙ্গিও বিশ্লেষণ করা দরকার।

আইস্খ্যলস্ থেকে এউরিপিদেস্ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির একটি অখণ্ড ধারা যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি প্রাচীন গ্রীসে কমেডির অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে ছিল না। 'গ্রীকরা কেবল ট্র্যাজেডির বেদনা বিধুর সঙ্গীতেই বিমুগ্ধ হয়ে থাকত না, তারা কমেডি থেকেও জীবনের আনন্দোজ্জ্বল চিত্রায়ণে খুশী হত।

খ্রীঃ পূর্ব ৪৮৬ অব্দে দিওন্যুসাসের উৎসবে কমেডি এসে যুক্ত হয়। দিওন্যুসাসের প্রাচীন উৎসবের মধ্যেও জীবনের হাস্যরসাত্মক ও অশ্লীল উপাদান যুক্ত হয়েছিল।

কমেডির প্রধান মৌলিক উপাদান হল আত্তিকার "কোমাস্" (Attic Comus), এটা একটা জনপ্রিয় গ্রাম্য অনুষ্ঠান ছিল। একদল কৌতুকপ্রিয় গ্রাম্য জনতা দিওন্যুসাসের সম্মানেই তাঁর নীতিহীনতার বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে শোভাযাত্রা করে গান গাইতে গাইতে যেত। এই কোমাস্ সঙ্গীত থেকেই 'কমেডি' (Comedy) নামের উৎপত্তি। 'কোমা'দের দল অনেক সময়ে 'মাস্ক' (Masks) জাতীয় নাটক লিখত অথবা নিজেদের নানান

পশুর আকৃতিতে সজ্জিত করে নিত—কখন পাখীর মত, কখন ঘোড়া, কখন ব্যাঙ্। এরাই দলবদ্ধ ভাবে আদি 'কোমাসে' খোরাসের কাজ চালাত। পরবর্তীকালে কমেডি যখন পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পেল তখনো এই জীবজগতের চরিত্রায়ণ তার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রইল। যেমন আরিস্তোফানেসের "দ্যা বার্ডস্" (The Birds) বা "দ্যা ফ্রগস্" (The Frogs) নাটকে আমরা খোরাসের ভূমিকায় পাখী ও ব্যাঙ্দের দেখতে পাই। আদিম সভ্যতার কাল থেকে জীবজগতের অনুকরণ প্রবৃত্তিই এর মূল কারণ। কোমাসের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছিল একদিকে নিকটবর্তী "মেগারা" (Megara) সহরের "বার্লেস্ক" (Burlesque) ধরনের অতি অমার্জিত সাধারণ উৎসবের উপাদান, অন্যদিকে এসে যুক্ত হয়েছিল "হিতারিয়স্" (Hitarious) ধরনের অত্যন্ত অশ্লীল উত্তেজনাপূর্ণ "কোর্দাক্স" (kordax) নৃত্য।

এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ওল্ড কমেডির (Old Comedy)—তা ছিল অনিয়ন্ত্রিত, অদ্ভুত, অশ্লীল, তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ এবং উদাত্ত গীতিকাব্য মণ্ডিত। এ এক কাল্পনিক জগতের রূপায়ণ আবার তার সঙ্গেই সর্বশেষ মুখরোচক কাহিনী ছড়িয়ে থাকত। নিম্নশ্রেণীর মানুষের হৈ হুল্লোড়ের মাঝেই অতি সহজে স্থান করে নিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব। আরিস্তোফানেস্পন্থীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই নারী স্বাধীনতা, ও শান্তির মহৎ বাণীর রূপায়ণ আর ওরি মধ্যে অনুরণিত হয়ে উঠেছে—অতি মধুময় কাব্যধ্বনি। যেমন আরিস্তোফানেসের দ্যা বার্ডস্ নাটকে নানান বাঁদরামির মধ্যে বুলবুলের সুমধুর গীতি লহরী অনুরণিত হয়ে উঠেছে,

……"O darling ! O tawny-throat
Love, whom I love the best,
Dearer than all the rest,
Playmate and partner in
    All my soft lays,
Thou art come : Thou art come ! ।
Thou hast dawned on my gaze,
I have heard thy sweet note,
Nightingale : Nightingale !……"

নাট্যকার আরিস্তোফানেসের (Aristophanes) নাটক "দ্য ক্লাউড্স (The Clouds)। নাটকে চরিত্র সংখ্যা খোরাস ছাড়া ১১ জন। রচনাকাল ৪২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—নাটকে মোট লাইন সংখ্যা ১৫১০, খোরাস সঙ্গীত ২৫৮ লাইন, কথোপকথন ১২৫২ লাইন।

পূর্বোক্ত এই ক্ষুদ্র হিসেবটির পর আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন যে খোরাল ট্র্যাজেডির মধ্য থেকে খোরাসের অংশ কত দ্রুত গতিতে কমে গিয়ে নাটকের অংশ বেড়ে যাচ্ছে।

এই ক্রমপ্রস্ফুট নাটককে রূপায়িত করবার জন্য মঞ্চে যে সমস্ত যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং কলা কৌশলের আবির্ভাব ঘটেছিল এখন আমরা তারি একটি চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব আর এও দেখাবার চেষ্টা করব যে এই যান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৎকালীন নাটকের গঠনভঙ্গি ও প্রয়োগ পদ্ধতি কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

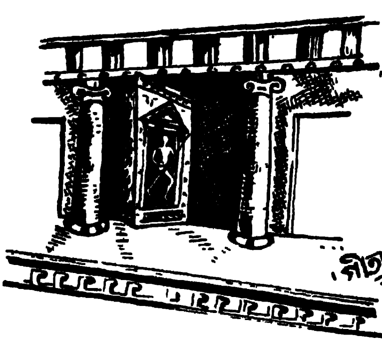
গ্রীকমঞ্চে অভিনয় কালে বহু ধরনেরই কৌশল অবলম্বন করা হত। রঙ্গালয় এবং প্রেক্ষাগারের আমরা যেমন স্থাপত্য ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রামাণ্য নিদর্শন পাই, যান্ত্রিক কৌশলের সে ধরনের নিদর্শন দুর্লভ। এ যুগের যান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অতিমূল্যবান দু'খানা স্থাপত্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ পাই। এই দু'খানাই রোমান যুগে রচিত হয়েছিল। একখানার রচয়িতা হলেন "ভিত্রুভিয়াস্" (Vitruvius) তিনি সম্রাট আগস্তাসের (Augustus) সমকালীন ছিলেন। অন্যগ্রন্থের রচয়িতা হলেন, সম্রাট "কম্মোডুসের" (Commodus) সময়কার "পোল্লুক্স" (Pollux)। এদের বিবরণে একটা প্রশ্ন থাকে যে তার কতটা ছিল তাদের যুগের বর্ণনা আর কতটা খাঁটি ক্লাসিকাল যুগের তথ্য। ভিত্রুভিয়াস্ ও পোল্লুক্স, এ দু'জনের কালের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় ২০০ বছরের। সুতরাং তারা দু'জনই যে সমস্ত জায়গায় একই সত্যকে ক্লাসিকাল যুগের বলে স্বীকার করেছেন তাকে আমরা তাদের যুগ প্রভাব না বলে ক্লাসিকাল যুগেরই সত্য বলে ধরে নিতে পারি।

এই দু'জন স্থাপত্য-বিশারদই স্কেনে ও মঞ্চের সংযোজনকারী তিনটি দরজার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যবর্তী দরজাটি প্রধান আর রয়েছে দু'টি পার্শ্ববর্তী দরজা। ক্লাসিকাল যুগের বিভিন্ন নাটকে এবং আমরা পূর্বোল্লিখিত আন্তিগোনের মঞ্চ নির্দেশেও তিনটি দরজার উল্লেখ পাই। তবে এযুগে এ তিনটি প্রবেশ পথই ছিল সর্বাধিক সংখ্যা। এগুলি যখন পাথরের স্থায়ী

স্কেনে গঠিত হয় তখন সর্বত্রই গৃহীত হয়েছিল। মাঝের দরজাটা হত বিরাটাকার ও প্রধান, এই দরজাটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, এরি সাহায্যে প্রাসাদাভ্যন্তরের দৃশ্য দেখানো হত—সেজন্য এটার সাজসজ্জাও ছিল বেশি। এই দরজার অলংকরণ হয়ত প্রকৃত স্থাপত্যের অংশ রূপে মাল-মশলা দিয়ে করা হত, নয়ত চিত্রিত পট ব্যবহার করা হত। এগুলিকে দরকার মত দৃশ্যানুযায়ী সরিয়ে নেওয়া যেত। 'পোল্লুক্স' হয়ত এই ধরনের দৃশ্যসজ্জাকেই 'ক্যাতাব্লেমাতা' (Katablemata) নামে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের মঞ্চসজ্জার উপকরণ ছিল—পশ্চাদ্‌যবনিকা (Back drops), যবনিকা (Curtains), "পিনাকেস্" (Pinakes) বা "ত্যাব্‌লেত্‌স্" (Tablets)। এগুলোর কাঠামো কাঠের ও ক্যানভাসের তৈরী হত—তার উপরে নাট্যোল্লিখিত দৃশ্য অঙ্কিত থাকত। ভিত্রুভিয়াস্ বলেছেন, যে ট্র্যাজিক্, কমিক্ ও সাত্যুরিক্ এই তিন শ্রেণীর কাব্যের জন্য আলাদা দৃশ্যপট তৈরী হত। তাঁর মতে এই অপসারণযোগ্য অঙ্কিত দৃশ্যপটেই সর্বপ্রথম দৃষ্টি বিভ্রমকারী পরিপ্রেক্ষিতের (Perspective) অনুশীলন হয়।

॥ গ্রীক মঞ্চে যান্ত্রিক পদ্ধতি ॥

১। পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত দৃশ্যাবলী ছাড়া এ যুগের প্রধান যান্ত্রিক কৌশল ছিল 'পেরিয়াক্‌তোই' (Periaktoi) এই পেরিয়াক্‌তোইর প্রকৃত



ক্ত পেরিয়াক্‌তোই।

আকার যে কি ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভিত্রুভিয়াস্ ও পোল্লুক্সের মতে এর আকার ছিল অনেকটা ত্রি-বেধ বিশিষ্ট "প্রিজ্‌মের"

(Prism) মত। তার তিনদিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত থাকত। তাদের ঘুরিয়ে দিয়েই দৃশ্যপট পরিবর্তন বোঝাত। একই শহরের অন্য একটি জনবিবাস দেখাতে হলে পেরিয়াক্‌তোই ডানদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হত, আর সম্পূর্ণ দৃশ্য পরিবর্তন বোঝাতে হলে দু'বার অর্থাৎ বাকি দু'পাশই ঘোরানোর রীতি ছিল। মঞ্চের দু'পাশে যে দু'টি দরজা ছিল তাদেরও ইঙ্গিতধর্মী বিশেষত্ব ছিল। তাদের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে বোঝা যেত যে তারা কোন নগরী বা বন্দর থেকে এসেছে। আর অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলে বোঝা যেত যে তারা স্বদেশ থেকে আসছে। হেলেনীয় যুগের আগে পর্যন্ত পোরিয়াক্‌তোইর কোন স্থায়ী স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। 'এলিস্' (Elis) থিয়েটারের দু'টি স্থানে পেরিয়াক্‌তোই ছিল বলে অনুমান করা হয়। এখানে একটি পাথর পাওয়া গেছে যার মাঝখানে বীম বসানোর জন্য গর্ত রয়েছে। মনে করা হয় এই বীমটি হত পেরিয়াক্‌তোইর অক্ষদণ্ড। পেরিয়াক্‌তোই এই বীমের সঙ্গে শক্তভাবে আটকানো থাকত এবং তার চারপাশে ঘুরত। দিওন্যুসাস্ থিয়েটারেও পাথরের গর্তে পেরিয়াক্‌তোইর বীম বসানো হত ও ঘোরানো হত। এই উপায়েই পরবর্তী হেলেনীয় যুগে "পের্‌গামোন্" (Pergamon) থিয়েটারে পুরো কাঠের সিন-বিল্‌ডিং পরিবর্তিত করা হত।[১৮]

পর পর তিনটি ট্র্যাজেডি এবং সাত্যুর অথবা একই নাটকের মধ্যে যদি তিনের অধিক দৃশ্য পরিবর্তন করতে হত তখন প্রিজ্‌মের যে দিকটা বাইরে আছে তা ছাড়া অতিরিক্ত পাখা দু'টিতে অতি সহজে এবং তাড়াতাড়িই দৃশ্য পরিবর্তন করে নেওয়া যেত। চতুর্থবার ঘূর্ণনের-সময় তাই আবার প্রয়োজন বোধে ট্র্যাজেডি, কমেডি বা সাত্যুরেরই কোন হয়ত নূতন দৃশ্য এসে যেত। দু'টি নাটকের মধ্যবর্তী বিশ্রামকালে আবার পেরিয়াক্‌তোইর পুরো দৃশ্যাবলীই পাল্টে নেওয়া যেত।

২। দ্বিতীয় যান্ত্রিক কৌশল ছিল "স্কেনা-ডুক্‌তিলিস্" এবং "স্কেনা-ভেরসিলিস্" (Scaena-ductilis and Scaena-versilis) এই পদ্ধতিতে কতকগুলি অপসারণযোগ্য অঙ্কিত দৃশ্য একটার পর একটা সজ্জিত করে রাখা হত, তাতে যখন সম্মুখেরটা তুলে নেওয়া হত তখন পেছনেরটা বেরিয়ে আসত ও নূতন দৃশ্য রচনা করত। এই পদ্ধতি বিশেষ করে "এক্যুক্লেমার" (Ekkyklema) সঙ্গেই ব্যবহারোপযোগী হত।

৩। পঞ্চম শতাব্দীর অন্যতম যান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল "এক্যুক্লেমা" বা সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদী (Moveable platform)। এর সমতুল্য কার্যোপযোগী ও বিস্ময়কর যান্ত্রিক কৌশল আর অধিক তৈরী হয়নি। এই "এক্যুক্লেমার"



দি এক্যুক্লেমা।

কৌশলটা ছিল অনেকটা বর্তমান প্যারাম্বুলেটারের মত চাকাওয়ালা একটা চৌকি যাকে ইচ্ছে মত মঞ্চে ঠেলে আনা যেত আবার মঞ্চ থেকে অপসাবণ করা যেত। এক্যুক্লেমাব বাবহার যে নাট্যকার আইস্খ্যুলসের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল তাব প্রমাণ আইস্খ্যুলসেব অ্যাগামেমনোন নাটকেব মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। অ্যাগামেমনোন ট্রয় যুদ্ধ থেকে বন্দিনী প্রেমিকা "কাস্‌সান্দ্রাকে" (Cassandra) নিয়ে ফিরলেন এদিকে স্ত্রী ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা ও তার প্রেমিক আইগিস্থাস্ তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে রেখেছে। অ্যাগামেমনোন এলেন; শুধু অন্ধ ভাগ্যই নয়, সঙ্গে সঙ্গে "চরিত্রই নিয়তি" (Character is destiny) একথাটিও প্রমাণিত হল—তার চরিত্রের অনেক ত্রুটিই ধরা পড়ল যার মধ্যে চরম পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে। অ্যাগামেমনোন অতি গর্বে আত্মস্ফীত হয়ে দেবভোগ্য সম্মান গ্রহণ করলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমেই কাস্‌সান্দ্রার ভারও ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রাব হাতে অর্পণ করলেন। কাস্‌সান্দ্রা দৈবক্ষমতাবলে ভবিষ্যৎকে দেখতে পেত তাই পরবর্তী নাটকীয় ঘটনার পূর্বেই উল্লেখ করল—

"পরিণীতা পত্নী এক, অন্যের সাহায্য নিয়ে
হত্যা করে স্বামীরে তাহার।"[১১]

এরপরেই দর্শকরা শুনল একটা কাতর চীৎকার। মঞ্চের মাঝের বিরাট

দরজাটাই এখানে রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ পথ—অ্যাগামেমনোনের মঞ্চ থেকে নির্গমনের সঙ্গে এ দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার তা উন্মুক্ত হল, রক্ত মাখা দেহে ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রা প্রবেশ করলেন এবং তার পেছনেই দেখা গেল নিহত অ্যাগামেমনোন ও কাস্‌সান্দ্রার দেহ সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে প্রবেশ করলেন আইগিস্থাস্।

মঞ্চে এই যে প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে অ্যাগামেমনোন ও কাস্‌সান্দ্রার মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা এর যান্ত্রিক কৌশলই এক্কুক্লেমা; এক্কুক্লেমায় করে ঠেলে তাদের অতি সহজেই নিয়ে আসা হয়েছিল।

সোফোক্লেসের "এলেক্‌ত্রা" (Electra) নাটকেও মঞ্চে এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক মঞ্চে কখন হত্যার দৃশ্য দেখানো হত না। এলেক্‌ত্রা নাটকেও অ্যাগামেমনোনের পুত্র ওরেস্তেস্, মাতা ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে হত্যা করে। রাণীর প্রণয়ী আইগিস্থাস্ মঞ্চে প্রবেশ করলে, প্রাসাদ দরজা খুলে এক্কুক্লেমার উপরে করে ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রার মৃত দেহ দেখানো হয়।

এর পরবর্তীকালে আরিস্তোফানেসের ব্যঙ্গ নাট্যের বহু স্থানেই এক্কু-ক্লেমার ব্যবহার দেখা যায়। তার নাটক "দি আখারনিয়াউসের" (The Acharniaus) মধ্যে রয়েছে যে, এউরিপিদেসের নাটকের একটি চরিত্র "দিকায়োপোলিস্" (Dicaeopolis) আথেন্‌সের একজন নাগরিক ছিলেন, তিনিই আরিস্তোফানেসের দি আখারনিয়াউস্ ব্যঙ্গ নাট্যের প্রধান চরিত্র। এই নাটকে তৎকালীন মঞ্চপদ্ধতি অনুযায়ীই দিকায়োপোলিসের গৃহে তিনটি দ্বার দেখা যাচ্ছিল। নায়ক অন্যান্য নাগরিক ও রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এই সময়ে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনায় একদল উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ আখারনিয়ার অধিবাসী প্যারোদোসের পথে অর্‌খেস্ত্রায় এসে প্রবেশ করল, এরাই নাটকে খোরাস। আখার-নিয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণে দিকায়োপোলিস্ বার্লেস্কের কায়দায় একটি কয়লার ঝুড়ি নিয়ে এসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ তার মাথায় আত্মরক্ষার জন্য এক অদ্ভুত পরিকল্পনার উদয় হল। তিনি ভেবে নিলেন এদের মাথায় করুণা জাগাতে হবে। অমনি দিকায়োপোলিস্ ছুটলেন এউরিপিদেসের খোঁজে সেখান থেকে এউরিপিদেসের "প্যাথেটিক্ প্লেয়" (Pathetic Play) বাস্তবধর্মী চরিত্রের কয়েকটি ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক

চেয়ে আনবার জন্য। এরপরে এউরিপিদেসের গৃহে, দিকায়োপোলিস্ এউরিপিদেসের ক্রীতদাস ও পরে এউরিপিদেসের যে দৃশ্য সেটি সত্যিই অভিনব।

ক্রীতদাস: (দরজা খুলে ও মাথাটা বাড়িয়ে)।
—ওখানে কে?
দিকায়োপোলিস্: এউরিপিদেস্ বাড়ি আছেন কি?
ক্রীতদাস: তিনি উপস্থিত আছেনও বটে এবং নেই ও বটে।
বুঝে দেখুন যদি পারেন।
দিকা: সে কি? তিনি রয়েছেন অথচ নেই?
ক্রীত: হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই; তিনি আকাশ কুসুম চয়নে
ব্যস্ত আছেন। তাঁর মনটা এখন বাড়িতে নেই
কিন্তু দেহটা রয়েছে। তিনি একটি উঁচু দাঁড়ের উপর
বসে; ট্র্যাজেডি রচনা করছেন। :২*

দিকায়োপোলিসের আগ্রহাতিশয্যে ক্রীতদাসটি বাধ্য হয়ে এউরিপিদেসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিল. এখানে মঞ্চে আমরা এক্যুক্লেমার এক সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই। ক্রীতদাস দরজা দিয়ে এক্যুক্লেমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। এক্যুক্লেমার উপরে বিছানায় শুয়ে আছেন—উপস্থিত কিন্তু অনুপস্থিত এউরিপিদেস্ এবং তাঁর সঙ্গে ট্র্যাজেডির ঝোলানো পোষাক ও অন্যান্য আসবাবপত্রের স্তূপ। এক্যুক্লেমা ঘুরিয়ে আনায় মুহূর্তেই মঞ্চ এউরিপিদেসের গৃহাভ্যন্তর হয়ে উঠল।

এই নাটকের মধ্যেই "ওল্ড কমেডির" একটি বিশেষ নাটকীয় গঠন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল "প্যারাবাসিস্" (the Parabasis) এতে খোরাস গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সোজাসুজিই দর্শকদের বিরাট সঙ্গীতপূর্ণ প্রশস্তিদ্বারা. সম্বোধন করে যুদ্ধতত্ত্ব নিয়ে তাদের দ্বন্দ্বের বিষয় বুঝিয়ে বলেছে। আরিস্তোফানেসের 'ওল্ড কমেডির' শেষের যুগে আমরা দেখতে পাব যে খোরাসের প্রাধান্য একেবারেই কমে আসছে। নাটকের পরিকল্পনা যদিও অলীক কল্পনা প্রসূত হত, তবু ব্যঙ্গ নাট্য হওয়ায় বিষয় বস্তুর উপর বাস্তব প্রভাব যথেষ্টই ছিল। তা ছাড়া খোরাসের উক্তি বাদ দিয়ে কথোপকথনের ভাষাও অনেক বেশি দৈনন্দিন, জীবনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। ফলে নাটকের মঞ্চের উপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে গিয়েছিল।

আরিস্তোফানেস্ গৃহের অভ্যন্তর দেখানোর জন্য এক্কাক্লেমাকেই পছন্দসই উপায় বলে মনে করতেন। তাঁর নারী জাগরণমূলক "থেস্মোফোরিয়াজিয়ুসি" (Thesmophoriazusae) নাটকেও এই যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখি। এক্কাক্লেমাও পেরিয়াক্‌তোইর মতই মুক্তাঙ্গন থিয়েটারের পক্ষে পূর্ণ উপযোগী ছিল। এক্কাক্লেমার সঙ্গে স্কেনা-ডুকৃতিলিসের সঞ্চরণশীল দৃশ্যপটের সংযোগ সাধন করে বর্তমানকালের সঞ্চরণশীল মঞ্চ ব্যবহারের কাছাকাছি ফললাভ করা যেত। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক আসনগুলি ধাপে ধাপে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য—এবং মঞ্চ নিম্নভূমিতে থাকার দরুণ কোন গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্যকে বাস্তবানুগ করার জন্য কোন ছাদওয়ালা দৃশ্য ব্যবহার করা যেত না। অতএব এমন দৃশ্যপটেরই অবতারণা করতে হত যা সহজেই সরিয়ে বা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। যেমন উপবেশনের জন্য সিংহাসন, বা অর্ধ-শয়নের জন্য কাউচ্, এগুলির নীচে চাকা দেওয়া থাকায় ঠেলে মঞ্চে এনে দৃশ্য পরিবর্তন করা যেত। অভিনয় বেদী হত অর্ধবৃত্তাকার বা চতুষ্কোণ একেই একটি কেন্দ্র বিন্দুর উপর অনেক সময় ঘোরানো হত সেটটা যখন ঘুরে সম্মুখে আসত তখন স্কেনের দরজা খুলে যেত। আবার সেট যখন সরে যেত দরজা বন্ধ হত। সেটের অংশ বিশেষ পরিবর্তিত করা হত এক্কাক্লেমার পদ্ধতি সাহায্যে আর তার দৃশ্য দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করা যেত স্কেনা-ডুকৃতিলিসের সাহায্যে।

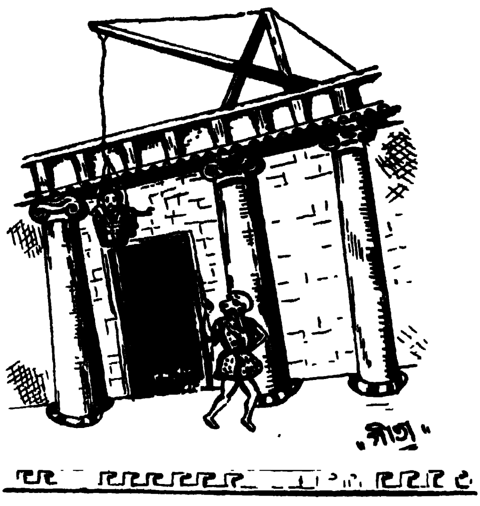
গ্রীক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ট্র্যাজেডি রচয়িতা এউরিপিদেসের যুগকে "বাস্তবতার আবির্ভাব কাল" (The Dawn of Realism) বলা হয়, কিন্তু আমরা যখন গিলবার্ট মারে লিখিত এউরিপিদেসের অনুবাদ পড়ি তখন তার খোরাসের উদাত্ত মধুর সঙ্গীত শুনে তার সঙ্গে "বাস্তবতা" কথাটির কোন সঙ্গতিই খুঁজে পাই না। কারণ এউরিপিদেস্ বাস্তববাদী এবং আধুনিক ছিলেন আইস্খ্যলস্ ও সোফোক্লেসের পরিপ্রেক্ষিতে। এউরিপিদেস্ সোফো-ক্লেসের মাত্র দশ বছরের ছোট ছিলেন—তবুও এঁদের মধ্যে যুগের ব্যবধান এসে গিয়েছিল, সোফোক্লেসের ছিল মানবচরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি। তিনি ভাগ্যকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছিলেন তেমনি দুঃখ বেদনার অগ্নিদহনে মানবচরিত্র যে মহত্ত্বে উদ্ভাসিত হয় তাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। সোফোক্লেসের আদর্শবাদ মানব জীবনের পরম সত্যকেই খুঁজেছে এবং তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে। এউরিপিদেসের মধ্যে এই আদর্শবাদ ছিল

না, ভাগ্য কিংবা জীবনের মহত্ত্বেও গাঢ় বিশ্বাস ছিল না। এউরিপিদেস্ বিচার করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন—যুক্তির আঘাতে বিশ্বাসের বনিয়াদ চূর্ণ করেছেন—তাই তিনি ছিলেন সে যুগের শ'। এক পেলোপোন্নেসিয়ার যুদ্ধ (Peloponnesion War) সম্পর্কেই এ দুই নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। বৃদ্ধ সোফোক্লেস্ এই সময়ে মরমী চিন্তাধারার দিকে এগিয়ে গেছেন—দূর থেকে যুদ্ধের এক আদর্শরূপই ছিল তাঁর কল্পনায়। কিন্তু এউরিপিদেস্ তখন তাঁর চারপাশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে গভীর ভাবেই যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারার জন্য সমকালের বুদ্ধিজীবীদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আইস্খ্যুলসের কল্পনায় দেবতারা যে এক ভয়ংকর শক্তির অধিকর্তা ছিলেন এউরিপিদেসের কাছে তাঁদের শক্তির সে অহংকার ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আথেন্সের পুরানো কিংবদন্তীগুলি এখন সন্দেহের চোখে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—বীরত্বপূর্ণ কার্য দৈনন্দিন জীবনের সংজ্ঞায় তার মোহিনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সমস্ত মোহের আবরণ ছিঁড়ে অসুন্দর বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলবার যে আধুনিক মনোভাব তাই এউরিপিদেসের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন জ্ঞান ও কিংবদন্তীর প্রতি এই সন্দেহ, তাঁর নাটকে এক বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এবং সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি নাটককে আধুনিক যুগের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে আনলেন। দু'টি জিনিস এউরিপিদেস্ তাঁর নাটকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ নাটকের চরিত্রগুলিকে তিনি আর আদর্শমানব চাননি তাদেব করতে চেয়েছেন বাস্তব ও সাধারণ। তাঁর নাটকে রাজা অ্যাগামেমনোনের কন্যা তেজস্বিনী এলেক্ত্রা এক দরিদ্র কৃষকের পত্নী—ছিন্নবাস পরে ঘড়ায় করে জল নিয়ে এগিয়ে আসে সে তার কুটিরের দ্বারে। আইস্খ্যুলস্ ও সোফোক্লেসের পর চিন্তার এই বৈপ্লবিক পরিণতি সত্যিই অভাবিত বিস্ময়কর। দ্বিতীয়তঃ এউরিপিদেস্ তাঁর চরিত্রগুলিকেই নাটকীয় ঘটনার দার্শনিক ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করেছেন। এই দুইটি ধারা অনুসরণ করার ফলেই এউরিপিদেস্ নাটকের গঠন শৈলীতেও পরিবর্তন নিয়ে এলেন। পূর্বে খোরাসই ছিল নাটকের প্রধান অংশ—ঘটনার তাৎপর্য উদ্ঘাটন ও দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রোতাদের কাছে তারাই করত। এউরিপিদেস্ চরিত্রকেই সর্বপ্রকার প্রাধান্য দিলেন, নাটকীয় ঘটনার মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে খোরাসকে

আর তিনি সংশ্লিষ্ট রাখলেন না। খোরাস মূল ঘটনার সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ সহ-ঘটনাকে ঘিরে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যই কেবল টিকে রইল। এ যেন আনুষ্ঠানিক শোভাবর্ধনমাত্র। নাটকে খোরাস নিজেদের যে অধিকার হারাল এউরিপিদেস্ তা খানিকটা মেটাবার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে দিলেন অতি উদ্ভাসিত, সুললিত, মনোগ্রাহী গীতিকাব্য, এবং খোরাস সঙ্গীতের সহকারী যন্ত্রশিল্পীদেরও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর বেশিরভাগ নাটকেই দর্শকদের প্রায় সমগ্র মনোযোগই প্রধান চরিত্রগুলি আকর্ষণ করে নেয় এবং সেখানেই সংলগ্ন হয়ে থাকে। এক কথায় বলা চলে—তাঁর নাটকগুলিতে খোরাস ও চরিত্রগুলির সংঘাতে সমৃদ্ধ নাট্যরূপের চেয়ে বেশি দেখা যায় গীতবহুল বিষ্কম্ভকের সমষ্টি।

৪। সোফোক্লেসের সময় থেকেই নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। নাট্যারম্ভে নাটকীয় চরিত্রগুলির পরিচয় দেওয়ার



দ্যা দেউস্-একস্ ম্যাখিনা।

জন্য এবং নাটকের বীজস্থাপনার জন্য কবির মুখপাত্র হয়ে কোন একটি ব্যক্তি "প্রোলোগে" (Prologue) তার বক্তব্য শোনাত। আবার নাটকের শেষে গঠনের দিক দিয়ে সমাপ্তি বোঝাবার জন্য "এপিলোগ" (Epilogue) ও বাধ্যতামূলক রীতি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এউরিপিদেস্ তাঁর নাটকে সমস্ত

রকম প্রাচীনকাহিনী ও কিংবদন্তী নিয়ে এমন নির্ভয়ে এগোলেন যে সেখানে চরিত্র পরিচয়মূলক প্রোলোগ্ একান্ত বাহুল্য হয়ে উঠেছিল, অন্য দিকে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ তিনি এমনই জটিল করে ফেলতেন যে তার সম্ভাব্য কোন পরিণতি তখন আর কবির আয়ত্তাধীন থাকত না—সুতরাং সমাপ্তি সূচক এপিলোগ্ ও হয়ে উঠেছিল অর্থহীন। নাটকের শেষরক্ষা করার জন্য এউরিপিদেসের হাতে তাই এমন কোন উপায় ছিল না যা এ যুগের গ্রাকমঞ্চ গ্রহণ করতে পারে। ফলে এউরিপিদেস্ তাঁর বহু নাটকেই এক অভিনব মঞ্চকৌশল গ্রহণ করে নাটককে এক আকস্মিক পরিণতির দিকে টেনে আনেন। তাই "দ্যা দেউস্-একৃস্ ম্যাখিনা" (The deus ex machina) মঞ্চ পদ্ধতি পরবর্তী কালেও তাঁর নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এই যান্ত্রিক পদ্ধতি হেলেনীয় যুগেও ছিল জানা যায়। এউরিপিদেস্ এই পদ্ধতি তাঁর নাটককে অযৌক্তিক পরিণতি ও বিশৃংখলার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রায়ই ব্যবহার করতেন। উপর থেকে দেবতা হয়ত দৈব আদেশ নীচের চরিত্রকে শোনাত। এউরিপিদেসের এলেকৃত্রা নাটকে আমরা দেখি ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রাকে হত্যা করার পর এলেকৃত্রার অনুভূতির জগতে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। নাট্যকার এখানে দৈব পীড়নকেই মুখ্য করেন নি, চরিত্র বিশ্লেষণ করে আত্মপীড়নকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ওরেস্তেস্ ও এলেকৃত্রা দু'জনেই চোখের জলে মাতা ক্ল্যুতাইম্‌নেস্ত্রার সর্বশেষের বেদনা ও করুণাপূর্ণ কথাগুলি ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার দেউস্-একৃস্ ম্যাখিনাতে স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব ঘটিয়ে সমাপ্তি আনলেন। আরিস্তোফানেসের নাটকেও আমরা দার্শনিক শ্রেষ্ঠ সোক্রেতিস্‌কে দেউস্-একৃস্ ম্যাখিনায় করে উর্ধ্বলোক থেকে নামতে দেখি।

এই যন্ত্রের সাহায্যে দেবতারা সিন বিল্‌ডিং-এর উপর থেকে আবির্ভূত হতেন।

॥ আরিস্তোফানেস্ ॥

আরিস্তোফানেসের "পীস্" (Peace) এবং "থেস্মোফোরিয়াজিয়ুসি" প্রভৃতি ব্যঙ্গ নাট্যে খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতেই "ফ্লাইং মেশিন" (Flying machine) বা উড়ন্ত যানের ব্যবহার দেখা যায়। আরিস্তোফানেসের 'পীস্' নাটক পেলোপোন্নেসিয়ার যুদ্ধ নিয়ে রচিত। এ নাটকে আথেন্‌স ও স্পার্টার

আত্মক্ষয়ী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাব্য নয়, ক্রন্দন ধ্বনি জাগরিত হয়ে উঠেছে। আথেন্সের এক নাগরিক "ত্র্যাগিউস্ (Trygaeus) যুদ্ধের সমাপ্তির চেষ্টায় নাটকের সুরুতেই এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এক গুবরে পোকাকে গোবর খাইয়ে খাইয়ে মোটা করছেন, যাতে সেটা অনেক বড় হয়ে যায়—কারণ তার পিঠে চেপে "ত্র্যাগিউস্" স্বর্গে যাবেন জেউসের কাছে যুদ্ধ বন্ধের দরবার করতে। এবং এই গুবরে পোকার উড়ন্ত যানে চেপে তিনি দেবলোকে যাত্রা করেন। এই উড়ন্ত যানটি ক্রেনের মত নীচ থেকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে যেত।

থেস্মোফোরিয়াজিয়ুসি নাটকেও দেখি নাট্যকার এউরিপিদেস্ একটি মহিলার হাতে বন্দী তাঁর শ্যালককে এই উড়ন্ত যানে করে এসে উদ্ধার করেন। আরিস্তোফানেসের ব্যঙ্গ-নাট্যে এই সব যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণও ছিল এউরিপিদেসের উপর আর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ আক্রমণ কারণ এউরিপিদেস্ তাঁর নাটকে যদৃচ্ছ যন্ত্রের সাহায্য নিতেন। পোল্লুক্স উল্লেখ করেছেন যে এউরিপিদেসের 'বেল্লেরোফোন্' (Bellerophon) ও "আন্দ্রেমিদা" নাটকের "পারসিউস্" চরিত্র এই উড়ন্ত যান ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া "এরেত্রিয়া" (Eretria) থিয়েটারে মঞ্চের নীচে ভূগর্ভের একটি পথ ছিল, পোল্লুক্সের মতে এটা ছিল মাটির নীচে একটি সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব ঘটত। হেলেনীয় যুগে এই পথ দিয়ে প্রোস্কেনিয়োনের নীচে থেকে অর্খেস্ত্রা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছন যেত। আইস্খ্যলসের "পারসিয়ানস্" নাটকে আমরা প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখি, তখন ভূগর্ভের পথ প্রথমে হয়ত ছিলনা, কারণ মঞ্চবেদীর পেছনে স্থায়ী স্কেনে তখন আসেনি। সেখানে ছিল রাজপথের গভীর খাদ—এখান থেকেই প্রেতাত্মার হঠাৎ আবির্ভাব ঘটতে পারত। চতুর্থ শতকেও আবার আমরা "মেদেয়া" (Medea) ট্র্যাজেডিতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখতে পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এর একটা পুরাতন ঐতিহ্য ছিল, যার জন্য পাতাল থেকে (Hades) প্রেতাত্মার আবির্ভাবের এক ভূগর্ভস্থ পথের কথা মঞ্চবিদ্‌দের ভাবতে হয়েছিল।

এই সমস্ত যান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়াও পোল্লুক্সের রচনায় কতকগুলি স্থাপত্য গঠন ও দৃশ্যসজ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়—যেমন উপরের তলা বা উচ্চবেদী যেখান থেকে দেবতারা বক্তৃতা দিতেন। নিঃসন্দেহে এগুলি পঞ্চম শতকেই

কাঠ দিয়ে তৈরী হত। কারণ এউরিপিদেসের "ফিনীসিয়ানস্‌" (Phoenicians) রয়েছে যে 'আন্তিগোনে' উপর তলা থেকে নীচে সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখছে। আরিস্তোফানেসের "উইমেন্‌ ইন্‌ কাউন্‌সিল"-এ (Women in council) মেয়েরা তাদের জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে, আইস্খ্যুলসের 'অ্যাগামেমনোন' নাটকেও পর্যবেক্ষণমঞ্চের (Watch tower) উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও মঞ্চোপকরণের মধ্যে কবরভূমি, সমাধিসৌধ, দেবদেবীর মূর্তি, পাথর ইত্যাদি দেখানো হত।

এউরিপিদেসের কাল পর্য্যন্ত গ্রীক নাটকে অনবরতই ভাঙ্গাগড়া চলেছে—তেমনি মঞ্চকৌশলের দিক দিয়েও নিত্য নূতন উপকরণের আবির্ভাব ঘটেছে। এউরিপিদেসের পরে মঞ্চের পশ্চাদ্‌পট ও আকৃতিও একটা স্থায়ী রূপ পেল এবং মঞ্চোপকরণ ও কলাকৌশলের মধ্যে তখন প্রথাগত ধারার আবির্ভাব ঘটল। ক্রমবিবর্তনের পথে নাটকের গঠনে ও বিষয়বস্তুতে যত বিস্তৃতি এসেছে মঞ্চের উপাদান ও যন্ত্রকৌশলও তত বেড়েছে। আবার যন্ত্রোপকরণের দিকে তাকিয়ে নাট্যকাররাও তাদের নাটকের দৃশ্য রচনা করেছেন ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সুতরাং পরস্পরের উন্নতি পরস্পরের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। একজন যেখানে এগিয়ে গিয়েছে, হাত বাড়িয়ে আর একজনকে সেখানে টেনে নিয়েছে, মঞ্চ ও নাটকের এই হল অভিযাত্রা।

মঞ্চের এত প্রকার উপকরণ কলাকৌশল ও যান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে এ ধারণা হতে পারে যে গ্রীকরা হয়ত বাস্তবানুগ অভিনয় করতেন। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। গ্রীকদের নাট্যকৌশল পুরোপুরিই "নাট্যধর্মী" ছিল। তারা বাস্তবের বিভ্রান্তি সৃষ্টির কখনই চেষ্টা করেন নি। তাদের প্রয়োগপদ্ধতি ছিল নাটকীয় ধারার অর্থাৎ অবাস্তবপন্থী (Non illusonistic or Presentational) তাদের দেউস্‌-এক্‌স্‌ ম্যাখিনা বা ফ্লাইং-মেশিনে করে মঞ্চে কারো আবির্ভাবের পর তারা আদৌ দর্শকদৃষ্টি সম্মুখ থেকে যান্ত্রিক কৌশলটি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন না। যন্ত্রটি স্পষ্টতঃই অভিনেতাকে নিয়ে আগমন বা নির্গমন করত। দর্শকরা এই যন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না—অভিনয়ের অংশ হিসেবে এগুলিকে তারা স্বীকার করেই নিয়েছিলেন।

॥ হেলেনীয় যুগ ॥

পূর্ব অধ্যায়ে গ্রীসের যে 'আত্তিক' যুগের কথা আলোচনা হয়েছে, সেখানেই ছিল খাঁটি গ্রীক নাটক এবং তার মঞ্চ-পরিকল্পনা। দিওন্যুসাসের জাতীয় উৎসব থেকে এর সুরু এবং বলা যায় নাট্যকার আরিস্তোফানেসের তিরোভাবে এর শেষ। কারণ আরিস্তোফানেস্ ও ওল্ড কমেডি বিদায় নেওয়ার পরে নাটকে ও মঞ্চে খোরাস তার প্রাধান্য একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল—আর তারি সঙ্গে বিদায় নিয়েছিল গ্রীক নাটকের ধর্মীয় ঐতিহ্য। এই খোরাসের বিবর্তনের সঙ্গেই মঞ্চে আর পুরো মাপের বৃত্তাকার অর্‌খেস্ত্রার প্রয়োজন রইল না। তাই দেখি হেলেনীয় যুগে "স্কেনে" এগিয়ে এসে অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের একেবারে কিনারা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। রোমান বিজয়ের পরে অর্‌খেস্ত্রা ছোট হয়ে এসে একটি অর্ধবৃত্তে দাঁড়াল এবং মধ্যকার দেববেদীটি অদৃশ্য হল। প্রেক্ষাগৃহও আকারে ছোট হয়ে এল, কারণ খোরাস-প্রধান অভিনয় যে বিপুল দর্শককে পরিতৃপ্ত করতে পারত, কথোপকথনবহুল মাঞ্চিক অভিনয়ে তা সম্ভব নয়। ক্রমশঃই এই প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত, উদ্ভবকালের প্রয়োজন প্রসূত খোরাস এবং অর্‌খেস্ত্রা কিছুই আর রইল না—এমন কি মুক্তাঙ্গনের সুবৃহৎ স্থাপত্য ও বিদায় নিল।

গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এল আর এক নূতন যুগ, নূতন অধ্যায়, তার নাম হেলেনীয় যুগ। প্রারম্ভেই আমাদের এই কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আথেন্‌সের প্রাধান্য-অবসানের সঙ্গেই গ্রীসের গৌরবময় যুগেরও অবসান ঘটেছিল। হেলেনীয় যুগ গ্রীক সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ। সুতরাং তাতে আড়ম্বর অনেক ছিল, ছিল অনেক কলাকৌশল—কিন্তু ছিল না প্রাণ প্রাচুর্যের উদ্দাম প্রকাশ যা যুগান্তকারী নূতন সৃষ্টিকে আনয়ন করতে পারে। এ যুগের মঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পূর্বে এ যুগের পরিক্ষীয়মান নাট্যপ্রচেষ্টার স্বরূপটি আমাদের জেনে নিতে হবে।

পুরানো দিনের আথেন্‌স ছিল গণতান্ত্রিক দেশ তা ধ্বংস হয়ে সেখানে আবির্ভাব ঘটেছিল বুর্জোয়া সভ্যতার। দেবতাদের অস্তিত্ব ক্রমান্বয়ে লোপ পেয়ে গেল, ঐশ্বর্যদেবতা "প্লাউতুস্" (Plutus) ছাড়া নগরবাসীর ভজনা করার মত আর কোন দেবতা রইলেন না। পুরাতন সংস্কৃতি অবশ্যই ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছাপ রেখে গিয়েছিল কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তি লোপ পেয়েছে—সহজ মনোমুগ্ধতার জন্য সে ধারণ করেছে কোমল রূপ।

সংস্কৃতির পীঠস্থান আথেন্স তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর, ক্ষমতা গ্রীসের এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রের হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যতদিনে না গ্রীসের শেষ ঐতিহ্যবাহী সম্রাট ম্যাসিদোনপতি আলেক্‌জেন্দার দ্য গ্রেটের আবির্ভাব হয়।

হেলেনীয় যুগের মঞ্চে আইস্খ্যলস্, সোফোক্লেস্, এউরিপিদেস্ এবং প্রাচীন কমেডির রচয়িতা আরিস্তোফানেসের রচনার পুনরাবৃত্তি অবশ্যই চলছিল। কিন্তু এ যুগের সৃষ্ট নাটক ছিল ট্র্যাজেডি বা ওল্ড কমেডিও নয় 'মিড্‌ল্‌ কমেডি'র (Middle Comedy) মধ্যবর্তী ধারা পার হয়ে আসা 'নিউ কমেডি' (New Comedy) এবং সর্বশেষে 'মাইমস্' (Mimes)।

ওল্ড কমেডির পরে "মিড্‌ল্‌ কমেডির" আবির্ভাব অতি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য হয়েছিল—বলা যায় পরবর্তী "নিউ কমেডির" প্রস্তাবনা রচনা করেছিল এই 'মিড্‌ল্‌ কমেডি'। মিড্‌ল্‌ কমেডির অস্তিত্ব খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ থেকে ৩৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়। বিবর্তনের দিক থেকে ওল্ড কমেডির সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য অনেকখানি। তৎকালীন সাহিত্য ও মূর্তি শিল্পের মধ্যে মিড্‌ল্‌ কমেডির যে সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় "মিড্‌ল্‌ কমেডির" উদ্ভব ওল্ড কমেডি থেকে হলেও ওল্ড-কমেডির বিষয় গাম্ভীর্য সে একেবারেই বর্জন করে এবং নিশ্চিতভাবেই "কমিক্" (Comic)-এর এক ভিন্ন ধারণার দিকে এগিয়ে চলে।

মিড্-কমেডির চরিত্রগুলি যে পোষাক পরত তাও খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের প্রাচীন কমেডির পোষাকের মতই "প্যাড্" লাগান বিরাটাকার ভুঁড়ি, নীচের দিকে সরু টাইট পোষাক, গায়ে ছোট ক্লোক ইত্যাদি হত কিন্তু যদি আমরা একটু সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করি তবে দেখব ওল্ড কমেডিতে প্যাড্ দিয়ে কোন কোন অংশে যে বাহুল্যের সৃষ্টি করা হত, মিড্‌ল্‌ বা মধ্য কমেডিতে তা অনেকটা কমে এসেছে। পোষাকের কৃত্রিমতা চলে গিয়ে তা হয়ে উঠল স্বভাবানুগ। আথেন্স নগরীর রাস্তায় ঘাটে যে নাগরিকদের দেখা যেত—মিড্‌ল্‌ কমেডির চরিত্রদের চেহারা অনেকটা যেন তেমনি। যে অদ্ভুত চেহারা আরিস্তোফানেস্ পছন্দ করতেন এ সে চেহারা নয়। মিড্‌ল্‌ কমেডিতে পুরাকাহিনীগত "হেরাক্লেসের" (Herakles) মত "বার্লেস্ক" (Burlesque) ধরনের চরিত্রও কিছু ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ রচনায়ই সৃষ্টি হত কতকগুলি নির্দিষ্ট টাইপ চরিত্র। যেমন ছিল, ছেলে কোলে বৃদ্ধা, সুন্দরী

বারবনিতা, বৃদ্ধ, যুবক, ক্রীতদাস ইত্যাদি। ওল্ড কমেডির চরিত্রের চেয়ে এগুলি অনেক বেশি ঘরোয়া হত এবং এদের আচরণও হত অনেক বেশি বাস্তবানুগ।

গ্রীক নাট্যেতিহাসে "নিউ কমেডি" আলেক্জেন্দার দ্য গ্রেটের সমকালের (৩৩০ খ্রীঃ পূঃ)। আমরা একালের নাটক ও অভিনয়ের বহু তথ্যই অভিনেতাদের পোড়ামাটির মূর্তি থেকে পাই। পুরাতন কালের কমিক্ চরিত্রগুলির অদ্ভুত ও বাহুল্যমণ্ডিত পোষাক চলে গিয়ে এসেছিল হেলেনীয় যুগের পিতা, পুত্র, ক্রীতদাস, বারবনিতা। কিছু কিছু অদ্ভুতাকৃতি মুখোশ থাকলেও বেশির ভাগ চরিত্র ও তাদের রূপায়ণই ছিল বাস্তবের কাছাকাছি।

এ যুগের কিছু কিছু সাহিত্যকীর্তি সৌভাগ্যবশতঃ কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে—এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত নাট্যসম্পর্কিত মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের বিচার করে আমরা কল্পনায় একালের প্রয়োগ রীতি কিছুটা প্রত্যক্ষ করতে পারি। নিউ কমেডির যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে তাতে কায়রোতে আবিষ্কৃত মেনান্দেরের (Menander) চার হাজার পংক্তি রচনাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন "ফিলেমোন্" (Philemon) "দিফিলস্" (Diphilus) "পোসাইদিপ্পস্" (Poseidippus) এবং "অ্যাপোল্লোদোরস্" (Apollodorus) তবে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে "মেনান্দেরের" মধ্যেই আমরা এযুগের সকল নাট্য-বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাব।

॥ মেনান্দের ॥

মেনান্দেরের জন্ম হয়েছিল ৩৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ও তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২৯২ খ্রীঃ পূঃ। তিনি ছিলেন মিড্ল্ কমেডির অন্যতম নাট্যকার "আলেক্সিসের" (Alexis) ভ্রাতুষ্পুত্র। উচ্চ বংশে তাঁর জন্ম—সামাজিক আচার আচরণ ও সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর ঔৎসুক্য—নাগরিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ধারাকে তিনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করতেন। দার্শনিক "এপিকিউরস্" (Epicurus) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক এবং বন্ধু। জীবন বিশ্লেষণে মেনান্দের তাঁর মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেন।

আরিস্তোফানেসের কল্পনার জগৎ তখন ছিল বিস্মৃতির অতলে। মেনান্দের নাটক রচনা করেছেন তাঁর কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্য, তাই সেখানে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের পরিবর্তে কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছিল এক ধরনের আধুনিকতা—সেখানে আমরা আমাদের চেনা জগৎই দেখতে পাই।

কমেডি থেকে আরিস্তোফানেসের উদ্দাম কল্পনা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই হো হো করা প্রাণমাতান হাসিও চলে গেল—মেনান্দেরের রচনায় প্রায়ই পাই মৃদু ঠোঁট বাঁকানো হাসি। এর মধ্যে যে চিন্তার অবগাহন আছে তা ট্র্যাজিক্ মঞ্চেরই যোগ্য। মেনান্দেরের রচনায় তাই দেখি—

"তুমি কে তা যদি জানতে চাও তবে সমধি ক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভগুলির দিকে তাকাও। ওখানে রয়েছে তাঁদের অস্থি ও ভস্মধূলি যাঁরা একদা ছিলেন সম্রাট, ছিলেন স্বেচ্ছাচারী কিংবা ঋষি। তাঁদের কারো বা অহংকার ছিল উচ্চকুলে জন্মের, ধনৈশ্বর্যের, বিষয় সম্পত্তির, অহংকার ছিল সুন্দর দেহকান্তির। কিন্তু এ সবকিছুই কালের অমোঘ বিধান থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে নি। মরণশীল সকল বস্তুর কাছে মৃত্যু আসবেই। এগুলির দিকে তাকাও এবং উপলব্ধি কর নিজের স্বরূপ।"[২১]

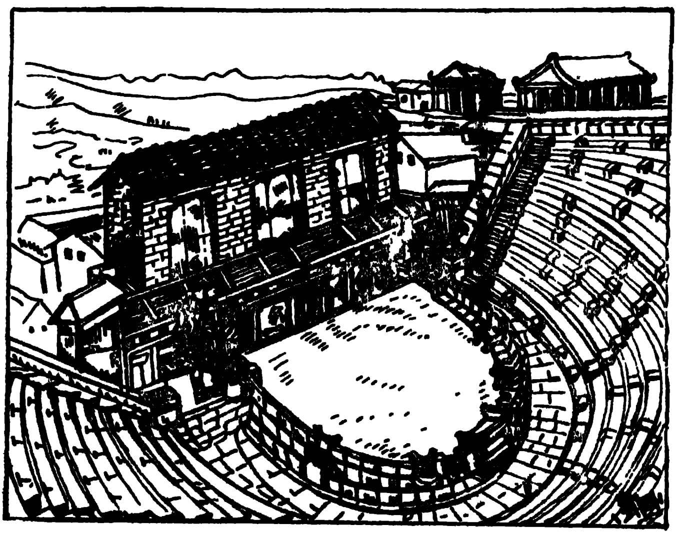
জীবনের এই নশ্বরতার দর্শনে নিউ কমেডির উপরে এউরিপিদেসের প্রভাব পরিষ্কার ভাবে দৃষ্ট হয়। এউরিপিদেসের প্রভাব তাঁর পরবর্তীকালে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এর প্রধান প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল পরবর্তীকালের ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের উপর—এবং তার পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল মেনান্দের প্রভৃতির রচনায়। এউরিপিদেসের এই প্রভাবের বৈশিষ্ট্য হল খোরাসের প্রাধান্য একেবারেই কমিয়ে দেওয়া, ব্যক্তি চরিত্রের উপর জোর দেওয়া—বিশেষ করে নারী চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া। অতি যত্নের সঙ্গে জটিলতম কাহিনী বয়ন করা; প্রণয় কাহিনীর প্রচলন করা এবং তাকে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করা। মূলতঃ এউরিপিদেসের ট্র্যাজেডির গতি ছিল "ট্র্যাজি-কমেডি"র দিকে। তাঁর যাত্রাপথের মূল প্রবণতা ছিল বীরকাহিনী থেকে বাস্তবানুগ কাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়া। তিনি চেয়েছেন আদর্শ ছেড়ে সামান্য সাধারণকে। তাঁর 'হেলেন' (Helen) প্রভৃতি নাটক খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের কমেডি রচয়িতাদের বিশেষভাবেই

প্রভাবিত করেছিল। এউরিপিদেসের শেষের দিকে রচিত 'আইওন্' (Ion) নাটকই একটু আধটু পরিবর্তিত করে মেনান্দেরের একাধিক নাটক রূপ পেয়েছে—যেমন "সামিয়া" (Samia) অর্থাৎ সামোস্ থেকে আগত মেয়েটি, "এপিত্রেপোন্তেস্" (Epitrepontes—The Arbitration) প্রভৃতি নাটকে। এই সকল নাটকে দেবচরিত্র, রাজকন্যা, অভিজাত ব্যক্তিরা সকলেই মধ্যবিত্ত নাগরিক চরিত্রের মতই আচরণ করেছেন। নিকল এর সমালোচনা করে বলেছেন, যে ৪র্থ শতক খ্রীঃ পূর্বাব্দে এসে নাটক তার খোরাল ট্র্যাজেডির রূপ পরিত্যাগ করছিল এবং অতি দ্রুতগতিতে ট্র্যাজেডি নাটকে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

বার্ণার্ড শ' তাঁর 'গ্রেট ক্যাথারিণ' নামক নাটকে লিখেছেন যে: ···কোন সুস্থ মস্তিষ্ক বা সুনিপুণ লেখক এমন নাটক রচনা করতে পারেন না যা রূপায়িত করা অভিনেতা বা মঞ্চকারের পক্ষে অসম্ভব। ···এমনি করেই লেখকরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন অভিনয় কলাকে ও নাটক মঞ্চায়িত করার প্রচেষ্টাকে। আবার লেখকের কল্পনায়ও পূর্বে যা ছিল অনাবিষ্কৃত, অভিনয় প্রতিভা দ্বারা সেই তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে অভিনেতাও করতে পারেন নাটকের প্রয়োগক্ষেত্রকে বিস্তৃততর।[২২]

নাট্যকারদের নাটকের দাবি মেটাতে মঞ্চে যেমন অনিবার্য ভাঙ্গাগড়া এসেছে, তেমনি অভিনেতাদের প্রাধান্যও মঞ্চকে এগিয়ে নিয়েছে অনেকখানি। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের শক্তিশালী ট্র্যাজেডির জন্য মঞ্চ-স্থাপত্যে আমরা পাথরের স্কেনে এবং প্যারাস্কেনিয়ার আবির্ভাব পর্যন্তই দেখি। এরপর খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে খোরাল ট্র্যাজেডি বিদায় নিলেও অভিনয় শিল্প আমরা অনেক বেশি উন্নত ধরনের হয়ে উঠতে দেখি। এ যুগে প্রতিভাবান ও শক্তিশালী অভিনেতারা চাইল যথাসম্ভব অভিজাত ধরনের রঙ্গভূমি, ফলে ট্র্যাজেডি ও কমেডির ক্ষেত্রে খোরাস ক্রমশই অবহেলিত হতে লাগল। নাটকও তার মূল উৎস-ভূমি থেকে অনেক দূরে সরে এল। চতুর্থ শতকের নাট্যাভিনয় আর দিওন্যুসাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা গ্রীসের জাতীয় উৎসব বলেই মাত্র চিহ্নিত রইল না। নাটক হল এখন চিত্তবিনোদনের বস্তুসম্ভার। সুতরাং ক্লাসিকাল যুগের বৃহৎ "অর্কেস্ত্রা" এ কালের নাটকীয় গুণ সম্পন্ন নাটকে অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে লাগল। অন্যদিকে পুরাতন ঐতিহ্য ও প্রথার প্রতি আনুগত্যের জন্য তা নাটক

ন্বা অভিনয় ক্ষেত্র থেকে একেবারে বিদায় নিতেও পারল না। তা রইল বিগত গৌরব দিনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কেবলমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার দায়ে। হেলেনীয় দর্শকদের কাছে প্রিয় নাটক ট্র্যাজেডি ছিল না, ছিল নিউ-কমেডি। নিউ-কমেডির উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিচরিত্র অঙ্কন এবং তার গভীর রহস্য রূপায়ণ। ফলে একালে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠল এই সমস্ত ব্যক্তিচরিত্রকে দর্শকের সম্মুখে অতি নিখুঁত পারিপাট্যের সঙ্গে উদ্ঘাটন করা। আর এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অভিনেতাদের ক্রমপ্রাধান্য, এবং মঞ্চ স্থাপত্যের পরিবর্তন। এই প্রয়োজন মেটাতেই গ্রীসে সর্বপ্রথম উচ্চতা বিশিষ্ট মঞ্চের আবির্ভাব ঘটল।



প্রিয়েনে থিয়েটার : পরবর্তী হেলেনীয় যুগে পুনর্গঠিত।

এযুগে সৃষ্ট সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ হল "প্রিয়েনে" (Priene) থিয়েটার—জন্মের পর থেকেই এই রঙ্গালয় অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এটাই ছিল হেলেনীয় যুগের নূতন থিয়েটারের একটা সুনির্দিষ্ট ছাঁচ। পুরানো স্থাপত্যের দিন বিগত হয়েছে, এখন কেবলমাত্র এই নূতন ধরনের রঙ্গমঞ্চই নবকালের চিন্তাধারা এবং অভিব্যক্তিকে প্রদর্শন করবার যোগ্য। এ যুগে সমগ্র নগরীর সাধারণ বাড়ির নক্সার সঙ্গেই রঙ্গালয়েরও নক্সা

তৈরী হত, এবং সম্ভবতঃ নগরীর অন্যান্য গৃহ ও প্রাসাদগুলির সঙ্গেই প্রেক্ষাগারেরও ভিত্তিস্থাপন ও নির্মাণ কার্য সুরু করা হত। প্রিয়েনের পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় যে হেলেনীয় মঞ্চ ক্লাসিকাল যুগের অশ্বক্ষুরাকৃতি মঞ্চেরই অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রায় ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে প্রেক্ষাগৃহে সম্মানিতের জন্য নির্দিষ্ট আসন গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় শতক খ্রীঃ পূঃ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও স্থায়ী পাথরের স্কেনে তৈরী হয়নি। এই পাথরের স্কেনের গঠন ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। পুরো মঞ্চ স্থাপত্যটি হত দোতলা, একতলার স্কেনে অংশটি সম্মুখে অর্‌খেস্ত্রার দিকে খানিকটা বেশি প্রসারিত থাকত। স্কেনের এই একতলা অংশের নীচু ছাদটি পাথরের বীমের মাঝে কাঠের তক্তা পেতে তৈরী হত। সম্মুখ ভাগে থাকত আয়ত আকারের পাথরের স্তম্ভশ্রেণী। এই স্তম্ভ ও উপরের বীমগুলির পার্শ্বে বল্টু আটকাবার গর্ত থাকত ফলে কাঠের তক্তাগুলিকে সহজেই পেরেক দিয়ে স্তম্ভের সঙ্গে আটকে দেওয়া যেত। এইভাবে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে একটা স্থায়ী কাঠামো তৈরী করা হত এবং সংলগ্ন স্তম্ভগুলির গায়ে স্থায়িভাবে কারুকার্য খোদিত থাকত। এর সঙ্গে সংলগ্ন থাকত সু-অঙ্কিত, সুসজ্জিত কাঠের প্যানেলগুলি। তাদের পাথরের কাঠামোর গা থেকে ইচ্ছা মত খুলে নেওয়া বা আটকিয়ে দেওয়া যেত।

"ভন্ গার্কেনের" (Von Gerken) মতে হেলেনীয় যুগে সমতল ছাদের উপরে যে দ্বিতীয় তলা ছিল তার সবদিকই আবৃত ছিল, কেবল খোলা ছিল একটি সম্মুখের দরজা। কিন্তু "বুলে"র (Bulle) মতে উপর তলায়ও নীচের তলার সমান্তরাল স্থানে প্রথম থেকেই পরপর তিনটি দরজা ছিল। এই তথ্যের প্রামাণ্য ভিত্তিই রয়েছে পরবর্তীকালের প্রিয়েনে থিয়েটারে। এই রঙ্গমঞ্চে দোতলার সম্মুখ অংশে মধ্যবর্তী দেয়ালের অংশ অত্যন্ত সরু করে এনে তিনটি বড় বড় প্রবেশ পথ বা দরজা তৈরী করা হয়েছিল।

"দেলোসে" (Delos) প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দের এক শিলালিপি থেকে আমরা হেলেনীয় মঞ্চের বিভিন্ন অংশের নাম ও একটি বর্ণনা পাই। এযুগের কাঠের তৈরী থিয়েটারে দু'টো অংশ থাকত, প্রথমটি "স্কেনে" ও দ্বিতীয়টি "প্রোস্কেনিয়োন্"। রঙ্গালয়ের প্রধান দোতলা বাড়িটাই ছিল স্কেনে আর "প্রোস্কেনিয়োন্" ছিল সম্মুখে সারি সারি স্তম্ভবিশিষ্ট একতলার বাড়তি বারান্দার মত অংশটি। এ ছাড়া ছিল 'পিনাকেস্' (Pinakes)—এই

পিনাকেস্ হল দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে সংলগ্ন প্যানেল। এই প্যানেলগুলিও নানাভাবে চিত্রিত করা থাকত। অনেক সময় আলাদা কাঠের বীমের দরকার হত—বক্তৃতা মঞ্চ বা প্লাটফর্ম তৈরীর জন্য। এই বক্তৃতামঞ্চ মানে বোঝাত প্রোস্কেনিয়োনের ছাদটি। এই সময়ে স্কেনের ছাদেও রং লাগান হত কচিৎ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে তখন প্রেক্ষাগৃহ একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ.ধারণ করেছে।

২৭৪ খ্রীঃ পূঃ প্রিয়েনে রঙ্গমঞ্চ আবার পুনর্গঠিত হয়। তখন স্কেনে পাথরে তৈরী হয় এবং তার পার্শ্ববর্তী প্যারাস্কেনিয়ার জন্য পাথরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্যারাস্কেনিয়াও স্কেনে গৃহের মত দোতলা হত। কতকগুলি পিনাকে আবার নূতন করে তৈরী হল এবং কতকগুলি পুনর্নির্মিত হয়। ২৪৬ খ্রীঃ পূঃ প্রেক্ষাগৃহের আসন সমূহও পুনরায় স্তরবিন্যস্ত হয়। কিছুকাল মধ্যে বক্তৃতামঞ্চের বা "লোগেইওনের" (Logeion) উপরেও পাথরের পিনাকে ব্যবহৃত হতে লাগল। লোগেইওনের পশ্চাতেও তিনটি বড় বড় প্রবেশ পথ দেখা যায়। এরপর 'ওরোপোস্' (Oropos) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্দিকে এক বিরাট প্রবেশ পথ দেখা যেত, যার মধ্য দিয়ে পেছনের পশ্চাৎপটের পিনাকে দেখা যেত। এই পিনাকেগুলিকে বলত "থ্যুরোমাতা" (Thyromata)।

প্রিয়েনে (Priene) ছিল একটি ছোট্ট, শিক্ষিত, কৃষি সমৃদ্ধ নগর ; কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এখানেই সর্বপ্রথম হেলেনীয় প্রোস্কেনিয়োন্ সংযুক্ত থিয়েটারের সূচনা হয়েছিল। 'বুলে' অনুমান করেন যে এই নূতন ধরনের রঙ্গমঞ্চের আরম্ভ হয় অ্যালেক্জেন্ড্রিয়া থেকে। এই যুগে প্রাচ্যের বহু মহানগরীতেই গ্রীসের সভ্যতা ও কৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছিল—অন্যদিকে তাদের প্রভাব থেকেও গ্রীস যে একেবারে বিমুক্ত ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন দেখি হেলেনীয় যুগের অনেক আগেই প্রাচ্যে প্রোস্কেনিয়োন্ সংযুক্ত রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় এই ধরনের প্রশস্তগৃহ যার প্রধান কক্ষের সম্মুখে থামওয়ালা বারান্দা রয়েছে এবং অনেক সময় তার দুই পার্শ্বে পাখার মত বিস্তৃত প্যারাস্কেনিয়ার মতও রয়েছে। এই বিশেষ গঠন ভঙ্গির মন্দির এবং প্রাসাদ অতি প্রাচীন এশিয়া মাইনর (Asia Minor) ইজিপ্ট (Egypt) এবং আসুর (Assur) সভ্যতার অনেক ভগ্নাবশেষ ও পোড়ামাটির স্থাপত্যের

মধ্যে পাওয়া যায়। এই ধরনের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি এখনও রয়েছে পারস্য (Persia) এবং ইরাকে (Irak)।

আমরা জানি হেলেনীয় যুগে গ্রীক ট্র্যাজেডির কোন উল্লেখযোগ্য বিবর্তনই হয়নি। মঞ্চে চলত পুরাতন ট্র্যাজেডি ও কমেডির পুনরাবৃত্তি, নোতুন ছিলেন এক মেনান্দের। সুতরাং নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোন উল্লেখযোগ্য বিবর্তনই হয়নি যা গোটা মঞ্চ স্থাপত্যকে এতখানি প্রভাবিত করতে পারে। তাই হেলেনীয় মঞ্চে যে পরিবর্তন এসেছিল তা মূলতঃ স্থাপত্যগত বিবর্তনেরই ফল। এযুগের গ্রীক স্থাপত্য অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও জটিল হয়ে উঠেছিল—তাতে যেমন বিভিন্ন ধারার প্রভাব এসে পড়েছিল তেমনি গ্রীক সভ্যতাও তখন হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী ও ঐশ্বর্যবিলাসী। তাদের অগণিত স্তম্ভশোভিত বিশাল স্থাপত্য গঠন তারি নিদর্শন।

হেলেনীয় যুগের এই মঞ্চ-স্থাপত্যের মধ্যে স্কেনে এবং পরবর্তী প্রোস্কেনিয়োন্ ক্লাসিকাল যুগের মতই এযুগেও সুসজ্জিত পশ্চাৎপট হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু প্রোস্কেনিয়োন্ প্রথমে পশ্চাৎপটের কাজ করলেও পরে এটাই প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল এবং প্রথম থেকেই প্রোস্কেনিয়োনের স্তম্ভ শ্রেণীর উপরে মঞ্চসদৃশ অলিন্দ ছিল। "লোগেইওন্" বক্তৃতা মঞ্চেরই অন্য নাম ছিল "পোদিয়াম্" (Podium)। দোতলায় এই মঞ্চের উপর দেবতার আর্বিভাব দেখা যেত। পরে এটি বক্তৃতামঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হত—আবার মাঝে মাঝে কোন বিশেষ একক অভিনেতা উঠে আসতেন। ক্রমশঃ এর পশ্চাতের দেয়াল বড় বড় প্রবেশ পথ ও অঙ্কিত প্যানেল দ্বারা সুসজ্জিত হতে লাগল—এবং দোতলার এই মঞ্চ একটি প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হয়ে উঠল। মঞ্চ উচ্চ করার ফলেই সম্মানিতদের জন্য কতকগুলি উচ্চ আসনের ব্যবস্থা হল।

আমরা জানি যে নিউ-কমেডি এসে পড়ায় খোরাসের স্থান ক্রমেই নাটক থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যেতে লাগল এবং খোরাসের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। লম্বা প্রোস্কেনিয়োন্ এই ভাবে মঞ্চের সকল প্রয়োজন মেটাতে লাগল। খোরাসের অভিনয় যেমন একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ উপভোগ করতে পারত, নিউ-কমেডির চরিত্র প্রধান কথোপকথনপূর্ণ অভিনয়ে তা সম্ভবপর ছিল না কারণ তা ছিল বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ। তাই নাটক এখন আর

সার্বজনীন আনন্দ উৎসব রইল না—রইল না প্রধান অভিনেতার ভূমিকায় বহু ব্যক্তির সমষ্টিগত খোরাস রূপ। কথোপকথনের মধ্যে চরিত্র সংখ্যা হত অল্প, সুতরাং তাদের অভিনয় ক্ষেত্রও হয়ে এল সংক্ষিপ্ত যাতে অভিনেতারা কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা সুষম রিলিফ চিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। বুলের বিশ্বাস যে এর পূর্ব হতে, চতুর্থ-শতক থেকেই মিড্‌ল্‌-কমেডির অভিনয় লোগেইওন্‌ বা উচ্চ মঞ্চের উপর হত। সর্বপ্রথম কাঠের উচ্চ মঞ্চ নাট্যকার মেনান্দেরের আবির্ভাব কালে আথেন্‌সে তৈরী হয়েছিল। নাটক অনুযায়ী কোন বিশেষ দৃশ্যাবলী রচিত হত না, এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রোস্কেনিয়োনের সম্মুখভাগ কারুশিল্প মণ্ডিত করে তোলা হল।

পূর্ব আলোচনা থেকে এই সমাধানেই আমরা উপনীত হতে পারি যে, উচ্চ মঞ্চ বা লোগেইওনের ক্রমোন্নতি সাহিত্য চিন্তার অগ্রগতিকে অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছিল। ল্যাকুর্গাসের থিয়েটারেই প্রকৃত পক্ষে ক্লাসিকাল ধারার পূর্ণ উপলব্ধি ঘটেছিল। নূতন ধারার মঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতি ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আথেন্‌সের পূর্বাংশে গৃহীত হয়। একই একতলার উচ্চতার পেছনে স্কেনে এবং সম্মুখে প্রোস্কেনিয়োনের একাঙ্গীভূত হওয়া মানেই উভয়দিক রক্ষার প্রচেষ্টা। একদিকে এগুলি সামনের অশ্বক্ষুরাকৃতি অর্‌খেস্ত্রায় গীতিমুখর খোরাস এবং প্রাচীন ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির আড়ম্বরময় পশ্চাৎপট হয়ে থাকত, অন্য দিকে নিউ-কমেডির উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজন মেটাত। অভিনেতাদের দেখা যেত পেছনে দেয়াল ও স্তম্ভশোভিত লোগেইওনের উচ্চ মঞ্চে, আবার সঙ্গীতশিল্পীরা স্কেনে থেকে অর্‌খেস্ত্রায় তাদের পূর্ব প্রথা মত যাতায়াত করতে পারত—তাদেরও পেছনে থাকত সু-অঙ্কিত পিনাকে ও প্রোস্কেনিয়োনের স্তম্ভ শ্রেণী। পাথর ও কাঠে তৈরী পেছনের দেয়াল ও সামনের স্তম্ভময় অলিন্দ এই সমগ্র স্থাপত্য গঠনটি দু'শ্রেণীর অভিনয় কালেই চমৎকার শ্রুতিগম্যতার সৃষ্টি করত।

প্যারাস্কেনিয়া যুক্ত থিয়েটার হেলেনীর যুগে খুব কমই নূতন তৈরী হয়েছে। এযুগের প্যারাস্কেনিয়া যুক্ত থিয়েটারের একটি উদাহরণ হল পাইরীন্‌সের রঙ্গমঞ্চ, সম্ভবতঃ এটা আথেন্‌সের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পূর্বেকার মঞ্চের সঙ্গে তফাৎ হল যে প্যারাস্কেনিয়ার সঙ্গে এতে আবার প্রোস্কেনিয়োন্‌ও সংযুক্ত ছিল। এটা ১৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তৈরী হয়েছিল।

অতএব মনে করা যায় যে, এটাই সম্ভবতঃ প্যারাস্কেনিয়া যুক্ত সর্বশেষ মঞ্চ।

ভৌগোলিক সীমা রেখায় প্রকৃত গ্রীক ভূমির উপরে যে সকল রঙ্গমঞ্চ ছিল হেলেনীয় যুগে তার স্থলে বিশেষ কোন নূতন রঙ্গমঞ্চ এল না— পূর্বেরগুলিই পুনর্গঠিত হল। হেলেনীয় যুগের প্রোস্কেনিয়োন্ পূর্বযুগের দুইপার্শ্ববর্তী প্যারাস্কেনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হতে লাগল। অনেক সময় প্রোস্কেনিয়োন্ পার্শ্ববর্তী প্যারাস্কেনিয়া থেকেও সম্মুখ দিকে বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ত; এর ফলে প্যারাস্কেনিয়া আবৃত বা অর্ধাবৃত হয়ে থাকত। এই একটি সংশোধনের জন্য পার্শ্ববর্তী ঢালু প্রবেশ পথের ব্যবস্থা হয়। এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল "এরেত্রিয়া" রঙ্গমঞ্চ। ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যে নূতন গৃহ বিনির্মিত হল সেটা সামনের দিকে এগিয়ে এসে ভিন্ন আর একটি স্তরের সৃষ্টি করল, ঢালু প্রবেশ পথ সামনের ভিত্তি দেয়ালের প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেল। এর পেছনে টিকে রইল "প্যারাস্কেনিয়া", রঙ্গমঞ্চের গঠন শৈলীতে যার আর কোনই প্রয়োজন রইল না।

চতুর্থ শতকে ম্যাসিদোনিয়ার রাজা পঞ্চম ফিলিপের অনুপ্রেরণায় গীতিকাব্য মুখর খোরাসের স্থান সুনির্দিষ্ট করে রাখবার জন্য অর্‌খেস্ত্রার চারদিকে একটা পাথরের বৃত্ত তৈরী করা হল। এপিদাউরসের প্রখ্যাত রঙ্গালয়েও দেখা যায় যে চুনা পাথরের এক ফুট মত উঁচু একটি দেয়াল অর্‌খেস্ত্রা ভূমিকে বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে। এটি পরবর্তী হেলেনীয় যুগেই তৈরী করা হয়েছিল।

হেলেনীয় যুগের এই হালকাবর্ণের চুনা পাথরের দেয়াল ঘেরা অর্‌খেস্ত্রা ক্রমশঃ এগিয়ে এসে প্রোস্কেনিয়োন্‌কে স্পর্শ করল কেবল প্যারাস্কেনিয়ার দুই পাশের বাড়তি অংশটাই বাকি রইল। কার্যতঃ অর্‌খেস্ত্রার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল—যেটুকু অস্তিত্ব ছিল তা কেবল প্রথাগত। এ সময়ে পুরাতন ট্র্যাজেডির অভিনয়েও খোরাসাঁও অর্‌খেস্ত্রার প্রাধান্য যথেষ্ট মেনে চলা হত না। দোতলার উপরে থ্যুরোমাতার সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৫টি এবং থ্যুরোমাতার মুখ বাড়িয়ে দিয়ে মঞ্চকে অভিনয়ের পক্ষে আরো বাস্তবানুগ করে তোলা হয়েছিল।

পুরাতন গ্রীকভূমি অর্থাৎ আথেন্‌স ও স্পার্টার ক্লাসিকাল মঞ্চপদ্ধতির

মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। রোমান অধিকারের পরে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের গোড়া সংগঠনের প্রভাব পুরাতন ক্লাসিক্ যুগের সংস্কৃতির উপর এসে পড়েছিল।

অন্যদিকে দক্ষিণ গ্রীসের অর্থাৎ "সিসিল্লি" (Sicilly) এবং ইতালির ক্রমবিবর্তনের রূপটি ছিল ভিন্ন রকমের। এই স্থানগুলি ছিল গ্রীক উপনিবেশ। এখানে প্যারাস্কেনিয়ার সঙ্গে কাঠের প্রোস্কেনিয়োন্ তৈরী হতে লাগল। এবং তার সঙ্গে রঙ্গালয়ে "ফ্ল্যুয়াকেসের" (Phlyakes)[২৩] জন্য অস্থায়ী মঞ্চ তৈরীরও ব্যবস্থা করে রাখা হত। গ্রীসের পূর্ব অংশের চেয়ে দক্ষিণ অংশে যে নূতন মঞ্চ নির্মিত হতে লাগল তার চাহিদা ছিল ভিন্ন সুতরাং গঠন ভঙ্গিও ভিন্নতর হয়ে উঠেছিল। তাই এই সময়ে "পম্পেঈ" (Pompeii—খ্রী: পূ: ২০০-১০০ অব্দে) "সেগেস্তা" (Segesta) এবং "ত্যুন্দারিস্" (Tyndaris) প্রভৃতি দক্ষিণাংশের রঙ্গালয়গুলিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—এইমঞ্চ পরিকল্পনায় দেখা যায় যে প্যারাস্কেনিয়ার অভ্যন্তরভাগ তির্যকভাবে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত ঘুরে গেছে, এবং তার ফলে মঞ্চের পাশের দিকের দর্শকরাও মঞ্চের অভ্যন্তরের দৃশ্যাবলী অবলোকনের সুযোগ পেত। "সেগেস্তা" এবং "ত্যুন্দারিস্" মঞ্চে দেখা যায় প্রোস্কেনিয়োন্ দু'দিকে প্যারাস্কেনিয়ার সম্মুখ দিক পর্যন্ত বর্ধিত, পম্পেঈতে দেখা যায় খ্রী: পূ: প্রথম শতকেই প্যারাস্কেনিয়া অবলুপ্ত হয়ে গেছে—এবং তার পরিবর্তে দোতলার লোগেইওনের পশ্চাদ্‌বর্তী দেয়াল সুসজ্জিত স্তম্ভ শোভিত হল এবং সেটাই হল প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র। "সেগেস্তা" এবং "ত্যুন্দারিস্"-এর উপরের দু'টি তলাও এই রকম অলংকৃত স্তম্ভ শোভিত ছিল, এবং সর্বোপরি ছিল ত্রিকোণাকৃতি একটি চূড়া। এই মঞ্চের নির্মাণ কার্য ছিল অতি নিপুণ ও চিত্তাকর্ষক।

পূর্বাঞ্চলে একমাত্র "ম্যাগ্‌নেসিয়া" (Magnesia) রঙ্গালয়েই এইরূপ স্তম্ভ শোভিত অলংকৃত দেয়াল দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই রঙ্গালয়টি পরবর্তী হেলেনীয় যুগে অর্থাৎ রোমান যুগের প্রারম্ভে তৈরী করা হয়েছিল।

খাঁটি হেলেনীয় যুগের প্রধান মঞ্চ বৈশিষ্ট্য হল থ্যুরোমাতা সংযুক্ত, অর্থাৎ বৃহদ্বার যুক্ত পশ্চাদ্‌দেয়াল। পেছনের দেয়ালে দুই স্তম্ভের মাঝে থাকত বড় প্রবেশ মুখ, যার ভিতর দিয়ে চিত্রিত এবং অলংকৃত অভ্যন্তর ভাগ দেখা যেত।—থ্যুরোমাতা শব্দের অর্থই হল "বিগ্ ডোর" (Big

door) বা বৃহৎ উন্মুক্ত দরজা। এ ধরনের আর একটি মঞ্চের উদাহরণ হল ক্ষুদ্র "ওরোপোস্" (Oropos) মঞ্চ।

এই প্রশস্ত ও সুগভীর থ্যুরোমাতা পশ্চাতের ছাদকে ধরে রেখেছে আর তারি মধ্যে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী হেলেনীয় সংস্কৃতির খেয়াল-খুশীভরা কল্পনা প্রবণ রুচির দৃষ্টান্ত। এই স্থাপত্য গঠনে ছিল একটা বিরাট শক্তি-মত্তার প্রকাশ। পরবর্তী হেলেনীয় যুগের এই থ্যুরোমাতা পূর্বেকার প্রোস্কেনিয়োনের স্তম্ভশ্রেণী ও তার মধ্যবর্তী চিত্রিত পিনাকেগুলির অপসারণ ঘটাল। মধ্যবর্তী স্থানের এই প্যানেলে সু-অঙ্কিত পিনাকের স্থানে এল সারি সারি অলংকৃত সমুন্নত স্তম্ভ। এইভাবে চিত্রিত পিনাকে সরে গিয়ে তা দোতলার থ্যুরোমাতায় অঙ্কিত দৃশ্যাবলী রচনা করল। চিত্রিত পাথরের টুকরো এবং ক্যানভাস পরবর্তী হেলেনীয় মঞ্চের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। কিন্তু পূর্বেকার পিনাকেগুলি পরবর্তীকালের থ্যুরোমাতার অভ্যন্তর ভাগের প্যানেলগুলির চাইতে অনেক বেশি গাম্ভীর্যপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্কিত ছিল, অন্য দিকে থ্যুরোমাতার অলংকরণ ছিল অনেক বাস্তবানুগ।

নিউ ইয়র্কের "মেট্রোপলিটান্ মিউজিয়ামে" কোন একজন ধনী রোমানের আদেশে অঙ্কিত এ যুগের তিনটি "সেটিং" দেখা যায়—তা হল ট্র্যাজিক্, কমিক্ ও সাত্যুরিক্ পদ্ধতির তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ। কিন্তু এই ধরনের মঞ্চপরিকল্পনায় কোন বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায় না, যাকে বিশেষ স্থান নির্দেশক বলে ধরা যায়। যেমন ট্র্যাজেডিতে রাজপ্রাসাদ, মন্দির, স্তম্ভশোভিত সমাধিক্ষেত্র, অথবা কমেডির নাগরিকদের বাড়ি, ঘর, বারান্দা, জানালা, নগরদৃশ্য কিংবা সাত্যুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, তরুশ্রেণী আচ্ছাদিত গ্রামাঞ্চল, পাহাড়, গুহা, সমুদ্রতীর, ইত্যাদি বহু কিছুই হতে পারত—কিন্তু তার বিশদ উদাহরণ আমরা পাইনি—পেয়েছি সব মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণার অভিব্যক্তি, নাট্যকাব্যের সহায়ক অঙ্গ হওয়া এযুগের সেটিংএর উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় নগরের বিপুল জনসমষ্টির মনোগ্রাহী হওয়া এবং তাদের আনন্দ বিতরণ করা।

হেলেনীয় মঞ্চের মূল গঠন বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রোস্কেনিয়োনের ক্রমবিকাশে—কালক্রমে প্রোস্কেনিয়োন্ আয়োজন ও আড়ম্বর সম্বলিত হয়ে উঠেছিল। তিনতলা অভিনয় গৃহের সম্মুখে পুরাতন ঐতিহ্য বহন করে যে অর্কেস্ট্রা ভূমি ছিল, প্রাচীন কাব্যগাথাময় খোরাস অভিনয় সেখানে হতই, তার সঙ্গে

সেখানে আসতে সুরু করলেন একক গায়ক ও স্বতোৎসারিত সঙ্গীতজ্ঞরা এছাড়া অর্কেস্ট্রায় আসতেন বাদ্যযন্ত্রবিদেরা এমন কি সর্বশেষে জাদুবিদ্যা-বিশারদেরাও এলেন। এই সময়েই প্রোস্কেনিয়োনের খানিকটা অংশ শ্রুতিগম্যতার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরী হত। একই মঞ্চের উপর পরস্পর নিরপেক্ষ দৃশ্যসজ্জা নিয়েও এই সময়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে 'নিউ-ট্র্যাজেডি', 'নিউ-কমেডি', ও 'মাইমের' অভিনয় চলত এখানে লম্বা 'পোদিয়াম্' বা দোতলা তিনতলার বারান্দার উপরে। এখানে অনায়াসেই 'নিউ কমেডির' গোপন ষড়যন্ত্রকারী ক্রীতদাস দৌড়াত, পালাত এবং প্রভুর হাতে ধরা পড়ে যেত। বিশাল মঞ্চ গৃহটি চারদিক দিয়ে আবৃত হত সম্মুখে অর্কেস্ট্রার বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত এক আশ্চর্য মনোগ্রাহী পরিবেশ রচনা করত। কিন্তু তারা যখন পর পর মঞ্চে এবং অর্কেস্ট্রায় অভিনয় চালাতে চেষ্টা করত, তখন তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ ও বিভ্রান্তিকারী হয়ে উঠত।

হেলেনীয় মঞ্চের এই লোগেইওন্ ও অর্কেস্ট্রার বৈচিত্র্য আমরা সমকালীন ভিক্রুভিয়াসের বর্ণনা থেকে পাই। মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে অর্কেস্ট্রায়ও গায়কদের অংশ গ্রহণ নবীন হেলেনীয় যুগের সঙ্গে প্রাচীন দিথ্যুরাম্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনই সূচিত করে। ভিক্রুভিয়াসের তৈরী নক্সা ও তার নিয়মাবলী হেলেনীয় মঞ্চের রীতি থেকেই গৃহীত। মঞ্চের সম্মুখে যে অর্কেস্ট্রা বৃত্ত ছিল সেই ভূমিবৃত্তের মাঝে যদি একটি বর্গ আঁকা যায় তবে স্কেনের পাশে যে বাহুটি পড়ে, অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের মাঝখানের বিপরীত দিকের প্রথম বাহুটিই ছিল "প্রোস্কেনিয়োন্", স্কেনের সম্মুখ দেয়ালটিই হল প্রোস্কেনিয়োনের পশ্চাৎ সীমার দেয়াল। এটি তৈরী করা হত প্রথম রেখাটির সমান্তরাল করে বৃত্তের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত—অর্থাৎ এটি হত অর্কেস্ট্রার ছেদক।

অভিনয় মঞ্চটি তৈরী হত দশ থেকে বারো ফুট উচ্চে। তবে এই নিয়ম ছোট আকৃতির মঞ্চেই প্রযোজ্য ছিল—আথেন্সের বৃহদাকার মঞ্চগুলিতে এর ব্যতিক্রম ঘটত। প্রকৃতপক্ষে অর্কেস্ট্রার পরিমাপ এবং তার সঙ্গে গ্যালারীর আসনশ্রেণীর দূরত্বের উপর নির্ভর করত মঞ্চের উচ্চতা। লোগেইওন্ বা মঞ্চ কতটা গভীর হবে তাও ভূমিবৃত্তের পরিমাপের উপর নির্ভর করত। এটা অর্কেস্ট্রার ব্যাসার্ধের দশ ভাগের তিনভাগ হত। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক প্রোস্কেনিয়োন্ সম্বলিত রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি প্রধান অংশই অন্য

অংশের সঙ্গে তুলনামূলক পরিমাপে তৈরী করা হত। এর ফলে স্কেনে গৃহ, মঞ্চ, অর্‌খেস্ত্রা এবং সম্মুখবর্তী আসনশ্রেণী সবকিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণ সমন্বিত রূপ গ্রহণ করত। তাই পরবর্তী হেলেনীয় যুগের অতি উচ্চ অগভীর মঞ্চ বাস্তবানুগ ছিল না।

গ্রীক যুগের অবসানে এসে মঞ্চস্থাপত্যে তিনটি বিভাগ সুনির্দিষ্টভাবে দেখা দিল, এর প্রত্যেকটি বিভাগই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে উদ্ভূত হয়েছিল। অর্‌খেস্ত্রা ছিল প্রাচীন যুগের তৈরী, প্রেক্ষাগার ছিল ক্লাসিকাল যুগের এবং অভিনয় মঞ্চ ছিল হেলেনীয় যুগের তৈরী। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ এবং ভিত্রুভিয়াসের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে হেলেনীয় যুগে এই তিনটি ভাগের কেবলমাত্র মিলিত ভাবেই প্রকাশ ঘটেনি, তারা বিচ্ছিন্ন অংবে তৈরী হলেও ছন্দ ও সমন্বয়ের সূত্রে একীকৃত হয়েছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে অর্‌খেস্ত্রা ক্রমশঃই পরিমাপে ছোট হতে লাগল এবং মঞ্চগৃহ প্রেক্ষাগারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

গীতিকাব্য মুখর খোরাসের কাল শেষ হয়ে এসেছে সুতরাং খোরাসের বৃত্তও ছোট হয়ে আসতে লাগল। খোরাস আর এখন প্রেক্ষাগৃহের প্রথম আসন শ্রেণীর কিনারা পর্যন্ত ভূমি দখল করত না। এর বৃত্তটি এখন পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ এবং আসন শ্রেণীর সম্মুখবর্তী জলের নালার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে রইল। কোন কোন রঙ্গালয়ে আবার অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের কিনারে দেয়াল কিঞ্চিৎ উঁচু করা হল এবং সম্মানিতদের জন্য আলাদা আসন বৃত্তের মধ্যে স্থাপিত হতে লাগল। অন্যদিকে মঞ্চের সম্মুখ ভাগ অর্‌খেস্ত্রার খানিকটা অংশ দখল করে নিল। অর্‌খেস্ত্রা যদিও নিখুঁত অর্ধবৃত্ত ছিল কিন্তু প্রেক্ষাগারের প্রথম আসন শ্রেণী অশ্বক্ষুরাকৃতি গ্রহণ করেছিল। অর্‌খেস্ত্রা বৃত্তের দ্বিগুণ ব্যাস নিয়ে এই বহিস্থ বৃত্ত রচিত হত। ভিত্রুভিয়াস্‌ ক্লাসিকাল যুগের এই নিখুঁত গঠনভঙ্গির সাহসিক প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। পেছনে স্কেনে গৃহ এবং সম্মুখে উঁচু ধাপের আসনশ্রেণী থাকায় অভিনেতাদের বাক্যধারা ও সঙ্গীতস্রোত পূর্ণ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত।

প্রেক্ষাগৃহের আসনশ্রেণী প্রতি ধাপে দ্বিগুণ করে বেড়ে যেত। প্রথম ধাপের আসন শ্রেণী ছোট প্রেক্ষাগার হলে ছয় কিংবা আট পংক্তি হত আর বড় প্রেক্ষাগারের হত দশ কিংবা বারো পংক্তি।

ভিক্রুভিয়াসের মতামত আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তার মধ্যে ক্লাসিকাল যুগের মঞ্চের বাস্তব জ্ঞান যেমন একদিকে ছিল, তেমনি তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এসে আদর্শমঞ্চের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা। মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগারের বিভিন্ন অংশ যা হয়ত ভিক্রুভিয়াসের সমকালে ভাঙ্গাগড়ার পথে একটা ছন্দোবদ্ধ সংগতির দিকে এগিয়ে চলছিল তারি সম্ভাব্য পূর্ণপরিণতির কথা তিনি তার রচনায় আদর্শ মঞ্চের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ভিক্রুভিয়াসের পরে খাঁটি গ্রীক মঞ্চ আর প্রায় তৈরীই হয়নি —তার পরবর্তী কালে হেলেনীয় মঞ্চ রোমান পরিকল্পনায় হয়ত পুনর্গঠিত হয়েছে বা খাঁটি রোমান মঞ্চই তৈরী হয়েছে—সুতরাং ভিক্রুভিয়াস্ বর্ণিত খাঁটি গ্রীক মঞ্চের মধ্যে কতটুকু আদর্শ মঞ্চপরিকল্পনার সংমিশ্রণ ছিল তা আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা অসম্ভব। রোমান যুগের মঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতি ছিল অনেকাংশে ভিন্ন ধারার এবং বাস্তবানুগ। গ্রীক যুগে ভাঙ্গাগড়া চলেছে অর্কেস্ট্রাকে কেন্দ্র করে আর রোমান যুগের ভাঙ্গাগড়া ছিল মঞ্চকে ঘিরে।

॥ রোম ॥

সামরিক শক্তির বলে রোমানরা গ্রীস জয় করে নিয়েছিল—এ যেমন ছিল ঐতিহাসিক সত্য আবার গ্রীসের সমুন্নত সভ্যতার কাছে রোম পরাজয় স্বীকার করেছিল—এও ছিল তেমনি সত্য।

বিজয়ী রোমানরা কিন্তু আপন অহমিকা ত্যাগ করে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রথমেই গ্রীক সভ্যতাকে গ্রহণ করেনি; করেছে প্রাথমিক বাধা অপসারিত হয়ে যাওয়ার পরে খানিকটা অসতর্কভাবে বিলাস ব্যসনের পথে। উৎসব দিনে ধীরে ধীরে গ্রীসের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রবেশ লাভ করল এবং এই পথেই গ্রীসের চিত্র, ভাস্কর্য, দর্শন, ধর্ম প্রবেশ লাভ করল রোমে।

গ্রীসের দক্ষিণাংশে যখন ট্র্যাজেডি এবং তার সঙ্গে নিম্নস্তরের মিলনান্ত কৌতুকের অভিনয় চলত—রোমান রিপাব্লিক্ কিন্তু তখনও ছিল সভ্যতাবিহীন। প্রথম যুগে রোমে তার নিজস্ব আদিপ্রথার নাটকই অভিনীত হত। এর নাম ছিল "ভের্সুস্ ফেসেন্নিনি" বা ফেসেন্নির পদ্য (Versus Fescennini)। "লাতিয়ুম্" (Latium) এবং 'এত্রুরিয়ার' (Etruria) মধ্যবর্তী "ফ্যালিস্কি"র (Falisci) নামানুসারে এই নাম হয়েছিল। এ ছাড়া শস্যকাটার উৎসবে শস্যদেবতা "সিলভ্যানুস্" (Silvanus) এবং "তেল্লুসের" (Tellus) সম্মানে জনপ্রিয় হাস্যকৌতুক, ব্যক্তিগতব্যঙ্গ ইত্যাদির অভিনয় চলত। কিন্তু এই আদিম উৎসব অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ এত দুর্নীতিমূলক হয়ে উঠতে লাগল যে তা আইন করে বন্ধ করে দিতে হল। দক্ষিণ ইতালি ও সিসিল্লিতে মেনান্দেরের নাটক এবং তার সঙ্গে "ফ্ল্যুয়াকেস্" (Phlyakes) মঞ্চ ও "মাইম" বিস্তৃতি লাভ করেছিল। রোমান যুগে এত্রুরিয়ার গ্রাম্য সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে "মাইমস্" ও বিস্তার লাভ করে। এত্রুরিয়ার সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীরা সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৩৬৪ অব্দে রোমে এসেছিল, এবং তাদেরই প্রচারিত "এত্রুস্কান্, মাইমেটিক্" (Etruscan mimetic) নৃত্যের সঙ্গে রোমানদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত "ফেসেন্নিনি ভার্স" যুক্ত হয়ে "সাত্যুরা" বা "ফ্যাবুলায়ে সাত্যুরায়ের" (Fabulae Saturae) সৃষ্টি হল। এই "সাত্যুরার" একটা নিজস্ব ছন্দ ছিল এবং এগুলি দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা নিয়ে রচিত হত। রোমের এই সাত্যুরা কিন্তু গ্রীক সাত্যুর নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এতে থাকত নানান বিচ্ছিন্ন ঘটনা সম্বলিত নাটকীয় নকশা।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোমে নাটকের এই অসংস্কৃত অবস্থার শেষ হল। সেখানে আসতে লাগল গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডির অনুবাদ। রোমে "লুদি রোমানি"[১] (Ludi Romani। বা রোমান উৎসবে গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন "লিউয়িয়ুস্ আন্দ্রোনিকুস্" (Livius Andronicus)। বিভিন্ন "লুদি"র পরিচালনার ভার ছিল নাট্যপরিচালকদের উপরে।

এই অভিনয়ে অভিনেতাদের মুখোশ থাকত না, কিন্তু মাথায় তারা পরচুলা ব্যবহার করতেন। গ্রীক নাটকে মুখোশ ব্যবহার করায় অভিনেতাদের সংখ্যা কম হলেও চলত, তার তুলনায় রোমে অভিনেতার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। উৎসবদিনগুলিতে মন্দির সম্মুখে খেলাধুলা বা দৌড়প্রতিযোগিতা অথবা "গ্লাদিয়েতর্" (Gladiator) দ্বন্দ্বযুদ্ধের নির্দিষ্ট স্থান ইত্যাদি কোন সাধারণ সমাবেশ ক্ষেত্রের সম্মুখে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে করা হত। এই মঞ্চটির নাম ছিল "পুল্পিতাম্" (Pulpitum)। উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ দৃশ্যাভিনয়ই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

রোমের এই "পুল্পিতাম্" মঞ্চ ছিল গ্রীসের ফ্ল্যাক্সাকেস্ মঞ্চেরই অন্যতম সংস্করণ। এই ধরনের মঞ্চ রোমে এসেছিল দক্ষিণ ইতালির ফার্স অভিনয়ের সঙ্গে। রোমে এসে এই ইতালীয় ফার্সের নাম হয়েছিল "ওস্কান্ ফার্স" (Oscan Farce)। রোমের প্রথম কবি নাট্যকার "প্লাউতুস্" (খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ Plautus), এই ধারা অনুসরণ করেই তাঁর যে ২১ খানা কমেডি পাওয়া গেছে তা রচনা করেন। তাঁর আদর্শ ছিল—"মেনান্দের", "ফিলেমোন্" এবং "দিফিলাস্" প্রভৃতি নাট্যকারদের লিখিত "আত্তিক্ নিউ কমেডি" (Attic New Comedy)। এই ধরনের কমেডির চরিত্রগুলি হত কতকগুলি নির্ধারিত 'টাইপ' চরিত্র। এতে থাকত একজন হা-ঘর ভদ্রযুবক, একজন সভাতরুণী, তার পিতা, মাতা, একজন ক্রীতদাস প্রভৃতি চরিত্র। প্লাউতুসের নাটকে "নিউ কমেডির" ধারার সঙ্গে রোমের নিজস্ব ফার্স মিলিত হয়েছিল। প্লাউতুসের মধ্যে ছিল প্রবল ব্যঙ্গবোধ ও উচ্চহাস্যের বস্তুসম্ভার। প্লাউতুস্ তাঁর এই রচনাকে বলেছেন, "ত্রাগি-কমোদইয়া" (Tragicomodia) অর্থাৎ "ট্র্যাজিক্-কমেডি" (Tragic-Comedy)। পরবর্তী কালে রেনেসাঁস্ যুগের ফরাসী নাট্যকার "মোলিয়েরের" (Moliere) উপর প্লাউতুসের নাটকের

রচনাকৌশল বিশেষভাবে ছায়াসম্পাত করেছিল—এবং পরস্পরকে ভুল চেনা থেকে এখানেই সূত্রপাত হয়েছিল শেক্‌সপীয়রের "কমেডি অব্‌ এরারস্‌" নাটকের।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে হেলেনীয় যুগের প্রভাব রোমান ট্র্যাজেডি ও কমেডি রচনার উপর এসে পড়ল। এমন কি গ্রীক ভাষায়ও অভিনয় হতে লাগল। গ্রীক নাট্যাভিনয় দর্শন অভিজাত রোমানদের ব্যসন হয়ে উঠল। নাটকের পথেই গ্রীক সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস রোমে প্রচার লাভ করেছিল। তাই এযুগেই একদিকে এলেন রোমান ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার "এন্নিয়ুস্‌," "পাকুভিয়ুস্‌", "আক্কিয়ুস্‌" (Ennius, Pacuvius, Accius) অন্যদিকে এলেন কমেডির কবি "কাইকিলিয়ুস্‌" এবং "তেরেন্স" (Caecilius, Terence)।

এই ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল "মাইম্‌", তা হাটে বাজারে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে অভিনীত হতে লাগল। মাইমের অভিনেতারা ছিল ভ্রাম্যমাণ দল। সার্কাসের লোকদের মত তারা নানা রকম শারীরিক কলাকৌশলও প্রদর্শন করত।

রিপাব্লিকের শেষের দিকে রোমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হত—আবার হয়ত একই "লুদি"র উৎসবে দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুষ্ঠান দেখান হত। সেখানে নাট্যকাব্য ছাড়াও, নানান ক্রীড়ার প্রদর্শন, রথ চালানোর প্রতিযোগিতা, বাইরের সার্কাস বা রঙ্গভূমিতেই চলত পশুযুদ্ধ বা গ্লাদিয়েতরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এই সর্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট থাকত নাট্যাভিনয়ের জন্য; যেমন "লুদি রোমানির" (Ludi Romani) ১৫ দিন উৎসবের মধ্যে ৫ দিন চলত নাট্যাভিনয়।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে রোমের এই সব নাট্যাভিনয় সাধারণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ সমাবেশ ক্ষেত্রেই হত। আর এটা অতি সহজবোধ্য যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যে নাট্যাভিনয় হত, তা গুরুগম্ভীর বা বিয়োগান্ত রসের হত না। এই জন্য গ্রীসের ব্যঙ্গ নাট্য ফ্ল্যায়াকেসের অনুকরণই তারা বিশেষভাবে করত এবং গ্রীক ফার্সেরই মঞ্চ "ফ্যাবুলায়ে আতেল্লানায়ে" (Fabulae Atellanae) সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। "লুদি প্লেবিয়া" ছিল জনপ্রিয় ক্রীড়ারঙ্গ, এগুলি হত হাটে বাজারে—এ সমস্ত জায়গায়

সম্ভবতঃ দর্শকরা অস্থায়ী কাঠের বেঞ্চির উপর বসত। কর্নেতোরের এক দেয়াল চিত্রে এই ধরনের আসন ব্যবস্থা অঙ্কিত দেখা যায়।

খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ অব্দে মঞ্চের সন্নিকটেই সেনেটরদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ আসনাবলীর ব্যবস্থা করা হয়। সেনেট কিন্তু প্রথম থেকেই নাট্যাভিনয়ের প্রবল বিরোধিতা করে আসছিল। কারণ এটা সর্বদিক দিয়েই ছিল গ্রীক সংস্কৃতির কাছে অবনত মস্তকে ঋণ স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু বিজয়ীর গর্ব তারা সহজে ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাই বাধার পরে বাধা আসতে লাগল—খ্রীঃ পূঃ ১৫৪ অব্দে থিয়েটারে বসবার আসন উঠে গেল কারণ সেনেটের মতে বসে বসে অভিনয় দেখাটা নিতান্তই স্ত্রীসুলভ—ওটা ছিল গ্রীকদের মেয়েলী বিলাস, রোম নগরে গা' এলিয়ে থিয়েটার দেখা চলবে না। অতএব এর পরে সাধারণ দর্শকরা নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অভিনয় দেখতে লাগল। দাঁড়িয়ে দেখার আইন থেকেই বোঝা যায় যে ইতিপূর্বে বসে দেখবার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আবার বছর দশেকের মধ্যেই রঙ্গালয়ে সমান্তরালভাবে বসবার আসন পড়তে লাগল। কারণ তখন আবার রোমের ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রীক ধর্ম, দর্শন ও "বাকৃখাইক্ মিস্ট্রির" (Bacchaic Mysteries) পুনরাগমন সুরু হয়েছে। রোমানরা গ্রীক ভাবধারায় ভাবিত হতে সুরু করলেন—সুতরাং নাটকের গতিপথও হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য।

একথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও রোমান সংস্কৃতি ছিল তার নিজস্ব রুচি প্রকৃতিতে ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর। রোমে এসে গ্রীকনাটক তার পূর্বধারা সামান্যই বজায় রাখতে পেরেছে। মূল গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবাদ চলত বটে কিন্তু রোমান ল্যাটিন ট্র্যাজেডি গ্রীক ট্র্যাজেডির বিরাট ব্যাপ্তি এবং বিপুল গভীরতা ও গাম্ভীর্য নিয়ে আসতে পারেনি। ট্র্যাজেডির রসের আদর্শ ধরতে না পারায় ল্যাটিন ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসপ্রধান "হরর্ ট্র্যাজেডি"তে (Horror Tragedy) পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে রোমের ট্র্যাজেডি কিংবা কমেডি ও ফার্স এই উভয় শ্রেণী থেকেই খোরাস ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু ল্যাটিন কমেডির চরিত্র এবং নাটকীয় বিষয়বস্তুগুলি মোটামুটি তৎকালীন সমাজ সম্পৃক্ত ছিল। নাটকের বিবর্তনের এই মূল ধারা অনুসরণ করেই রোমান থিয়েটারও ভাঙ্গাগড়ার পথে এক পরিবর্তিত আকার ধারণ করল।

অভিজাত শ্রেণী এবং সেনেটের বিরোধিতার ফলে বারবার ভাঙ্গাগড়া চলায় রোমে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পূর্ব পর্যন্তও কোন স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারেনি। খ্রীঃ পূঃ ১৭৯ অব্দে "অ্যাপোল্লো"র মন্দিরের নিকটে মিলিতভাবে রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার নির্মিত হয়—"থিয়েত্রাম্ এত্ প্রোস্কেনিয়াম্" (Theatrum et proscenium)। খ্রীঃ পূঃ ১৭৪ অব্দে পরিদর্শক "ফুল্‌ভিয়ুস্ ফ্লাক্কুস্" (Fulvius Flaccus) ও "পস্তুমুস্ আল্‌বিনুসের" (Postumus Albinus) অধীনে আর একটি রঙ্গালয় তৈরী হয়েছিল। পরিদর্শক "উয়ালেরিয়ুস্ মেস্সালা" (Valerius Messala) এবং "কাস্সিয়ুস্ লনগিনুস্" (Cassius Longinus)-এর অধীনে পাথরের রঙ্গালয় তৈরীও সুরু হয়েছিল কিন্তু সেনেট প্রেক্ষাগৃহে বসবার আসন নিষিদ্ধ করায় এর অগ্রগতি তখনকার মত বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে এই আইন উঠে যাওয়ায় সেখানে গ্যালারী ও আসনশ্রেণী তৈরী হয়েছিল। এই রঙ্গালয় রোমানদের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানকালে ব্যবহৃত হত। রোমের যে সমস্ত বিশিষ্ট নাট্যকাররা সাধারণের মনোরঞ্জন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নাটক কিন্তু এই সমস্ত স্থায়ী অভিজাত মঞ্চে প্রায়শঃই স্থান পেত না।

বিভিন্ন চিত্রিত পাত্রের নিদর্শন থেকে একালের অস্থায়ী মঞ্চের গঠন কি রকম ছিল তা আমরা জানতে পারি। এই ধরনের অস্থায়ী মঞ্চেই "প্লাউতুস্" "আক্কিয়ুস্" এবং "তেরেন্স" প্রভৃতি প্রখ্যাত নাট্যকারদের নাটকের অভিনয় হত। এই মঞ্চের পশ্চাদ্‌দিকে থাকত খুব সাড়ম্বর সজ্জিত দরজা। কমেডিতে এই দরজার নাম ছিল "ভেস্তিব্যুলা" (Vestibula)--সেখান থেকে অভিনেতারা প্রবেশ করত। তার সামনের দিকে থাকত কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ, সেখানে বিদেশ থেকে আগত চরিত্ররা উঠে এসে দাঁড়াত। কখন দোতলা গৃহ, তার জানালা এবং উপরের ছাদও তৈরী করে দেখানো হত। এগুলি "সেটের" অঙ্গ ছিল, সুতরাং নাটকীয় ঘটনা অনুযায়ী পরিবর্তিত হত। অস্থায়ী কাঠের মঞ্চ-গৃহের প্রথম সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন লুদি উৎসবে। এই মঞ্চগুলি যখন ক্রমোন্নত রূপধারণ করেছিল, তখন মঞ্চ-গৃহের সম্মুখ দেয়াল "স্কেনে ফ্রন্‌স্" অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সজ্জিত করা হত। সম্ভবতঃ এর আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তী হেলেনীয় যুগের "থ্যুরোমাতা প্যানেলের" অনুসরণে। মঞ্চের সুসজ্জিত পশ্চাদ্-দেয়াল ক্রমশঃ রোমান ধারার মঞ্চের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। অনেক সময়

এই দেয়ালের গায়ে বাস্তবানুগ চিত্রও অঙ্কিত থাকত, যেমন ছিল 'পম্পেঈ' (Pompeii) থিয়েটারে।

রোমে এই ধরনের সাদামাটা প্রথমদিককার অস্থায়ী মঞ্চ গড়ে ওঠার পেছনে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের প্রভাব ছিল অতি প্রবল। ল্যাটিন নাট্যকার প্লাউতুস্ তাঁর নাটক আড়ম্বরময় রোমান রঙ্গালয়ের জন্য লেখেন নি। তাঁর নাটক কাঠের তৈরী পুরাতন ফ্ল্যায়াকেস্ আঙ্গিকের মঞ্চের জন্যই লিখিত হয়েছিল।

॥ প্লাউতুস্ ॥

"তিতুস্ মাক্কিয়ুস্ প্লাউতুস্" (Titus Maccius Plautus)—জন্ম খ্রীঃ পূঃ ২৫৪. মৃত্যু ১৮৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে—ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুঃখনিপীড়িত। গ্রীসে আইস্খ্যলস্ প্রভৃতি নাট্যকাররা ছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী। দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে জাতীয় সম্মান, পারস্য যুদ্ধ, সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ইত্যাদি সবকিছুরই এই সমস্ত নাট্যকারগণ সম-অংশীদার ছিলেন। কিন্তু রোমের ইতিহাস ছিল ভিন্ন—রোমের রঙ্গমঞ্চের লেখক, অভিনেতা এবং অন্যান্য নাট্যবিদ্ সকলেই প্রায় ছিলেন ক্রীতদাস শ্রেণীর থেকে আগত—এবং তাঁরা বেশিরভাগই গ্রীক ক্রীতদাস হতেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলেও এ কথা সত্য যে "তেরেন্স"-এর নাট্যকার জীবন যখন সুরু হয় তখনও তিনি ক্রীতদাসই ছিলেন। "সেনেকা" (Seneca) ছিলেন স্পেন থেকে আগত বিদেশী। প্লাউতুস্ একেবারে ক্রীতদাস শ্রেণীর না হলেও অভিজাত রোমান ছিলেন না। তিনি ইতালীয় সবজান্তা গোছের রাস্তার ফক্কর ছেলে ছিলেন। এঁরা কেউই তাই আত্মমর্যাদায় সু-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐতিহ্যবাহী মানব ছিলেন না। এরই পাশাপাশি গ্রীক নাট্যকারদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার কত আসমান্ জমিন ব্যতিক্রম তা সহজেই অনুমেয়। অতএব রোমের নাটক যে গ্রীক ট্র্যাজেডি, এবং ওল্ড কমেডি বা নিউ কমেডির (Old Comedy or New Comedy) নাটক শ্রেণীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি হীন ও নগণ্য হবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্লাউতুসের প্রায় ২১ খানি নাটক কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই নাটকগুলির কাহিনী-বৃত্ত কম বেশি প্রায় একই রকম। মোটের উপর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে—রোমান কমেডির কাহিনী প্রায়

একই ধারায় গ্রথিত হত—এই কাহিনী গড়ে উঠত এক তরুণ প্রেমিক, তার গুপ্ত প্রেম, তার কঠিন হৃদয় পিতা ও এক অতি বুদ্ধিমান ক্রীতদাসকে নিয়ে। প্লাউতুসের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি নাটকের নাম এখানে উল্লেখ করছি— "দ্যা ব্রাগিং সোলজার্" বা "মিলেস্ গ্লোরিওসুস্" (Miles Gloriosus) "দ্যা কমেডি অব্ অ্যাসেস্" বা "অ্যাসিনাবিয়া" (Asinaria), "সেউদোলুস্" (Pseudolus), "ত্রিনুম্মুস্" (Trinummus), "দ্যা কমেডি অব্ দ্যা লিট্ল্ প্লট্" বা "আউলুলাবিয়া" (Aulularia), "দ্যা মারচেন্ট্" বা "মেরকাতোর" (Mercator) ইত্যাদি।

প্লাউতুস্ চেয়েছিলেন অতি সাধারণ শ্রেণীর অগণিত জনতার মনোরঞ্জন করতে। চেয়েছেন কালের পাতায় কোন অমরতার সাক্ষ্য না রেখে ক্ষণিকের আনন্দ বিতরণ করে যেতে। তাঁর উদ্দীপনা ছিল দুই ধারার— প্রথমতঃ তিনি "গ্রীক নিউ কমেডির" অর্থাৎ "মেনান্দের" প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন; এবং সেখান থেকেই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গেই কাহিনী, চরিত্র এবং কথোপকথন পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন রোমান দর্শকদের কাছে মেনান্দেরের রচনা অত্যন্ত জোলো লাগবার কথা। জনপ্রিয়তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল প্লাউতুসের, তাই তিনি দ্বিতীয় ধারা "আতেল্লান্ ফার্সেস্" (Atellan Farces) থেকেও স্বাধীনভাবেই উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এই আতেল্লান্ ফার্সের মূলে ছিল "সিসিলিয়ান ফ্ল্যায়াকেস্"; এর সঙ্গে আরিস্তোফানেসের রচনার তবু কিছু সুদূর মিল আছে। এছাড়াও প্লাউতুসের রচনায় মাইম্, বার্লেস্ক্ এবং গীতিকাব্য ইত্যাদি বহু বৈচিত্র্য ছিল। মোটের উপর নাট্যকীর্তি রচনা করতে বসে তিনি অতীতের কালসমুদ্রে জাল ছুঁড়তেন, সম্ভব, অসম্ভব যে মৎস্যটি শিকার হত তাই তিনি তাঁর দর্শকদের পরিবেশন করতেন। তবুও এরি মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, চরিত্রগুলিকে তিনি একটা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ফেলে নিতেন। সেই সব চরিত্রগুলি একটি আবেগময় রোমান্টিক "প্লট্"কেই ফুটিয়ে তুলত, তার মধ্যে জড়িত থাকত বহু "ফার্সিকাল এপিসোড্" (Farcical Episode)। কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠত তৎকালীন নাগরিক জীবন, সমাজ ও সংসারের চিত্র। এইভাবেই আধুনিক নাটকের সূত্রপাত হয়।

তিনি তাঁর সাধারণ দর্শকদের অহমিকাকে অক্ষুণ্ণ রেখে হঠাৎ বিস্ময়কে

প্রকাশ পেতে দেননি। দর্শকেরা যেন দেবদুর্লভ গাম্ভীর্যে চরিত্রগুলির ভ্রম দেখে যাচ্ছে। এই উপায়েই নাটকে যা তাঁর প্রধান অবদান সেই "কমিক্ আইরনি" (Comic Irony) তিনি তৈরী করতেন। তাঁর এই পদ্ধতি হল, নাটকীয় কাহিনীর গোপন তথ্য দর্শকদের আগেই জানিয়ে দেওয়া সুতরাং কোন ঘটনা হঠাৎ ঘটছে, বলে দর্শকরা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে আনন্দ পেতেন না। তারা আনন্দ পেতেন যখন দেখতেন তারা যা জানেন নাটকীয় চরিত্রগুলি না জেনে সেই ভুল ভ্রান্তিগুলি করে যাচ্ছে।

॥ তেরেন্স ॥

তেরেন্স কিন্তু ছিলেন ভিন্ন গোত্রীয়। তিনি স্বয়ং রোমানদের রুচি, প্রকৃতির খুব নিন্দা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যেও সুরুচি, পাণ্ডিত্য, এবং মার্জনাই বড় ছিল এগুলি তিনি বহু চেষ্টায় আহরণ করেছেন। তেরেন্সের রচিত নাটকের মধ্যে মাত্র ৬ খানা পাওয়া গিয়েছে। তাঁর ১। আন্দ্রিয়া (Andria—খ্রী: পূ: ১৬৬ অব্দ) ২। হেকিরা (Hecyra—খ্রী: পূ: ১৬৫ অব্দ) ৩। হেউতোন্তি মোরুমেনোস্ (Heautonti Morumenos—খ্রী: পূ: ১৬৩ অব্দ) ৪। এউন্নুখুস্ (Eunnuchus—খ্রী: পূ: ১৬১ অব্দ) ৫। ফোরমিও (Phormio—খ্রী: পূ: ১৬১ অব্দ) ৬। আদেল্‌ফি (Adelphi—খ্রী: পূ: ১৬০ অব্দ) রচিত নাটক। তেরেন্স বাল্যে ছিলেন ক্রীতদাস—কিন্তু তাঁর প্রভু বালকের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে বাল্যেই মুক্তি দেন। এই জন্যই অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তেরেন্স ছিলেন চির কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত। তাই তিনি তাঁর রচনায় বিনীতভাবে চেয়েছেন অভিজাত রোমানদের মনোরঞ্জন করতে। প্লাউতুসের রচনায় স্বাধীন যদৃচ্ছ শক্তির প্রকাশ ছিল, তেরেন্সের মধ্যে ছিল গ্রীকসুলভ লঘু গাম্ভীর্য। পূর্বসুরীদের ঋণ তেরেন্স উন্নত মস্তকেই বহন করেছেন—তাই তাঁর মুখে শুনতে পাই সানন্দ স্বীকৃতি—"ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নূতন নেই—যা এখন বলা হচ্ছে তা পূর্বেও বলা হয়েছিল।"[২] এই দুই রোমান নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাই অ্যালারডাইস্ নিকল তাঁর ওয়ার্লড ড্রামা গ্রন্থে বলেছেন—

"প্লাউতুস্ যদি জন মনোরঞ্জনের নিমিত্ত লিখে থাকেন তবে তাঁর উত্তরসূরী তেরেন্স চেয়েছিলেন বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে। প্লাউতুস্

হয়েছিল পম্পেঈ থিয়েটারে—এতে ৫ শত খচ্চর, তিন সহস্র রথ, অসংখ্য যদি তাঁর কৌতুক নাট্যের রচনা শৈলী একাধিক সূত্র থেকে আহরণ করে থাকেন তবে তেরেন্স অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন কেবলমাত্র একজন শিক্ষক মেনান্দেরকে। যদিও দু'জনের নাম প্রায়ই একত্রে উল্লেখ করা হয় তবু তাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ আমরা করব যে, পরবর্তীকালে অন্ধকার যুগের অবসানে রেনেসাঁসের সময়ে ইউরোপে যে কালজয়ী "ক্লাসিকাল কমেডির" প্রাধান্য সুবিস্তৃত হয়েছিল, সেখানে তীক্ষ্ণধার আরিস্তোফানেসের প্রভাব ছিল না, ছিল না মেনান্দেরেরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি। রেনেসাঁস্ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মার্লো, শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের—শেষ দু'জনের কমেডির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এই প্লাউতুস্ ও তেরেন্সেরই কমেডি। অন্যদিকে এ যুগের ট্র্যাজেডির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল ল্যাটিন নাট্যকার সেনেকার।

॥ সেনেকা ॥

সেনেকা (Seneca খ্রী: পূ: ৪ অব্দ থেকে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ সম্ভাব্য) ছিলেন রোমান যুগের একটি স্মরণীয় চরিত্র। তাঁর সমকালীন পরিবেশই তাঁর সত্যকার পরিচয় তুলে ধরবে।

প্লাউতুস্ এবং তেরেন্স কমেডি রচনা করলেও তাদের রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি যে সেকালের রোমানরা নাটকের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিল না। নাটকের চেয়ে তারা দড়ির খেলা, বক্সিং কিংবা তারো চেয়ে নৃশংস কোন অনুষ্ঠান যা তাদের "অ্যাম্ফিথিয়েটারে" (Amphitheatre) অনুষ্ঠিত হত তারি প্রতি অনুরক্ত ছিল বেশি। ফার্স জাতীয় কমেডির প্রতি তাদের কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, তাদের জীবনে ট্র্যাজেডির কোন স্থানই ছিল না। হেলেনীয় যুগের পর থেকেই ট্র্যাজেডির দুর্ভাগ্য সুরু হয়। আরিস্তোফানেস্ তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বেচারা দিওন্যুসাস্‌কে "হেডিজের" ভয়াবহ পথে তাঁর অনুরক্ত ভক্ত কোন প্রাচীন নাট্যপ্রতিভাকে আনতে পাঠিয়েছিলেন।

আমরা জানি যে গ্রীক সভ্যতার সমাপ্তির যুগে বা রোমান যুগের প্রারম্ভে প্রাচীন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়। কাব্যরচনায় "রেটোরিকের" (Rhetoric) স্থান নেয় "ভাইব্রান্ট্ পোয়েট্রি" (Vibrant Poetry)। জীবন্ত

অনুভূতির জায়গায় আসে কৃত্রিমতা, আসে আবেগপ্রবণতার স্থানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগারতি। রচনার যত অপকর্ষ ঘটতে লাগল নাটকে কুশলী অভিনেতার প্রাধান্য ততই বেড়ে যেতে লাগল, আধুনিক যুগেও এই প্রবণতাই আমরা দেখি। এমনকি গ্রীক ক্লাসিকাল যুগের শ্রেষ্ঠ রচনাও তারা ব্যক্তিক ভূমিকাকে প্রধান করে তুলবার জন্য পাল্টে নিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অভিনেতাদের নিজস্ব সংঘ পর্যন্তও তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন অঙ্কিত পাত্রের চিত্রে দেখা যায় যে এই সমস্ত অভিনয় হত অত্যন্ত দেহসর্বস্ব এবং অঙ্গ-ভঙ্গিযুক্ত। পূর্ব শতাব্দীর সেই শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য আর ছিল না, তার স্থানে প্রকাশ পাচ্ছিল অস্থিরতা এবং উত্তেজনা। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে রোমে 'ষ্টার' প্রথাও প্রবল হয়ে ওঠে, অভিনেতারা প্রথমে ক্রীতদাস থাকলেও পরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন। অভিনেতারা এত প্রবল হয়ে ওঠায় নাট্যকাররা চাপা পড়ে যান।

রোমের মঞ্চে প্রথম ট্র্যাজেডির আবির্ভাব মৌলিক লেখা দিয়ে হয়নি, হয়েছিল গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবাদ দিয়ে। এই নাট্যকাররাও রোমান ছিলেন না, ছিলেন "তারেন্তুম্" (Tarentum) দাস—অর্থাৎ গ্রীক দেশীয় ক্রীতদাস। সোফোক্লেস্ ও এউরিপিদেসের অনুবাদক হিসেবে "লিভিয়ুস্ আন্দ্রোনিকুসের" (Livius Andronicus রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ২৪০ থেকে ২০৯) নাম ল্যাটিন জগৎ জানে। তাঁর প্রথম নাটকের অভিনয় হয় "ইটার্নাল সিটি" (Eternal City) তে। এরপরে "নাইয়ুয়িয়ুস্" (Nævius) গ্রাক নাটকের উপরে নির্ভর করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে রোমানদের ইতিহাস ও পুরাকাহিনী নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা করেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে এউরিপিদেসের অনুকারী ট্র্যাজেডির নাট্যকার ছিলেন তিনজন—"এন্নিয়ুস্" (Ennius), "পাকুয়ুয়িয়ুস্" (Pacuvius) এবং "আক্কিয়ুস্" (Accius)।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে (A. D.) এই নবাবিষ্কৃত ট্র্যাজেডির ধারা রোমে ও তার প্রদেশগুলিতে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু এগুলির বহুরকম ত্রুটি ছিল, ১। প্রথমতঃ এগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত গঠনের, ২। দ্বিতীয়তঃ এগুলি বিস্তৃত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। ৩। তৃতীয়তঃ এগুলি করুণ রসের অত্যাধিক সংবেদশীলতার জন্য ছিল অত্যন্ত দুর্বল গঠনের। ৪। এবং চতুর্থতঃ অনুষ্ঠানের জটিলতায় অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসত যেমন খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে "আক্কিয়ুসের" ক্ল্যতাইম্নেস্ত্রা নাটকের অভিনয়

হাতি, জিরাফ, ইত্যাদির এক শ্বাসরোধকারী ট্রয় বিজেতাদের শোভাযাত্রা মঞ্চের উপর দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে অতিক্রম করে গিয়েছিল বলে জানা যায়। বর্তমানকালেও অনেক প্রযোজকদের এরূপ প্রচেষ্টা দেখে তেরেন্সের বিখ্যাত উক্তিই আবার স্মরণ হয়—ব্রহ্মাণ্ডে নূতন কিছুই নেই।

এই চরম বিক্ষিপ্ত নাট্য পরিবেশের মাঝে সেনেকার ৯।১০ খানি ট্র্যাজেডি যেন হতভম্ব হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেনেকা "স্টোয়িক্" (Stoic) মতাবলম্বী এবং নীরোর গুরু হিসেবেও প্রখ্যাত ছিলেন, যদিও তিনি নীরোর হুকুমেই আত্মহত্যা করেন। বেকনের মতই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের লেখক ছিলেন এবং বেকনের মতই বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনীতির পংকিলতা, নৈতিক অনুভূতি দিয়ে স্বীকার পেতেন না। শেষ জীবনে তিনি গ্রীসের পুরাকাহিনী নিয়ে ৯ খানি ট্র্যাজেডি রচনা করেন—১। হের্কুলেস্ ফুরেন্স্ (Hercules Furens) ২। মেদেয়া (Medea) ৩। ত্রোয়াদেস্ (Troades) ৪। ফইদ্রা (Phœdra) ৫। অ্যাগামেমনোন্ (Agamemnon) ৬। অয়দিপউস্ (Œdipus) ৭। হের্কুলেস্ অয়লয়ুস্ (Hercules Œlœus) ৮। ফইনিস্সই (Phœnissœ) ৯। থ্যুয়েস্তেস্ (Thyestes) তার দশম নাটকখানি এক রোমান কাহিনী নিয়ে রচিত ১০। ফেবুলা প্রোইতেক্সতা অকতায়িয়া (Fabula Prœtexta Octavia) অনেকে মনে করেন এখানি তাঁর রচনাই নয়।

প্রকৃতপক্ষে সেনেকাই রোমে স্বকীয় প্রতিভাধর নাট্যকার। সেনেকার নাটক অবশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডিরই অনুবর্তনকারী ছিল। সেনেকার নাটকের মধ্যে অভিনয়যোগ্য গুণের চেয়ে পঠনযোগ্য সাহিত্যিক গুণই বেশি ছিল। তাঁর নাটকের মধ্যে কল্পনার উন্মুক্ত প্রকাশের চেয়ে ছন্দে, অলংকারে এবং স্টোয়িক্ দর্শনে পাণ্ডিত্যের প্রকাশই ঘটেছে অধিক। নাটকীয় গতিশক্তি হীন লম্বা, চওড়া বাক্যবিন্যাস এই নাটকের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, তবুও ইউরোপের নাট্যজগতে সেনেকার স্থান ছিল অবিনশ্বর। সেনেকা সম্পর্কে নিকল তাঁর ওয়ার্লড ড্রামা গ্রন্থে বলেছেন—

"রেনেসাঁস্ যুগের প্রথম দিকের নাট্যকারগণ সেনেকার ভাবধারা পুষ্ট ছিলেন। সেনেকার রচনার প্রভাব না থাকলে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-গুলিকে তাদের বর্তমানরূপে আমরা কখনই পেতাম না।"

প্রায় এক শতাব্দী ধরে আধুনিক নাটকের গঠন প্রচেষ্টার কালে তিনিই

ছিলেন আদর্শ, তাঁর দিকে সমস্ত নবীন লেখকরাই তাকিয়ে থাকতেন। হয়ত তাঁর ছাঁচ এখন অস্পষ্ট হয়েছে, হয়ত তাঁর মূর্তি এখন ভেঙ্গে গিয়েছে কিন্তু পুরো ১৬শ শতক ধরে নাট্যকারদের তিনি যে পথপ্রদর্শন করেছেন, তার চিহ্ন কোনদিনই অবলুপ্ত হবে না।

আমরা তাঁর প্রধান নাটকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এবার দেখব যা রেনেসাঁস্ যুগের নোতুন জন্মানো পৃথিবীর নাট্যকারদের পথ দেখিয়েছিল।

সেনেকা যদিও এউরিপিদেস্‌কে অনুসরণ করেছিলেন তবুও তাঁর রচনার মধ্যে গ্রীকনাট্যকারের রিয়ালিজমের অংশ অত্যন্ত কমই ছিল; তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বাহুল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন—"সেণ্টিমেণ্টাল মেলোড্রামার" গুণগুলি। আসলে ট্র্যাজেডির "Pity" ও "Fear" ছিল স্টোয়িক্ মতাবলম্বীদের কাছে একটা সংস্কার মাত্র। তাই সেনেকার পক্ষে সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা করা সম্ভব হয়নি। এই অভাব মেটাতেই সেনেকাকে আত্মার আবির্ভাব ও ভয়াবহ রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়েছে। রক্ত, ভয়াবহতা, বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা, মৃত্যুর করাল গহ্বর তাঁকে আনন্দ দিত। তিনি নাটকের মধ্যে এগুলি ডাক্তারী ছাত্রদের মত, নিরাসক্ত, শান্তচিত্তে ও ঠাণ্ডা মাথায় ঘটাতেন। তিনি যে মানসপ্রকৃতি অনুভব করতেন, তা ছিল কালো. বিষাদঘন ও দৈবাক্রান্ত। তাঁর অনুরাগ ছিল ষোল আনা খল চরিত্রে—যার মানস গঠনেই রয়েছে অপরাধ প্রবণতা, সেই চরিত্রই তিনি পছন্দ করতেন—যিনি নরকের দেবতাদের আবাহন করেন। সেনেকা সৃষ্ট এই চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবই আমরা দেখতে পাই শেক্সপীয়রের "ওথেলো" নাটকে "ইয়াগো" চরিত্র পরিকল্পনায়।

সেনেকার রচনায় বাগাড়ম্বরও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি নানান "মেটাফর্" ও "সিমিলি" একঘেয়ে ভাবে একটা লম্বা বক্তৃতার মধ্যে ব্যবহার করতেন; এবং সেই রকম একঘেয়ে ভাবেই তার সঙ্গে নীতিউপদেশ দিতেন। বিরাট দৈর্ঘের প্রাণহীন নিরাশাবাদ—ধীর, মন্থর গতিতে এগিয়ে চলত। চরিত্রগুলি হত অন্ধকারের জীব, তাই নরকের অন্ধকারই ছিল তাদের প্রকৃত আলোক।

কিন্তু একথা অস্বীকার পাওয়া যাবে না যে, তাঁর নিজস্ব কাব্যরচনা পদ্ধতির মাঝে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাই প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর নাটকে অপরাধের উপর জোরালো বক্তৃতায়, কথোপকথনের প্রজ্জ্বলিত শিখায়, এবং

তাঁর চিন্তাশীল খোরাসের মুখে তা বিদ্যুচ্চমকের মত প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হের্কুলেস্ ফুরেন্সের নায়ক বলছেন—

"মহান্ নেপচুনের মহাসমুদ্রের জলরাশি কি সম্পূর্ণ ধুয়ে দিতে পারবে আমার হাতের এই রক্তলেখা? না, সংখ্যাহীন সমুদ্র আমার এই হাতকে করে তুলবে আরো ঘন রক্তবর্ণ রঞ্জিত—পীতবর্ণকে রূপান্তরিত করবে গাঢ় লাল বর্ণে।"[৩]

শেক্সপীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটকের লেডি ম্যাকবেথের প্রখ্যাত উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। "Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this litte hand."

সেনেকা ও তেরেন্স উভয়ের প্রচেষ্টা রোমান নাটকের এমন এক গঠন ভঙ্গিমা ও অবয়ব সৃষ্টি করেছিল যা ১৯শ শতক পর্যন্ত অটুট ছিল।

সেনেকার নাটকগুলি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রাচীন গ্রীক নাটকের "প্রোলোগের" অংশ নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গেই একত্রিত করে যুক্ত করে দেন। ফলে কাব্যে নাটকীয় গুণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। "কমেডি"র ক্ষেত্রে তেরেন্সের পরিকল্পনাও ছিল মূলতঃ একই। তিনি আর একটু এগিয়ে গিয়ে "প্রোলোগ" বা প্রস্তাবনার অংশটি নাটক থেকে আলাদা করে দেন। এই অংশটিকে তিনি আরিস্তোফানেসের "প্যারাবাসিসের" আদর্শে নাটকের মধ্যে কবির মুখপাত্রের মত করে রাখেন। এইভাবেই তেরেন্স ও সেনেকার চেষ্টায় রোমান ট্র্যাজেডি ও কমেডি তার পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত আধুনিক রূপ পায়।

গ্রীক নাটকের প্রথানুযায়ী সেনেকাও তাঁর নাটকে খোরাসের ভূমিকা রেখেছেন, কিন্তু এই রাখা নিতান্তই নামগতভাবে রাখা—অনেকটাই না রাখার সামিল। সোফোক্লেস্ ও এউরিপিদেস্ খোরাসের প্রাধান্য অনেকখানিই কমিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে সেনেকার ট্র্যাজেডিতে খোরাস যে সমস্ত প্রশস্তি গাইত, তা হত নাটকীয় উত্তেজনাহীন, শান্ত, কাব্যসৌন্দর্য-মণ্ডিত, বুদ্ধিদীপ্ত। নাটকের মূল ঘটনাকে তারা কোথাও পরিচালিত করত না অতি শিথিলভাবেই সম্পর্কিত থাকত। খুব বেশি প্রাধান্য পেলে হয়ত "মূল অ্যাক্‌শনে" যে ঘটনা বিবৃত হত তার সঙ্গে ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ থাকত। প্রকৃতপক্ষে সেনেকার হাতে খোরাস হয়ে উঠেছিল "ইন্‌টারলুডের" (Interludes) রসদ সরবরাহকারী।

কথোপকথনের ক্ষেত্রে লম্বা বক্তৃতার অংশ থাকলেও তার মধ্যে পরিবর্তন

আসতে লাগল। কথোপকথনের কোন কোন অংশ "ব্যাট্‌লডোর্‌ অ্যাণ্ড সাট্‌লককের" (Battledore-and-Shuttlecock) মত দ্রুত উত্তর প্রত্যুত্তরের রূপ গ্রহণ করতে লাগল। এই ধরনের কথোপকথনে দু'টো চরিত্র ৫০।৬০ লাইন ধরে অতি দ্রুতগতিতে কোন কথা নিয়ে বলের মত লোফালুফি খেলত। এ ধরনের কথোপকথনকে বলা হত "স্তিখোম্যুথিয়া" (Stichomythia) অবশ্য এর মূল গ্রীসে—কিন্তু সেনেকার হাতে তা পরিবর্ধিত রূপ ধারণ করে এবং এর উপরে নির্ভর করেই পরবর্তীকালে "এলিজাবেথান ট্র্যাজিক্‌ স্টাইল" গড়ে উঠেছিল।

আইস্খ্যুলস্‌ থেকে সেনেকা, আথেন্‌স থেকে রোমে নাটকের বিবর্তন ও গতিরেখা এভাবেই এগিয়ে চলেছিল। এরিমধ্যে গ্রীক নাটকের একটি পার্শ্ববর্তী ধারা প্রবাহিত হয়ে "বাইজেন্তাইন্‌" ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একশ্রেণীর "ক্রিশ্চিয়ান্‌" নাটকের সৃষ্টি করেছিল, এই ধারার নাটকের মধ্যে একাদশ শতকের "ক্রাইস্টস্‌-সাফারিং" (Christ's Suffering) বলে একটি নাটক পাওয়া যায়। যদিও পশ্চিমের রঙ্গমঞ্চের উপরে এই বাই-জেন্তাইন্‌ ধারার প্রভাব মূলতঃ কিছুই পড়েনি—তবুও এই গতিরেখাটি কৌতূহলোদ্দীপক।

রোমান নাট্যধারার এই পরিপ্রেক্ষিতেই তার রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়কে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। নাটক যেমন গ্রীক পদ্ধতি থেকে বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল—রোমের স্থায়ী রঙ্গালয়েও তেমনি নাট্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কতকগুলি মৌলিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল। জন্মকালের হিসেবে পম্পেঈ-ই (খ্রীঃ পূঃ ৭৫ অব্দে) ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রোমান পদ্ধতির স্থায়ী রঙ্গালয়। এখানে প্রথমাবস্থায় সঙ্গীত, সঙ্গীতমূলক জলসা, ও কবিতার প্রতিযোগিতা হত। গ্রীসের রঙ্গালয় হত মুক্তাঙ্গন—এই পম্পেঈ রঙ্গালয়টি ছিল আচ্ছাদিত ও আকারে ক্ষুদ্র। কারণ গ্রীসের রঙ্গালয়ে জাতীয় উৎসব উপলক্ষে বিপুল জনসমাবেশ ঘটত—রোমে তা নয়, এখানে স্থায়ী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বল্প সংখ্যক অভিজাতদের চিত্ত বিনোদনের জন্য।

পম্পেঈতে দেখা যায় গ্রীক প্রথানুযায়ীই প্রেক্ষাগৃহের আসনশ্রেণী উচ্চ-ভূমিতে এবং রঙ্গমঞ্চটি নিম্নস্থানে, রোমানপদ্ধতিতে অর্‌খেস্ত্রা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রোমান নাটকে খোরাসের অস্তিত্ব যেমন আনুষ্ঠানিক হয়ে

উঠেছে তেমন নাটকীয় চরিত্র এবং সংলাপ বেড়ে যাওয়ায় মঞ্চ ক্রমশঃ বৃহৎ স্থান অধিকার করে নিতে লাগল। মঞ্চ অধিক স্থান অধিকার করতে গিয়ে পেছন দিকে সরে গেল না—ভাল দেখানো এবং শোনানোর মৌলিক ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এল দর্শকদের দিকে, কাজেই মঞ্চ অর্‌খেস্ত্রার অর্ধভূমি অধিকার করে নিল! পূর্বে অর্‌খেস্ত্রা ভূমি ছিল বৃত্তাকার এখন খোরাসের আধিপত্য কমে যাওয়ায় ও মঞ্চের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় অর্‌খেস্ত্রা হয়ে উঠল অর্ধবৃত্তাকার। পম্পেঈতে মঞ্চের সম্মুখভাগে অর্‌খেস্ত্রা পর্যন্ত বড় বড় সিঁড়ির ধাপ নেমে এসেছে, সেখানে নগর পরিষদের সভ্যদের ও সম্মানিত অতিথিদের জন্য অস্থায়ী আসন পাতা হত। মঞ্চের পশ্চাদ্‌দিকের দেয়াল, অর্থাৎ স্কেনে গৃহের সম্মুখ দেয়াল "স্কেনে ফ্রন্‌স্" স্থাপত্যের বিশ্বাস আনয়নকারী কৌশলে চিত্রিত ছিল, গোলাকৃতি প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে সম্পৃক্ত মঞ্চভূমির দুই পার্শ্ব কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল ফলে সমগ্র আগারটির গঠন হয়েছিল আয়তক্ষেত্রের মত। এই পদ্ধতিতে নির্মাণ করার সুবিধা হল এই যে প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চ উভয়ই মিলিতভাবে ছাদের শক্ত আচ্ছাদনের কোণগুলিকে ধারণ করতে পারত। এ ছাড়া মঞ্চের তিনদিক সংকীর্ণ ও আবদ্ধ হওয়ায়, এবং সেখানে স্থাপত্যসুলভ গঠন ভঙ্গি থাকায় শব্দ প্রত্যাহত হয়ে প্রেক্ষাগৃহের দিকে ফিরে যেত, ফলে সমগ্র রঙ্গালয়ের শ্রুতিগম্যতা অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। স্মরণযোগ্য যে রোমান নাটকে গ্রীক নাটকের বড় বড় খোরাস সঙ্গীত এবং "ওডস্" আর ছিল না, রোমানদের রঙ্গালয় ছিল ছোট, নাটকও ছিল সংলাপবহুল ও মঞ্চপ্রধান—সুতরাং শ্রোতারা যাতে সব কথাই শুনতে পায় মঞ্চবিদ্‌রা সে জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। পম্পেঈতে রঙ্গালয়ের অঙ্গ হিসেবেই যে ছাদ ছিল তাতে বৃহদায়তন রঙ্গালয় হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পম্পেঈ প্রকৃতপক্ষে একটি সঙ্গীতাগার বা "ওদেউম্" (Odeum) ছিল, সেখানে মাত্র ১,৫০০ জন দর্শকের আসন ছিল। বৃহদাকৃতি রঙ্গালয়গুলির ছাদ আচ্ছাদিত করা হত চট বা "ক্যান্‌ভাস" দিয়ে। ছোট ছোট রঙ্গালয় বা সঙ্গীতাগার যেমন "তাওরমিনা" (Taormina) "এপিদাউরস্" (Epidauros) অথবা "নাপলস্" (Naples) প্রভৃতি মঞ্চের উপরগুলি কাঠের দ্বারা আচ্ছাদিত হত। রঙ্গমঞ্চের উপরে এই আচ্ছাদন দেওয়া রোমান মঞ্চ স্থাপত্যের একটি মৌলিক অবদান, গ্রীকরা এদিকটার কথা কখন ভাবেনি। রোমানরা আচ্ছাদিত প্রেক্ষাগৃহের

পাথরের স্তরগুলির উপরে চৌকি ও আসন পেতে পুরোহিত, ম্যাজিস্ট্রেট ও অভিজাতদের বসাতেন। আবার অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পূর্বোক্ত অর্‌খেস্ত্রার সম্মুখ ধাপগুলিতে বসতেন। এই আসনগুলি অনুচ্চ কার্নিস দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত, ফলে অর্‌খেস্ত্রার প্রান্তবর্তী অর্ধবৃত্তাকার পথ পার হয়েই দর্শকরা তাদের আসন শ্রেণীতে গিয়ে উপবেশন করতেন।

পম্পেঈতে যখন রঙ্গালয় তৈরী হয় সেই সমকালেই তৈরী হয়েছিল রোমের সর্বপ্রাচীন 'অ্যাম্ফিথিয়েটার'। এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে হত গ্লাদিয়েতর্‌দের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং পশুর লড়াই, এগুলি সেকালের দিনে অত্যন্ত জনপ্রিয় আমোদ ছিল। এর ক্রীড়া প্রদর্শন ক্ষেত্রকে বলা হত "অ্যারিণা"। অ্যারিণা দর্শকদের আসনশ্রেণী থেকে অনেক নীচে নিমজ্জিত থাকত, এবং সেখানে অবতরণের জন্য থাকত "উত্তল পথ" (Vaulted passage)। প্রথম সারি আসনের ধাপগুলি ক্রীড়া প্রদর্শন ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত—দর্শকদের নিরাপত্তার জন্যই। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় সারির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করত একটি অনুচ্চ প্রাচীর, এই দু'টি শ্রেণীই ভূমি সমতল থেকে নীচে অবস্থিত হত। দ্বিতীয় সারির নীচ থেকেই একটি উচ্চ পৃষ্ঠ নিম্নগামী পথ ঘুরে চলে যেত। সর্বোচ্চ শ্রেণী থাকত ভূমি সমতলের উপরে। আমরা এখানে জনসাধারণের প্রবেশ প্রস্থানের একটি সুপরিকল্পিত পথ পাচ্ছি। প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে নিম্নের ও বাইরের একটি পরিচ্ছন্ন সংযোগ এতে রক্ষিত হত। এই পদ্ধতিই পরে প্রবেশ প্রস্থানের জন্য রোমের অনেক রঙ্গালয়েও অনুসৃত হয়েছিল।

ক্রমশঃ মঞ্চের পশ্চাদ্‌দেয়ালের বা স্কেনে ফ্রন্‌সের উন্নয়ন হতে লাগল, আলংকারিক সাজসজ্জা বেড়েই চলল, এল স্থাপত্য গঠন এবং উন্নত পাকা গাঁথুনি, ধীরে ধীরে বিদায় নিল গ্রীক আলংকারিক চিত্রাঙ্কন প্রথা। এমন কি আভিজাত্য বাড়াতে রোমানরা স্থানে স্থানে সোনা, রূপো ও হাতির দাঁতের কারুকার্যও সম্ভবতঃ করতেন।

সর্বপ্রাচীন পাথরের রোমান মঞ্চ কিন্তু খাস রোমে সৃষ্টি হয়নি, এর আবির্ভাব ঘটেছিল রোমের উপনিবেশ "সিসিলিতে" (Sicilly) এরই অন্তর্গত ছিল "সেগেস্তা" (Segesta) "ত্যুন্দারিস্" (Tyndaris) ও "পম্পেঈ" (Pompeii) নগরী। এই সমস্ত নগরীতে পূর্বেই পরবর্তী হেলেনীয় যুগের গ্রীক রঙ্গালয় ছিল—সেগুলি পুনর্গঠনের কালেই ভেঙ্গে রোমান পদ্ধতিতে তৈরী

করা হয়। তাই গ্রীক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনেক স্মৃতি চিহ্নই এই সকল মঞ্চে রোমান পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। "সেগেস্তা" রঙ্গালয়ও পুনর্গঠিত হয়েছিল—সেখানে মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তী দেয়ালের উন্মুক্ত স্তম্ভশ্রেণী ও তার উপরের খিলানে হেলেনীয়যুগের ছাপ রয়েছে সুস্পষ্ট। এর দোতলার স্তম্ভশ্রেণী ছিল "দোরিক্‌" পদ্ধতিতে বানানো এবং তিনতলা ছিল "ঈয়োনিক্‌" পদ্ধতিতে রচিত। দু'দিকে দুই প্যারাস্কেনিয়োনের উপরে ছিল ছোট দু'টি ত্রিকোণ শীর্ষ এবং এর গঠনকার্য সমাপ্ত হয়েছে মাঝখানে মঞ্চের উপরে একটি বড ত্রিকোণাকৃতি চূড়ায়। 'বুলের' মতে উপরের এই ত্রিকোণাকৃতি চূড়ায় একটা করে দরজা থাকত যা দিয়ে দেবতারা কথা বলতে পারতেন।

হেলেনীয় যুগে ত্যুন্দারিস্‌ ও পম্পেঈর গঠন কৌশলও সেগেস্তার অনুরূপই ছিল। প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে ত্যুন্দারিস্‌ ও পম্পেঈ গ্রীকপদ্ধতিতে তৈরী করা হয়েছিল, গ্রীকপদ্ধতি অনুসারে এ দু'টোই পাথরের ঢালুতে তৈরী হয়েছিল এবং এর আকার ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি। এতে প্রায় ৫,০০০ দর্শক বসবার মত আসন ছিল, সেগেস্তার মতই এরও দু'পার্শ্বে ছিল প্যারাস্কেনিয়োন্‌ ও তার সহায়ক স্তম্ভশ্রেণী। এতে পাঁচটি দরজা ছিল—পেছনের দেয়ালে তিনটি ও প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করে। উন্মুক্ত প্রবেশপথ গোলাকৃতি অর্‌খেস্ত্রায় এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু সিসিলিতে "সুল্লন্‌" (Sullan) এসে উপনিবেশ স্থাপন করায় এই রঙ্গালয়গুলি ভেঙ্গে রোমান পদ্ধতিতে গডে তোলা হয়। এর দু'পাশের প্যারাস্কেনিয়া উঠে গেল, এবং প্রবেশপথ উত্তল বা বক্রপৃষ্ঠ হল, রঙ্গালয় আকারে অনেক ছোট হয়ে সঙ্গীতাগার বা বিচার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। রোমান পদ্ধতির এই বক্রপৃষ্ঠ প্রবেশপথের পার্শ্বদরজার নাম হল—"ইতিনেরা উয়েরস্‌সুরারুম্‌" (Itinera Versurarum) এটা পথের বর্ধিত অংশ যা দিয়ে মঞ্চে আসা যায়। মঞ্চটা হত নীচু এবং গভীর, পশ্চাদ্‌দিকের দেয়ালের পাঁচটি দরজাই উন্মুক্ত থাকত, এর প্রত্যেকটি দরজার দু'পাশে দু'জোড়া করে স্তম্ভ উপরের বরগার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। অতএব সর্বসমেত ২০টি স্তম্ভ একই সমরেখায় সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকত।

পম্পেঈ-র রঙ্গালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যবাদের যুগে, সম্রাট আগস্তাসের রাজত্বকালের তখন প্রথমভাগ, মঞ্চগৃহের বৈচিত্রময় অলংকৃত সম্মুখ দেয়ালের বা স্কেনে ফ্রন্‌সের মাঝখানে ছিল একটি বিশাল আকৃতির বর্ধিতমুখ 'কুলঙ্গি' (Niche) তার দু'পাশে ছিল অনুরূপ আয়তাকৃতির

আর দু'টি কুলঙ্গি। কুলঙ্গির এই বর্ধিতমুখের অভ্যন্তরে তিনটি দরজা ছিল। মঞ্চ থেকে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়েছিল কুলঙ্গি পর্যন্ত। এগুলি ছিল রাজপ্রাসাদ ও অতিথি-আগারে প্রবেশের দরজা। পশ্চাদ্-দেয়ালের বিভিন্ন খাঁজগুলির জোর বাড়ানো হত ভিত্তিবেদীর উপর সংস্থাপিত স্তম্ভদ্বারা। কুলঙ্গির বর্ধিতমুখ যদিও দরজার গভীরতা রক্ষা করত কিন্তু একদিকে তাতে পেছনের সাজঘরের আয়তন ছোট হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে মঞ্চের উপরে স্থাপত্য জটিলতা ও আড়ম্বর বর্ধিত হওয়ায় মঞ্চের গভীরতাও অনেক কমে গিয়েছিল। অভিনয় ক্ষেত্রটি অনেকটা রাজপথের মত হয়ে উঠেছিল যার পার্শ্বে রয়েছে প্রাসাদাবলী এবং যা প্রস্থে কম ও লম্বায় বেশি। রোমান কমেডি নাটকগুলির কাহিনীও ছিল এই মঞ্চেরই অনুকূল। নাগরিক জীবন ও পারিবারিক রোমান্টিক কাহিনীই ছিল তার উপজীব্য। মঞ্চের চাইতে মঞ্চের পশ্চাদ্গৃহের স্কেনের মেঝেটা ছিল উচ্চ। সেই জন্যই সাজঘর থেকে কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ প্রবেশপথ দিয়ে মঞ্চের উপর নেমে এসেছিল। অর্কেস্ট্রার পশ্চাতে মঞ্চবেদীর উচ্চতার যে দেয়ালটা তাও মঞ্চের পশ্চাদ্-দেয়ালের মতই উঁচু-নীচু খাঁজকাটা, মূর্তিশোভিত এবং অলংকৃত ছিল। তার মধ্যেও ছিল গোলাকৃতি কুলঙ্গি এবং তার দুই পাশে আয়তাকার প্যানেল। ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপ মঞ্চ থেকে অর্কেস্ট্রা ভূমিতে নেমে এসেছিল, অনেক চরিত্র এই সোপানাবলী বেয়ে অর্কেস্ট্রায় নেমে এসে বসত বা অভিনয় করত।

"হেরকুলানেয়ুম্" (Herculaneum) থিয়েটারের গঠন শৈলী ছিল পম্পেঈর মতই। তৎকালীন সাহিত্য রচনা থেকে জানা যায় যে প্রথমাবস্থায় কাঠের থিয়েটারে আড়ম্বরপূর্ণ অলংকরণের কাজ দেয়ালের গায়ে চিত্রিত করা হত। ক্ষুদ্রাকৃতি পম্পেঈতেও এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এই চিত্রিত দেয়ালের গায়ে বড় বড় প্রবেশমুখ ও কুলঙ্গি থাকত, সেখানে ছোট ছোট ভাস্কর্যমূর্তি বসানো হত। এ ছাড়া স্তম্ভগুলির গায়ে থাকত তির্যকভাবে কার্নিসশ্রেণী আর থাকত ব্রঞ্জের কারুকার্য। বস্তুতঃ প্রকৃত ব্রঞ্জের পরিবর্তে চিত্রাঙ্কনের দ্বারাই তার প্রভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। মোটের উপর দৃশ্যপট, চিত্রশিল্প এবং প্লাস্টারের মূর্তি মঞ্চের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হত। মঞ্চে অবতরণের জন্য যে ছোট ছোট সিঁড়িগুলি ছিল সম্ভবতঃ সেগুলি অপসারণ করা যেত। রোমান সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই

সব মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের চেয়ে মূকাভিনয়, অঙ্গাভিনয়, এবং খেলোয়াড়গণের শারীরিক কসরতের প্রাধান্যই ছিল বেশি।

প্রথমাবস্থায় রোমান সেনেটররা গ্রীকানুগ স্থায়ী মঞ্চ স্থাপত্যের পরিপন্থী ছিলেন—এবং যে কোন সুযোগেই রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে ফেলে দিতেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৫-৫২ অব্দে মহান্ "পম্পেঈ" (Pompey) সর্বপ্রথম স্থায়ী মঞ্চ স্থাপত্য নির্মাণ করেন এই "পম্পেঈ" নগরীতে। এটা স্থায়ী হল কারণ পম্পেঈ সুকৌশলে প্রেক্ষাগৃহের পশ্চাতে বিজয়িনী দেবী "উয়েনুসের বা ভেনাসের" (Venus Victrix) এক বেদী প্রতিষ্ঠিত করেন—ফলে তা বিনষ্ট হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। সমুচ্চ দেবমন্দিরের সানুদেশে স্থাপিত হল রঙ্গালয়টি। দেবমন্দিরের সম্মুখভাগে চক্রাকারে দর্শকদের উপবেশনের জন্য নেমে এসেছে গ্যালারীশ্রেণী; তাকে বসবার আসনশ্রেণী মনে না হয়ে মনে হত পূত দেববেদীর দিকে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সোপানাবলী—এবং সর্বশেষে নিম্ন ভূমিতে ছিল মঞ্চ। মনে হত সস্মিত বয়ানে স্বয়ং দেবী ভেনাস্ রঙ্গালয়ের অনুষ্ঠান অবলোকন করছেন। এই রঙ্গালয়ই ছিল রোমান রঙ্গমঞ্চ স্থাপত্যের অগ্রগণ্য এবং আদর্শ। পম্পেঈর এই রঙ্গালয়ে প্রেক্ষাগার ছিল গোলাকৃতি; তার মাঝে ছিল শ্রেণী বিভাগকারী অর্ধবৃত্তাকার পথ। আসনশ্রেণীর মাঝখানে ছিল মন্থন-দণ্ডের মত উর্ধ্বগতি বিভাজন। কিন্তু পরবর্তী রোমান যুগে এর আকার হয়েছিল আয়তাকৃতির। আসনশ্রেণীর সম্মুখবর্তী রেখাটি ছিল সম্পূর্ণ অর্ধবৃত্তাকৃতির। অর্কেস্ট্রাও ছিল অর্ধবৃত্তাকার। প্রেক্ষাগৃহ, অর্কেস্ট্রা এবং মঞ্চগৃহ, থিয়েটারের এই তিনটি মূল অংশের মধ্যে একটি ঐক্য ও সর্বাঙ্গীণ সংযোগ রক্ষার চেষ্টাই ছিল পম্পেঈর এক মৌলিক প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে পম্পেঈ মঞ্চ হয়ে উঠল অতি বৃহৎ আয়তাকৃতির। এর বৃহৎ, বৃহৎ প্রবেশমুখ সম্বলিত কুলঙ্গির পার্শ্ববর্তী স্তম্ভের সংখ্যাই ছিল ৫০টি। দু'পাশেই ছিল দু'টি অর্ধবৃত্তাকার পার্শ্বমুখ ও কুলঙ্গি।

পম্পেঈ, সেগেস্তা এবং ত্যুন্দারিস্ এই সমস্ত স্থায়ী রঙ্গালয়গুলির বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্যগঠন ছাড়াও এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ও ঐকীভূত স্থাপত্য গঠন প্রচেষ্টা। এই ধরনের স্থাপত্যগঠন রোমে কাষ্ঠ নির্মিত মঞ্চের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছিল, এবং সেই প্রচেষ্টাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছিল পাথরের স্থায়ী রঙ্গালয়ে। রোমের নাটক যেমন গড়ে উঠেছিল রোম ও গ্রীকধারার

সংমিশ্রণে তেমনিই হয়েছিল রোমান মঞ্চেরও বিবর্তন। আসলে রোমান মঞ্চধারাই, তথা সমগ্র সংস্কৃতির ধারাই ছিল বিভিন্ন প্রাচীন বিষয়বস্তু এবং উপকরণকে একটা বিশেষ গঠন ভঙ্গিমায় ফেলা এবং তাকে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়া যা কার্যকরীভাবে সর্বযুগেই রূপান্তরিত হতে পারে। প্রাচীন ইতালীয় ফার্সের মঞ্চ, প্রাচীন গ্রীসের প্রেক্ষাগার এবং রোমের নিজস্ব কারুকার্য খচিত, আড়ম্বর মণ্ডিত সম্মুখ দেয়াল—এই ত্রয়ী মিলিত হয়ে যে এক সুষম ঐক্যের সৃষ্টি হল তাই ছিল পরবর্তী রোমান যুগের স্থায়ী আচ্ছাদিত রঙ্গালয়ের ভিত্তিস্বরূপ।

ল্যাটিন নাটকের অভিনয়ের জন্য এরপরে আরো কতকগুলি স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরী হতে লাগল—তার মধ্যে সুবিশাল আকৃতির "মার্কেল্লুস্" (Marcellus) রঙ্গালয়ের নির্মাণ কার্য শেষ হয় খ্রীঃ পূঃ ১১ অব্দে। এটির নির্মাণকার্য সুরু হয় জুলিয়াস্ সিজারের সময়ে এবং শেষ হয় আগস্তাসের কালে। আগস্তাসের জামাতা তথা ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে এটি উৎসর্গীকৃত হয়। এই রঙ্গালয়টি ছিল বিরাট, বিশাল, আড়ম্বরপূর্ণ, প্রাসাদ সদৃশ। এই রঙ্গালয়ের সম্মুখভাগের কারুশিল্প তিনভাগে বিভক্ত করা যেত, এই তিনটি স্তম্ভের বৈপরীত্য আবার রক্ষিত হচ্ছিল প্রেক্ষাগারের গ্যালারীর ভিন্ন ভিন্ন অভ্যন্তর শ্রেণী বিভাগে, এবং তার উত্তল পথ-মধ্যে সংলগ্ন স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা। রঙ্গালয়ের নীচের তলার নির্মাণ কৌশল ছিল "দোরিক্" পদ্ধতির, দ্বিতীয় তলা ছিল "ঈয়োনিক্" পদ্ধতির এবং সর্বোচ্চ তলা নির্মিত হয়েছিল "কোরিন্থিয়ান্" পদ্ধতিতে। পরবর্তী বহু রোমান সাম্রাজ্যের রঙ্গালয়ে এবং "অ্যাম্ফিথিয়েটারে" এই রঙ্গালয়ের বহিরঙ্গের রচনাশৈলী অনুসরণ করা হয়েছিল, তা ছাড়া এর প্রভাব রেনেসাঁস্ যুগের প্রাসাদ সদৃশ ইতালীয় রঙ্গালয়েও পরিলক্ষিত হয়, এই রঙ্গালয়ের বহির্ভাগের দেয়ালটা শুধুমাত্র যে অলংকৃতই ছিল তা নয়, ওরি মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল অন্তর্ভাগের গঠন ভঙ্গিমা। এর পরিকল্পনা অত্যন্ত সুচারুরূপে করা হয়েছিল, এর দেয়াল যেমন ছিল সুগঠিত তেমনি ছিল আলোকপথ যুক্ত। রঙ্গালয়ের সিঁড়ি, আচ্ছাদিত করিডোর, উৎকৃষ্ট পথ ও দরজা, সবগুলিই হাজার হাজার রোমান দর্শকের আগমন ও নির্গমনের জন্য উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত ছিল, এই সকল পথ ধরে কোথাও ভিড় না বাড়িয়ে তারা অতি সহজেই আসতে যেতে পারতেন, কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশপথ ছিল, তা ছাড়া প্রত্যেকটি আসন থেকেই সমান

ভালভাবে মঞ্চ দেখা যেত। কারণ প্রেক্ষাগৃহটি ছিল অর্ধবৃত্তাকার এবং মঞ্চ ছিল নীচে। উপরে "কাতুলুস্" (Catulus) আবিষ্কৃত চটের আচ্ছাদন থাকায় দর্শকদের রৌদ্রদগ্ধ হতে হত না। কিন্তু নাবিকরা ও সব আচ্ছাদনের পরোয়া করত না। তারা এখানে, ওখানে, সেখানে—দেয়ালের উপরে, কার্নিসের মাথায়—যত্রতত্র বসে অভিনয় দেখত।

রোমের নাট্যাভিনয় গ্রীসের মত জাতীয় উৎসব ছিল না—সুতরাং সেখানে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকারও ছিল না, রোমের স্থায়ী রঙ্গালয়গুলি ছিল আবৃত—এবং এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিজাত নাগরিকদের টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখানো হত। রোমান টিকিটের বহু নিদর্শন পম্পেঈ ও অন্যান্য বহু রোমান নগরীতে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি এমনভাবে তৈরী করা হত যাতে দর্শক সাধারণ নির্ভুলভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসতে পারে। সেগুলি বেশির ভাগই হাড় কিংবা হাতির দাঁতে তৈরী হত; তাদের গায়ে আসনের ক্রমিক সংখ্যা কখন বা রোমান অঙ্কে কখন বা গ্রীক গাণিতিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ থাকত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হত মুদ্রার মত গোলাকৃতি—এই প্রবেশ স্মারকের অন্য পৃষ্ঠে মুখোশ, মাথা, মূর্তি বা প্রাসাদ খোদিত হত। এই নিদর্শনগুলির দ্বারাই তারা আসনের শ্রেণী বিভাগ নির্দেশ করতেন। কখনও এই টিকিটগুলি ফল বা মাছের আকৃতিরও হত। রোমে কেবল থিয়েটারেই নয় সার্কাস বা অ্যাম্ফিথিয়েটারের অনুষ্ঠানেও অনুরূপ ধরনের টিকিট বিক্রির প্রচলন ছিল।

ভিত্রুভিয়াস্ (Vitruvius—উয়েত্রুউয়েয়স্) গ্রীক মঞ্চের মতই রোমান মঞ্চেরও সহজ গঠন কৌশল উল্লেখ করে গেছেন। গ্রীসের মত রোমান মঞ্চেরও স্থাপত্য শৈলীর দিক দিয়ে অরৃখেস্ত্রা বৃত্তই ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরে চারটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা হত যার কোণগুলি কেন্দ্রের বাইরে বহিঃবৃত্তকে ১২টি বিন্দুতে স্পর্শ করত—অনেকটা ঘড়ির কাঁটার মত। যে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু এসে প্রেক্ষাগারের মধ্যভাগ স্পর্শ করত তার ভূমিরেখাই মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়ালের ভিত্তিরেখা হত। এই দেয়ালকেই রোমানরা "স্কেনে ফ্রন্স্" হিসেবে পর্যাপ্ত উপকরণে অলংকৃত করতেন। এই মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়ালের অর্থাৎ স্কেনে ফ্রন্স্-এর সমান্তরাল যে রেখা বৃত্তের মধ্যভাগ দিয়ে ছেদ করে গেছে সেটাই ছিল মঞ্চবেদীর "পুলপিতাম্" (Pulpitum)। মঞ্চের সম্মুখ ভাগ বা প্রোসীনিয়াম্ (Pros..nium) এগিয়ে

এসে অরূখেস্ত্রার অনেকটা স্থান দখল করে নিয়েছিল, ফলে অরূখেস্ত্রা বৃত্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে অর্ধবৃত্ত আকার ধারণ করেছিল। ভিক্রুভিয়াসের মতে রোমান যুগে সমস্ত অভিনেতারাই মঞ্চে উঠে এসে অভিনয় করতেন গ্রীসে কিন্তু কেবল চরিত্র অভিনেতারাই মঞ্চে উঠতেন, তা ছাড়া খোরাস বা অন্যান্য সঙ্গীত বা কাব্যের অভিনেতারা অরূখেস্ত্রায়ই অভিনয় করতেন। এ কথা সহজবোধ্য যে অভিনয় ক্ষেত্রে অরূখেস্ত্রার চেয়ে মঞ্চের ক্রম প্রাধান্য নাটকের আঙ্গিক বিবর্তনের সঙ্গেই এসেছিল। রোমান নাটকের মধ্যে একদিকে যেমন নাটকীয় গুণ এবং চরিত্র প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি খোরাস সঙ্গীত এবং কাব্যপ্রাধান্য নাটক থেকে কমে গিয়েছিল। নাটকের মধ্যে মূল আধিপত্যই ছিল সংলাপের তাই অভিনেতাদের উপরে মঞ্চের আকর্ষণই ছিল বেশি।

ভিক্রুভিয়াসের মতে গ্রীক মঞ্চের উচ্চতা ছিল দশ বা বারো ফুট এবং সে ক্ষেত্রে রোমান মঞ্চের উচ্চতা ছিল মাত্র ৫' ফুট। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে রোমে দর্শক সংখ্যা ছিল অনেক কম তাই খুব বেশি দূর থেকে তাদের অভিনয় দেখতে হত না—মঞ্চের উচ্চতাও অতএব কম হলে চলত, অন্যদিকে রোমে দর্শকরা এগিয়ে এসে অরূখেস্ত্রার দিকে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন কারণ অভিনেতারা সেখানে বিশেষ আসতেন না। দর্শকরা অরূখেস্ত্রার দিকে এগিয়ে আসায় মঞ্চেরও নিকটে এগিয়ে এলেন সেক্ষেত্রে মঞ্চের উচ্চতা খুব বেশি হলে তাদের পক্ষে আর কিছুই দেখা সম্ভব হত না। পম্পেঈতে অরূখেস্ত্রার মধ্যে অভিজাত দর্শকদের আসনের চিহ্ন থেকেই ভিক্রুভিয়াসের যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হয়।

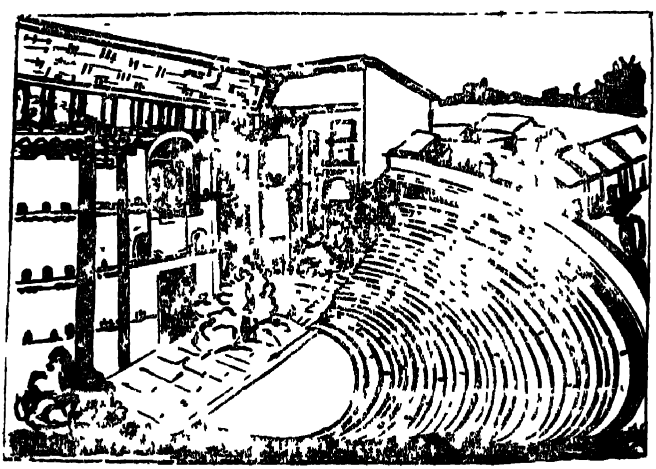
অরূখেস্ত্রাকে ঘিরে যে চারটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হত তাদের ১২টি কোণের মধ্যে ৭টি বিন্দু প্রেক্ষাগারের ঊর্ধ্বমুখী সিঁড়ির ধাপগুলির দিকে নির্দেশ দিত। বৃত্তের এই ভাগে নিম্নাংশের কিনারা ঘেঁষে দর্শকদের আসনশ্রেণী উঠে যেত। সিঁড়িগুলির দ্বিতীয় শ্রেণী বা পর্যায়ে ধাপে ধাপে আসন সংখ্যা বেড়ে চলত। এই ধরনের আসন সজ্জার ব্যবস্থা গ্রীক থিয়েটার থেকেই রোমে এসেছিল কিন্তু গ্রীসে এত গাণিতিক সংখ্যা সমতা রক্ষা করে চলা হত না। এর মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যের দর্শন মিলত, কারণ বড় রঙ্গালয়ে সিঁড়ির ধাপের সংখ্যা এবং আসন সংখ্যা হত বেশি আর ছোট রঙ্গালয়ে আনুপাতিক হারে হত কম।

ত্রিভুজগুলির আর বাকি ৫টি কোণ মঞ্চের ৫টি ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ দ্বারের দিকে ইঙ্গিত করত। তার মধ্য দরজাটি থাকত মঞ্চের মধ্যকুলঙ্গিতে—এটি ছিল রাজকীয় প্রবেশ দ্বার "উয়ালউয়া বা আউলা রেজিয়া" (Valva or Aula regia) তার দু'পাশের দু'টি কুলঙ্গি সম্বলিত দ্বার ছিল অতিথিদের প্রবেশ দ্বার "হস্‌পিতোলিয়া" (Hospitolia)। অন্য দু'টি কোণে ছিল মঞ্চের পার্শ্ববর্তী দু'টি প্রবেশ দ্বার "ইতিনেরা উয়েরসুরারুম্‌" (Itinera Versurarum), এই পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ দু'টি থাকত গ্রীসের পারাস্কেনিয়ার অনুরূপ মঞ্চালয়ের দুই বিস্তৃত পক্ষ সদৃশ অংশে। গ্রীসে প্যারাস্কেনিয়া, অরখেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগারে প্রবেশের জন্য যে দুই উন্মুক্ত প্যারোদোই বা প্রবেশ পথ ছিল, রোমান রঙ্গালয়ে সেই স্থানই গ্রহণ করল উচ্চ পৃষ্ঠ উত্তল পথ, এই পথই ছিল রোমে প্রেক্ষাগার ও অরখেস্ত্রায় প্রবেশের প্রধান পথ।

সমগ্র রঙ্গালয়টিকে রোমানরা একটি ঐক্যবদ্ধ প্রাসাদ সদৃশ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আর সেইজন্যই দর্শকদের আসনশ্রেণীর সর্বপশ্চাতে অর্থাৎ রঙ্গালয়ের মূলগৃহের সর্বোচ্চ কিনারা ঘিরে তারা আচ্ছাদিত ছোট ছোট থামওয়ালা খোপ খোপ অলিন্দশ্রেণী বা পোর্টিকো তৈরী করেছিলেন। আসনশ্রেণীর পশ্চাতের এই অলিন্দশ্রেণীর উচ্চতা হত সমগ্র মঞ্চগৃহটির বা "স্টেজ বিল্ডিং"-এর সম উচ্চ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনতলা বা চারতলা উচ্চ মঞ্চগৃহ এবং প্রেক্ষাগারের উচ্চতা শেষ পর্যন্ত একই হত, অন্যদিকে প্রেক্ষাগারের উর্ধ্বসীমা এভাবে অলিন্দশ্রেণী দ্বারা সজ্জিত হওয়ায় এবং তার উপরে চন্দ্রাতপ থাকায় মঞ্চের সঙ্গে একটি সমন্বিত রূপ ধারণ করত। ভিত্রুভিয়াস্‌ এই অলিন্দশ্রেণী থাকার আর একটি কারণ দেখিয়েছেন যে এতে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে কণ্ঠস্বর সমভাবে প্রতিধ্বনিত হত। গ্রীক রঙ্গমঞ্চের গঠন ধারা যে রোমানরা যথাসাধ্য রক্ষা করেছিলেন তার অন্যতম কারণ হল, গ্রীক রঙ্গমঞ্চের গঠন ভঙ্গিমা এমন অদ্ভুত ছিল যে তার মধ্যে শ্রুতিগম্যতা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবেই রক্ষিত হত। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিলাসী রোমানদের আরাম দেওয়ার জন্য প্রেক্ষাগৃহের আসনশ্রেণীর পাশ দিয়ে নালার মধ্যে সুগন্ধি শীতল জল প্রবাহিত করে দেওয়া হত—ফলে সমগ্র রঙ্গালয়টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠত।

আতেল্লান্‌ ফার্সের সঙ্গে রোমে কাঠের যে আদিম মঞ্চ নির্মাণ কৌশল এসেছিল—গ্রীক নাটকের অনুগামী হয়ে তার সঙ্গে এসে গ্রীক গোলাকৃতি

অর্খেস্ত্রা ও প্রেক্ষাগৃহের গঠন পদ্ধতি সংমিশ্রিত হয়, ফলে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে রোমান রঙ্গালয়ের এই সমন্বিত স্থাপত্য রীতি গড়ে ওঠে। পরিশেষে এটা হয়ে দাঁড়াল অনেক বেশি সুন্দর ও বাস্তবগুণসম্পন্ন। রঙ্গালয়ের বিভিন্ন বিভাগ যা তারা গ্রীকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা তারা অনেক নিয়ম, শৃংখলা ও সমতাদ্বারা গ্রথিত করেছিলেন। প্রেক্ষাগারের মাঝে তারা সহায়ক কাঠামো হিসাবে স্তম্ভের ব্যবহার করতেন, যাতে ভূমির গঠনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়েও আসনশ্রেণী পাতা যায়। সর্বোপরি সমগ্র রঙ্গালয়ের গুহামুখ ঘিরে থাকত আচ্ছাদিত অলিন্দশ্রেণী তাতে রঙ্গালয়ের বহির্দৃশ্যটি অত্যন্ত বিশাল, বিপুল দেখাত। রোমানরা সর্বাধিক ঐশ্বর্য, বিলাস ও স্থাপত্য-বিজয়ের খেলা দেখাতেন মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়াল—স্কেনে ফ্রন্স্ নির্মাণকালে, এ ছাড়া তারা প্রেক্ষাগারের বাইরের দেয়ালকেও প্রবেশমুখ, আর্চ, স্তম্ভ ও সিঁড়ি দ্বারা সুশোভিত করে তুলতেন। মঞ্চগৃহের একেবারে পশ্চাদ্‌দেয়ালেও নানাভাবে স্থাপত্য অলংকরণ করা হত। তাই আমরা



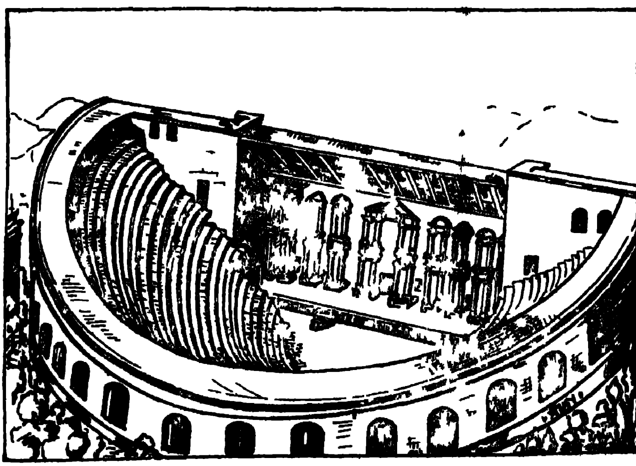
রোমান থিয়েটার : ওরাঞ্জে।

নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে রোমান রঙ্গালয় তাদের নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠলেও অন্যদিক দিয়ে ছিল রোমান ঐশ্বর্য, বিলাস ও স্থাপত্য কলাকৌশলের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই মঞ্চে রোমানদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অবদান ছিল রঙ্গালয়ের উপরের কাঠ ও ক্যানভাসের আচ্ছাদনটি। এই চন্দ্রাতপটি পেছনের দেয়াল থেকে ঢালু হয়ে এসে দর্শকদের বিপরীত দিকে মঞ্চের উপরিভাগে শেষ হয়ে যেত। মঞ্চের উপরে এই আচ্ছাদন থাকার কারণ হল মঞ্চগৃহের সম্মুখ দেয়ালের অত্যন্ত মূল্যবান সাজসজ্জাকে রক্ষা করা। এই আচ্ছাদনটি দর্শকদের দিকে ক্রমে উচ্চ হয়ে আসায় তা খুব ভাল শব্দপ্রেরকের কাজ করত, আবার দর্শকদের রৌদ্র, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষাও করত, অনেক সময় এই চন্দ্রাতপের গায়েও নানান চিত্রাবলী অঙ্কিত থাকত।

গ্রীক সাম্রাজ্যবাদের যুগে যেমন তার রঙ্গালয় দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার রোমান স্থাপত্য রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নগরী ও প্রদেশগুলিতে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোম নগরীর পূর্ব এবং পশ্চিম দু'দিকেই তার সংস্কৃতিগত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমে ছিল উত্তর ইতালি এবং পূর্বে ছিল এশিয়া মাইনরের দক্ষিণভাগ এছাড়াও উত্তর আফ্রিকার খানিকটা অংশও রোমের প্রভাবযুক্ত ছিল। উত্তর ইতালির রোমান ধারার রঙ্গালয় ছিল—১। ওস্তিয়া (Ostia) ২। মিন্তুরনয় (Minturnæ) ৩। ফিয়েসোলে (Fiesole) এবং ৪। ওরাঞ্জে (Orange) ইত্যাদি। এশিয়া মাইনরে রোমান শৈলীর রঙ্গালয়গুলি বেশির ভাগই গ্রীক প্রথার রঙ্গালয় পুনর্নিমিত হয়েছিল—এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—১। প্রিয়েনে (Priene) ২। এফেসোস্ (Ephesos) ৩। ম্যাগ্‌নেসিয়া (Magnesia) ৪। এয়ারানোই (Airanoi) ৫। তের্‌মেস্‌সেস্ (Termesses) ৬। সাগালাস্‌সোস্ (Sagalassos) ইত্যাদি। এই সমস্ত রঙ্গমঞ্চগুলির গঠন ভঙ্গির প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় যে, এগুলি ছিল গ্রাকো-রোমান পদ্ধতির। এই ধারা অনুযায়ী রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ গ্রীকপ্রথায় পর্বত সানুদেশেই তৈরী হত। এর আকার হত অর্ধবৃত্তাকৃতি, সামনে এগিয়ে এসে মাঝখান দিয়ে কীলকসদৃশ বিভাজন ঘটত ফলে অর্ধবৃত্তের সুগোল কিনারা আর থাকত না সেখানে আয়তাকার রঙ্গমঞ্চ স্থান পেতে পারত। এই রঙ্গালয়গুলির মঞ্চের পশ্চাদ্‌দেয়ালটি রোমান শৈলী অনুযায়ী আড়ম্বরপূর্ণভাবে নির্মিত হত, এবং সেখানে সুসজ্জিত কুলজি ও স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে তিনটি বা পাঁচটি মঞ্চ প্রবেশপথ থাকত। এর মধ্যে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সংযুক্ত মঞ্চের "পোদিউমের" উচ্চতাবিশিষ্ট যে দেয়ালটি

তার গঠনকৌশল ছিল রোমানদের একেবারে নিজস্ব অবদান। এই অনুচ্চ দেয়ালের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট দরজা থাকত, কোন কোন দরজা এত ছোট হত যে তার মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারত না। এই দরজা দিয়ে পথ চলে গিয়েছিল ভূনিম্নতলায়। এ থেকে আমরা সহজেই ধারণা করে নিতে পারি যে যখন এর সম্মুখবর্তী অর্ধবৃত্তাকার অবৃখেস্ত্রায় পশুর লড়াই হত, অথবা মানুষের উপর ক্ষুধার্ত পশু লেলিয়ে দেওয়া হত, এই দরজার মুখ খুলে পশুদের অবৃখেস্ত্রায় প্রবেশ করানো হত। অবৃখেস্ত্রার অবস্থান একদিকে যেমন ছিল নিম্নভূমিতে অন্যদিকে সন্নিকটবর্তী রাজকর্মচারী ও প্রধান অতিথিদের আসনশ্রেণী নিরাপদ রাখার জন্য অবৃখেস্ত্রা উঁচু কার্নিস দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। পম্পেঈ-র মত ছোট রঙ্গালয়ও এমনি করে বন্যপশুর হাত থেকে



একটি খাঁটি রোমান পদ্ধতির রঙ্গালয়।

আত্মরক্ষার জন্য অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত ঘেরা ছিল। এমনকি নীরোর রাজত্বকালে গ্রীসের অতিপ্রাচীন পবিত্র দিওন্যুসাস্ থিয়েটারটিও এইরূপ রোমান পদ্ধতিতে পুনর্নির্মিত হয়েছিল। এই রঙ্গালয়ের অধিকার তখন দিওন্যুসাস্‌কে নীরোর সঙ্গে সম-অংশে ভাগ করে নিতে হয়েছিল। এই পবিত্র রঙ্গভূমিতে বসেই নীরো গ্লাদিয়েতরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা পশুর লড়াই দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন।

এবার গ্রীক নাটক ও মঞ্চের সঙ্গে রোমান নাটক ও মঞ্চের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্যের উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

১। গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে, সেখানে নাট্যাভিনয় ছিল জাতীয় উৎসব। তাই একদিকে ছিল তা গাম্ভীর্যপূর্ণ ও পবিত্রতাময় অন্যদিকে হয়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি।

রোমে নাটকের সঙ্গে কোন পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংযোগ ছিল না। এ ছিল ঐশ্বর্যশালী, বিলাসী অভিজাত রোমানদের ব্যসনের একটি অঙ্গ।

২। গ্রীক নাটকে ট্র্যাজেডিই ছিল প্রধান—কমেডির মধ্যে কৌতুক রসই ছিল মূল উপজীব্য, রোমে ট্র্যাজেডির স্থান থাকলেও প্লাউতুস্ এবং তেরেন্স সাধারণ জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য রোমান্টিক কমেডি রচনা করেছেন। এই সব কাহিনীর বিষয়বস্তু ও চরিত্র গ্রীসের মত পুরাকাহিনী থেকে (as they said) নেওয়া হত না—কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ হত পারিবারিক ঘটনা নিয়ে।

৩। গ্রীক নাটকের আরম্ভে খোরাসই ছিল মূল নায়ক। ক্রমশঃ খোরাসের প্রাধান্য কমলেও খোরাস হেলেনীয় যুগ পর্যন্তও নাটকের একটি অপরিহার্য ও বিশিষ্ট অংশ বলেই পরিগণিত হত। রোমান নাটকে খোরাস সকল প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যই একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল—যেটুকু বা টিকে ছিল তা ছিল কাহিনীর সঙ্গে সর্ব সম্পর্কশূন্য নিতান্তই প্রথানুগভাবে।

৪। গ্রীক নাটকে খোরাসের প্রাধান্য ছিল বলেই নাটকীয় চরিত্র সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প। রোমান নাটকে চরিত্রগুলিই ছিল নাটকের প্রধান কাহিনীবেত্তা—তাই চরিত্র সংখ্যাও ছিল প্রায় আধুনিক নাটকের মতই অধিক।

নাট্য রচনা রীতির এই ব্যবধানগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রোমান রঙ্গালয়ে গ্রীক রঙ্গালয় থেকে কতকগুলি নূতন বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছিল।

৫। গ্রীক রঙ্গালয় আত্তিক্ যুগ থেকেই (আত্তিক্—আথেন্স সম্বন্ধীয় ; আথেন্সের প্রাধান্যের যুগ) পাহাড়ের সানুদেশে নির্মিত হওয়ার রীতি মেনে চলছিল ; কিন্তু রোমান প্রেক্ষাগৃহ সাধারণতঃ নগর মধ্যে সমভূমিতে একক স্থাপত্য হিসেবে গড়ে উঠত।

৬। গ্রীক রঙ্গালয়ে অর্‌খেস্ত্রা, প্রেক্ষাগৃহ (গ্যালারী) ও স্কেনেগৃহ এই

তিনটি অংশই ভিন্ন ভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এগুলি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বজায় ছিল।

রোমান থিয়েটারে স্কেনেগৃহ, অর্কেস্ট্রা এবং প্রেক্ষাগৃহ এই তিনটি অংশ একত্রিত হয়ে একটি সমবেত, সুগঠিত একক স্থাপত্য শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

৭। রোমান স্কেনেগৃহ আয়তনে গ্রীক স্কেনেগৃহের তুলনায় অনেক বড় হত এবং জমকালোভাবে সুসজ্জিত হত। কারণ রোমান নাটকের মূল অভিনয় ক্ষেত্র অর্কেস্ট্রা ছিল না, ছিল স্কেনের সম্মুখবর্তী মঞ্চ।

৮। রোমান নাটকের স্থান বেশিরভাগই হত কোন অভিজাত নাগরিকের গৃহ সম্মুখ বা রাজপথ তাই রোমান থিয়েটারে মঞ্চ হত সংকীর্ণ ও লম্বা; এর গভীরতা থাকত কম—খানিকটা রাজপথ সদৃশ। রোমে মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ উভয়ই চন্দ্রাতপ দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত। মঞ্চের উচ্চতাও হত গ্রীক মঞ্চের চেয়ে কম।

৯। রোমে প্রেক্ষাগার সংক্ষিপ্ত করে এনে একেবারে অর্ধবৃত্তের আকারে গঠিত হতে লাগল—আর মঞ্চের অংশটা আয়তক্ষেত্রের মত বর্ধিত হয়ে যেত। কিন্তু গ্রীক প্রেক্ষাগার বেশিসংখ্যক দর্শকের জন্য জ্যামিতিক অর্ধবৃত্তের বাইরেও পরিবর্ধিত থাকত।

১০। রোমান থিয়েটারে অর্কেস্ট্রা আকারে ছোট হয়ে গিয়েছিল কারণ খোরাস তখন তার সকল প্রাধান্যই হারিয়ে ফেলেছিল। রোমে অর্কেস্ট্রা বৃত্তের আকার ছেড়ে অর্ধবৃত্ত হয়ে দাঁড়াল। গ্রীসে তা বৃত্তাকারেই ছিল।

১১। রোমান যুগে নাটক যেমন মুষ্টিমেয় অভিজাতের তুষ্টির জন্য রচিত হত রঙ্গালয়ও তেমনি আকারে গ্রীক রঙ্গালয়ের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেল। খোরাসও নেই যে একই সঙ্গে বহুসংখ্যক দর্শককে মুগ্ধ করে রাখতে পারে। রোমান রঙ্গালয়ে বসবার আসন সংখ্যাও স্বল্প হয়ে এল। অভিজাত বিলাসী রোমানরা প্রধানতঃ পরিমাণের আধিক্যের চাইতে শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বই বেশি কামনা করতেন। রোমান থিয়েটারে বহিরাড়ম্বরের দিকেই মূল আকর্ষণ ছিল বলেই সেখানে দর্শক সাধারণ এবং নাটকের শৈল্পিক মান ছিল গ্রীসের তুলনায় অনেক অবনত। গ্রীসে নাট্যাভিনয়ের মূল্যবোধ ছিল অত্যন্ত সুগভীর। তা কেবল তাদের প্রমোদ ছিল না, ছিল জীবন-জিজ্ঞাসা।

॥ ভারতবর্ষ ॥

হিন্দু রঙ্গালয়

ভারতবর্ষে নাটকের চর্চা অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্যদের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। পণ্ডিতদের অনেকের মতে ঋক্‌বেদের মধ্যেই নাটকের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়—যেমন "সরমা ও পণি", "যম ও যমী", "পুরুরবা ও উর্বশী", প্রভৃতি সংবাদ সূক্ত বা গাথা কাহিনী। পরবর্তীকালে অন্যান্য উপাদানের সংযোগে নাটকের ধারা যেদিকেই প্রবাহিত হক না আমরা বলব, আর্য সভ্যতার প্রথম পর্বেই—অন্য সমস্ত দেশের প্রাথমিক পর্বের মতই নাটকের বীজ উপ্ত হয়েছিল। আর্যরা যজ্ঞ করতেন সে যজ্ঞ ছিল তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সুগভীর ভাবে যুক্ত, যখন যজ্ঞ হত তখন তাতে আহুতি দেওয়া হত, গোষ্ঠীর সকলে ঘিরে দাঁড়াত, সোমরস পান করা হত—পুরোহিত বা মুনি উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে বেদমন্ত্র গাইতেন। তাতে বিভিন্ন দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তির স্তব ও প্রশস্তি ছিল—ছিল গান আর ছোটখাট দু'একটা কথা কাহিনীর উদাহরণ দিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা। অতএব তা যখন সমবেত ভাবে গীত হত তখন তাতে নাটকীয় উপাদান ছিল না, একথা বলতে যাওয়া অযৌক্তিক।

আর্যরা জীবনকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে আমরা যখন সংস্কৃত নাটকের সুসংস্কৃত পূর্ণ রূপ পাই তখনও দেখি তার আগাগোড়াই একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আর্যভারত নাটককে যতখানি উন্নততর শিল্প হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে, বর্তমান জগৎও আর কোন সংজ্ঞায় শিল্প হিসেবে নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য ততখানি তুলে ধরতে পারেনি। তবে একথা ঠিকই, ভারতীয় নাট্যারম্ভের কাল ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় নির্ধারিত করা দুষ্কর। তার কারণ আর্যরা ইতিহাসবেত্তা ছিলেন না। সোজাসুজি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সরবরাহ তাঁদের ধাতে সইত না। অতএব তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের মহাকাব্য, পুরাণ, গাথা, কাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদির আশ্রয় নিতেই হবে। ভারতীয়রা যে সব ছেড়ে, লৌকিক, অলৌকিক জীবন জুড়ে একটা কিছু গল্প শুনতে ভালবাসতেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই গল্পের খোলসটার মধ্যেই থাকত

ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুই। ঐ গল্পের মধ্যে স্বর্গের দেবতা, মর্ত্যের মানুষ সবই একাকার হয়ে যায়—তাই তাকে মিথ্যে বলতে পারি, বলতে পারি নিছক গল্প, কিন্তু তার মধ্যে যে তত্ত্বটা ছিল, যে ইতিহাসটা ছিল সেটা মিথ্যে ছিল না—তা ছিল জীবন সমুদ্রের মন্থন করা ধন।

হিন্দু নাট্যশাস্ত্র নিয়ে এবং নাট্যতত্ত্ব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা অনেক প্রাচীন আচার্য এবং পণ্ডিতরাই করে গেছেন। তার মধ্যে আমরা ভরতমুনি, কোহল, নন্দিকেশ্বর, মাতঙ্গ ইত্যাদি ঋষিদের রচনাভাগ বা কোথাও কোথাও নামের উল্লেখ পাই। তারো পূর্বে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ, কারো কারো মতে পঞ্চম শতকে পাণিনির রচনায় শিলালিন্ (Silalin) এবং কৃশাশ্ব (Krsasva) এই দুই নাট্যবেত্তার রচিত নাট্যসূত্রের উল্লেখ রয়েছে। পাতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১৪০ অব্দে, তারো মধ্যে আমরা বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখ পাই। পাণিনির ব্যাকরণে অর্থাৎ সম্ভাব্য খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের গ্রন্থে যদি নাট্যশাস্ত্র রচয়িতাদের নামোল্লেখ থেকে থাকে তবে আমরা ধরতে পারি, তখন খোদ নাটক যথেষ্টই বিস্তৃত এবং পরিণত আকার ধারণ করেছিল। তার কারণ স্বতঃস্পন্দিত প্রাণপ্রবাহে আগে শিল্প, সাহিত্য এবং ভাষার সৃষ্টি হয় পরে তার নীতি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেয় শাস্ত্র ও ব্যাকরণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাট্যশাস্ত্রের প্রায় ৪০ খানি পুঁথি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রমাণিত ও প্রচারিত হল "ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র"। তাঁর রচনাকাল সম্ভবতঃ দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতক—আবার কোন কোন ইউরোপীয়ের মতে তৃতীয় খ্রীষ্ট শতক ছিল। ভরতমুনি ছাড়া নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা এবং ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে "নন্দিকেশ্বরের" নামও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অভিনব গুপ্তের টীকাসহ "নাট্যশাস্ত্রের" বরোদা সংকলনের সম্পাদক অধ্যাপক এম, রামকৃষ্ণ কবি—নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন[১] যে নন্দিকেশ্বরের সম্প্রদায় ভরতের চেয়েও প্রাচীন ছিল। নন্দিনের শাস্ত্র অধ্যয়ন করে লোকের এই ধারণাই হবে যে তিনি নাট্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের প্রথানুগ ধারাটিকেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং বেঁধে দিয়েছেন। নন্দিন যে প্রথানুগ পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন শাস্ত্রানুযায়ী তাকে বলা হয় "নাট্যধর্মী" (Theatrical Convention) রীতি। ভরতমুনি নন্দির অনুরূপ নাটকের নাটকীয় রূপায়ণ ছেড়ে দিয়ে নাটকের বাস্তবানুগ বা "লোকধর্মী"

রূপায়ণই সমর্থন করেছেন। এইজন্যই ভরতের অভিনয় পদ্ধতির মূল ভিত্তিভূমি হল বাস্তবানুগ আচরণের দ্বারা সঞ্চারিভাবের সাহায্যে স্থায়িভাবের প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবেই "ভাবাবেগ" বা "ইমোশনের" ঘাত প্রতিঘাতের পথে নাটককে রস-পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা জানি শিল্প সম্পর্কে যত রীতি নীতির বিরোধিতা—কলকোলাহলের আবির্ভাব হয়েছে—তা সকলেরই মূল হল—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী—এই দুই বিপরীত পদ্ধতি। সমস্ত "শিল্পেরই" প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে লোকধর্মিতা অর্থাৎ বাস্তবানুগ প্রচেষ্টা থেকে, ক্রমশঃ তা রীতি, নীতি প্রথার অনড় বাঁধনে শিল্পধর্মী তথা নাট্যধর্মী হয়ে উঠেছে। পরবর্তী শাস্ত্রকার কোহল ও মাতঙ্গকে ভরতের শিষ্য বা অনুগামীই বলা হয়।

নন্দিকেশ্বরের রচিত শাস্ত্রের নাম "অভিনয় দর্পণ" এখানাও যথেষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। নন্দিকেশ্বর তাঁর অভিনয় শাস্ত্রে "বহিরঙ্গের" বা দৈহিক অভিনয়ের অর্থাৎ 'মুদ্রার' দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন বেশি। কিন্তু ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' কেবল ইঙ্গিতধর্মী মুদ্রাকেই অগ্রাধিকার দেন নি—তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন মানবিক ভাবাবেগের লোকধর্মী প্রকাশ পদ্ধতি যার মূলাধার—বিজ্ঞানসম্মত "রসতত্ত্ব"। কোহল ও মাতঙ্গের সম্প্রদায় ভরত ও নন্দিকেশ্বর এই দু'জনের দুই দলের মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করেছে। অভিনবগুপ্ত ও সারদাতনয়ের মত বহু টীকাকারই মনে করেন, নাট্যসম্পর্কিত যে সকল বিষয় ভরত আলোচনা করেন নি কোহল তার সূত্র নির্ণয় করেন। তিনি নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্যতত্ত্বের উপরে বহু শ্লোক রচনা করেন।

"কীথ" প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় নাট্যবেত্তার মতে—রামায়ণ, মহাভারত এই দুই মহাকাব্য রচনার পরে সংস্কৃত-নাটকের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বীণা সহযোগে বিভিন্ন জনপদে ও রাজসভায় এই মহাকাব্য আবৃত্তি করা বা গাওয়া হত। তাই থেকেই হিন্দু নাটকের সৃষ্টি। এ তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারি না। কোন দেশে, কোন কালেই একদিনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হয়নি। নাটকের প্রাথমিক উপাদান ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে যে নৃত্যগীত তারি মধ্যে পাওয়া যায়। পরিবর্ধিত অবস্থায় তারি মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি হয়ে এবং কথোপকথনের মাত্রা বেড়ে বেড়ে গিয়ে নাটক পূর্ণ রূপ পায়।

আমরা বেদের যুগেও দেখেছি সঙ্গীত, নৃত্য, ও কথোপকথনের উপাদান রয়েছে। মহাকাব্য তার অনেক পরেকার। সুতরাং মহাকাব্যের যুগ থেকেই হিন্দুদের নাট্যারম্ভ একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কোন দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজজীবনের উপরে মহাকাব্যের প্রভাব অতি সুবিস্তৃত ভাবেই পড়ে। তখন সে দেশের কাব্য, সাহিত্য, নাটক, শিল্প সকলেই এই মহাকাব্য থেকে রস আহরণ করে পরিবর্ধিত হতে থাকে। মহাকাব্যের বিভিন্ন বীরের কাহিনী অবলম্বনে নূতন কাব্য ও শিল্পের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেও শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, সমাজজীবন সবকিছুর উপরই মহাকাব্যের প্রভাব যে কতখানি তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তেমনি আমরা দেখেছি গ্রীক সভ্যতারও ভিত্তিভূমি ছিল হোমরের মহাকাব্যদ্বয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিরও মূল কাহিনী সূত্র হোমরের মহাকাব্য থেকেই নেওয়া, আরিস্তোতলের ভাষায় এই মহাকাব্যের অবলম্বিত উপাদানকেই বলা হয়েছে পৌরাণিককাহিনী বা "অ্যাজ্ দে সেড্" (As they said)। কিন্তু আমরা গ্রীক অধ্যায় আলোচনাকালেও দেখেছি যে পরিণত অবস্থায় মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করলেও গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল আরো অনেক আগে। খোরাস সঙ্গীত, দিওন্যুসাস্ কাহিনী, জাতীয় বীর চরিত্র ইত্যাদি বহু পথ পরিক্রমা করেই নাটক এগিয়ে এসেছিল। তেমনিই আমরা দেখেছি খ্রীষ্টীয় ইউরোপে মহাকাব্যেরই অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, এবং জীবনের উপর সুপরিব্যাপ্ত প্রভাব, তা হল বাইবেল। অতএব হিন্দু নাটক যে মহাকাব্যের পরেই প্রখ্যাত বংশের কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি অবলম্বন করে, উন্নততর শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তার পূর্বে কিছু ছিল না, একথা বলার পথে বহুপ্রকার প্রামাণ্য বাধা এসে যাচ্ছে। মহাভারত মহাকাব্যের মধ্যেই নটনটীদের উল্লেখ বহু স্থানে রয়েছে। মহাভারতের "বনপর্বে" যদু ও বিরিঞ্চিদের দ্বারা যুদ্ধকালে অভিনয় নিষিদ্ধ করা ও নটদের নগর থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা আছে। মহাভারতেই আমরা উল্লেখ পাই যে রাজপ্রাসাদে, রাজ অন্তঃপুর সংলগ্ন স্থানে নৃত্যশালা বা নাট্যশালা নামে আলাদা গৃহ থাকত। সেখানে রাজকুমার, রাজকুমারীরা নৃত্য, গীত ইত্যাদি শিক্ষা করতেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে মহাকাব্যদ্বয় গুপ্তযুগে যখন পুনর্লিখিত হয়

তখন অনেক কিছু যোজনা হয়েছে আবার কাল প্রবাহেও মহাকাব্যের খাঁটির সঙ্গে অনেক অখাঁটি মিশে গিয়েছে—অতএব এসব তথ্যও পরবর্তী-কালের যোজনা কি না, হতে পারে—কিন্তু মহাভারতে সমগ্র বিরাট পর্বটা নিশ্চয়ই যোজনা নয়। এই বিরাট পর্বেই আমরা পাই, অর্জুন বৃহন্নলাবেশে রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য, গীত ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। অর্জুনের ক্লীবত্ব মিথ্যে হতে পারে কিন্তু তাঁর ছদ্মবেশটা মিথ্যে ছিল না। পঞ্চপাণ্ডবের এক বছর অজ্ঞাতবাস মূল কাহিনীরই অংশ। সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি—রাজকন্যারা যে কলা শিল্প প্রতিদিনের শিক্ষাদ্বারা অর্জন করছেন, অদ্বিতীয় যোদ্ধা স্বয়ং অর্জুনও যে কলায় পরম পারদর্শী সমাজে তার তখন যথেষ্টই বিস্তৃতি ও অনুশীলন ছিল। আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই নৃত্য, গীত ইত্যাদি নাটকীয় উপাদানগুলি বিবর্তিত হয়ে নাট্যরূপে এসে সর্বপ্রথম গ্রহণ করে দেব-চরিত্র, দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ-চরিত্র এবং তৃতীয় পর্যায়ে আসে সাধারণ মানব-চরিত্র। আমরা পর্যালোচনা করলে তাই দেখতে পাব যে হিন্দু নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রাথমিক অবস্থায় দেবাসুরের যুদ্ধ ও দেবচরিত্র ছিল প্রধান। মহাকাব্যদ্বয়ের আবির্ভাবের পর রাজচরিত্রই নাটকে প্রধান হল। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ হিন্দুনাটক মাঝপথেই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাতে আর সাধারণ মানবকাহিনীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

॥ নাট্যশাস্ত্র বা পঞ্চম বেদ ॥

আমরা ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের সূচনা পর্বের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাই না, আমাদের নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন কিংবদন্তীর উপরে, তাই যখন প্রশ্ন জাগে, নাটকের মত এই অপরূপ শিল্পশোভা সৃষ্টি করতে হিন্দুরা কোথা থেকে শিখল, কেমন করে পেল? তখন পুরাকাহিনীর ঋষি শ্বেত শুভ্র জটাজুটের মধ্যে মৃদু স্নিগ্ধ হেসে বলবেন—তবে শোন সে কাহিনী—অনেক, অনেকদিন আগে—ঋষিরা তখন চতুর্বেদ রচনা শেষ করেছেন, এই চতুর্বেদে অধিকার ছিল কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্ররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই জনতার বেদপাঠে অধিকার ছিল না। কালক্রমে তারা বেদপাঠে অধিকার দাবী করতে লাগল, কিন্তু দাবী করলেই তো তাদের অধিকার দেওয়া যায় না—তা হলে তারাও যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের

সমতুল্য হয়ে ওঠে। এই অশাস্ত্রীয় ব্যাপারে "হ্যাঁ" বলা যেমন যায় না তেমনি "না" বলেও জনমতকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর। তখন দেবদানব গন্ধর্ব, যক্ষরক্ষ, মহোরগ সহ মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ গেলেন ব্রহ্মার কাছে —বললেন, পিতামহ আপনার চতুর্মুখ দিয়ে যে চতুর্বেদের উদ্ভব হয়েছে সাধারণ বৈশ্য শূদ্ররাও যে তাতে অধিকার চায়—কি করি, আমরা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক চাই যা শ্রব্য ও দৃশ্য উভয়ই হবে। আপনি চতুর্বেদের সারমর্ম নিয়ে এক পঞ্চমবেদের সৃষ্টি করুন, জনসাধারণের যাতে অধিকার থাকবে। ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করে বললেন—এতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাক্য প্রভৃতি সর্বশিল্পের সমন্বয় ঘটবে। এ হবে ভবিষ্যৎ লোকের সর্বকর্মের অনুদর্শক, এর দর্শনে এবং শ্রবণে লোকে আনন্দ পাবে, তদুপরি হবে লোকশিক্ষা। এতে ঋগেদ হতে পাঠ্য অর্থাৎ কথা, সামবেদ হতে গীত, যজুর্বেদ হতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হতে রস গ্রহণ করা হল।

এই ভাবে পঞ্চম বেদ রচনা করে প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রকে তা প্রয়োগ করতে বললেন। ইন্দ্র উত্তর করলেন—ভগবন্, দেবতারা এই নাট্যকর্ম করতে অশক্ত এবং অযোগ্য। "অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মণি।" (ভরত ; নাট্যশাস্ত্র ; ১ম অধ্যায়, শ্লোক ২২)।

ইন্দ্রের কথা শুনে পিতামহ ভরতমুনিকে আদেশ করলেন—তুমি তোমার একশত পুত্র বা শিষ্য নিয়ে ইহাকে প্রয়োগ কর। ভরত নাট্যবেদ সম্যক্ উপলব্ধি করে বললেন—নাট্যের অর্থ উপলব্ধি করেছি কিন্তু কি বিষয় নিয়ে প্রয়োগ করব নির্দেশ করুন। ব্রহ্মা বললেন—ইন্দ্রের বিজয়োৎসব সমুপস্থিত, এই উপলক্ষে অভিনীত হওয়ার জন্য তুমি একটি নাটকের মহড়া দাও।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থে বলেছেন,

"বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ দ্রাবিড়দের শিবকে করে রেখেছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু নটনাথরূপে আখ্যাত শিবের নিকটেই আর্যগণের দেবতা ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এবং তার ফলেই রচিত হয়েছিল নাট্যবেদ নামক পঞ্চম বেদ। ব্রহ্মা পরে তদীয় শিষ্য, ভরতমুনিকে উক্ত বিষয় শিক্ষাদান করেন এবং ভরতের লেখনী হতে জন্ম লাভ করে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্র। এই নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী ভরত এক অভিনয়ের আয়োজন করেন। ব্রহ্মা সমাগত ইন্দ্রধ্বজ পূজার তিথিতে এই অভিনয়

অনুষ্ঠান করতে বলেন। তদনুসারে ইন্দ্রের অসুর ও দানব বিজয়ের স্মারক হিসেবে ভরত প্রথমে নান্দীর পর অসুর-বিজয়ের কাহিনীটিই রূপায়িত করলেন।"

ভরত যখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দেবাসুরের কাহিনী অবলম্বনে নাট্য প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হলেন—তখন তিনি তাতে প্রথমে তিনটি "বৃত্তি" বা নাট্য প্রয়োগ শৈলী অবলম্বন করেন তা হল, ভারতী বা বাক্ কৌশল, সাত্বতী বা চমকপ্রদ মহৎ আচরণ, আরভটী বা উৎসাহ ও বীরভাব।

ভরত এই পর্যন্ত রচনা করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, পিতামহ আমি এই করেছি। ব্রহ্মা তখন বললেন, ওতে কৈশিকী বৃত্তি বা সুকুমার বৃত্তি সংযোজনা করতে হবে—না হলে তা শিল্প হয়ে উঠবে না।

"শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী॥"

(সাহিত্য-দর্পণ। ষষ্ঠপরিচ্ছেদ শ্লোক ১৪০)।

নাটকে কৈশিকী বৃত্তির উপাদান দিলেন নীলকণ্ঠ তাঁর প্রলয় নাচ ভরতকে দেখিয়ে—তাই তিনি হলেন নটরাজং। এরই অবলম্বনে ভরত তাঁর নাটকে শৃঙ্গার রসের সংযোজনা করলেন। আনলেন মনোরম বেশভূষা মাল্য চন্দন। এল রস এবং বিভিন্ন স্থায়ী ও সঞ্চাবিভাব, যা বাক্যে ও ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে লাগল।

এবার সমস্যা হল, নাটকের কৈশিকী বৃত্তি তো কেবল প্রলয় নাচনের একখানি টুকরো মাত্র নয়। এর সৌকুমার্য এবং লালিত্য, এর মনোহারিত্ব ও সুষমাকে ফোটাবে ভরতের এক শ' শিষ্য—নৈব নৈব চ। কেবল পুরুষ দেহে, পুরুষ ভাবে তা হয় না, তার সঙ্গে নারী চাই। তখন ব্রহ্মা তাঁর মানস কন্যাদের সৃষ্টি করলেন—তারা হলেন অপ্সরা। এরা সর্বপ্রকার নৃত্য, গীত ও সুকুমার বৃত্তিতে পারদর্শিনী। ব্রহ্মা বললেন, নিয়ে যাও এদের, এদের সাহায্যেই তোমার নাটক হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর।

ভাদ্রমাসের 'শুক্ল' পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে এই নাটকের অভিনয় হবে স্থির হল। প্রণিধান যোগ্য যে ইন্দ্র হলেন বর্ষণের দেবতা, এবং ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষণ শেষে শরৎ এসে পড়ে। কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষ, হলকর্ষণ ও বীজবপন হয়ে গেছে—তখন বর্ষণের দেবতার উৎসব করা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা কৃষিজীবী সমাজের লৌকিক

ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। ইন্দ্র যে সব দানব, অসুর ও দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, এবং যে সব বিঘ্নরা নাটক পণ্ড করতে এসেছিল তাদের বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিকল্প ভাবাও অযৌক্তিক নয়।

ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে দেবতারাও উপস্থিত ছিলেন, ভরত তাঁদের তুষ্টির জন্য—নাট্যারম্ভে "নান্দী" পাঠ করলেন। তারপরে তিনি ইন্দ্রের দৈত্যবধের অনুকরণে দৃশ্য রচনা করে "অসুর বিজয়" নাট্যাভিনয় দেখালেন। এই দেবাসুর যুদ্ধ আর্য ও অনার্য সংগ্রামেরই প্রতিরূপ ছিল। এখন দৈত্যরা পরাজিত হচ্ছে এই দৃশ্য যখন এল, তখন অনিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত দৈত্য ও দানবরা—বিঘ্ন ও বিরুপাক্ষ নামক অনুচরদের ডেকে বলল, ভেঙ্গে দাও এ নাটক—এ আমাদের অপমানের জন্য করা হচ্ছে। তখন বিঘ্নরা অপ্রাকৃত মায়া বিস্তার করে অভিনেতাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠস্বর এমন কি স্মরণশক্তি পর্যন্ত বিকল করে দিল। ইন্দ্র যখন ঘটনাটা বুঝলেন তখন ক্রোধে তাঁর রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত হতে লাগল। ধ্বজোৎসবের মণি মাণিক্য খচিত এক ধ্বজদণ্ড তিনি তুলে নিয়ে অসুর ও বিঘ্নদের প্রবল ভাবে আক্রমণ করে হত্যা করলেন এবং মঞ্চকে বিঘ্নমুক্ত করলেন, উপস্থিত দেবতারা এই দেখে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—ভরত তুমি এক দৈবশক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে গেলে, যা দিয়ে তোমার নাটকের বিঘ্নদের পিটিয়ে জর্জরিত করতে পারবে। অতঃপর এর নাম রইল "জর্জর"।

"তবে তাই হক।" বলে জর্জরে, তখন ইন্দ্র বজ্র স্থাপনা করলেন, এবং এর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতাদের অধিষ্ঠান হল। জর্জরকে পাঁচভাগে ভাগ করা হল, তার প্রথম ভাগে অধিষ্ঠিত হলেন "ব্রহ্মা", দ্বিতীয় ভাগে "শিব", তৃতীয় ভাগে "বিষ্ণু", চতুর্থ ভাগে "কার্তিকেয়", এবং পঞ্চম ভাগে—শেষ, বাসুকী, তক্ষক—ইত্যাদি "নাগেরা"।

দৈত্য এবং অসুররা তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এই অবিচারের জন্য নালিশ করল। ব্রহ্মা তাদের শান্ত করবার জন্য নাটকের গুণাগুণ এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে তাঁর নাট্য সম্পর্কিত প্রখ্যাত ভাষণটি দিলেন।

বললেন—হে দৈত্যরা! এই নাটকের মধ্যে তোমাদের বা দেবতাদের কারো কথাই বিশেষ ভাবে বলা হবে না, কারো প্রতিই পক্ষপাতিত্ব থাকবে না, নাটকের মধ্যে থাকবে ত্রিলোকের ভাবানুকীর্তন।

নাটক মানেই হল সর্বশ্রেণীর সর্ব সাধারণের আচার আচরণ ও কার্যের অনুকৃতি। এতে থাকবে বিভিন্ন পরিবেশে মানব মনে যে বিচিত্র ভাবরাশির উদ্ভব হয় তারি পূর্ণরূপ।

এতে মানুষের ভাল, মন্দ, সর্ব আচরণই স্থান পাবে, আর এর কাছ থেকে মানুষ বন্ধুর মত পাবে উৎসাহ, পাবে সুখ, পাবে সৎপরামর্শ।

মানব জীবনের বিভিন্ন ভাব ও তার সংশ্লিষ্ট রসকে কার্যের দ্বারা ফুটিয়ে তোলার শক্তিসম্পন্ন এই নাটক হবে জনশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এ মানুষকে ধর্মে, কর্মে, সামাজিক কর্তব্যে, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে বিশ্বস্তভাবে উদ্দীপিত করবে। আবার হতভাগ্য মানুষ যখন দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হবে, শ্রান্তি-ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়বে, তখন এ দেবে আশা—আনন্দ, জানাবে সান্ত্বনা।

এমন কোন জ্ঞান গরিমার পথ নেই, এমন কোন চারুশিল্প বা কারুশিল্প নেই, এমন কোন কলাকৌশল বা কার্য নেই, যা নাটকের ব্যাপ্ত পরিধির মধ্যে পাওয়া না যাবে। এ হল সর্বশিল্প ও জ্ঞানের আধার। এতে বেদ এবং ইতিহাস, মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে কাহিনী গ্রহণ করা হবে, এ সর্বলোকে সর্বব্যাপ্ত হবে। অতএব হে দৈত্যগণ, দেবতাদের অনুকীর্তনে ক্রুদ্ধ হোয়ো না—তোমরাও এখানে সমান সম্মানের আসন পাবে। নাটক মানেই হল দেবতা, অসুর, রাজা এবং সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্যিক ও সাত্বিক ভাবের অভিনয়ের মাধ্যমে মানব জীবনের সুখ, দুঃখ, ভালমন্দের ভাবানুষঙ্গই নাটক।

ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক সম্পর্কিত সর্ব প্রকার রীতিনীতি এবং রঙ্গমঞ্চের মূল সূত্রগুলি নির্ধারণ করেছেন। অসুর ও দৈত্যদের আক্রমণ থেকে নাট্যাভিনয়কে রক্ষা করবার জন্যই ব্রহ্মার নির্দেশে দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা প্রথম রঙ্গালয়টি নির্মাণ করেছিলেন। ভরতের এই নাট্যশাস্ত্র প্রায় ১২,০০০ শ্লোকে বিরচিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার মধ্যে ৬,০০০ এর বেশি শ্লোক পাওয়া যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তার পুরোবর্তী "নাট্যবেদের" অনুসরণে। নাট্যবেদে ছিল ৪টি উপবেদ বা বিভাগ। প্রায় ৩৬,০০০ শ্লোক ছিল এতে এবং এই নাট্যবেদের রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা ঐতিহাসিক চরিত্র না হলেও হিন্দুসভ্যতার আর্যদের কাছে "নাট্যশাস্ত্র" যে বেদের সমতুল্য "নাট্যবেদ" বা "পঞ্চমবেদ" হিসেবে মূল্য

পেয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বেদের ঋষিরা 'বেদ' যেমন ধ্যান-যোগে পেয়েছিলেন, নাট্যবেদও তেমনি মুনি ঋষিরাই রচনা করেছিলেন—সেও তাঁদের ধ্যানেরই ধন। আর্যরা জানতেন নাটকের শক্তি কতখানি। জনসাধারণকে নাটক কতখানি আনন্দ দিতে পারে, কতখানি শিক্ষা দিতে পারে, কতখানি প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এছাড়াও এই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ও নৃত্যেরও সূত্র নির্ধারিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সর্বশিল্পের সারবস্তু যে "রসতত্ত্ব" তাও বিধৃত এই নাট্যশাস্ত্রে।

ধর্মকেন্দ্রিক নৃত্য গীতানুষ্ঠান থেকেই আর্য ভারতে নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। বিশাল এই ভারতবর্ষ, আর্য অনার্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা এখানে প্রবাহিত। বেদের যুগ থেকে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগের কাল-বিস্তৃতিও কিছু কম নয়। স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী নাটকে লোকধর্মী প্রয়োগ রীতিই হয়তো প্রথমে এসেছিল—তারপর শাস্ত্র ও প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতে নাটক ও তার প্রয়োগ কৌশল হয়ে উঠেছে নাট্যধর্মী। যে নাটকের উপভোক্তা ছিলেন সর্ব-সাধারণ সেই নাটকই একদিন করেছে কেবল রাজচিত্ত বিনোদন।

হিন্দু ভারতে সংস্কৃত ভাষা সর্ব-সাধারণের ভাষা ছিল না—ছিল কেবল অভিজাত পণ্ডিত সমাজের ভাষা। একদিন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রও যেমন জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ হয়ে উঠেছিল, সংস্কৃত নাটকও তেমনি জনমনোরঞ্জক ছিল না। জনসাধারণের উপভোগ্য ছিল যাত্রা, মহাকাব্য ও গাথা নিয়ে নৃত্য, গীত—সামাজিক ক্রিয়া ও পূজামণ্ডপের অনুষ্ঠান। হিন্দু নাট্য সাহিত্যে যদিও স্ত্রী-চরিত্র ও ইতরজন "প্রাকৃত" ভাষা ব্যবহার করেছে—কিন্তু মূল নাটকটি হত সুগ্রথিত সংস্কৃত কাব্যে—ইতরজনের জন্য নয়। বৌদ্ধ যুগে কিছু কিছু বৌদ্ধ নাটক পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাও ছিল সংখ্যায় অতি অল্প ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সুতরাং সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে দু'টি সত্য আমরা ধরে নিতে পারি, প্রথমতঃ এ ছিল অভিজাত সমাজের নাট্যকীর্তি—আর সেইজন্যই প্রথম থেকেই আবৃত রঙ্গালয়ের উল্লেখ রয়েছে—সেখানে দর্শক সংখ্যাও খুব বেশি হওয়া চলত না। গ্রীসের মত সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠান কখন জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুসভ্যতার যুগে দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেই এই সংস্কৃত নাটকের অনুশীলন হয়েছে। ভরত স্বয়ং নাটক, প্রকরণ, ভাণ,

ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বা অঙ্ক, বীথী, প্রহসন এই দশ প্রকার নাটক বা "দশরূপকের" উল্লেখ করেছেন এবং নাটিকা, ত্রোটকম্, গোষ্ঠী, সট্টকম্, নাট্যরাসকম্, প্রস্থানম্, উল্লাপ্যম্, কাব্যম্, প্রেঙ্খণম্, রাসকম্, সংলাপকম্, শ্রীগদিতম্, শিল্পকম্, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ, ভাণিকা ইত্যাদি ১৮ প্রকার উপরূপকের উল্লেখ রয়েছে সাহিত্য দর্পণে।[৩] উপরূপকগুলিও মূলতঃ নাটকই ছিল—নাটকের সর্ব প্রকার গুণ ও ধর্মই এর মধ্যে ছিল কেবল অঙ্ক, রস, চরিত্র, সন্ধি, বৃত্তি, ইত্যাদির ব্যতিক্রম ধরে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। নাট্য সাহিত্যে যেক্ষেত্রে এতপ্রকার বিভাগ ও বিভাজন ছিল, সেক্ষেত্রে তার প্রয়োগ পদ্ধতির মাঝেও বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। এই জন্যই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেও আমরা পরস্পর বিরোধী প্রয়োগশৈলীর উল্লেখ পাই। এর একটি সত্য হলেই যে অপরটি মিথ্যে হবে এমন কোন যুক্তি নেই। হয়তো বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন প্রথার উদ্ভব হয়েছিল—কিংবা একই কালে একাধিক বৃত্তির অনুশীলন হওয়াও অসম্ভব নয়।

ভরতমুনি নাট্য সম্পর্কিত সমগ্র বিষয়কে তেরটি মূল ভাগে বিভাগ করেছেন, ১। রস, ২। ভাব, ৩। অভিনয়, ৪। ধর্মী, ৫। বৃত্তি, ৬। প্রবৃত্তি, ৭। সিদ্ধি, ৮। স্বর, ৯। আতোদ্য, ১০। গান, ১১। রঙ্গ, ১২। উপচার, ১৩। মণ্ডপ—এই তেরোটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেই নাট্যবিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়।

১। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত—এই ৮টি হল ভরতোল্লিখিত নাট্য-রস।[৪]

২। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা (জুগুপ্সা), বিস্ময় এই ৮টি হল স্থায়িভাব। এর সঙ্গে আরো আছে ৩৩টি ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব —নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, স্মৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিথ্ধা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। এ ছাড়া রয়েছে—৮টি সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়। মোট ভাবের সংখ্যা হল স্থায়ী—৮+ ব্যভিচারী ৩৩+সাত্ত্বিক ৮=৪৯টি।

৩। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্যিক, সাত্ত্বিক এই ৪ প্রকার অভিনয়

কৌশল। ৪। ধর্মী ২টি—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। ৫। ভারতী, সাত্বতা, কৈশিকী, আরভটী এই ৪টি হচ্ছে বৃত্তি। ৬। প্রবৃত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও প্রয়োগ কৌশল ছিল ৪ প্রকার অবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্র-মাগধী, পাঞ্চাল-মধ্যমা, ৭। দৈবিকী ও মানুষী—'সিদ্ধি' এই ২ প্রকার, ৮। সা—রে—গা—মা ইত্যাদি স্বর ৭টি, ৯। আতোদ্য বা বাদ্য হল ৪ প্রকার—তত, অবনদ্ধ, ঘন, সুষির। তত—বলতে বোঝাত বীণা প্রভৃতি তারের বাদ্যযন্ত্র, অবনদ্ধ হল তবলা, ঢাক ইত্যাদি আচ্ছাদিত যন্ত্র, ঘন—কর্তাল প্রভৃতি নিরেট যন্ত্র, সুষির হল ফাঁপা যন্ত্র—নানাপ্রকার বাঁশি—এই শ্রেণীর। ১০। গান সম্বন্ধে হল ৫ প্রকার—প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রম, প্রাসাদিক, আন্তর, ১১। রঙ্গ—রঙ্গালয়কে বলা হয়। ১২। বাহ্য ও আভ্যন্তর—উপচার এই ২ প্রকার। ১৩। মণ্ডপ বা রঙ্গমণ্ডপ ৩ প্রকার বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র।

ভরত বলেছেন, এই সর্বপ্রকার বিদ্যায় যিনি জ্ঞান লাভ করেন তিনিই হলেন নাট্যবিদ্।

হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের আমরা এতক্ষণ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হল ভারতীয় ধ্রুপদী রঙ্গালয় এবং তার নাট্যপ্রয়োগপদ্ধতি। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত উপাদানের এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একান্তই অভাব রয়েছে। বৈদিক আর্যরা করতেন পশুপালন এবং কৃষিকর্ম—তাদের সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা, "পার্সি ব্রাউন্" মহাশয় তাঁর প্রখ্যাত "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার্" গ্রন্থে বৌদ্ধ এবং হিন্দুযুগে উল্লেখ করেছেন যে, আর্যগণ দলে দলে ভারতে এসে যখন স্থায়িভাবে বসবাস করতে সুরু করলেন, তখন প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের গৃহ—শর, বাঁশ ও পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরী করতেন। গৃহের ভিত্তি তৈরী হত মাটি দ্বারা। এই আদিম অবস্থা থেকেই পরবর্তী আর্য স্থাপত্য শিল্প বিকাশ লাভ করে। এরপর খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আর্যগোষ্ঠীর বিস্তার ঘটতে থাকে এবং নানান সামাজিক পরিবর্তন আসে। তখন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নগরী ও রাজধানী স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রেও ঐতিহ্যগত গ্রামীণ স্থাপত্য রীতিই আরো সুসম্পূর্ণ আকারে বিশদভাবে গৃহীত হয়। বিভিন্ন আর্যদলের মধ্যে সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাই প্রধান নগরী বা

রাজধানীগুলি সুরক্ষিত করা দরকার হত। এর চারপাশে থাকত সমুচ্চ প্রাকার, এগুলি তৈরী হত মোটা কাঠের খুঁটি দৃঢ় ভাবে মাটিতে প্রোথিত করে। আর এই প্রাকারের মধ্যে যে গৃহ ও প্রাসাদাবলী থাকত তাও আগাগোড়া প্রায় কাঠের তৈরী হত, পার্সি ব্রাউন্ মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে—"বৈদিক সভ্যতা এখন কাষ্ঠ স্থাপত্য যুগে প্রবেশ করল।" ভারতবর্ষে এই কাষ্ঠ স্থাপত্য সুদীর্ঘকাল ধরেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। প্রখ্যাত বৌদ্ধ টীকাকার ধর্মপাল উল্লেখ করেছেন যে খ্রী: পূ: পঞ্চম শতকে স্থপতি "মহা-গোবিন্দ" উত্তর ভারতের কয়েকটি মহানগরীর পরিকল্পনা করেন, এই নগরীগুলির মূল স্থাপত্য ছিল কাষ্ঠ স্থাপত্য। এই কাষ্ঠ স্থাপত্য যে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বা গঠনরীতির উৎকর্ষের দিক থেকে—কোনক্রমেই হীন ছিল না তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে—এরমধ্যে অন্যতম প্রধান প্রমাণই হচ্ছে গ্রীসদেশীয় ভারতস্থিত রাজদূত "মেগাস্থেনিসের" লিখিত বিবরণ। মেগাস্থেনিস্ খ্রী: পূ: তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরী ছিল বর্তমান "পাটনার" সন্নিকটে—গঙ্গানদীর উপকূলে। এই নগরীর চারদিকে কাঠের প্রাকার ছিল এবং তাকে ঘিরে ছিল সুগভীর পরিখা। নগর প্রাকারের উপর প্রায় ৫০০টি বুরুজ ছিল, আর ছিল ৬৪টি গোপুরম্। এই দেয়ালের অভ্যন্তর ভাগে ছিল রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদটি নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী অন্যান্য রাজাবাস থেকে অধিক মূল্যবান ও বৃহদায়তন ছিল। এই প্রাসাদের সুবৃহৎ কক্ষশ্রেণীতে অগণিত সমুচ্চ কাষ্ঠ স্তম্ভ ছিল, সেই স্তম্ভগুলির গায়ে সোনার আঙ্গুরলতা খোদাই করা ছিল, তাছাড়া সোনা ও রূপোর পত্রগুচ্ছ ও বিহঙ্গকুল দিয়ে এগুলি অলংকৃত থাকত। স্থাপত্যশিল্পের এই বিপুল জাঁকজমকের কথা এবং নৈপুণ্যের বর্ণনা পড়ে, আমাদের এই কথাই মনে হয় যে ইউরোপের ক্লাসিকাল স্থাপত্য শিল্প এবং প্রাচীন পারস্য ও একবাটানার রাজপ্রাসাদের কাষ্ঠ স্থাপত্য ছাড়া তৎকালীন পৃথিবীর অন্যত্র এতখানি সমুন্নত স্থাপত্য শিল্প ছিল দুর্লভ। কিন্তু এই অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তির সকলি আজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেছে, কেবলমাত্র কয়েকটি কাষ্ঠ স্তম্ভ ছাড়া কিছুই আর কালের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। এই কাষ্ঠ স্তম্ভের একটি উপরের অংশ কলকাতা জাদুঘরে এখনো রক্ষিত আছে, সেটির দৈর্ঘ থেকেও বোঝা যায় এই কাষ্ঠ স্তম্ভগুলি কি সুবিপুল ছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট

অশোকই সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম ও নীতিকথা প্রচারের জন্য প্রস্তর শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পরবর্তী হিন্দু ভারতেও ভাস্কর্য এবং মন্দির স্থাপত্য ছাড়া, অন্যান্য স্থাপত্য শিল্পে প্রস্তরের ব্যবহার খুব কমই হয়েছে।

আমরা এই বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে এই কথাই উল্লেখ করতে চাইছি যে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের রীতি অনুযায়ী হিন্দু রঙ্গালয়ও গঠিত হয়েছিল কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকার সাহায্যে। রঙ্গালয় সম্পর্কে ভরতমুনি যে বর্ণনা দিয়েছেন—সেখানেও তিনি এই কাষ্ঠ স্থাপত্য এবং তার নিপুণ অলংকরণের কথা বলেছেন। কাষ্ঠ স্থাপত্যের শিল্পোৎকর্ষ যতই থাক তা নিঃসন্দেহে প্রস্তর স্থাপত্যের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। আমরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রস্তর নির্মিত রঙ্গালয়ের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি, এবং তারি ভিত্তিতে রঙ্গালয় সম্পর্কিত আমাদের তত্ত্বগুলি অনেক স্পষ্ট এবং প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই সেখানেই দুই বা ততোধিক মত সমান প্রবল হয়ে ওঠে এবং পথিক দিশাহারা হয়। কাষ্ঠনির্মিত হিন্দু রঙ্গালয়ের আমরা আজ পর্যন্ত কোন ধ্বংসাবশেষই পাইনি—তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা অসহায়। হিন্দু রঙ্গালয় এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী অনেক মতবাদই রয়েছে, তার মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য। আমরা এই মতামতগুলি তুলে ধরে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারি মাত্র। এক্ষেত্রে ভরতমুনিই হলেন আমাদের একমাত্র আশ্রয়। হিন্দু রঙ্গালয় সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলে গেছেন—সেটুকুই আমাদের প্রামাণ্য উপকরণ। টীকাকাররা ভাষ্য রচনা করে স্থানে স্থানে শাস্ত্রের জটিলতা আরো বাড়িয়েছেন। আমরা সন্তর্পণে এই সমস্ত বিষয়গুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে বিশ্বকর্মা "নাট্যবেশ্ম" নির্মাণ করলেন। এই নাট্যবেশ্মর দু'টি মূল অংশ ছিল প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চের অংশ ছিল ৪টি রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, মত্তবারণী এবং নেপথ্য। প্রেক্ষাগৃহকে বলা হত প্রেক্ষামণ্ডপ। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রঙ্গালয়ের বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখানো হয়েছে। ভরত তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহের পরিকল্পনার কথা লিখেছেন—

"বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈ হি মণ্ডপঃ।
তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠ্যং মধ্যং তথাঽবরম্‌॥"

(না. শা. ভরত. দ্বিতীয় অধ্যায় : ৮ম শ্লোক।)

আকার অনুযায়ী তাদের বলা হত—১। বিকৃষ্ট, ২। চতুরস্র, ৩। ত্র্যস্র। এই তিন প্রকার প্রামাণ্য রঙ্গমণ্ডপকে পরিমাপ অনুসারে আবার বলা হত জ্যেষ্ঠ, মধ্য এবং অবর। ১০৮ হাত বা কিউবিট্ মাপ ছিল জ্যেষ্ঠের, ৬৪ হাত ছিল মধ্যমাকারের প্রেক্ষাগৃহ, অবর বা কনীয় ছিল ৩২ হাত। এক কিউবিট্‌কে ১½´ ফুট বলা যায়। দেবতাদের প্রেক্ষাগৃহ হবে জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয়, নৃপতিরা দেখবেন মধ্যমাকারে—আর অবশিষ্ট জনসাধারণের জন্য থাকবে "কনীয়" রঙ্গালয়। সাধারণ ভাবে ত্র্যস্র আকারের প্রেক্ষাগার হত কনীয় পরিমাপের, চতুরস্র হত মধ্যমাকারের, বিকৃষ্ট হত জ্যেষ্ঠ আকারের।

উপরোক্ত তিনশ্রেণীর রঙ্গমণ্ডপের প্রতিশ্রেণীতেই যদি আবার তিনটি করে আকারগত বিভাগ ধরা হয় তবে রঙ্গমণ্ডপকে সম্ভাব্য ৯টি আকারে ফেলা চলে। অধ্যাপক ডি, সুব্বা রাও শ্রেণী বিভাগগুলি এই ভাবে দেখিয়েছেন—

১। বিকৃষ্ট (আয়তাকার)—ক। জ্যেষ্ঠ ১০৮ × ৬৪ হাত : জ্যেষ্ঠ সুতরাং দেবতাদের জন্য।

খ। মধ্যম ৬৪ × ৩২ হাত : মধ্যমাকার সুতরাং নৃপতিদের জন্য।

গ। অবর ৩২ × ৩২ হাত : অবর অন্ততঃ ৩২ হাতের চেয়ে প্রস্থে বেশি নয়, এটা অবশিষ্ট জনসাধারণের।

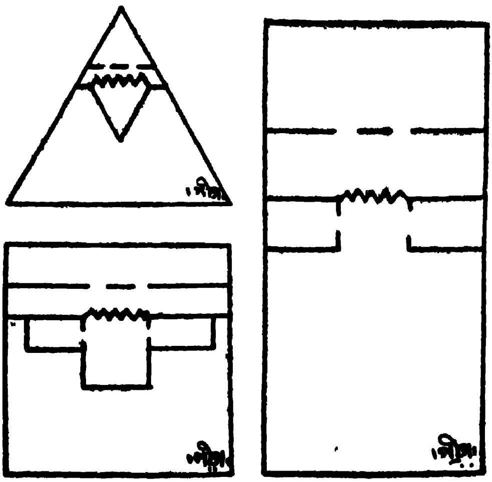
২। চতুরস্র (বর্গাকার)— ক। জ্যেষ্ঠ ১০৮ × ১০৮ হাত : এই আকার বিকৃষ্ট জ্যেষ্ঠর চেয়েও বড় হয়ে যায়। চতুরস্র অর্থে এখানে বর্গক্ষেত্র ধরা হয়েছে। এটা দেবতাদের জন্য। কিন্তু আকারটা নাট্যাভিনয়ের পক্ষে অযোগ্য হয়।

খ। মধ্যম ৬৪ × ৬৪ হাত : এটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বর্গক্ষেত্র যার অভিনয় যোগ্যতা রয়েছে।

গ। অবর ৩২ × ৩২ হাত : সাধারণ মানবের পক্ষে এ ধরনের রঙ্গমঞ্চও চলতে পারে।

৩। ত্র্যস্র (ত্রিভুজাকার)—ক। জ্যেষ্ঠ ১০৮ হাত
খ। মধ্যম ৬৪ হাত
গ। অবর ৩২ হাত

এক্ষেত্রেও জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম আকারে অভিনয় অসঙ্গত হয়ে পড়ে।



ভরত উক্ত তিন ধরনের হিন্দু রঙ্গালয়
আয়তাকার বিকৃষ্ট, বর্গাকার চতুরস্র এবং ত্রিভুজাকার ত্র্যস্র।

সুতরাং প্রেক্ষাগৃহগুলির মধ্যে জাগতিক মানবের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির জন্য সর্বচেয়ে উৎকৃষ্ট রঙ্গালয় হল, বিকৃষ্ট-মধ্যম, এই রঙ্গালয় হল ৬৪ হাত দৈর্ঘ্যে ও ৩২ হাত প্রস্থে। আবার কেউ কেউ মনে করেন চতুরস্র রঙ্গালয়—"চতুরস্র" বা ইংরেজী "স্কোয়ার্" নামের হলেও সম্পূর্ণ বর্গাকার ছিল না, ছিল আয়তাকার—তাই কোথাও কোথাও এই আদর্শ আকারের রঙ্গালয়কেও "বিকৃষ্ট-মধ্য" আকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভরত বলেছেন এর চেয়ে বৃহৎ, অর্থাৎ ১০৮ হাত দীর্ঘ রঙ্গালয় ব্যবহার না করাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ বিকৃষ্ট-জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় হলে তাতে অভিনেতাদের

সূক্ষ্মভাব ও রসের অভিনয়, তাদের আবৃত্তি তথা কণ্ঠস্বর কোনটাই দর্শকদের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছয় না। তাই চতুরস্র-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়। এরূপ মঞ্চের আবৃত্তি এবং সঙ্গীত সবই হয় সুখশ্রব্য—মর্ত্য মানুষের এই মণ্ডপ ৬৪ হাত দীর্ঘ হবে, ৩২ হাত হবে তার বিস্তার।

এই মধ্যম রঙ্গগৃহকে কত ভাগে ভাগ করা হবে—তার কোন ভাগ প্রেক্ষামণ্ডপ হবে, কোন অংশে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য এবং মত্তবারণী থাকবে—এবার আমরা সেই আলোচনায় প্রবেশ করব। বিভিন্ন অংশের অবস্থান নিয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদের জটিলতা রয়েছে। আমরা ভরতের উক্তি এবং অভিনবগুপ্তের টীকার প্রতি দৃষ্টি রেখে এগোব।

মধ্যম রঙ্গালয়ের বিভাগ সম্পর্কে ভরত বলেছেন—প্রথমে ৬৪ হাত ভূমি মেপে নিয়ে তারপর তাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে হবে অর্থাৎ সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। এক এক ভাগ ৩২ হাত হবে। পিঠের দিকে যেভাগ থাকবে তাকে আবার সমান দু'ভাগ করতে হবে। ১৬ হাত+১৬ হাত। এই পিঠের দিকের যে প্রথম ১৬ হাত তাকে আবার সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হবে—এক এক ভাগ হবে ৮ হাত করে। এই আট হাতের নেপথ্য সংলগ্ন ভাগ হবে "রঙ্গশীর্ষ"। কাজেই প্রেক্ষামণ্ডপের দিককার প্রথম ৮ হাত হবে "রঙ্গপীঠ"। রঙ্গশীর্ষের পশ্চিমে থাকবে "নেপথ্য" বিভাগ। এই অংশের টীকায় অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—৬৪ হাত দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে ৩২ হাত ক্ষেত্র গ্রহণ করে, তার মধ্যে আড়াআড়ি করে সূত্র দিতে হবে। তখন যে অংশ প্রযোক্তার পিঠের দিকে থাকবে—তা হল পৃষ্ঠ। তার মধ্যে পৃষ্ঠভাগের আবার আড়াআড়ি সূত্র ধরতে হবে। তাতে ১৬ হাত করে দুই ভাগ হবে। পৃষ্ঠগত ভাগকে দু'ভাগ করলে এক ভাগ হবে—রঙ্গশির—প্রবেশকারী পাত্রদের অন্তঃস্থান এবং চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নাট্যমণ্ডপের রঙ্গপীঠমুখ—অষ্টহস্তশির। তার পৃষ্ঠে দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত নেপথ্য-গৃহ। এরপরে তিনি বলেছেন—কারো কারো মতে রঙ্গপীঠ হবে বিস্তারে ১৬ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হাত। কেউ কেউ বিপরীত কথাও বলেন। অর্থাৎ তাদের মতে রঙ্গপীঠ বিস্তারে হবে ৮ হাত দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত।[৫] মঞ্চের দৈর্ঘ্য মানে দর্শক আসন থেকে নেপথ্যের দিকে। বিস্তার ৮ হাত অর্থাৎ সেটাই মঞ্চমুখ বা "ওপেনিং"। কেউ কেউ মনে করেন এই ৮ হাতের পরেই ছিল মত্তবারণী দৈর্ঘ্যে ৪ হাত প্রস্থে ৪ হাত স্থান নিয়ে। মূল প্রেক্ষাগৃহের বিস্তার

৩২ হাত হওয়ায় রঙ্গপীঠের ১৬ হাত বিস্তার বাদ দিলে দু'দিকে আরো ৮ হাত করে থেকে যায়। সম্ভবতঃ এই অংশ দু'টি সম্মুখ দিকে আবৃত থাকত—এবং তা হত নাট্যশিল্পীদের এলাকা। এ থেকে এই সত্যেই আমরা উপনীত হই যে দর্শকরা অভিনেতাদের মুখোমুখি একটা অংশ জুড়েই থাকত—যাত্রা ইত্যাদির মত কিংবা গ্রীক বা এলিজাবেথীয় দর্শকদের মত তিন দিক বা চার দিক ঘিরে নয়।

রঙ্গালয়ের এই বিভাগ এবং ভিত্তি স্থাপনা হয়ে গেলে রঙ্গালয়ের চারদিকে দেয়াল তুলতে হবে এবং বিভিন্ন স্তম্ভ সংস্থাপন করতে হবে। এই স্তম্ভ সংস্থাপন করা ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই কার্যের জন্য রোহিণী বা শ্রবণা নক্ষত্রের কালকেই সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ শুভ তিথি বলে ধরা হত।

যিনি নাট্যাচার্য তিনি তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসে থাকতেন, তারপর শুভ তিথির প্রভাতে স্নান করে এসে, বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, বিশুদ্ধ দেহে ও মনে পূজাপাঠের পরে প্রথম স্তম্ভ স্থাপনা করতেন। এই স্তম্ভগুলি অবশ্যই কাষ্ঠনির্মিত ছিল। প্রথমেই ব্রাহ্মণদের প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্রাহ্মণ স্তম্ভ স্থাপিত হত। এর সমস্ত আয়োজনই ছিল—ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক শ্বেত শুভ্র। সর্ব বস্তুই "ঘি" ও "শ্বেত সরষে" দ্বারা বিশুদ্ধ করে নেওয়া হত। এর উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের পায়সান্ন ভোজন করানো হত এবং স্তম্ভের পাদদেশে সুবর্ণ নির্মিত কর্ণাভরণ উৎসর্গ করা হত।

এরপরে ক্ষত্রিয় স্তম্ভ স্থাপনের সময় বস্ত্র, মাল্য ও অন্যান্য সর্ব পূজোপচারই হত রক্তবর্ণের। রক্তবর্ণ হল শক্তি ও উৎসাহ জ্ঞাপক, ক্ষত্রিয়দের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে লাল রং-এর ঝোলাগুড় ও ভাত দ্বিজদের ভোজন করানো হত। স্তম্ভ পাদমূলে তাম্র আভরণ দেওয়া হত।

রঙ্গালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে উঠত "বৈশ্য স্তম্ভ"। এ অনুষ্ঠানে সমগ্র বস্তুই হত পীতবর্ণের। পীতবর্ণ ছিল বৈশ্যদের ঐশ্বর্য ও স্বর্ণের প্রতীক। এতে ব্রাহ্মণদের ঘি-ভাত খাওয়ান হত এবং রৌপ্য আভরণ উৎসর্গ করা হত।

উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রথিত হত "শূদ্র স্তম্ভ"। এর পূজোপচার ছিল নীলবর্ণের। নীলবর্ণ ছিল অনার্য শূদ্রদের গাত্র বর্ণের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হত "কৃশর" বা খিচুড়ি। স্তম্ভমূলে লৌহ কর্ণাভরণ উৎসর্গ করা হত।

এই পূজাপাঠ শেষ হলে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনির মধ্যে—"মেরুপর্বত বা হিমালয় পর্বতের মত তুমি শক্তিশালী ও অনড় হয়ে থাক, এবং রাজার যশ ও বিজয় আনয়ন কর।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তম্ভ উত্তোলন করা হত। এই ভাবে নির্ধারিত শাস্ত্র অনুযায়ী রঙ্গালয়ের দরজা, জানালা, দেয়াল, মঞ্চ, নেপথ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার স্থাপত্য কর্মগুলি করা হত।

ভরত বলেছেন, প্রেক্ষাগৃহ পর্বতগুহার ন্যায় তৈরী করা হত। ডাঃ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়-এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রঙ্গালয়ের স্তম্ভগুলো হত কাঠের এবং খুব সম্ভব তার উপরে খড় দিয়ে ছেয়ে ছাদ তৈরী হত। এই খড়ের চৌচালা দেখতে পিরামিডের আকার নিত এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই পর্বতগুহার সঙ্গে রঙ্গগৃহের তুলনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হওয়ার পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চ বা রঙ্গপীঠ তৈরী করা হত। রঙ্গপীঠের পরে হত রঙ্গশীর্ষ, ৬ খানা কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী হত এই মঞ্চ ও নেপথ্যের মধ্যকার দেয়াল। তাই তার নাম ছিল "ষড্‌দারুক"। মঞ্চ-পীঠের দু'পাশ দিয়ে নেপথ্যের দিকে দু'টি দরজা থাকত তার মাঝখানে হত কারুশিল্প মণ্ডিত ষড্‌দারুক।

রঙ্গালয়ের ভিত্তি হত মৃত্তিকায় গঠিত। যে মাটি দিয়ে রঙ্গালয় তৈরী হত তার মধ্যে কোন রকম ময়লা বা পাথরকুঁচি থাকত না। আবর্জনা থাকলেই মাটি ফেটে যায় এবং সেগুলি পায়ে ফুটতে পারে। প্রথমে রঙ্গালয়ের জন্য নির্দিষ্ট মাটির ঘাস শিকড় ইত্যাদি হলকর্ষণ দ্বারা অপসারিত করা হত। মোটের উপর মাটিটি কোমল ও মসৃণ করে তোলা হত। হল চালাত শ্বেতকায় দুই বলীবর্দ।

যিনি হল কর্ষণ করতেন তাকে সমস্ত রকম শারীরিক খুঁত বর্জিত হতে হত। নোতুন ঝুড়িতে করে নিখুঁত অঙ্গ লোকেরা এই মাটি বহন করে নিয়ে রঙ্গালয়ের ভিত্তি তৈরী করত।

মঞ্চের জন্য নির্ধারিত জমি ভরাট হয়ে গেলে তার উপর কৃষ্ণ মৃত্তিকা সাবধানে লেপন করা হত। ভরত বলেছেন, মঞ্চের মেঝেটা এমন করতে হবে, যাতে তা সমান ও সুন্দর হয়, কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হলে চলবে না। এর উপরটা হবে আয়নার মত সমতল ও মসৃণ। অর্থাৎ অভিনেতাদের চলাফেরায় কোন রকম বাধার সৃষ্টি না হয়।

রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় মণিরত্ন প্রোথিত করা হত। পূর্বদিকের মাটির নীচে বসান হত "হীরা," দক্ষিণে "বৈদূর্যমণি," পশ্চিমে "স্ফটিক," উত্তরে "প্রবাল" ও মাঝে "স্বর্ণ" প্রোথিত করা হত।

এরপরে রঙ্গালয়ের যেখানে যত কাষ্ঠ নির্মিত অংশ সেগুলিকে নানান শিল্পসম্ভারে খোদিত করে অলংকরণের কাজ হত। কাঠের গায়ে বহুপ্রকার লতাপাতা ও মানুষের নকশা, হাতি, সাধক ইত্যাদির মূর্তি খোদিত করা হত। রঙ্গালয়ের এখানে সেখানে কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিও স্থাপিত হত। এ ছাড়াও কাঠের কাজের দরকার হত দরজা, জানালা, রেলিং এবং উত্তম আসনের জন্য। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ও বিভিন্ন জায়গায় আরো কয়েকটি কাঠের স্তম্ভ সংস্থাপিত হত।

কাঠের কাজ শেষ হলে স্থপতিরা দেয়াল গড়ত, অন্যান্য স্তম্ভ বসাত, জানালা দরজাগুলি বসাত। দর্শকদের আগমন, নির্গমনের সুবিধার জন্য দরজাগুলি মুখোমুখি বসানো হত।

প্রেক্ষাগৃহের মেঝেটা দু'টো স্তরে বিভক্ত হত। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বায়ু-চলাচলের পথ রাখা হত না। এতে রঙ্গালয়ের শ্রুতিগম্যতা নষ্ট হয়। অভিনেতাদের কথা বায়ুচলাচল থাকলে চারদিকে ছড়িয়ে যায় এবং সামাজিকরা তা শুনতে পান না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালায় দর্শকরা কাঠের বা পাথরের বেঞ্চিতে বসতেন। অলংকৃত কাষ্ঠাসনের উল্লেখ ভরত করে গেছেন। পরবর্তীকালের মন্দির স্থাপত্যে যখন প্রস্তর ব্যবহার করা হত—তখন মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে প্রস্তরাসনের উল্লেখও পাওয়া যায়। এই আসনগুলি ধাপে ধাপে গ্যালারীর মত সজ্জিত থাকত। সামনের দিকের মধ্যবর্তী স্থানটি রাজা, বিশিষ্ট অতিথি ও পৃষ্ঠপোষকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। বাকি বসবার অংশটি স্তম্ভশ্রেণী দিয়ে চারি বর্ণের জন্য চারটি আলাদা ভাগ করা থাকত।

দেয়াল দাঁড় করান হলে তাতে সুধাকর্ম করা হত অর্থাৎ প্লাষ্টার লাগান হত ও চুনকাম করা হত। তারপর দেয়ালগুলি ঘষে ঘষে মসৃণ করে তুলে—দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাতে নানা রকম চিত্রাঙ্কন করা হত। এই সমস্ত চিত্রে থাকত লতা, পাতার নকশা এবং প্রেমমগ্ন নরনারীর দৃশ্য।

এই ভাবেই বিকৃষ্ট ও চতুরস্র রঙ্গালয় তৈরী করা হত। এরপরে ভরত সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি ত্র্যস্র রঙ্গালয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ভরতমুনি বলেছেন—ত্র্যস্র রঙ্গালয় ত্রিকোণাকার হবে। এই ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহে ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ নির্মাণ করতে হবে। রঙ্গালয়ের এক পার্শ্বে একটি দরজা থাকবে এবং রঙ্গপীঠের পেছনের দিকে আর একটি দরজা থাকবে।

এই ত্র্যস্র রঙ্গালয়ে দেয়াল ও স্তম্ভশ্রেণী চতুরস্র রঙ্গালয়ের মতই গড়ে তোলা হত।

ত্র্যস্র ধরনের রঙ্গমঞ্চে কোন প্রকার মত্তবারণী ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ত্র্যস্র মঞ্চের সম্মুখ ভাগ সরু তাই মত্তবারণীর সংস্থাপন সম্ভব ছিল না। ত্রিভুজাকৃতির এই রঙ্গালয়ের ৩২ হাত দৈর্ঘ্যকে প্রথমে মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ করা হত—এক এক ভাগে ১৬ হাত করে হত। তার সামনের প্রশস্ত অংশটা হত প্রেক্ষাগৃহ, পেছনের ১৬ হাতকে আবার দুই ভাগ করা হত ৮ হাত করে। সর্বপশ্চাতের ৮ হাত নেপথ্য—এবং প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখবর্তী ৮ হাতের মধ্যে ত্রিভুজাকারে হত রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ। এর কারুকর্ম এবং অন্যান্য মণ্ডনশিল্প অন্য প্রেক্ষাগৃহগুলির মতই হত। এ ধরনের রঙ্গমঞ্চে একক অভিনেতার স্বগত ভাষণযুক্ত ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটকেরই অভিনয় হত বলে মনে হয়।

॥ মত্তবারণী ॥

এখন আমরা মত্তবারণীর সংস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করব। হিন্দু মঞ্চের মত্তবারণী নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক রকম মতভেদ আছে। শাস্ত্রোক্ত শ্লোকের বহুপ্রকার টীকা ও ভাষ্য রয়েছে। এই সমস্ত ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতরা নিজেদের রুচি ও যুক্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। যেখানে প্রমাণ খুব জোর নয়, সবকিছুই সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল সেখানে এরকম তর্কের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। তাছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে নূতন একটি মতবাদ হয়ত আমরা সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারি না। সুতরাং মত্তবারণী সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি এবং টীকা রয়েছে আমরা সেগুলিই তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

মত্তবারণীর অবস্থান সম্পর্কে ভরতমুনি বলেছেন—

"রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী ॥৬৩॥
চতুঃস্তম্ভসমাযুক্তা রঙ্গপীঠপ্রমাণতঃ।
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্তব্যা মত্তবারণী ॥৬৪॥
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্" ॥৬৫॥

(না. শা. ভরত. ২য় অধ্যায়।)

রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে (পাঠভেদে পশ্চাতে) মত্তবারণী নির্মাণ করা কর্তব্য। ১। এক একটি মত্তবারণী চারটি করে স্তম্ভযুক্ত হবে। এই স্তম্ভগুলি রঙ্গপীঠের সমপ্রমাণ অর্ধহস্তোন্নত হবে। অর্থাৎ রঙ্গপীঠ থেকে আধ হাত উঁচু। রঙ্গপীঠের উচ্চতা এক দণ্ড বা এক হাত হলে মত্তবারণীর উচ্চতা হয় দেড় দণ্ড। ২। মত্তবারণীর উচ্চতার সমান হবে রঙ্গমণ্ডপের (প্রেক্ষাগৃহ) উচ্চতা।

ভরত অন্যত্র বলেছেন—পূর্বোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে মত্তবারণী নির্মাণ করতে হবে। মত্তবারণী হবে চতুস্তম্ভ সমাযুক্ত এবং রঙ্গপীঠ বেদিকার পার্শ্বে।

এ সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় বলেছেন—"পার্শ্বে মানে রঙ্গপীঠের দুই পাশে, কারণ এর পরে দ্বিবচনান্ত "তয়োঃ" পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি স্তম্ভ মণ্ডপের বহির্ভাগে অবস্থিত—মণ্ডপক্ষেত্র থেকে বহির্ভাগে, সুতরাং ভিত্তিচ্ছেদ অবধি দুই স্তম্ভ এবং বহির্ভিত্তির আট হাত অন্তরে অবস্থিত স্তম্ভের অনুসারে আটহাত অন্তর দুটি স্তম্ভ। অতএব অষ্টহস্ত বিস্তার সমচতুরস্র বা চতুষ্কোণ মত্তবারণী। যাঁরা বলেন আয়তনই প্রমাণ, তাঁদের মতে—রঙ্গপীঠের বিকৃষ্টতা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, বিস্তারে ১৬ হাত। অন্যেরা বলেন—মত্তবারণীর উচ্ছ্রায় বা উচ্চতা হবে রঙ্গপীঠ থেকে সার্ধহস্ত পরিমাণ। "তয়োঃ" শব্দটি দ্বিবচন জ্ঞাপক। মত্তবারণীর যতখানি উচ্চতা (উৎসেধ) রঙ্গপীঠের উচ্চতাও ততখানি, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে—ভূমি থেকে রঙ্গপীঠের উচ্চতা হচ্ছে—সার্ধহস্ত প্রমাণ।

মত্তবারণী সম্পর্কে টীকাকার আরো উল্লেখ করেছেন যে—কারো কারো মতে রঙ্গপীঠ দ্বিভূমিক—এক ভূমি নীচুতে, অন্য ভূমি উপরে। কেউ বলেন মত্তবারণী থেকে বাইরে যাওয়ার যে দুয়ার সেই দুয়ারের উচ্চতার প্রমাণ

অনুসারে দেবপ্রাসাদ-অট্টালিকার চারদিকে ঘোরান যে প্রদক্ষিণ ভূমি থাকে, সেই রকম রঙ্গপীঠের চারদিকের প্রদক্ষিণ-সদৃশী ভূমি। আবার কারো মতে—মণ্ডপের উপরে আর একটি মণ্ডপ তৈরী করা হত।

মত্তবারণীকে দ্বিতীয় ভূমিরূপে গণ্য করলে তার অর্থ দাঁড়াবে—বাইরে যাওয়ার দরজার উচ্চতার সমতুল্য রঙ্গভূমির চারদিকে যে প্রদক্ষিণের জন্য ভূমি তৈরী করা হয় তাই মত্তবারণী। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ এই কথা উল্লেখযোগ্য যে দশম শতাব্দীর পর অভিনবগুপ্ত প্রমুখ যে সমস্ত টীকাকাররা এসেছেন—তাঁরা সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় কাল পার হয়েই এসেছেন। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয় তাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি, তাঁরা মন্দির স্থাপত্যযুগে মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির দেখেছেন। মন্দির নাট্যালয়ে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত না এবং তার স্থাপত্যে মত্তবারণীরও কোন উল্লেখ নেই। মন্দিরে দেববিগ্রহ যে গর্ভগৃহে স্থাপিত হত তার চারপাশে বারান্দার মত প্রদক্ষিণ পথের উল্লেখ বহুস্থানেই রয়েছে। তাই হয়তো পরবর্তীকালের টীকাকাররা মত্তবারণীর সঙ্গে প্রদক্ষিণ পথকে কোথাও কোথাও একাকার করে ফেলেছেন।

ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গভূমি" শীর্ষক প্রবন্ধে মত্তবারণী সম্পর্কে ভরত এবং টীকাকারদের বিভিন্ন মতামতকে এই ভাবে সজ্জিত করে দেখিয়েছেন—

(ক) রঙ্গপীঠের পার্শ্বে—উভয় পার্শ্বে—মত্তবারণীর সংস্থান।

(খ) রঙ্গপীঠের পশ্চাতে মত্তবারণীর সংস্থান। (কোন কোন পুঁথি অনুসারে)।

(গ) রঙ্গপীঠের বেদিকার পার্শ্বে মত্তবারণীর সংস্থান।

(ঘ) মত্তবারণী চতুস্তম্ভসমাযুক্তা।

(ঙ) অষ্টহস্তবিস্তারা সমচতুরস্রা মত্তবারণী। (কারণ—রঙ্গপীঠের সমপ্রমাণ)।

(চ) মত্তবারণী রঙ্গপীঠ থেকে সার্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চ হবে।

(ছ) রঙ্গপীঠের যতখানি উচ্চতা মত্তবারণীর উচ্চতাও ততখানি।

(জ) মত্তবারণী দু'টির উচ্চতার প্রমাণ অনুসারে রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা নির্ধারিত হবে। (উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্।)

(ঝ) মত্তবারণী দেবপ্রাসাদাট্টালিকা প্রদক্ষিণ সদৃশী দ্বিতীয় ভূমি।

উপরোক্ত তথ্যগুলির মধ্যে মত্তবারণীর কোন স্পষ্ট চিত্রতো নেইই—পরন্তু পরস্পর বিরোধী উক্তিই রয়েছে। প্রকৃত মত্তবারণীর অবস্থান রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা যুক্তিসঙ্গত।

রঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপ নিয়েও বহুপ্রকার মতামতের উদ্ভব হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন রঙ্গপীঠ বিস্তারে ১৬ হাত এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হাত। (এখানে দৈর্ঘ্য অর্থাৎ নেপথ্যের দিকে প্রসারিত স্থান)।

আবার কেউ উল্টোটা বলেন—অর্থাৎ এ বিস্তারে ৮ হাত ও দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত।

তৃতীয়তঃ অনেকে মনে করেন রঙ্গপীঠ "সর্বতোঽষ্টহস্তং" অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে উভয়তঃ ৮ হাত।

এরপরে রঙ্গশীর্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরতমুনি বলেছেন, "সমান অর্ধেক করে রঙ্গশীর্ষের পরিকল্পনা করবে।" এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন—রঙ্গপীঠের পশ্চিমে বা পৃষ্ঠে অষ্টহস্ত রঙ্গশীর্ষ—এক্ষেত্রেও রঙ্গপীঠের মতই পরিমাপ নিয়ে নানান প্রশ্ন জাগে—রঙ্গশীর্ষ ৮ হাত × ৩২ হাত, বা ৮ হাত × ১৬ হাত, কিংবা ১৬ হাত × ৮ হাত, অথবা ৮ হাত × ৮ হাত—কি মাপের ছিল ?

অভিনব গুপ্তের টীকায় রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ এবং নেপথ্য সম্পর্কে যে সামগ্রিক বিভাজন এবং পরিমাপ রয়েছে তাতে বিষয়টি জটিলতরই হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ৩২ হাত × ৩২ হাত ক্ষেত্রটিকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান ৮ ভাগে ভাগ করে দাবার ছকের মত ৬৪ কোঠায় পরিণত করতে হবে। এর এক একটি প্রকোষ্ঠ এখন ৪ হাত বর্গ, অর্থাৎ ৪ হাত দৈর্ঘ্যে ৪ হাত প্রস্থে হয়। অভিনবগুপ্ত বলছেন—"তত্র মধ্যম প্রকোষ্ঠ চতুষ্ক, রঙ্গপীঠং সর্বতোঽষ্ট হস্তং" —এই ৬৪ কোঠার মধ্যম চারটি কোঠায় হবে রঙ্গপীঠ। এখন মধ্যম বলতে যদি একেবারে মাঝখানের ৪টি কোঠাকে রঙ্গপীঠ ধরা হয় তবে অভিনবগুপ্তের হিসেব মতই তার পশ্চিমে ১২ হাত × ৩২ হাত একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে। রঙ্গপীঠের সংলগ্ন ঐ ক্ষেত্র থেকে—পূর্ব-পশ্চিমে ৪ হাত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩২ হাত ক্ষেত্র নিয়ে রঙ্গশীর্ষ, এবং তারও পশ্চিমে ঐ একই আকারের (৪ × ৩২ হাত) নেপথ্যগৃহ নির্মাণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে অভিনবগুপ্ত পূর্বে যে নির্দেশ দিয়েছেন—রঙ্গালয়ের ভূমিকে

সমদ্বিখণ্ডিত করে ৬২ × ৩২ হাত প্রেক্ষামণ্ডল বাদ দিতে হবে বাকি ৩২ × ৩২ হাতে ক্ষেত্রের প্রথম ৮ হাত ক্ষেত্র রঙ্গপীঠ, দ্বিতীয় ৮ হাত ক্ষেত্র রঙ্গশীর্ষ এবং অবশিষ্ট ১৬ হাত ক্ষেত্র নেপথ্যগৃহ—এই নির্দেশ এখানে পাওয়া গেল না। মাঝখানে রঙ্গপীঠ ধরলে তার সামনে ও পিছনে ১২ × ৩২ হাত ক্ষেত্র থাকছে। পিছনের ক্ষেত্রে ৪ × ৩২ হাত রঙ্গশীর্ষ এবং ৪ × ৩২ হাত নেপথ্যগৃহ হলে আরো ৪ × ৩২ হাত একটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে। সামনেও ১২ × ৩২ হাত একটি শূন্য ক্ষেত্র থাকে। অথবা অন্যত্র তিনি যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে রঙ্গপীঠের সংলগ্ন ক্ষেত্র থেকে ৪ × ৩২ হাত একটি ক্ষেত্র কেটে নিয়ে তার পশ্চিমে ঐরূপ ৪ × ৩২ হাত ক্ষেত্র জুড়ে রঙ্গশীর্ষ নির্মিত হয় তবে তা ৮ × ৩২ হাত রঙ্গশীর্ষ হয় বটে—তবে নেপথ্যগৃহের স্থান থাকে ৪ × ৩২ হাত। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনবগুপ্ত যে বলেছেন—"ততোঽপি পশ্চিমে তাবদেব নেপথ্য গ্রহণম্"—এই "তাবদেব"র অর্থ খাটে না। আর একটি সমস্যা হচ্ছে সামনের ১২ × ৩২ হাত ক্ষেত্রটি নিয়ে। কারণ এতে দর্শকগণ এবং রঙ্গপীঠের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই ১২ হাত ব্যবধান এসে যায়—যা অভিনয় প্রদর্শনের বাস্তব ক্ষেত্রে একান্তই অসঙ্গত। বিভাগের পরিমাপ নিয়ে বচসা থাকলেও মোটামুটি এই অবস্থান কটি আমরা নির্দিষ্ট বলে ধরে নিতে পারি যে,—দর্শক আসনের সম্মুখে রয়েছে রঙ্গপীঠ তার পৃষ্ঠে রঙ্গশীর্ষ এবং তৎপশ্চাতে নেপথ্যগৃহ—অর্থাৎ রঙ্গপীঠ ও নেপথ্যগৃহের মাঝখানে রয়েছে রঙ্গশীর্ষ। এই রঙ্গশীর্ষের ষড়্দারুকেই নেপথ্যগৃহের দু'টি দরজা রয়েছে। রঙ্গশীর্ষের সংস্থান সম্পর্কে একথাও বলা হয়েছে যে—বিকৃষ্ট নাট্যগৃহে রঙ্গপীঠ থেকে রঙ্গশীর্ষ উন্নত অর্থাৎ উঁচু হবে এবং চতুরস্রে হবে সমতল। বিকৃষ্ট-জ্যেষ্ঠে ১০৮ হাত দৈর্ঘ্য তাই—প্রেক্ষামণ্ডল হয় ৫৪ হাত এবং অভিনয়ক্ষেত্র ও নেপথ্য হয় ৫৪ হাত—অতএব সে ক্ষেত্রে রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ ইত্যাদি সকলের পরিমাপই সেই অনুপাতে বেড়ে যায়—এরূপ নাট্যগৃহে রঙ্গপীঠ থেকে রঙ্গশীর্ষকে একটি ধাপ উঁচু করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত—কারণ দর্শকদের দেখা এবং নাট্যাভিনয় করা উভয়দিকেই এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক।

রঙ্গশীর্ষের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রঙ্গশীর্ষ হবে "ষট্দারুকসমন্বিতম্"। ষট্দারুক কথাটি নিয়েও মতবিরোধ আছে। এ সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের মত হল—নেপথ্যগৃহের ভিত্তিতে আট হাত অন্তর

দুই স্তম্ভ মোট ১৬ হাত স্থান জুড়ে, তাদের মুখ বরাবর চার হাত অন্তর আর দু'টি স্তম্ভ—মোট এই নেপথ্য ভিত্তিসংলগ্ন চারটি স্তম্ভ, এ ছাড়া আছে তাদের নীচের কাঠ ও উপরের কাঠ—অর্থাৎ উপরের ও নীচের বাতা, এই হল ষড়্‌দারুক।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে—দুই পাশের উপর নীচের ৪ খানি কাঠ এবং দু'টি স্তম্ভ নিয়ে ষড়্‌দারুক।

তৃতীয়তঃ কাষ্ঠ শিল্পের বিভিন্ন কারুকৌশল নিয়ে ষট্‌দারুক। এর মধ্যে রয়েছে—"উহ"—স্তম্ভের মাথা থেকে যে কাষ্ঠ নির্গত হয়েছে—"প্রত্যুহ"—উহ থেকে বিনির্গত তুলা, "সঞ্জবন ফলক"—আকাশে স্থাপিত ভিত্তিব্যাখ্যা। স্তম্ভাশ্রিত সিংহাদি, ব্যালানুবন্ধ—নির্ব্যূহ বা নির্যূহ—তুলাস্ত থেকে নিঃসৃত ফলক, ভিত্তিময় দারুকর্ম, কুহর—পর্বত বা পুরনিকুঞ্জ গহ্বর—ইত্যাদি দারু-কর্ম। এই সমস্ত কাষ্ঠাংশগুলি আবার নানান খোদিত মূর্তি এবং লতাপাতায় সুশোভিত থাকত। এই রঙ্গশীর্ষ ছিল নানা রকম কুড্যসজ্জার এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিন্যাসস্থল—এখানেই ছিল "কুতপ" বা যন্ত্রবিদ্‌দের অবস্থানক্ষেত্র।

রঙ্গশীর্ষের পশ্চাতে ছিল—নেপথ্যগৃহ। নেপথ্যগৃহ দৈর্ঘে ছিল ১৬ হাত ও বিস্তারে ছিল ৩২ হাত। এই নেপথ্যগৃহের দু'টি দরজা সম্মুখে অর্থাৎ রঙ্গশীর্ষের দিকে—আর একটি দরজা পাশে বাইরের দিকে।

এরপরে নাট্যমণ্ডপ সম্পর্কে ভরত লিখেছেন—নাট্যমণ্ডপ শৈলগুহাকার, এবং দ্বিভূমি হবে। অল্পসংখ্যক বাতায়ন যুক্ত হবে, গৃহ নির্বাত অর্থাৎ বায়ুচলাচলহীন এবং ধীরশব্দবান হবে।

নাট্যমণ্ডপ নির্বাত হলে কুতপের স্বর গম্ভীর হবে।* নাট্যমণ্ডপ শৈলগুহাকার এবং বায়ুহীন হবে এতে মতভেদ নেই—কিন্তু দ্বিভূমি কথাটি নিয়ে আবার বিভিন্ন মতের আবির্ভাব ঘটেছে।

প্রথমতঃ কারো কারো মতে রঙ্গপীঠের অধস্তন এবং উপরিস্তন এই দ্বিভূমি। সম্ভবতঃ এখানে প্রেক্ষাগৃহকে একটি তল—রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যকে দ্বিতীয়তল বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত—মত্তবারণীর বহির্গমন প্রমাণ অনুসারে দ্বিতীয় ভিত্তিনিবেশ করে দেবপ্রাসাদাট্টালিকার প্রদক্ষিণ ভূমির মত দ্বিতীয় ভূমিনির্মাণ।

তৃতীয়তঃ এক মণ্ডপের উপর অন্য একটি মণ্ডপস্থাপন করা।

চতুর্থমতে দ্বিভূমি হবে না।

পঞ্চমত: রঙ্গপীঠের নিকট থেকে দ্বার পর্যন্ত রঙ্গপীঠের উচ্চতার সমান নিম্নোন্নত ক্রমে অর্থাৎ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যাওয়া ভূমি বিন্যাস।

এই মতবাদগুলির মধ্যে যেটিই সত্য হক—এবিষয়ে সংশয় নেই যে প্রাচীন ভারতীয়রা স্থাপত্য কর্মে এবং পূর্তবিদ্যায় সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রঙ্গালয় সম্পর্কিত প্রতিটি সমস্যারই তাঁরা সুচিন্তিত পন্থায়, বাস্তবজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতায় মীমাংসা করতে চেয়েছেন। তাঁরা নাট্যগৃহকে সুগঠিত, সুদৃশ্য করেছেন। তাতে ভূমিভাগকর্ম, ইস্টকদৃঢ় ভিত্তিকর্ম, দারুকর্ম, ভিত্তিলেপকর্ম, সুধাকর্ম, চিত্রকর্ম—ইত্যাদি সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে করেছেন—গৃহে শ্রুতিগম্যতা এবং দর্শনযোগ্যতার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তাই গৃহকে রেখেছেন নিবাত, এবং দর্শক আসনশ্রেণী তৈরী করেছেন সোপানাকৃতির। ইঁট ও কাঠ দিয়ে এই সোপানশ্রেণী তৈরী হবে। প্রথম আসনশ্রেণী হবে এক হাত উঁচু—যাতে রঙ্গপীঠ সহজেই দেখা যায়। রঙ্গপীঠের উপরে দশটি দৃঢ় স্তম্ভ এমন ভাবে স্থাপনা করতে হবে যাতে দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

রঙ্গপীঠ এবং রঙ্গশীর্ষের অবস্থান সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনা করলাম। মত্তবারণীর অবস্থান সম্পর্কেও যে সমস্ত মতবৈপরীত্য রয়েছে তারও আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাতে সমস্যার যে যথার্থ সমাধান হয়েছে—তা নয়, কেবল আমরা মতপার্থক্যগুলি জানতে পেরেছি। মত্ত-বারণীর সঠিক অবস্থান যে কি ছিল প্রমাণাভাবে নাটকের প্রয়োগ রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এবং প্রাচীন হিন্দু নাটকে যে সমস্ত মঞ্চ নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে—সেই নাট্য নির্দিষ্ট পথেই আমাদের সমাধানের পথ দেখতে হবে।

নাটকের আভ্যন্তরিক প্রমাণ সংগ্রহ করে মত্তবারণীর অবস্থান এবং ব্যবহার সম্পর্কে ডা: সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় যে মত ব্যক্ত করেছেন তাকেই আমরা নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে বলে সম্ভাব্য মত হিসেবে এখানে উল্লেখ করছি।

ডা: ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে মত্তবারণীর ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ পাওয়া যায়—"রাজশেখর কৃত" বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকে। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা ও বিদূষকের সংলাপে মত্তবারণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদূষক রাজাকে বলছেন—কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকব, আসুন মত্ত-বারণীতে গিয়ে বসি—"তা এহি মত্তবারণী এ উঅবিসহ্ম।"*

অষ্টাদশ শতাব্দীর "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" নামক টীকার কর্তা ঘনশ্যামের দুই স্ত্রী সুন্দরী ও কমলা, তাঁদের "চমৎকার তরঙ্গিণীর" টীকায় মত্তবারণীর অর্থ করেছেন—মত্তবারণী বসার একটি স্থান—বেশ একটু উঁচু স্থান বা বেদিকা, যাতে দীর্ঘবর্তুলাকার শিলাময় বা ইষ্টকময় উপাধান সন্নিবদ্ধ থাকে।[৮] স্থানটি যে রঙ্গপীঠ থেকে বেশ উঁচু তা নাট্যকার রাজশেখরের নির্দেশ থেকেই বোঝা যায়—"ইতি উভাবতরণং নাটয়তঃ"—দু'জনে অবতরণ করলেন। অবতরণ কথাটির টীকায় লেখা হয়েছে—"অবতরণং চতুষ্কিকা সোপান পরম্পরায়াঃ ইতি ভাবঃ"। টীকা থেকে মত্তবারণীর যে চেহারা ফুটে উঠেছে তা এই—রঙ্গপীঠ থেকে চতুষ্কিকা সোপান পরম্পরা ক্রমোচ্চভাবে চতুস্তম্ভযুক্ত উচ্চ বেদিকার তিন কোণে দীর্ঘ ও গোলাকার প্রস্তরময় বা সুধেষ্টকাময় উপাধান রয়েছে। ঐ উপাধান খুব সম্ভব ঠেস দিয়ে বসার জন্য তৈরী হত। বলা বাহুল্য অভিনব গুপ্তের টীকার সঙ্গে এর মিল নেই এবং ভরতের "অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন" এর সঙ্গে মেলান গেলেও, "উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্"—এর সঙ্গে মেলান যাবে না। তা না গেলেও মনে হয়—সুন্দরী ও কমলার বর্ণনাই প্রয়োগের দিক থেকে বেশি গ্রাহ্য হওয়ার দাবী করতে পারে। মত্তবারণীকে আমরা রঙ্গপীঠের দুই পাশের চতুস্তম্ভযুক্ত সোপান পরম্পরা-বিশিষ্ট, গোলাকার উপাধান বেষ্টিত উচ্চ বেদিকা বা দ্বিতীয় ভূমি বলেই স্বীকার করব। খুব সম্ভব এই স্থানটি অভিনয়ের সময় বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, রাজোপবেশন, নৃত্য গীতাদি দেখার সময় রাজার আসন, প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত।

এই আলোচনার পরে আমরা আর একটি মতামতের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি, সুব্বা রাও মহাশয় "মত্তবারণী" শব্দটির অর্থ করেছেন—শ্রেণীবদ্ধ প্রমত্ত হস্তী। তিনি বলেছেন এর মত্তবারণী নাম হল, তার কারণ মঞ্চের সম্মুখভাগে কাঠের প্যানেলের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ হস্তী খোদাই করা থাকত। এই হাতি মানেই ঐরাবত, ইন্দ্রের বাহন, যে ইন্দ্র রঙ্গমঞ্চের বিঘ্ননাশক রক্ষাকারী দেবতা।

এর পরে সুব্বা রাও আলোচনা করেছেন—তবে এই মত্তবারণীর অবস্থান কোথায়? ভরত বলেছেন যে, রঙ্গপীঠের পার্শ্বে মত্তবারণী রচনা করতে হবে। রঙ্গপীঠ অর্থে শ্রীরাও রঙ্গশীর্ষসহ সমগ্র "রঙ্গ" অর্থাৎ মঞ্চকেই

ধরেছেন। এই রঙ্গপীঠ অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখ দিক যদি পুবদিক হয় তবে তার উত্তরদিকে ও দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মঞ্চের দুই পাশে দু'টি দেয়াল রয়েছে, এবং তার পশ্চিম দিকে রয়েছে নেপথ্যগৃহ। সুতরাং সম্মুখের এই পূর্ব অংশই একমাত্র দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে, ভরত যেখানে, "রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা" লিখেছেন, সেখানে "পার্শ্বে" শব্দটি এক বচনে ব্যবহার করেছেন—অর্থাৎ সম্মুখ অংশই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। মঞ্চের আর তিনটি দিক দর্শকরা দেখতে পেত না সুতরাং শ্রীরাও-এর মতে সামনেই একশ্রেণী হস্তী দেখা যেত, "মত্তবারণী" শব্দটিও ভরত এক বচনে ব্যবহার করেছেন। "চতুস্তম্ভ" বলতেও শ্রীরাও হাতিদের চারটি পা বেঁধে রাখার স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীবদ্ধ হস্তীর দৈর্ঘ্য ছিল "রঙ্গপীঠপ্রমাণতঃ" অর্থাৎ রঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্যের সমান, এর উচ্চতা হচ্ছে, অর্ধহস্ত বা ৯" ইঞ্চির বেশি, রঙ্গমণ্ডপের বা মঞ্চের উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উচ্চতা হবে।

শ্রীসুব্বা রাওর এই মতামত থেকে আমরা এইটুকুই বুঝলাম যে মঞ্চবেদীর যে উচ্চতা সেই অংশে কাঠের প্যানেলের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ হস্তী খোদিত থাকত একেই তিনি মত্তবারণী বলেছেন এবং এটাকে তিনি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগের এক স্থাপত্য অলংকার বলে ধরেছেন। আমাদের পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী অভিনয়-ক্ষেত্র বা মঞ্চবেদীর উপরে মত্তবারণীর অস্তিত্ব ছিল না।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা অন্ততঃ এই সত্যে উপনীত হলাম যে ভারতীয় থিয়েটার হিন্দু যুগে যথেষ্ট উন্নত আকার ধারণ করেছিল। তাদের সুগঠিত প্রেক্ষাগৃহে সোপানাকৃতি আসনশ্রেণী ছিল এবং রঙ্গমঞ্চে ছিল —রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ, মত্তবারণী, আর ছিল নেপথ্যগৃহ, এগুলির আকার প্রকার নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় নেই। এবার আমাদের বিচার করে দেখা দরকার নাট্য প্রযোজনার কালে তার শিল্পরীতি কেমন হত।

॥ নেপথ্য বিধি ॥

আমরা জানি যে নাটকের প্রয়োগ-পদ্ধতি দু'রকম হয়। প্রথম পদ্ধতি হল "নাট্যধর্মী" (Non-illusionistic Style) এতে স্বল্প নেপথ্য ও মঞ্চ-উপকরণ ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় পদ্ধতি হল "লোকধর্মী" (Illusionistic Style) এতে

মঞ্চাভিনয় দৃশ্যসজ্জাসম্পন্ন হয়। এখন ভারতীয় থিয়েটারে এর কোন রীতি গৃহীত হত আমাদের সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা জানি অভিনয়-রীতিতে ভরত লোকধর্মী বা বাস্তবধর্মিতারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন ভাবাবেগকে সঞ্চারিভাবের সাহায্যে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এই বাস্তববাদী অভিনয় যে মঞ্চে স্থান পেত, সে মঞ্চোপকরণ কি ছিল এ সম্পর্কে যথেষ্টই সংশয়ের অবকাশ আছে। মঞ্চপ্রয়োগপদ্ধতি যদি বাস্তবধর্মী হয় তবে তার জন্য আহার্যাভিনয়ের বা নেপথ্যবিধির প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হত। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে "নেপথ্যবিধিকে" চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। (১) পুস্ত, (২) অলংকার, (৩) অঙ্গরচনা, (৪) সংজীব।

১। নেপথ্যবিধির প্রথম শ্রেণী "পুস্তর" আবার তিনটি ভাগ ছিল। (ক) সন্ধিম্, (খ) ব্যাজিম্, (গ) বেষ্টিম্।

(ক) সন্ধিম্ হচ্ছে—কিলিঞ্চ (ঘাস বিশেষ) চর্ম, বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা জুড়ে জুড়ে যে প্রতিরূপ তৈরী করা হয় জ্ঞানিগণ তাকেই "সন্ধিম্" বলেছেন।

(খ) ভরত "ব্যাজিম্"-এর সংজ্ঞায় বলেছেন—যন্ত্র দ্বারা যা করা হয় তাকেই "ব্যাজিম্" বলে। এখানে মনে হচ্ছে দড়ি দড়ার সাহায্যে কোন রকম যান্ত্রিক কৌশল মঞ্চে প্রয়োগ করা হত।

(গ) "বেষ্টিম্" বা "চেষ্টিম্" সম্পর্কে বলেছেন—যে রূপকে গালা ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টন করে বা আবৃত করে তৈরী করা হয় তাকেই "বেষ্টিম্" বলে। চেষ্টিম্ অর্থে প্রধানতঃ সঞ্চরণশীল বস্তুকেই বোঝায়।

সুতরাং বলা যায় নাটকে শৈল, যান, বিমান, চর্মবর্ম, ধ্বজ প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু বা দৃশ্য তৈরী করা হয় তাদের সংক্ষেপে "পুস্ত" বলে।

এগুলি কি ভাবে নির্মাণ করা হবে ভরত তারও নির্দেশ দিয়েছেন—

নাটকের জন্য যে সব চর্মবর্ম ধ্বজ, শৈল, প্রাসাদ, দেবতাগৃহ, হয়যান, বারণযান, বিমানগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করতে হবে সেগুলি প্রথমে বেণুদল অর্থাৎ বাঁশের চটা দিয়ে তৈরী করে নিয়ে সরঙ্গ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে এবং বস্তুটির সমরূপ করে তুলতে হবে। বস্ত্র না পেলে, শুষ্ক তালপত্র ও কিলিঞ্চ দিয়ে বস্ত্রের কাজ চালাতে হবে।

২। নেপথ্য বিধির দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল "অলংকার"। মালা, আভরণ, বাস ইত্যাদি ছিল অলংকারের উপাদান। মালা ছিল পঞ্চ প্রকার। আভরণ—চার রকম, প্রথম "আবেধ্য" অর্থাৎ কুণ্ডলাদি, যা অঙ্গ বিদ্ধ করে

ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয় ছিল "বন্ধনীয়"—যেমন শ্রোণীসূত্র এবং অঙ্গদ। তৃতীয় "প্রক্ষেপ্য"—নূপুর, অস্ত্র প্রভৃতি। চতুর্থ "আরোপ্য" হেম সূত্রাদির দ্বারা গ্রথিত। বাস—হল অধঃ-বস্ত্র, উত্তরীয়, অন্তর্বাস, উষ্ণীষ ইত্যাদি।

৩। "অঙ্গরচনা"—অর্থাৎ রূপসজ্জা বা "মেক্-আপ" গ্রহণ। কেশচর্চা, এবং অলক্তক, লোধ্রেণু, চন্দন ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা অঙ্গসজ্জা।

৪। "সংজীব"—অর্থাৎ প্রাণী প্রবেশ। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ ইত্যাদি প্রাণী তৈরী করা হত; তাদের মধ্যে ছিল উরগ, খগ, নাগ, যেমন শকুন্তলা নাটকে 'মৃগের' প্রবেশ, এছাড়াও যুদ্ধ ইত্যাদিতে প্রাণীর ব্যবহার ছিল।

এই নেপথ্য বিধির আলোচনায় এটাই আমরা দেখতে পাই যে মঞ্চে বস্তুলোক ও প্রাণীলোকের সর্বপ্রকার উপকরণই তারা ব্যবহার করতেন। প্রাথমিক অবস্থায় যেমন সর্বত্র হয়ে থাকে তেমনি এর প্রয়োগ পদ্ধতি হয়তো বাস্তবানুগ হত, এবং কালক্রমে তা ইঙ্গিতধর্মী ও প্রথানুগ হয়ে ওঠাই সম্ভব। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে হিন্দু মঞ্চে শৈল, যান, বিমান, মৃগ, হস্তী ইত্যাদির যথাযথ প্রতিরূপ ব্যবহার করা হত না, হত তার ক্ষুদ্রাকার অনুরূপের ব্যবহার। "মৃচ্ছকটিক" নাটকে যেমন মৃৎ-শকটক বা মাটির "খেলনা গাড়ির" ব্যবহার দেখি। মঞ্চেও তেমনি শৈল, যান, বিমান বাস্তবাকৃতির না হয়ে কিলিঞ্চ, বাঁশ ও বস্ত্র দ্বারা নির্মিত ছোট ছোট আকারের "প্রতিরূপ" হত। মঞ্চে প্রতীক হিসেবে এগুলির ব্যবহার হত। চীন ও জাপানেও এইরূপ প্রতীক মঞ্চোপকরণের আমরা ব্যবহার দেখেছি; অভিনেতা মুদ্রা এবং আচরণ দ্বারা এগুলির অস্তিত্ব দর্শক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে নিতেন।

আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব তৈরীর জন্য ভরত এই যে সমস্ত নির্দেশ তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দিয়ে গেছেন তাতে প্রতীকধর্মিতা কতদূর ছিল তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন, তবে এটা স্পষ্টতঃই মনে হয় প্রচলিত প্রথা মেনে নিয়ে নাট্যপ্রযোজকরা যতদূর সম্ভব পাত্র পাত্রীদের বাস্তবকল্প পটভূমিতে স্থাপন করার চেষ্টা করতেন। তাদের মধ্যে পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবকল্প করার প্রবণতা যেমন ছিল, গায়ের রং, কেশ, বেশভূষা ইত্যাদির সুচারুরূপ দেওয়ার প্রতিও তেমনি সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় এই রীতিকে অকুণ্ঠভাবেই বাস্তব-প্রবণ থিয়েটার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি "ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয়" প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"থিয়েটারের বাস্তবতা আপেক্ষিক বাস্তবতা, প্রথাগত বাস্তবতার প্রতিভাস। কোনো থিয়েটারই আজ পর্যন্ত বাস্তব পটভূমিকে সমগ্রভাবে উপস্থিত করতে পারেনি। সুতরাং থিয়েটারের বাস্তবতা বিশেষ যুগের বাস্তব সমৃদ্ধির ও শিল্পবিদ্যার মানের উপর নির্ভর করে এবং তা করে বলেই ভরতের যুগের বাস্তবকল্প দৃশ্যসজ্জা বা নেপথ্য বিধি তদানীন্তন সভ্যতার বিশেষতঃ বস্তুপকরণের পরিমাণ ও শিল্পবিদ্যার মানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।"

ভারতবর্ষে হিন্দু সভ্যতা বলতে একটি বিস্তৃত কালকেই বোঝায় এর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নাটকের বিভিন্ন প্রয়োগপদ্ধতির উদ্ভব হওয়া, প্রচলিত থাকা এবং বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা এতক্ষণ যে বাস্তব রূপকল্পের উল্লেখ করলাম তাকে বর্তমানে ইউরোপীয় দৃশ্যসজ্জা বা "সেটিং" এর সমতুল্য ভাবা অন্যায় হবে। বরং প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে কিছু সঙ্গতি পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে যেমন উন্নত শ্রেণীর ট্র্যাজেডির আবির্ভাব ঘটেছিল, ভারতবর্ষে তেমনি ঘটেছিল অতি উন্নত মিলনাত্মক নাটকের আবির্ভাব। দুই ক্ষেত্রেই উন্নত পর্যায়ে এসে নাট্যতত্ত্ব এবং শিল্পতত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছিল, এসেছিল নাট্যরচনাশৈলী ও প্রয়োগপদ্ধতির মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা। আবার একথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রাচীন গ্রীসে কিছু কিছু যান্ত্রিক কৌশল, অঙ্কিত "পেরিয়াক্তোই"র প্রচলন থাকলেও—মূলতঃ তার প্রয়োগ রীতি ছিল 'নাট্যধর্মী' অর্থাৎ "প্রেজেন্টেশনাল" যা আছে তার যথাযথ রূপায়ণের চেষ্টা নয়, একটি আদর্শ রূপ ফুটিয়ে তোলা—যেখানে দর্শকের কল্পলোক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। হিন্দু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগরীতিও মৌলিক ভাবে ছিল তাই। মঞ্চোপকরণ সামান্যই ছিল দৃশ্যসজ্জারও বাহুল্য ছিল না, সামান্য কিছু ইঙ্গিতের সাহায্যে পরিবেশটি বুঝিয়ে দেওয়া হত। এগুলি যখন ব্যবহৃত হত তখন মঞ্চসজ্জা দৃশ্যের কাজ না করে একান্তই পশ্চাদ্‌পটের কাজ করত। ভারতীয় নাট্যগঠনে গ্রীক ট্র্যাজেডির মত স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্যের প্রতি অত সতর্ক দৃষ্টি ছিল না। হিন্দু নাটক এক বছরের বেশি কাল নিয়ে বিস্তার লাভ করত না, ক্রিয়ার ঐক্যও নায়ক চরিত্রকে আশ্রয় করে পঞ্চসন্ধি অর্থাৎ প্রারম্ভ থেকে ফলপ্রাপ্তির মধ্যে বিধৃত থাকত। কিন্তু স্থানের ঐক্য একেবারেই ছিল না বলা যায়—যেমন শূদ্রক প্রণীত "মৃচ্ছকটিকেই" আছে

নান্দীর পরে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে স্থানের পরিবর্তন ১। চারুদত্তের গৃহ (বহির্বাটি), ২। রাজপথ (একাধিকবার), ৩। চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর, ৪। বসন্তসেনার গৃহ. ৫। রাজপথের ধারে শূন্য মন্দির, ৬। বসন্তসেনার ভবন—প্রথম মহল, দ্বিতীয় মহল, তৃতীয় মহল, চতুর্থ মহল, পঞ্চম মহল, ষষ্ঠ মহল, সপ্তম মহল, অষ্টম মহল, উদ্যান। ৭। চারুদত্তের উদ্যান (বাহির ও অভ্যন্তর), ৮। পুষ্প করণ্ডক উদ্যান, ৯। বিচারালয়, ১০। দক্ষিণ শ্মশানের পথ, ১১। প্রাসাদ, ১২। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলনের দৃশ্য।

এরপরে দেখা যাক মহাকবি কালিদাস প্রণীত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" নাটকে বিভিন্ন স্থান বা দৃশ্যের পরিবর্তন কি রকম—প্রস্তাবনা ও নান্দীর পরে প্রথম অঙ্ক—দৃশ্য ১। প্রান্তর, ২। তপোবন প্রদেশ, ৩। আশ্রম উদ্যান। দ্বিতীয় অঙ্ক—১। বন পার্শ্বস্থ শিবির। তৃতীয় অঙ্ক—১। বনপথ, ২। মালিনীতীরস্থ বেতস কুঞ্জ। চতুর্থ অঙ্ক—১। আশ্রম উদ্যান, ২। কুটীর প্রাঙ্গণ, ৩। কুটীর, ৪। বন পথ, ৫। সরসী তীরস্থ বটবৃক্ষ। পঞ্চম অঙ্ক—১। রাজপ্রাসাদের ঘর, ২। হোম-শালা। ষষ্ঠ অঙ্ক—১। রাজপথ, ২। প্রাসাদের সিংহদ্বার, ৩। প্রমোদ-বন, ৪। মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ। সপ্তম অঙ্ক—১। আকাশপথ—অদূরে হিমকূট পর্বত, ২। মারীচ ঋষির আশ্রম, ৩। আশ্রম-কুটীর, ৪। আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

এখন সর্বাগ্রে একটি কথা আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, আমরা দু'টি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকের দৃশ্য বিভাগ দেখালাম প্রকৃত নাটকের মধ্যে নাট্যকাররা এভাবে দৃশ্য বিভাগ উল্লেখ করে দেখাননি। সংস্কৃত নাটকে অঙ্ক বিভাগের নির্দেশ আছে কিন্তু দৃশ্য বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় পরোক্ষ নির্দেশ। যেমন শকুন্তলা নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বিভাগটি আমরা রাজা ও সারথির সংলাপের মধ্য দিয়েই পাচ্ছি—

সারথি। "মহারাজ, উঁচু-নীচু ভূমি বলে আমি অশ্বের রাশ সংযত করে রেখেছিলাম, তাই রথের বেগটা একটু কমে এসেছিল, এখন আমরা সমভূমিতে এসে পড়েছি, এখন আর হরিণকে ধরতে বেশি কষ্ট হবে না।" (শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত)।

এখানে "সমভূমিতে" কথায় আমরা স্থানের বা দৃশ্যের নির্দেশ পাচ্ছি। এরপরে আবার রাজা যখন চতুর্দিক অবলোকন করে বলছেন—"এ

যে তপোবন প্রদেশ" অথবা "এই তো আশ্রমের পথ" তখন নাটকে অলিখিত দৃশ্য বিভাগ এবং স্থানের নির্দেশ আমাদের দর্শকদের বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। এই নাট্যোল্লিখিত ইঙ্গিতক্রমেই শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় যে সমস্ত প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন, তাতে দৃশ্য বিভাগ অর্থাৎ স্থান নির্দেশ করে দেখিয়েছেন। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে স্থানের পরিবর্তন যেভাবে প্রাসাদ, অরণ্য, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জুড়ে হতে দেখা যায়, তাকে গ্রীক সুলভ ক্লাসিকাল স্থান-ঐক্য তো ভাবাই চলে না, রোমান্টিক গঠন ভঙ্গির নাট্যকার স্বয়ং শেক্সপীয়র মহাশয়ও অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করবেন। আমরা শেক্সপীয়রের নাটক ও মঞ্চ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে মঞ্চে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁকেও কয়েকটি বাধ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু মঞ্চে প্রয়োগ অসম্ভব ভেবে স্থানের সে বাধাও সংস্কৃত নাট্যকারদের মানতে হয়নি—কিন্তু কেন হয়নি? তাঁদের হাতে এমন কি উপকরণ ছিল যা দিয়ে মঞ্চে স্থানের বন্ধন তাঁরা অনায়াসে ছিন্ন করে দিতে পেরেছেন। এই উপকরণ হল মঞ্চের "কক্ষা" বিভাগ বা "জোনাল্ ডিভিঝন্" (Zonal Division)। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

॥ কক্ষা-বিভাগ ॥

পৃথিবীকে যেমন ভৌগোলিকরা কতকগুলি কাল্পনিক দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দ্বারা ভাগ করে নিয়েছেন, হিন্দু নাট্যশাস্ত্রকারগণও তেমনি মঞ্চকে বিভিন্ন কাল্পনিক বিভাগে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেছেন,—এই বিভাগগুলিই "কক্ষা বিভাগ"। দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ রেখা কাল্পনিক হলেও স্থির অর্থাৎ তার ডিগ্রির পরিমাপ ইচ্ছে মত ওলট পালট হয়না, কিন্তু হিন্দু রঙ্গমঞ্চে কক্ষা বিভাগ ছিল সঞ্চরণশীল—নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে কক্ষারও পরিবর্তন হত।

এই কক্ষা দ্বারা নাটকের বিভিন্ন স্থান ও দৃশ্যের কাল্পনিক বিভাগ বোঝাত, যেমন নগর, অরণ্য, পাহাড়, আশ্রম ইত্যাদি। মঞ্চে এই কক্ষা বিভাগের কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না, এটা সম্পূর্ণই মঞ্চে অনুষ্ঠিত একটি নাট্যপ্রথা ছিল। কক্ষা বিভাগ দ্বারা যে সমস্ত স্থানগুলিতে তৎকালীন নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তারি অবস্থান বোঝাত, আবার এই কক্ষা বিভাগ দ্বারাই

কাছে, দূরে, ভিতরে, বাইরে ইত্যাদি স্থানবাচক সমস্ত রকম সম্পর্কই বোঝানো হত।

ভরত বলেছেন, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যারা মঞ্চে প্রথম প্রবেশ করবে তাদের (অর্থাৎ সেই সমস্ত নাট্যচরিত্রকে) ঘরের ভিতর বলে ধরতে হবে। আর যারা পরে প্রবেশ করবে তাদের ঘরের বাইরে বলে ধরা হবে।

নেপথ্যের দরজা ও "কুতপ" যার দিকে মুখ করে আছে সেটাই হবে মঞ্চের পূর্বদিক। অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখ রেখা পূর্বদিক, নেপথ্য হবে পশ্চিমে।

কাউকে যদি ঘরের ভিতর থেকে বাইরে যেতে হয় তবে সে যে দরজা দিয়ে ঘরের কক্ষায় প্রবেশ করেছে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়েই বাইরে যাবে। অর্থাৎ 'কুতপের' দাক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে কেউ যদি প্রাসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তবে তার প্রাসাদ অন্তঃপুর থেকে বাইরে যেতে হলে দক্ষিণদিকের দরজা দিয়েই বাইরে যেতে হবে। বামদিকে এগিয়ে গেলে সে নূতন কক্ষায়—হয়তো রাজোদ্যানে প্রবেশ করবে। অতএব বাম দিকের দরজা দিয়ে সে সোজাসুজি প্রাসাদ অন্তঃপুর থেকে প্রস্থান করতে পারে না—তাকে আর একটা ভিন্ন কক্ষা পার হতে হয়, সেখানে হয়তো তার যাওয়ার কথা নয়। যদি সেই ব্যক্তিকে আবার মঞ্চে ফিরে আসতে হয় তবে সর্বশেষ ব্যক্তিটি মঞ্চে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল, সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। অথবা যদি প্রয়োজন বশতঃ তাকে শেষ ব্যক্তিটির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হয় তবে এ দু'জনার জন্য আলাদা কক্ষা নির্দিষ্ট হবে, যার সীমারেখা তাদের পরিক্রমা দ্বারাই বোঝা যাবে। প্রতিটি কক্ষার সীমারেখাই সেই কক্ষার চরিত্রদের পরিক্রমা দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

মঞ্চে অনুসৃত আরো কতকগুলি প্রথা আছে যেমন—সম পর্যায়ের লোক হলে তারা মঞ্চে পাশাপাশি চলবে। আর যদি কেউ নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করেন তবে তিনি তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আসবেন। যেমন রাজা পারিষদদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রবেশ করবেন। আর পরিচারিকা বা তাম্বুল করঙ্কবাহিনীরা প্রভু বা রাজার আগে আগে আসবে।

আমরা রঙ্গমঞ্চখানা এবার একবার কল্পনায় অঙ্কিত করে নিতে পারি। মঞ্চের মূল অভিনয় ক্ষেত্র হল সম্মুখে রঙ্গপীঠ ও তারপরে রঙ্গশীর্ষ এবং দু'পাশে মত্তবারণীর এলাকা। এই অভিনয় ক্ষেত্রের পশ্চাতে রয়েছে কুতপ এবং

ষড়্দারুক বা পশ্চাদ্‌দেয়াল, তার দু'পাশে নেপথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত মঞ্চে প্রবেশ, প্রস্থানের দুই দরজা। পেছনের দুই দরজায় নেপথ্যকে আবৃত করে রাখবার জন্য দু'খানি "যবনিকা" ব্যবহৃত হত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে যবনিকা না বলে, "পর্দা" কিংবা "আবরক" বলাই উচিৎ। "যবন" শব্দের সঙ্গে এর মিল খুঁজে নিয়ে—ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের উপর্ গ্রীসের প্রভাব ইত্যাদি অনেকেই টেনে আনেন—কিন্তু এগুলি সমস্তই অমূলক। আলেক্‌জেন্দারের আগমনের সঙ্গে এদেশে যবনদের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিকই—কিন্তু গ্রীক রঙ্গমঞ্চের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি সেকালে গ্রীক মঞ্চে যবনিকার কোনই উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল না। পরন্তু ভারতীয়রা একখানা বস্ত্রাবরক বা পর্দা ব্যবহারের মত উন্নত জাতি তখন অবশ্যই ছিল। এই আবরকের নাম যবনিকা যবনদের আগমনের পরেই হয়েছে মনে হয়। দু'পাশে দু'জন যবন কন্যা দাঁড়িয়ে থাকত নাটকীয় চরিত্রের প্রবেশ প্রস্থানের সময় পর্দাখানি ধরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। যবন কন্যাদের নাম থেকেই যবনিকা নাম হয়।

যাই হোক, মঞ্চের পশ্চাদ্‌দিকে কিছু পুস্তের বা দৃশ্যসজ্জার অবস্থিতি হয়তো ছিল, কিন্তু এ দৃশ্যসজ্জা হত স্থির এবং সম্পূর্ণই "ইঙ্গিতধর্মী" নাটকের স্থান এবং দৃশ্য যে অবাধগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে তার সঙ্গে কোন মঞ্চ কৌশলেরই সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ রীতিতে ছন্দোরক্ষা করে চলা সম্ভবপর ছিল না। দৃশ্য পরিবর্তনের এই প্রবাহমানতা মঞ্চে বজায় থাকত কক্ষা পরিবর্তনের অবাধ সুযোগের মধ্যে। যেমন "মৃচ্ছকটিকে" বসন্তসেনার গৃহ সম্মুখে এসে বিদূষক বলছে—

বিদূ—(প্রবেশ ও অবলোকন) "হি! হি! হি!

ওগো, এই প্রথম মহলে চাঁদের মত, শাঁখের মত, মৃণালের মত চক্‌চকে, আর চুনকামকরা ধবধবে সারি—সারি প্রাসাদ দেখছি যে—আবার, নানা প্রকার রত্নে খচিত সোনার সিঁড়ি, উপরে স্ফটিকের গবাক্ষ—মনে হচ্ছে, যেন চাঁদ মুখ বের করে সমস্ত উজ্জয়িনী নগরটিকে দেখ্‌ছে।"

এখানে বসন্তসেনার প্রথম মহলের যে বর্ণনা তার যথাযথ দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে এযুগের কারুবিদ্‌রাও নিজেদের বিপন্ন বোধ করবেন। আর মঞ্চে যদি এই দৃশ্য পরিবেশ রচিতই থাকত তবে বিদূষকের এত বিস্তৃত বর্ণনারও কোন প্রয়োজন থাকে না। কবিকৃত এই বর্ণনাই সামাজিক সাধারণের

চিত্তে পরিবেশের ভ্রম জন্মে দিচ্ছে, মঞ্চ মায়ার সৃষ্টি করছে। দর্শকদের অতঃপর নাটকীয় সংলাপ অনুধাবন করতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। এর পরে বিদূষককে দাসী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, দু'জনে এক একটি কক্ষা পরিক্রমা করে আর একটি কক্ষায় ঢুকছে—অর্থাৎ একটি মহল পার হয়ে আর একটি মহলে প্রবেশ করছে। তাদের বর্ণনায় এবং কথোপকথনেই পরিষ্কারভাবে ভিন্ন ভিন্ন মহলের চিত্র অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। দাসী বলছে—"আসুন মহাশয়, এই দুয়ের মহলে।" বিদূষকের কণ্ঠে তখন সেই মহলের চিত্রটি পেলাম। দু'জনে পরিক্রমা করে এগিয়ে চলল। দাসী বলল—"আসুন মশায়, এই তিনের মহলে আসুন।" বুঝলাম আমরা, তারা নূতন কক্ষায় প্রবেশ করেছে; আবার পেলাম তৃতীয় মহলের কবিদত্ত এক নিখুঁত স্বপ্নময় দৃশ্য। এইভাবেই অবাধগতিতে অপূর্বশোভাময় আটটি মহল আমরা পার হয়ে এলাম। কক্ষা বিভাগ এবং অধিক সংখ্যক বার পরিক্রমায় বেশি দূরত্ব, কম বার পরিক্রমায় কম দূরত্ব ইত্যাদি প্রথা দর্শকদের পরিজ্ঞাত থাকার দরুন, কবি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নাটক এগিয়ে চলল, মঞ্চ প্রয়োগপদ্ধতিতে কোন বাধা এল না। নাটকই আমাদের বারবার তার সমকালের মঞ্চের সম্ভাব্য উপস্থাপনা রীতিকে জানিয়ে এসেছে।

রঙ্গালয় এবং রঙ্গমঞ্চ তৈরী শেষ হয়ে গেলে ভরত বলেছেন, মঞ্চের বিঘ্ন-নাশনের জন্য জর্জরের পূজা করতে হবে।

জর্জরের প্রথমভাগে এক টুকরো সাদা কাপড় বেঁধে দিতে হবে—এটা ব্রহ্মার প্রতীক চিহ্ন। নীলকণ্ঠ রুদ্রের জন্য দ্বিতীয় ভাগে বাঁধতে হবে নীল কাপড়, তৃতীয় পীতবসন বিষ্ণুর জন্য বাঁধতে হবে হলুদ কাপড়; চতুর্থ দেবসেনাপতি স্কন্দের জন্য বাঁধতে হবে ক্ষত্রিয়ের বর্ণ লোহিত কাপড়, এবং পঞ্চমভাগে নাগদের জন্য দিতে হবে বহুবর্ণ রঞ্জিত কাপড়।

এরপরে জর্জরকে মাল্য ইত্যাদি ভূষিত করে ধূপধুনো, ফুলচন্দন দ্বারা সাজাতে হবে। তারপর তার পূজায় ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করবেন—ব্রহ্মা আদি দেবতা ও পন্নগগণের ত্রিভুবন বিজয়ী শক্তির তুমি আধার হও। মঞ্চকে বিঘ্নমুক্ত রাখো ও রাজার যশ বর্ধন করো, ইত্যাদি। তাঁরা মনে করতেন সমস্ত দেবতাদের শক্তি তখন রঙ্গালয় রক্ষার কাছে নিয়োজিত হল।

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার তৈরী, তার যা কিছু উপকরণাদি সংগ্রহ শেষ হয়ে গেল। এরপরে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হওয়ারই কথা। কিন্তু বড় বড়

ওস্তাদদের জলসায় যেমন দীর্ঘসময় চলে যায় শুধু হাতুড়ি পিটিয়ে তবলা ঠিক করতে, এবং কানমুচড়ে তানপুরার সুর বাঁধতে, হিন্দু রঙ্গমঞ্চের নাট্যারম্ভটাও তেমনি নানান অনুষ্ঠান, আয়োজনের মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে এগোয়।

এই নাট্য পূর্বেকার অনুষ্ঠানের নাম হল "পূর্বরঙ্গ" (Preliminaries)। "পূর্ব" মানে আরম্ভ, এবং "রঙ্গ" মানে মঞ্চ। মোট অর্থ হল মঞ্চীয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ। এই পূর্বরঙ্গের মধ্যে নয়টি বিভাগ রয়েছে—১। প্রত্যাহার, ২। অবতরণ, ৩। আরম্ভ, ৪। আশ্রাবণা, ৫। বক্ত্রপাণি, ৬। পরিঘট্টনা, ৭। সংঘোটনা, ৮। মার্গাসারিত, ৯। আসারিত।

এই অনুষ্ঠান সূচীর মধ্য দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা কুতপে এসে বসবেন, নানা রকম বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধবেন সঙ্গে স্তোত্র পাঠ হবে, গলা ঠিক করা হবে ইত্যাদি। এগুলি সকলি চলবে "সম্মুখ-যবনিকার" (Front Curtain) অন্তরালে।[৮]

এরপরে যবনিকা উত্তোলন হয়ে গেলে, নৃত্য, প্রশস্তি ও পূজাপাঠ সুরু হবে—এর নাম হল "নান্দী"। এই নান্দী অনুষ্ঠানে সবরকম বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজতে থাকবে এবং গান হতে থাকবে। নান্দীও নয় প্রকার।

১। উত্থাপন—যবনিকা উত্তোলন বা অনুষ্ঠান আরম্ভ।

২। পরিবর্তন—সূত্রধার ও তার সহচররা পূজোপকরণ নিয়ে ঢুকবেন, এবং মঞ্চের দশদিক পরিক্রমা করে তার—অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের প্রশস্তি পাঠ করবেন।

৩। নান্দী—ব্রহ্মার আশীর্বাদ কামনা এবং দ্বিজ ও রাজার প্রশস্তি।

৪। শুষ্কাপকৃষ্টা—মন্ত্রপাঠ করে তর্পণ করা।

৫। রঙ্গদ্বার—নাট্যারম্ভ। কিছু কিছু কথা ও দেহভঙ্গি এল।

৬। চারি—শৃঙ্গার রসাত্মক নাচ।

৭। মহাচারি—পায়ের বিশেষ ভঙ্গি ও তাল, ভয়ানক রসাত্মক।

৮। ত্রিগত—মঞ্চে তিনজন লোকের কথা। সূত্রধার, তার সহচর বা পারিপার্শ্বক এবং বিদূষক।

৯। (কার্যের) প্ররোচনা—এতে সূত্রধার নাটকের কার্যের উত্থাপনা ও যৌক্তিকতা প্রয়োগ করবেন।

এরপর দৈত্যদের তুষ্টি বিধানের জন্য "বহির্গীত" বা দানব প্রশস্তি গীত হবে।

নান্দীর যে বিভিন্ন অংশের আলোচনা হল, এর মধ্যে "পরিবর্তনের" অঙ্গটাই বিস্তৃত এবং প্রধান। এইটি সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

নান্দীর পরিবর্তন অংশে সূত্রধারকে অগ্রবর্তী করে তার দু'জন পারিপার্শ্বিক অথবা ভরত উক্ত "পারিপার্শ্বক" মঞ্চে ঢুকবেন। তারা মঞ্চের বিঘ্ননাশের জন্য পূজা-উপচার ও পুষ্প নিয়ে আসেন ও দশদিক পরিক্রমা করেন। তারা সাদা পোষাক পরিহিত হবেন এবং সাদা ফুল নিয়ে আসবেন। তাদের "অদ্ভুত দৃষ্টি" হবে এবং "বৈষ্ণবস্থানে" (স্থান=দেহভঙ্গি) দাঁড়াবেন।

দু'জন পারিপার্শ্বকের হাতে স্বর্ণ ভৃঙ্গার বা 'কলসী' ও জর্জরদণ্ড থাকবে। সূত্রধার তাদের পাশে পাশে পাঁচ পা এগোবেন. এরপরে সূত্রধার ব্রহ্মামণ্ডলে বা মঞ্চের মধ্যভাগে অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য দেবেন। এবং ব্রহ্মামণ্ডল পরিবর্তন বা পরিক্রমা করবেন। এবার তিনি তাঁর ভৃঙ্গারধারী পারিপার্শ্বককে ডাকবেন, সে শঙ্খে করে জল এনে দেবে। সূত্রধার সেই জলে আচমন করে গায়ে জল ছিটোবেন। এবার তিনি সাবধানে বিঘ্ননাশক জর্জর স্থাপন করবেন, এবং ব্রহ্মামণ্ডল দ্রুতলয়ে পরিক্রমা করে জর্জর তুলে নেবেন। জর্জর নিয়ে পরিক্রমা কালে তিনি মন্ত্র পাঠ করবেন তার পদক্ষেপও ভিন্ন তালের হবে। তিনি এগিয়ে যাবেন 'কুতপ' বা 'অর্কেস্ট্রা' যেখানে বসে আছে সেই দিকে। বাদ্যযন্ত্রও দ্রুতলয়ে বাজবে। সূত্রধার ও তার পারিপার্শ্বকরা এরপরে ভূমি স্পর্শ করে তিনবার প্রণাম করবেন ও নিজেদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেবেন। 'ত্র্যস্র' ধরনের মঞ্চে এই সব জল ছিটোনো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বিশদভাবে হবে না। এরপরে "পরিবর্তন ধ্রুব" সুরু হবে। এতে দেবতাদের প্রশস্তি গানের সঙ্গে মঞ্চপরিক্রমা করে তার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অধিষ্ঠাতৃদেবতার পূজা দেওয়া হবে।

এবার মঞ্চে চতুর্থ ব্যক্তি ঢুকবেন হাতে ফুল নিয়ে। তিনি জর্জরকে পূজা দেবেন, কুতপ ও বাদ্যযন্ত্রদের পূজা দেবেন, এবং সূত্রধারকে পুষ্প অর্ঘ্য দেবেন। তার পায়ের তালের সঙ্গে ড্রাম বাজবে। তারপর অর্থহীন শব্দে অসুর ও দৈত্যদের স্তব হবে, এবং চতুর্থ ব্যক্তি চলে যাবেন।

এইভাবেই নান্দী শেষ হলে হবে নাটকের প্রস্তাবনা। নান্দীর শেষে স্থাপক ঢুকবেন, তিনি সূত্রধারের সঙ্গে নাট্যের প্রস্তাবনা করবেন। স্থাপক এসে সুত্রধার যে স্থান, লয় ও ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তার অনুসরণ করবেন।

এরপর স্থাপক দর্শকদের খুশী করে নাটক ও নাট্যকারের নাম ঘোষণা করবেন; নাটকের মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা করবেন এবং নাটকীয় বিষয়বস্তু দর্শকদের জানাবেন।

অলৌকিক চরিত্র নিয়ে কাহিনী বিরচিত হলে তিনি দেবতার নাম উল্লেখ করবেন, লৌকিক কাহিনী হলে করবেন কোন মানব চরিত্রের নাম উল্লেখ আর দেবতা ও মানবের কাহিনী হলে করবেন দেবতা কিংবা মানবের নাম উল্লেখ অর্থাৎ দেবতা অথবা মানুষ যাকে নিয়েই হক নাটকের নায়ক চরিত্রের নাম ঘোষণা করবেন। অনেক সময় 'নটী' বা সূত্রধারের স্ত্রীই সংস্থাপকের কার্য করেন। তিনি নাটকের বীজস্থাপনা করে চলে যাবেন।

যেমন শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় দেখি সূত্রধারের সঙ্গে নটীর কথোপকথন প্রসঙ্গে সূত্রধার নাট্যকার নাটক ইত্যাদির পরিচয় দিচ্ছেন—

সূত্রধার—আজ এই সভায় অনেক পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হয়েছে, তা আজ কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক অভিনব নাটকটির অভিনয় করে এদের মনোরঞ্জন করা যাক না কেন। দেখ আর্যো, নাটকের প্রত্যেক পাত্র যাতে সুন্দররূপ অভিনয় করে, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কোরো।

নটী—আপনি তো পূর্বেই বলেছিলেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক একটি অপূর্ব নাটক আজ এইখানে অভিনয় করা হবে।

সূত্রধার—আর্যো, ঠিক্ মনে করে দিয়েছ। আমি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেম। তার কারণ কি জান?

কোথা ধায় চিত্ত মম তব গীত সাথে
দুষ্মন্ত যেমন ওই মৃগের পশ্চাতে॥

—সকলের প্রস্থান।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর অনুবাদিত)।

এখানেই নাটকের প্রস্তাবনা শেষ, মৃগের পশ্চাতে দুষ্মন্তের আগমন ঘোষণায় বীজস্থাপনা হল। এরপর নাট্যারম্ভ। স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব ও সাত্ত্বিকভাব ইত্যাদির সহায়তায় নাট্যাভিনয় এগিয়ে চলতে থাকে এবং নাটকও এগোয় প্রারম্ভ, প্রযত্ন, ফলসম্ভব, নিয়তাফলপ্রাপ্তি এই সন্ধিগুলি পার হয়ে ফলপ্রাপ্তির দিকে। অভিনয় কালে অভিনেতা বিভিন্ন প্রকার ভাব, তার হস্তের মুদ্রা, দাঁড়ানোর 'স্থান' চক্ষু এবং ভ্রূর বিভিন্ন অভিব্যক্তি ইত্যাদির সাহায্যে প্রকাশ করেন।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগৃহের সম্পর্কে যেটুকু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তা হল—ইকেরিতে রাজা ভেঙ্কটাপ্পা কর্তৃক রচিত একটি রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয়টিতে হাতির দাঁতের এবং চন্দনকাঠের কারুকার্য ছিল। নাট্যগৃহের মধ্যে মূল্যবান পাথর বসান ছিল, চারদিক ঘিরে ছিল একটি বাগান।

ভারতবর্ষে ক্লাসিকাল ধারার নাট্যানুষ্ঠান হত হয়তো কোন বাগানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করে অথবা কোন রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্ন কক্ষে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকের যুগে কেবল মাত্র নাট্যাভিনয়ের জন্য আলাদা ভাবে স্থায়ী নাট্যশালা নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায় না—তাই এগুলি রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্নই হত। বিশেষজ্ঞদের মতে নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে রঙ্গক্ষেত্র ত্রিভুজাকৃতিরই হত। তারপরে হয়েছে বর্গাকার চতুর্ভুজ এবং সর্বশেষে এসেছে আয়তাকার রঙ্গালয়। ছোট আকারের রঙ্গগৃহে একক সংলাপের (Monologue) অভিনয়ই বেশি হত।

গুপ্তযুগেই ভারতে পাথরের স্থাপত্যকলা উন্নত শ্রেণীর শিল্পনিদর্শন হয়ে ওঠে। এর আগে প্রস্তর স্থাপত্য পর্বতের গুহাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গুপ্তযুগের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের দিনে গুহাগৃহের নিভৃত সাধনা আর রইল না—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন সমস্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলিই উন্নত শিল্পরূপ পেতে লাগল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকেই মধ্য ভারতে গুপ্তযুগের মন্দিরশিল্প বিশেষ বিকাশ লাভ করে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই গুপ্তযুগের এই মন্দির শিল্পের ধারা দক্ষিণভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে প্রস্তরের অভাব ছিল না—সুতরাং চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল, পাণ্ড্য, হয়সল ইত্যাদি রাজবংশ এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠ-পোষকতায় প্রায় হাজার বছর ধরে দক্ষিণভারতের মন্দির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য এক অনন্য শিল্পরূপ পায়। এই সব মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য এবং নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপের উল্লেখ বহু স্থানেই পাওয়া যায়। নাট্যশালা মূল মন্দির অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত না, অতএব বিদেশী আক্রমণে এবং কালের কবলে এই বহিরংশের ক্ষয়ক্ষতিই হয়েছে বেশি।

এই মন্দিরের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেছেন—"আমাদের অনুমান মন্দির পরিক্রমার পর এইভাবে বৃত্তাকারে বসে নাটমন্দিরে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন সূচক অভিনয় রূপে, যাত্রা অনুষ্ঠিত

হত। সারদাতনয় (দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে) তাঁর "ভাব প্রকাশনম্" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে নাটমণ্ডপ বর্ণনা করার সময় ত্রিবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লেখ করেন।"

ভাবপ্রকাশনমে উল্লিখিত তিন প্রকার নাটমণ্ডপ হল চতুরস্র, ত্র্যস্র এবং বৃত্তাকার। আমরা ইতিপূর্বে যে নাট্যক্ষেত্রের উল্লেখ পেয়েছি তা হল বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। ভাবপ্রকাশনমেই আমরা সর্বপ্রথম মন্দির শিল্পের ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত বিকৃষ্টের পরিবর্তে বৃত্তাকার মণ্ডপের উল্লেখ দেখি। অতএব নাট্যশাস্ত্রের কালে এরূপ বৃত্তাকার রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় হত বলে মনে হয় না। পরে—অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে, সারদাতনয়ের সমসাময়িক কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমুন্নতশির মন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির তৈরী হতে থাকে—এই নাটমণ্ডপগুলি সাধারণতঃ বৃত্তাকারই হত। যেমন দেখা যায় ৯৫৪ খ্রীঃ নির্মিত খাজুরাহোর "লক্ষ্মণ মন্দিরে"। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপটি চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মণ্ডপের গঠন ছিল সম্পূর্ণ বৃত্তাকার।

সারদাতনয় "বিকৃষ্ট" নাটমণ্ডপের পরিবর্তে কেন যে বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের কথা উল্লেখ করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃত্তাকার নাটমণ্ডপই তিনি তখন দেখেছিলেন, "বিকৃষ্ট" শ্রেণীর নাটমণ্ডপ হয়তো তিনি দেখেননি। সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে 'চতুরস্র' এবং কোন কোন স্থানে নৃত্য গীতাদির জন্য হয়তো বা ত্র্যস্র মণ্ডপও বাঁধা হত, সারদাতনয় তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই এই দুই শ্রেণীর নাটমণ্ডপের উল্লেখ তিনি করেছেন। সেই যুগে "বিকৃষ্টের" ন্যায় শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ নির্মাণ করে অভিনয় নৃত্য, গীতানুষ্ঠান করার মত আড়ম্বর লক্ষ্য করা যেত না। তখনকার সমস্ত নাট্যকলা চর্চার আড়ম্বর এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মন্দিরের সীমানায় মধ্যে ;—তাই ক্রমশঃ মন্দিরে "দেবদাসী" রাখা হত, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সমৃদ্ধ পালাগান, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত।

বাংলা দেশে—তখনকার পৌণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়র মন্দির নির্মিত হয়—সেই মন্দিরের নাটমণ্ডপ বৃত্তাকার ছিল, তাতে নৃত্য গীতানুষ্ঠান হত।

মন্দির থেকে দেবমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হত, তারা নৃত্য গীতাদি সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করত। দেবতাকে নিয়ে এই যাত্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত ছিল—আজো কোথাও কোথাও আছে—যেমন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

শোভাযাত্রাকারীরা প্রদক্ষিণান্তে মন্দিরে ফিরে এসে দেবতাকে গর্ভগৃহে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করত—তারপর নাটমণ্ডপে বৃত্তাকারে দর্শক-পরিবেষ্টিত হয়ে তারা দেবতার মহিমাজ্ঞাপক পালাগান করত। ক্রমে এই পালাগানই নৃত্য গীতাভিনয় সহযোগে সুসংস্কৃত রূপ ধারণ করল। তখনও কিন্তু তার নাম যাত্রাই রইল। প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলির অভিনয় প্রধানতঃ রাজদ্বারেই হত মন্দিরে নয়। বৃত্তাকারে নাটমণ্ডপের চার পাশে দর্শকদের উপবিষ্ট হওয়ার রীতিই পরবর্তীকালে নগরে, গ্রামে, হাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, রাজগৃহে, জমিদার বাটীতে প্রচলিত ছিল, যেখানেই—কীর্তন, পাঁচালী, পালাগানের অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানেই আসর হয়েছে কেন্দ্রে। যাত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানেও ক্রমশঃ এই ধারাই প্রবর্তিত হয়েছিল।

দক্ষিণভারতে কেরালার অন্তর্গত কোচীন রাজ্যে কয়েকটি মন্দির-নাট্যশালা কালের কবল থেকে এখনো ভগ্নদশায় টিকে আছে। এই ধরনেরই একটি নাট্যশালা রয়েছে ত্রিচূড়ে। এই রঙ্গালয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে এটি ছিল "আয়তাকারের", ভূমি থেকে নাট্যগৃহের উচ্চতা ছিল চার ফুট। কক্ষমধ্যটি গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছিল। নাট্যশালায় দু'টি প্রবেশ পথ রয়েছে উত্তরে ও দক্ষিণে। পূব-পশ্চিম দিকে পাথরের ভিতের উপরেই রয়েছে কাঠের গাঁথুনী। তার মধ্যমাংশে রয়েছে একটি বেদী এবং তার পশ্চাতে নেপথ্য। নেপথ্য ও বেদীর মাঝখানে দু'টি দরজা ও তাতে যবনিকা। মাঝের এই বেদীটিই প্রকৃত রঙ্গমঞ্চ—তাই তা সামান্য উঁচু। রঙ্গমঞ্চটি আকারে চতুষ্কোণ, উপরে একটি কারুকার্য খচিত সিলিং, তাকে আবার ধরে আছে অলংকৃত কয়েকটি স্তম্ভ। গৃহাভ্যন্তরের বাকি অংশটি দর্শকদের বসবার জন্য নির্দিষ্ট। কারুকর্ম খোদিত স্তম্ভশ্রেণী চারদিক ঘিরে ছাদকে ধরে রেখেছে। দক্ষিণ ভারতীয় থিয়েটারের আধুনিক বিশেষজ্ঞ কে. আর. পিশারোতির (K. R. Pisharoti) মতে মন্দির রঙ্গালয়ে কোথাও কোথাও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত—কিন্তু তা বাইরের লোক জানতে পারত না।

মুসলমান আগমনের পরে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যাভিনয়ে ক্রমশঃ ছেদ পড়ে যায় এবং আরম্ভ হয় এক নূতন ইতিহাস।

॥ সুদূর প্রাচ্য ॥

সুদূর প্রাচ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান ছাড়া অন্যান্য উপদ্বীপ ও দ্বীপগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম হল ইন্দো-চায়না বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশের উপদ্বীপ অঞ্চল। এর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্ম, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), মালয় উপদ্বীপ, লাউস, কম্বোডিয়া, কোচীন-চীন, আনাম, টোনকিন প্রভৃতি অঞ্চল। দ্বিতীয় অংশ হল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আরম্ভ করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে রয়েছে বর্ণিও, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, পূর্বে নিউগিনি, উত্তরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণে রয়েছে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ।

এশিয়ার এই উপদ্বীপ ও দ্বীপময় প্রাচ্য অঞ্চলকে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুরা বলতেন "সুবর্ণভূমি" (Suvarnabhumi)। প্রধানত ব্রহ্ম, শ্যাম ও মালয়কেই স্বর্ণদ্বীপ বলা হত। এই নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন যে এই সকল দেশে প্রচুর স্বর্ণ বা অতি মূল্যবান বাণিজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায়—যার জন্য তারা বাণিজ্যতরী সজ্জিত করে ওদেশে যেতেন। পরবর্তীকালে আরবরাও স্বর্ণ প্রত্যাশায় সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেছিলেন—যার ফলে এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পূর্ণ আধিপত্যের পরে আবির্ভাব ঘটেছিল মুসলিম ধর্মের।

ইন্দো-চীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ছিল সেমাং, স্যাকাই প্রভৃতি আদিম উপজাতি অধ্যুষিত। এরা বেশির ভাগই বনে জঙ্গলে সম্পূর্ণ বন্য ও বর্বর জীবন যাপন করত। আবার তাদের কিছুটা অংশ উন্নত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত না হলেও আদিম মানুষের সহজ শিল্প ও বিজ্ঞান বুদ্ধির স্পর্শ পেয়েছিল। এই জাতিরাই ইন্দো-চীন উপদ্বীপে এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এখানে ভারতীয় উপনিবেশের সূচনা হয় খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভকালে।

যেমন সর্বদেশে সর্বকালে হয়ে থাকে—তেমনি সুবর্ণভূমির সম্পদ এবং সুখ-সম্ভাবনা ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়িকদের সর্বপ্রথম অজানার অভিযাত্রায় উৎসাহিত করেছিল। এখানকার প্রধান মূল্যবান পণ্য ছিল 'মশলা'।

সমুদ্র ও পাহাড় ছাড়িয়ে এই কিংবদন্তীর দেশ, পূর্বসমুদ্রের সুবর্ণদ্বীপে তারা যাত্রা করলেন। নিঃসন্দেহে এই অভিযানে বণিকরা ছাড়াও অন্যান্য শক্তির সমাগম ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ এর আগেই এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এরপরে গুপ্তযুগে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটল তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রচারকরাও অভিযাত্রীদের সঙ্গী হলেন। অন্যদিকে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষগণও দিগ্‌বিদিকে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন, তারা এসে হাত মেলালেন বণিকদের সঙ্গে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ উপকূল থেকে দলবদ্ধ নৌ-বহর বেরিয়ে পড়ল পূর্ব-সমুদ্রের পথে।

এই সমস্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সেই বিদেশভূমিতে স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করলেন। ধর্মপ্রচারকরা সেখানে রয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে, আবার কেউ কেউ সেখানকার সমাজে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে লাগলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। ফলে উন্নততর হিন্দুসভ্যতা এই দ্বীপপুঞ্জে ক্রমান্বয় বিস্তৃত হয়ে চলল। ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং সামাজিক ধারণা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে এই আগন্তুক হিন্দুজাতি নিবিড়ভাবে সংমিশ্রিত হয়ে এক নূতন হিন্দুজাতি সৃষ্টি করল—তার মধ্য থেকে কে ছিল আর কে এসেছিল তা বেছে নেওয়ার উপায় রইল না। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীরা সংস্কৃত এবং পালিকে তাদের ভাষারূপে গ্রহণ করল।

এইভাবেই ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটল। অভিযাত্রীরা মূল মাতৃভূমির সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতিগত অখণ্ড সম্পর্ক রক্ষা করে চললেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক অনেক পর্যটকদের বিবরণীতে, অনেক গাথায় ও উপকথায়। যেমন পাওয়া যায় "তুয়েন্‌-সুইনের" (Tuen-Suin) তৎকালীন বিবরণীতে। বৌদ্ধ জাতকের মধ্যেও রয়েছে বহু সমুদ্রযাত্রার কথা, রয়েছে নির্বাসিত রাজপুত্রের বহু কষ্টভোগের পর ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের কাহিনী। আবার রয়েছে একদল ছুতোর মিস্ত্রির কাঠ কেটে জাহাজ তৈরী করে অজানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহুদূর দ্বীপে পৌঁছনোর গল্প। আর সেই অন্ধ মহানাবিকের কথা, যে সপ্তসিন্ধু ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অন্ধ হলেও বণিকদের দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত সুদূর দ্বীপের পথ।

এই ধরনের ভারতীয় বণিকদের সুবর্ণদ্বীপের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী 'বৃহৎকথা' গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্বেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। এর মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য ছিল সানুদাসের অভিযান কাহিনী। জাহাজ থেকে নেমে তাদের বহু বিচিত্র পথ অতিক্রম করতে হয়—যেমন, বেত্রপথ, বংশপথ, অজপথ, জানুপথ, শঙ্কুপথ বা হুকের দড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠা, চাত্রাপথ বা খাড়াই বেয়ে নামা ইত্যাদি। এই পথের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে তাদের কত অনিশ্চিত বিপদের মধ্য দিয়ে বিদেশে যাত্রা করতে হয়েছে।

ভারত পর্যটক ফা-হিয়েনের বর্ণনার মধ্যেও আমরা বণিকদের দল বেঁধে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ পাই।

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। ভারতের প্রাচীন কথাসাহিত্যের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে সপ্তসিন্ধুতে বাণিজ্যিক অভিযাত্রার ঐতিহাসিক কথা-চিত্র। এই বিদেশযাত্রার প্রধান প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর) প্যালুরী (গোপালপুরের কাছে) এবং মছলিপত্তমের কাছে তিনটি বন্দর।

এ ছাড়া বুদ্ধজন্মের বহুপূর্বেই ব্রহ্ম, আরাকান ও কম্বোজে, কপিলাবস্তু ও ইন্দ্রপ্রস্থের ক্ষত্রিয় রাজারা বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন ও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ১। মালয় উপদ্বীপ, ২। যবদ্বীপ—এ দ্বীপ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এবং শস্য-শ্যামল ভূ-খণ্ড। হিন্দুরা এখানে প্রায় ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ৩। সুমাত্রা। ৪। বর্নিও—এখানে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে হিন্দু ও বৌদ্ধ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার "কোমলেং" (Komleng) গুহায় শিব, নন্দী, অগস্ত্য—(আমাদের কিংবদন্তী-উক্ত অগস্ত্যমুনির যে অগস্ত্য-যাত্রা তা এই পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যেই হয়েছিল বলে মনে করা হয়), নন্দিশ্বর, ব্রহ্মা, স্কন্দ, মহাকাল প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি পাওয়া যায়। ৫। বলিদ্বীপ—এটা বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপনিবেশ ছিল। ভারতের বাইরে একমাত্র এই বলিদ্বীপেই প্রাচীন হিন্দুধর্ম এখনো অটুট রয়েছে।

সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতার এই বিস্তার এবং মূল ভূ-খণ্ড ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপের সঙ্গে তার সংযোগ ৬ষ্ঠ ও ৭ম খ্রীষ্টশতক পর্যন্তও অটুট ছিল।

এটা এক জাগতিক সত্য যে কোন উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে যদি কোন অনুন্নত সভ্যতা আসে—তবে সেই অনুন্নত সভ্যতা উন্নত সভ্যতার মাঝে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

এই উপনিবেশ অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার হয় তা বৈদিক ধর্ম ছিল না। তা ছিল বেদ পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমসাময়িক নবজাগরিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এ ধর্মে অনেক দেবদেবী মানা হত এই নতুন ধর্ম বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয়েছিল "পুরাণ" সাহিত্যের এবং রামায়ণ, মহাভারত এই মহাকাব্যদ্বয়ও এই সময়ে পুনঃপ্রচারিত হয়। লক্ষণীয় যে এই ঔপনিবেশিক অভিযান আর্যসভ্যতার মূল কেন্দ্রস্থল উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে হয়নি, হয়েছিল বাংলা, উড়িষ্যা এবং প্রধানতঃই দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল থেকে। ভারতের এই দক্ষিণাঞ্চলে বৈদিক সাহিত্যের চাইতে রামায়ণ, মহাভারতের প্রভাবই ছিল বেশি—বিশেষ করেই ছিল রামায়ণ অবলম্বনে নৃত্য, গীত ও নানা কথা-কাহিনীর প্রচার। মহাভারতের যুদ্ধকেন্দ্র এবং মূল কাহিনীস্থল ছিল উত্তর ভারত, অন্যদিকে রামায়ণের যুদ্ধকেন্দ্র ছিল সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণাঞ্চল। তাই এই রামায়ণ কাহিনীই উড়িষ্যা ও দক্ষিণভারতের মন. হরণ করেছিল অতি সহজে।

দাক্ষিণাত্যের চোল, শৈলেন্দ্র প্রভৃতি রাজবংশগুলির সময়ে এই উপনিবেশগুলিতে বাণিজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যবিস্তার ঘটেছিল। তাদের কাছ থেকেই সুবর্ণদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছিল রামায়ণের নৃত্যনাট্য ও ছায়ানাটক।

সংস্কৃতির দিক থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার উপরে গ্রীসের "ইলিয়ড" ও "অডিসি" এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব সুবিস্তৃত। তেমনি ভারতের দুই মহাকাব্যও প্রভাব বিস্তার করেছিল সমগ্র এশিয়া জুড়ে—বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়।

ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রভাব—সেই খাঁটি ভারতীয় ধারা যা ভারত থেকে এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে তারো অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ভারতের বাইরে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, বলিদ্বীপে, জাভার উপকূল জুড়ে, শ্যামদেশে, চীনে, মুখোশ পরিহিত জাপানের কাবুকি নৃত্যে। যা আজ ভারতবর্ষে বিস্মৃতির অতলে সেই খাঁটি ভারতীয় নৃত্যের নিদর্শন রয়েছে এই বৃহত্তর ভারতে। ভারতীয় শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ছিল

বৌদ্ধধর্ম। বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মমতই প্রথম প্রচার লাভ করেছিল—হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পরে। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশে সিংহ-নৃত্য প্রবর্তিত হয়েছিল। কখনো এই নৃত্য শোভাযাত্রার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় অভিনীত হয়েছে, আবার কখনো বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উচ্চতর ভূমিতে অভিনীত হয়েছে। এশিয়াতে সিংহের আবাসভূমি ভারতবর্ষেই, চীন, জাপান সিংহের গল্পই শুনেছে—সিংহ তাদের পশুরাজ ছিল না, এখন এই সিংহ-নৃত্য তার স্বদেশ ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্ত কিন্তু ভারতের বাইরে অটুট রয়েছে।

আর্য-সভ্যতায় বৈদিক যুগের শেষে রামায়ণ, মহাভারত দুই ভারতীয় মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। এই দুই মহাকাব্য রচনাকালে নৃত্য-নাট্য এবং গীতি-নাট্য প্রচলিত ছিল। কারণ তার উল্লেখ মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থানে পাই, পুরো রামায়ণ মহাকাব্যখানিই বীণাবাদ্য এবং নৃত্যসহযোগে লব, কুশ দ্বারা গীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যের গঠন-ভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই মহাকাব্যদ্বয়ের প্রবল একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

এখনও ভারতের নগরে ও গ্রামে যাত্রা, কথকতা, শিল্প, সাহিত্য ও নাট্যে মহাকাব্যের সমুজ্জ্বল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই রামায়ণ ও মহাভারত—নৃত্য-নাট্যের রূপ, রস, কাহিনী, সংস্কার, বিশ্বাস সকলেরই উৎসস্বরূপ হয়ে রয়েছে। এই মহাকাব্যকাহিনী অবলম্বন করেই বাংলাদেশের 'যাত্রা' উত্তর ভারতের "রাম-লীলা" দক্ষিণভারতের সুপ্রসিদ্ধ "কথাকলি" নৃত্য-নাট্য রূপ পেয়েছে। কোন আবৃত্তিকার, নৃত্য-নাট্যদল বা নাট্যকার দলই একই সময়ে কোন একটি মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ অভিনয় দেখাতে পারেন না। সুতরাং কাহিনীর অংশবিশেষ বা সংক্ষিপ্ত সংশোধিত রূপই দেখান হয়। রামায়ণ-মহাভারতে, ইলিয়ড-অডিসির বহুবর্ণ রঞ্জিত রোমান্সের কাব্যরূপ যেমন আছে—তেমনি বাইবেলের অনুরূপ নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাস রয়েছে—তাই কেবল শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়—জাতির জীবনাদর্শে তার রয়েছে সুগভীর অবদান।

মহাকাব্যদ্বয় বহু-বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করেছে—সিংহলে এবং দক্ষিণ এশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় মহাভারতের নাম হল—"ব্রাত-যুদ্ধ" বা "ভারত-যুদ্ধ" (Brata Yudha), কম্বোডিয়ায় রামায়ণের অন্য নামকরণ হলেও

কাহিনী এবং চরিত্র মূলের অনুরূপই আছে। ব্রহ্মদেশে মুখোশ পরিহিত ভ্রাম্যমাণদলকে রামায়ণ কাহিনী অভিনয় করতে দেখা যায়। থাইল্যাণ্ডে দেখি রাম বিরাটাকার স্বর্ণ-বিনির্মিত রাজমুকুট মাথায় দিয়ে অ্যারিণায় নৃত্য করছেন। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে দর্শকগণ এই রামচরিত্রকে "বুদ্ধ" এবং রাবণ-চরিত্রকে "দৈত্য বা অপদেবতা" নামে অভিহিত করলেও—প্রকৃত কাহিনী সেই রামায়ণের বলেই চেনা যায়। লাউসে রাবণই হচ্ছেন নায়ক এবং রাম একটি সহায়ক চরিত্রমাত্র। এই নাটকের একেবারে উপসংহারে মূল রামায়ণের অনুসরণেই রামচন্দ্র সীতাকে ফিরে পান, কিন্তু সীতা তখন রাবণকে ছেড়ে যাওয়ায় বেদনাবিদ্ধ—অশ্রুবিসর্জন করতে করতে গৃহে ফিরছেন। সিংহলে রামচরিত্রের উপরে আরোই বেশি অবজ্ঞা এবং বিরূপতা। মহাকাব্য অনুসারে রাবণের বাসভূমি এই স্বর্ণলঙ্কাই ছিল—তাই তাদের প্রিয়চরিত্র রাবণ। এখানে একটি জনপ্রিয় নাট্যকাহিনী প্রচলিত আছে—তার নাম হল "রাম-হত্যা" এটা একটা "ইন্টারলুড" ধরনের নাটক। এর নাটকীয় কাহিনীতে আছে—রামচন্দ্র যখন তার অপহৃতা পত্নী সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কাদ্বীপে এসে পৌঁছলেন—তখন তিনি লঙ্কার ভাষা না জানা থাকায় মহাবিপদে পড়ে গেলেন। লঙ্কার এক ব্যবসায়ী রামকে এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে এবং রাম কাপড় চুরি করেছে এই সন্দেহে তাকে প্রচণ্ড মার লাগায় তাতে রামের ক্ষীণ প্রাণ বহির্গত হয়ে যায়। তারপরে অত্যন্ত লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করে ব্যবসায়ী চীৎকার করে নিহত রামকে বলল—"ওহে ওঠো, ওঠো, তোমার শ্বাশুড়ী এসে গেছে।" কিন্তু তাতেও লোকটা জীবন পেয়ে উঠল না, এদিকে দেবতারা রাম আগেই মরে গেলে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ হবে কি করে, কেই বা রাবণ হত্যা করবে—কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁরা পরামর্শ করে রামকে জীবন দান করলেন। এই কাহিনীর মধ্যে হাস্যরস যাই থাক মূল বক্তব্যটি পরিষ্কার। একমাত্র দেবানুকূল্যেই রাম রাবণকে হত্যা করতে পেরেছিলেন—না হলে রামের রাবণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবারই যোগ্যতা ছিল না, কারণ সামান্য একজন ব্যবসায়ীর হাতে নিগৃহীত হয়েই রাম পরমগতি লাভ করলেন। মুসলমান অধিবাসীপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় এই হিন্দু মহাকাব্য ধর্মীয় বহু বৈপরীত্য সত্ত্বেও বিচিত্র উপায়ে টিকে রয়েছে। জাভার মুসলমান "জোগ-জাকারতা" (Jogjakarta) রাজসভা অথবা "সোলোর" (Solo) রাজসভায়,

রাজসভার নৃত্যকারীরা গ্যামেলিনের ঘণ্টাধ্বনির মনোমুগ্ধকর, মধুর শব্দপ্রবাহ মধ্যে ধীর, মন্থর গতিতে হাজার হাজার বছর ধরে মহাভারতের অর্জুন ও সেমবোদ্রো (Sembodro) বা সুভদ্রার প্রণয়লীলা বা পাণ্ডব-কৌরবদের যুদ্ধ নৃত্য দেখিয়ে চলেছে।

বিশেষ করে মালয়, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া ও লাউসে রামায়ণের প্রভাবই বেশি—তবে ভাষাগত উচ্চারণ পার্থক্যের জন্য চরিত্রের নামগুলি স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে—এক রামকেই "রাম" "লাম", "রোম" ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যচীনের কোন কোন অপেরায় এখনো রামায়ণের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠে।

হিন্দু যুগে ভারতীয় নাট্যজগতে রামায়ণ মহাভারতের লৌকিক রূপটাই কিন্তু সব ছিল না। তার আর একটা রাজজন সমাদৃত, সুধীজন প্রশংসিত সংস্কৃত সাহিত্য অন্তর্গত নাগরিক নাট্য ধারা ছিল। বলা যায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে সংস্কৃত ধারার এই পূর্ণাঙ্গ নাট্যাকৃতি রূপ পায়—একে আমরা সংস্কৃত নাটকের সুবর্ণযুগ বলতে পারি। কালিদাস, ভাস, শূদ্রক প্রভৃতি মহাকবি ও নাট্যকারের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক', 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি নাটক কেবল সংস্কৃত সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্যের মণিকুট্টিমে রক্ষণীয় কবিকীর্তি। কিন্তু শকুন্তলা প্রভৃতি বেশিরভাগ সংস্কৃত নাটকেই আমরা দেখি যে তাদের কাহিনী বিরচিত হয়েছে মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে। নাটকের কাহিনী, চরিত্র, আদর্শ এবং সর্বশেষ "ভরতবাক্য' মহাকাব্যদ্বয়ের সঙ্গেই ধর্মীয় ও নৈতিক সুরসঙ্গতিতে বাঁধা। তবে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা অবলম্বনেও কাহিনী বিরচিত হতে দেখা যায়—যেমন ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা" শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক", বা বিশাখদত্তের লেখা "মুদ্রারাক্ষস" ইত্যাদি।

কালক্রমে সংস্কৃত আর কথ্য ভাষারূপে রইল না, হয়ে উঠল জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত এবং পুরোহিতদের ভাষা। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন প্রচারলাভ করে তখন তার ধর্মগ্রন্থের ভাষার সঙ্গে প্রচলিত জনসমাজের কথ্যভাষার মিল ছিল—সেই জন্যই দেখি বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশসমূহে জাতক ও বিভিন্ন কিংবদন্তীর কাহিনী অবলম্বনে নৃত্য-নাট্যই পূর্ণ প্রাণে প্রজ্জ্বলিত। বৃহত্তর ভারতেও এই নৃত্য-নাট্যই সমধিক প্রচার লাভ করে, সংস্কৃত ভাষা ও

নাটক সেখানে গিয়ে পৌঁছলেও তা প্রাণস্পর্শে উজ্জীবিত হয়নি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাট্যসম্পদ স্বল্প শিক্ষিতদের বোধগম্য না হওয়ায়—তার অভিনয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং রঙ্গালয় থেকে নির্বাসিত হয়ে পড়ে। বৃহত্তর ভারতে সাহিত্য হিসেবে হিন্দু নাটকের কিছু প্রসার ঘটলেও—হিন্দু রঙ্গালয়ের স্থাপত্য-রীতি এবং নেপথ্য-বিধির প্রচার ঘটার কোন নজির পাওয়া যায়নি। অতএব আমরা বৃহত্তর ভারতের নাট্যপ্রচেষ্টা খুঁজতে গেলে কোন না কোন প্রকার নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যই পাই এবং রঙ্গমঞ্চ বলতে দেখা যায় সাদাসিধে চত্বর বা একটা সামিয়ানা ঢাকা প্লাটফর্ম মাত্র।

ব্রহ্মা এবং ভরতমুনি প্রদর্শিত পথে ভারতীয় নাটকের রীতিনীতি, গঠনশৈলী, প্রয়োগকৌশল এবং ভাবাদর্শগত যে সূত্র নির্ধারিত হয়েছিল, তা হিরন্ময়যুগের সংস্কৃত নাটক যেমন প্রবল নিষ্ঠায় রক্ষা করেছে—তেমনি তার আদর্শগত প্রভাব লৌকিক নৃত্য বা নাট্যও এড়াতে পারেনি। তারি কতকগুলি মূল সূত্র ভারত ছাড়িয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিজয়ের কালে ছড়িয়ে পড়েছে সারা এশিয়া জুড়ে—এখানেই নিরূপিত হয়েছে পশ্চিম জগতের সঙ্গে প্রাচ্য এশিয়ার নাট্যগঠনগত এবং মঞ্চশিল্পের মৌলিক ব্যবধান। তাই দেখি এশিয়ার নাট্যধারার মধ্যে কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের এক বিচিত্র সমন্বয়। এদের অনুসরণ করেই আমরা এশিয়ার নাটকের মূল প্রতিপাদ্যে পৌঁছতে পারি।

নৃত্য, কাব্য, সঙ্গীত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রাচ্য ধারায় কাব্যই প্রধান, কাব্যই সর্বজয়ী, কাব্যেই আচরণ, কাব্যেই উক্তি-প্রত্যুক্তি। কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে যাওয়া ইউরোপীয় নাটকের বাস্তবানুগ নাট্যরূপ এ নয়। গ্রীক নাট্যেও কাব্য ছিল, শেক্‌সপীয়রেও কাব্য আছে, কিন্তু কাব্য সেখানে ভাষা প্রয়োগের বিশিষ্ট রীতিমাত্র। প্রাচ্যে কাব্য, কাব্যের জন্যই—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, ব্যঙ্গ—কথার বিচিত্র কারুকাজ নিয়ে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। সংস্কৃত শাস্ত্রকার নাটককে বলেছেন "দৃশ্যকাব্য"। অভিনেতাদের সমস্যাই এখানে কাব্যকে দৃশ্যরূপ দেওয়ার—নাটককে নয়। তাই থাইল্যাণ্ডের জনপ্রিয় "লাইকে" (Likay) অভিনেতাদের দেখি নাটকের যে কোন জায়গায় থেমে গিয়ে কবিতার বিচিত্র মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতে।' আবার জাপানের কাবুকি নাটকও

ইউরোপীয়দের অধৈর্য করে তোলে কাব্যের অভিনব মারপ্যাঁচে। সংস্কৃত "শকুন্তলা" প্রভৃতি নাটকের কাব্যও ভুবন বিখ্যাত। এই কাব্যের সঙ্গে গ্রথিত নৃত্যকেও সঙ্গীত ধারায় সিক্ত করে—বিলম্বিত লয়ে একটি গল্প শুনিয়ে দেওয়াই প্রাচ্য নাট্যের রীতি। অতএব সেক্ষেত্রে মঞ্চও হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগামিতা বর্জিত। কাব্যের রূপায়ণে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির মাথা ব্যথা তাদের নেই। কাব্যকে সঙ্গীত, দেহভঙ্গি ও মুদ্রার সাহায্যেই প্রকাশ করা সহজ। তারা কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ধারা প্রস্রবনে দর্শককে এই দুঃখময় বাস্তব জীবন থেকে দূরে, বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। দর্শকের মানস মঞ্চে ফুটুক কাব্যের কুসুম, উঠুক ভ্রমর নিকন, কলাপবিস্তার করে নাচুক ময়ূর-ময়ূরী—দর্শক তুমি দেখ, শোন, রসিয়ে রসিয়ে অনুভব কর—তারপরে আত্মস্বপ্নে নিমগ্ন হও। মঞ্চ কতটুকু পারে সেই স্বপ্নলোকের পরিচয় দিতে, পরিবেশ সৃষ্টি করতে। তাই থাকুক সবকিছু পেছনে পড়ে—এসো এই ছন্দের, সুরের, কাব্যের স্নিগ্ধ সলিল ধারায় অবগাহন করি।

প্রাচ্য নাটকে কাব্যের প্রাবল্যের জন্যই অনেকসময় স্থান, কাল, পাত্রে ইউরোপীয় রীতির অনুরূপ একত্ব রক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে স্থান ও কালের একত্ব (unity) প্রাচ্যে যদৃচ্ছ ব্যাহত। অন্যদিকে নাটকীয় ক্রিয়ার গতিশীলতাও কাব্যপ্রাধান্যের জন্য খণ্ডিত। অভিনেতাকে কাব্যের অগ্রগতির মাঝে যে কোন জায়গায় থেমে নৃত্য, গীত, আচার-আচরণ বা কাব্যে অলংকার বিস্তার করতে হয়, ফলে নাটকে সৃষ্টি হয় স্থির পরিবেশ (Static mood)। মঞ্চের উপর গতির এই বিশ্রাম ইউরোপীয় ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই স্থির কারুকর্ম সৃজনে দর্শকদের ভাবাবেগের ধারাবাহিকতা অবশ্যই খণ্ডিত হয়। প্রাচ্য নাটকের এটাই বৈশিষ্ট্য—সে কেবল একটা গল্প বলতে চায় না, তাকে সুবিস্তৃত সুবর্ণিত উপায়ে বলতে চায়। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে যেমন শুনি দীর্ঘকাল রাগরাগিণীর বিচিত্র বিস্তারের মধ্যে রাজকুমারীর অনন্ত চলার পদধ্বনি—গায়ক এবং শ্রোতা কেউই ব্যাকুল নয় কখন সে পৌঁছবে তা নিয়ে। প্রাচ্যের নাট্য-সাহিত্যেও তাই কাজের মানুষের ছুটে চলা নেই, ভ্রমণ বিলাসীর মত হয়ে সয়ে, রসিয়ে রসিয়ে, দেখতে দেখতে, আস্বাদন করতে করতে যাওয়া।

এই জন্য প্রাচ্য নাট্যের অভিনয়কালে কেবল অভিনেতাগোষ্ঠী থাকলেই চলে না—চাই নৃত্য, গীত, যন্ত্রবিদ্যা পারদর্শী আর একশ্রেণীর লোক—যারা

সঙ্গীতধারার সাহায্যে নাটকের কাব্যভার লাঘব করে গল্পাংশ শুনিয়ে দেবে এবং অভিনেতাদের সহায়ক হবে। প্রাচ্যে এই কথকতার প্রাধান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মহাকাব্যের আবৃত্তি করা থেকে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেছে। ক্রমশঃ এই কথক আবৃত্তি ও সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির সংযোগ করতে লাগলেন, পরে সংলাপের জন্য আলাদা অভিনেতাগোষ্ঠী এল। কিন্তু মূল কথকের ভূমিকা এখনও কীর্তন পাঁচালীতে টিকে আছে।

সংস্কৃত নাটকে এই গল্পকারকে বলা হত "সূত্রধার", তিনিই কাহিনীর ভূমিকা জানাতেন, দৃশ্যারম্ভ করে বীজস্থাপনা করতেন, নাটকের কাহিনী সূত্র রক্ষা করতেন এবং চরিত্রের ব্যাখ্যা ও পরিচালনা করতেন। কাবুকি নাটকেও আমরা দেখি অভিনেতাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে জোরুরি নামে গায়করা থাকেন। তারাই সঙ্গীত ধারায় কাহিনী বিবৃত করে যান এবং অভিনেতারা অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যের সাহায্যে তার ভাবাভিব্যক্তি ঘটান। কেবল সবচেয়ে সুন্দর ও আবেগপূর্ণ অংশগুলিই অভিনেতারা অভিনয় করে থাকেন। জাপানের পুতুল নাচে তো একটি মাত্র গায়কই সকল চরিত্রগুলির বক্তব্য বলে যান। জাপানের "নো" নাটকে একদল কোরাস সঙ্গীতকারী, এবং বাঁশি ও ড্রামসহ যন্ত্রবিদ্‌রা নাটকের প্রয়োজনায় বহু অংশই বিবৃত ও ব্যাখ্যা করেন।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এই সব গল্পকারকরা বিভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে। এখানে নৃত্য ও নাট্য একই ব্যাপার। যে সব নৃত্যবিদ্ বা অভিনেতারা বার্ধক্য বশতঃ অভিনয় করতে পারেন না তারাই অর্কেস্ট্রায় কোরাস সঙ্গীতকারকদের সঙ্গে বসেন এবং কাহিনীটি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন—মঞ্চে তরুণ অভিনেতারা একান্ত বাধ্যতায় নীরবে, সুনিপুণ নৃত্যে তার আঙ্গিক অভিব্যক্তি ঘটায়। আমরা রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা", "শ্যামা" প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যেও এই আঙ্গিকই দেখি—গায়করা গানের সাহায্যে কাহিনী বিবৃত করছেন, নৃত্যশিল্পী নাচের মাধ্যমে মঞ্চে অভিনয় দেখাচ্ছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় দর্শকরা অনেক সময় "দালাঙ্" (Dalang) বা গল্প-কারককেই বেশি মনোযোগ বা সম্মান দেয়। তারা পরিতৃপ্ত অন্তরে ভাল আবৃত্তির জন্য গল্পকারকের প্রশংসাই আগে করে, ভাল অভিনয়ের জন্য নৃত্য শিল্পীরা বাহবা পান পরে। জাভার ছায়া-নাটকেও তেমনি রয়েছেন এক কাহিনী-বক্তা বা "জোরুরি"। আমাদের বাংলা দেশের যাত্রায়ও

বৃদ্ধ গায়করাই "জুড়ির" কাজ করেন এবং তারাও আংশিকভাবে যাত্রাভিনয়ে কাহিনীর সহায়তা করেন।

এই কাব্য ও সঙ্গীতের প্রাবল্যের জন্যই প্রাচ্যের নাটক অনেক বেশি ভাববাদী। এর ফলে সে আধুনিক জীবনের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসেনি। প্রাচীন ঐতিহ্যের মায়াময় স্বপ্নলোকে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুনিপুণ চেষ্টায় একের পর এক তার চড়িয়ে সেই অতি প্রাচীন, অতি মধুর সুর ঝংকার বংশ বংশ ধরে সৃজন করে চলেছে। বর্তমান ইউরামেরিকার ভাবধারা, তার জ্বালাময় অস্থিরতা, দর্শকদের চিত্তে নিত্য নূতনের জন্য গোবি-সাহারার পিপাসা খাঁটি প্রাচ্য সংস্কৃতির রাজ্যে নেই। প্রাচ্য নাটক কাব্যভিত্তিক হওয়ায় আর একটা বিপদ ঘটেছে ভাষা প্রাচীন হয়ে যাওয়ার ফলে তার অর্থ দুর্বোধ হয়ে গেছে কিন্তু কাহিনী, আচরণ ও নৃত্যের এক সর্বমানবিক আবেদন আছে তাই তা এ যুগেও উপভোগ্য। নাটকের অর্থ দর্শকদের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলার এদেশে প্রধান উপায় হল "প্যান্টোমাইম্" (Pantomime) বা মূকাভিনয়ের প্রয়োগ। এ ছাড়াও প্রাচ্য নাটকে রয়েছে ভাঁড, বিদূষক প্রভৃতি লঘু হাস্যরস সৃজনকারী অভিনেতারা। তারা সাধারণ দর্শকদের কাছে নাটকের অর্থ বোধগম্য করে তোলে এবং তাদের আনন্দ বিতরণ করে কৌতূহলকে অটুট রাখে। সংস্কৃত নাটকে রাজার সখা হিসেবে বিদূষক চরিত্রের উপস্থিতি আমাদের পরিজ্ঞাত। তেমনি বলিদ্বীপেও দেখি—নাটকের অভিজাত বা রাজচরিত্রের অভিনেতার সঙ্গে একটি ভাঁড চরিত্রও প্রবেশ করে, সে প্রধান চরিত্র যা করেন তারি ব্যর্থ অনুকরণ করে; যা বলেন, তাই গ্রাম্য ভাষায় অনুবৃত্তি করে। ফলে সাধারণ জনসমাজ যেমন কৌতুক উপভোগ করে, তেমনি রাজ অভিনয়ের তাৎপর্যও সহজে বুঝতে পারে। চীনদেশেও সম্রাট বা সেনানায়কদের গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয়ের পরে একটা ছোট হাস্যরসাত্মক "ইন্টারলুড" থাকে তার ভাষাও হয় কথ্য বা গ্রাম্য। এরই সাহায্যে প্রধান গল্পকে অনুধাবন করা সহজ হয়। এই লঘুচরিত্রগুলির আবার শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুরূপ অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনও আছে। গুরুগাম্ভীর্যের মধ্যে এই লঘুচরিত্র একটি সুন্দর অবকাশ ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। তাছাড়াও নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির এবং নাটকীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা হিসেবেও তাদের স্থান অসামান্য।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নাট্যকাহিনী ধর্মীয় ও নৈতিক হওয়ায় নাট্যরূপও কাব্যিক হয়ে উঠেছে, কারণ বাস্তবানুগ কথোপকথনের প্রয়োজন বিশেষ থাকে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই নাটকের সুরু এবং এখনো জনসমাজে বিশ্বাস যে, দেব অনুগ্রহে নাট্যের জন্ম এবং অভিনয় ক্ষেত্রে স্বয়ং দেবতারা উপস্থিত থাকেন। অতএব কাহিনীর যেখানে যাই ঘটুক পরিশেষে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগত নাট্যোৎসবে আমরা কিন্তু পুণ্যের নিশ্চিত শুভ পরিণাম পাই না; যেমন তাদের "প্যাশান প্লে" বা "গুড্‌ফ্রাইডের" দৃশ্যে অথবা "দ্য রেজারেক্‌শন্" (The Resurrection) বা পুনরুত্থানের দৃশ্যাবলীতে—এ ধরনের বিয়োগান্ত ব্যথা-করুণ সুর ভারতের ধর্মীয় উৎসবে ফুটে উঠতে পারে না।

কাব্য স্বভাবতঃই ভাবানুগামী। এশিয়ার নৃত্যনাট্যগুলি সঙ্গীতের ও কাব্যের সপ্তসুর মিশ্রণে ইউরোপীয় বাস্তব সমস্যাসম্বলিত, বাস্তবানুগ গঠন ভঙ্গিমাযুক্ত নাট্যরূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় সংস্কৃত নাটকে আমরা সঙ্গীত প্রাচুর্যের উল্লেখ পাই। চীনদেশের নাটক তারের যন্ত্র এবং বাঁশি সহযোগে অভিনীত হত। এর একএকটি সঙ্গীতদলে থাকত বারোটি স্ত্রী ও বারোটি পুরুষ কণ্ঠ, ছাব্বিশটি বাঁশি, ছ'টি বড় ড্রাম ও তিনটি ছোট ড্রাম। সংস্কৃত নাটকেও "কুতপ" নামে যন্ত্রশিল্পীদের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এই সঙ্গীত দর্শকদের যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি ভাবাবেগের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করে। প্রাচ্য নাট্যে প্রবেশ, প্রস্থান, বিচ্ছেদ সবেতেই গান—মদ্যপও গাইছে, হৃদয়ের শান্তিকামীও গাইছে—এরা যেন কিন্নর লোকের অধিবাসী। গানের ভাষাতেই কথা বলছে। ক্লাসিক্‌ ও অর্ধ-ক্লাসিক্‌ যুগের এই সঙ্গীত প্রাবল্য আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত নাটকও সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি। এখনো এদেশে বিচিত্র ভাবাবেগের প্রকাশ সঙ্গীত ছাড়া হয় না। প্রাচ্য মানুষের হৃদয়ের ভাষা, মুখের কথা সকলি অর্ধসুরময়। "গেয়ে গান নাচে বাউল—গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে······"জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিই গানে গানে, সুরে সুরে—এই সুকুমার বৃত্তির সর্বব্যাপক আশ্চর্য খেলা পাশ্চাত্য মানুষের কাছে এখনো বিস্ময়ের বস্তু।

থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, জাভা, বলি এই দ্বীপাবলী ছাড়া এশিয়ার আর কোন দেশের সঙ্গীতে কোরাস, অর্কেস্ট্রা বা দ্বৈত সঙ্গীত ছিল না। এশিয়া

"হার্মনি"র (Harmony) দেশ নয় "মেলোডি"র (Melody) দেশ—বেজে চলে সমবেত সুর নয় একটি একক সুরধ্বনি। পাশ্চাত্যের অর্কেস্ট্রা বা সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের সুর-ঝংকারে—মেলোডির নিখুঁত সুর ও ছন্দের কান নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচ্যের মার্গসঙ্গীতে তাই "হার্মনির" প্রবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস নেই, আছে অতি নিপুণ কারুকর্ম অতি দক্ষকান, মেলোডির দেশ প্রাচ্য তাই ড্রাম ও তবলা জাতীয় যন্ত্রই সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহার করে নিখুঁত তাল, লয়, ছন্দ রক্ষা করার জন্য—অন্যদিকে পাশ্চাত্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন স্তরে বাঁধা বহু সংখ্যক 'তাম্বুরিণ' (Timbrels)। এশিয়া কিন্তু বর্তমান যুগে এসে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ হয়ে ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যতটা প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং উপভোগ করতে পারে পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যকে গ্রহণ করা আজো ততটা সম্ভব নয়—তার চেয়ে নৃত্য ও নাট্য তাদের কাছে অনেক সহজ গ্রহণীয়।

কাব্য ও সঙ্গীতের চেয়ে নৃত্যের আবেদন অনেক সহজ রসগ্রহণযোগ্য বলে ভারতের সর্বপ্রকার নাটকের মধ্যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল নৃত্যের সর্বব্যাপক অধিকার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও তাই নৃত্যের করণ, প্রকরণ, মুদ্রা, স্থান, চক্ষু-কর্ম, ভ্রূ-কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের এমন মিশ্রিত রূপ নেই—সেখানে নৃত্য—নৃত্য, নাট্য—নাট্য। ব্যতিক্রমের সীমারেখাও নির্দিষ্ট, যেমন নৃত্য আংশিকভাবে কাহিনী বলছে "ব্যালে"তে এবং সঙ্গীত কাহিনী বলছে "অপেরায়"। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রবল প্রভাব বশতঃই দেহকে আনন্দ সৃষ্টি ও রস সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে, নৃত্য শিল্পের উৎকর্ষ তাই তাদের জীবনের অতি ক্ষীণ অংশই অধিকার করে আছে। সেই জন্যই নৃত্য থেকে এদের নাট্য সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু ভারতবর্ষে তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সূচনা থেকেই নৃত্য ও নাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নৃত্য এ দেশে ভঙ্গির সাহায্যে কাব্যের সমুচ্চ ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে, যখন কাহিনীকার তার গল্প বলে যান—তখন এই নৃত্যকারীরাই মঞ্চ আলোকিত করে রাখেন। অভিনেতারাও মঞ্চে এসে তখন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি বা মূকাভিনয়ে কাজ চালাতে পারেন না, তাদেরও নৃত্যের তালে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এইজন্যই এশিয়ার মঞ্চ অতি স্বাভাবিক কারণেই নৃত্যশিল্পের পাদপীঠ হিসেবে গঠিত হয়েছে। মঞ্চের

বিভিন্ন সাজসজ্জা, "সেটের" বিচিত্র উপকরণ কিংবা বাস্তব দৃশ্যের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির দিকে তাদের নজর নেই। কাব্যের ও সঙ্গীতের বিচিত্র ধ্বনি-জাল এবং ভাবব্যঞ্জনাই এখানে পরিবেশ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে নৃত্যের আবর্তনে একই মঞ্চে বিভিন্ন কক্ষা পরিক্রমা দ্বারা স্থানের ব্যবধান ও দূরত্বের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই প্রাচ্য মঞ্চে সেটের ব্যবহার ছাড়াই বিভিন্ন স্থান এবং দূরত্ব একই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছে এবং এই ভাবেই রক্ষিত হয়েছে স্থানের ঐক্য।

নৃত্যশিল্পীরা রাজসভায় সমাদরের সঙ্গে আহূত হতেন। তারা নৃত্যপ্রদর্শন করতে রাজসভার মঞ্চে উঠতেন এবং চিন্তাকুল রাজহৃদয়ের বিনোদন করতেন। ক্রমশঃ এই নৃত্যের সঙ্গেই কাহিনী ও অভিনয় যুক্ত হতে লাগল, মঞ্চে বিবাহানুষ্ঠান মানেই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান, একজন যুদ্ধনায়ক বীর যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে নেচে নিতেন, যখন তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হতেন তখনও নাচতেন। নায়ক-নায়িকা মিলনের প্রগল্ভ আনন্দেও উদ্বেল হয়ে নাচতেন, দেবতারা তাদের ঐশীশক্তি দেখাতে নাচতেন এবং নাট্যকাহিনী শেষ হয়ে গেলেও কোন একটি দেবতা বা মানব চরিত্র শুধুমাত্র আনন্দ বিতরণের জন্যই নৃত্য করতেন। পাশ্চাত্য মানুষের কাছে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে এরকম ধারাবাহিক নৃত্যপ্রদর্শন অকল্পনীয়।

নাটকে যেখানে অঙ্ক পরিবর্তন, এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে আবর্তন ঘটে প্রাচ্যে এ সব ক্ষেত্রে মঞ্চপটের বা সেটের পরিবর্তন ছাড়াই অতিসহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। তা হল নাট্যকাহিনীর দু'টি অংশের মাঝখানে একটি আলাদা নৃত্যানুষ্ঠানের সমাবেশ করা। নাটকের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এশিয়ার এই নৃত্যশিল্প মানে কিন্তু ইউরোপের উদ্দেশ্যহীন বিশেষ ছন্দে ও তালে ঘুরপাক খাওয়া "বল্-ডান্স" বা শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনকারী নৃত্য মাত্র নয়। এশিয়ার নৃত্য অনেক বেশি ছন্দোময়, ভাবব্যঞ্জক, অতিশয় নাট্যগুণ সম্পন্ন—একে একমাত্র ইউরোপের ব্যালে অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তুলনা করা চলে—যেখানে নৃত্য গভীর উপলব্ধির ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছয় ভাবময় অন্তর্লোকের সিংহদ্বার খুলে দেয়, একটি কাহিনী সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শতশতাব্দী ধরে এশিয়ার নাট্যজগতে যে বিবর্তন ও প্রগতি চলেছে, তাতে দেখা যায় নাটককে পেছনে রেখে নৃত্যই জনপ্রিয় ও সমুন্নত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥

পৃথিবীর সর্বদেশের আদিম সভ্যতার মতই ব্রহ্মদেশেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস থেকেই নৃত্য-গীতের সূচনা হয়েছিল। ব্রহ্মে সাংস্কৃতিক ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে ভারতীয় ও চৈনিক এই দুই ধারার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। খ্রী: পূ: ৮০০ অব্দেই ব্রহ্মে এই দুই সভ্যতার মিলন সুরু হয়। ব্রহ্মে কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি জাভা, ইন্দোচীন ইত্যাদির মত প্রত্যক্ষভাবে প্রচার লাভ করেনি। কারণ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে যখন হিন্দু রাজারা এই দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করতে যান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করে তোলেন, হিন্দু মহাকাব্য এবং সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের তখনি বহুল প্রচার ঘটে কিন্তু উর্ধ্ব অংশে ব্রহ্মদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকায় তারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যায়নি। সেই জন্যই পূর্ব সীমান্তে একমাত্র ব্রহ্মেই ভারতীয় মহাকাব্য উদ্ভূত যুদ্ধ নৃত্য নেই। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ব্রহ্মদেশে প্রথমেই ঘটেছিল এবং বৌদ্ধধর্মের মূলকেন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে গেলেও ব্রহ্মদেশে তা আগাগোড়াই টিকে ছিল। এই জন্যই হিন্দুসংস্কৃতির পূর্ণ বিস্তার সেখানে সম্ভবপর হয়নি।

ব্রহ্মের নাটকের ইতিহাসকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। ১। প্রথম "নিভাৎখিন্" (Nibhatkhin) যুগ, এর সঙ্গে তুলনা করা যায় ইংরেজী সাহিত্যের 'মিরাকল্' নাটকের। এই যুগের শেষ হয় প্রায় ১৭৫২ খ্রী:। ২। দ্বিতীয় অধ্যায় খ্রী: ১৭৫২-১৮১৯—এ হল "ইন্টারলুডের" (Interlude) যুগ, এ ছাড়া তখন রাজসভার নাটক (Court drama) ও গড়ে ওঠে। ৩। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮১৯-১৮৫৩ খ্রী: আমরা নাট্যকার "উ-কীন-উ" কে (U kyin U) পাই। ৪। চতুর্থ ভাগে ১৮৫৩-১৮৭৮ খ্রী: আমরা পাই কবি "উ-পোন-নিয়া" কে (U-Pon Nya)। ৫। পঞ্চম অধ্যায় হল ১৮৭৮-১৮৮৬ খ্রী:, একে বলা হয় "অবক্ষয়ের যুগ" (Decadence) ৬। ষষ্ঠ অধ্যায় হল ১৮৮৬ খ্রী: থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত "আধুনিক যুগ"।

ব্রহ্মদেশের নাটকের মূল উৎসকে দুই ধারায় ভাগ করা যায়। প্রথম ধারা হল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, দ্বিতীয় ধারা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত উৎসব সমগ্রদেশ জুড়েই হত। এই সমস্ত উৎসবের আবার দু'টো রূপ ছিল—১। এক হল অনুকরণ (Mimicry),

২। দুই হল ভাঁড়ামী (Foolery)। অনুকরণ অভিনয়ে গ্রাম্যলোকেরা নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে রাস্তায় নেচে বেড়াত। এই মুখোশগুলি হত ঘোড়া ও সিংহমুখ মিশ্রিত কিংবদন্তীর জলদানবমূর্তি (Unicorn)। সম্ভবতঃ মানুষের এই জন্তুর মূকাভিনয় থেকেই এসেছে জন্তু-জানোয়ারের পুতুল খেলা। ব্রহ্মের পুতুল খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মঞ্চে বিভিন্ন জন্তুর মুখোশ পরা পুতুল এসে এক একটি নাচ দেখিয়ে যেত। গ্রাম্য লোকের আর একটি উৎসবের ধারা ছিল কৌতুকময়। অপরের বাড়ি থেকে হাস্য উদ্রেককারী সামগ্রী চুরি করা, প্রতিবেশীর মাথায় জল ঢালা, মুখে কালি মেখে বাঁদর সাজিয়ে বাঁদর নাচ নাচা ইত্যাদি।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রহ্মের নিজস্ব ধর্ম ছিল সর্বপ্রাণবাদী (Animistic), তারা নানা রকম জড়শক্তি এবং আত্মার পূজা করত—এই শক্তিগুলিকে বলা হত "নাটস্" (Nats), এদের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম ছিল মেয়েরা, তারা আত্মাকে তুষ্ট করতে নাচত এবং আত্মা তাদের উপর ভর করেছে বলে মনে করা হত। ভর করা শক্তিরই ভূমিকা সে তখন গ্রহণ করত, এই সময়ে মেয়েটিকে উপযুক্ত পোষাক পরানো হত এবং সে যে নাচ নাচত মূলতঃ তা কিন্তু অভিনয়ই ছিল। ব্রহ্মদেশের ধর্মমন্দির "প্যাগোডার" উদ্ভব এই পুরাতন নাটদের পূজার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করল জনসাধারণ তাদের গ্রামীণ আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে এই ধর্মকে জড়িয়ে ফেলল। গ্রাম্য কৃষকরা তাদের উৎসবকালে বুদ্ধের জীবন এবং তাঁর জন্মকাহিনী নিয়ে দৃশ্য রচনা করতে সুরু করল।

কৃষকরা চাকাওয়ালা গ্রাম্য-গাড়িতে করে শোভাযাত্রার সঙ্গে নাট্যদৃশ্য রচনা করে বের হত। প্রথম দিকে বিভিন্ন গল্প অনুসারে কয়েকটা গাড়িতে দৃশ্য রচনা করা হত, পরে দৃশ্যের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং একই কাহিনী অবলম্বন করে একাধিক দৃশ্য রচিত হয়ে গল্প দেখানো হতে লাগল। পোষাকগুলি অত্যন্ত জাঁকজমকময় হত, দৃশ্যগুলিও অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। ক্রমে একই গ্রাম দুই বা তিন দলে ভাগ হয়ে এই শোভাযাত্রা বের করতে সুরু করল। তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা দিত, কখন কখন দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হত।

ব্রহ্মদেশের এই নিভাংখিন অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা মধ্যযুগের ইংরেজী

'মিস্ট্রি' এবং 'মিরাক্‌ল্' নাট্যাভিনয়ের তুলনা করতে পারি। এই গাড়িগুলি বাজারে অথবা গ্রাম-প্রধানদের বাড়ির সম্মুখে থামত এবং প্যাগোডায় এসে শোভাযাত্রা শেষ হত। শোভাযাত্রা যখন চলত অভিনেতারা পুতুলের মত স্থির হয়ে তাদের চলমান মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকত—আবার গাড়ি দাঁড়ালেই তারা অভিনয় সুরু করে দিত, এর জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর এবং কোথাও কোথাও তার প্রচলন এখনো রয়েছে।

ক্রমশঃ এই ধর্মীয় "নিভাৎখিন" নাটকের মধ্যেও ব্রহ্মের নিজস্ব হাস্য-পরিহাস মিশ্রিত হল—প্রধান নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গী হিসেবে এক একটি বিদূষক বা ক্লাউনের বহিঃচরিত্র এসে যুক্ত হল। জনসাধারণ একে এতই পছন্দ করত যে পরবর্তীকালের নাট্যকারদের উন্নতধরনের সৃষ্টিতেও এই বিদূষকের ভূমিকা বাদ যেত না। মূল নাটকের মধ্যে কিন্তু তার চরিত্র থাকত না, মঞ্চে এসে সে নিজেই নিজের ভূমিকা ঠিক করে নিত। নাটকের গতির সঙ্গে মিল রেখে সে তার কথোপকথন এবং পরিহাস চালিয়ে যেত।

নিভাৎখিন শোভাযাত্রায় মূল নাটকে বিদূষকের অংশ না থাকলেও সে ক্লাউনের মত সকলকেই সমালোচনা এবং পরিহাস করবার সুযোগ পেত। ক্রমশঃ নিভাৎখিনের সমস্ত চরিত্রই প্রহসন বা বার্লেস্ক্‌ ধরনের হয়ে উঠতে লাগল। এখানে আর ধর্মীয় চরিত্রের গাম্ভীর্য এবং মাহাত্ম্য রইল না, সকলি হয়ে উঠল গ্রাম্য "ফার্স"। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "বোধি" লাভের পরে আর বুদ্ধ চরিত্র মঞ্চে দেখানো হত না। কারণ "অর্হৎ" বা সন্তের চরিত্র মঞ্চে আনা প্রথানুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল, অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খুব উঁচুদরের অভিনেতারা সারাদিন সংযম ও উপবাসের পর স্বল্পকালের জন্য বুদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন। নইলে বুদ্ধের 'বোধি' লাভের পূর্ববর্তী জীবনই দেখানো হত এবং সেখানে পরিহাস-বিদ্রূপের কোন বাধাই ছিল না। "নাটদের" আত্মায় ভর করা নাচিয়েরা স্বভাবতঃই সমাজ থেকে বিচ্যুত থাকত; তারা মদ খেয়ে মাতাল হত এবং অশরীরী আত্মার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হত সুতরাং সাধারণ লোক তাদের ভয়ের চোখে দেখত। পরবর্তীকালে এরাই নাচ গানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করল, তাদের কাজই হল আনন্দ বিতরণ, তারা শীঘ্রই ইন্‌টারলুড অভিনেতার সমগোত্রীয় হয়ে উঠল।

সাধারণ লোক কেবল নাচগানে তুষ্ট থাকত না, অতএব এই নাচের মাঝে একটা একাঙ্ক নাটক ধরনের কিছু কথোপকথনের অংশ থাকত। এতে পুরুষরা পুরুষ চরিত্রে এবং নারীরা নারী চরিত্রে অভিনয় করত। এই ইন্‌টারলুডগুলির দৃশ্য সবসময়ই হত অরণ্য। তাতে মঞ্চসজ্জার কতকগুলি সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ এতে বেশিকিছু মঞ্চোপকরণ এবং দৃশ্যাবলীর দরকার হত না। গাছের একটি শাখাই এটা যে অরণ্য-দৃশ্য তা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়তঃ নাটকের স্থান অরণ্য হওয়ায় নাট্যগঠনের একটা মস্তবড় সুবিধা ছিল—নাট্যকার সেখানে অতি সহজে যত অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত চরিত্র আনয়ন করতে পারতেন। পরী, দৈত্য, দেবতা, রাজপুত্র ও যে কোন সাধারণ লোকেরই একই স্থানে সাক্ষাৎ হতে পারত। তাছাড়া নানারকম অ্যাডভেঞ্চার ঘটতেও সেখানে বাধা ছিল না। এপথেই ব্রহ্মদেশের ইন্‌টারলুড বিকাশ লাভ করে। ব্রহ্মদেশের নাটক প্রধানতঃই ছিল নাচগান বহুল। যদিও দর্শকরা চাইত নাটকের পাত্রপাত্রীরা উঁচুসমাজের রাজা বা রাজপুত্র হোক—তাই নাটকে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীরা থাকলেও রাজপ্রাসাদের দৃশ্য থাকত না। বনানীই ছিল প্রধান, এছাড়া গ্রাম বা নগর দৃশ্যও দেখানো হত।

ব্রহ্মে ক্ষমতাশালী এবং বিদ্যোৎসাহী রাজশক্তি দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল। ১৭৮৩ খ্রীঃ রাজসভায় এক তরুণ পণ্ডিত ও উদীয়মান কবির দেখা মিলল যিনি এই গৌরবময় যুগের খাঁটি প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মন্ত্রী "মিয়াওয়াদ্দি" (Myawaddi) নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য গভীর থাকলেও তাঁর কাব্য ছিল সাবলীল, প্রাণবন্ত এবং সহজ ভাষায় রচিত; তাতে পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য এবং রাজসভার কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি প্রথমে শ্যামদেশের রাম চরিত্রের অনুসরণে লেখেন কিন্তু পরে ব্রহ্মদেশের রাজসভার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক রচনা করেন। তাঁর রামায়ণের কাহিনীতে রাম আদর্শ নায়ক, রাবণ অহংকারী, সীতা প্রাণহীন ক্রীড়নক কিন্তু পরবর্তী নাটক "ঈনাং" (Eenanng) এর নায়ক ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নারী চরিত্রগুলিও ছিল জীবন্ত। এখানে রাজ পরিবারের মেয়েদের দুঃখ বেদনার ইতিহাস সহানুভূতিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। "রামায়ণ" এবং "ঈনাং" দু'খানিই বিশালাকার গ্রন্থ। এ বই লেখা হয়েছিল রাজসভায় কাব্য হিসেবে পাঠের জন্যই; তারি সঙ্গে তার কিছু কিছু অংশ

অভিনয় করে দেখানো হত। এর পাঠ এবং অভিনয়ে দু'তিন দিন লেগে যেত কিন্তু রাজসভার কোন তাড়া ছিল না, তারা বেশ ধীরেসুস্থে রয়ে-সয়েই তা উপভোগ করত।

এ কথা বলা যায় যে মিয়াওয়াদ্দিই মৌলিক কাহিনী নিয়ে রচনাকারী প্রথম নাট্যকার, তিনিই আগামী কালের "উ-কীন-উ" এবং "উ-পোন-নিয়া"র মত নাট্যকারদের পথিকৃৎ। সমসাময়িক কালেও মিয়াওয়াদ্দির অনুসরণকারী কম ছিলেন না, তার মধ্যে মহিলা কবিও ছিলেন।

"আলাউনংপায়া" রাজবংশের চতুর্থ রাজা "বোদাওপায়ার" সময় দেশে নাটকের কদর এতই বেড়ে গিয়েছিল যে রঙ্গমঞ্চের জন্য নূতন মন্ত্রীপদ সৃষ্টি করতে হল। এই মন্ত্রীর অধীনে ব্রহ্মদেশের পুতুলখেলার বহুল প্রচলন এবং উন্নয়ন হয়েছিল। বিভিন্ন রাজকর্মচারীরা রাজসভার অনুকরণ করতে আরম্ভ করায় সমগ্র দেশময় রাজসভার নাটক ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমশঃ শিক্ষিত পেশাদারী অভিনেতাদের ভ্রাম্যমাণ দল তৈরী হতে লাগল। রাজসভা অভিনেতাদের ঘৃণার চোখে দেখলেও মাঝে মাঝে পুরস্কৃত করত।

রাজসভার বাইরে জনসাধারণের প্রথম নাট্যকার ছিলেন "উ-তোয়ে" (U-Toe), তাঁর রচিত রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব রাজসভাতেও পড়েছিল। তিনি কাহিনীকে মহাকাব্যের দৃষ্টিতে দেখেননি, দেখেছেন রোমান্সের দৃষ্টিতে, তাঁর নাটকের চরিত্র জাগতিক সুখ-দুঃখাধীন মানুষ। সমগ্র দেশ রামায়ণের এই কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়ল।

নিভাৎখিন নাটক, ব্রহ্মের ইন্টারলুড বা বিষ্কম্ভক এবং রাজসভার নাটক এই তিনের সংমিশ্রণেই ব্রহ্মদেশের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ এই জাতীয় নাট্যধারার বাস্তবমুখিনতাই রাজদরবারের কৃত্রিমতাকে সরিয়ে সর্বব্যাপক হয়ে উঠল।

ব্রহ্মদেশের নাট্যাভিনয় দু'টি মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করেছিল—

১। জীবন্ত অভিনেতাদের দ্বারা ২। পুতুলের দ্বারা।

ব্রহ্মে অবক্ষয়ের যুগে অর্থাৎ ইউরোপীয় ধারার আগমনের পূর্বপর্যন্তও অভিনেতাদের কাছে উঁচু মঞ্চ ছিল অপরিজ্ঞাত। ব্রহ্মদেশের রঙ্গমঞ্চ হত একটা খোলা জায়গায়, অনেকটা আমাদের যাত্রার মত। অর্কেস্ট্রা বৃত্তের মধ্যখানে হত অভিনয় স্থান, এর চারদিকে বসত দর্শকবৃন্দ। জমির উপর মাদুর পাতা থাকত, দর্শকরা তাদের প্রয়োজন মত তাতে বসত বা

দাঁড়াত। কদাচিৎ দেখা যেত যে নীচু বাঁশের বেড়া দিয়ে নাট্যাভিনয়ের নির্দিষ্ট স্থানকে ঘিরে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের গৃহে যে অভিনয় হত তার ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। সেখানে একটি নির্দিষ্ট স্থান সাধারণ জমির চাইতে দু'তিন ফুট উঁচু করে রাখা হত এবং সেখানে বসে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অভিনয় দেখতেন। তাদের সম্মুখে চলত অভিনয়, অভিনেতাদের পেছনে থাকত অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতকারীরা এবং তার পেছনে বসত সাধারণ দর্শক। অভিনয় স্থানে কোন যবনিকা ছিল না, অভিনেতাদের কোন অপেক্ষাগৃহ (Green Room) বা সাজঘর ছিল না। তারা তৈরী হয়ে এসে অর্কেস্ট্রার মধ্যে বসে তাদের অভিনয় কালের জন্য অপেক্ষা করত, তখন তারা দর্শকদের একেবারে খোলাখুলি চোখের দৃষ্টিতে পড়ত।

মঞ্চের দৃশ্যাবলীর মধ্যে থাকত অরণ্য বোঝানোর জন্য ইঙ্গিত স্বরূপ একটি গাছের ডাল। আর মঞ্চে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে থাকত একটি বাক্স যা সিংহাসনের কাজ করত। মঞ্চের দৃশ্যাবলী ও সাজসজ্জার অভাব পূরণ করত দর্শকদের সুদূর প্রসারী কল্পনা। নাটকের কাব্যিক ভাষা এবং সমবেত সঙ্গীত দর্শকদের কল্পনা প্রসারে সাহায্য করত।

এই অভিনয়ে অর্কেস্ট্রার যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দু'টো দৃশ্যের অন্তবর্তী সময়ে যন্ত্রশিল্পীরা দ্বিতীয় দৃশ্যের জন্য সুর-জাল বিস্তার করে পরিবেশ রচনা করতেন। বিভিন্ন দৃশ্যের ভাব পরিজ্ঞাপক বিভিন্ন সুর ছিল, যেমন সিংহাসন আরোহণের জন্য রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য, যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য অথবা বনভূমির দৃশ্য—এদের প্রত্যেকের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সুর ছিল এবং দর্শকরাও মুহূর্তে তাদের চিনে নিতে পারত।

কখন কখন মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত দৃশ্যের মাঝখানেও বেজে উঠত, এগুলি বাজত তখনি যখন কোন উত্তেজনাত্মক ক্রিয়াকৌশল মঞ্চের উপর দেখানো হত, যেমন নায়কের প্রাসাদ দেয়াল বেয়ে ওঠা বা সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া ইত্যাদি।

অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদে জাঁকজমক খুব বেশি থাকত না কিন্তু তা চিত্রগুণ সম্পন্ন হত। তাদের পোষাকগুলি রাজসভার চরিত্র অনুযায়ী হত কিন্তু তা মূল্যবান সিল্ক হত না বা সোনা, হীরা, মণিমুক্তা কোনটাই খাঁটি হত না—যা থাকত সকলি ঝুঁটামাল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—দৈত্যদানব বা পশুপাখীর ভূমিকায় মুখোশ ব্যবহৃত হত, অন্যত্র নয়। কখন কোন

রাক্ষসী বা দানবী হয়তো মানবীর রূপ ধরত তখন সে মুখোশটা কপালের উপর তুলে দিয়ে স্বাভাবিক মুখে মানবীর অভিনয় করত। যদি কোন সৈন্যের হাতি বা ঘোড়ার পীঠে মঞ্চে প্রবেশ দেখাতে হত তখন একজন অভিনেতা একটা হাতি বা ঘোড়ার মুখোশ পরে তারি অনুকৃত রূপ ধরে আসত।

যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেবতা সাজত তারা প্রথানুযায়ী খুব উজ্জ্বল পোষাক পরত। মনুষ্যচরিত্রের পোষাকগুলির নকশা রাজসভার পোষাক থেকে নেওয়া হত। দেবতা এবং দৈবিক ও আত্মিক চরিত্রগুলির অত্যুজ্জ্বল পোষাকের নকশা প্যাগোডার পূজা বেদীতে প্রায় একাদশ শতকে রক্ষিত বহু প্রাচীনকালের দেবদেবীর পোষাকের অনুকরণে করা হত।

এক একটা নাটকের দলের মধ্যে থাকত চরিত্র অভিনেতৃগণ এবং অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতকারীর দল। মেয়েরা এই দলে সহজেই অভিনেত্রী হিসেবে যোগদান করতে পারত, কিন্তু অর্কেস্ট্রার সমবেত সঙ্গীতকারীদের মধ্যে তাদের স্থান ছিল না—আইনগত বাধা না থাকলেও প্রথাগত ভাবে তারা সেখানে বসতে পারত না। এই সঙ্গীতশিল্পীদের যিনি প্রধান পরিচালক হতেন তিনিই হতেন দলেরও নেতা। পূর্বে আমরা প্রাচ্যদেশে সঙ্গীতের যে সর্বব্যাপী প্রাধান্য দেখেছি তাতে অর্কেস্ট্রার প্রধানই সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানের পরিচালক হবেন এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তিনিই হতেন দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। দলের সমগ্র দায়িত্ব এবং আর্থিক বণ্টনের ভার তার উপরেই থাকত। সাধারণতঃ দল যখন গ্রামে বা নগরে অভিনয় দেখাতো তখন জনসাধারণের টিকিটের বা চাঁদার টাকায়ই তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা চলত। এই সমস্ত দল সাধারণতঃ পারিবারিক ভিত্তিতেই গড়ে উঠত। শিশুরা বয়স্কদের কাছ থেকে দীর্ঘকাল শিক্ষা পেত এবং পরিবারের জ্যেষ্ঠজনকে দলের নেতা হিসেবে মেনে চলত। তাদের দারিদ্র্য ছিল, সামাজিক অসম্মান ছিল তবুও তাদের প্রাণের দোসর হয়েছিল শিল্প।

অভিনেতাদের মঞ্চ সম্পর্কে কতকগুলি প্রচলিত প্রথা মেনে চলতে হত। কতকগুলি প্রথা অভিনয়কারীরা নিজেদের সুবিধার্থে গ্রহণ করেছিল, আবার কতকগুলি প্রথা তারা দর্শকদের রুচি অনুযায়ী পালন করত।

অভিনেতারা কোন সময়ই ভুলত না যে তারা আত্মা বা ভূতাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করছে, তাই তারা প্রথমেই মাথায় লাল কাপড় বেঁধে তাদের ৩৭ জন

'নাটস্' বা অধিদেবতাকে খাদ্য ও অন্যান্য উপহার নৃত্যগীতের দ্বারা উৎসর্গ করত।

তা ছাড়া বুদ্ধ চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কেও তাদের বহু বাধা নিষেধ ছিল। বোধি লাভের পর বুদ্ধ সম্পর্কে সামান্যতম পরিহাসও সম্ভব ছিল না কিন্তু অন্যান্য সাধুসন্ত সম্পর্কে এবং ধর্ম সম্পর্কে যথেচ্ছ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ চলতে পারত। অভিনেতারা রাজকীয় পোষাক পরলেও রাজার অনুরূপ স্বর্ণ পাদুকা মঞ্চে ব্যবহার করতে পারত না—তাতে কেবল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজকুমারদেরই অধিকার ছিল—এখনও ব্রহ্মদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথা অটুট রয়েছে। এই সমস্ত প্রথা ভঙ্গ করলে দৈব রোষের সম্ভাবনা তো ছিলই, তার উপরে জনসাধারণের কাছে ইঁট পাটকেল খাওয়া বা হাজতবাসেরও সম্ভাবনা ছিল।

অবক্ষয়ের যুগে এসে মঞ্চ উচ্চ প্লাটফর্মের উপরে স্থাপিত হল, বিস্তৃত দৃশ্যসজ্জা এবং যবনিকারও প্রচলন হল। এগুলি এসেছিল ফরাসী এবং ইংরেজদের অনুকরণে। "মিনডোনদের" (Mindon—১৮৫৩-৭৮) রাজত্বের শেষদিকে বহু ফরাসী পরিব্রাজকদল সুদূর প্রাচ্য পরিভ্রমণ করে বেড়ায়, তখন তারা ব্রহ্মের রাজসভায় ইউরোপীয় রীতির নাটক দেখায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কতকগুলি ইংরেজ অভিনয়কারীর দল রেংগুনে এসে অভিনয় করে। এই সব অভিনয়ের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, রাজা এবং রাজসভার লোকেরাই তা দেখতেন। ফরাসী ভাষা না জানা থাকায় ফরাসীদের অভিনয় তাদের কাছে বিরক্তিকরই হয়ে উঠত।

রেংগুনে ইংরেজ অভিনেতারা যদিও তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতমূলক কমেডির অভিনয়ই চালাত, তবুও এটা ছিল ইউরোপীয়করণের যুগ—তাই ব্রহ্মের অভিনেতা-সমাজ ইউরোপীয় মঞ্চসজ্জার ধারা অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। রেংগুনে এই সময়ে স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হল যা ব্রহ্মের ইতিহাসে নূতন। এখানে ইউরোপীয় প্রথায় টিকিট কেটে ঢুকতে হত। অর্কেস্ট্রার পরিচালকের স্থানে এবার প্রধান অভিনেতাই দলের প্রধান হয়ে উঠলেন। পূর্বে অভিনয় হত সন্ধ্যাবেলা বা অপরাহ্নে, এখন সারারাত ধরেই অভিনয় চলতে লাগল।

যদিও অভিনেতা অভিনেত্রীরদল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তবুও জনসাধারণের

কাছে তারা ভিখারীর চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করত না। কিন্তু প্রায় বিংশ শতাব্দীতে এসে অভিনেতা "পো-সেইন্" (Po. Sein) দু'পাশে দুই রাইফেলধারী সৈন্য নিয়ে অভিনয়ে নামলেন এবং জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও সম্মান উদ্রেক করলেন। জীবিকার এই পথের প্রতি মানুষের যে কুৎসা ও বিরূপতা তা ধুয়ে মুছে গেল। পো-সেইনের দয়া, দাক্ষিণ্য, নিষ্কলংক চরিত্র অভিনেতাদের প্রতি দুর্নীতি ও ধর্মহীনতার অভিযোগ দূর করল। প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি "রেড-ক্রস" তহবিলে প্রচুর অর্থও দান করলেন। তাঁর কর্ম ও চরিত্র নিষ্ঠার ফলে সরকারী খেতাব এল—যা ব্রহ্মের অভিনেতাদের ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। আর এ কথাও মানুষ জানল যে, পথ মানুষকে নষ্ট করে না, মানুষই পথকে নষ্ট করে। আশ্রম-নিবাসী সাধুও লম্পট হতে পারে, আবার জোলার ছেলেও হতে পারেন সন্ত কবীর।

॥ ব্রহ্মের পুতুল নাচ ॥

ব্রহ্মের "পুতুল নাচের" (The Burmese Puppet Show) আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচ্যের নাট্য-প্রচেষ্টার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকের কথা প্রথমেই স্মরণ করতে হয় তা হল প্রাচ্যদেশে পুতুল নাচ ও ছায়া নাটকের প্রাধান্য। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন ভারতবর্ষ থেকেই এই ধারা সুদূর প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে প্রাচ্য নাট্যাভিনয়ে একমাত্র সংস্কৃত নাটক ছাড়া আর সর্বত্রই একজন কাহিনীকার এবং সঙ্গীত-শিল্পীরা প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন। কাহিনীর অগ্রগতির দায়িত্ব যেখানে অভিনয়কারী চরিত্রদের নেই, যেখানে তারা মূলতঃ কাহিনীকারের নির্দেশ দেহভঙ্গির সাহায্যে পালন করে, সেখানে তারা পুতুলেরই নামান্তর মাত্র। আবার সেই চরিত্রগুলি যখন জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরিধান করে অভিনয়ে নামে, তখন তারা আরোই পুতুলের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে। প্রাচ্য-দেশের শিল্প ও নাট্যাভিনয়ে ইঙ্গিতধর্মিতাও তাদের মনুষ্যরূপ পরিত্যাগে উৎসাহিত করেছে। তাই ব্রহ্মে আমরা পুতুল নাচ পেয়েছি, জাপানেও দেখেছি মহান শিল্প হিসেবে পুতুল নাচের প্রাধান্য, আবার জাভায় পেয়েছি "ছায়া-নৃত্য"—তাও পুতুল নাচেরই নামান্তর মাত্র। পর্দার যেদিকে ছায়া

পড়ে সেদিকে ছায়া নাটক আর যেদিকে বসে দালাঙ্‌ অভিনয় করেন সেদিকে তা পুতুল নাচই।

ব্রহ্মদেশে নাটকের উদ্ভব হওয়ার পূর্ব থেকেই পুতুল নাচের প্রচলন ছিল। কিন্তু তার ঠিক ঐতিহাসিক ধারা গড়ে ওঠে "বোদাওপায়ার" (Bodawpaya —১৭৮২-১৮০৯ খ্রীঃ) রাজত্বকালে, যখন জাতীয় নাটকের উন্নয়নের জন্য একজন মন্ত্রীপদের সৃষ্টি হয়। এই নোতুন মন্ত্রী জনপ্রিয় পুতুল নাচকে সম্পূর্ণই সরকারী আয়ত্তাধীনে আনবার চেষ্টা করলেন। ব্রহ্মের পুতুল নাচের অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর সাজে সজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন পুতুল এসে আলাদা আলাদাভাবে অর্‌কেষ্ট্রার সুরে এক একটা নাচ দেখিয়ে যেত, তারপরে আসত "জাওগী" বা যোগী; সে ভারতীয় যোগসাধনা থেকে বিবর্তিত এক রসায়নবিদ্‌ চরিত্র—সে এসেও নাচ দেখাত এবং সর্বশেষে রাজপুত্র ও রাজকন্যারা এসে নাচ, গান ও প্রেমাভিনয় করত।

পুতুলগুলো আকারে ২½' ফুট থেকে ৩' ফুট পর্যন্ত উঁচু হত, মঞ্চে তাদের সুতো নেড়ে নাচান হত। পুতুল নাচের মঞ্চটা হত বেশ উঁচু, তার গভীরতা হত কম; এবং পেছন দিকে থাকত একটা কালো পর্দা। এই কালো যবনিকাটির পেছনে থাকত পুতুল-নাচিয়ে, সে সেখান থেকে সুতো নেড়ে পুতুলদের নাচ দেখাত। পর্দার উপর দিকে লোকটির হাত দেখা যেত কিন্তু মঞ্চের উচ্চতা প্রায় ৪' ফুট হওয়ায় দর্শকদের দৃষ্টি পুতুলগুলিকে ছাড়িয়ে হাতটাকে স্পষ্ট দেখতে পেত না। মঞ্চটা প্রায় ২০' ফুট লম্বা হত পুতুলরা মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক বেশ চলাফেরা করতে পারত। পর্দার সম্মুখে এই মঞ্চের গভীরতা হত মাত্র ৪' ফুট।

নোতুন মন্ত্রী পুতুলনাচকে সম্পূর্ণ ই সরকারী আয়ত্তে নিয়ে এলেন। ফলে পুতুল নাচ সাধারণ নাট্যাভিনয়েরই সমতুল্য হয়ে দাঁড়াল। কেবল রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হল মানুষের পরিবর্তে পুতুল। তারা পুরোপুরিই নাট্যাভিনয় করে দেখাত। অতএব নোতুন যুগে পুতুল নাচের মধ্যে দু'টি ধারার সৃষ্টি হল, একটি পুরানো ধারা অনুযায়ী জন্তুরা এসে একটি করে নাচ দেখিয়ে যেত এবং দ্বিতীয়টি হত নবযুগের সৃষ্ট পুতুল-নাটক। মূলতঃ এটাও নূতন কিছু ছিল না, রাজকুমার, রাজকুমারীর কাহিনীই আর একটু বিস্তৃতভাবে দেখানো হত। ভারতবর্ষ, জাভা, বলি, শ্যাম, তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি দেশে যেমন পুতুলের নিজস্ব নাটক আছে এবং কাহিনীর ধারা রয়েছে ব্রহ্মে তা নয়। সেখানে

পুতুল নাচের নিজস্ব কোন নাট্যপ্রবাহ ছিল না, তাকে সম্পূর্ণই মনুষ্য অভিনীত নাট্যপন্থা অনুসরণ করতে হত। নাট্যাভিনয়ের মন্ত্রী পুতুলনাচের উপরে দু'টি সর্ত আরোপ করলেন, এক হল পুতুলনাচের কাহিনী জাতক বা জাতীয় কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত হবে, আর দ্বিতীয়তঃ পুতুল খেলার মঞ্চে যে সমস্ত রাজা এবং রাজসভার দৃশ্য দেখানো হবে তা অতি নিখুঁত বাস্তবানুগ হতে হবে।

পুতুল খেলার এই প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর নূতন পুতুলখেলা দেখানেওয়ালাও সৃষ্টি হল। তারা অভিনয়জীবীদের মধ্য থেকে এলেও তাদের কিছু দিনের জন্য এই নোতুন বিদ্যার আঙ্গিক সম্পর্কে শিক্ষানবিশী করতে হত, এই সব পুতুল খেলানেওয়ালারা কিন্তু অভিনেতাদের চাইতে অনেক বেশি সম্মানিত হতেন। এরা প্রথা সম্পর্কে অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। মন্ত্রীর মৃত্যুর পর এদের উপর থেকে সরকারী প্রভাব সরে গেলেও সরকারী নির্ধারিত প্রথা এরা কিছুই ত্যাগ করলেন না।

অবক্ষয়ের পরে আবার দেশ জুড়ে যখন নব উদ্দীপনা দেখা গেল, তখন পুতুল খেলা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু যারা খেলা দেখাতেন তাদের অত্যধিক নিয়মনিষ্ঠা এবং গোঁড়ামীই বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, তারা নূতন কোন পরিবর্তন গ্রহণ করতে চাইলেন না, এমন কি তাদের গোঁড়ামীর ফলে পুরাতন শিল্পীদের জায়গায় নূতন কোন শিল্পীও এল না—কারণ অত বাঁধাধরা পথে শিক্ষানবিশী করা তাদের রুচির মোটেই অনুকূল ছিল না। এবং নবীন প্রাণের স্পর্শ না পেয়ে পুতুল নাচ ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলল।

পুতুল নাচ এবং ছায়ানাটকের প্রকৃত জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের যুগে মহাকাব্য এবং সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পুতুল নাচ এবং ছায়া নাটকও ছড়িয়ে পড়েছিল। জাভায় এসে এটা একটা স্থায়ী আসন অধিকার করে বসল এবং তা আজো জনপ্রিয়তার সমুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে, জাভা থেকে এই ছায়া নাটক ছড়িয়ে পড়ে শ্যাম, ইন্দোচীন ও জাপানে, অন্যদিকে ভারতবর্ষ থেকেই ছড়ায় নিকটপ্রাচ্যের—পারস্য, তুরস্ক এবং আরবে—এমন কি ইউরোপ পর্যন্ত। ব্রহ্মে এই নাটকের ধারা ইন্দোচীন ঘুরে গিয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ থেকে যায়নি।

॥ শ্যামদেশ ॥

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এক এক দেশে তা এক এক রকম রূপ ধারণ করে—প্রকাশ পায়। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে হিন্দুসভ্যতা নিবিড়ভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল। শ্যামেও এই প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। শ্যামে এরপরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রবল হয়ে ওঠে। রাজসভা ধর্মের দিক দিয়ে বৌদ্ধ হলেও হিন্দুসভ্যতার প্রভাব তারা বরাবরই অক্ষুন্ন রেখেছিল। যদিও রাজসভার সাহিত্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধারার প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কম্বোডিয়া, বলিদ্বীপ, প্রভৃতি দেশে হিন্দুধারার অনুসরণ ছাড়া আজো কোন নিজস্ব সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়নি। এমনকি তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যেরও কোন উন্নত ধরনের চর্চা সেখানে হয়নি।

কম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতার প্রভাব পড়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মূলতঃ তারি ফলে তাদের নিজস্ব কোন ঐতিহ্য গড়ে উঠবারও সুযোগ পায়নি। সেখানে বর্তমানে একটি রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে সেই নাট্যশালায় আজো রামায়ণ বা অন্যান্য কাহিনী অবলম্বনে যে নাটক অভিনীত হয়, তা হিন্দুরাজাদেরই প্রচারিত সংস্কৃত সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

শ্যামেরই অন্যতম নাম "থাইল্যাণ্ড"। "থাই" সেখানকার অধিবাসীদের নাম—তা থেকেই সে দেশের নাম "থাইল্যাণ্ড" (Thailand)। থাইরা মঙ্গোলীয় উপজাতি—তারা চীনের সঙ্গে সুদূর সম্পর্কিত। খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই তারা শ্যামে বসবাস করতে আসে। থাইরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি নির্মাণ করে উপাসনা করত, ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু রাজত্ব সেখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৫০ খ্রীঃ রাজা "উলং" (Ulong) এক নূতন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন "অযোধ্যা" (Ayodhya) এবং নিজে "রামাধিপতি" (Ramadhipati) উপাধি গ্রহণ করে রাজা হন। অযোধ্যার রাজা ক্রমশঃ "লাওস" (Laos) ও "কম্বোডিয়া" (Combodia) অধিকার করে নিলেন। কিন্তু ব্রহ্মের কাছে একেবারে পরাজিত হয়ে গেলেন। অযোধ্যা এবং "সুখোদয়ের" (Sukhodaya) রাজারা বৌদ্ধই ছিলেন এবং ১৫শ ও

১৬শ শতক পর্যন্তও তাদের লিখিত ভাষা ছিল পালি। কিন্তু তারা হিন্দুদের শিল্প সাহিত্যও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর "কম্বুজা" ও "দ্বারবতীর" (Dvaravati) প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়েছে। তা এখানকার বুদ্ধমূর্তি, স্তূপ ও মন্দিরশিখরে পরিলক্ষিত হয়।

শ্যামদেশের নাট্যানুষ্ঠানে হিন্দুদের "রামায়ণের" কাহিনী নির্দ্বিধায় গৃহীত হলেও তার উপর বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রভাব পড়েছিল। ভারতীয় রামায়ণ যেমন হিন্দুদেবতাদের ধারণার সঙ্গে জড়িত, শ্যামের রামায়ণ তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধজাতকের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু হিন্দুদেবতাদের মত এই সমস্ত দৈবী শক্তি যবনিকার অন্তরালে বসে ঘটনা প্রবাহ পরিচালনা করছেন না, সোজাসুজিই জাতকচরিত্র নাটকীয় ভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন। রাক্ষস-রাজা রাবণ সেখানে সীতার প্রেম নিয়ে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাকাব্য অবলম্বী সংস্কৃত নাটকে যেমন দর্শকদের কাহিনী জানা থাকায় কথোপকথনের দরকারি সূত্র বজায় রেখে অগ্রসর হলেই চলত, শ্যামে তা নয়। শ্যামের রামায়ণ নাটকের কাহিনীতে যেমন রয়েছে অভিনবত্ব তেমনি নৃত্য বা "অ্যাক্‌শনই" ছিল প্রধান অতএব আমরা বলতে পারি, সেখানে নাট্যধর্মী আঙ্গিকের প্রয়োগই প্রবল। শ্যামের রামায়ণে উত্তরভারতের মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান রামলীলার মত সমগ্র ঘটনাই অভিনয় করে দেখানো হত—"রামলীলার" মূর্তি কাঠ ও কাগজে তৈরী হয়, কিন্তু শ্যামের রাবণ ছিলেন প্রকৃতই মানুষ, তার দশ মাথা থাকলেও তিনি মানুষেরই আকৃতি প্রকৃতি এবং স্বভাব অবলম্বন করে চলতেন। শ্যামের নাটক কিন্তু শেষ হত অগ্নি-পরীক্ষার পরে সীতার সঙ্গে রামের পুনর্মিলনে। এক্ষেত্রে তারা সংস্কৃত নাটকেরই রীতি অনুসরণ করত। শ্যামের রাজসভায় সংস্কৃত এবং শ্যামীয় এই দু'ধরনের নাট্যসাহিত্যেরই প্রচলন ছিল, তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দ বিতরণ করা। এলিজাবেথীয় "মাস্ক" নাট্যাভিনেতাদের মত, শ্যামের অভিনেতাদের পোষাকে খুব ঔজ্জ্বল্য এবং জাঁকজমক থাকত। অনেক অভিজাত বংশের নরনারীও নাট্যাভিনয়ে বা নৃত্য-নাট্যে অংশ গ্রহণ করতেন।

নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি অভিনয়েরই অখণ্ড অংশ ছিল। রাজবংশীয় এবং অভিজাতবংশীয় তরুণ তরুণীরা ললিত-কলা হিসেবে এগুলির চর্চা করতেন এবং অনেকেই বেশ পারদর্শিতা দেখাতেন। তাদের এই সমস্ত গুণাবলী উচ্চপ্রশংসিতই হত। রাজসভার মধ্যে জনসমাবেশে তারা অ

প্রদর্শন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না, এবং তাতে কোন প্রথাগত বাধাও ছিল না।

এই সব নাট্যাভিনয়ে কোন দৃশ্য বা মঞ্চসজ্জাও ছিল না এবং দৃশ্য-পরিবর্তনও ঘটত না। এতে হয় চরিত্রগুলি অভিনয় শেষে মঞ্চ থেকে চলে যেত, অথবা অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতের ফাঁকে মঞ্চের উপরেই পরিক্রমা করে প্রবেশ প্রস্থানের ভান করত। এই নাটকীয় আঙ্গিক শ্যামদেশীয়দের কাছ থেকেই ব্রহ্মবাসীরা পায়। নাটকের ভাষা হত অভিজাতমণ্ডলীর মুখের অর্থাৎ রাজসভার ভাষা, তদুপরি তা হত কাব্যপ্রধান, অতএব ভাষার মধ্যে যথেষ্টই কৃত্রিমতা ছিল—তবুও সে ভাষা জনসাধারণের মোটের উপর বোধগম্যই হত।

১৭৬৭ খ্রী: ব্রহ্মদেশ যখন শ্যাম জয় করল তখন তারা তাদের রাজসভার জন্য শ্যামদেশীয় নাট্যাভিনয়রীতি গ্রহণ করল। এর সঙ্গে ব্রহ্মের জাতক কাহিনীর নাট্য-চরিত্র এবং রাজসভার শোভা ও পরিবেশ অনেক কিছুরই মিল ছিল, তা ছাড়া ব্রহ্মের রাজসভায় যে সমস্ত শ্যামদেশীয় অভিজাতরা ছিলেন তারা তাদের নিজস্ব আনন্দ উৎসবের ধারাকে সাদরেই গ্রহণ করলেন।

শ্যামের প্রতিনিধি এবং রাজবন্দীরা তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী ব্রহ্মের রাজসভায় "রামায়ণের" নাট্যানুষ্ঠানে প্রথম অবস্থায় নিজেরাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন, কিন্তু ব্রহ্মে অভিনেতাদের প্রতি সামাজিক বিরূপতা ছিল, তারা ভিখারীর অধিক সম্মান পেত না। এর ফলে সেখানে অভিনয় ব্যবসায়ীরাই অভিনয় করত, অভিজাতরা করতেন না। সুতরাং শ্যামদেশের অভিজাতদেরও অচিরকাল মধ্যে অভিনয় প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হল। ব্রহ্মে শ্যামদেশীয় ধারায় গড়ে ওঠা এই নূতন নাট্য-প্রচেষ্টার নাম হল, "জাত" (Zat)—পণ্ডিতেরা মনে করেন এই শব্দটি এসেছে "জাতক" থেকে। কিছুকাল পরে এর সঙ্গে নানান দেশীয় উপাদান মিশ্রিত হওয়ায় এর নূতন নামকরণ হল 'পয়া জাত' (Pya-Zat) যার অর্থ হল "দৃশ্য-কাব্য"—এই নামই প্রকৃত নাটকের অর্থ বহন করে।

শ্যামের এই নাটকে প্রকৃত নাটকীয় অভিব্যক্তির চাইতে দেহভঙ্গিই ছিল প্রধান এবং ব্রহ্মের রাজসভাও তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করল। এই অঙ্গভঙ্গি বা "মুদ্রা" সংস্কৃত নাটকেও অতিশয় গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং

নাট্যশাস্ত্রেও তার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এর হয়তো অন্যতম প্রধান কারণ যে তখন মঞ্চে আলোকের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, তাই কথা ছাড়া সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি প্রকাশে অঙ্গাভিনয় এবং মুদ্রাই একমাত্র বলিষ্ঠ মাধ্যম ছিল।

॥ দ্বীপময় ভারত ॥

এতক্ষণ আমরা ইন্দো-চায়না অথবা ব্রহ্ম-শ্যাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত উপদ্বীপ অঞ্চলের নাট্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইন্দোনেশিয়া বা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করব। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বর্ণিও, মালাক্কা, ফিলিপাইন, নিউগিনি, জাভা, সুমাত্রা, প্রভৃতি বহু দ্বীপাবলীই রয়েছে। এই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রামায়ণ, মহাভারত এবং সেখানকার পুরাণ, ইতিহাস অবলম্বনে নৃত্য-নাট্য এবং গীতি-নাট্যের প্রচলন রয়েছে। তাদের সকলের নৃত্য গীতানুষ্ঠানের ব্যাপক আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে করা সম্ভব নয়, তাই আমরা এদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ যবদ্বীপের নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান এবং ছায়া-নাটকের আলোচনা করেই এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানব।

যবদ্বীপে অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয় সাহিত্য গিয়ে পৌঁছেছে, তারি পঠন-পাঠন এবং অনুশীলনের ফলে ওদেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তা হল "ইন্দো-জাভানীজ্" সাহিত্য—ভারত ও জাভার সংমিশ্রণে এই ভাষার ও সাহিত্যের সৃষ্টি। ১০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাভায় ভারতীয় ভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের যুগ।

এরপরে এই দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান বিজেতাদের আগমনের ফলে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে বাধা পড়ল।

জাভায় ভারতীয় সভ্যতা প্রচারের প্রথম যুগেই রামায়ণের সৃষ্টি হয়েছিল। এটা "ইন্দো-জাভানীজ্" সাহিত্যের এক প্রধান ও বিখ্যাত অবদান। এর বিষয়বস্তু সংস্কৃত রামায়ণের অনুরূপই। কিন্তু এতে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পরে রাম ও সীতার মিলনেই কাব্য শেষ—এরপরে সীতার নির্বাসন বা পাতাল-প্রবেশের অধ্যায় নেই।

পরবর্তীকালে "ধর্ম" বংশের রাজত্বকালে মহাভারতও গদ্যে অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদ মোটামুটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুরূপই করা হয়েছে, কিন্তু

তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ যথেষ্ট ছিল না। এই দুইখানি মহাকাব্য জাভায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাভার শিল্প সাহিত্যের এক নিরন্তর উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও পুরাণ, কালিদাসের রচনা, নীতিশাস্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, চাণক্য-সূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিও অনূদিত হয়েছিল। একদিকে ছিল শিক্ষিতদের মধ্যে নবসংস্কৃতির এই বিকাশ অন্যদিকে ছিল অভিজাতদের এবং গ্রাম্যজনগণের নৃত্য-গীতের প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ।

যবদ্বীপ বা এই সুবর্ণদ্বীপের মেয়েদের একটা নিজস্ব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ছিল। যখন আকাশ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় তখন গ্রাম্য মেয়েরা ২০ বা ৩০ জনের একটি দল বেঁধে বেরোয়। প্রধান মেয়েটি গ্রাম্য গীতির এক লাইন করে গাইবে এবং সে থেমে গেলে আর সকলে মিলে সমবেতভাবে গাইবে। এইভাবে তারা দল বেঁধে তাদের আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে অথবা ধনী বা অভিজাতদের গৃহে যাবে। সেখানে তাদের তামার পয়সা বা অন্যকিছু মূল্যবান বস্তু দিয়ে বিদায় করতে হবে। একে বলা হত "চাঁদনী রাতের গান"।

নৃত্যগীত সুবর্ণদ্বীপের সর্বত্রই বিশেষভাবে অনুশীলন করা হত, অভিজাত বংশীয়রা এবং রাজপুরুষেরা তো রাজসভার নৃত্যগীতানুষ্ঠানে যোগদান করতেনই এমন কি রাজকন্যারাও কখন কখন বিশেষ অনুষ্ঠানে বা রাজ-অতিথির সমাগমে নৃত্যপ্রদর্শন করতেন। রাজপুত্র এবং রাজকন্যারা নৃত্যশিল্প যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করতেন, পারদর্শিতা অর্জন করতেন এবং তা প্রকাশ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখতেন।

যবদ্বীপের নৃত্য-নাট্য এবং ছায়া নাটক সম্পর্কে এই শতকেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায়। তিনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণে যান তখন তাঁর সঙ্গি ছিলেন। কবি বিংশ শতাব্দীতেও এই দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সংস্কৃতির যে চিহ্নগুলি দেখতে পান এবং তাদের দার্শনিক চিন্তায় ভারতীয়ত্বের যে সুস্পষ্ট ছাপ পান তাতে অভিভূত হয়ে যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ পরিভ্রমণের প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কবিতাবলীও রচনা করেন। এঁদের এই দীর্ঘ ভ্রমণকালের সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ"

নামক গ্রন্থে। তিনি কবির সঙ্গে যবদ্বীপের অন্যতম সামন্ত মঙ্কুনগরোর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভোজন পর্বের শেষে যবদ্বীপের রাজবাড়ির বিরাট বড় মণ্ডপে কবির সম্মানে যে যবদ্বীপীয় নৃত্যের আয়োজন করা হয় তার সুন্দর একটি বর্ণনা আমরা শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাই।

যবদ্বীপের এই ধ্রুপদী নাচের উপরে হিন্দুযুগের প্রভাব ছিল সুগভীর। বেশিরভাগ নাচই যুদ্ধনৃত্য, সুকুমার তনু অভিজাত বংশীয় তরুণরাই নাচেন। তাদের পোষাকের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের বেশ মিল আছে, কিন্তু ওরি সঙ্গে আধুনিক রুচির কিছু কিছু উপকরণও যুক্ত হয়েছে, যেমন বাতিকের কাজ করা ধুতির নীচে হাঁটু অব্দি আঁটো পাজামা এবং তাদের গায়ের জামা। তাদের মাথায় সোনার রাজমুকুট, গলায় হার, কোমরে গুজরাটী পাটোলা কাপড়ের বর্ণ-বৈচিত্র্য—সব মিলিয়ে অতি মনোরম দৃশ্য রচনা করেছিল। নাচের করণ, প্রকরণ, হাতের মুদ্রা সকলি শাস্ত্র নির্দিষ্ট যদিও তা ভারতীয় নৃত্য মুদ্রা থেকে কিছুটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে গিয়েছিল—তবুও অভিজ্ঞ চোখে মিল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়। এক সঙ্গে দু'তিন জনের বেশি নট মঞ্চে দেখা যায় না। ফোবিয়ন বাওয়ারসের (Faubion Bowers) প্রদর্শিত একটি চিত্রে প্রেমাভিনয় নৃত্যে রাজপরিবারের তরুণ-তরুণীকে একই সঙ্গে দেখা যায়। এই সমস্ত নৃত্যের জন্য কোন দৃশ্যপটের ব্যবহার থাকত না, উজ্জ্বল আলোয় মণ্ডপের মার্বেল পাথরের মেঝেতেই নাচ হত।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সামন্তরাজ মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে যে নৃত্যানুষ্ঠান দেখেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকা নিয়ে উল্লেখ করা হল—এই তালিকায়ই আমরা দেখতে পাব এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের কতখানি মিল—দুই সংস্কৃতির মাঝে আজো সেই অন্তর্লীন স্রোত বইছে।

নাচের তালিকা—

1. Wireng Pandji henem (Orde dans)—প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাসের আখ্যায়িকা বর্ণিত কোনও ঘটনার নৃত্যাভিনয়।

2. Wireng Raden Hindrajit Kalijan Wanara Hanoman—রামায়ণের ঘটনা—রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ আর বানর হনুমানের যুদ্ধাভিনয়।

3. Bekaan Golek—একটি স্ত্রীলোকের নৃত্য।

4. Wireng Panah hoedoro—তীর ধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়—Abimanjoe অভিমন্যুর সঙ্গে Sambo শাম্বর পুত্র—Wersokoesoemo বর্ষকুসুম বা বৃষকুসুমের যুদ্ধ।

5. Wireng Raden Werkoedoro Kalijan Praboe Partipejo—রাজপুত্র বৃকোদরের সঙ্গে প্রভু বা রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।

6. Petilan Langendr jo—Menak Djinggo den Damar Woelan—"দামার বুলান্" নামক বিখ্যাত প্রাচীন যবদ্বীপীয় কথার ঘটনা বিশেষ নিয়ে নৃত্যাভিনয়; দুই প্রতিপক্ষ মেনাক্-জিঙ্গো ও দামার্ বুলানের যুদ্ধ।

গ্যামেলানের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাচ চলছিল। অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিরা যখন রাজসভায় এই নৃত্য করেন, তখন তাদের সুশিক্ষিত তনুতে স্বভাবতঃই এমন একটি সুষমা, সৌন্দর্য এবং মহিমা প্রকাশ পায় যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তাকে "দেহের সঙ্গীত" আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

যবদ্বীপের নৃত্য-নাট্য ভারতের দুই মহাকাব্যের কথাবস্তু অবলম্বনে রূপায়িত। ঘটোৎকচ তাদের অতি প্রিয় চরিত্র, সে একাধারে বীর এবং প্রেমিক। পূর্বে আমরা যে বিষয়সূচীর উল্লেখ করলাম তাতেই আমরা দেখতে পাই হিন্দুসভ্যতার প্রভাব সেখানে কত সুগভীর। যবদ্বীপে হিন্দু রাজাদের শাসনকালের পরে এসেছিলেন মুসলমান বিজেতারা তখন যবদ্বীপের প্রজা ও সামন্তরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে এগুলি হয় ডাচ্‌দের উপনিবেশ। তবুও ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় তারা তাদের "জাত দেয়নি"—অর্থাৎ তারা তাদের হিন্দু সংস্কৃতি এবং দার্শনিক চিন্তা ত্যাগ করেনি বরং সেখানেই অক্ষুন্ন রয়েছে তাদের অস্তিত্বের মৌলিক স্বাক্ষর। ডাচ্ সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও তারা উন্নত ধরনের দৃশ্য-সজ্জা বহুল ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ ধ্রুপদী নৃত্য-নাট্যের জন্য গ্রহণ করেনি। রাজসভার মঞ্চ হত চারদিকে সমভাবে আলোকোজ্জ্বল একটি মণ্ডপ। যার সঙ্গে রাজবাড়ির ঐশ্বর্য এবং জাঁকজমকের অংশ বাদ দিলে আমাদের যাত্রার অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণের রঙ্গভূমির স্থাপত্যগত বিশেষ প্রভেদ নেই।

যবদ্বীপে অভিনয় ক্ষেত্রকে বলা হয় "পেণ্ডপো" বা "মণ্ডপ"। রাজবাড়ির এই মণ্ডপ বহুস্তম্ভ বিশিষ্ট এবং ঐশ্বর্যময়। এই মণ্ডপটি দু'টি চাতালে বিভক্ত,

উপরের চত্বরে রাজা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা বসেন। এর এক ধাপ নীচে বারান্দার মত দ্বিতীয় চাতাল—রাজাসন রয়েছে যে মণ্ডপটিতে তার নাম—"বেঙ্সাল কনচানা" (Bengsal Kentjana) অর্থাৎ "কাঞ্চন-মণ্ডপ"। এর থামগুলো উঁচু উঁচু, ছাদের নীচে কাঠের কারুকার্য করা, চারদিকে রঙিন নিশান পোঁতা, সাদা মার্বেল পাথরে মেঝেটি আচ্ছাদিত। মণ্ডপের একদিকে মেঝেতে গায়ক এবং বাদ্যকররা বসেন। আবহসঙ্গীতে ইউরোপীয় বাদ্য বাজলেও, গানের সঙ্গে গ্যামেলানের টুং টাং মধুর ধ্বনিই হল প্রধান সঙ্গত। গায়কদের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ই থাকে। গানের সুরে ধ্রুপদী-ঢঙের প্রাধান্যই বেশি।

রাজপরিবারের এবং অভিজাত পরিবারের পুরুষরাই যে কেবলমাত্র নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তা নয়, নারীরাও এবিষয়ে সমান পারদর্শিতার অধিকারিণী এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত নন। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা যে কতখানি পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছিল তা আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থেকে বুঝতে পারি। রাজপরিবারের তরুণ তরুণীরা আচার্যের কাছে নৃত্যগীত শিক্ষা করতেন তার বহুতর প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে। এসব নৃত্য রাজসকাশে প্রদর্শিত হত। এ ছাড়া দেববিগ্রহের সামনে নৃত্যগীত বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল। ভারতের মন্দিরগাত্রে নৃত্য-গীতপরা কিংবা বাদ্যবাদিনী ভাস্কর্যমূর্তির কোন অভাব নেই। ভারতবর্ষ থেকে নানান কারণ বশতঃ নৃত্যগীত শিক্ষা অভিজাত সমাজ পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তা নটনটী নামে ভিন্ন এক শ্রেণীর হাতে চলে যায়। ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু তা লুপ্ত হয়নি বিভিন্ন স্থানে অভিজাত তরুণ তরুণীর নৃত্য-গীতানুষ্ঠান সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্তও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের মুদ্রা এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

রাজপরিবারের সুদর্শনা কন্যারাও অনেক সময় বিশেষ অনুষ্ঠানে গ্যামেলানের মধুর ধ্বনির সঙ্গতে নৃত্য প্রদর্শন করেন। আট ন'জন মেয়ে একই সঙ্গে হয়তো মণ্ডপে আসেন। এই সমস্ত রাজ-অন্তঃপুরিকাদের সম্মানের জন্য আগে পিছে দাসীরা আসে—দাসীরা উঠে দাঁড়ায় না উবু হয়ে আসতে থাকে, তারা মণ্ডপের মধ্যভাগ পর্যন্ত কন্যাদের সঙ্গে থাকে তারপরে সরে

যায়। এই নর্তকীদের পরিধানে থাকে খয়রি-রঙের ডুরে কাটা নকশাদার সারঙ্—এই সারঙ্ লুঙ্গির মত বিশেষ এক পরিধেয়। সারঙের খানিকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের দেহের উর্ধ্বভাগে থাকে ঝকমকে উজ্জ্বল বর্ণের মখমলের আঙিয়া—দু'কাঁধ থাকে অনাবৃত। কোমরে নানা বর্ণের রেশমী পাটোলা কাপড়ের কোমর-বন্ধ, দু'দিকে তার দু'টো খুঁট ঝুলে পড়ে আরো শোভা বাড়ায়। মাথার খোপায় জুঁইফুলের মালা মাঝে সোনার তারের ফুল লতাপাতা, প্রজাপতি বা অন্য কোন অলংকার। কানে জড়োয়ার দুল, হাতে সরু চুঁড় বা বালা, কনুইয়ের উপরে তারের কাজকরা গহনা। মাথায় সোনার মুকুট, আর গলায় একগাছি হার। মুখে এবং দেহের অনাবৃত অংশে ও বাহুতে হলুদে রঙের গুঁড়ো মাখান—তাতে দূর থেকে তাদের অনেকটা আমাদের দেবী প্রতিমার মত দেখায়। অন্তঃপুরের পথে মণ্ডপে যখন তারা আসেন তাদের তন্ময় দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হয়েই থাকে। সেই ভাবে তারা এগিয়ে আসেন সাধারণভাবে পাশাপাশি পা ফেলে নয়—এক পায়ের ঠিক সামনে আর এক পা ফেলে এগোন এবং এইভাবেই রাজসমীপে এসে নিজেদের পদতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়ান।

রাজকন্যাদের এই নৃত্য, তাদের পোষাক, অলংকার, অঙ্গসজ্জা, এমন কি তাদের তনুশ্রী, চোখের দৃষ্টি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।

রাজসভার এই সমস্ত নৃত্য-নাট্য ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যেও নাট্যানুষ্ঠানের প্রচার ছিল। কোথাও কোথাও এই সাধারণ রঙ্গালয় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠতে দেখা যায়। এর পেশাদার নটসম্প্রদায়ও রাজ অর্থেই পরিচালিত হয়। নাটকের মুখ্য কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত এবং যবদ্বীপের প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বনে বয়ন করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতির আকর্ষণের মাঝেও জনসাধারণ যাতে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে তাই এর উদ্দেশ্য। নাট্যানুষ্ঠান অভিনেত্রী বর্জিত, এবং কৌতুক প্রধান হয় এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাবেশ হয়।

যবদ্বীপের নাট্যানুষ্ঠানের আর একটি প্রধান অংশ হল তার ছায়া-নাটক। এর যবদ্বীপীয় নাম "ওআইয়াঙ্ কুলিৎ" (Wajang Koelit) বা পুতুলের ছায়া-নাটক। এটি একটি অপূর্ব শিল্প সম্ভার এবং অভিনবও বটে। এর

পুতুলগুলি জাপানের কিংবা অন্যান্য পুতুল নাটকের পুতুলগুলির মত সাধারণ ত্রিমাত্রিক পুতুল নয়। অভিনয়কারী পুতুলের মূর্তিগুলি তৈরী করা হয় মোষের চামড়া কেটে।

ছায়া-নাটকের মঞ্চে মস্তবড় একটি সাদা যবনিকা টাঙ্গান থাকে। যবনিকার যে দিকে প্রদর্শক তার পুতুল নিয়ে বসেন সেইদিকে মাথার উপর একটি উজ্জ্বল আলো থাকে, পুতুলগুলি থাকে এই আলো এবং পর্দার মাঝখানে, পর্দার উপরে তাদের ছায়াগুলি পড়ে। পর্দার দু'দিকেই দর্শকরা বসেন, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পর্দার যে দিকে পুতুলের ছায়া দেখা যায় সে দিকে বসেন স্ত্রীলোকেরা এবং যেদিকে আলোর নীচে পুতুলগুলো খেলানো হচ্ছে সেদিকে থাকেন পুরুষেরা। এই পদ্ধতির মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট তা হল ছায়া-নাটকের আলোর দিকে বসে কখন দর্শকরা অনুষ্ঠান দেখেন না, তারা ছায়ার দিকেই বসেন কারণ সেদিক থেকেই প্রকৃত শিল্পশ্রী উপলব্ধি করা যায় জাভায় এর ব্যতিক্রম রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ সর্বত্র এই পুতুল নাচে আমরা দেখতে পাই যে পুতুলগুলোকে উপর দিক থেকে সুতোর সাহায্যে নাড়ানো হয় কিন্তু যবদ্বীপের পদ্ধতি ভিন্ন। সেখানে নীচের দিক থেকে বা দু'পাশ দিয়ে স্বচ্ছ লাঠির সাহায্যে পুতুলগুলোকে চালানো হয়। এই পুতুলগুলোর হাত নাড়তে পারা যায়। একই চরিত্রের অভিনেতা বিভিন্ন ভাবজ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন পুতুল রয়েছে। স্বচ্ছ বস্ত্র দিয়ে এই পুতুলগুলির পোষাক বহুবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। তার ভিতর দিয়ে আলো ঠিকরে গিয়ে অন্ধকার পর্দায় পড়ে এবং তাতে পুতুলের চেহারাগুলো আশ্চর্য বর্ণোজ্জ্বল দেখায়। মস্তবড় পর্দাটার মাঝখানে একটা কাল্পনিক দ্রাক্ষাকুঞ্জ রয়েছে, তাতে লতাপাতা জড়ানো, তার উপরে উপবিষ্ট রয়েছে বাঁদর এবং পাখীরা—আর নীচে দু'জন পাহারাদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। নাটক সুরু হলে এই অদ্ভুতদর্শন ছায়া-বৃক্ষটি অদৃশ্য হয়ে যায়। নাট্য প্রদর্শককে বলা হয় "দালাঙ" (Dalang), তিনি একটি মাদুরে বসে মুখে মুখে নাটকের ঘটনাবলী পাঠ করেন, সংলাপ থাকলে তাও অভিনয়ের ধরনে বলেন, তার পেছনে তার সহায়ক হিসেবে রয়েছে অর্কেস্ট্রার বাদ্যযন্ত্রবিদ্‌রা। যখনি কোন নূতন চরিত্র আসে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠে তার প্রবেশ জানিয়ে দেয়। অন্যকোন দেশের ছায়া নাটকে এই কাল্পনিক বৃক্ষটি নেই এবং অন্যকোথাও পুতুলগুলির মুখও এতটা কিম্ভূতকিমাকার ভাবে বিকৃত নয়। এ পুতুল-

॥ চীন ॥

আমরা পাশ্চাত্য নাট্য আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে নাট্যশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবকে ভিত্তি করে। প্রাচ্যের ইতিহাসও তাই। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান সর্বত্রই নাটকের অগ্রদূত ছিল দেবমন্দিরের নৃত্য, গীত ও পূজানুষ্ঠান। প্রায় ২,০০০ খ্রী: পূ: থেকেই চীনদেশে দেবপূজায় তন্ত্রমন্ত্র, নৃত্য, গীত, ভূতপ্রেতের ওঝার 'ভরে' পাওয়া ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নাটকের প্রাথমিক উপাদানগুলি ছিল। এই উপাদানগুলির সঙ্গে রাজকীয় অনুষ্ঠান এসে এরপরে সংযুক্ত হল তখন এর সৌষ্ঠব ও পরিধি দুই-ই বেড়ে গেল এবং নানান শৈল্পিক ধারারও উৎপত্তি ঘটল, চীনের নাটকীয় ধারার আবির্ভাবও ঘটল তখন।

চীনদেশীয় নাটকের প্রধানতম উৎসই হল নৃত্য। প্রথমে এ ছিল দেববেদীর সম্মুখে পুরাণ বা ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে পূজারীর নৃত্যানুষ্ঠান, বা পূর্বপুরুষের বীরকাহিনী নিয়ে যুদ্ধ-নৃত্য ও বিভিন্ন নৃত্যমূলক সামাজিক অনুষ্ঠান। পরে নৃত্যের মধ্যে যখন জটিলতা এল তখন সেই সমবেত নৃত্য পরিচালনার জন্য একটি প্রধান ভূমিকার সৃষ্টি হল, এলেন প্রথম অভিনেতা। ক্রমশঃ পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের উদ্ভব হল, তারা ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও শুধুমাত্র আনন্দ বিতরণের জন্যই নৃত্য ও নৃত্য-নাট্যের অনুষ্ঠান করতেন। আমরা "চাও"-রাজত্বে (Chow—১১২২-৩১৪ খ্রী: পূ:) নৃত্য-নাট্যের বহু বিবরণ পাই। এই সময় রাজসভায় কৌতুক শিল্পীদেরও বিশেষ স্থান ছিল। পরবর্তী কালে চীনের নাটকে "ক্লাউন" একটি লক্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিল। "হ্যান্" রাজবংশে (২০৬ খ্রী: পূ:) পাখা নিয়ে নৃত্য কিংবা দেবতা বা পশুর পোষাক ও মুখোশ পরে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ নৃত্যানুষ্ঠান সমস্ত রকম গণ-অনুষ্ঠান এবং অর্থশালীদের ব্যক্তিগত উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল।

"থং" রাজত্বে (T'ang dynasty—৬১৮-৯০৭খ্রী:) সর্বশিল্পের, বিশেষ করে নাট্যশিল্পের সমুন্নতি ঘটেছিল। কারণ থং রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সভ্যতা বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আরো বেশি উন্নত হয়ে ওঠে। এই সময়ে চীনে নাটক ধর্মানুষ্ঠান ও গণউৎসব মাত্রই আর রইল না, তা রাজানুগ্রহে পুষ্ট হওয়ার সুযোগ পেল এবং চীনদেশের ক্লাসিকাল নাটক

পূর্ণায়ত রূপ পেল। রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল বলেই এই যুগে চীনদেশে নাটকের জন্ম নিয়ে একটি উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপকথায় আছে যে অষ্টম শতকে থং সম্রাট "মিং হুয়াং" (Ming-Huang) একবার চন্দ্রলোকে বেড়াতে গিয়ে চন্দ্ররাজের "জেড্" প্রাসাদে (Jade Palace) একদল কুশলী নাট্যাভিনেতাকে অভিনয় করতে দেখে মুগ্ধ হন। পরে তিনি স্বরাজ্যে ফিরে এসে একটি নাটকের দল সৃষ্টি করেন এবং তাদের অভিনয়ের জন্য তাঁর "পেয়ার্ অর্‌চ্যার্ড্" (Pear orchard) বা নাশপাতি কুঞ্জে একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরী করান। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ের বহুদলের সঙ্গেই পেয়ার্-উদ্যান বা পেয়ার্ কুঞ্জের নাম যুক্ত হয়েছিল। এই সময়ে রাজসভায় নাটকের বিষয় হত বীরগাথা, পুরাণকাহিনী, কমেডি, এমনকি অপরাধীদের নিয়ে রঙ্গ তামাশা।

থংদের পরে "স্যুং" রাজত্বের (Sung dynasty—৯৬০-১২৭৮ খ্রীঃ) ৩০০ খানি নাটক পাওয়া যায়। প্রকৃত নাট্যসাহিত্য কিন্তু রচিত হয় "ইয়াং" রাজত্বে (Yuan dynasty—১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষভাগে। এ যুগে লিখিত ক্লাসিকাল ধারার নাটকই শ্রেষ্ঠ চীনা নাটক হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এখনো এ যুগের অনেক নাটকই ক্লাসিকাল চীনা রঙ্গমঞ্চে আধিপত্য বজায় রেখেছে। মঙ্গোল বা ইয়াংদের রাজত্বকালের ৮১৫ খানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরপরে থিয়েটার এসে পৌঁছল 'মিং' (Ming) যুগে। মিং-দের ৬০০ খানা নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই নাটকগুলি বড় বড় পণ্ডিতব্যক্তিরা রচনা করেছিলেন সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত গুণে নয় তবে সাহিত্যিক উৎকর্ষে এ পূর্ব ইতিহাসকেও ছাড়িয়ে গেল এবং এক নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করল।

ইয়াং যুগের নাটকে তিন থেকে পাঁচটি অঙ্ক থাকত এবং মাত্র একটি চরিত্রই আগাগোড়া প্রাধান্য পেত। মিং যুগের নাটকের অঙ্ক সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দুই থেকে চার ডজন অঙ্ক এ যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। স্বতঃই এই নাটক অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়ে পড়ত, সুতরাং এই নাটকের এক একটা অঙ্কের মধ্যেই নিজস্ব একটা সম্পূর্ণতা থাকত, ছোট গল্পের মত বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন কাহিনী গ্রথিত করেই একটি পূর্ণাঙ্গ উপকথা বলা হত। এ যুগের এই নাটক দেখেই সাধারণ ইউরোপীয়দের ধারণা হয়েছিল যে চীনদেশের নাটক—একাদিক্রমে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এ যুগের সাহিত্যিক নাটক পুরোটা খুব কমই দেখানো হত—অভিনেতারা

কয়েকটি দৃশ্য বেছে নিয়ে অভিনয় দেখাতেন। এ সময়কার একটি প্রখ্যাত নাটক হল "লুট" (Lute)-এর কাহিনী। লুট-এর গল্প হল, একটি ছেলে গ্রামে তার অনুরাগিণী বধূকে রেখে সহরে পড়তে এসেছিল। সেখানে সে রাজকর্মচারীর পদ পায় ও সম্রাটের আদেশে এক অভিজাত নারীকে বিবাহ করে সহরে বাস করতে বাধ্য হয়। এরপরের কাহিনী হল তার সেই বিশ্বস্ত গ্রাম্য বধূ কেমন করে তার তারের যন্ত্র 'লুট'টিকে পরম যত্নে নিয়ে এল—ছেলেটি তাকে চিনতে পারল ও তাদের মিলন হল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এযুগের নাটকে প্রচুর চরিত্র এসে যাচ্ছে এবং জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

মিং যুগের পরে চীনে মাঞ্চু রাজত্ব (১৬৪৪—১৯১১ খ্রীঃ) স্থাপিত হল। এই বহিরাগতরা এসে ড্রাগন সিংহাসন অধিকার করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি চীনদেশের সংস্কৃতি গ্রহণ করলেন—এদের রাজত্বকালেই চীনের শিল্প-ক্ষেত্রে নবজাগরণের যুগ এসেছিল। এ যুগের প্রায় ৮০০ খানি নাটক পাওয়া যায়, তার মধ্যে সর্বপ্রধান অংশই হল ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। যেমন মিংদের পতন নিয়ে লেখা "রক্তাঙ্কিত পাখা" কিংবা থং-সম্রাট মিং হুয়াং ও তার বিশ্বাসঘাতিনী রক্ষিতার কাহিনী নিয়ে লেখা "অনন্ত জীবনের প্রাসাদ"। এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল—বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান, যেমন—"তিন-সাম্রাজ্য" (সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটক) "জল গর্তের বীরেরা" (রবিন হুড জাতীয় কাহিনী) "লাল-গৃহের স্বপ্ন" (বিখ্যাত প্রেমের উপন্যাস নিয়ে রচিত)।

এই মাঞ্চু রাজত্বেই চীনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী 'মিং' রাজত্ব পর্যন্ত নারীর চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু মিং রাজত্বের শেষের দিকে অভিনেত্রীদের কেন্দ্র করে নানাণ সামাজিক বিকৃতি ঘটতে লাগল। রাজকুমারগণ এবং প্রধান রাজপুরুষগণ তাদের প্রাসাদে বহুসংখ্যক অভিনেত্রীকে রাখতেন—এর ফলে চূড়ান্ত রকম সামাজিক অধঃপতন ও লোকনিন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। মাঞ্চু বংশীয় বিজেতাগণ নিজেদের শক্তি, সাহস অক্ষুন্ন রাখবার জন্য ও অবনতি রোধ করবার জন্য মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।

একথা অনস্বীকার্য যে চীনদেশের নাট্য-সাহিত্য সোফোক্লেস্, শেক্সপীয়র বা কালিদাসের রচনার মত পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে উঠতে পারেনি। অতএব সাহিত্য সামগ্রী হিসেবে সুধী সমাজে তার পঠনও

প্রচলিত নেই। বিশেষতঃ ট্র্যাজেডি বিলাসী পশ্চিমী মনের কাছে কাহিনীর অসংবদ্ধতা ও অগভীরতার জন্য তা নিতান্তই উচ্ছাসপূর্ণ মেলোড্রামা মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তার জন্য নাট্যকাররা ততখানি দায়ী নন যতখানি দায়ী ছিল দর্শক সাধারণ। কারণ অভিনয় চলাকালে দর্শকরা অনবরতই যাওয়া-আসা করত, তাদের অবস্থানটা হত সাময়িক, সুতরাং কাহিনীকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। হাটের পথে হচ্ছে, যে যতক্ষণ খুশী দাঁড়িয়ে, বসে দেখল। লোক আসছে, যাচ্ছে, চা খাচ্ছে, খানা-পিনা গল্প গুজব চলছে, এমন কি নাটকের অপেক্ষাকৃত হীন অংশে তাস-পাশাও খেলছে। সুতরাং পুরো নাটকের মধ্যে সঘন রসসংবদ্ধতা আশা করা সেখানে বাতুলতা। একটি ভাব বা বিশেষ ঔৎসুক্যকে আগাগোড়া বাঁচিয়ে রেখে, টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই নাটকের এক একটি ছোট ছোট অঙ্কই নাটকীয় পূর্ণতা নিয়ে স্বপ্রধান হয়ে বিরাজ করত। চীনে নাটকের অভিনয় চলত সায়াহ্ন থেকে প্রায় পরদিন প্রত্যুষ পর্যন্ত।

এই দীর্ঘ সময়ে দেখানোর জন্য নাটকের সূচীপত্রেও একাধিক নাটক থাকত। একটা নাটকের অভিনেতারা যখন প্রস্থানের দরজা দিয়ে চলে যেতেন, তখন প্রবেশের দরজা দিয়ে ভিন্ন নাটকের অভিনেতারা মঞ্চে আসতেন। এই ভাবেই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে নাটক প্রবাহিত হয়ে চলত। আর তার সঙ্গে উচ্চ গ্রামে বেজে চলত সঙ্গীত। সবচেয়ে দীর্ঘ যে নাটক তাতে ৩২ থেকে ৪৮টি পর্যন্ত অঙ্ক থাকত। কিন্তু ওরি মধ্যে চীনের দর্শকগণ তাদের নাট্যানুষ্ঠানকে গভীর ভাবেই উপভোগ করত, যা আর কোন বহিরাগতের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

চীনে নাটকের বিষয়বস্তু সব রকমই হতে পারত। ইউরোপীয় ধারার পূর্ণমাত্রার ট্র্যাজেডির দর্শন সেখানে না মিললেও তার মধ্যে বেদনাদায়ক পরিবেশ ও দুঃখাশ্রুর সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া বীরত্বপূর্ণ কার্য, ঐতিহাসিক যুদ্ধবিজয়, পিতৃসত্য বা ভ্রাতৃপ্রেম রক্ষা ইত্যাদি গুরুগম্ভীর রসের আশ্রয় রয়েছে; অন্য দিকে আছে সর্বপ্রকার হাস্য পরিহাস। মৃদুল হাসি থেকে, মাথায় ডাণ্ডা মেরে রহস্য করা পর্যন্ত। হাসি, তামাশা ছাড়া ফার্সকে ভিন্নশ্রেণীর নাটক বলে ধরা হত।

গুরুগম্ভীর ধারার চীনা নাটক দু'শ্রেণীর হত। এক হত ঐতিহাসিক, যার মধ্যে বীরত্ব গাথা, যুদ্ধজয় ও দেশভক্তিমূলক কাহিনী থাকত। অন্য

শ্রেণী ছিল সামাজিক নাটক। এগুলি বেশিরভাগই পারিবারিক নাটক হত, যাতে সুনীতির জয় ও দুর্নীতির পরাজয় দেখানো হত—এর একটা অংশে অপরাধমূলক নাটকও থাকত।

চীনদেশের নাটকের গঠন প্রকৃতি অনেকটাই তার চরিত্রগুলির উপরে নির্ভরশীল। নাটকীয় চরিত্রগুলি সবসময়েই কতকগুলি বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা হত। ব্যক্তিচরিত্রের চাইতে নাটকে "টাইপ" চরিত্রই প্রধান ছিল। চার ধরনের টাইপ চরিত্র এবং তার মধ্যে আবার নানান শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। ১। এরমধ্যে প্রথম বিভাগ হল পুরুষ চরিত্র "শ্যেং" (Sheng) তার মধ্যে যারা রাজা, বীর বা সৈন্যাধ্যক্ষ তাদের চেহারা হত দাড়িওয়ালা ভারিক্কি ধরনের। আর ছিল তরুণ বয়সের চরিত্র—এরা হত নায়ক বা প্রেমিক, হাতে এরা পাখা কিংবা পালক নিয়ে আসত।

২। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল নারী চরিত্র "তান্" (Tan) তারমধ্যে থাকত জাগতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞা মনোহারিণী নারী, থাকত যোদ্ধনারী। আর থাকত সৎ আদর্শস্থানীয় নারী চরিত্র। এই আদর্শ নারী চরিত্রই ছিল নানান দুরধিগম্য পরিবেশ অতিক্রম করে আসা বাঞ্ছিত ফলভাগী নায়িকা চরিত্র।

এই সমস্ত টাইপ চরিত্রগুলির পোষাক, বর্ণ, রূপ-সজ্জা এগুলিও সুনির্দিষ্ট থাকত। চরিত্রটি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ দেখে অভিজ্ঞ দর্শক বলে দিতে পারত এটি কোন চরিত্র এবং এর আচরণগুলি কেমন হবে। পূর্বেকার দু'শ্রেণীর পুরুষ ও নারী চরিত্র পশ্চিমী ধরনে মুখে রং-এর প্রলেপ্ লাগাত, তবে তাতে মুখের স্বাভাবিক রেখাগুলি ঢাকা পড়ত না। অনেক সময় সুন্দরী তরুণী নায়িকারা মুখে ঝক্‌ঝকে সাদা রংও লাগাত। বয়স্ক পুরুষ চরিত্র মুখে বয়সের কুঞ্চন দেখাত এবং ধূসরবর্ণের এলোমেলো চুল রাখত ও লম্বা নকল দাড়ি পরত। নায়িকা চরিত্রের নারী চোখকে আরো বড় এবং উজ্জ্বল দেখাবার জন্য অনেক সময় হয়তো চোখের মণিতে চীনা কালো কালির ফোঁটা লাগিয়ে দিত, তারা মাথায় পরচুলাও পরত। কারণ মাঞ্চু রাজত্ব থেকে পুরুষরাই নারী চরিত্রের অভিনয় করত। তরুণ নায়কদের আভিজাত্য বাড়ানর জন্য চোখ এবং ভ্রূ তির্যকভাবে টেনে উপর দিকে তুলে দেওয়া হত।

অন্যান্য নারী চরিত্রের মধ্যে ছিলেন এক অভিজাত বয়স্কা-নারী চরিত্র, যিনি মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আর ছিল হাস্যরসের অভিনয়কারী নারী। যে সমস্ত পুরুষ অভিনেতারা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন তারা ছোট পা-ওয়ালা চীনা মেয়েদের চলার হুবহু অনুকরণ করতে শিখতেন। তাদের পদক্ষেপ হত তেমনি কম্পিত, শঙ্কিত। এজন্য তারা এক রকম কাঠের জুতো ব্যবহার করতেন এবং ব্যালে নৃত্যশিল্পীদের মত কেবলমাত্র বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করতেন।

৩। তৃতীয় ধরনের চরিত্র হল ক্লাউন "ছোউ" (Chou) তার পোষাক পরিচ্ছদ ইচ্ছেমত কাল্পনিক হত। এই ক্লাউন চরিত্র মঞ্চের সর্বপ্রকার গতানুগতিক প্রথা ভেঙ্গে যদৃচ্ছ আচরণ করে বেড়াতে পারত। তার রূপ-সজ্জা ইউরোপীয় সার্কাসের ক্লাউন বা প্যান্টোমাইম্ অভিনেতার মত হত। মুখে সাদা রং মাখা, চিবুকটা লাল, কখন বা নাকটায় বেশি পাউডার লাগিয়ে প্রাধান্য দেওয়া হত। সে নাচ গান করত, দৈনন্দিন জীবনের অনুরূপ কথা কইত। মঞ্চ বা দর্শকদের কোন নিয়মই না মেনে সে সোজাসুজি হয়তো দর্শকদের সম্বোধন করে কথা বলত। সে চটুল হাস্য পরিহাস থেকে হৈ-হুল্লোড় সকলি করে বেড়াত।

চীনদেশের অভিনেতাদের মধ্যে কিছু নিজস্ব রীতিনীতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। পেপিং-এর "হাতা গোতের" (Hata Gote) বাইরে তাদের নিজস্ব এক মন্দির রয়েছে, তাতে তাদের তিনজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতার বেদী আছে। এর মধ্যে একজন হলেন "কুয়ান্ ইউ" (Kuan Yu) বা যুদ্ধ দেবতা। দ্বিতীয় দেবতা হলেন থং সম্রাট "মিং হুয়াং" (Ming Huang) ইনিই ছিলেন পেয়ার্ উদ্যানের উপকথা জাত নাট্যাভিনয়ের সৃষ্টিকর্তা। কথিত আছে সম্রাট মিং হুয়াং নিজে ক্লাউনের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এই জন্যই চীনের রঙ্গমঞ্চে প্রথাগতভাবে ক্লাউন চরিত্র সর্বাধিক সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। মেক্-আপের লোক সর্বপ্রথম তারি সাজপোষাক করাবে। এই ক্লাউন চরিত্র গ্রীনরুমে যে কোন বড় অভিনেতার আসনে গিয়েই বসতে পারত। অন্য দিকে দেখা যায় নগণ্য নারী চরিত্রের যারা অভিনেতা তাদের নিজেদের আসন ছাড়া অন্যত্র বসবার অধিকার ছিল না। অভিনেতাদের তৃতীয় দেবতা হলেন, "লিন্ মিং-জু" (Lin Ming-Ju) ইনি ছিলেন পেয়ার্ উদ্যানেরই এক বালক শিক্ষার্থী।

গ্রীনরুমে এই সমস্ত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের যে "আইকন্" বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে তার সম্মুখেও ক্লাউনেরই সর্বপ্রথম গন্ধবাহী আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বিগ্রহের সম্মুখে এসে প্রত্যেক অভিনেতাকে অনুষ্ঠানের সুরুতে ও শেষে প্রণাম জানাতে হত।

৪। চতুর্থ শ্রেণীর চরিত্র হল অঙ্কিত-মুখ চরিত্র "ছিন" (Chin), এদের মুখে এত পুরু করে রং মাখানো হত যাতে তা মুখোশের মত দেখায়। এই শ্রেণীর প্রধান চরিত্র ছিল যোদ্ধার চরিত্র। তারা মঞ্চে যুদ্ধ এবং নানা রকম শারীরিক কসরত দেখাত। তাদের ঝকৃঝকে যুদ্ধ পোষাক এবং মোটা মেক্-আপের সঙ্গে একটি চমৎকার শিরস্ত্রাণ থাকত। তাদের প্রত্যেকটি আচরণ হত আভিজাত্যপূর্ণ ও প্রথাগত। উঁচু হিলের বুট দিয়ে তাদের উচ্চতাও বাড়ানো হত এবং সঙ্গে থাকত পতাকা, অস্ত্র ইত্যাদি। সব কিছু মিলিয়ে তাদের যুদ্ধ ও শক্তির মূর্তিমানরূপ বলে মনে হত।

অঙ্কিত-মুখ চরিত্রের মধ্যে আরো দু'শ্রেণীর চরিত্র ছিল "কালো রং করা মুখের" ভালো চরিত্র এবং "সাদা রং করা মুখের" খারাপ চরিত্র। এ ছাড়া ছিল নানান শ্রেণীর ও কিংবদন্তীর চরিত্র যেমন দৈত্য, দানব, উপদেবতা, পশু ও অর্ধমানব।

চীনদেশী নাটকের এই সমস্ত টাইপ্ চরিত্রগুলি যে সমস্ত বর্ণ, পোষাক ও মেক্-আপ ব্যবহার করত তাও ছিল প্রথাগত। তাদের পোষাক ও মেক্-আপ দেখেই দর্শকরা বুঝতে পারত এরা কোন চরিত্র এবং এদের আচরণ কি হবে।

দুষ্ট বা 'ভিলেন' চরিত্র পুরু করে যে মেক্-আপ লাগাত, সেই মেক্-আপের সাদা অংশের পরিমাণ দিয়ে সে কতখানি দুর্বৃত্ত তার পরিমাপ হত। লাল রং-এর মেক্-আপে বোঝাত উন্নত চরিত্র এবং রাজভক্তি। আর হালকা লালে এই গুণগুলিই কম পরিমাণে বোঝাত তা ছাড়া বার্ধক্যও বোঝাত। কালো রং-এর মেক্-আপ নিত যারা স্বল্পবুদ্ধি ও সোজাপথে এগিয়ে যেত। হলুদ রং ব্যবহার করত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশলবান চরিত্র। সোনা ও রূপা ছিল আভিজাত্যের রং—তা দেবতা ও পরীরা মুখে ব্যবহার করতেন। সবুজ ছিল দুষ্ট আত্মা ও শয়তানের বর্ণ।

আমরা ইতালীয় "কমেদিয়া দেল্ আর্তের" অভিনয়ে যেমন দেখি কতকগুলি টাইপ্ চরিত্রকেই ভিত্তি করে নাটক গড়ে উঠেছে, চীনের

ক্লাসিকাল নাটকের গঠন কৌশলও ছিল তেমনি। যদিও কমেদিয়া দেল্-আর্তের মত এর চরিত্রগুলি ব্যঙ্গ-চরিত্র ছিল না তবুও ঐতিহ্যগতভাবে চরিত্র, পোষাক ও আচরণ থেকে দর্শকরা অনায়াসে বুঝত যে তারা কারা এবং তাদের বক্তব্যই বা কি হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চীনদেশের নাট্য-সাহিত্য, তার গঠন-ভঙ্গি এবং চরিত্র পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম, এবার আমাদের দেখতে হবে এই শিথিল-গ্রন্থি, বাস্তব বিমুখ, প্রথানুগ, প্রায় শিশুর মনোরঞ্জনকারী নাটককে চীনদেশীয়রা কি রকম মঞ্চে রূপদান করতেন কি-ই বা ছিল তাদের মঞ্চোপকরণ আর কেমনই বা ছিল তাদের অভিনয় প্রথা।

ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির বা ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের গাম্ভীর্য ও গভীরতা চীনদেশের নাটকে ছিল না। তাদের নাটক ছিল অপরিণত, মনোহারী—পরীর গাথার মত রঙীন, কৌতূহলাবহ এবং কৌতুকাবহ। রূপকথা রাজ্যের এই ক্লাসিক্ নাট্য-শিল্প সর্বতোভাবেই প্রথার উপরে গড়ে উঠেছিল।

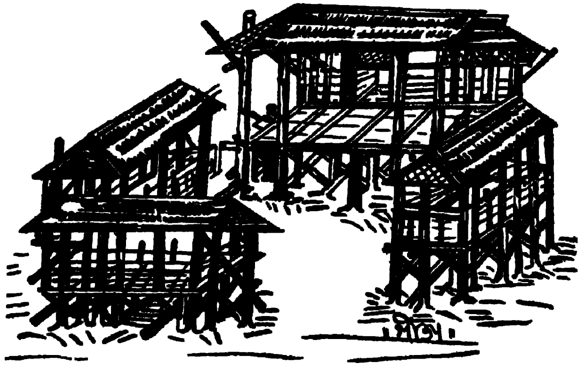
৬।৭ ঘণ্টা থেকে কখন বা ১২ ঘণ্টা পর্যন্তও চীনাদের এই অসংবদ্ধ কাহিনীর যে নাটক দেখানো হয় তা পাশ্চাত্য রুচির মানুষের কাছে যেমন অদ্ভুত তেমনি বিরক্তিকর। কিন্তু তারাও যদি সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্যসন্ধানী মন নিয়ে এই নাট্যাভিনয় দেখেন তবে অভিনয় শেষে কাব্যের এই জাদুদণ্ড এবং অত্যুজ্জ্বল মঞ্চসজ্জা সত্যই তাদের মনকে সম্মোহিত করে তুলবে।

॥ মঞ্চ ॥

চীনদেশের মঞ্চ এবং রঙ্গালয়কে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—প্রথম শ্রেণী হল চীনের ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদলের অস্থায়ী মঞ্চ; দ্বিতীয় শ্রেণী হল চীনের স্থায়ী ক্লাসিকাল রঙ্গালয়; তৃতীয়তঃ হল ইউরোপীয় ধারার নাট্যাভিনয়ের জন্য সম্পূর্ণ পশ্চিমী ধরনের মঞ্চ এবং চতুর্থ শ্রেণী হল আধুনিক লাল চীনের নাট্য প্রচেষ্টাকে রূপ দেওয়ার জন্য "ইয়াংকো থিয়েটার" (Yanko Theatre)।

চীনদেশের নাট্য রচনা এবং অভিনয়ের প্রাথমিক ধারা আমাদের ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। চীনের প্রাথমিক রঙ্গমঞ্চ ছিল এখানকার দেবমন্দিরগুলির অঙ্গন, নাট্যাভিনয় ক্রমশঃ মন্দির পরিত্যাগ করে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হাটে, মাঠে, বাটে, গ্রামে ও নগরে

ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রাম্যমাণ অভিনেতারদল অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের বাংলার যাত্রার মত জনসমাবেশ ক্ষেত্রগুলিতে অভিনয় দেখিয়ে আসছেন। এরা অস্থায়িভাবে যে রঙ্গমঞ্চটি গড়ে তুলতেন তার প্রধান উপকরণই হত বাঁশ ও মাদুর। এই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের নৌকো গ্রামের ঘাটে এসে দাঁড়াত, তারা যদি সেখানে কোন ফাঁকা মাঠ দীর্ঘদিন অভিনয়ের জন্য পেতেন, তবে সে মাঠে মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর মতই বাঁশ ও মাদুর দিয়ে একটি অস্থায়ী প্রেক্ষাগারও গড়ে তুলতেন।



চীন: বাঁশ ও মাদুরে তৈরী অস্থায়ী রঙ্গালয়।

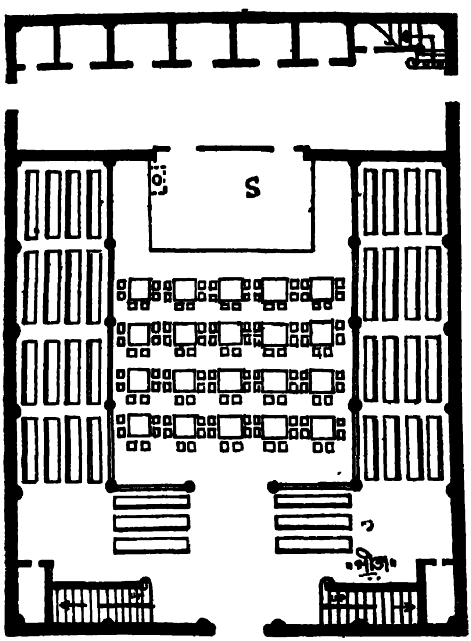
একদিকে বাঁশের মাচা বেঁধে একটি পাটাতন তৈরী করে রঙ্গমঞ্চ হত, তার দু'দিকে বাঁশের বেড়া এবং পেছনে সেই মাচারই একটা অংশ কেটে নিয়ে সাজঘর তৈরী হত। মঞ্চের সম্মুখে থাকত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ—এখানে দর্শকরা দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত। এই চত্বরের বাকি তিন দিক ঘিরেও থাকত বাঁশের পাটাতন এবং বাঁশের গ্যালারী। কিন্তু অভিনয় যখন কোন রাস্তার পাশে বা হাট বাজারে হত, তখন একটা তাঁবুর মত খাটিয়ে কেবল অস্থায়ী একটা মঞ্চই করা হত, তার সম্মুখে দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত, কখন বা কিছু বেঞ্চি পেতে দেওয়া হত। এই সমস্ত দর্শকদেরও একটা প্রধান অংশ ছিল অস্থায়ী, তারা ১২ ঘণ্টা ধরে অভিনয় দেখত না—অবকাশ মত হাট বাজারের পথে যেতে যেতে হয়তো দু'এক অঙ্ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত এবং চলে যেত আবার নূতন দর্শক-শ্রেণী সে জায়গা জুড়ে ফেলত। আর সেই সঞ্চরণশীল দর্শকদের মধ্যে চলত গল্প, গুজব, চা ও ধূমপান,

মারকাট কখনং বা তাস-পাশা পেটানো। সারা রাত ধরেই চলমান মানুষের চলার ক্ষণিক আনন্দ দিত এদের নাট্যাভিনয়। এই ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের রঙ্গালয় বলতে বোঝাত অভিনয়ের জন্য একটা বিশেষ ধরনের মঞ্চ (Platform) বা অভিনয় ক্ষেত্র। এই মঞ্চের সম্মুখ অংশ একেবারেই উন্মুক্ত হত, কোন রকম যবনিকার বালাই-ই থাকত না। একটানা আলোয় যাত্রার আসরের মত সমগ্র মঞ্চটি উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। মঞ্চে মঞ্চসজ্জার উপকরণ অর্থাৎ উইংস্, দৃশ্যপট বা কোন যান্ত্রিক কলা-কৌশল কিছুই থাকত না। এর নির্মাণ কৌশল ছিল একেবারেই সহজ, সরল এবং অভিনব, তবে এটা যে রঙ্গমঞ্চ তা বোঝা যেত। মঞ্চের পেছনের দেয়ালে দু'টো দরজা থাকত, বাঁ দিকের দরজা দিয়ে অভিনেতারা এসে মঞ্চে প্রবেশ করতেন, আর ডান দিকের দরজা দিয়ে তারা অপেক্ষা-গৃহে বা গ্রীনরুমে চলে যেতেন। চীনে স্থায়ী রঙ্গালয়ের চেয়ে ভ্রাম্যমাণ অস্থায়ী রঙ্গালয়ের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে মঞ্চ—রঙ্গগৃহেই হোক বা মুক্তাঙ্গনেই হোক, তার মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই রক্ষিত হত—তা হল উপরের একটা ছাদ অবশ্যই দিতে হবে। এই আচ্ছাদনটা সাধারণতঃ মন্দিরের অনুরূপভাবে অলংকৃত হত। রঙ্গালয় সর্বপ্রথম যে মন্দির প্রাঙ্গণেই গড়ে উঠেছিল এই আচ্ছাদন তারি স্মৃতি বহন করছে।

মঞ্চ শুধুমাত্র একটা প্লাটফর্ম হওয়ায় এবং তাতে উপকরণের বাহুল্য একেবারেই না থাকায় সেখানে অভিনয় শিল্পের প্রাধান্যই ছিল সর্বাধিক। মঞ্চের দৈন্য ঢেকে দিয়েছিল সমবেত সঙ্গীত, অভিনেতাদের শিক্ষিত কণ্ঠের উদাত্ত আবৃত্তি, তাদের নয়নগ্রাহী উজ্জ্বল পোষাক, বিভিন্ন অভিনয় উপকরণ এবং নাটকীয় কলাকৌশল। সবকিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য কাল্পনিক পরিবেশ গড়ে উঠত। সঙ্গীতশিল্পীরা মঞ্চের পেছন দিকে দুই দরজার মাঝখানে বসতেন। অভিনয়ে কথোপকথনের অংশ খুবই কম থাকত, বেশির ভাগই হত কাব্য উদ্ধৃতি। অভিনয় কৌশলও ছিল সম্পূর্ণ নাট্যধর্মী।

এই ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ থেকেই কালক্রমে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। চীনদেশে চা-পানের প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এবং তার সামাজিক মূল্যও যথেষ্ট ছিল। চা-খানায় তাদের ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের আনন্দ-বিতরণের জন্য মঞ্চ তৈরী করে নাট্যাভিনয় হতে থাকে। প্রথমে চা-এর জন্যই পয়সা নেওয়া হত—অভিনয়ের জন্য আলাদা প্রবেশমূল্য লাগত না।

ক্রমশঃ অভিনয়ই প্রধান হয়ে উঠল। চা-খানাগুলিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে উঠতে লাগল—কারণ প্রধান প্রধান নগরগুলির চা-খানায় দর্শকদের ভিড় সর্বদাই লেগে থাকত। তখন রঙ্গালয়ের নামই হল "চা-ঘর" চা-এর দোকানগুলিতেই অভিনয়ের টিকিট বিক্রি হত। অভিনয় দেখতে দেখতেই দর্শকরা আয়েস করে চা পান করত। এই পূর্বানুগ প্রথা এখনো চীনা-রঙ্গমঞ্চে চায়ের কাপে বজায় রয়েছে।



চা-ঘর থিয়েটারের নকশা।

চীনদেশের ক্লাসিকাল থিয়েটারের কেন্দ্রভূমিই ছিল পেপিং (Peiping) শহর, বর্তমান শতকেও পেপিংকে থিয়েটারের প্রধান পীঠস্থান বলা যায়। স্থায়ী রঙ্গালয় ছাড়াও এখানে মন্দিরে, রেষ্টুরেন্টে নাট্যাভিনয় হয়—এবং অসংখ্য ভ্রাম্যমাণদলও রয়েছে। পেপিং-এর অভিনেতারা যথেষ্ট সামাজিক সম্মানও পেতেন। বর্তমান কালে চীনের বহু ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চই আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইউরোপীয় স্থাপত্য-শৈলীতে পুনর্গঠিত হয়েছে। সাংহাই,

টিয়েনসিন্, ক্যানটন প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলিতেও বহু রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল, তা ছাড়া চীনের অভ্যন্তরের ছোটখাট গ্রামে এবং জনস্থানেও রঙ্গালয়ের দর্শন মিলত। স্থায়ী ও অস্থায়ী এই অসংখ্য রঙ্গালয়ের অস্তিত্বই প্রমাণ করে চীনের জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ছিল।

চীনা রঙ্গালয়ে প্রবেশ করতে গেলেই দূর থেকে শোনা যাবে কর্তালের ঝন্‌ঝন্ ঝংকার এবং "হু-ছিন্" (Hu Ch'in) বেহালার বিলম্বিত সুর। মাঝে মাঝে কাষ্ঠখণ্ডের সময় দ্যোতক ক্লাপ্, ক্লাপ্ শব্দ আর তারিমধ্যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধা অভিনেতার কণ্ঠস্বর। দর্শকরা এই সুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করত। ক্লাসিকাল রঙ্গালয়ের প্রবেশ দ্বারটিও কম আকর্ষণীয় হত না। প্রবেশ দ্বার ছিল উজ্জ্বল লাল এবং সবুজ রং করা— কাষ্ঠ নির্মিত। তার উপরদিকে টাঙ্গানো হত সোনার জলে লেখা নামের ফলক। পাশে সবুজ রং-এর পোষ্টারগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কালো কালিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে সেদিনকার 'প্রোগ্রাম' এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম লেখা থাকত। এই প্রবেশ দ্বারের পরে রয়েছে থিয়েটারের "লবি" বা প্রবেশ কক্ষ। প্রবেশ কক্ষের চারদিকের দেয়াল চিত্রাঙ্কণ বর্জিত, অত্যন্ত সাদামাটা কাঠের তৈরী হত, কিন্তু তাতেও বর্ণসম্ভারের অভাব ছিল না— গাঢ়লাল, পান্না-সবুজ, সাদা, কালো ইত্যাদি শুভ ভাগ্যসূচক বর্ণ দেয়ালের গায়ে প্রলিপ্ত থাকত। এই পুরাতন ঐতিহ্যবাহী যে সমস্ত রঙ্গালয় এখনো টিকে আছে—সংস্কারের অভাবে দীর্ঘ দিনের ছাপ ধরে তার এই বর্ণসম্ভার ক্রমশঃ মলিন হয়ে উঠেছে।

'লবি' পার হয়ে ঢুকতে হত মূল রঙ্গালয়ে। রঙ্গালয় আকারে খুব বেশি বড় হত না। মঞ্চের সম্মুখবর্তী একতলার মেঝেতে এবং তার তিন দিকের ঘুরানো গ্যালারীতে সব শুদ্ধ ৬।৭ শত দর্শক বসতে পারত। অভিনয় সুরু হত অপরাহ্ণ ৬টার সময় তারপরে চলত যতক্ষণ খুশী।

চীনের ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চ হত আয়তাকৃতি, তার উচ্চতা হত ৫´ ফুট। মঞ্চের প্রত্যেক দিকে প্রায় ২০´ ফুট উচ্চ লাল রং-এর বার্নিশ লাগান স্তম্ভ থাকত, তার উপরে থাকত চন্দ্রাতপ, তার গায়ে তীর্যকভাবে লাগান থাকত একটা কালো রং-এর ফলক, তার উপরে সোনার জলকরা অক্ষরে লেখা থাকত কাব্যলিপি। মঞ্চের খোলা দিক নীচু রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকত;

কিন্তু তা সত্ত্বেও খুদে বিচ্ছু ছেলেরদল এই রেলিং-এর উপরে উঠে বসত এবং বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে অবহেলা ভরে কিনারায় পা দোলাত।

রঙ্গালয়ের ছাদটা দো-চালা ঘরের চালের মত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই দিকে বড় বড় ভারি বাঁমের উপর দিয়ে ঢালু হয়ে যেত। ছাদের এই দু'অংশের মাঝখানে একসারি জানালা থাকত। দিনের বেলা এই জানালা পথে আলো এসে প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত করত আর রাত্রিবেলা ৪টি বড় বড় বর্ণহীন উজ্জ্বল গ্যাসের আলো মঞ্চের উপরে ও সম্মুখে জ্বেলে দেওয়া হত। মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহে টানা আলোই ব্যবহৃত হত কোন স্পটলাইট (Spot Light) কিংবা পাদপ্রদীপের আলোক থাকত না।

মঞ্চের সম্মুখদিকে প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জমিই সমতল এবং ফাঁকা, এই জমিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে তার মাঝে চতুষ্কোণ টেবিল এবং তাকে ঘিরে চেয়ার সাজানো থাকত। এই আসনগুলিই ছিল প্রেক্ষাগৃহের সবচেয়ে দামী আসন, অভিজাত এবং ব্যবসায়ীরা সেখানে বসত। তারা সেখানে বসে অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে দেখতে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপচারী করতে করতে চা পান ও মিষ্টান্ন আহার করতে থাকত। এই চত্বরের পেছন দিকে কতকগুলি বেঞ্চি পাতা থাকত, সেই বেঞ্চের পেছনে চার্চের বই রাখার তাকের মত হেলানো লম্বা তাক আটকানো থাকত, সেখানে স্বল্পবিত্ত দর্শকের জন্য রাখা হত চা-এর পাত্র এবং খাদ্যবস্তু। সবচেয়ে সস্তা দামের আসন ছিল মঞ্চের দু'পাশের সরু লম্বা বেঞ্চিগুলি। পেছনের গ্যালারীগুলি আবার বক্সে বিভক্ত ছিল, অতীতে এখানে মহিলাদের আসন নির্দিষ্ট থাকত কিন্তু এখন আর আলাদা বিভাগ নেই। অভিজাতদের আসনগুলিতে সাটিনের পোষাক পরিহিত ধনীরা বসত আর সাধারণ আসনগুলিতে নীল, কালো বা ধূসর বর্ণের সঙ্গে সৈন্যদের পোষাকের খাকি রং দেখা যেত।

মঞ্চ থেকে বহু রং-এর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে মনকে চকিত করে তোলে। মঞ্চের উপরে বিছানো থাকত গভীর নীল রং-এর "পিকিংরাগ্।" পেছনের দেয়াল ঢাকা থাকত উজ্জ্বল বর্ণের সিল্কের পর্দা দিয়ে—এই পর্দার গায়ে এম্ব্রয়ডারী করা থাকত কখন পীচ্ ও পামের পুষ্পিত শাখা, কখন মেঘের গায়ে ফিনিক্স পাখী। পেছনের দেয়ালে মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য যে দু'টি দরজা তাতেও এই ধরনের নকশা কাটা ছোট পর্দা ঝুলত। চারপাশের এই বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝে অভিনেতাদের পোষাকও হত অতি মূল্যবান এবং

বর্ণোজ্জ্বল। এমনকি যারা হাঘরে দরিদ্রের ভূমিকায় নামত তাদের দেহেও সিল্ক ও সাটিনের পোষাক থাকত। নাটক ও অভিনেতা যত উচ্চ শ্রেণীর হত এই পোষাকের সৌন্দর্য এবং ঔজ্জ্বল্যও তত বাড়ত। মঞ্চে যদিও কোন "সেট" বা দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন হত না কিন্তু যে চেয়ার টেবিলগুলিকে বিভিন্ন জিনিসের রূপক হিসেবে মঞ্চে ব্যবহার করা হত তাতেও পর্দা, চন্দ্রাতপ ও পোষাকের সমতুল্য অপূর্ব মূল্যবান এম্ব্রয়ডারীর কাজ করা আচ্ছাদন থাকত।

চারদিকের এই অত্যুজ্জ্বল বর্ণসম্ভারের মধ্যে অত্যন্ত পানসে, বিবক্তিকর, দৈনন্দিন জীবনের পোষাক থাকত সঙ্গীতকারীদের। এই অর্কেস্ট্রার স্থান ছিল মঞ্চের বাঁ দিকে।

যদিও দৃশ্যতঃ অর্কেস্ট্রার মধ্যে কাউকেই প্রধান বলা যেত না, কিন্তু তাদের মধ্যে যিনি কাঠের "ক্লাপার্" (Clapper) বাজিয়ে সময়ের তাল রাখতেন তিনিই সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং নৃত্যের ছন্দ বজায় রাখতেন বলে স্বতঃই একটা প্রাধান্য পেয়ে যেতেন। এই অর্কেস্ট্রার দলে ঝাঁঝর, কর্তাল, ড্রাম, গং, ট্রাম্পেট্, ফ্ল্যুট্, বেহালা ইত্যাদি বহুপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই থাকত। এরি মধ্যে আর একটি বৈচিত্র্য নিয়ে আসত একদল মানুষ যাদের দৈনন্দিন পোষাকে অত্যন্ত সংযতভাবে এবং নীরবে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এরা ছিল পরিচারক। মঞ্চের স্তম্ভের পাশেই দর্শকদের চোখের সম্মুখে তুলোর আচ্ছাদনে একটি বিরাট চা-এর পাত্র রয়েছে, পরিচারকরা প্রয়োজন অনুসারে যন্ত্র-চালিতের মত তা থেকে চা পরিবেশন করত। বিশেষ করে অভিনয়ের হালকা অংশে—অর্থাৎ যখন কমেডি বা হাস্যরসাত্মক ফার্সের অভিনয় চলতে থাকত তখন প্রেক্ষাগৃহে পরিচারকদের চা নিয়ে, খাবার নিয়ে, সুগন্ধী তোয়ালে নিয়ে চলত সর্বাধিক আনাগোনা। কিন্তু দর্শকদের কাছে এ এতই স্বাভাবিক যে তারা সামান্যতমও মনোযোগ দিত না ওদের অস্তিত্বের প্রতি। কেবল খুব ভাবগম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে পরিচারকদের আনাগোনা সাময়িকভাবে বন্ধ হত, দর্শকরা নিঃশব্দে, একাগ্রচিত্তে তখন দেখত অভিনয়।

কমেডির খেলো হাস্যরসের মধ্যেও এক এক সময় দেখা যেত কৌতূহলোদ্দীপক স্মরণযোগ্য কাহিনী-বিন্যাস। অভিনয়ও স্বাভাবিক গতি-পথে হয়ে উঠত অনেকটা লোকধর্মী দর্শকরাও একাগ্র হয়ে উঠত এই সমস্ত

দৃশ্যে। এমনিই এক কাহিনী হল—এক সাধারণ রঙ্গালয়ের গায়িকাকে বন্দী করে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে এক জঁাদরেল ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার সভায়। ম্যাজিস্ট্রেট নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন এবং ছলনা ভরে নীতিবাক্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কিন্তু বেচারি ম্যাজিস্ট্রেট ভুলেও ভাবতে পারেননি যে এই নগণ্য, সামান্য, অসহায় মেয়েটা বুদ্ধির জোরে তাকে এক হাটে বিক্রি করে অন্য হাটে কিনে আনতে পারে। মেয়েটা এবার চোখের জলে বলতে সুরু করল তার জীবনের বেদনাময় কাহিনী—কেমন করে এক তরুণ যুবককে সে তার নারী হৃদয়ের সব বিশ্বাস আর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিল—কেমন করে সেই যুবক তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছিল কল্পনার স্বর্গলোক, আর কেমন করেই বা সে তার সমস্ত প্রতিজ্ঞার জাল ছিন্ন করে অসহায় মেয়েটিকে সর্বনাশের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। শুনতে শুনতে বিচার সভার শ্রোতারা করুণায় ভরে উঠলেন, ম্যাজিস্ট্রেটও হুংকার ছেড়ে বললেন—"কে সেই অসভ্য, ইতর, এখনি তাকে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা ঢেলা ছুঁড়ে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।" মেয়েটি কোমল কণ্ঠে বলল, "মহামান্য মহাশয়—এই বিচার সভার অসংখ্য লোকের মধ্যেই সে উপস্থিত।" কর্তব্যপরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট আবার গর্জন করে উঠলেন, "কই, কে সে, দেখাও তাকে।" মেয়েটি তখন মৃদুহাস্যে হাত তুলে দেখিয়ে দিল স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটেরই আসন। বিচারালয়ের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। ফ্যাকাসে সাদামুখে ম্যাজিস্ট্রেট মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলেন। মামলা এখানেই খতম।

প্রাচীন কালে কিন্তু মঞ্চে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—কেবল বর্তমান যুগে এসেই তারা পুনরায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে ওই সুন্দরী, কোমলাঙ্গী, মাধুর্যময়ী নারীর ভূমিকায় একজন পুরুষ অভিনেতাই অভিনয় করতেন, কিন্তু তা পোষাকে, আচরণে, লাস্যে, ভাষ্যে এতই নিপুণ ও নিখুঁত হত যে তাকে কেউ পুরুষ বলে ভাবতেই পারত না। অতি শিক্ষিত পারদর্শী অভিনেতারাই থাকতেন নারীর ভূমিকায়, নারী চরিত্রের কঠিন মুহূর্তগুলোও তারা অবলীলাক্রমে পার হয়ে যেতেন, সুতরাং সমগ্র দৃশ্যের মধ্যে ছন্দঃপতনের কোন আশঙ্কা থাকত না।

॥ মঞ্চোপকরণ ॥

চীনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় পদ্ধতি মূলতঃই ছিল নাট্যধর্মী, অন্যদিকে তাদের মঞ্চের বিভিন্ন কলাকৌশল এবং উপকরণগুলি ছিল ইঙ্গিতধর্মী। কাহিনীর যে অংশ মঞ্চে দেখানো হত না—প্রথানুসারে আমাদের সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত কোন এক চরিত্র এসে গল্পের সেই সূত্র আবৃত্তি করে দর্শকদের বলে যেতেন। মঞ্চের উপরে বসেই অভিনেতারা তাদের ছোট-খাটো "মেক্-আপ" ও পোষাকের পরিবর্তনগুলি করে নিতে পারতেন। এমন কি পরিচারকরা যখন চা-এর গরম পাত্র নিয়ে মঞ্চে এসে অভিনেতাদের পান করতে দিত এবং অভিনেতারা পান করতেন, তখনও দর্শকদের কোন আপত্তি হত না। সৈন্যাধ্যক্ষেরা যখন মুখে লাল সাদায় মেশানো একটা অমানবীয় মেক্-আপ লাগিয়ে পিঠে কয়েকটা পতাকা গুঁজে উঁচু বুটের প্রচণ্ড শব্দ তুলে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক হুংকার তুলে, আস্ফালন করে যাতায়াত করতেন তখন তাকে প্রচলিত রীতি (নাট্যধর্মী) ভেবেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া হত। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষের নানান দৈহিক কসরৎ ও বিশেষ আচরণগুলির মধ্যেই ফুটে উঠত অপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিক বীরত্ব, আভিজাত্য এবং ভয়ংকরত্ব। চীন দেশের চরিত্র, পোষাক, আচরণ সবকিছুই যেন হত বিশেষ গুণগুলি তুলে নিয়ে "স্টাইলাইজেশন্" (Stylization) করে সৃষ্টি করা।

ছবির ফ্রেমের মত প্রোসীনিয়ামে বাঁধানো ইউরোপীয় ধারার মঞ্চ চীনের ছিল না। কোন দৃশ্যাবলী রচনা দ্বারা বাস্তবের অনুরূপ পরিবেশ বা ভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস ক্লাসিকাল চীন করেনি। চীনের মঞ্চে স্থাপত্য জটিলতা বিশেষ কিছুই ছিল না। অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মতই নিরাভরণ হত। তবুও চীনদেশের ক্লাসিকাল নাটকের স্থান, কাল, পাত্র পরিবেশ রচনার এক নিজস্ব ধারা ছিল। এজন্য সেখানে বহুরকম মঞ্চের উপকরণ বা স্টেজ প্রপার্টিস্ (Stage Properties) যাকে মঞ্চের ভাষায় "প্রপ্স্" (Props) বলে, তার ব্যবহার ছিল। তাছাড়া প্রথাগত আচার, আচরণ ও অভিনয়-শিল্প তো ছিলই—এরই দ্বারা চীনের নাট্যশিল্পীরা দর্শকদের কল্পলোক উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন এবং তাদের রসের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করতেন। মঞ্চের ঠিক পিছনে থাকত তাদের গ্রীনরুম। সেখানে মঞ্চের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বাক্স-পেটরা, পোষাক, পরিচ্ছদ, মেক্-আপের তেল রং (Grease Paint), তুলি ইত্যাদি থাকত।

মোটের উপর এটাই হল বাস্তব সত্য যে চীনদেশীয় নাটকের সার্থকতা দর্শকদের কল্পনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল ছিল। চীনদেশের মঞ্চোপকরণের মধ্যে ছিল কয়েকখানা মূল্যবান সিল্কের পর্দা, মেঝেতে পাতবার জন্য একখানা চিত্রিত রাগ্, কয়েকটা চেয়ার-টেবিল আর বাঁশের তৈরী ছোট-খাট জিনিস। এই নিয়েই চীনের অভিনেতারা এবং "প্রপার্টিম্যান্" (Property Man) হঠাৎ এক জাদুর খেলার মতই তৈরী করে ফেলত—হয়তো পুষ্পভারাবনত চেরি-গাছের শাখা বা কোন হ্রদের বুকে নৌকো ভেসে যাওয়ার এক কোমল, গ্রাম্য চিত্র। আর এগুলো এতই স্পষ্ট, সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য হত যে বহু বৈজ্ঞানিক উপকরণ নিয়েও দক্ষ কোন মঞ্চশিল্পী এতখানি সুকুমার দৃশ্য রচনা করতে পারতেন না। ছোট ছোট করে কাটা সাদা কাগজের টুকরো যখন প্রপার্টিম্যান্ মুঠো মুঠো তুলে উপর দিকে ছুঁড়ে দিত, তখন তা সত্যাই মনে বরফ ঝড়ের ভ্রম জন্মাত। একটা বাঁশের ফ্রেমে পর্দা ঝুলিয়ে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দর্শক নয়ন সম্মুখে মুহূর্ত মধ্যে তৈরী করে ফেলা হত শয়নাগার, আর মঞ্চের সমস্তগুলি আলো থাকা সত্ত্বেও সেই শয়নাগারের জলন্ত মোমবাতিটি যখন নিবিয়ে ফেলা হত তখন দর্শকরা অনায়াসেই বুঝত যে রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। মঞ্চে সৈন্যাধ্যক্ষ একাই তার সমগ্র বাহিনীটি কাঁধে বহন করে নিয়ে আসতেন। সৈন্যাধ্যক্ষের পেছনে একটি পতাকা গোঁজা থাকলেই তাতে ১,০০০ সৈন্যের উপস্থিতি বোঝাত। অতএব দর্শকরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই মনে মনে গুণে ফেলত ক'খানা পতাকা আসছে। বুঝতে কোন অসুবিধা হত না কত হাজার সৈন্য অধ্যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করেছে। হয়তো কোন চরিত্র হাতে একখানা দাঁড় নিয়ে শূন্যে ছন্দোবদ্ধভাবে বাইতে বাইতে মঞ্চে আসত, তখন জলের উপর নৌকো বেয়ে যাওয়ার পূর্ণ, মধুর দৃশ্যখানি চোখের সম্মুখে সহজেই ফুটে উঠত। কখন কখন দৃশ্যের উপকরণগুলি আর একটু বাস্তবানুগ হত। প্রপার্টিম্যান্ এসে দু'টো বাঁশের খুঁটির উপরে আড়াআড়িভাবে বাঁশ বেঁধে, সিল্কের পর্দা ঝুলিয়ে চমৎকার রাজসভা তৈরী করে ফেলত। কিংবা দেখা যেত মঞ্চের উপর অঙ্কিত ইটের পাঁচ ফুট দেয়াল এবং সংলগ্ন তোরণ এনে দাঁড করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর সৈন্যাধ্যক্ষ এসে বিস্তৃতভাবে অভিনয় করে গেলেন একটা নগরী অবরোধ করবার এবং তা অধিকার করবার। নগর দেয়ালের অভ্যন্তরে যদি সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখাতে হত তবে দর্শকদের চোখের সম্মুখেই একটি টেবিল

এনে দেয়ালের পেছনে রাখা হত, তার উপরে বসানো হত একটি চেয়ার —এই চেয়ারে উঠে যখন সেনানায়ক বসতেন তখন দর্শকরা তাকে নগর অভ্যন্তরে দেখতে পেত। দৃশ্য শেষ হলে প্রপার্টিম্যান্ মানচিত্রের মত দেয়ালটি গুটিয়ে নিয়ে যেত। এবার হয়তো টেবিলটা মাঝখানে রেখে তার দু'পাশের চেয়ার এম্ব্রয়ডারী করা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে হয়ে গেল মন্ত্রণা-কক্ষ।

নাট্যপ্রথা অনুযায়ী চীনা ক্লাসিকাল মঞ্চের পাহাড় ও নদীর দৃশ্যও অনেকটা দেয়ালের দৃশ্যের মতই টুকরো টুকরো পর্দার গায়ে অঙ্কিত থাকত। বাস্তবের অনুরূপ হিসেবে তারা মঞ্চে কখন পুরো একটি সেট বা দৃশ্য রচনার প্রয়াস করতেন না—সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যেই কাজ সারতেন। হয়তো পাহাড় অঙ্কিত স্ক্রীনটি কোন এক টেবিল বা চেয়ারের উপর প্রয়োজন মত তুলে দাঁড় করান হত—তাতেই বোঝা যেত অভিনয়-ক্ষেত্রটি কোন এক উচ্চভূমি। রথারূঢ় কোন ব্যক্তি যখন মঞ্চে ঢুকত তখন তার সম্মুখে দু'জন প্রপার্টিম্যান্ থাকত, এদের হাতে থাকত বর্গাকৃতি রথচক্র অঙ্কিত দু'খানা ছোট ছোট পতাকা—পতাকা দু'খানি ধরা থাকত ভূমির সমান্তরাল-রেখায়, তাতেই বোঝা যেত রথচক্র এগিয়ে চলেছে।

মঞ্চে জলের ঢেউ এবং মাছ অঙ্কিত পতাকা আনলে বোঝা যেত সেটা কোন সমুদ্র বা বড় নদীর দৃশ্য। যদি কোন নাটকীয় চরিত্র ডুবে মরতে চাইত তবে সে ওই পতাকারূপী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। আর প্রপার্টি-ম্যান্রা তাকে তাড়াতাড়ি পতাকা দিয়ে ঘিরে দাঁড়াত তখন সব ক'জন মিলে খুব তাড়াতাড়ি মঞ্চ ত্যাগ করে যেত। যুদ্ধের শেষে যদি কেউ পরাজিত হত বা মৃত্যু বরণ করত তবে তার মঞ্চে পড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হত না, সে দৌড়ে নিজেই প্রস্থান করত। বিজয়ী বীরও তার পশ্চাতে অস্ত্র আস্ফালন করে সদর্পে প্রস্থান করতেন। এদিকে কোরাস সঙ্গীতকারীরা তখন প্রচণ্ড শব্দে ঝাঁঝর ও ক্লাপার বাজিয়ে চলতেন। সমগ্র দৃশ্যটি আমাদের মানসচক্ষে যতখানি হাস্যকর মনে হচ্ছে, চীনদেশীয় দর্শকদের কাছে তা মোটেই হাস্যকর ছিল না, তারা এ ধরনের দৃশ্যে বিসদৃশ কিছুই দেখত না।

চীনের রঙ্গমঞ্চে একটি টেবিল এবং দু'টি চেয়ার ছিল একেবারেই অপরিহার্য অঙ্গ। মঞ্চের উপর মাত্র একটি চেয়ার বসিয়ে একটি কারাগারের দৃশ্য রচনা করা যেত। চেয়ারটা ঘুরিয়ে মঞ্চে পাতা হত, চেয়ারের পেছন দিক্কার হেলান দেওয়ার কাঠের টুকরোগুলি থাকত দর্শকদের দিকে,

বসবার অংশটা থাকত পেছনে, বন্দী চেয়ারে উল্টে বসে, কাঠের টুকরো গুলোর ফাঁকে ফাঁকে—গারদের ফাঁকে কয়েদির মত উঁকি মারত। আবার একটা চেয়ারকে একটা কুয়ো বলেই হয়তো কল্পনা করা হত। কোন অভিনেতা যদি গল্পাংশ অনুযায়ী এই চেয়ারের উপর লাফ দিয়ে উঠে সেই উঁচু থেকে তার অপর দিকের নীচুতে অনেক গভীরে লাফ দেওয়ার মত ভঙ্গি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত প্রস্থান করত, তাতে ধরে নেওয়া হত সে কুয়োর জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

কোন নগরী শত্রু পরিবৃত হয়েছে বোঝাতে হলে তার অধিবাসীরা মঞ্চে পরস্পর পরস্পরকে বিপরীত দিক থেকে পরিক্রমা করত। এদের পশ্চাদ্‌পট হিসেবে থাকত নগরপ্রাচীর। সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা বোঝা যেত পরিচারক ক'খানা পতাকা বহন করছে তা থেকে।

কালো পতাকা ছিল ঝড়ের বিজ্ঞাপক। চারজন অভিনেতা অথবা প্রপার্টিম্যান্ যদি এই কালো পতাকা হাতে নিয়ে মঞ্চের এক দিক থেকে অন্য দিকে দৌড়ে পার হয়ে যেত, তবে দর্শকরা বুঝত প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। চীন দেশের ঘোড়া মঞ্চে আসত না, আসত কেবল তার চাবুকটা। তিন ফুট লম্বা একটি চাবুক তার গায়ে সিল্কের চারটি ট্যাসেল সমান দূরত্বে বাঁধা থাকত, এই চাবুক মঞ্চে অনেক সময়ই দেখা যেত, এটিই ছিল ঘোড়ার প্রতীক। কোন অভিনেতা ডান হাতে এই চাবুক নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলে দর্শকরা অনায়াসে বুঝে ফেলত—সে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। এই চাবুকের সঙ্গে অবিশ্যি তার দেহ-ভঙ্গিও যুক্ত হত। পা তোলা এবং পা ফেলা থেকে বোঝা যেত সে ঘোড়ায় চেপে আছে, আবার যখন হাঁটু মুড়ে বসত তখন বোঝা যেত সে ঘোড়া থেকে নামল। এরপরে অভিনেতা যখন চাবুকটা মঞ্চের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিত, তখন সে ঘোড়াটাকে চড়ে বেড়াতে ছেড়ে দিত। মঞ্চে তাদের নৌকোর প্রয়োজন হত না। একখানা দাঁড় দিয়েই মঞ্চে তারা নৌকো বাওয়ার সমস্ত আচরণগুলি দেখিয়ে যেতে পারত।

হলুদ রং-এর স্ক্রোল্ করা কাগজে রাজ-আজ্ঞা বোঝাত। হলুদ রং-এর সিল্কে মোড়া একখানা কাঠের টুকরো মানে ছিল রাজকীয় সীল।

বস্তুতঃ তাদের সমগ্র আচরণই ছিল নাট্যধর্মী। কোন চরিত্র যদি মরে যেত, তবে সে মুহূর্তের জন্য মঞ্চে পড়ে গিয়ে উঠে মঞ্চ থেকে ছুটে পালাত। একজন পরিচারক এরপরে একটি গোলাকৃতি বস্তুতে লাল

কাপড় জড়িয়ে এনে সেই মৃত ব্যক্তির ছিন্ন মুণ্ডের বিকল্প হিসেবে মঞ্চে দেখাত। এ ছাড়াও পরিচারক হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নানান দৈত্য, দানবের ক্রিয়াকলাপ দেখাত।

॥ প্রপার্টিম্যান্ ও চীনদেশীয় অভিনয় রীতি ॥

চীনের রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় কৌশল সম্পর্কে এতক্ষণ যে বিশদ বর্ণনা দেওয়া গেল তার মধ্যে অভিনবত্বে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ প্রপার্টিম্যানের অস্তিত্ব। চীন এবং চীনের প্রভাবে সৃষ্ট জাপানী রঙ্গমঞ্চের এক অত্যাশ্চর্য অবদান এই প্রপার্টিম্যান্। এক বা একাধিক প্রপার্টিম্যান্ মঞ্চে সর্বদাই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—মঞ্চের উপকরণগুলি সাজাচ্ছে, সরাচ্ছে, অভিনেতাদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে রয়েছে, কিন্তু এমনি অদ্ভুত যে দর্শকরা তাদের দেখতে পাচ্ছে না। এই প্রপার্টিম্যানেরা কালো কিংবা গভীর নীল রং-এর সর্বদেহ আচ্ছাদিত বোরখার মত একটা পোষাক পরত এবং প্রয়োজন মত মুখে মুখোশ লাগাত। রূপকের দিক থেকে ধরে নেওয়া হত যে দর্শকরা তাদের দেখতে পাচ্ছে না। অতি বাস্তবধর্মী আধুনিক নাটকেও আমরা অনেক সময় নাট্যধর্মীতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই—নাটকের স্বগতোক্তিই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে স্বগতোক্তি প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শক শুনতে পাচ্ছে, মঞ্চের উপরের অভিনেতার পার্শ্ববর্তী একটি অবাঞ্ছিত চরিত্রই হয়তো তা শুনছে না। চীনের রঙ্গমঞ্চে “ফ্রন্ট কার্টেন্” বা সম্মুখ যবনিকার অস্তিত্ব না থাকায় মঞ্চের খুঁটি-নাটি দৃশ্য পরিবর্তনও দর্শকদের চোখের আড়ালে করা যেত না। অতএব মঞ্চের সাহায্যকারী এই ‘প্রপার্টিম্যান্’ ও তার সহকারীদের দর্শকরা নাট্যধর্মী প্রথানুযায়ীই একেবারে দেখতে পেত না—এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে দর্শকদের কিছুমাত্রও উদ্বেগ ছিল না। প্রপার্টিম্যান্ এবং তার সহকারীরাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল মঞ্চের জাদুকর। তারা মুহূর্তমধ্যেই সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারত। তাই ধ্রুপদী যুগ থেকেই এদের উপস্থিতি বজায় রয়েছে। চীনের ভ্রাম্যমাণ অস্থায়ী মঞ্চেও এই প্রপার্টিম্যান্‌রা রয়েছে বলেই অতি স্বল্প উপকরণেও তারা অলৌকিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। এই প্রপার্টিম্যান্ হয়তো বাজী পুড়িয়ে বুঝিয়ে দিত যে মঞ্চের পরবর্তী আগন্তুক চরিত্র একজন স্বর্গবাসী আত্মা। অথবা সে হয়তো একটা চেয়ার পেতে বুঝিয়ে দিত একটা পাহাড়, যার উপর দিয়ে নায়ক বহু কষ্টে

বেয়ে উঠবার অভিনয় দেখাত। কিন্তু দৃশ্য যেখানে সম্পূর্ণ কাব্যিক সুরে গাঁথা হত সেখানে প্রপার্টিম্যান্ কখনই মাথা গলাত না।

অভিনেতারা এই সামান্য উপকরণগুলির সঙ্গে এমনভাবেই একাত্ম হয়ে অংশ গ্রহণ করতেন যেন সেগুলি সকলই বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব। এমন কি কোন উপকরণ না থাকলেও তাদের নিখুঁত অভিনয়ে বক্তব্যটি দর্শকের চোখের সম্মুখে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতেন। অভিনেতা একটার পর একটা পা মেঝে থেকে তুলে ওঠার ভঙ্গি করে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা বোঝাতেন। আবার মঞ্চের উপব কয়েকবার পাক খেয়ে তারা পিকিং থেকে তিব্বতের দূরত্ব অতিক্রম করতেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে মুখেও ঘোষণা করে বলে দিতেন, এখন কোথায় এসে পৌঁছেছেন। তেমনই হয়তো এক অলীক জলাশয়ে হাত ধুয়ে নিতেন, বাঁশের পুলটা ধীরে ধীরে পার হতেন কিংবা মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলে পড়তেন।

চীনদেশের মঞ্চের উপকরণগুলি নগণ্য তুচ্ছ হলেও, অভিনেতাদের অঙ্গেব পোষাক এবং অভিনয় কৌশল মোটেই তুচ্ছ হত না। চৈনিক নাট্য-শিল্পেব বহিরাবরণের একটা অত্যুজ্জ্বল দিকই ছিল তাদের পোষাক। তাদের একটা দলের পোষাক পরিচ্ছদের মূল্য কোন পশ্চিমী অভিজাত দলের তুলনায় অনেক বেশি হত। একটা সামান্য চরিত্রও রাজকীয় পরিচ্ছদ পরত। একটা ভিখারীর অঙ্গেও থাকত সিল্কের সজ্জা, আর উঁচুদরের চরিত্রের তো কথাই নেই, তাদের জাঁকজমক ও চাকচিক্য চোখ ঝলসান হত। একটি কল্পনা বিলাসী রোমান্টিক পরিবেশের সাজ পোষাকে ও মেক্-আপে তারা বাস্তব বস্তুর চমক লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু এখানেও তারা বাস্তবকে ছাড়িয়ে দর্শকের মনকে কল্পনা প্রয়াসীই করে তুলতেন, কারণ ভিখারীর মূল্যবান সিল্কের পোষাকটা বাস্তব উপকরণ হলেও, স্বয়ং ভিখারী চরিত্রটি মোটেই বাস্তববাদী হয়ে উঠত না।

চীনদেশের নাটক যেমন উন্নত ধরনের নাটকীয় গুণ-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি, তেমনি অন্যদিকে তাদের মঞ্চোপকরণও ছিল নগণ্য— চীনদেশের অভিনেতারাই তাদের নাটক এবং মঞ্চের সমস্ত দৈন্য আবৃত করে রাখতেন। এইজন্যই অভিনেতাদের সুদীর্ঘকাল ধরে অভিনয়-বিদ্যার শিক্ষানবিশী করতে হত। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করে অভিনেতারা এই বিদ্যা অধিগত করতেন। চীনের অভিনেতার ইউরোপীয় ধরনে মঞ্চের

উপর পড়ে সাময়িকভাবে মরে যাওয়ার বিদ্যেটা শিখলেই কেবল চলত না। অভিনেতাকে এমনভাবেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হত যে তিনি যেমন পূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে মঞ্চের উপর পড়ে মরতেন, তেমনি আশ্চর্য শৈল্পিক কৌশলে অবনত দেহে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন। তার প্রস্থান দেখে দর্শকদের এটাই শুধু প্রতীয়মান হত যে—দেহটা বুঝি চারজন বাহক বহন করে নিয়ে গেল। অনেক সময় যুবকদের তাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির নারী চরিত্রে অভিনয় করতে হত—আর তখন তাদের ফুটিয়ে তুলতে হত নারীদেহের সুকোমলতা ও সৌন্দর্য। এমন কি চীন দেশীয় মেয়েদের পা ছোট করে রাখবার পীড়াদায়ক ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহ পাদুকা ব্যবহার করেও তাদের স্বচ্ছন্দে চলা অভ্যাস করতে হত। অষ্টাদশ শতকের এক আইনে অভিনেত্রীরা চীনের রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কারণ তখন এক সম্রাট স্বয়ংই এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করে ফেলেছিলেন। বলতে গেলে তারপর থেকে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত পুরুষই নারী ভূমিকায় অভিনয় করে আসছে। চীনদেশের বর্তমান শতকের প্রখ্যাত অভিনেতা "মেই-ল্যান্-ফং" (Mei Lan Fang) এর প্রধান গৌরবই হল নারী চরিত্রে অত্যাশ্চর্য অভিনয় করা। ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যের ক্লাসিকাল অভিনয় শিল্পে জীবনের যথাযথ অনুকরণ ছিল না, অভিনেতারা ছিলেন আঙ্গিকে সুশিক্ষিত স্রষ্টা ও শিল্পী, তাই অতি স্বল্প উপকরণেই তারা দর্শকদের মনে প্রকৃত পরিবেশের ও বস্তুর অনুভূতি টেনে আনতে পারতেন।

ইউরোপীয় রঙ্গালয়ে যেমন একজন স্বাভাবিক ক্ষমতাশালী শৌখিন অভিনেতাও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে স্বচেষ্টায় সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন চীনের রঙ্গমঞ্চে তা সম্ভব নয়। সেখানে যতবড় প্রতিভাশালী শিল্পীই হোক তাকে সুদীর্ঘকাল মঞ্চে শিক্ষানবিসি করতেই হবে। এজন্য অবশ্য তাদের সুগঠিত নাট্য শিক্ষালয় ছিল না কিন্তু অল্প বয়সেই তাদের রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসতে হত এবং অন্তত: ছয় কি সাত বছর কোন বড় অভিজ্ঞ অভিনেতার কাছে শিক্ষানবিস হয়ে থেকে রঙ্গালয়ের সমস্ত নিয়ম, কানুন, প্রথা ও অভিনয় কলা শিখতে হত—তারপরে দীর্ঘকাল ধরে সাবলীল প্রকাশ কৌশল ধৈর্য ধরে অভ্যাস করতে হত। তাই মঞ্চে আসতে হত বালক বয়সে, শিক্ষাশেষে পরিণত বয়সে সুযোগ পেতেন অভিনয়ে বড় অংশ গ্রহণের। তাদের অভিনয় বাস্তবানুগ না হওয়ায় এবং সব কিছুই নাট্যধর্মী প্রথায় বাঁধাধরা থাকায়

অভিনেতার পক্ষে স্বয়ং শিল্পী হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। মঞ্চে তাদের আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়-পদ্ধতি প্রায় সমস্তই ছিল নিয়মের ছকে বাঁধা। যেমন মঞ্চে হাসির বিভাগই হল কুড়িটি—প্রতিটি হাসির অভিব্যক্তি এবং তাৎপর্যও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কখন "সুখের হাসি" কখন "ঠাণ্ডা হাসি" কখন হেঁ হেঁ করা "মোসাহেবি হাসি" কখন "অস্বস্তিকর হাসি" কখন বা "পাগলের হাসি" আবার যদি "ভয়ংকর হাসি" হাসতে হত অভিনেতা দু'হাত উর্ধ্বে তুলে সজোরে তিনবার হেসে উঠতেন।

এই জন্য যারা শিক্ষানবিস তাদের অভিনয় শিক্ষার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের চর্চাও করতে হত—এছাড়া তাদের নৃত্য এবং নানান শারীরিক কসরৎ শিক্ষা করতে হত। বিশেষ করে তাদের শিখতে হত হাত, উর্ধ্ববাহু, পা, দেহ, কোমর ইত্যাদির বিভিন্ন প্রকার সাবলীল সঞ্চালন। চীনের ক্লাসিকাল অভিনেতাদের জামার হাতাটা লম্বা এবং ঝোলানো হত। এই জামার হাতা দিয়ে তারা বহুরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন। এক মেয়েদের জামার হাতাই পঞ্চাশ রকম নৃত্য ভঙ্গিতে ঘোরানো যেত, আর তার অর্থও হত ভিন্ন ভিন্ন। এই হাতার বিভিন্ন ভঙ্গির বিভিন্ন নামকরণও রয়েছে। অভিনয়কালে জামার হাতায় জলের ঢেউ-এর মত বিভিন্ন ভাব দ্যোতক তরঙ্গের সৃষ্টি হত।

নাটকের খানিকটা অংশ তারা শুধু প্যান্টোমাইম্ বা নির্বাক দৈহিক ভঙ্গির সাহায্যেই অভিনয় করতেন। মঞ্চের উপর দিয়ে নৌকো বেয়ে আসা ছিল একটি চমৎকার মূকাভিনয়ের দৃশ্য। হয়তো কোন জেলে হাতে দাঁড় নিয়ে নৌকো বাওয়ার ভঙ্গিতে তা ফেলতে ফেলতে মঞ্চে এসে ঢুকল। তখন সত্যিই মনে হত, সে যেন নৌকো চড়েই আসছে। মঞ্চের মাঝখানে এসে সে দাঁড়টা নামিয়ে মঞ্চের উপর রেখে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামল। তারপরে সে কল্পিত দড়ি টেনে নৌকোকে পাড়ে এগিয়ে নিয়ে এল এবং গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ফাঁস দিয়ে তরীটি বেঁধে ফেলল। এরপর সে তার অভিনয় শেষ করে সেই কল্পনার নাও-এ করে যখন ফিরল—তখন নিখুঁত ভঙ্গিতে লাফিয়ে নৌকায় উঠল এবং হাঁটু নীচু করে পা ফাঁক করে অপূর্ব কৌশলে ভারসাম্য রক্ষা করল, নীচু হয়ে তুলে নিল দাঁড়টা কিংবা প্রপার্টিম্যান্ই এসে সেটা তুলে দিল তার হাতে—জেলে দাঁড় বাইতে বাইতে ফিরে গেল।

চীনে সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও ক্লাসিকাল যুগে মাঞ্চু সম্রাট এবং অভিজাতদের প্রাসাদেও অভিনয় অনুষ্ঠান হত। পেপিং-এর মাঞ্চু রাজ-প্রাসাদে উন্নতশ্রেণীর মঞ্চ-স্থাপত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। কোন কোন জায়গায় একটা মঞ্চের উপরে দোতালার মত আর একটা মঞ্চও গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের মঞ্চে, নীচের অংশে মরণশীল মানুষরা অভিনয় করতেন, আর উপরের অংশে অভিনয় করতেন দ্যুলোকের অধিবাসীরা। কখন হয়তো মঞ্চে পরপর তিনতলা পর্যন্তও দেখা যেত। এর সর্ব নিম্ন তলায় মাটির নীচে "পাতালপুরী" জগতের অভিনয় হত।

সাধারণ রঙ্গালয়েও থং বংশের সম্রাট মিং হুয়াং-এর ঐতিহ্য বরাবর রক্ষিত হয়েছে। মঞ্চের যে অংশে অর্কেস্ট্রা বসে এখনো তাকে বলা হয় "ন'টা ড্রাগনের প্রবেশ পথ" (Nine Dragon Entrance) এই নয় ড্রাগন, সম্রাট মিং হুয়াং-এরই প্রতীক চিহ্ন। তিনি মঞ্চের যে অংশে বসে সঙ্গীত পরিচালনা করতেন সেই আসনের গায়ে ন'টা ড্রাগন খোদিত থাকত। প্রত্যেক অভিনেতা অর্কেস্ট্রার পার্শ্ববর্তী ডান দিকের পথেই ঢুকতেন এবং মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে মহামান্য সম্রাটের আসনের সামনে থেমে তাঁকে প্রণতি জানাতেন। হয়তো বা সেই সময় সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষণিকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতেন। বর্তমান কালে যদিও অর্কেস্ট্রা এই নির্দিষ্ট স্থানে সর্বদাই বসে না, তবুও অভিনেতারা সর্বদাই এই পথে প্রবেশ করেন এবং ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে প্রণতি জানান। এই স্থির-ভঙ্গি প্রদর্শন অভিনেতাদের বিশেষ সহায়ক হয়েই উঠেছে—কারণ দর্শকদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তখন তার উপর এসে পড়ে ফলে তার বিশেষ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়।

চীনের ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চে বর্তমান যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। সেখানে ব্যক্তিচরিত্র ছিল সম্পূর্ণ অনাদৃত, চরিত্রগুলি হত সামাজিক শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন নিদর্শন স্বরূপ। তারা নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে চলত—দেবতা কিংবা রাজকর্মচারীরা গ্রীসের "দেউস্-একস্ ম্যাখিনায়" চরিত্রের আবির্ভাবের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

নাট্যশিল্প চিরকালই সমাজের প্রতিরূপ। চীনের মঞ্চে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তর বিভাগ পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গে অনুবন্ধিত

রয়েছে দার্শনিক কন্‌ফুসিওর প্রবর্তিত জীবনাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব। তারা বিনা দ্বিধায় দেবতা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার আবির্ভাবে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত সম্রাটকে দৈব প্রতিভূ এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে। জীবনের এই বিশ্বাস-গণ্ডির মধ্যেই চীনের ক্লাসিকাল নাটক এক অতি উচ্চস্তরের শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

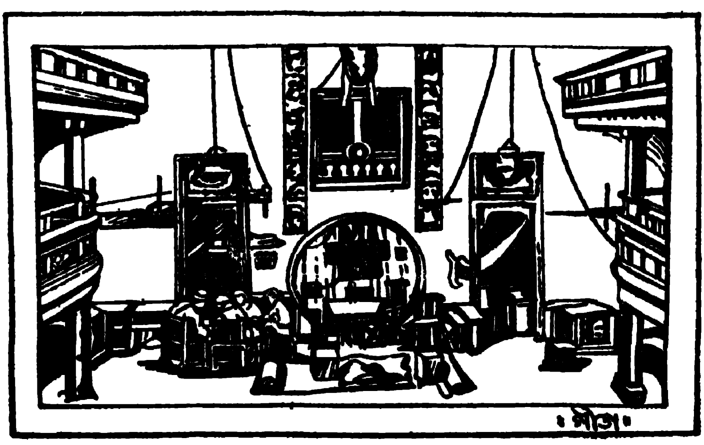
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে চীনের এই সমাজ ও জীবন-বোধের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। হাল আমলের বুদ্ধিজীবী সমাজতান্ত্রিক মানুষের রুচিতে এটা শুধু এক প্রাচীন রীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই চীনের শিক্ষিত মানুষ নাটকের মধ্যে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ চেয়েছে। এইজন্য এযুগের সমাজতান্ত্রিক চীন ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে "ইয়াংকো" ধারার নাটকের মাধ্যম গ্রহণ করেছে। এরই সাহায্যে চলমান যুগের ভাবধারাকে তারা অনুসরণ করতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চ কোথাও কোথাও নামে মাত্র টিকে থাকলেও, প্রকৃতই আজ তা জাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

॥ ইউরোপীয়করণ ॥

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে চীনের বহু ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য জাপানে যেত। জাপান তখন ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিজেদের সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য প্রবলভাবে অনুসরণ করে চলেছে, চীনের প্রবাসী ছাত্ররাও তার সংস্পর্শে আসে এবং সেখানেই তারা ইউরোপীয় নাট্যশিল্প জানবার সুযোগ পায়। তারা স্বদেশে ফিরে এসে পিকিং শহরে "স্প্রিং উইলো ড্রামাটিক্ সোসাইটি" (Spring Willow Dramatic Society) নামে পশ্চিমী ধারার এক নাট্যসংস্থা গঠন করে, ক্রমে এক নূতন রঙ্গালয় স্থাপিত করে ইউরোপীয় তথা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বদেশী নাটক প্রদর্শন করতে লাগল।

এই ইউরোপীয় রীতির নাটক চীনের সাধারণ দর্শকমণ্ডলী গ্রহণ করল না কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নূতন রীতি সাগ্রহে বরণ করে নিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি শৌখিন সম্প্রদায় আধুনিক ধরনের রঙ্গালয় গড়ে তুলল এবং একে সামাজিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পন্থা হিসেবে বেছে নিল। বুদ্ধিজীবী ছাত্রদল এই আধুনিক ভাবধারা যত সহজে গ্রহণ

করল সাধারণ লোক তা পারল না কিন্তু বিভিন্ন শৌখিন নাট্যসংস্থা চুপ করে রইল না, তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল সাধারণের মধ্যেও এই নবরীতি প্রচারের জন্য, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল নাট্যরচনার জন্য সাধারণ কথ্য ভাষার প্রয়োগ এবং তার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরার। চীনের ছাত্ররা তখন বিপ্লবের পথ অতিবাহিত করে চলেছে—তাই বড় নাটক নয়, জীবনের ছোট ছোট ঘটনা অবলম্বনে স্কেচের মত ইউরোপীয় ধারায় নাটক রচনা করে তারা দেশের সর্বত্র দলে দলে তা অভিনয় করে বেড়াতে লাগল। এ যেন জীবন্ত সংবাদপত্র। তাদের এই ছোট ছোট নাটকগুলির বিষয় বস্তু থাকত হয়তো—আফিম খাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি; মেয়েদের পা-কে ছোট করে বেঁধে রাখা, সরকারি-কর্মচারীর দুর্নীতি অথবা বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জাগ্রত জাতীয়তাবোধ মূলক নাটক। আবার কখন বা দেখানো হচ্ছিল জাপানী আক্রমণের ভয়াবহতা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনদের মধ্যে ইউরোপীয় প্রখ্যাত নাট্যকারদের জনপ্রিয়তাও প্রচুর ছিল—তাদের রচনার অনুবাদও হতে লাগল। বিশেষ করেই তারা গ্রহণ করল ইউরোপীয় নাট্যতত্ত্ব এবং তার বহিরঙ্গের গঠন। এই নবপদ্ধতিকে তারা আনন্দদানের উপায় হিসেবে না ভেবে শিক্ষাদানের উপায় হিসেবেই ভেবেছিল।



আধুনিক চীনদেশীয় থিয়েটারের একটি সেট।

॥ ইয়াংকো থিয়েটার ॥

চীনদেশের ইয়াংকো থিয়েটারের ইতিহাসটা কিছু কৌতূহলপ্রদ। ইয়াংকো নাটকের সঙ্গে চীনের মূল ক্লাসিকাল নাট্যধারার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ইয়াংকোর আদি উৎস ছিল লৌকিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক অনুষ্ঠান। পীত নদীতে ঘেরা সিয়ান্‌সি প্রদেশ চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র ছিল। ক্লাসিকাল থিয়েটারের নাড়ীর স্পন্দনও সেখানেই প্রথম অনুভূত হয়—ইয়াংকোর আবির্ভাবও ঘটেছে এখান থেকেই। সিয়ান্‌সি প্রদেশেরই জনপ্রিয় সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল এই ইয়াংকো। এই গ্রাম্য গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান হত চাষ আবাদের সময়—যা আমাদের গ্রীসের দিওন্যুসাসের উৎসবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষি ও উৎপাদনকে ভিত্তি করেই সূচনা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের কালক্রমে তাই হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস। ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য গ্রামের তরুণ তরুণীর মিলিত গীতিমূলক নৃত্য ছিল এই ইয়াংকো। এক একটি নৃত্যদলে থাকত বিশ বা ত্রিশ জন তরুণ তরুণী। দলের যে প্রধান বা মূল গায়ক থাকত সে মাথার উপরে একটা কাগজের খোলা ছাতা বা ধাতবদণ্ড তুলে ধরত, তার অন্য হাতে থাকত একটা পাখা—এই নিয়ে সে নৃত্যের তালে তালে নাটকের কাহিনী গেয়ে যেত। তার গান বেশির ভাগই হত প্রশ্নমূলক তারপরে কোরাস তার উত্তরাংশ আবৃত্তি করত। পুরুষ ও নারী নৃত্যশিল্পীরা মুখোমুখী দুই সারিতে দাঁড়াত। যদিও পরবর্তীকালে ক্লাসিকাল নাটকের মতই এরও নারী চরিত্র বালকরা অভিনয় করত। সঙ্গীত এগিয়ে চলত এই নারী পুরুষদলের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে। কাহিনী বেশির ভাগই হত প্রশস্তি ও প্রেমমূলক। এই সঙ্গীতের সঙ্গেই চলত তাদের নৃত্যের পদক্ষেপ, দল বেঁধে তারা এগিয়ে আসত, দোলা দিয়ে পাশে সরত বা পিছিয়ে যেত। এ ছাড়াও ছিল নানান ছন্দ, ভঙ্গি এবং পদক্ষেপ। মূল গায়কের একক সঙ্গীতের মাঝে সমগ্র দলটা ছন্দোবদ্ধ নৃত্যে বিভিন্ন নকশার সৃষ্টি করতে থাকত—আর তার সঙ্গে বেজে চলত ড্রাম, গং এবং মাঝে মাঝে তাল পড়ত ঝাঁঝরের, এরই মধ্যে কোমল একটানা সুর বেজে চলত বেহালায়। কখন কখন তার মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসত ক্লাউনের আবির্ভাব।

উত্তর-পশ্চিম চীনের এই লোকশিল্পই ১৯৩৮ সালের পর থেকে এক দ্রুত

পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পথ এরপর সে মাত্র দশ বছরে পার হয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছয়। বর্তমান যুগের জটিলতম সমস্যা সম্বলিত কাহিনী নিয়ে এ এগিয়ে চলেছে, হয়ে উঠেছে উন্নত ও সুবিস্তৃত এক শিল্প মাধ্যম। বলা যায় গ্রামীণ শিল্প এসে উন্নীত হয়েছে বুদ্ধিজীবী মানুষের নাগরিক শিল্পে। ১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন কমিউনিস্টরা সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করছিলেন—তখন সিয়ান্‌সি প্রদেশের স্থানীয় কমিউনিস্টরা এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইয়াংকোকে তাদের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। এই ইয়াংকোয় তারা নবসৃষ্টির প্রাণ প্রবাহ বইয়ে দিয়ে দলে দলে, গ্রামে গ্রামে চড়িয়ে পড়তে লাগলেন।

নব ইয়াংকোয় তরুণদল প্রথমেই কতকগুলি পরিবর্তন নিয়ে এল। পূর্বে—ইয়াংকো দলের পরিচালকের হাতে ধরা থাকত একটা কাগজের ছাতা—নব ইয়াংকোয় প্রধান গায়ক উঁচু করে ধরলেন একটা রাইফেল কিংবা চাষ আবাদের প্রতীক কোন যন্ত্রপাতি। শিল্পীরা নরনারীর পূর্বরাগের প্রেমাভিনয় ছেড়ে দিলেন, তারা বিভিন্ন দলে কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ ছাত্র, কেউ পণ্ডিত, কেউ ব্যবসায়ী ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সাজতে লাগলেন। সঙ্গীতের নব বিষয়বস্তু হল নানা রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। আর পূর্বে যে ক্লাউন সাজত, অতঃপর সে বেচারীকেই জাপানী সেজে আসতে হত এবং নিঃসন্দেহে মার খেতে হত। ক্রমশঃ এই নব ইয়াংকো কৃষকদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। কারণ প্রাচীন ইয়াংকোর তুলনায় এই নব ইয়াংকো জনকল্পনার অধিকতর খোরাক যোগাল।

সায়াহ্নে ইয়াংকো গ্রামের এবং নগরের হাটে, মাঠে, স্কুল ময়দানে, বলা যায় গ্রামপঞ্চায়েতের সর্বত্রই অভিনীত হতে লাগল। ইয়াংকো ছিল মুক্তাঙ্গন নৃত্যানুষ্ঠান। গ্রীক "খোরাস" সঙ্গীতের "অর্‌খেস্ত্রা" ভূমির মতই একখণ্ড উন্মুক্ত বৃত্তাকার ভূমি তাদের মঞ্চ হত। প্রথমে লোক জড়ো করবার জন্য নব ইয়াংকো প্রাচীন ইয়াংকোর মৌলিক সুরে নৃত্যের বাজনা বাজিয়ে চলত, অনেকটা আমাদের যাত্রাগান আরম্ভের পূর্বে বেহালার সুরের মত। বাজনার শব্দে লোকের ভিড় বাড়তে থাকে, ক্রমশঃ এক বিরাট জনসমাবেশ হয়ে যায়, তারা অপেরার দর্শকদের মত নৃত্যশিল্পীদের গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়। এরপরে যিনি মূলগায়ক তিনি একটি গাথার সাহায্যে কাহিনীটি

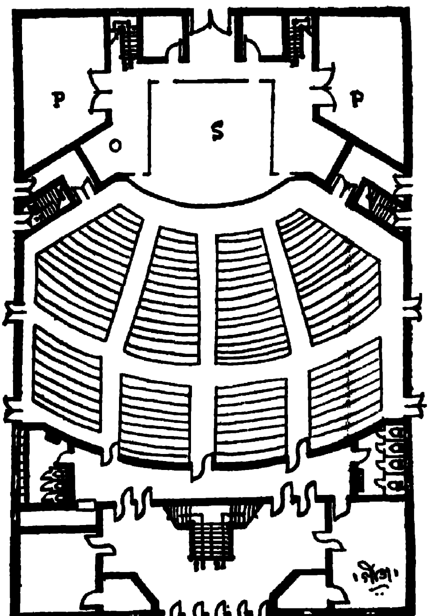
শোনান, তার কোরাসরা বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক মানুষের পোষাক পরে এসে যোগ দেয়। তখন ইয়াংকোর যে মূল নৃত্যছন্দ তা সুরু হয়। তিনধাপ এগিয়ে এসে একটা পা-দোলা দিয়ে পাশ ঘুরে পেছনে যাওয়া। চারপাশে ঘিরে যে দর্শকরা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাও তাদের এই চিরপরিচিত সুরের আকর্ষণে সম্মিলিত নৃত্যে অংশ গ্রহণ না করে পারে না। ইয়াংকোর মাঠে তখন এক আনন্দের হাট বসে যায়, তরুণ-যুবকরা তো আছেই এমন কি বেতো শরীর নিয়ে বৃদ্ধরাও ক্ষণকালের জন্য নিজেদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে, তিন পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে ঘুরে ঘুরে না নেচে পারেন না। এ যে তাদের আজন্মের চেনা সুর, ও সুর বেজে উঠলে রক্তে তাদের দোলা লাগবেই এমন কি বড় বড় নেতা, সরকারি কর্মচারী বা জাপ্-বিরোধী সৈন্যাধ্যক্ষও বাদ যেতেন না, তাদেরও টেনে এনে নাচে নামানো হত। কেউ কেউ সুট্-বুট সহ নিজেরাই লাফিয়ে আসতেন।

এরপরে সঙ্গীত তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠত। তখন দর্শকদের সেই বৃত্তের মধ্যে মূল পরিচালক ও তার সহকারীরা একটা ছোট্ট নাটক গানে, কাব্যে, নাচে ও সংলাপে মিশিয়ে অভিনয় করতেন। এ ধরনের নাটকের পরিসমাপ্তি আনন্দমধুরই হত।

নাটকের শেষে সবাই হৈ-হুল্লোড় সুরু করে দিত, আবার বাজনা বেজে উঠত, কোরাস আবার ঘুরে ঘুরে নাচত, দর্শকরাও তাতে যোগ দিত। অনেক সময় ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে একাধিক নাটকও একই সান্ধ্য উৎসবে অভিনীত হত।

ক্রমশঃ নব ইয়াংকো আরো জটিল হয়ে উঠতে লাগল, যে সব বুদ্ধিজীবীরা এর সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য উৎসের জন্য এতদিন মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তারাও এর শক্তি বুঝতে পারলেন এবং এসে যুক্ত হতে লাগলেন। বর্তমানে এ চার পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী পূর্ণাঙ্গ নাটক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন এর মধ্যে চীনের ক্লাসিকাল নাটক এবং ইউরোপীয় নাটক সবকিছুরই সম্মিলন ঘটেছে—সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে তার অভিনয় ক্ষেত্রের। পরিবর্ধিত ইয়াংকো কেবল যে মুক্তাঙ্গনেই অভিনীত হচ্ছে তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চেও "শ্বেত-কেশ-নারীর" মত অতি বিখ্যাত ও প্রথম শ্রেণীর নাটকও নব ইয়াংকো গোষ্ঠী বহু রজনী অভিনয় করেছেন।

নব ইয়াংকো এখন এক অদ্ভুত প্রাণশক্তি সম্পন্ন চীনের জাতীয় শিল্প। চীন ও পশ্চিমের সর্বপ্রকার আধুনিক কাহিনীই এই পদ্ধতিতে অভিনীত হয়ে থাকে। ইয়ান্‌সি এলাকা ছেড়ে নবচীনের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে এই ইয়াংকো। কোন কোন গ্রামে প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত ভাবে ইয়াংকোর অভিনয় হয়। বৃষ্টি ধারার মত গ্রামে গ্রামে আনন্দের ধারা ছড়িয়ে দেয় এই



বর্তমান কালের চীনদেশীয় মঞ্চ ও রঙ্গালয়ের একটি নকশা।

ইয়াংকো। কল্পিত কোন রাজা-রাণী, দৈত্য, দানব নয় তাদেরই জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ, হাসি কান্নার কথা তারা ব্যগ্র ব্যাকুল নয়নে দেখে আর শোনে। জীবনের প্রধান কথাই হল চির চাঞ্চল্য—গতি—সেই গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে চীনের নব-ইয়াংকো।

॥ জাপান ॥

জাপানের উন্নত শ্রেণীর নাটককে সোজাসুজিই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারার নাটক হল জাপানের প্রাচীনতম বনেদী ক্লাসিকাল 'নো' (Noh) নাটক—যা অভিজাতদের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল জনসাধারণের জন্য—তা হল 'কাবুকি' (Kabuki) নাটক। অভিজাতদের নো নাটক ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ, আর জনসাধারণের নাটকের বাঁধন ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল কিন্তু প্রাণ-শক্তিপূর্ণ। এই দু'ধরনের নাটকের প্রয়োগবিধির মধ্যেই অত্যন্ত নিপুণ, হৃদয় মনোগ্রাহী সাজসজ্জা ও মৌলিক উপকরণের পারিপাট্য দেখা যায়। যা জাপানীদের জাতিগত চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

জাপানে অভিজাতদের নাটক হল 'নো' নাটক। বর্তমান পৃথিবীতে আদিম ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত নাটকের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—যা এখনো অভিনীত হচ্ছে এবং তার প্রাচীন প্রয়োগবিধিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। নো নাটকের অভিনয়ে বর্তমান যুগের মানুষ তার নিখুঁত সৌন্দর্য বিন্যাসেই আকৃষ্ট হয়। এক স্বপ্নলোকের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সেখানে গল্পাংশ বা প্লটের প্রাধান্য নেই, অথবা মানবিক আবেগের গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে নি। নো নাটক স্রোতহীন, উত্তাপহীন মনোরম একটি বদ্ধ হ্রদের মত প্রথা ও নিয়মের উপকূলে বাঁধা। এর জন্ম মন্দিরের পূজা অনুষ্ঠান থেকে এবং তারি সঙ্গে এসে মিশেছে জাপানীদের স্বাভাবিক শিল্পবোধ-জাত সুকোমল, সমুজ্জ্বল রূপবিভা। এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নৃত্য, গীত, ঘটনা ও কথা থেকে ক্রমে জন্ম লাভ করেছে বলেই এতে প্রথাগত নীতি নিয়মের বাঁধন এত কঠিন।

জাপানীদের প্রাচীন নৃত্যগীতের উপরে চীনদেশের নৃত্যগীত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশি ছিল তা ক্রমবিবর্তনের পথেই জাপানের নিজস্ব হয়ে গেছে। বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান থেকে জাপানী নাটকের উদ্ভব ও তার ক্রমবিবর্তনের একটি ছক পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল। এতে জাপানের উপকাহিনী জাত সূর্য-নৃত্য থেকে বিংশ শতকের ভাউদেভিল্লে তাকারাজুকা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী নাট্যকীর্তি হল নো, কাবুকি ও বুনরাকু পুতুল নাচ।

জাপানী থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস।

"নৃত্য-রূপ" (DANCE FORMS)

পৌরাণিক যুগ

সূর্যদেবীর সম্মুখে উজুমে নৃত্য (Uzume's Dance before the Sun-Goddess)
↓
দেববেদী সম্মুখে কাগুরা নৃত্য (Kagura Shrine Dance)

"এশিয়া থেকে আগত ধারা"

গিগাকু মুখোশ নৃত্য (Gigaku Mask Dance—সপ্তম শতক)
↓
বুগাকু দরবারী নৃত্য (Bugaku Court Dances—সপ্তম শতক)

"জাপানের দেশজধারা" | **"নাট্য-আঙ্গিক"**

ডেনগাকু মেঠোনৃত্য (Dengaku Field Dances—দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক) ⟶ সারুগাকু মূকাভিনয় (Sarugaku Mimes—দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক)

"নৃত্য এবং নাটকের মিশ্রিতরূপ" ↓ ↓

"নো" গীতি-নাট্য (Noh Lyric Dramas—পঞ্চদশ শতক) ⟵ কিয়োগেন হাস্যরসাত্মক বিষ্কম্ভক (Kyogen Comic Interludes—পঞ্চদশ শতক)
↓

গীতিমূলক কাহিনীকথন ও আবৃত্তি (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক) ⟶ বুনরাকু পুতুল নাচ (Bunraku Puppet Theatre—ষোড়শ শতক)
↓

"কাবুকি" সাধারণ থিয়েটার
(Kabuki Popular Theatre—সপ্তদশ শতক)
↓ ↓
শিম্পা নিউ স্কুল থিয়েটার (Shimpa New-School Theatre—উনবিংশ শতক)
↓

"পশ্চিম থেকে আগত"
ভাউদেভিলে তাকারাজুকা (Vaudeville Takarazuka etc.—বিংশ শতক) | **"আধুনিক থিয়েটার"** (উনবিংশ শতক)

প্রাচীনতম পদ্ধতির জাপানী নৃত্য ছিল "কাগুরা" (Kagura), এই নৃত্য সূর্যদেবীর কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় নৃত্য ছিল। সপ্ত শতকে চীনদেশ থেকে জাপানে নূতন নৃত্য পদ্ধতির আগমন হয় তার নাম ছিল 'গিগাকু' (Gigaku) এই নৃত্যে মুখোশ ব্যবহৃত হত—এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধদেবের নির্দেশাবলীর প্রচার। এরপরে আর একশ্রেণীর নৃত্য এল তার নাম 'বুগাকু' (Bugaku) যা ছিল বিভিন্ন ধারার চীনা, হিন্দু এবং করিয়ার নৃত্য পদ্ধতির এক সমন্বিত রূপ। এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অভিজাতদের মনোরঞ্জন করা। অভিজাত মহলে বুগাকুর প্রচলন জাপানে এখনো আছে। বুগাকুর সর্বাধিক উন্নতি হয়েছিল হেইয়ান্‌যুগে। এরপরে প্রধান স্থান অধিকার করে নিল 'ডেনগাকু' (Dengaku) নৃত্য। এটা ছিল জনসাধারণের মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান—সহজ ধরনের এবং শারীরিক কসরৎ যুক্ত। এই সময়েই জাপানে আর একটি নৃত্য পদ্ধতি এল তার নাম "সারুগাকু" (Sarugaku) এতে একদিকে ছিল হাস্যরস অন্যদিকে ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ মূকাভিনয়। এই সারুগাকুই আরো সংস্কৃত এবং সূক্ষ্ম মার্জিতরূপ পরিগ্রহ করে পরবর্তিকালের জাপানী নো নাটকের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠেছিল।

॥ "নো" নাটক ॥

"নো" নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত উপকথায় রয়েছে যে—এ নাট্যোৎপত্তির আদিনৃত্যের সূচনা করেন দেবতারা। জাপানে দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রধানা ছিলেন সূর্যদেবী। তিনি একবার দীর্ঘকালের জন্য স্বর্গের এক পর্বতগুহায় লুকিয়েছিলেন। সূর্যদেবী না থাকায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারে ডুবে গেল। দেবতারা কিছুতেই দেবীকে গুহার আড়াল থেকে বাইরে আনতে না পেরে তাকে ভুলিয়ে আনবার জন্য এক নাচ আবিষ্কার করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুহা মুখে একটা ফাঁকা গামলাকে উলটে নিয়ে তার উপরে নৃত্য সুরু করলেন। সূর্যদেবী নৃত্যশিল্পীর পদাঘাতের ফাঁকা আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে দেখতে এলেন কি ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে উঠল। নো নাটকের মঞ্চে এখনো টিকে রয়েছে এই নৃত্যকৌশল। তার কাঠের ফাঁপা মেঝেতে শিল্পীরা নৃত্যকালে এই বিশেষ ধরনের পদাঘাতের শব্দ করে থাকেন।

সূর্য উপাসনার এই নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে ক্রমশঃ নাটকীয় উপাদান মিশতে লাগল।

নো নাটক পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে বৌদ্ধ পুরোহিত কওয়ানামি (Kwanami—১৩৩৩-৮৪ খ্রীঃ) ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র জেয়ামির (Zeami—১৩৬৩-১৪৪৪ খ্রীঃ) প্রচেষ্টায়। এই চতুর্দ্দশ শতকেই নো নাটক রাজসভার আনুকূল্য পেল। তারপর থেকেই প্রতিভাসম্পন্ন কবি এবং বিশেষ নাট্যগোষ্ঠী নির্ধারিত নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এবং অতি সূক্ষ্ম, সুমার্জিত উপায়ে নো নাটকের অভিনয় করে যেতে লাগলেন, এ ছিল অভিজাত মহলের একান্ত সংরক্ষিত ধন। তবুও এই নো নাটকের পূর্ণ বিকাশই পরবর্তী 'কাবুকি' নাটকের সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে তুলেছিল। নো শব্দের ভাষাগত অর্থ ছিল কোন কাজে "নৈপুণ্য"—যোগ্যতা বা দক্ষতা। ক্রমে যে কোন শিল্প বা অনুষ্ঠানকে বলা হত "নোগাকু" (Nohgaku) যার প্রকৃত অর্থ ছিল নিপুণ-সঙ্গীত। এই নোগাকু থেকেই সংক্ষেপে ধ্রুপদী নাট্যাভিনয়ের নাম হল "নো" (Noh)।

নো নাটকগুলি আকারে ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যবর্জিত। প্রায় আড়াইশ মত প্রাচীন নো নাটকের সংগ্রহ বর্তমানকালের হাতে এসে পৌঁছেছে। এর প্রত্যেক শব্দই ছিল ইঙ্গিতধর্মী। শব্দের যা স্বাভাবিক অর্থ তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ তারা বহন করত, বহু শতাব্দীর পুরাতন সংস্কার ও পুরুষানুক্রমিক কাব্যময় প্রয়োগবিধি শব্দার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে অনেক সুবিস্তৃত করে তুলত। কখন বা দ্বৈত অর্থ বোঝাত, কখন বা অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। শব্দের এই অর্থমূল্য আরো অনেক বেড়ে যেত সঙ্গীতময় এবং কাব্যিক প্রকাশ ভঙ্গিতে। অন্যদিকে অভিনেতা এবং নৃত্যশিল্পীদের আচরণ, গতি ও দেহভঙ্গিও ছিল ইঙ্গিতধর্মী—রূপক ও অলীক কল্পনার সৃজনকারী।

নো নাটকের কাহিনীতে মৌলিক উপাদান খুব কমই আছে, অন্যান্য বহুধারার সংমিশ্রণে এর কাহিনীর সৃষ্টি। তার মধ্যে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত নাটকও দেখতে পাই, যেমন "হেইকু মোনোগাতারি" (Heiku Monogatari) আবার "গেঞ্জি মোনোগাতারির" (Genji Monogatari) মত দেবালয় ও দেবদেবীর উপাখ্যান বা প্রশস্তি সম্বলিত কাব্যময় গাথাও ছিল। চিন্তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশের জন্য প্রাচীন সুভাষিতাবলী

এবং কাব্যময় উক্তি ব্যবহার করা হত এবং দর্শকদের মনের উপর ছাপ ফেলবার জন্য তাকে সম্ভবমত—সহজবোধ্য করে তোলা হত। নো নাটকের কথোপকথনের কতকটা অংশ হয়তো অভিনীত হত গদ্যে বা "কোতোবা"য় (Kotoba) আবার তার অংশ বিশেষ হত পদ্যে বা "উতাই"য়ে (Utai) সঙ্গে কোরাসেরদল গাইত সমবেত সঙ্গীত। নো নাটকের ভাষা অতি প্রাচীন—এর কারণই প্রচলিত প্রথার প্রতি তাদের একনিষ্ঠ অনুরক্তি। আজকের নো নাটকেও চতুর্দশ শতকের অভিজাতদের ভাষা এবং পরিমার্জিত প্রকাশ ভঙ্গিরই অনুবৃত্তি দেখা যায়। নাটকের কাব্যাংশ শ্লেষ ও অলংকার দ্বারা সুসমৃদ্ধ।

জাপানী নাটক তার মূল উৎস সঙ্গীত ও নৃত্যের ঐতিহ্যকে সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছে। আধুনিক যুগেও বাস্তবের আকর্ষণকে অস্বীকার করে সে তার ক্লাসিকাল মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

নো নাটকে অভিনেতারা তাদের ভূমিকা অভিনয় করতেন অনেকটা সঙ্গীতমূলক আবৃত্তির ঢঙ্গে, আর তার সঙ্গে সঙ্গত ধরত কোরাসেরদল। তারা আসন নিত মঞ্চের পাশেই। অভিনেতারা যখন তাদের সংলাপ শেষ করে নৃত্য সুরু করতেন তখন কোরাসদল গান গাইত এবং নাটকীয় ঘটনাবলী বিবৃত করত। মঞ্চের পশ্চাতে বসত অর্কেস্ট্রা বা বাদক দল (ভারতীয় হিন্দু নাটকে কুতপ বা অর্কেস্ট্রা বসবার স্থানও এখানেই)। এই স্থানকে বলা হত "হায়াসি" (Hayasi)। বহু প্রকার ড্রাম, বাঁশি, ফ্লুট ইত্যাদি অর্কেস্ট্রায় স্থান পেত। এই হায়াসির সঙ্গীতের যন্ত্রপাতিই ছিল নো নাটকের পশ্চাৎপট, এরই সম্মুখে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি হত। এই যন্ত্রসঙ্গীতের সুর এবং তালই অভিনেতার গতি পরিচালন করত। অভিনয় যখন আরম্ভ হত, যখন অভিনয় সর্বোচ্চ গ্রামে উঠত, অথবা যখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেত তখন ফ্লুটের উচ্চ তীক্ষ্ণসুর বেজে উঠত।

নো নাটক আকারে অত্যন্ত ছোট—এমন কি ইংরেজী একাঙ্ক নাটকের চেয়েও ছোট হয় এবং পড়তে গেলে একে আরো ছোট মনে হবে। এর মধ্যে রয়েছে একটা গভীর গীতিকাব্যের সুর কিন্তু নাটকীয় সংঘাত এবং উপাদানের স্বল্পতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। আসল কথা স্বল্প উপাদান এবং কাব্যিক প্রকাশ-ভঙ্গির সাহায্যে কেবল কাহিনীর মোটা কাঠামোটা গড়া থাকে। কিন্তু নাটকের যে নাটকীয়তা অর্থাৎ তার যে অনিশ্চয়তা, কৌতূহল,

যে সংঘাত, তা আপনা থেকেই রচিত হয় সুশিক্ষিত অভিনেতাদের প্রথাগত বিশিষ্ট পরিবেশনায়। প্রকৃতপক্ষে জাপানী দর্শকরা ইউরোপীয়দের চোখে নাটক দেখেনা, তারা চায় আনুষ্ঠানিকভাবে বহিরাবরণের নিখুঁত উপস্থাপনা।

নো নাটকের একটি অনুষ্ঠান সূচীতে একাধিক নাটক এক সঙ্গে দেখানোই প্রচলিত প্রথা। দর্শকদের কাছে সেই নাটকগুলি এককভাবে বিচারের চাইতে সমগ্র অনুষ্ঠান সূচীটি কিভাবে সাজানো হল তাই ছিল প্রধান বিচার্য বিষয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতই সূচীপত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও তারা সহ্য করত না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হত একটি ধর্মীয় গাথা। এর বিভিন্ন অংশের সমাবেশ করা হত পুরো অনুষ্ঠানটির ঐক্য বিচার করে। সব কিছুই একটা সুনিপুণ নকশার মত গ্রথিত হত। এর মধ্যে পশ্চিমী কাঠামোর প্রস্তুতি, উর্ধ্বগতি, সর্বোর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি ইত্যাদির কিছুটা সন্ধান মিললেও, আবেগের ধারাবাহিকতা মিলবে না। এর প্রকৃতিই হল কাব্যে, কল্পনায়, রূপসজ্জায়, মনোহরণ করা। নো নাটকের প্রধান উদ্দেশ্যই হল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া নয়—দর্শকের চোখের সম্মুখে একটি ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলা।

সাধারণতঃ নো নাটকের বিষয়সূচী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হত। প্রাচীনকালে কখন হয়তো এই বিভাগ সাত ভাগ বা তারো বেশি হত; বর্তমানে এই বিভাগ হয় তিনটি। নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ঋতুর দিকে লক্ষ্য রেখে প্রোগ্রাম তৈরী হয়। নো নাটকের এক একটি অঙ্ক এক একটি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন নাটকে তৈরী। এই ক্ষুদ্র নাটকগুলি দৈর্ঘ্যে ২০।২৫ মিনিটের বেশি সময় নেয় না। প্রথম যুগের পঞ্চাঙ্ক নাটকে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকত—সেই পাঁচটি অংশের নাম ছিল, "শিন" (Shin) "ন্যাম" (Nam) "জো" (Jo) "কিও" (Kyo) এবং "কি" (Ki)। প্রথম শিন নাটকের মধ্যে প্রধান থাকতেন একটি দেবচরিত্র, এই চরিত্রটি প্রথম দৃশ্যে ছদ্মবেশে আসতেন এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বরূপে ব্যক্ত হতেন। দ্বিতীয় ন্যাম নাটকে ঘটত একটি মৃত সৈনিকের আত্মার আবির্ভাব। যিনি প্রথমে সাধারণ মানুষ সেজে আসতেন, তারপর তার প্রকৃত রূপ ধরে বিগত দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের করুণ গাথা গাইতেন। জো নাটকটি হত নারী চরিত্র মূলক। মঞ্চে এই নারী চরিত্রের অবশ্যই পরচুলা পরতে হত। এই

নারী কখন হতেন একজন সুন্দরী তরুণী, কখন বা হতেন একজন বৃদ্ধা। মঞ্চে এই চরিত্রটি অভিজাত ভঙ্গিতে নৃত্য করতেন। জো নাটকের প্রধান বিশেষত্বই ছিল এর গীতিকাব্যময়তা। কিও নাটকে হত মত্ততার অভিনয়। আপন সন্তানকে বা প্রেমিককে হারিয়ে ফেলা এক নারী এই ধরনের নাটকে প্রবল ভাবাবেগ ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে নৃত্য করত। কি নাটকে থাকত অতিপ্রাকৃত দৈত্য, দানবদের নিয়ে রচিত কাহিনী। এই দানবরা ভয়াবহ শক্তির অধিকারী ছিল—ইচ্ছা হলে তারা নদী কিংবা পাহাড়ও নাড়িয়ে দিতে পারত।

নো নাটকের মধ্যে আর এক শ্রেণীর নাটক আছে যেগুলো সম্পূর্ণ পার্থিব জগতের নাটক। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের নাম "ম্যায়" (Mae) তাতে প্রধান অভিনেতা মিথ্যে পরিচয়ে মঞ্চে ঢুকতেন, দ্বিতীয় দৃশ্যের নাম "নোতি" (Noti) এখানে তিনি আত্ম-পরিচয় ব্যক্ত করতেন, চরিত্রের পরিবর্তন বোঝাতে এসময়ে তারা পোষাক পরিচ্ছদও পাল্টাতেন। পরিচয়ের এই দ্বিতীয় পর্বে যখন সমবেত সঙ্গীত চলত কিংবা নাটকের প্রকৃত কাহিনী ব্যক্ত হত, তখন প্রধান অভিনেতার নাচ চলত এবং যখন সমবেত সঙ্গীত থামত তখন কেবল বাদ্যযন্ত্রগুলি বেজে চলত।

নো নাটকে "কিওগেন" (Kyogen) নামে আর এক শ্রেণীর হাস্য-রসাত্মক গাথা ছিল। এই নাটক সম্পূর্ণই কৌতুকপূর্ণ কথোপকথনে এগিয়ে চলত, এর সঙ্গে সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক থাকত না। আর এর অভিনেতারাও মূল নো নাটকের অভিনেতা হতেন না, তারা সংখ্যায় হতেন দুই বা তিন-জন। এই নাটকের শেষে একজনের পশ্চাদ্ধাবন করে অন্যজন বেরিয়ে যেতেন। এদের গতির নির্দিষ্ট সময় ছিল। যেমন তারা কৌতুকপূর্ণ কথোপকথনে মাতিয়ে রাখতেন, তেমনি আবার নানান অঙ্গভঙ্গিসহ মূকাভিনয়েও দর্শকদের হাসাতেন। এটা ছিল নো নাটকের গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান সূচীর পর একটু হাস্যরসাত্মক অবকাশ। যখন বিশ্রামের জন্য কোরাস এবং সঙ্গীতকারীরাও মঞ্চ থেকে উঠে চলে যেত তখন সার্কাসের ক্লাউনের মত আসতেন এরা। ক্রমশঃ এরা অনেকেই কাবুকি মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেলেন এবং উনবিংশ শতকে এসে এগুলি অতি লঘু ধরনের নৃত্য, গীত ও হাস্যপরিহাসপূর্ণ নাটক হয়ে দাঁড়াল।

পাশ্চাত্য নাটকের যা প্রধান উপজীব্য নাটকীয় ঘাত, প্রতিঘাত বা ক্রিয়া,

প্রতিক্রিয়া নো নাটকের উদ্দেশ্য বা গতিবেগ তা ছিল না—সে চাইত শুধু একটা কাব্যময় পরিবেশ রচনা করতে। এর অভিনেতাদের নাটকের গতি পরিচালনার কোন ক্ষমতা ছিল না; তারা ছিলেন বিগত দিনের স্মৃতির হাতের ক্রীড়নক। এ নাটকে মানবিক আবেগ ছিল গৌণ—প্রধান ছিল অপার্থিব জগতের প্রকাশ। বস্তু ছিল না, ছিল বস্তুর ভাব নির্যাস, নিখুঁত সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যেভরা অলৌকিক এক পরিবেশ।

নো নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংলাপ ও সঙ্গীতসহ নাচ। অভিনেতার সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও চলত, কারণ মঞ্চপার্শ্বে কোরাসদলই প্রয়োজনীয় গান গাইত, কিন্তু অভিনেতাকে অবশ্যই পারদর্শী নৃত্যশিল্পী হতে হত। কাব্য ও সঙ্গীত এখানে নৃত্যের পরিবেশ রচনা করত; নৃত্যই হল আঙ্গিক অভিনয় যা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তুলত। নাটকের নৃত্য এবং অঙ্গাভিনয় কোনটাই বাস্তবের কিছুমাত্রও অনুকৃতি ছিল না। প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করতে গিয়ে এঁরা বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। বরং বলা যায় নো নাটকের সমস্ত অঙ্গাভিনয়ই ইঙ্গিতধর্মী ছিল। যেমন নাটকে 'কান্না' বোঝাতে কোন বাস্তব অঙ্গভঙ্গিরই প্রয়োজন হত না। কেবল জামার হাতা দিয়ে চোখ স্পর্শ করলেই দর্শকরা বুঝে নিত।

নো নাটকের নৃত্য-শিল্পীরা মঞ্চের একটি সরল রেখায় দাঁড়িয়ে দেহকে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে আবর্তিত করে নৃত্য করেন। অভিনেতারা নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিকে সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য সবসময়েই হাতে একখানা সুদৃশ্য পাখা রাখেন। এই পাখাখানা কিন্তু কেবলমাত্র নৃত্যের সহায়কই নয়, পাখাটিকে নৃত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বস্তুর প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। পাখাখানাকেই হয়তো স্বর্গ বা কোন নৈর্ব্যক্তিক বস্তু বলে ভাবা হল, আবার হয়তো সেই পাখাখানাই হয়ে গেল অতি বাস্তব জিনিস যেমন একপাত্র সুরা (সাকে) বা একখানা তরবারি। ভাঁজ করা পাখাখানা নৃত্যশিল্পী সম্মুখে এমনভাবে ধরে রাখতেন যেন সেটা দু'চোখের মধ্যবর্তী রেখা থেকে সরে না যায়। পোষাকের ঢিলে হাতাটাও বহুরকম ভাবের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হত। হাতাটা দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললে বোঝাত কোন সুদূর গভীরে দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গির বিভিন্ন নাম রয়েছে। নৃত্যভঙ্গির একটি বিশিষ্ট ধারা হল পশুর অভিনয়।

যিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন তার নাম হত "শিতে" (Shite)

এবং যিনি দ্বিতীয় স্তরের চরিত্রের অভিনেতা তার নাম ছিল "ওয়াকি" (Waki) উভয়েরই আবার সহকারী অভিনেতারা রয়েছে। প্রধান অভিনেতা যখন নৃত্যসহ নাটকের মূল অংশ অভিনয় করেন, তখন দ্বিতীয় অভিনেতা কোনই অংশ গ্রহণ না করে চুপচাপ মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোরাস প্রধান অভিনেতার বক্তব্য গেয়ে সাহায্য করতে থাকে, আবার দ্বিতীয় অভিনেতার কালেও তাদের গান সমানই চলে। নো নাটকে অনেক সময় বাল্যকাল দেখাতে বা নারীচরিত্রে—শিশু অভিনেতারা অভিনয় করত কিন্তু কোন অভিনেত্রী মঞ্চে আসতে পারতেন না।

নো নাটকে মুখোশের প্রচলন যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তারো মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল কেবল প্রধান অভিনেতা এবং তার সহায়ক অভিনেতারাই মুখোশ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতারা, তার সহায়ক বা অপ্রধান শ্রেণীর অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহারে অধিকারী ছিলেন না। নাটকের মুখোশগুলো তৈরী হত বিশেষ ধরনের পাতলা কাঠের উপরে চিত্রাঙ্কণ করে। অনেক সময়ে এগুলি হয়তো শতবর্ষ ধরেও পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হত। নিজস্ব গুণ এবং বৈশিষ্ট্যে এগুলি উন্নত শ্রেণীর শিল্প হয়ে উঠেছিল। এই মুখোশগুলি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু কখনই এগুলো চরিত্রের জীবন্তস্বরূপ হয়ে উঠত না। এতে অঙ্কিত থাকত মনুষ্যভাবের নির্যাস—যেমন একটি শান্ত সুমধুর সুন্দরী তরুণী, কিংবা সুগভীর বেদনাহত এক বৃদ্ধানারী, অথবা ভয়ংকর-দর্শন কোন দানব, দেবদেবী বা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। এছাড়া বিশেষ ধরনের কতকগুলি মুখোশ ছিল তা কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হত।

জাপানে মুখোশ পরে অভিনয় করার পদ্ধতি অভিনেতাদের দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা করে আয়ত্ত করতে হত; কারণ এই মুখোশ পরলে অভিনেতাদের মুখ সম্পূর্ণভাবেই ঢাকা পড়ে যেত। মুখোশে কেবল চোখের জন্য ছোট দু'টি ফাঁক থাকত, অতএব এই মুখোশ নিয়ে নৃত্য করা এবং এর মধ্য দিয়ে কণ্ঠস্বর পরিবেশন করা দু'টোই অত্যন্ত দুরূহ ছিল; তদুপরি নিশ্ছিদ্র কাঠের মুখোশে লাগত অসহ্য গরম। কাঠের মুখোশটাকে বাঁকিয়ে মুখের অনুরূপ করে গড়ে তোলার শিল্পকৌশল বর্তমানে প্রায় হারিয়ে গেছে। আটশ থেকে তিন চারশ বছর পূর্বে পর্যন্তও জাপানে উন্নতধরনের মুখোশ তৈরীর শিল্পোদ্যোগ ছিল।

নো নাটকের পোষাক হত প্রাচীন ধরনের আনুষ্ঠানিক পোষাক, যদিও বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে তাকে কিছুটা অদল বদল করে নেওয়া হত। এই পোষাকগুলি হত যথেষ্ট ঢিলেঢালা, বিরাট পরিধি এবং আড়ম্বরযুক্ত, ফলে মঞ্চের উপর অভিনেতার চেহারাটা অনেক বড় দেখাত। পোষাকগুলো যেমন হত মূল্যবান, তেমনি হত বর্ণবহুল এবং কারুকার্যময়। মুখোশের মত এই পোষাকগুলিও পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হত। পোষাকের শ্রেণী বিন্যাসও হত বহুপ্রকার। অন্তর্বাস, বহির্বাস, নিম্নাঙ্গের ট্রাউজার, ঊর্ধ্বাঙ্গের বেশ—তাছাড়া বহু প্রকার শিরোভূষণ। এই পোষাকগুলি বহুমূল্যবান হলেও বিভিন্ন নাটকে একই পোষাক ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল—অতএব সেখানে কিছুটা আর্থিক সাশ্রয় ঘটত। কাবুকির মত নো নাটকের 'অভিনেতাও মঞ্চে কোন পাদুকা ব্যবহার করতে পারতেন না। জাপানীদের গৃহের মেঝেটি খড়ের উপর মাদুর মোড়া থাকে, ঘরের একপাশে কিছু ফুল ও ঋতু অনুযায়ী একটি স্ক্রোল-চিত্র টাঙ্গানো থাকে—ঘরের আর কোথাও কোন আসবাবপত্র তারা ব্যবহার করে না। এই পরিচ্ছন্ন গৃহে প্রবেশের সময় তারা জুতো পরিত্যাগ করে মোজা পরে নেয়—জাপানীদের এই মোজার নাম "ত্যাবি" (Tabi)। এ প্রথা জাপানে সুপ্রাচীন কালের, নো এবং কাবুকির অভিনেতারাও এই ত্যাবি পরেই মঞ্চে অভিনয় এবং নৃত্য করেন। কিন্তু জাপানের সমাজ জীবনে বারাঙ্গনারা এই ত্যাবি ব্যবহারে অধিকারী নয় মঞ্চেও বারাঙ্গনা চরিত্র ত্যাবি ব্যাবহার করতে পারে না।

নো নাটকের পোষাক ও শিরোভূষণের গভীর প্রভাব রয়েছে কাবুকি থিয়েটারে। নো-এর অভিনেতাদের মধ্যে রূপসজ্জা প্রায় ছিলনাই বলা যায়। কিন্তু নো-তে যারা মুখোশ পরত তারা অবিশ্যিই পরচুলা ব্যবহার করত। কাবুকিতে কিন্তু এই পরচুলার ব্যাপকতর এবং বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখা যায়, সেখানে যারা মুখোশ ব্যবহার করত না তারাও পরচুলা পরত। নারীচরিত্রের জন্য ছিল অপরূপ কবরী, দৈত্য বা দানবদের ছিল দীর্ঘ বিস্তৃত ভাসমান কেশরের মত পরচুলা। উভয় মঞ্চেই এগুলোর ব্যবহার যথেষ্ট ছিল।

এবার আমরা একটি জাপানী নাটকের উল্লেখ করব যে নাটকটি মূলতঃ ছিল নো নাটক কিন্তু পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে কাবুকি মঞ্চেও বহু অভিনীত হয়েছে। এই নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সামনে রাখলেই

আমরা বুঝতে পারব জাপানী নাটকের সুকুমার কাব্যময়তাই বা কোথায় এবং মঞ্চে তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যই বা কি ?

এই নাটকটির নাম, "দ্যা মন্‌স্ট্রাস্‌ স্পাইডার্‌" (The Monstrous Spider) এটি নো থেকে গৃহীত একটি নৃত্য-নাট্য—ওনোয় পরিবারের সংগ্রহের অন্যতম।

নাটকের মধ্যে মোট চরিত্র সংখ্যা ৮টি, কিন্তু মঞ্চে একই সময়ে দুই বা তিনের অধিক চরিত্রের প্রবেশ দেখা যায় না। নিম্নে নাটকটির কিছু অংশের বাংলা ভাবানুবাদ দেওয়া গেল—

॥ নাটকীয় চরিত্র ॥

পুরোহিত "চিচু" (প্রকৃতপক্ষে দানবাকৃতি মাকড়সা)
রাইকো—
ইয়াসুমাসা (রাইকোর পরিচারক)
ওয়াতানাবে নো ৎসুনা (রাইকোর অনুচর)
সাকাতা নো কিনতোকি (ঐ)
উরাবে নো সুয়েতাকে (ঐ)
উসুই নো সাদামিৎসু (ঐ)
কোচো (পরিচারিকা)

মঞ্চে প্রথমে একা "ইয়াসুমাসা" (Yasumasa) প্রবেশ করল, নাটকের মুখবন্ধে সে—"আমি হিরাই ইয়াসুমাসা, প্রভু রাইকোর একজন পরিচারক"··· ·········ইত্যাদি বলে আত্মপরিচয় এবং প্রভু রাইকোর পরিচয় জ্ঞাপন করল। তার কথাতেই আমরা জানলাম যে রাইকো দীর্ঘকাল ধরেই রোগভোগ করছেন এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য বুদ্ধের মন্দিরে পূজাপাঠ চলছে।

পরিচয় জ্ঞাপনের পর ইয়াসুমাসা আসনগ্রহণ করল। এরপরে সমবেত কণ্ঠে কোরাস সঙ্গীত-প্রধান কাব্যে রাইকোর চরিত্রটি চিত্রণ করল এবং গল্পটি বলে যেতে লাগল—

কোরাস সঙ্গীত। "মন্দ পবনে ভেসে ভেসে যায়
সাদা সাদা মেঘ আকাশের গায়।

ঐ আসছেন আমাদের প্রভু রাইকো,
দীর্ঘ রোগভোগের পর
সান্ধ্য পরিমলে সতেজ হবেন ভেবে।”

এরপরে রাইকো উদ্যানে ভ্রমণ করতে করতে তাঁর অনুচর ইয়াসুমাসার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। উদ্যানের সুন্দর ফুলগুলি রাইকোর মন হরণ করে নিয়েছে·· ইত্যাদি।

কোরাস-সঙ্গীত রাত্রির গভীরতা তার অপূর্ব কাব্যে প্রকাশ করল। একটি ছবির মত সমগ্র পরিবেশটি ফুটে উঠল দর্শকদের চোখে—কোরাস গান গাইছে—

সঙ্গীত। “যখন দীর্ঘ শরৎরাত্রি হল অবসান
বিকশিল প্রভাত আলোক।
আমরা—
আমি আর প্রিয়তমা মোর
নিয়েছি বিদায়,
বেদনায় ভরা দু'টি চোখ।······
আর আমি যখন বেরিয়ে এলাম শীতল হাওয়ায়”—

পার্শ্ববর্তী কোরাসের এই অসমাপ্ত গীতিকাব্যেরই পাদপূরণ করে যেন মঞ্চে রাইকো বলে উঠলেন—

রাইকো। “আমার শীত লাগল, আমি অসুস্থ বোধ করলাম।”
পূর্বের মনোরম পরিবেশটির সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈপরীত্য।

ইয়াসুমাসা। “আপনার পরিচারকরা তাদের যথাসাধ্য করছে।”
সঙ্গীত তখন নির্লিপ্তভাবে কাহিনীর অপূর্ণতা
পূরণ করে চলেছে—শুধু মাত্র বিবরণ দান।

সঙ্গীত। “মহামান্য সম্রাট করুণাপরবশ হয়ে
পাঠিয়েছিলেন প্রধান ঔষধপ্রস্তুতকারীকে
তাঁর জন্য প্রস্তুত করতে ওষুধ।”

আর কিছুটা সংলাপের পর ইয়াসুমাসা বিদায় নিল।

কোরাস সে সংবাদটি জানিয়ে বলল।

সঙ্গীত। “এই রকম বলে—
ইয়াসুমাসা পাশের কক্ষে চলে গেল।”

কোরাস এবার তার কাব্যমণ্ডিত ভাষায় পরবর্তী চরিত্রটির পরিচয় দিয়ে আগমন বার্তা জানাল।

সঙ্গীত। "চন্দ্র যখন লুকোচুরি খেলে
মেঘের গায়ে—
শান্তভাবে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলে
এগিয়ে এল কোচো,
সুন্দরী পরিচারিকা
তার প্রভু রাইকোর দিকে।"………

"কোচো" (Kocho) "রাইকোর" (Raiko) আনন্দ বিধানের জন্য নৃত্য সুরু করল। এই নৃত্যের সঙ্গে প্রকৃতির এক অপূর্ব গীতিবর্ণনা দিয়ে চলল কোরাস সঙ্গীতকারীরদল। পাহাডেব বুকে ম্যাপেল বনানীতে জেগেছে ঝরা পাতার কান্না।

সঙ্গীত। "তাকাও পাহাডের নাম ছিল, তার ম্যাপেল বৃক্ষের তরে,
শরতের রং ধরা সেই গাছ।
ওগুরা পাহাডের চূড়া এখন আলোকিত
অস্ত সূর্যের ঐশ্বর্য আভায়।
আরাশিয়ামার হলুদ পত্রপল্লব
ঝড়ের দোলায় হল প্রকম্পিত।
ওই (Oi) নদী, ওই—
ভেসে যায়, ভেসে যায় ঝরা পাতা কত—
হলুদ ও লাল, আব লাল ও হলুদ।"

নৃত্য শেষে কোচো চলে গেল, রাইকো জ্বরের উত্তাপে কেঁপে উঠলেন। কোরাস জীবনের সুগভীর দার্শনিকতা ব্যাখ্যা করে চলল এবং তার সঙ্গে পুরোহিত "চিচু" বা ছদ্মবেশী মাকড়সার (Chichu or the Spider) হঠাৎ প্রবেশের কথা প্রচার করল, দর্শকদের জানিয়ে দিল ভবিষ্যৎ অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত।

সঙ্গীত। "মেঘ আর কুয়াশার গ্রাসে ঢাকা পড়ে চাঁদ,
যে আলোক এতই উজ্জ্বল, এখন তা অন্ধকারময়।"

সঙ্গীত। "হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক পুরোহিত, জপমালা হাতে।"

এরপরে পুরোহিত চিচু যখন রাইকোর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে

আত্মপরিচয় দিচ্ছে, তখন কোরাসও বলে চলেছে চিচুর পরিচয়। আবার কখনো রাইকোর অভিশপ্ত জীবনের বেদনা কোরাস সঙ্গীতে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত। "এই পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য
কালো ধর্মীয় পোষাক আমি পরেছি।
একদিন আমি সুদূর উত্তরের সমুদ্র সৈকতে একাকী ঘুরে বেড়াই,
আর তার পরদিনই আমি পরিদর্শনে যাই—
বহুদূরবর্তী কিউশুর উপকূল।"

পুরোহিত চিচু স্বয়ং বলছে,

চিচু। "লোকেরা বসন্তের পুষ্প এবং শরতের
চাঁদেরই প্রশংসা করে।"

প্রত্যুত্তরে কোরাস তখন চিচুর বক্তব্য বলে যাচ্ছে,

সঙ্গীত। "কিন্তু আমার জন্য এই বিশ্বজগৎ খোলা,
কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে না, কোন কিছুতেই
আমার কৌতূহল নেই।
অনেক তপশ্চর্যা আমি করেছি,
হেঁটে পার হয়েছি অশান্ত নদী,
পার হয়েছি বন্য প্রান্তর।"

তারপরে পুরোহিত-বেশী দানব মাকড়সা বলল, আমি তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আচরণ দেখে রাইকোর পরিচারক বালকটি সংশয়াম্বিত হয়ে উঠল। কোরাস সঙ্গীত তখন আর চরিত্রগুলির প্রত্যক্ষ মুখপাত্র নয়। সে নৈর্ব্যক্তিকভাবে নাটকের কাহিনী এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির উদ্দেশ্য ও আচরণ বর্ণনা করে যাচ্ছে। অভিনেতারা কোরাস বর্ণিত কাহিনীর আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চে সামান্য কিছু সংলাপ বলছে।

সঙ্গীত। "প্রভু রাইকোর দিকে এগিয়ে এল
সেই পুরোহিত বেশী—
হাতে নিয়ে তার জপমালা।
দেখে কেমন সন্দেহ জাগে মনে
বালক ভৃত্য বাধা দিল তাকে।"

বালক ভৃত্য। "সতর্ক হন, প্রভু সতর্ক হন—"

রাইকো। "তুমি কি বলছ ?"

বালক ভৃত্য। "প্রভু, এই পুরোহিতকে বড়ই অদ্ভুত
লাগছে দেখতে।"

সঙ্গীত। "আশ্চর্য হয়ে রাইকো ফিরে তাকালেন,
হঠাৎ নিভল সব আলো"—

রাইকো। "নিশ্চয়ই এ কোন দানবীয় শক্তির কাজ—
এই অন্ধকার হয়ে যাওয়া। কই, কোথাও তো
হাওয়া নেই, তবে প্রদীপ নিভল কেন ?"

চিচু। "এমন ঘটনা কি তুমি এই প্রথম দেখলে ?"

রাইকো। "তোমার চেহারাটা কুৎসিত মাকড়সার মত।"

সঙ্গীত। "এবং সেই বিরাট আকার মাকড়সার মত
সেই দানবের চেহারা
রাইকোর দিকে এগিয়ে চলল
আর তাঁর চারপাশে বুনতে লাগল জাল।
রাইকো তার তরবারি তুলে নিলেন
আঘাত করলেন সেই দানবকে।
মাকড়সা মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল
এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।"

(ইয়াসুমাসার দ্রুত প্রবেশ)

ইয়াসুমাসা। "আমি ছুটে এলাম প্রভু, আপনার কণ্ঠস্বরে
চকিত হয়ে।"

সঙ্গীত। "ইয়াসুমাসা—প্রভুর আদেশ পেয়ে,
প্রচণ্ড উদ্দামতায় ছুটে বেরিয়ে গেল।
প্রভু রাইকো অন্তঃপুরের দিকে গেলেন,
সঙ্গে নিয়ে বালক-ভৃত্য।"

মূল নাটক এখানেই শেষ। নায়ক, প্রতিনায়ক এবং তাদের সহকারীরা সকলেই মঞ্চ থেকে প্রস্থান করল। এরপরে মঞ্চে একটি 'কৌতুক নাটিকা' নৃত্যে পরিবেশিত হল। এই কৌতুক নাটিকাটি ছিল অর্থহীন হাস্যরসাত্মক। এই নাটিকাটির শেষে সবুজ কাপড়ে আবৃত একটি বেদী এনে মঞ্চে রাখা হল। এটিই সেই দানব-মাকড়সার আবাস-স্থল। সে রাইকোর গৃহ থেকে বিতাড়িত

হয়ে এখানেই এসে আত্মগোপন করেছে। এখানে সবুজ রংটি ইঙ্গিতপূর্ণ। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো'তেও আমরা পেয়েছি "সবুজ চক্ষু দানব" (Green eyed monster)।

এরপর ইয়াসুমাসা এবং তার আর চারজন সঙ্গী দানবটিকে তার কবর ভেঙ্গে হত্যা করবার জন্য মঞ্চের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। যে পথে মাকড়সা এসেছিল সেই পথেই তারা এগিয়ে চলল।

ইয়াসুমাসা। "এসো তোমরা এসো। আমরা এই কবরবেদীটা
ভেঙ্গে ফেলি। তোমাকে এবার মরতেই হবে দানব।
যত অলৌকিক শক্তিই তোমার থাক না কেন
তাতে কিছুই এসে যায় না।"

অন্য চারজন। "এসো আমরা আক্রমণ করি।"

সঙ্গীত। "তারা সেই কবরবেদী ধ্বংস করতে সুরু করল।
কিন্তু বিষাক্ত বাতাসে তারা ফিরে এল
পশ্চাদ্-দিকে।
মাটি কম্পিত হল, পৃথিবী নড়ে উঠল,
ঝলসে উঠল আগুনের শিখা।
মাকড়সার জাল থেকে
উচ্ছলিত হয়ে পড়ল জলের ধারা।
কিন্তু এই সমস্ত ভয়ংকর দৃশ্যে
তারা কণামাত্রও হতাশ না হয়ে
সেই কবরবেদী ভেঙ্গে ফেলল।
তখন বেরিয়ে এল সেই দানব মাকড়সা,
বিরাট, ভয়ংকর তার আকার।"

এবার দু'দলের যুদ্ধ আরম্ভ হল। মাকড়সা তার রূপালী জাল বিস্তার করে যোদ্ধাদের বন্দী করে ফেলল। তারা বহু কষ্টে মুক্তি পেয়ে সেই মাকড়সাকে আক্রমণ করল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইয়াসুমাসার এক চরম আঘাতে তার মৃত্যু হল। কোরাস তখন গেয়ে উঠল—

সঙ্গীত। "আর তারপরে এই অদ্ভুত অভিযানের কাহিনী
বলা হতে লাগল বংশ বংশ ধরে।"

"দ্যা মনস্ট্রাস্ স্পাইডার্" নাটকটির বিস্তৃত আলোচনা থেকে জাপানী

নাটকে কোরাস সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। মঞ্চে যতক্ষণ অভিনয় চলত অভিনেতাদের বাম পার্শ্বে, নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানটিতে ৬ বা ততোধিক ব্যক্তির কোরাসদলটি বসে থাকত, এরা অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গীতিকাব্য আবৃত্তি করে চলত। নো নাটকে কোরাসের ভূমিকা প্রায় গ্রাক নাটকের কোরাসের অনুরূপই ছিল। তারা গ্রীক কোরাসের মতই আগামী ঘটনার সম্ভাবনা উদ্ঘাটিত করত, প্রধান চরিত্রগুলির কার্যের সমালোচনা করত এবং দর্শকদের ভালমন্দ নির্দেশ দিত।

পুরুষরাই হত প্রধান অভিনেতা, তারা সংখ্যায় থাকত দুই, তিন বা চারজন। তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে ধীর গতিতে ঢুকত এবং তাদের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি, অনুভূতি ও চিন্তাই প্রচলিত নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হত। একমাত্র যুবক চরিত্র ছাড়া অন্য সমস্ত মুখ্য চরিত্রই মুখোশ ব্যবহার করত। যাদের মুখোশ থাকত না তারা মুখে পুরু প্রলেপ লাগিয়ে এমন অঙ্কিত মেক্-আপ ব্যবহার করত, যা মুখোশেরই অনুরূপ ছিল বলা যায়। ফলে অভিনয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে যেত। মুখোশগুলি সুন্দরভাবে আঁকানো এবং প্রথানুযায়ী হলেও তা মোটেই বাস্তবানুগ ছিল না। মুখোশগুলি কতকগুলি নিজস্ব ধরনের চারিত্রিক অভিব্যক্তিই প্রকাশ করত; অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদও হত অত্যন্ত মূল্যবান এবং ঝক্‌ঝকে। অন্যদিকে জাপানের মঞ্চটি হত বাহুল্যবর্জিত, সাদামাটা—এই মঞ্চে অভিনেতাদের অত্যুজ্জ্বল বেশভূষা এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও সংঘাত সৃষ্টি করত। যখন নো নাটক মন্দিরের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পৃক্ত ছিল তখন কেবল অভিনেতারাই নয় দর্শকরাও আসত উৎসব দিনের ঝক্‌ঝকে পোষাক পরে।

॥ "নো" নাটকের মঞ্চ ও মঞ্চোপকরণ ॥

নো নাটকের অভিনয়কালে মঞ্চে খুব স্বল্প সংখ্যক জিনিসপত্র (Stage and Hand Props) ব্যবহৃত হত এবং সেই উপকরণগুলিও পুরোপুরিই নাট্যধর্মী প্রথায় অভিনয়কালে কাজে লাগান হত। মঞ্চে ব্যবহারের জন্য অতিশয় সহজ, সরল, কিন্তু অত্যধিক প্রয়োজনীয় উপকরণটি হল একখানি সুদৃশ্য পাখা। অভিনেতারা এ ছাড়াও অনেক সময় ঢাল, তলোয়ার, বর্শা

প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়ে মঞ্চে ঢুকতেন। মঞ্চ উপকরণের মধ্যে প্রধান ছিল একটা কাঠের তৈরী চৌকি ; একে বলা হত "ইচিজো দাই" (Ichijo Dai) এই চৌকিটি হত—৬´ ফুট লম্বা, ৩´ ফুট চওড়া, ১´ ফুট উঁচু। মঞ্চে এটিকে অনেক সময়ই অনেক কিছুর প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হত। কখনো বা একে মনে করা হত পর্বতের সানুদেশ, আবার কখনো বা ধরে নেওয়া হত তাকে শয়ন কক্ষ হিসেবে। মঞ্চে যে নৌকো দেখা যেত তা হত হালকা বাঁশের তৈরী নৌকোর একটা বহির্গঠন। এই নৌকোখানা নিয়ে মঞ্চে ঢুকত নৌকোর মাঝিরূপী অভিনেতা। আর একটি উপকরণের ব্যবহার নো মঞ্চে প্রায়শঃই দেখা যেত, তা হল কালো বার্নিশ করা পিপের মত চোঙাকৃতি একটা বসবার আসন। এর নাম ছিল "কোশিওকে" (Koshioke) এটা বসবার আসন, বা রাজসিংহাসনের এক হাস্যকর অনুকৃতি হিসেবে গীত-সমন্বিত কাহিনীতে ব্যবহৃত হত। অনেক সময় মদ্যপাত্রের জন্য একটা ঢাকনা ব্যবহার করা হত, মদ্যপাত্র হিসেবে সেটা আকারে অনেক বড় হলেও মঞ্চের বৃহৎ পরিবেশে সেটা বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হত।

নো নাটকের গঠনশৈলীতে পাশ্চাত্য নাটকের মত ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রের অ্যাকৃশন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ক্রমপরিবর্তন নেই, নেই কোন দার্শনিক তত্ত্বময় জীবনব্যাখ্যা। নো নাটকের পথ ভিন্ন—তার যাত্রা সৌন্দর্যময় কল্পলোকে। নাটকে নৃত্যগীতই মূল উপাদান, সংঘাত এবং সংলাপ নয়। তাই নো নাটকের মঞ্চোপকরণগুলিও বাহুল্য বর্জিত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ নো নাটক পরিবেশনায়ও বাস্তবের প্রতিবিম্ব কখনো হয়ে উঠতে চায়নি। নো নাটকের মঞ্চও তেমনি নৃত্য ও চিত্রের প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ—নাটকে যেমন জীবনানুগ গতিশীলতা নেই, মঞ্চেও তেমনি নেই কোন প্রয়োজনানুগ ক্রমবিকাশ—ধ্রুপদী শিল্পের সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই সে এখনো আবদ্ধ, বিধৃত।

রীতি অনুযায়ী নো নাটকের মূল মঞ্চ হল বর্গাকৃতি। এই মঞ্চটি তৈরী হত আয়নার মত প্রতিবিম্বিত হয়.এমন ঝকৃঝকে পালিশ লাগান সাইপ্রেস বৃক্ষের কাঠ দিয়ে। মঞ্চের নিম্নটা হত ফাঁপা, যাতে নৃত্যকালের প্রতিটি পদাঘাত অনুরণিত হতে থাকে। কাজেই নির্ভুলভাবেই বলা যায় যে নাট্যাভিনয় নয় নৃত্যনাট্যকে উদ্দেশ্য করেই গড়ে উঠেছিল মঞ্চ পরিকল্পনা। সাইপ্রেস কাঠ অত্যন্ত হালকা, নরম এবং তার আঁশগুলি বড় বড় হওয়ায়

তাকে খুব পাতলাভাবে চেরা যায় এবং মসৃণ হয় সুতরাং নৃত্য মঞ্চের জন্য এই বিশেষ কাঠটি বাছাই করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। বর্গাকৃতি মঞ্চটির মাপ হত ১৯ ফুটবর্গ—অর্থাৎ ১৯´ফুট লম্বা এবং ১৯´ফুট চওড়া। মঞ্চটি সামনের দিকে সামান্য একটু ঢালু হয়ে আসত। মঞ্চের প্রত্যেক কোণাতে থাকত এক একটি অলংকৃত স্তম্ভ যা উপরের ছাদটিকে ধারণ করে রাখত। নো মঞ্চের এই ছাদটি হয়তো আদিযুগের মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনয়কালে মন্দিরের ছাদই ছিল। পরে যখন তা বহিরঙ্গনে চলে এল তখন মঞ্চের উপর



নো রঙ্গমঞ্চ।

আচ্ছাদনরূপে তাই একটা সুষ্ঠু শৈল্পিকরূপ পেল, কিন্তু এরপরই প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে ছাদটি মঞ্চের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল। বর্তমান কালে যখন রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরেও মঞ্চ তৈরী হয় তখন একান্ত অপ্রয়োজনীয় হলেও মঞ্চের উপর একটি অলংকৃত অংশ হিসেবে এই ছাদটি শোভা পেতে থাকে। মুক্তাঙ্গনে অভিনয় কাল থেকেই এই ছাদটি নো মঞ্চের অপরিহার্য অংশ হয়ে রয়েছে। নো মঞ্চ-স্থাপত্যের এই রীতি কাবুকি মঞ্চও প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তী কালেও টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এসে এই রীতি জাপানী মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে।

বিভিন্ন কোণায় যে স্তম্ভগুলি রয়েছে, তাদের নামও বিভিন্নতর। মঞ্চে ঢুকবার মুখেই যে স্তম্ভটা তার নাম—১। "শিতে বাশিরা" (Shite bashira)

তারপরেরটার নাম ২। "মেৎসুকে বাশিরা" (Metsuke bashira), তৃতীয়টির নাম ছিল ৩। "ওয়াকি বাশিরা" (Waki bashira) এবং সর্বশেষটির নাম ৪। "ফুয়ে বাশিরা" (Fue bashira) এই স্তম্ভগুলি নৃত্য কি কি পথে আবর্তিত হবে তার নির্দেশক বিন্দু ছিল। আমরা জানি হিন্দু রঙ্গালয়ে মত্তবারণীরও অন্যতম কাজ ছিল পরিক্রমাকালে অভিনেতাদের গতিপথ নির্দেশ করা।

মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তী বিশ্রাম গৃহের যে দেয়াল তাতে প্রথানুযায়ী সর্বদাই একটি পাইনগাছ অঙ্কিত থাকত। পণ্ডিতদের মতে এই অঙ্কিত পাইন গাছের প্রথা এসেছিল "নারার" (Nara) "কাসুগা" মন্দিরে অঙ্কিত একটি পাইন গাছের স্কেচ্ থেকে। এই পশ্চাদ্-দেয়ালের বাম দিকে একটা "সরন্ত দরজা" (Sliding door) থাকত তার নাম ছিল "কিরিদো" (Kirido)। এই দরজা দিয়ে কোরাস এবং মঞ্চ-সজ্জার সহায়ক ব্যক্তিরা যাওয়া আসা করত। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তম্ভের পরে অর্থাৎ দর্শকদের ডানদিকে মঞ্চের খানিকটা বাড়তি অংশ রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকত। বর্গাকৃতি মূল মঞ্চের বাইরের এই বাড়তি অংশটায় কোরাসরা আসন গ্রহণ করত। অর্কেস্ট্রা বসত মঞ্চের পশ্চাদ্-দেয়ালে যে পাইন গাছটা অঙ্কিত থাকত ঠিক তার নীচে, এই স্থানটির নাম ছিল "আতোজা" (Atoza)। হিন্দু রঙ্গমঞ্চে এই অংশটিকে বলা হত "কুতপ", এখানে যন্ত্রশিল্পীরা বসতেন। প্রধান রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ দিয়ে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত নেমে আসত। বর্তমান কালে এটা সম্পূর্ণই আলংকারিক ভাবে টিকে রয়েছে। কিন্তু এই সিঁড়িটি সংযুক্ত হয়েছে সেই যুগে যখন কোন অভিনেতাকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ডাকা হত—অভিনেতা এই সিঁড়ি দিয়েই প্রেক্ষাগৃহে নেমে আসতেন। অভিনেতারা দর্শকদের বাম পার্শ্বস্থ যে পথ দিয়ে মঞ্চে ঢুকতেন তাকে বলা হত "হাসিগাকারি" (Hashigakari), এই পথটি উপরে আচ্ছাদন দেওয়া এবং রেলিং ঘেরা থাকত। পথটি সোজা চলে যেত মঞ্চ থেকে গ্রীনরুমের দিকে। এই পথটির দৈর্ঘ্য কতটা হবে তার কোন নির্দিষ্ট মাপ ছিল না। পথটির দৈর্ঘ্য মঞ্চ থেকে গ্রীনরুম বা সাজঘরের দূরত্বের উপরই নির্ভর করত। পথটি মঞ্চের যে কোণের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত সেখানে মঞ্চটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে পথের সঙ্গে মিশে যেত। হাশিগাকারির পাশে তিনটি জাপানী পদ্ধতিতে ছোট করে রাখা পাইন গাছ লাগানো থাকত। এই

গাছগুলি বসানো হত হাশিগাকারির কিনারা ঘেঁষে নুড়ি বাঁধানো একটি পথের উপর, এই পথটি সমগ্র মঞ্চকেই ঘুরে আসত। হাশিগাকারির প্রবেশ মুখ একটি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকত, এই পর্দাটির নাম ছিল "আগেমাকু" (Agemaku), এর গায়ে লম্বা লম্বা রেখা দ্বারা স্ট্রাইপ কেটে নকশা করা থাকত। তাতে সবুজ, গাঢ় হলুদ, রক্তিম, গভীর লাল, কমলা প্রভৃতি নানা বর্ণের সমারোহ দেখা যেত। তার সঙ্গে কমলা রং-এর লম্বা, মোটা সুতোর ট্যাসেল দিয়ে প্রত্যেক মাথায় ফাঁস লাগানো থাকত। পর্দার নীচের দু'টি অংশ ভূমি পর্যন্ত নেমে আসত, দু'জন লোক দুই দিক থেকে নিম্নের দুই প্রান্ত ধরে থাকত এবং যখন কোন অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ বা প্রস্থান করতেন তখন তড়িৎগতিতে পর্দাটি উপর দিকে তুলে দিত। এই পর্দার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ থাকত তার নাম ছিল "কাগামিনোমা" (Kagaminoma), অথবা আরশি বসানো ঘর। এই নাম হওয়ার কারণ ছিল এই যে, এই কক্ষে একটি মস্ত বড় আরশি আটকানো থাকত, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশের পূর্বক্ষণে তাদের পোষাক, পরচুলা, মুখোশ প্রভৃতি ঠিক করে নিতে পারতেন।

নো মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহের এক পাশে মাঝখান দিয়ে তৈরী হত। মূল মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এগিয়ে আসত এবং তার তিন দিকই অনাবৃত থাকত, ফলে দর্শক সমাজ মঞ্চের দু'পাশে এবং সম্মুখে তিন দিকেই বসতে পারত। আবার মঞ্চ ও হাশিগাকারি ঘিরে নুড়ি বিছানো পথ থাকায় দর্শকদের একটু দূরত্বও বজায় রাখতে হত। কিন্তু নাট্যাভিনয় ইউরোপীয়দের মত ফ্রেমে বাধানো একখানি চিত্রের মত হত না। মঞ্চ ও দর্শকদের মাঝে সামান্য পথের ব্যবধান ছাড়া আর কোন ব্যবধানই ছিল না, সুতরাং নাট্যানুষ্ঠানটি দর্শকদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠত। কাবুকি মঞ্চশিল্পীরা কিন্তু "ত্রি-মাত্রিক" চিত্রগুণ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টায় ছিলেন। তাই তারা হাশিগাকারি বা সাজঘরে যাওয়ার পথকে মঞ্চ স্থাপত্যের অখণ্ড অংশ করে তুললেন। পরবর্তীকালে এই পথই বিবর্তিত হয়ে নবরূপে দেখা দিল "হানামিচি" (Hanamichi) বা পুষ্পপথ রূপে। এই পুষ্পপথকে বলা যায় মঞ্চের এক অভিনব আঙ্গিক। কাবুকি অভিনেতারা এই পথের সহায়তায় দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাট্যাভিনয়ের এক নিজস্ব রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

॥ কাবুকি ॥

জাপানে নো নাটক ছিল প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস পূর্বকালে উদ্ভূত ধ্রুপদী নাটক। আর "কাবুকি" নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল "তোকুগাওয়া" (Tokugawa—১৫৪২-১৬১৭ খ্রীঃ) বা "ইয়েদো" (Yedo) যুগে এবং তার পূর্ণপরিণতি ও বিস্তার হয়েছিল "গেন্‌রোকু" (Genroku—১৬৭৩-১৭৩৫ খ্রীঃ) যুগে। জাপানে এ ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। এযুগে বহু রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। সুতরাং কাবুকি নাটক সমুন্নত স্তরের ধ্রুপদী নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। তার মধ্যে ঘটেছে নবনবজীবনায়ন। সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনের প্রভাব তাই প্রকাশ পেয়েছে কাবুকির চিন্তায়, চরিত্রে এবং উপস্থাপনায়।

এই প্রভাবকে বুঝতে হলে আমাদের তৎকালীন জাপানের প্রচলিত আচার, আচরণ এবং সামাজিক-রীতিনীতির সামান্য কিছু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। ইয়েদো যুগে জাপানের সমাজে সর্বোচ্চ স্তরের লোক ছিলেন "সামুরাই" (Samurai) বা যোদ্ধশ্রেণীর লোকেরা। এরাই ছিলেন অভিজাত এবং রাষ্ট্রের পরিচালক। এই যোদ্ধশ্রেণী নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ দু'খানা তরবারি ধারণ করতে পারতেন, এ অধিকার অন্য কোন শ্রেণীর ছিল না। এই তরবারি যে কেবলমাত্র যুদ্ধের অস্ত্রই ছিল তা নয়—এ ছিল বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্য এবং পারিবারিক সম্মানের চিহ্ন। অতএব একে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করতেন। কাবুকি মঞ্চে এই তরবারির প্রভাব ছিল খুব বেশি। কারণ কাহিনীর মধ্যে প্রায়ই এই তরবারি নিয়ে একটা কিছু গোলযোগ দেখা দিত—হয় এটা চুরি গেছে, না হয় হারিয়েছে এবং পারিবারিক সম্মানের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। এই যোদ্ধারা দু'খানা তরবারিই কাছে রাখতেন, এছাড়া একখানা পাখাও তাদের সঙ্গে সর্বদা বাঁধা থাকত। তারা তাদের মাথার সামনের দিক কামাতেন, এবং পেছন-দিকের দীর্ঘকেশ প্রতিদিনই পরিচর্যা করে বেঁধে রাখতেন। স্নান তারা প্রতিদিনই করতেন। অত্যন্ত অভিজাত এবং গাম্ভীর্যময় ছিল তাদের চলাফেরা এবং অবস্থান।

ইয়েদো যুগের দীর্ঘশান্তির কালে এরা ক্রমশঃ বিলাসে নিমগ্ন হয়ে সম্পত্তি ও যুদ্ধক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। তাই এযুগে অর্থ ও প্রতিপত্তিতে

প্রবল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় আর এক শ্রেণী তারা হলেন 'চোনিন্' (Chonin) বা ব্যবসায়ীরা। চোনিন্‌রা অনেক চটপটে এবং পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, তারা নির্ভীকভাবে শাসকশ্রেণীর সমালোচনা করতেন এবং 'শিভাল্‌রি' দেখিয়ে দুর্বলকে সাহায্য করতেন। সমাজের এই সমস্ত শ্রেণীগত চরিত্রগুলি কাবুকি নাটককে ও মঞ্চকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। এইভাবেই কাবুকি জাপানের সমাজ জীবনে অধিষ্ঠিত হল এবং জাপানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার এক সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে পরিগণিত হল।

কাবুকির উপরে জাপানের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছিল। যেমন ছিল "মাৎসুরি" (Matsuri) বা জাপানীদের ধর্মীয় আহার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান দিনে সকলেই ইচ্ছামত নৃত্য, গীতে যোগ দিত। এ ছাড়া ছিল জাপানীদের জনপ্রিয় "সুমো" (Sumo) বা কুস্তিলড়াই-এর অনুষ্ঠান। এই সব বিজেতারা কাবুকি মঞ্চে উঠে আসতেন। আর ছিল 'তোবি' (Tobi) বা অগ্নিনির্বাপক দল। জাপান ভূমিকম্পের দেশ বলে বাড়িগুলি প্রধানতঃই কাঠ ও কাগজে তৈরী হত, সুতরাং অগ্নিকাণ্ডটা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা,—অগ্নিনির্বাপকদলও তাই জাপান সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। এরা এদের উত্তেজিত মেজাজ এবং চটপটে কাজকর্ম নিয়েও মঞ্চে দেখা দিতে লাগল।

এছাড়া কাবুকিতে আর এক ধরনের চরিত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—তারা হলেন নগরের বারাঙ্গনারা। বহু কাবুকি নাটকেই একটি বারাঙ্গনা চরিত্র দেখা যায়। সাধারণ সমাজ জীবনে বারাঙ্গনা চরিত্রের প্রতি আমাদের যে বিরূপতা আছে, এদের উপর তা আরোপ করা অযৌক্তিক হবে। বর্তমান কালের প্রতি নগরীর যারা রাত্রির সঙ্গিনী, এদের এককথায় সে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে জাপানের পারিবারিক জীবনে কোন রকম রোমান্সের সম্ভাবনাই ছিল না অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে ভাললাগা, মন্দলাগার কোন প্রশ্নই উঠত না। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্বাচন ছাড়া অন্য সম্পর্ক কেবল যে অবৈধ ছিল তা নয়, ছিল গুরুতর শাস্তিমূলক অপরাধ—সেখানে প্রধান কথাই ছিল বংশধারা রক্ষা করা। সুতরাং তরুণ সমাজ শাসনতন্ত্রের স্বৈরাচার, পারিবারিক কর্তব্যের একঘেয়েমি ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পেতে ছুটত এই বারাঙ্গনাদের কাছে। এবং এক্ষেত্রে কোন সামাজিক

নিষেধও ছিল না। এখানে তারা পেত মুক্তি, পেত আনন্দ, উত্তেজনার ক্ষেত্র এবং রোমান্সের স্বাদ।

যিনি প্রধান বারাঙ্গনা হতেন ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তিনি কিন্তু কেবল দৈহিক সৌন্দর্য এবং জৈবিক আকর্ষণের বস্তু হয়েই থাকতেন না। তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহু প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করতে হত। তিনি সঙ্গীত এবং বিবিধ শিল্পে পারদর্শিনী হতেন। তাঁকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুরসিকা এবং কথোপকথনে পারঙ্গমা হতে হত, জানতে হত রাজসভার এবং অভিজাত-মহলের প্রচলিত আচার আচরণ।[১] তাঁদের দর্শনপ্রার্থিদেরও হতে হত সুরুচি সম্পন্ন। এঁরাই ছিলেন চোনিন্ সম্প্রদায়ের "মানসী"। বছরের কোন এক সময়ে এঁরা সুসজ্জিত ভাবে শোভাযাত্রা করে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য বেরোতেন। এমন কি তাঁরা যখন একক ভাবেও চলতেন তখনও তাঁদের সর্বপ্রকার অভিজাত বিলাস ও আড়ম্বর থাকত। এই বারাঙ্গনাদের চরিত্র এবং তাঁদের মার্জিত আভিজাত্যপূর্ণ আচরণের প্রকাশ আমরা কাবুকি নাটকের সর্বত্রই পাই। এঁরাই ছিলেন জাপানের সুবিখ্যাত "গেইশা" চরিত্র।

সুগম্ভীর, সৌন্দর্যময়ী বহু কলা পারদর্শিনী হতেন প্রধান বারাঙ্গনা, অতএব তাঁর চারদিকে এসে ভিড় করতেন দেশের যত জ্ঞানী, গুণী, কবি ও শিল্পীর দল—তাঁরাই ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি। সুতরাং এই বারাঙ্গনারাই হতেন দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও সমাজজীবনের মধ্যমণি। এই সমাবেশে ব্যবসায়িশ্রেণীরই ছিল অগ্রাধিকার, কারণ যোদ্ধশ্রেণীর যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া আর সবকিছুই নিষিদ্ধ ছিল। এবার আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে কি ভাবে এঁরা কাবুকি নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের চারপাশে এমনিতেই মঞ্চের অনুরূপ দর্শকরা ঘিরে থাকত এবং এঁদের সৌন্দর্য ও কোমলতায় মুগ্ধ হত।

অবশ্য মঞ্চদৃশ্যে স্বামীর ছায়াস্বরূপিনী জাপানী সতীসাধ্বী কুলবধূর চরিত্রও যে একেবারে বাদ পড়ত তা নয়।

এছাড়া জাপানীদের জীবনযাত্রার কতকগুলি নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তা ইত্যাদির প্রভাবও পড়েছে কাবুকি মঞ্চে। জাপানীদের জীবন যাত্রায় কতকগুলি এমন অদ্ভুত নিজস্বতা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যত্র একান্ত দুর্লভ, তাদের গৃহনির্মাণ কৌশল, পোষাকপরিচ্ছদ, গৃহের আসবাব-

পত্র, সবকিছুই হত আশ্চর্যজনকভাবে সরল, ব্যয়বাহুল্যহীন, অথচ সুন্দর আলংকারিক। তাদের জীবনযাত্রার এই সরলতা ও সৌন্দর্যের সমন্বয় দেখা যায় কাবুকি মঞ্চের সেটে, পোষাকে এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে।

জাপানের বাড়ি ঘরগুলি পুরোপুরিই কাঠ ও প্লাষ্টারে তৈরী হত, উপকরণগুলি অত্যন্ত হালকা হলেও তাতে কাচ থাকত না। বাড়ির জানলাগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরী হত, তাতে থাকত বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট কাগজের পরদা এবং দুই ঘরের মধ্যকার সরন্ত দরজাও এই কাগজের আবরণে তৈরী হত। এদের ঘরের মেঝেতে বিছানো থাকত খড়ের উপর নিপুণ হাতে বোনা মাদুর। মেঝের মাপও মাদুরের সংখ্যা দিয়ে হিসেব করা হত। একটি মাদুর ৬' ফুট লম্বা ৩' ফুট চওড়া, এবং খড়ের উচ্চতা হত ২" ইঞ্চি। এই মাদুরের নাম ছিল "তাতামি" (Tatami) তাদের গৃহসজ্জার যা প্রধান উপকরণ ছিল, তা ধনী দরিদ্র সকলের ঘরেই দেখা যেত।

জাপানীদের গৃহের এক প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকত এই স্থানটির নাম হত "তোকোনোমা" (Tokonoma), সেখানে টাঙ্গানো থাকত একটি নিপুণ হাতে আঁকা "স্ক্রোল" (Scroll)[২] ছবি আর থাকত একগুচ্ছ ফুল—এ দু'টোই ঋতু অনুযায়ী নির্বাচন করা হত। ঘরের কাঠের কারুকার্যের উপর কোন উজ্জ্বল রং দেওয়া হত না, স্বাভাবিক রং-এর সঙ্গে মানিয়ে সামান্য একটু পালিশের ছোঁয়া লাগান হত। ঘরে পশ্চিমী ধরনের কোন আসবাব-পত্রই ব্যবহৃত হত না—আগন্তুকরা বসত মেঝের মাদুরে সেখানে থাকত সিল্কের কুশন। তাদের রাত্রের শয়নও হত এই মাদুরের উপরেই একটা গদীর মত আচ্ছাদন পেতে সেগুলোও দিনের বেলা সরিয়ে ফেলা হত।

হয়তো খুব রুচিসম্মত নকশায় তৈরী আলোকদান, নীচু জলচৌকি, কিংবা ড্রয়ারওয়ালা ছোট আলমারী—এইমাত্র থাকত তাদের গৃহের আসবাবপত্র। অতএব ঘরের ভেতরটা হত খোলামেলা ঝকঝকে, তকতকে—শান্ত, কোমল স্নিগ্ধ। জাপানীরা যখন ঘরের ভিতর ঢুকত, তখন বাইরে জুতো পরিত্যাগ করে "ত্যাবি" (Tabi) নামে এক রকম মোজা পরে ঢুকত। ঘর গরম রাখবার জন্য কাঠকয়লার একটা চুল্লি থাকত, আর থাকত একটা কাঠের হাতা আগুন তুলে পাইপ জ্বালবার জন্য। ঘরে জ্বালানো হত মোমবাতি বা তৈলপ্রদীপ—এর আধারগুলি হত কারুকাজ করা সুসজ্জিত। ঘরের

উপরের আচ্ছাদন গ্রামের দিকে হত খড়ের, আর শহরে হত ধূসরবর্ণের টালির। এতক্ষণ ধরে জাপানীদের গৃহসজ্জার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম, কারণ গৃহনির্মাণের এই শিল্প সৌষ্ঠব বিশেষভাবেই "কাবুকি" মঞ্চের সেটকে প্রভাবিত করেছে। কাবুকি মঞ্চ গৃহনির্মাণের আলংকারিক চিত্ররূপটি যথেষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাত।

এরপরে আসে তাদের দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরিচ্ছদ। তাদের পরিচ্ছদ তৈরী হত সুতো, লিনেন এবং সিল্কের দ্বারা, তাতে নানা ধরনের সূচী শিল্প ছিল এবং নানান শ্রেণী বিভাগ ছিল। বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, অথবা ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পোষাক পরত তাই এই পোষাকেই তাদের শ্রেণীগত বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত। কাবুকি মঞ্চেও তাই দেখতে পাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ধরনের পোষাক পরছে। এ ছাড়া নারী, পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বহুপ্রকার কেশবিন্যাসের প্রথা প্রচলিত ছিল—তাও কিন্তু সামাজিক স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন হত, সুতরাং কাবুকির প্রতীক অভিনয়ে এই পোষাক, কেশ বিন্যাস এবং পরচুলা অত্যন্ত লক্ষনীয় বিষয় ছিল।

জাপানীদের পোষাকের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল "ত্যাবি" বা মোজা, কিন্তু এই ত্যাবির ব্যবহার বারাঙ্গনাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। মঞ্চের অন্যান্য অভিনেতাদের পক্ষে ত্যাবি ব্যবহারিক দিক দিয়েই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল কারণ জাপানী অভিনেতারা প্রধানতঃই হতেন নৃত্যশিল্পী এবং ত্যাবি ছাড়া মঞ্চে তাঁরা নিখুঁতভাবে নাচতে পারতেন না। সুতরাং প্রয়োজনকে সরিয়ে রেখে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বারাঙ্গনা যখন খালি পায়ে আসতেন, তখন তাঁকে আর চিনে নিতে কোন অসুবিধা হত না।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পোষাক, বাসস্থান, আহার ইত্যাদির যথেষ্ট মূল্যগত পার্থক্য থাকলেও সব কিছু ছাপিয়ে জেগে থাকত সামগ্রিক জীবন-যাত্রায় একটা সূক্ষ্ম রুচি এবং সহজ সুর। মঞ্চের সেটে এবং অভিনয়ে এই রুচিগত ঐক্য বিশেষভাবেই রক্ষিত হত।

সাকে (Sake) নামক মদ্য তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবার উত্তেজক পানীয় হিসেবে, এই দু' কারণেই পান করত। কাবুকি মঞ্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক সময়েই এই মদ্যপানের অভিনয় চলত।

জাপানীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাই ছিল প্রথানুসারে গ্রথিত। মধ্য-

যুগের জাপানে তাদের পোষাকপরিচ্ছদ, খাওয়া, থাকা, চলা, বলা সবকিছুর মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধান এবং ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা স্থিরীকৃত থাকত। তাদের জীবনে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য এবং নিয়মবদ্ধতার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। আমরা যাকে বলি 'এটিকেট্' তা তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারত না। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের মত তাদের হালচাল ছিল একান্ত রীতিসিদ্ধ।

অতএব কাবুকি মঞ্চে যখন এর অনুরূপ জীবনের অভিনয় হত, তখন তা একটা বিচিত্র রূপ ধারণ করত, গভীর ভাবাবেগের সময়ও এদের সীমিত, স্বল্প এবং নিয়মবদ্ধ চালচলন পশ্চিমী রুচির কাছে নিতান্ত দুর্বোধ ঠেকত। কারণ আমরা স্বাভাবিক জীবনে যে ভাবের আশ্রয়ে যে রকম আচরণ করে থাকি,—এদের সামাজিক শিক্ষা এবং বিধি অনুযায়ী তা করবার উপায় ছিল না।

কাবুকি নাটকে প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দর্শকদের চোখের সম্মুখে সুনিপুণ তুলির টানে এক একটি চিত্র অঙ্কিত করা এবং সে চিত্রের প্রতিটি রেখাই হত ইঙ্গিতধর্মী। মঞ্চে যে চলমান চিত্ররূপ ফুটে উঠত তা জীবনের কোন গভীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাময় ছিল না। সেই জন্যেই বুদ্ধি, যুক্তি বাস্তবতা—সব কিছুর অবমাননা করে কাল্পনিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এ বিচরণ করতে পারত। দু' একটা বলিষ্ঠ রেখায় হয়তো মানবচরিত্র ফুটে উঠত, কিন্তু তা বিশেষ সমাজের বিশেষ পরিবেশের অলিখিত নিয়মাবলী ছাড়িয়ে যেতে পারত না। মানব প্রকৃতির যা চিরন্তন সত্য, যা রক্তমাংসের মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, মাতায়, কাবুকি তাকে তার গণ্ডির বাইরে বলে কোনদিন ধরতে চায়নি, সে চেয়েছে নয়নকে মুগ্ধ করে মনকে ভুলিয়ে নিতে স্বপ্নলোকের পথ দেখাতে, নানান কলাকৌশলে সৃষ্ট একটি মনোরম পরিবেশে দর্শকের মনকে আবিষ্ট করে রাখতে। তাই কোমলতায়, সৌন্দর্যে এবং কল্পনাবিলাসে এর আনন্দ-দায়িনী শক্তি ছিল অত্যদ্ভুত আর এরই মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হত জাপানীদের কিংবদন্তী, ধর্ম, প্রথা, ঘৃণা, ভালবাসার কাহিনী, কিন্তু তা সম্যকভাবে জানা না থাকলে এ নাটকের রস পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না।

প্রাচ্যের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারার তুলনায় কাবুকি অনেক অর্বাচীন শিল্প প্রচেষ্টা। কাবুকি নাটকের প্রারম্ভিক ভূমিকায় আমরা এক

মূর্তিস্বরূপিণী নারীকে দেখতে পাই। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কোন ধারার আদি স্রষ্টা হিসেবে এক নারীর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। কাবুকির জন্মদাত্রী এই নারীর নাম ছিল "ও-কুনি" (O-Kuni)। ও-কুনি দেব মন্দিরের নর্তকী ছিলেন, যাকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় দেবদাসী বলা যায়। কথিত আছে ও-কুনি অতি সুন্দরী ছিলেন আর ছিলেন বহুগুণে বিভূষিতা। তিনি নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কণ, কাব্যরচনা তো জানতেনই, এমন কি তৎকালীন প্রচলিত প্রথা ,অনুযায়ী হস্তলিপিকেও শিল্প হিসেবে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোমল, অনুভূতিপ্রবণ মনের—মুগ্ধ হতেন আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে, ভালবাসতেন ফুলের সুকুমার শোভা। হয়তো বা কোন এক বরফ পড়া সন্ধ্যায় অথবা ম্যাপেল গাছের উপবনে যখন পট পরিবর্তন করত শরৎ ঋতু, তখন ও-কুনি প্রাণের আবেগে কাব্য রচনা করে যেতেন। এমনিই কোন এক আবেগময় মুহূর্তে ও-কুনি "কিওতো" (Kyoto) প্রদেশের "কোমো" (Komo) নদীর শুষ্ক বেলাভূমিতে প্রথম কাবুকি নৃত্য করেন। এই অনুষ্ঠান হয়েছিল "কেইচো" (Keicho) যুগে সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রারম্ভে (১৫৯৬-১৬১৪ খ্রীঃ মধ্যে) এই নৃত্যের মূল বিষয় ছিল বৌদ্ধ-ধর্মোৎসব কিন্তু দেবদাসীর স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যে এটি এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ এই অনুষ্ঠান সূচীকে তিনি নানাভাবে সুসংবদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। এই নাটকের মধ্যে নো নাটক বহির্গত অনেক সাধারণ রুচির বিষয় এসে পড়তে লাগল। নৃত্যের সঙ্গে বাঁশি ও ড্রাম এল। এছাড়া ও-কুনি তাঁর প্রেমিক "নাগোইয়া সান্‌রাবুরো"কেও (Nagoya Sanraburo) পেলেন সহায় হিসেবে।

অতি অল্পকাল মধ্যেই ও-কুনির চারপাশে শিক্ষার্থী নারী পুরুষের ভিড় হতে লাগল এবং একটা পূর্ণাঙ্গদল গড়ে উঠল। পুরাতন নো নাটকের ছাঁচে ঢালাই করে একটি মঞ্চ বাঁধা হল, নো-র মতই সর্বসাধারণের আকর্ষণের জন্য বহিরঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় রীতি বজায় রাখতে হল। কিন্তু তার সঙ্গে সংযোজিত হল নবধারার নৃত্যকলা। এই নবজাতক থিয়েটারের নামই হল ও-কুনির থিয়েটার, জনসাধারণ একে ঐকান্তিকভাবে সম্বর্ধিত করল এবং এই ধারাই প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছল বর্তমান যুগের কাবুকিতে।

"কাবুকি" (Kabuk) নামটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থময়। কাবুকি

নামের উদ্ভব হয়েছিল ১৬শ শতকে জাপানে প্রচলিত একটি চীনা যুগ্ম শব্দ থেকে—তা হল "কাবু" (Kabu), "কা" অর্থ "সঙ্গীত" এবং "বু" অর্থ হল "নৃত্য"। জাপানীরা এর সঙ্গে একটি সমাপ্তি পদ যুক্ত করল তা হল "সু" (Su) যার অর্থ "কিছু করা"। সুতরাং "কাবুসু" শব্দের অর্থ হল নৃত্য-গীত করা। "সু"-এর চলিত গ্রাম্য উচ্চারণ ছিল "কু" (Ku) অতএব কাবুসুর প্রচলিত নাম হয়ে গেল "কাবুকু"। "কু" হল "করা" অর্থাৎ ক্রিয়াপদ—তা যখন বিশেষ্যপদ ধারণ করে অনুষ্ঠানের নাম হল, তখন হল "কি"। এই "কি"-র আবার অন্য একটি অর্থও ছিল তা হল "নিপুণতা" বা "কৌশল"—এই অর্থটাও অভিনয়ের ক্ষেত্রে খেটে গেল—সুতরাং নৃত্য-গীতবহুল এই অভিনয়ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ অভিধা হল "কাবুকি"। এর কি-তে কিছুটা গ্রাম্যতা থাকলেও ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ নাম গ্রহণ করলেন। তাই কালক্রমে ও-কুনির থিয়েটারের কাবুকি নামই প্রচলিত হয়ে গেল।

কাবুকি শব্দটি ঢিলেঢালাভাবে প্রথমে সমস্ত জনপ্রিয় নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে,—এ জন্মলাভ করেছিল "তাইহেইকি" (Taiheiki) নামে জনসাধারণের আবৃত্তি থেকে। এগুলিই ক্রমোন্নত হয়ে নাট্যরূপ পরিগ্রহ করল যখন একজন অভিনেতা তিনটি তার সমন্বিত গিটারের সুর-সঙ্গত এবং একটি পাখা দিয়ে তাল রেখে গাথাকাহিনী আবৃত্তি করতে লাগলেন।

সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে প্রথম খাঁটি কাবুকি থিয়েটার আবির্ভূত হল যখন ও-কুনি—যিনি প্রথমে ছিলেন কেবলমাত্র একজন স্বধর্মত্যাগিনী পূজারিণী, এক নাটকের দলে কয়েকটি নৃত্যশীলা তরুণীকে একত্রিত করেন এবং তাদের দিয়ে সাধারণ অনুষ্ঠান করান। কালক্রমে এতে সাধারণ জীবনের কাহিনী সংযুক্ত হল, এল সেই সব কাহিনী যা কিংবদন্তী থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং নাটক ক্রমশঃ তার মেলোড্রামা সুলভ রীতি পেতে লাগল—ক্রমে এ দৈর্ঘ্যে গণ-অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়ে উঠল। কখন বা ৮ ঘণ্টা সময় ধরে অনুষ্ঠান হত, প্রত্যূষ থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত—আবার কতকগুলি নাটক হত খুবই ছোট।

ও-কুনি থিয়েটারের স্থায়ী দল গড়ে কাবুকি অভিনয় দেখিয়ে যেতে লাগলেন এবং তার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে অনুরূপ আরো অনেক কাবুকি দল গড়ে উঠতে লাগল। সে সব দলেও বারাঙ্গনা শ্রেণীর নারীদেরই

প্রাধান্য হল বেশি। ও-কুনির মৃত্যুর পর তাঁর দলের নাম হল "ওনা-কাবুকি" বা নারী পরিচালিত কাবুকি। নারীপ্রাধান্যযুক্ত এই কাবুকি ক্রমশঃ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল যে শহরবাসীদের মধ্যে কাবুকি নাট্যাভিনয় দেখতে ছোটাটা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ১৬২৯ খ্রীঃ জাপানে এক সরকারি আইন জারি করে রঙ্গমঞ্চে নারীদের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। কারণ তাদের অভিমত ছিল যে এই অভিনেত্রীদের প্রভাব জনসাধারণের উপর অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এই আইনের ফলে জাপানী মঞ্চে বহুবর্ষের মধ্যে আর অভিনেত্রী হিসেবে নারীরা প্রবেশ লাভ করতে পারল না। কাবুকির প্রথম অধ্যায়—নারীদের কাবুকি শেষ হল।

নারীদের কাবুকি অন্তর্ধান হওয়ার পরে তার স্থানে এল "ওয়াকাশু" (Wakashu) কাবুকি বা যুবকদের কাবুকি—সুরু হল কাবুকির দ্বিতীয় অধ্যায়। নারীদের কাবুকিতেও সহকারী হিসেবে সুদর্শন যুবকদের দেখা যেত, এখন তারাই সর্বময় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুকাল মধ্যে কর্তৃপক্ষের আবারও মনে হল এই সব সুদর্শন তরুণদের সুকোমল অভিনয়ও সমাজের নৈতিক চরিত্রকে অধঃপতিত করছে। সুতরাং ১৬৫২ খ্রীঃ এক আইন জারির ফলে তরুণদের কাবুকি বন্ধ হয়ে গেল। তারা তাদের কেশ ও দেহের সুকুমার পরিচর্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ছোট বড় নানারকম সরকারি বিধিনিষেধ থাকা সত্বেও কাবুকি নাটক কিন্তু কোন না কোন এক রূপ নিয়ে টিকে রইল।

তরুণদের কাবুকি নিষিদ্ধ হওয়ার পর প্রায় বছর দু'য়েক আর কোন কাবুকি রইল না। তারপর গড়ে উঠল কাবুকির তৃতীয় পর্যায় "ইয়ারো" (Yaro) কাবুকি। এই তৃতীয় পর্যায়ের কাবুকিই হল পরিণত খাঁটি কাবুকি। 'ইয়ারো' মানে হল পূর্ণ বয়স্ক বীরত্বব্যঞ্জক চেহারার পুরুষ। এ নাটকেও নারী পুরুষ উভয় চরিত্রেই পুরুষরা অভিনয় করত—সুতরাং তাদের দর্শক সাধারণকে তৃপ্ত করতে হত অভিনয় দক্ষতা এবং পারদর্শিতা দিয়ে—সেখানে দৈহিক সুকুমার সৌন্দর্যের কোন স্থান ছিল না। এই পূর্ণবয়স্কদের কাবুকিই ছিল প্রকৃত খাঁটি কাবুকি। জন্মকালের পর থেকেই "ইয়ারো" কাবুকির বিজয়যাত্রা সুরু হল। ক্রমোন্নতির পথে নাট্যরচনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হতে লাগল এবং এল মঞ্চের নানান কলা কৌশল।

একদিকে হতে লাগল কাবুকির জন্য পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা, অন্যদিকে এল সঙ্গীত, পোষাক, রূপসজ্জা, মঞ্চ স্থাপত্য এবং সেটিং। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই কাবুকি একটা পরিণত, সমুন্নত শিল্প হয়ে উঠল—কাবুকি হল জনগণের নাট্য-সংস্থা অতি দ্রুতলয়ে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যা ছিল কেবল মনোরঞ্জনকারী অনুষ্ঠানমাত্র তাই—কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্প হয়ে দাঁড়াল। "গেনরোকু" (Genroku) কালকে, জাপানের শিল্প, সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কাবুকিও এই যুগেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইয়ারো কাবুকিকে তাই "গেনরোকু কাবুকি" নামেও অভিহিত করা হয়। কাবুকি নাটকের এই ক্রমোন্নতির পথে জাপানে আর একটি নূতন ধারার অগ্রগতি সুরু হয় এবং তার প্রভাব বিশেষভাবেই কাবুকির উপর এসে পড়ে, এই নূতন ধারাটি হল "নিনগিও-শিবাই" (Ningyo Shibai) বা পুতুলের খেলা প্রদর্শন। যদিও এ দু'টি ছিল দুই ভিন্ন ধারার অনুষ্ঠান তবুও এদের আভ্যন্তরীণ সংযোগ ছিল সুগভীর। জাপানে পুতুল খেলার প্রদর্শন ও-কুনির কাবুকিরও বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এসে কাবুকির যখন উন্নতির যুগ ভ্রাম্যমাণ পুতুলখেলা স্থায়ী নিজস্ব ধরনের মঞ্চে অভিনয় প্রদর্শন সুরু করল এবং পুতুল তৈরীর প্রক্রিয়াও পাল্টে গেল। প্রাথমিক যুগে পুতুল তৈরী হত মাটি দিয়ে—নোতুন ধারায় কাঠের তৈরী পুতুলের আমদানী হতে লাগল। এই পুতুল খেলা এত উন্নততর হয়ে উঠল যে, জনসাধারণকে এ কাবুকির চেয়েও বেশি আকর্ষণ করতে লাগল। যদিও অনতিবিলম্বে পুতুলের খেলাকে মানুষের খেলা আবার হারিয়ে দিল, কিন্তু পুতুলখেলা কাবুকিকে এত প্রভাবিত করল যে তার মধ্যে পুতুল খেলার আঙ্গিক অভিনয় এবং মঞ্চ রূপায়ণ পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে বহুল পরিমাণে সংযুক্ত হতে লাগল। পুতুলখেলার বড় বড় পুতুলগুলির আচার আচরণ যাতে ক্রমশঃই মানুষের মত জীবন্ত হয়ে ওঠে তার কলাকৌশল আরম্ভ হতে লাগল, আবার কাবুকির মানুষ অভিনেতারা নাট্যাভিনয়কালে পুতুলের মতই চালচলন ও অঙ্গভঙ্গির প্রয়োগ করতে লাগলেন। এমনকি পুতুল-খেলার জন্য লিখিত নাটকও কাবুকি মঞ্চে অভিনীত হতে লাগল, যার ফলে, পুতুলখেলার একটা স্থায়ী ছাপ রয়ে গেল কাবুকির অঙ্গে। এক নোতুন ইতিহাসের সৃজন হল কাবুকির মঞ্চ পরিকল্পনায়—পুতুলখেলার কাছ থেকে

কাবুকি পেল এক স্বপ্নময় পরিবেশ। প্রতিযোগিতায় পুতুলখেলা হেরে গেল, কাবুকি টোকিওর জনচিত্ত জয় করে নিল। কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত স্রষ্টা শিল্পীরা আসতে লাগলেন জনসাধারণ তাঁদের দেখবার জন্য উন্মত্তের মত ছুটতে লাগল। এই কাবুকি অভিনেতাদের মজুরী ছিল অত্যধিক এবং তাঁরা বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন ফলে প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য ছিল প্রচণ্ড তবুও রঙ্গালয়ে তিলধারণের স্থান থাকত না। আমাদের বর্তমান চলচ্চিত্র জগতের মতই ইয়ারো কাবুকির নারী ভূমিকার পুরুষ অভিনেতারাই হয়ে দাঁড়াল জাপানী মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও স্টাইলের প্রবর্তন কর্তা। সরকার বিরূপ হয়ে উঠলেও এক্ষেত্রে কিছুই করবার সুযোগ পেল না।

উনবিংশ শতকে এসে দর্শকমণ্ডলী কাবুকির মধ্যে নূতনত্ব এবং বাস্তবতার অভাব অনুভব করতে লাগল। সরকারি বিরূপতা তো ছিলই, তার সঙ্গে কতকগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অগ্নিকাণ্ড কাবুকিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু তবুও কাবুকি ধ্বংস পেল না। ১৮৬৮ খ্রীঃ "মেইজি" (Meiji) যুগে কাবুকি আবার নবীন প্রাণের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কাবুকির মধ্যে দেখা দিল এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন। সৃষ্টি হতে লাগল যুগের দাবি নিয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি এবং শ্রেষ্ঠ নাটকই পথ করে দিল অন্যান্য মঞ্চ আঙ্গিকের। কাবুকিতে দু'জন যুগান্তকারী প্রতিভাশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত অভিনেতা নাট্যকারের আবির্ভাব হল। তাঁদের একজনের নাম হল "ইচিকাওয়া দানজুরো নবম" (Ichikawa Danjūro IX) এবং অন্যজন তাঁর বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী "ওনোয়ে কিকুগোরো পঞ্চম" (Onoe Kikugoro V)। দানজুরো কাবুকিতে এক নূতন ধরনের নাটকের প্রবর্তন করলেন তা হল ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে খাঁটি তথ্যবহুল জীবন্ত ইতিহাস স্বরূপ নাটক। আর কিকুগোরোর ক্ষেত্র ছিল পারিবারিক জীবন। সাধারণ মানুষের পারিবারিক জীবনের বাস্তব রূপের রূপায়ণই ছিল তাঁর আদর্শ। দু'জনই গভীর নিষ্ঠা সহকারে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এগিয়ে চললেন এবং কাবুকির প্রাচীন ধারায় এক নবতম ঐতিহ্যের সৃষ্টি করলেন। জনসাধারণ এঁদের সসম্মানে গ্রহণ করল, এঁদের মৃত্যুতে শোকাহত জাপান হারাল দু'জন বুদ্ধিজীবী স্রষ্টাকে।

এরপরে কাবুকির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত সেটা তার পতনেরই ইতিহাস। জাপানে ১৯২৩ খ্রীঃ ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তারি ফলে শিল্প, সংস্কৃতির অগ্রগতি

সাময়িকভাবে বাধা পেল, এবং এই পরিবর্তনের মুখেই কাবুকি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে এসে পড়ল। এই নূতন অবস্থাতেও কাবুকি কিন্তু তার জনপ্রিয়তা হারাল না। জাপানের শিল্প প্রতিভূ হিসেবে কাবুকি তার পুরাতন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখল। কাবুকি আর একবার ধ্বংসের সম্মুখীন হল দ্বিতীয় মহাসমরকালে, টোকিওতে বোমা বর্ষণের ফলে। বর্তমানে কাবুকি পুরাতনের পুনরাবৃত্তির মাঝেই নিজের অস্তিত্ব কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছে। জাপানের একাংশ কিন্তু এখনো কাবুকির অনুরাগী। বর্তমান কালে জাপানের জীবনযাত্রায়ও আমূল পরিবর্তন এসে গেছে, কিন্তু কাবুকির মধ্যে যে জীবন, যে সমাজচিত্র রূপায়িত তা বিগত দিনের—অতএব এ আজ জাদুঘরের সামগ্রী। নাট্যশিল্প শিক্ষার্থীর পক্ষে কাবুকি জানা অপরিহার্য কিন্তু বর্তমান কালের জাপানী জনসাধারণের কাছে এটা একটা ব্যয় বহুল বিলাস মাত্র।

॥ কাবুকি মঞ্চ ॥

ও কুনির কাবুকির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্তও সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের উপায় ছিল পুতুল নাচ এবং বিভিন্ন ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান। এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ দল, এক এক ঋতুতে এক এক জায়গায় এসে খেলা দেখাত, অতএব এদের কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। কিন্তু ও-কুনির অনুষ্ঠান সাধারণ লোক এমন আগ্রহে গ্রহণ করল যে অচিরকাল মধ্যে কাবুকির জন্য নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চ গড়ে তুলতে হল এবং খুব স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই প্রথমাবস্থায় কাবুকি মঞ্চের গঠন ভঙ্গির উপর ঐতিহ্যপূর্ণ নো মঞ্চের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ল। এখান থেকেই যাত্রা সুরু হল কাবুকি রঙ্গমঞ্চের। এরপরে দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে কাবুকি রঙ্গমঞ্চ এমন এক নিজস্ব ধারায় রূপায়িত হয়ে উঠল, যে তার সঙ্গে পুরাতন নো মঞ্চের এখন আর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নো-কে সে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছে, নো মঞ্চের কিন্তু আর কোন নবতর পরিবর্তন ঘটেনি, পুরাতন আমলে সে যা ছিল এখনো তাই আছে কেবল সে ছিল মুক্তাঙ্গনে এখন হয়েছে গৃহবাসী।

প্রথমাবস্থায় কাবুকি মঞ্চেও নো-এর অনুরূপ ভাবেই সাজঘর ও প্রেক্ষা-গৃহের উপরে কোন আবরণ ছিল না, ছাদ ছিল কেবল মঞ্চের উপরে।

কিছুকাল পরে কাবুকি রঙ্গালয়ে দর্শকদের বসবার আসনগুলি আড়াআড়ি বুনানির বাঁশের বেড়া দিয়ে কয়েকটা ভাগে ঘিরে দেওয়া হল। নাট্যশালার সম্মুখে থাকত একটা সমুচ্চ প্রবেশ পথ তার নাম ছিল "ইয়াগুরা" (Yagura) এই প্রবেশপথের উচ্চশীর্ষে একজন ড্রাম বাদক সজোরে ড্রাম বাজিয়ে সেদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা করত। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ড্রাম বাজিয়ে দর্শকদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা কাবুকির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ইয়াগুরা প্রবেশ পথটি একখানা মঞ্চের অভিজ্ঞান অঙ্কিত, কারুকার্য খচিত পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকত। পথটির উচ্চ চূড়ার উপরে নহবৎখানার মত স্থানটিতে বসত ড্রাম বাদকদল, তার নীচের দিকে একটা ছোট্ট অপ্রশস্ত প্রবেশ মুখ থাকত যার নাম ছিল "নেজুমি-কিদো" (Nezumi kido) যার বঙ্গার্থ হল "ইঁদুরের পথ" এই পথেই মাথা নুইয়ে দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করত।

নো মঞ্চ হত বর্গাকৃতি, কাবুকিতে কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ যতখানি প্রস্থে, মঞ্চের প্রোসীনিয়ম্ মুখও ততখানি বিস্তৃত হত। এই মঞ্চমুখের দৈর্ঘ্যের তুলনায় উচ্চতা খুব কমই হত দৈর্ঘ্যের মাত্র এক চতুর্থাংশ হত উচ্চতা। বলা যায় মঞ্চ মুখটি হত অনেকটা বর্তমান চলচ্চিত্রের 'সিনেমাস্কোপের' (Cinema-Schope) মত মঞ্চ মুখ এতটা প্রশস্ত হওয়ায় কাবুকি অভিনয়ে একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, এখানে আর নো মঞ্চের মত পার্শ্বে আলাদা কোরাসের স্থান রইল না। দৃশ্যানুযায়ী সেট তৈরী হত এবং অভিনেতৃদল, নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীরা সকলেই এক সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারতেন।

নো মঞ্চের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ হাশিগাকারি। কাবুকি প্রথমাবস্থায় একে নো-এর অনুরূপ ভাবেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তা বিবর্তিত হয়ে মঞ্চের পেছনদিকের কিনারা ছেড়ে সম্মুখে এসে পড়ল। প্রধান মঞ্চের সম্মুখ ভাগে লম্ব রেখার মত দু'দিকে সমকোণ রচনা করে—এই পথটি প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান দিয়ে চলে যেত পশ্চাতের দেয়াল পর্যন্ত। কখন আবার আড়াআড়িভাবে আর একটি পথও প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়ে চলে যেত। এই পথের উপর দিয়ে অভিনেতাদের হঠাৎ করে প্রবেশ প্রস্থান দর্শকদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলাবহ হয়ে উঠত। এই পথের উপর দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনেক সময় অভিনয় এবং নৃত্যানুষ্ঠানও হত।

এইভাবে নাটকের চরিত্র মঞ্চের ফ্রেমে বাঁধা হয়ে দর্শকদের কাছ থেকে দূরে সরেই থাকত না—নাটকীয় ঘটনা দর্শকদের মাঝখানে এসে যেন তাদেরই একটা অংশ হয়ে উঠত। কাবুকি মঞ্চের এই পথের নাম হল "হানামিচি" (Hanamichı) বা পুষ্পপথ। অনেকে মনে করেন "পুষ্পপথ" এই বিশেষ নামটি এসেছে প্রাচীন আমলে দর্শকরা এই পথে অভিনেতাদের ফুলের উপহার দিতে এগিয়ে আসত বলে। এই পুষ্পপথ বর্তমানকালে ইউরোপ এবং আমেরিকার "রিভিউ" থিয়েটারে কোথাও কোথাও পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হচ্ছে। কলকাতায় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপও এর প্রয়োগ করেছে "তিতাস একটি নদীর নাম" নাটকে। মঞ্চের মেঝেতে যেমন, এই হানামিচির বুকেও তেমনি গুপ্ত দরজা থাকায় (Trap devices) অভিনেতাদেব ইচ্ছামত আবির্ভাব, তিরোভাব দিয়ে দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেওয়া যেত। মঞ্চে যে ছ'টো হানামিচি থাকত তার বাঁদিক দিয়ে যে প্রধান হানামিচিটি চলে যেত তার নাম ছিল "হোন্" (Hon) এবং ডানদিকে সাময়িকভাবে যে হানামিচিটি তৈরী হত তার ছিল 'কারি' (Kari)। দ্বিতীয় পথটি, প্রথমটির চেয়ে প্রস্থে ছোট হত। ১৭৬০ খ্রীঃ নাগাদ প্রায় সর্বত্রই ছ'টি পুষ্পপথ দেখা যেতে লাগল। এর আগে প্রধান পুষ্পপথটির মাঝখানে দর্শকদেরই মধ্যে একটি প্লাটফর্ম তৈরী করা হত, এটির নাম ছিল "নানোরি দাই" (Nanori Dai) এখানে দাঁড়িয়ে অভিনেতারা নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি আবৃত্তি করতেন। এই ভাবেই কাবুকি দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হত।

চীনদেশীয় অভিনেতার অন্যান্য বহুবিধ গুণ ও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ থাকতেই হত, তা হল মনোরম সঙ্গীতের কণ্ঠ এবং সঙ্গীতে সুশিক্ষা। কিন্তু নো এবং কাবুকি মঞ্চে অভিনেতাদের সঙ্গীত বিদ্যাটা অপরিহার্য ছিল না তবে তাদের নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী হতে হত। নাটকের কাহিনীকে দেহভঙ্গিতে প্রকাশ করা কাবুকি নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কোন কোন নাটকে সোজা নৃত্যাংশই প্রদর্শিত হত—কোথাও অন্যান্য ঘটনার সহায়ক হিসেবে নৃত্য ও দেহভঙ্গি আসত। কাবুকি নাটকে অভিনেতারা পর পর কতকগুলি ক্লাইম্যাক্সের পথে অগ্রগতির কালে সঙ্গীতকারীদের সহায়তা গ্রহণ করেন। এই ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্তগুলিতে মঞ্চে অভিনয়ের চেয়েও চিত্রগুণ প্রকাশ পায় বেশি। প্রত্যেক নাটকেই

এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন মঞ্চের প্রত্যেক অভিনেতাই মূকাভিনয়ে (Tableau) অংশ গ্রহণ করেন এবং "জোরুরি" (Joruri) বা সঙ্গীতকারীরা তখন থাকেন কাহিনী বক্তা। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এটাই হল সাধারণ পরিশেষ। এমন কি অত্যন্ত বাস্তবানুগ নাটকেও এই রীতির ব্যতিক্রম নেই। কাবুকির কথোপকথন কখন হত প্রাচীন বাগ্‌ভঙ্গিতে কখন হত অতি প্রচলিত কথ্যভাষায়। একটাতে থাকত সঙ্গীতময় ছন্দোবদ্ধতা, অন্যটাতে উচ্চশ্রেণীর "স্টাইলাইজ্‌ড" পদ্ধতি তারি সঙ্গে যুক্ত হত দৃশ্যের চিত্ররূপ এবং দেহভঙ্গি। ফলে এক কাল্পনিক ভাব-বিলাসময় শিল্পের সৃষ্টি হত।

কাবুকি নাটকের মূল শ্রেণী বিভাগ ছিল তিনটি ১। প্রথমটা কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত নাটক যার নাম ছিল "জিদাইমোনো" (Jidaimono) ২। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল পারিবারিক জীবন নিয়ে রচিত নাটক "সেওয়ামোনো" (Sewamono) এর মধ্যে মানবচরিত্রের সব রকম সম্ভাব্যরূপই পাওয়া যায়। এই সেওয়ামোনোর আর একটা অংশ ছিল "কিজেওয়ামোনো" (Kizewamono) তাতে থাকত পাতালের কাণ্ডকারখানা এবং চোর, জুয়ারী, দুঃসাহসিক ডাকাতদের কীর্তিকলাপ। ৩। আর তৃতীয় শ্রেণী ছিল "শোসাগোতো" (Shosagoto) এতে থাকত শুধু মাত্র নৃত্যনাট্য।

ক্রমশঃ কাবুকির সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। থিয়েটার সম্পর্কে একটা শব্দের ব্যবহার সর্বত্র হতে লাগল, তা হল "জা" (Za) ভাষাগত ভাবে এর অর্থ ছিল বসবার আসন বা সভাস্থল এই থেকেই অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের সংগঠনের নাম হতে লাগল "জা"। অর্থের বিস্তৃতি আর একটু ঘটল—তারা এসে যে থিয়েটার দলগুলি খুলে বসতে লাগলেন অতঃপর তাদেরই বলা হত জা।

ভোর হয়ে আসার আগেই কাবুকি জা-র সম্মুখে দলে দলে দর্শক সাধারণের ভিড় হতে থাকত, আর তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত, কখন প্রবেশ দ্বারে প্রারম্ভিক ড্রাম বেজে উঠবে। অভিনয় ঋতুগুলি সাধারণ জীবনে এক প্রাণময় উজ্জীবন ও চাঞ্চল্য এনে দিত। রাস্তায়, পথে, ঘাটে উৎসববিহারী মানুষের দল জলোচ্ছ্বাসের মত বাড়তে থাকত।

এই সব রঙ্গালয়গুলি ছোট ছোট চা-ঘরে ঘেরা থাকত, এগুলিকে বলা হত "চায়া" (Chaya) বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষের জন্য এই চা-ঘরগুলিও

ভিন্ন ভিন্ন চার শ্রেণীর ছিল। এই চা-ঘরগুলির সাহায্যেই উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অভিনয়ের টিকিট ক্রয় করত, তাছাড়া এখানেই তারা বিশ্রামকালে বা ফিরবার সময় আসত এবং গল্পগুজব করত। তখনকার দিনে লোকে অতি প্রত্যুষে থিয়েটার দেখতে আসত এবং যখন সায়াহ্নের অন্ধকার নামত তখন পর্যন্তও অভিনয় দেখত। অভিনয় দেখার কালটা তাদের বেশ দীর্ঘই ছিল, সুতরাং মাঝের বিশ্রামের সময়টাও বেশি দিতে হত, কিন্তু এ সময়ে রঙ্গালয়ের পক্ষ থেকে দর্শকদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা বা উপভোগের ব্যবস্থা থাকত না বলে সে ভার সানন্দে গ্রহণ করেছিল এই সমস্ত চা-ঘরগুলি। ফলে এগুলিরও ধনে জনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। এই চা-ঘরগুলি অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত ছিল কাবুকি রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে। অভিনেতাদের এক বিরাট গোষ্ঠীই আসত এই চা-ঘরের মালিকদের পরিবার পরিজন থেকে। বর্তমান কালে কাবুকি রঙ্গালয়গুলি এ সমস্ত এলাকা থেকে সরে এসেছে, ভেঙ্গে গেছে চা চক্রের মেলা। তবু কিন্তু আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে এই চা-ঘরগুলি এবং এখনো এরা বহুভাবে জনসাধারণের সেবা ও আনন্দ বিতরণ করে চলেছে।

থিয়েটারের ঋতু ছিল নভেম্বর মাস—অর্থাৎ শীতকাল। শীতের সুরুতেই থিয়েটার পাড়াটা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। রঙ্গালয়, চা-ঘরগুলি এবং কাছাকাছি অন্যান্য বাড়িগুলিও উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হত। এই থিয়েটার এলাকাটাই নানান বর্ণের কাগজে আচ্ছাদিত এবং আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, প্রস্ফুটিত কৃত্রিম পুষ্পসাজে ভরা বৃক্ষশাখায় গৃহগুলি সজ্জিত হত। রঙ্গালয়গুলির সম্মুখে টাঙ্গানো হত অভিনেতাদের চিত্রাঙ্কিত সাইন বোর্ড, এই ধারা বর্তমান যুগের কাবুকিতেও চলে আসছে। এ ছাড়া রঙ্গালয়ের সম্মুখে আর একটি বোর্ড থাকত তাতে ছোট বড় হিসেবে লেখা থাকত অভিনেতাদের নাম এবং তার সঙ্গে সাজানো থাকত অভিনেতাদের পাওয়া উপহার, বেশির ভাগই তা হত কারুকার্যমণ্ডিত সাকে বা মদের পেয়ালা, রঙ্গালয়ের সম্মুখে এখানে সেখানে সাজানো থাকত লাল ও সাদা রং-এর পাখী অথবা পতাকা। দর্শক সাধারণকে স্বাগত জানাবার ভার নিত গেইশারা। সমগ্র পরিবেশটির মধ্যেই এক হালকা উৎসব উপভোগের হাওয়া বইতে থাকত।

কিন্তু কালের হস্তক্ষেপ বারে বারেই কাবুকির ঐতিহ্যকে নিঃশেষে অবলুপ্ত

করে দিতে চেয়েছে। কাবুকির পুরানো পাড়া এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। তবুও প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রাবল্যে কাবুকি আবার জেগে উঠল। "নাকামুরা জা" (Nakamura Za) "ইচিমুরা জা" (Ichimura Za) এবং "মোরিতা জা" (Morita Za) এই তিনটি রঙ্গালয় নিয়ে কাবুকির নূতন পাড়া গড়ে উঠল। এরপরে ১৮৬৮ খ্রীঃ জাপানের মেইজি রেস্টোরেশন্ যুগে (Meiji Restoration) কাবুকি মঞ্চ তার বিশেষ এলাকা ত্যাগ করে শহরে এসে স্থায়ী হল, কিন্তু ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে টোকিও শহরের এই রঙ্গালয়গুলিও ধ্বংস হয়ে গেল, নবযুগের কাবুকি আবার আর একবার দ্বিতীয় মহাসমর কালে আঘাতের সম্মুখীন হল। এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে পুরাতন কাবুকির আর একবার নবতর অভ্যুত্থান ঘটল। টোকিও শহরে এখনো যে কাবুকির ঐতিহ্যবাহী রঙ্গালয় টিকে আছে তার নাম "কাবুকি জা" বা কাবুকিদল। এখানে সারা বছর ধরেই অভিনয় চলতে থাকে—এখানকার মোট আসন সংখ্যা ২,০০০ মত।

যুদ্ধের পরে কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পুরাতন মঞ্চের দু'দফা হানামিচি এখন আর টিকে নেই। দর্শকদের বসবার আসন সংখ্যা বাড়াবার জন্য এবং আংশিকভাবে খরচ কমাবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এরপরে পশ্চিমী প্রভাবে যখন ইম্পেরিয়াল থিয়েটারে (Imperi e) ক্লাসিকাল কাবুকির অভিনয় হল তখন আর তাতে একটিও হানামিচি রইল না। কেবল কয়েক ফুট লম্বা পুলের মত একটি পথ পার্শ্ববর্তী প্রস্থান পথের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে। টোকিও শহরের বাইরেও কিছু কিছু কাবুকির অভিনয় এখনো হয়। কিন্তু কাবুকি তার বিপুল প্রাণশক্তি, যার বলে সে শত বাধা অতিক্রম করে এসেছিল তা এখন সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছে। কাবুকির যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখতে বর্তমান কালের মানুষ ছোটে, তা কৌতূহলী মানুষের ইতিহাস বিশ্রুত স্থাপত্য কিংবা ভাস্কর্য কীর্তি দেখতে ছোটার মতই, —কারণ কাবুকি এখন পুরাতনের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

কাবুকি নাটকের ক্রমোন্নতির যুগে মঞ্চ আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হতে থাকে। ১৬৪৪ সালে ইচিমুরা জা সর্বপ্রথম দুই ভিন্ন প্রকার পর্দার ব্যবহার করে। তার একটা হল "হিকিমাকু" (Hikimaku) এটা ছিল সম্মুখ যবনিকা, —মঞ্চের উপর দিক থেকে ঝুলত এবং অভিনয় কালে আড়াআড়িভাবে

টেনে সরিয়ে দেওয়া হত—আবার অভিনয় শেষে তাকে হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করে দেওয়া হত। এ পর্দা পশ্চিমী ধরনে নীচ থেকে উপরে উঠত না—দু'পাশে সরে যেত। দ্বিতীয় যবনিকাটির নাম ছিল "কিরিওতোশি" (Kiriotoshi) এটা হত সাহায্যকারী পর্দা। কোন বিস্ময়জনক দৃশ্যকে মঞ্চে আকস্মিকভাবে দেখানোর জন্য মঞ্চের মাঝে এটা টাঙানো থাকত এবং পার্শ্ববর্তী দড়ির বিনুনি ধরে টেনে হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়া হত।

॥ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাবুকি মঞ্চে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রীঃ "ঘূর্ণায়মান মঞ্চ" বা "মাওয়ারি বুতাই" (Mawari butai) জাপানের পুতুল নাচের মঞ্চ থেকে উন্নততর রূপ ধারণ করে কাবুকিতে এসে প্রবেশ লাভ করল। একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, পশ্চিম যখন চিন্তাও করেনি—প্রাচ্যের জাপানে তখন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মঞ্চপদ্ধতি প্রথম জন্মমুহূর্তের অসংস্কৃত অবস্থা থেকেই পুতুল অভিনেতাদের এবং পরে সংস্কৃত অবস্থায় মানুষ অভিনেতাদের এক প্রধান সহায়ক হিসেবেই চলে আসছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এতে দর্শকদের চোখের সম্মুখেই মঞ্চের সমগ্র দৃশ্যটি পরিবর্তিত হয়ে দৃশ্যান্তর এসে পৌঁছয়। এরই সাহায্যে নাটকের স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ সবকিছুরই স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিবর্তন করা চলে এবং কোন রকম বাধার সৃষ্টি না করে কাহিনীকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়া যায়। আবার তেমনি বিগত ঘটনার যে দৃশ্য দর্শকরা ঠিক যে ভাবে ছেড়ে এসেছে মঞ্চের ঘূর্ণনের সঙ্গে তারা সেই পেছন দিকের দৃশ্যে ফিরে গিয়ে কাহিনীর ছিন্ন সূত্র গ্রথিত করে নিতে পারে। এই সঞ্চরণশীলতার ফলেই নাটকে বোধগম্যতার দিক থেকে এবং নাটকের কার্যের (action) দিক থেকে তৃতীয় আর এক মাত্রার সৃষ্টি হয়—এবং কল্পনাকে বাস্তব অনুভূতির দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের যান্ত্রিক কৌশল হল একটা টেবিলকে তার অক্ষদণ্ডের চারপাশে ঘুরিয়ে দেওয়ার অনুরূপ। এখানে মঞ্চটি এক বিরাট গোল টেবিলের মত যাকে তার মধ্যবর্তী দণ্ডের উপরে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো যায়। সমগ্র মঞ্চের যে ব্যাস নেওয়া হবে তারি উপরে এর

এক একটি দৃশ্যভাগের পরিমাপ কত হবে তা নির্ভরশীল। কখন পুরো মঞ্চের অর্ধাংশ, কখন এক চতুর্থাংশ কখন বা এক তৃতীয়াংশ নিয়ে প্রয়োজনানুরূপ আলাদা আলাদা দৃশ্য রচনা করা হয়ে থাকে। টোকিওর "কাবুকি জার" (Kabuki Za) ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যাস ছিল ৬০´ ফুট আবার "মেইজি জার" (Meiji Za) ব্যাস ছিল ৪২´ ফুট। বর্তমান কালে এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ চালান হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে, বিদ্যুতের সাহায্যে মাঝের মন্থন



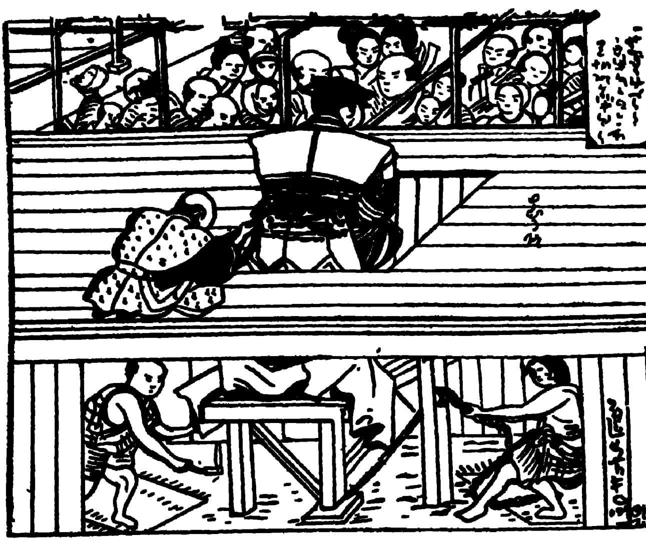
জাপানের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ।

দণ্ডটি ধীরে ধীরে মঞ্চকে ঘুরিয়ে দেয়। জাপানের পুরানো কাবুকি মঞ্চকে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করা হত মনুষ্যশক্তির সাহায্যে। তখন মঞ্চটিকে ঘুরানো হত মঞ্চের দু'দিকে দু'টি চাকার সঙ্গে কপিকলে দড়ি বেঁধে— এগুলিকে ডাইনে বাঁয়ে টেনে অক্ষদণ্ডের উপরে মঞ্চকে ঘুরানো হত। এই দড়ি টেনে মঞ্চকে ঘুরানোর জন্য অবশ্যই একসঙ্গে বহু সংখ্যক মানুষের প্রয়োজন হত।

কাবুকি থিয়েটারে প্রধান মঞ্চের নিম্নভাগকে বলা হত "নারাকু" (Naraku) এটি একটি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের শব্দ৺ এর অর্থ হল অন্তহীন গহ্বর, যেখানে মানবজীবনের বহু কর্ম এবং চেষ্টা বিনা প্রতিদানে অজানিতভাবে হারিয়ে গেছে। এই ইঙ্গিতটি প্রয়োগ করা হত যে সব মঞ্চকর্মীরা পশ্চাতের গভীর অন্ধকারে নিজেদের ঢেকে রাখতেন তাঁদের প্রতি। তাঁরা

অভিনেতাদের মত দর্শকদের চোখের সম্মুখে কখনই আসতেন না—তাঁরা ছিলেন জীবনের সেই সব হারিয়ে যাওয়া কর্মপ্রচেষ্টার মতই কিন্তু তাঁদেরই শিল্প নৈপুণ্য সমগ্র নাটকটিকে উজ্জীবিত করে রাখত এবং দর্শকদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই পেত অকুণ্ঠ প্রশংসা, করতালি এবং হর্ষধ্বনি।

মাওয়ারি বুতাই বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন এল তখন এর নাম হল "জানোমে বুতাই" (Janome butai) এতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দু'টো ভাগ ছিল—এর ফলে মঞ্চের অভ্যন্তরভাগ অর্থাৎ সেটের পশ্চাদংশ বহির্ভাগের ঠিক বিপরীত মুখে ঘুরত। জানোমে বলতে বোঝাত "জানোমেন্ গাসা" (Janomen Gasa) নামে এক ধরনের কাগজের তৈরী ছাতা, এই ছাতাটি হত সম্পূর্ণ গোলাকৃতি, এর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের অতি নিকটতম সাদৃশ্য ছিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের এই নূতন পরিকল্পনার ফলে মঞ্চে অনেক কলা কৌশল সৃষ্টি করা চলত—যেমন মঞ্চে দেখানো চলত একটি সাঁকোর নীচ দিয়ে জলস্রোতে নৌকো ভেসে যাওয়ার দৃশ্য।



কাবুকির যান্ত্রিক পদ্ধতি : গুপ্ত দরজা দিয়ে অভিনেতার প্রবেশ।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে আর যে সব যান্ত্রিক পদ্ধতির আমদানী হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল "সেরিয়াগে" (Seriage) এবং "সেরিসাগে"

(Serisage) নামে মঞ্চের উপরিস্থিত দু'টি গুপ্ত দরজা। এই গুপ্তদরজার নীচে থাকত মনুষ্যশক্তি চালিত চাকা লাগানো দু'টি ছোট প্লাটফর্ম, এর সাহায্যে অভিনেতারা ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে বা হারিয়ে যেতে পারতেন। হানামিচির উপরও তদনুরূপ একটি দরজা থাকত তার নাম ছিল "সুপ্পোন" (Suppon)। এই দরজাটি বিশেষ যত্ন সহকারে তৈরী করা হত কারণ এখান থেকে ঘটত ভূত বা আত্মার আবির্ভাব। এই দরজাগুলোও আগে সরানো হত হাত দিয়ে এখন সেখানে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়।

কাবুকি মঞ্চের ছাদটি হত পুরাতন নো মঞ্চের মত ত্রিকোণ বিশিষ্ট। কাবুকির রঙ্গালয়টি হত আয়তাকার। মূল রঙ্গালয়টি তৈরী হত সামান্য পালিশ লাগানো সাদামাটা কাঠে। মঞ্চ বিস্তৃত হত প্রেক্ষাগৃহ যতখানি প্রস্থে ততখানি, কিন্তু তা প্লাটফর্ম স্টেজের মত দর্শকদের এলাকায় খানিকটা এগিয়ে আসত।

প্রেক্ষাগৃহে দু'টো হানামিচির অন্তর্বর্তী স্থানকে বলত "হিরাদোমা" (Hiradoma) ক্রমশঃ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একটি নূতন ধরনের বিশেষত্ব দেখা দিতে লাগল—তা হল দর্শকদের এলাকাটি কয়েকটি চতুষ্কোণ খোপে ভাগ করে অত্যন্ত সরু কাঠের বিড়ালপথ দিয়ে তাকে ঘিরে দেওয়া হত। এই খোপগুলির মধ্যেই দর্শকরা বসত। প্রেক্ষাগৃহের মেঝেটাও হত জাপানীদের গৃহসজ্জার অনুরূপ—এই চতুষ্কোণ এলাকাগুলিতে খড় বিছিয়ে ঢেকে দেওয়া হত—দর্শকরা তারি উপরে আসন গ্রহণ করত। প্রধান হানামিচির পাশে থাকত এ রকম দু'শ্রেণীর ঘেরা জায়গা এবং সহায়ক হানামিচির পাশে থাকত একশ্রেণী আসন। এই এক একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে ছয় থেকে সাতজন দর্শক বসতে পারত। বসবার এই ঘেরাও জায়গাগুলি অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হত। মঞ্চের আকৃতি বা পরিমাপের উপরে এই বসবার আসনগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা হত। এই ঘেরা জায়গাগুলিকে বলা হত "দোমা" (Doma)। দোমা শ্রেণীর পেছনে "সাজিকি" (Sajiki) নামে একশ্রেণীর গ্যালারী থাকত—এই পশ্চাদ্‌-গ্যালারীর প্রথম ধাপটির উচ্চতা হত হানামিচির সমান। প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ববর্তী আসনগুলিও এমনি গ্যালারীর মতই থাকে থাকে উঠে যেত।

এই যে পাশাপাশি আসনে গায়ে গায়ে দর্শকশ্রেণী বসে রয়েছেন—

জাপানের এই দর্শকশ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেণীরই সম্মিলিত রূপ দেখা যেত। সেখানে থাকতেন দাঁতে কালো মিশিলাগানো বিবাহিতা মহিলারা, আবার থাকতেন প্রকৃত সমালোচক রসিকজন, থাকতেন তরুণ ও যুবকদল, আবার তার পাশেই বসতেন নৃত্যগীত পারদর্শিনী গেইশা আর তারি অন্যপাশে হয়তো বসতেন দোকানদাররা, বসতেন রাজ কর্মচারীরা। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কেশসজ্জা করে এবং সামাজিক পোষাক পরে আসতেন সুতরাং সহজেই তাঁদের শ্রেণী পার্থক্য বোঝা যেত, তাঁরা হয়তো উচ্চ হাসিতে ভেঙ্গে পড়তেন, হত পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়, কিংবা ডুবে যেতেন নাটকের অতল তলে, আর হয়তো তখনি চা-ঘর থেকে এসে হাজির হত চা বা বেণ্টো জাতীয় পানীয় কিংবা মাছ, ভাত প্রভৃতি দ্বিপ্রাহরিক আহার্য। এই রীতি কিন্তু আজো পর্যন্ত জাপানীদের জীবনে অটুট রয়েছে।

প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই বিচিত্রশ্রেণীর দর্শকরা কেউই কিন্তু অবজ্ঞার বস্তু ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন প্রকৃত নাট্যরসিক তাঁরা হতেন স্বল্প বিত্ত মানুষ, সুতরাং সম্মুখের শ্রেষ্ঠ আসনগুলিতে তাঁদের স্থান হত না, সেখানে বসতেন সৌভাগ্যশালী দর্শকশ্রেণী। এই বিত্তহীন সমালোচক, রসিক-সুজনরা বসতেন পেছনের সারিগুলিতে এবং গ্যালারীতে, তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত রসিক সমালোচকদল, তাই বিচারবোধশীল শিল্পী অভিনেতারা সম্মুখের বিত্তশালীদের তুলনায় তাঁদের সামান্যও হীন মর্যাদার মনে করতেন না। বরং অভিনেতাদের প্রধান লক্ষ্যই হত পেছনের গ্যালারীর দর্শকরা কারণ তাঁরা অভিনয় হীনমানের হলেই এবং সুযোগ পেলেই হাসি, বিদ্রূপ করতেন, হৈ-হুল্লোড় বাধিয়ে দিতেন। অভিনেতাদের প্রকৃত দক্ষতার কষ্টিপাথর ছিল এখানেই—এঁদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারলেই হত তাঁদের বিজয়।

ইয়ারো কাবুকি মঞ্চের সম্মুখ ভাগে দু'দিকে দু'টো স্তম্ভ নো মঞ্চের স্মৃতি বহন করছিল। মঞ্চে—দর্শকদের ডান দিকে একটি কালো পাথরের ফলক আটকানো থাকত, এর উপরে যে দর্শকদের অতি সত্বর বাইরে যাওয়ার জন্য ডাক পড়েছে—তাদের নাম লেখা থাকত। কোন দর্শককে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে থেকে ডাকতে এলে সর্ব প্রথম তার নাম মঞ্চ থেকে তিনবার ঘোষণা করা হত—এমনকি নাটক চলতে থাকলেও নাম বলা হত,

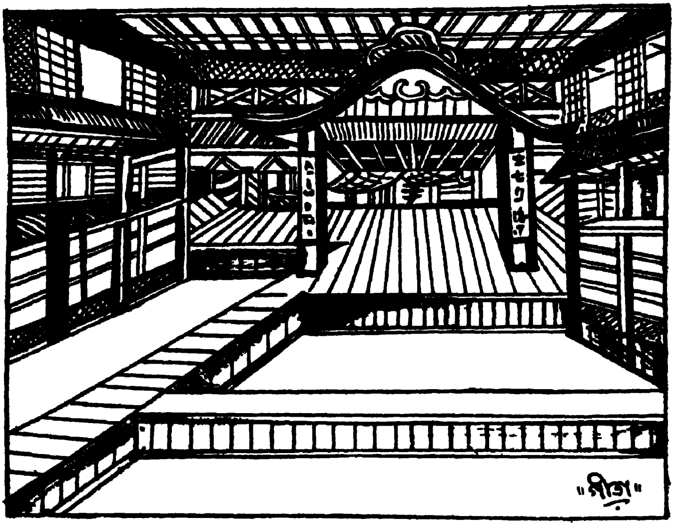
কিন্তু তাতেও সাড়া না পাওয়া গেলে ফলকে নাম লিখে দেওয়াই রীতি ছিল। বর্তমানকালে মাইক্রোফোন থাকায় দর্শকদের বাইরে ডাকার অসুবিধা নেই, একালে কিন্তু মাইক্রোফোন চলে শুধু বিশ্রাম কালেই।

মঞ্চের উপর দিয়ে ঝুলতো বিখ্যাত "জোশিকিমাকু" (Joshikimaku) পর্দা। এর গায়ে সবুজ, কালো প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের রেখা টানা থাকত। এর সারল্য ও বর্ণসম্ভার একদিকে যেমন মনকে আকৃষ্ট করত, অন্যদিকে তেমনি কাবুকি মঞ্চের এক বিশেষ পরিবেশ রচনা করত। কাবুকি মঞ্চের বিজ্ঞাপন বা মঞ্চ সম্পর্কিত কোন প্রচার কার্যে এই বিচিত্র বর্ণ যথেষ্টই ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। কোন কোন নাটকে দেখা যেত যে মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তী সেটের দেয়াল এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত দরজা—গভীর নীল, হলুদ, সাদা এবং পার্সিমন, মিশ্রিত নকশায় সুসজ্জিত করা হত, এই নকশাকে বলা হত "মানজিৎসুনাগি" (Manjitsunagi) মঞ্চসজ্জার এই রীতিটি নেওয়া হয়েছিল বৌদ্ধ প্রতীকধর্মিতা থেকে। একটি প্রাচীন ধর্মীয় প্রতীকচিহ্নই মঞ্চসজ্জার আঙ্গিকে এসে একটি সুসজ্জিত নকশার সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালে এর সঙ্গে—সবুজ, কালো, হালকা নীল ইত্যাদি বর্ণের রেখাও অলংকরণে ব্যবহৃত হতে থাকে।

কাবুকি মঞ্চে প্রথানুযায়ী সম্মুখ যবনিকার একাংশ মঞ্চের ডান দিকে অর্থাৎ দর্শকের বামে টাঙ্গিয়ে রাখা হত এবং তার ভারসাম্য রক্ষা করে বিপরীত দিকে আর একটি পর্দা টাঙ্গানো থাকত, এটিকেই টেনে সামনে আনা বা গুটিয়ে নেওয়া হত। এই পর্দার রং সাধারণতঃ হত নীল বর্ণের তার উপরে সাদা দিয়ে মঞ্চের অভিজ্ঞান ছাপা থাকত।

মঞ্চের পেছনে থাকত সাজঘর—এটি হত তিন তলা। একতলার প্রথমে থাকত "উরাকিদো" (Urakido) বা প্রবেশদ্বার তার পেছনে থাকত অভিনেতাদের জন্য বাথরুম, বাজিয়েদের কক্ষ, নাট্যকারদের কক্ষ এবং ছোটখাটো জিনিসপত্র রাখবার ঘর। দ্বিতীয় তলায় থাকত "ওনাগাতা" (Onnagata) বা নারী-চরিত্র অভিনেত্রীদের কক্ষ। তৃতীয় তলায় দলের প্রধান অভিনেতাদের, পরিচালক এবং অন্যান্য অভিনেতাদের আলাদা কক্ষ থাকত। এছাড়া পালিশ লাগান বড বড় তক্তা পাতা একটা মস্ত কক্ষ থাকত—যেখানে দলের সকলে একত্রিত হয়ে রিহার্সাল দিত। কিন্তু বর্তমান কাবুকিতে পেছনের এই তিনতলা সাজঘরে নানান পরিবর্তন এসে গেছে।

হানামিচি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে প্রেক্ষাগৃহের পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ক্ষুদ্র কক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকত, এই কক্ষটি নো মঞ্চের আরশি-ঘরের মতই হত, কাবুকিতে এই কক্ষটির নাম ছিল "তোয়া" (Toya) এই কক্ষের সম্মুখে থাকত মঞ্চের স্মারক চিহ্ন অঙ্কিত একখানি পর্দা, এই পথেই অভিনেতারা



কাবুকি থিয়েটার : সপ্তদশ শতক।

হানামিচিতে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে মঞ্চে আসতে পারতেন, যদিও মঞ্চে প্রবেশের জন্য কাবুকিতে সেটের সংলগ্ন আলাদা দরজা থাকত।

কাবুকিতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, সেট এবং মঞ্চোপকরণ হত অনেকটা বাস্তবানুগ। কিন্তু তাদের নূতনত্বের স্পৃহা ছিল অদম্য, একদিকে তারা যেমন নো এবং পুতুলখেলার মঞ্চের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি চীনদেশের অদ্ভুত কাল্পনিক "অদৃশ্য" মানুষ প্রপারটিম্যান্‌কেও তারা মঞ্চে নিয়ে এল। কাবুকি জনসাধারণের নাটক এবং স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী হলেও—জাপানীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই আদবকায়দা এবং প্রথার কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল বলে, কাবুকি নাট্যানুষ্ঠানকে অনেকাংশেই

অবাস্তব ও ধর্মানুষ্ঠানের মত মনে হত। মূলতঃ কাবুকির বাস্তবতা ইউরোপীয় বাস্তববাদের ধারা বহির্গতই ছিল। যেমন কোন অভিনেতা তাঁর মৃত্যু দৃশ্যে যখন বিলাপ করেন কিংবা দুঃখ গাথা গাইতে থাকেন তখন তা বাস্তবের এবং যাঁরা ওই প্রথার সঙ্গে আজন্ম পরিচিত নন তাঁদের উভয়েরই হত্যাকারী হয়ে ওঠে। কুড়ি মিনিট ধরেই প্রবল রক্তক্ষরণের মধ্যেও সে বিলাপ চলতেই থাকত।

কাবুকি অভিনয়ের বাস্তব ভাবনার উপর কেবলমাত্র জাপানের সামাজিক প্রথার প্রভাবই যে পড়েছিল তা নয়, তার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল নো মঞ্চের প্রথানুগ অভিনয়ের এবং পুতুলখেলার স্থির দেহ ভঙ্গির। কাবুকি অভিনয়ে অনেক সময় দেখা যেত মঞ্চের সম্মুখে যবনিকা যখন ধীরে ধীরে সরে গেল অভিনেতারা তখন স্থির হয়ে চিত্রবৎ বিশিষ্ট ভঙ্গিতে আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, এই অভিব্যক্তিহীন পুতুল মানুষগুলি সঙ্গীতের হঠাৎ ইঙ্গিত পেয়ে লাফিয়ে উঠতেন এবং অভিনয় সুরু করতেন। এটা ছিল সম্পূর্ণই পুতুলখেলার প্রভাবে গড়ে ওঠা প্রথা। আবার কখন হয়তো তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুত ও বীরত্বপূর্ণ লয়ে পুষ্পপথের উপর অভিনয় করতেন। অনেক সময় নায়কের হাতে বিরাট আকারের এক ছাতা থাকত বা পাখা থাকত, মুক্ত তরবারির ব্যবহার মঞ্চে তো ঘটতই। কার্যতঃ কাবুকির আঙ্গিক অভিনয় ছিল নৃত্যধর্মী তাই তা বাস্তবানুগ হতে চাইলেও হয়ে উঠত ভাবানুগ ও ইঙ্গিতময়।

কাবুকি মঞ্চে মুখোশের ব্যবহার যথেষ্ট থাকলেও সকল অভিনেতাই মুখোশ ব্যবহার করতেন না কিন্তু তাঁরা মুখের উপর যে রূপ-সজ্জা বা মেক্-আপ গ্রহণ করতেন তা অনেক সময়ই মুখোশের পরিপূরক হয়ে উঠত। রূপ-সজ্জার সাহায্যে অভিনেতার ব্যক্তিগত চরিত্র ঢাকা দিয়ে এক বিশেষ ধরনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হত। মুখের মাংস পেশীর অবস্থান ঢাকা দিয়ে পুরু সাদা এক প্রলেপ মাখিয়ে নেওয়া হত, তার উপরে লাল ও কালো রেখা টেনে কখনো বাদুড় কখন প্রজাপতির রূপ ফুটিয়ে তোলা হত। এই পদ্ধতির প্রথম জন্মদাতা ছিল চীন সেখান থেকেই কাবুকিতে এসে পৌঁছেছে প্রত্যেক কাবুকি অভিনেতাই মাথার উপর কপাল ঢেকে একটা শক্ত টুপি পরতেন এবং তার উপরে আটকাতেন পরচুলা।

মঞ্চে বিবাহিতা এবং বয়স্কা নারীরা সব সময় দাঁতগুলো কালো করে

রাখত। এ ছাড়া জাপানী মেয়েদের মধ্যে আর একটি প্রথা প্রচলিত ছিল তা হল ভ্রূ কামিয়ে ফেলা—মঞ্চ একেও গ্রহণ করেছিল। ভ্রূ কামিয়ে প্রথমে তার উপর সাদা প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর খয়েরি ও কালো মিশিয়ে ভ্রূ-র কোমল ও সূক্ষ্ম রেখা ফুটিয়ে তোলা হত।

কাবুকি মঞ্চের বিভিন্ন ধরনের উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং উল্লেখযোগ্য ছিল—ভেলভেটের তৈরী ঘোড়া। এই ঘোড়ার আকৃতি নিখুঁতভাবে বাস্তব ঘোড়ার মতই তৈরী করা হত। তার ফুলানো কেশর, লম্বা লেজ, লাগাম, পাদানী, জিন সব কিছুই খাঁটি ঘোড়ার মতই হত। কাঠের ফ্রেমের উপর ভেলভেট মুড়ে এই ঘোড়ার অবয়ব গড়া হত—দু'জন অভিনেতা এই ঘোড়া সাজত। একজন হত ঘোড়ার সামনের দুই পা, অন্যজন হত পিছনের পা দু'টি। এই অভিনেতাদের নিজেদের পায়ের উপরেই আঁটো ভেলভেটের আস্তরণ এবং কালো খুরের মত জুতো থাকত। কাবুকি মঞ্চের এই নকল ঘোড়াকে দর্শকরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গাম্ভীর্যের সঙ্গেই গ্রহণ করত। এখনো কাবুকি মঞ্চে দর্শকদের আনন্দ বিধানের জন্য এই ঘোড়ার ব্যবহার টিকে রয়েছে। লক্ষণীয় যে চীনদেশের মঞ্চে এই ঘোড়ার অভাব কেবলমাত্র একটি চাবুকেই মিটে যেত। চীন দেশের অভিনয় কৌশল ও মঞ্চরীতি ছিল সম্পূর্ণই ইঙ্গিতধর্মী,—নকল ঘোড়া তৈরীর ক্ষেত্রে তাই কাবুকি ছিল অনেক বেশি বাস্তবপন্থী।

আরো অনেক রকম জীবই কাবুকি মঞ্চের জন্য তৈরী করা হত যেমন—হাতি, বাঘ, শেয়াল, বাঁদর, কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, সাপ, ব্যাঙ্, ইঁদুর প্রভৃতি। এর মধ্যে কতকগুলি ঘোড়ার মত সম্পূর্ণই বাস্তবানুগ হত, আবার কতকগুলি গড়ে উঠত কল্পনার সংমিশ্রণে। এই সমস্ত শিল্পগুলি কারুশিল্পীরা বংশানুক্রমিক ধারায়ই শিক্ষা করত এবং প্রয়োগ করত।

কাবুকি মঞ্চে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হত তার নাম ছিল "কোদোগু" (Kodogu)। কোদোগু দুই শ্রেণীর হত। ১। "দেদোগু" (Dedogu) ২। "মোচিদোগু" (Mochidogu)। এর মধ্যে সেটের অংশ হিসেবে মঞ্চে যে সমস্ত উপকরণগুলি থাকত সেগুলিকেই বলা হত দেদোগু, আর যে সমস্ত উপকরণ অভিনেতা স্বয়ং বহন করে আনতেন যেমন তরবারি, পাখা, ছাতা ইত্যাদি তাদের বলা হত মোচিদোগু এ ছাড়া সেটের উপকরণ হিসেবে মঞ্চে থাকত ঘর, বাড়ি, পুল ইত্যাদি— এগুলির অবস্থানের জন্য

মঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট থাকত। এগুলি তৈরী করা, রক্ষা করা এবং প্রয়োজন মত যোগানোর জন্য মঞ্চের পশ্চাতে থাকত একদল অক্লান্ত পরিশ্রমী কুশলী মানুষ। তারাই মূর্তি গড়ত, ছবি আঁকত, মুখোশ বানাত তাদেরি কল্পলোকে ধরা দিত দৈত্য, দানব এবং নানা পশু পাখীর রূপ।

কাবুকি মঞ্চে সেটকে বলা হত "ওদোগু" (Odogu), এই সেট তৈরী হত কাঠের তৈরী ফ্রেমের উপরে আঠা দিয়ে নানান ধরনের কাগজ আটকিয়ে। এই কাজের জন্য দু' শ্রেণীর কুশলী লোকের দরকার হত— এক যারা কাঠের ফ্রেম গড়ে তার গায়ে কাগজ আটকাত এবং দ্বিতীয় দল যাবা তার গায়ে চিত্রাঙ্কণের সাহায্যে অলংকরণ করত। অঙ্কন শিল্পীদের একদলের কাজ ছিল সেটের উপরের ছাদ, মঞ্চের বেড়া ও পুরো মঞ্চ দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তোলা, অন্য দল প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছপালা ইত্যাদি মঞ্চোপযোগী ফ্রেমের গায়ে অঙ্কন করত। এছাড়া কাঠমিস্ত্রীরা তৈরী করত মঞ্চ বেদী।

কাবুকি মঞ্চ সব সময়ই চেষ্টা করত নাটকে বর্ণিত স্থান ও পরিবেশের অনুরূপই সেট তৈরী করতে, তাই কাবুকি সেট কখন হত অভিজাতদের প্রাসাদ, কখন দরিদ্র কুটীর, কখন বা চা-খানা। কখন এই সেট সোজাসুজিই মঞ্চের উপর তৈরী করা হত, কখন আবার মঞ্চের পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ উঁচু একটা প্লাটফর্মের উপর তৈরী করা হত। এই উঁচু বেদীটি মঞ্চের সঙ্গে তিনটি সিঁড়ির ধাপ দিয়ে সংযুক্ত থাকত। কাবুকি সেটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটা দৃশ্যের পশ্চাৎপটের মত মঞ্চের পেছনের অংশ জুড়েই থাকত—সম্মুখ দিকটা খোলা থাকত—এবং এই অংশেই মূল অভিনয় চলত। সম্ভবতঃ নাটকে নৃত্যাংশ বেশি থাকার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কাবুকি সেট নির্মাণের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত ছিল তা হল সেটের মধ্যভাগে থাকত প্রধান গৃহ, তার সম্মুখ-মঞ্চের দিকে থাকত বাইরের প্রবেশ পথ, প্রধান গৃহের দেয়ালের সঙ্গে থাকত সরস্ত দরজা, তাতে অভিনেতারা স্বচ্ছন্দে পিছন দিকে সেটের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারতেন। এই মধ্য কক্ষ মঞ্চ বাম দিকের সঙ্গে (দর্শকদের দক্ষিণ) একটি ছোট দরজা দ্বারা যুক্ত থাকত এদিককার সম্মুখভাগে দর্শকদের মুখোমুখি থাকত কাগজে আচ্ছাদিত একটি বন্ধ জানালা, আর মঞ্চের দক্ষিণ দিকে থাকত বাইরের সঙ্গে সংযোগকারী প্রধান

প্রবেশ পথ—হানামিচির সঙ্গে এটি যুক্ত হত। এই সংযোগ স্থলে "কিদো" (Kido) নামে একটি দরজা সেটের অংশকে বাইরের পথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। এই কিদোও নানান শ্রেণীর হত এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন গঠনশৈলী ছিল।

জাপানী নো এবং কাবুকি নাটক কোনটাকেই হয়তো ইউরোপীয় নাট্যতত্ত্ব অনুযায়ী নাটকই বলা যায় না। পাশ্চাত্য চায় বিভিন্ন মানবিক ভাবাবেগের খেলা, চায় বুদ্ধিদীপ্ত কার্যক্রম। এটা ঠিকই যে মানুষের ভাবাবেগের অনুকরণে আমাদের পরিজ্ঞাত শ্রেণীর নাটক গড়ে উঠেছে—তথাপি নাটক হিসাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধানুগ নৃত্যগীত মূলক জীবনানুকৃতিও কোন অংশেই হেয় নয়। কারণ বলা যায় এখান থেকেই সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর নাটকের আরম্ভ—তারপর যে যার আপন আপন বৈশিষ্ট্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য, আছে কল্পনার বিস্তার, আছে কাব্যলোকের ভাবমূর্তির বিভিন্ন প্রকাশ। প্রাচ্য—রঙে, রূপে, সুরে, ছন্দে, গতিতে মানুষকে চেয়েছে ভুলিয়ে দিতে, সজাগ ইন্দ্রিয়কে চেয়েছে ঘুম পাড়িয়ে দিতে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য অর্থেভরা, জীবনের ব্যাখ্যাময় দার্শনিক তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে তার নাটকে—পঞ্চেন্দ্রিয়কে আরো তীক্ষ্ণ, শিক্ষিত, জাগ্রত করে তুলে যাকে গ্রহণ করতে হয়। তবু কিছু কিছু ইউরোপীয় শিল্পী বর্তমান কালে প্রাচ্যের এই শিল্পকে এবং দর্শনকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন—কারণ তাঁদের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবপন্থার জয়ই শেষ কথা নয়—(The Conquest of Realism is not the whole battle of the theatre)।

আজো জাপানে কাবুকির অভিনয় হয়—আজো মঞ্চের নীচে এবং পশ্চাতে সেই অদ্ভুত শ্রেণীর কারুশিল্পীরা বাস করে—কাবুকিই যাদের বিশ্বসংসার। তারা আত্মতৃপ্ত, সমাহিত, একটিই তাদের মূল অনুপ্রেরণা এবং উদ্দেশ্য—যথা নির্দিষ্ট সময়ে মঞ্চের যবনিকাটি প্রপারটিম্যান্ ছুটে এসে সরিয়ে দিল কি না, দর্শকরা পরিতৃপ্ত হল কি না। প্রাচীনকালে সেই যবনিকার অপর প্রান্তে যে দর্শকরা বসে থাকত মঞ্চের মানুষদের সঙ্গে ছিল তাদের অন্তরের যোগ—সেকালের দর্শকদের কাছে কাবুকিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তবিনোদনের পন্থা। বর্তমান কালের মঞ্চে নানান বৈজ্ঞানিক সম্ভার এসে গেছে—এসেছে বিদ্যুতের শক্তি, মঞ্চকর্মীদের মধ্যেও এসেছে

গতানুগতিকতার হতাশা, দর্শকদের মধ্যেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন—তারা হল বর্তমান কালের সিনেমার দর্শক—কাবুকি থেকে তারা আনন্দ পায় বটে তবে প্রাণের যোগ হারিয়ে গেছে।

তবুও কাবুকি থিয়েটার সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে—আজকের জগতে স্বল্প সংখ্যক জীবন্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলির এটি অন্যতম। সমস্ত রকম নাটকীয় উত্তেজনাই সেখানে আছে। বিরাট প্রশস্ত প্রোসীনিয়ম্, বিস্তার তার সত্তর ফুট, মঞ্চ অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং তা পরিপূর্ণ হয়ে আছে বহু সংখ্যক ত্রি-মাত্রিক দৃশ্যপটে আছে চেরী গাছ, সাঁকো, অঙ্কিত ঢেউ-এর উপরে ভাসমান তরণী, চারদিকে উদ্যান পরিবৃত গৃহ। গৃহখানি মেঝেতে খড়ের মাদুর পেতে এবং কাগজের সরন্তদেয়াল দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এর বেশিরভাগ অংশই দর্শকদের চোখের সম্মুখে বিরাট ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপর অপসারিত হয়।

প্রেক্ষাগৃহের বাম দিক পার হয়ে চলে গিয়েছে হানামিচি অথবা পুষ্পপথ, এ যেন একটা কাষ্ঠ বেদী যা মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহের সর্বশেষ দেয়াল পর্যন্ত চলে গিয়েছে,—এটার ব্যবহার হয় যখন নাটকের মধ্যে কোন বিস্ময়কর আবির্ভাব বা তিরোভাব দেখানো হয়।

নাটকগুলি হল কমেডি, মেলোড্রামা এবং নৃত্যনাট্য, এগুলি বিদেশীদের কাছে এতই দৃষ্টি সুখকর যে তারা অচিরকাল মধ্যে ভাষার বাধা ভুলে যায় এবং তারা যা দেখছে এবং শুনছে তারি প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে।

॥ বুনরাকু-পুতুল নাট্যাভিনয় ॥

জাপানে "হেইয়ান্ যুগে" (Heian era—৭৮১-১১৮৫ খ্রীঃ) পুতুলের খেলাকে আমরা প্রারম্ভিক অবস্থায় রাস্তায়, পথে-ঘাটে মানুষের মনোরঞ্জন করতে দেখতে পাই। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এ পূর্ণ পরিণত রূপ ধারণ করল; ক্রমশঃ তা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে কাবুকি থিয়েটারকেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করল।

পুতুল অভিনয়ের মৌলিক উপকরণ ছিল গান। জনপ্রিয় গাথা এবং বৌদ্ধ কিংবদন্তী অবলম্বনে তারের যন্ত্র সহযোগে শিল্পীরা এই সঙ্গীতময় কাব্য নির্ঝর সৃষ্টি করত। এই গাথার বিখ্যাত যোদ্ধা নায়ক "ইয়োশিৎসুনের"

(Yoshitsune) প্রেমিকার নামানুসারে এই গানের নাম হল "জোরুরি" (Joruri)।

প্রথমে পুতুলের কেবল মাথাই থাকত এবং তা পরিচালনা করত একজন মাত্র শিল্পী। ক্রমশঃ পুতুলগুলি আর মাটির রইল না হাত-পা-ওয়ালা কাঠের পুতুল তৈরী হতে লাগল অতএব তখন এক একটি পুতুল পরিচালনার জন্য তিনজন মানুষের দরকার হল। ধীরে ধীরে পুতুলগুলি নানা গুণেরও অধিকারী হয়ে উঠল—তারা পা ফেলে ফেলে নাচতে শিখল, তাদের যান্ত্রিক কৌশল এমন হল যে অক্ষিমণ্ডল ঘোরাতে পারত—এবং কিছুকাল মধ্যেই তাদের দেহটাও বিভিন্নভাবে আবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেল। পুতুলের দেহবিজ্ঞানই যে কেবল উন্নত হল তা নয় তাদের মুখভঙ্গিও ভাবব্যঞ্জক হল, চোখের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের ভ্রূ-ও খেলা করতে সুরু করল। এত সব জটিলতার ফলে পুতুলগুলো পূর্বের তুলনায় আকারে দ্বিগুণ বড় হয়ে দাঁড়াল। মানুষের আকার এবং আচরণ অনুসরণ করাই যেন পুতুল জগতের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল।

অষ্টাদশ শতকে (১৭১৫ খ্রী:) পুতুলের জন্য সঞ্চরণশীল মঞ্চ এবং দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি হল। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং স্থাপত্য কলাকৌশল দেখা দিল—মঞ্চ-অলংকরণ বাস্তবানুগ হয়ে উঠল।

পুতুল নাটকের "জোরুরি" সঙ্গীতকারীরা মঞ্চের সম্মুখভাগে দর্শকদের দক্ষিণ দিকে বসতেন। ক্রমে যাঁরা পুতুল খেলাতেন এবং যাঁরা গান গাইতেন সবাইকেই দর্শক সম্মুখে দেখা যেতে লাগল—এবং এই নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলল।

কাবুকির ক্রমোন্নতির সঙ্গে পুতুল খেলার ভিড় আপাততঃ ভেঙ্গে গেল কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই আবার এদের পুনর্জাগরণ ঘটালেন "উয়েমারা বুনরাকু কিন্" (Uemara Bunraku Kin)। তিনি এর সঙ্গীত এবং পুতুল পরিচালনা শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং একটা সংঘ গঠন করলেন। আদিতে যে পুতুল খেলার নাম ছিল "নিন্‌গিও শিবাই" (Ningyo Shibai) বুনরাকুর প্রভাবে সেই পুতুল খেলারই নব নামকরণ হল "বুনরাকু"। বুনরাকু সংঘের সদস্য সংখ্যা দেশ জুড়ে অনেক ছিল। বছরে তারা দু'বার টোকিওতে আসত খেলা দেখাতে। অতিথিরা নিমন্ত্রণ চিঠি পেতেন। এতে যথেষ্ট ভিড় হলেও কাবুকি এবং সিনেমার প্রতিযোগিতায় ক্রমেই বুনরাকু হেরে যেতে লাগল।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আজ প্রাচ্য তথা সমগ্র পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ লোকশিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। বুনরাকুর নিপুণ শিল্পীরা আজ সকলেই হতশ্রী-বৃদ্ধ। তারা হয়তো এর শিক্ষা এমন কোন উত্তরপুরুষের হাতে দিয়ে যাবে যাদের কাছে এই মঞ্চই হচ্ছে জীবন ও জগৎ, তারা প্রকৃত শিল্পী তাই একে আঁকড়ে থাকবে এবং এরই মৃত্যুতে নিজেরাও মৃত্যুর পথে ছুটে যাবে। এরি জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সহায়তার যাতে এই বিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষা হয় এবং সমগ্র জাপান ও পৃথিবীর অঙ্গনে এর নিমন্ত্রণ লিপি ছড়িয়ে পড়ে।

যারা পুতুলের নাচ দেখায় সেই সব শিল্পীর শিক্ষানবিসির কাল অতি দীর্ঘ। অন্ততঃ ত্রিশ বছর ধরে প্রত্যহ অভ্যাস ছাড়া এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হয় না—অতএব তখন মধ্যবয়স উত্তীর্ণ। সুতরাং এজন্য চাই আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। মঞ্চে উঠে তারা পুতুলের সাহায্যে জীবন্ত পুরুষ ও নারী চরিত্রের অভিনয় দেখাত। তারা বিশ্বাস করত যে তাদের এই পুতুলগুলো সজীব এবং তাদের আত্মা আছে। তাই তারা পুতুলগুলির সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করত। একই সঙ্গে তারা ঘুমোত এবং জাগত। পুতুলের জগতে ছিল সেই গম্ভীর সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতকারীরা, আর সেই শিল্পীরা যারা অখ্যাত, অবজ্ঞাত—তবু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সুদীর্ঘ বছর ধরে তৈরী করত এইসব জীবন্ত পুতুল। এই যন্ত্রবিদ্‌দের বলা হত "চোবো" (Chobo) তারা পুতুলের চলাফেরা, তাদের স্থান, কাল, সময় সকলেরই নির্দেশ দিত।

পুতুলগুলো চরিত্র অনুযায়ী ৩´ ফুট থেকে ৪´ ফুটের মধ্যে লম্বা হত। বিভিন্ন চরিত্রের পুতুলের অঙ্গবিন্যাসও বিভিন্ন প্রকার হত। নারী চরিত্রের পুতুলের পা থাকত না, তাদের ঝুলানো পোষাকের বা কিমোনোর কিনারাটা এমন কৌশলে হাতের আঙুল দিয়ে নাড়ানো হত যে পায়ের অভাব ঢাকা পড়ে যেত। পুতুলের চোখ, মাথা, ভ্রূ ইত্যাদির মধ্যে এমন সব যান্ত্রিক কলাকৌশল থাকত যে সুতোর একটি টানে সুন্দরী নারীর মুখ ভীষণাকৃতি ডাইনীর মুখে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারত। মুখগুলোকে অদ্ভুত উপায়ে বাঁকিয়ে আকৃতি দেওয়া হত; মাথায় সত্যিকার চুল পরিয়ে দেওয়া হয় এবং পোষাক পরিচ্ছদও হত চরিত্রানুযায়ী। মঞ্চের পেছনে একজন লোক এদের রূপসজ্জা, অঙ্গসজ্জা এবং পোষাক পরানোয় সর্বদাই ব্যস্ত থাকত।

পুতুলগুলোর হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সাইপ্রেস কাঠে তৈরী করা হত। এদের ঘুরানো এবং চালানোর সুবিধার জন্য কাঁধ, কনুই এবং হাঁটুর কাছে আলাদা কাঠের টুকরো বা চামড়া দিয়ে সেগুলো কব্জার মত লাগানো থাকত।

পুতুলখেলার মঞ্চ উচ্চতার তুলনায় লম্বায় অনেক বড় হত। সাধারণতঃ মঞ্চটা প্রস্থের দিকে পেছনের দেয়ালের সঙ্গে তিনটি স্তরে ভাগ করা থাকত। এতে পুতুল এবং তার পরিচালকরা প্রয়োজন মত চলা ফেরা করতে পারত। মঞ্চে নাটকানুগ যে সেট হত তা একটি কাল্পনিক, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করত। দর্শকদের চোখের সম্মুখেই দৃশ্যাবলী পাল্টে যেত, কারণ সেটগুলি একটার পেছনে আর একটা—পরপর সাজানো থাকত। নূতন একটা সেট যখন এগিয়ে আসত তখন পুরানো বা অপ্রয়োজনীয় সেটটা ডাইনে কিংবা বাঁয়ে সরে যেত। পুতুলখেলার মঞ্চে এক বিশেষ ধরনের সেটের ব্যবহার দেখা যায়—এগুলি ঘূর্ণায়মান চাকার উপরে উঠে আসে এবং খুব ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর দিয়ে তাদের টেনে নেওয়া হয়। এতে স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও পুতুলগু'ল দৃশ্যতঃ সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে আমরা যে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দেখি জাপানের পুতুলখেলায় এভাবেই হল তার সূচনা।

বুনরাকু পুতুলখেলা যখন আরম্ভ হত তখন সম্মুখের পর্দা উঠে গেলে একজন ঘোষক মঞ্চের উপর উঠে আসত। সে আপাদমস্তক কালো পোষাকে আবৃত হয়ে আসত এবং মুখ ও মাথার উপরে একটা ঢাকনা পরত। দেখতে কতকটা মুসলমান মেয়েদের বোরখার মত। এই পোষাকই মঞ্চের সাধারণ পোষাক ছিল—যারা খেলা দেখাত এবং যারা পরিচালনা করত সকলকেই এই পোষাক পরতে হত। ঘোষকের হাতে দু'টো ওক কাঠের লাঠি মত ক্লাপার থাকত, সে এই দু'টোকে একত্রে বাজাত এবং চিৎকার করে স্বস্তিবচন বলত—তোজাই, তোজাই, তোজাই। তারপর সে নাটকের নাম, গায়ক ও নৃত্যপরিচালকদের নাম ঘোষণা করত। তিনজন নৃত্য-পরিচালকের মধ্যে যিনি প্রধান হতেন তাঁকেও মঞ্চ নিয়মানুযায়ী পোষাক পরতে হত, কিন্তু তাঁর উচ্চ পদের জন্য মুখটা অনাবৃত থাকত। এদের এই মাথার ঢাকনাটা ইচ্ছে মত সরানো যেত। এই ধরনের পোষাক এরা পেয়েছিল চীনের প্রপার্টিম্যানের কাছ থেকে; কাবুকি মঞ্চের অনুষ্ঠানেও

কর্মিবৃন্দ এই পোষাকই ব্যবহার করত। যিনি সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানের পরিচালক তিনি মঞ্চের পশ্চাদ্দিকে একটি কক্ষে থাকেন; এবং সেখান থেকেই তিনি সবকিছু পরিদর্শন করেন—এই ধারা কাবুকিতেও প্রচলিত রয়েছে।

পুতুলগুলির চলাফেরারও কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম রয়েছে—যেমন একটি পুরুষ পুতুল এগোতে হলে বাঁ পা প্রথম বাড়িয়ে দেবে আর একটি স্ত্রী পুতুল বাড়াবে ডান পা। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ যখন দাঁড়াবে তখন সে পশ্চাদ্দিকে তাকাবে; অন্য পুতুল পেছনে তাকাবে কেবল যখন তারা মঞ্চ ত্যাগ করে যাচ্ছে। ভয় পেলে পুতুল বাঁ থেকে ডাইনে মুখ নাড়বে, অনুরোধ জানাতে হলে এগোবে ফিরিয়ে দিতে হলে পিছিয়ে যাবে। বারাঙ্গনা চোখের জল মুছবে কাগজের রুমালে আর নায়ক হাত দিয়ে। পুরুষচরিত্র যখন হাসবে তখন কাঁধ নড়বে, মেয়েরা হাসবে নীচু হয়ে ঝুঁকে সামনে জামার হাতা তুলে ধরে। হাতে পাখা বা তরবারি ধরবারও বিশিষ্ট রীতি আছে—ভ্রূ-ভঙ্গি হয় বহু প্রকার। বছরের যে ঋতুই হক না পাখা তারা ভুলবে না। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিই হবে নিখুঁত। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তারা অঙ্গ সঞ্চালন করবে।

জাপানের এই বুনরাকু পুতুল নাচের এটাই হল প্রধান কথা, যে পুতুল নাচাতে হলে নিজেকেও পুতুলের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হবে। নিজের গভীর অনুভূতি হাতের পুতুলের মধ্যে সুতোর মৃদু টানে ফুটিয়ে তুলতে হবে। পুতুল শিল্পীরা তা জানতেন এবং পারতেন।

॥ মধ্যযুগ ॥

ইউরোপ

গ্রীস এবং রোমের ক্লাসিকাল অধ্যায় শেষ হওয়ার পরে ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য এবং সমাজ জীবনে নেমে এল এক অন্ধকারময় যুগ। প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রম-ক্ষীয়মাণ পরিশেষ—"বর্বর" বা বিদেশীদের আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বর্বরদের মধ্যে নাটক এবং শিল্প সম্পর্কে কোন শিক্ষা ছিল না। তবুও দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তও জমিদারদের দুর্গপ্রাসাদে এবং গ্রামীণ অনুষ্ঠান ও প্রথার মধ্যে দক্ষিণ ইটালির ক্লাসিকাল যুগের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। জমিদারদের প্রাসাদে বীণা (Lyre) সহযোগে চারণদের গান হত। আবার মাইমস্ ও ফার্সের দলছাড়া অভিনেতারা হাটে মাঠে শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে এবং মূকাভিনয় করে দু'পয়সা উপায় করত। অবিশ্যি পরবর্তীকালে চার্চের হাতে নাটক যদি পুনরুজ্জীবিত না হয়ে উঠত তবুও আমরা হয়তো অচিরকাল মধ্যে এই পথেই এক পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র শ্রেণীর নাটক দেখতে পেতাম।`

খ্রীষ্টধর্ম এবং প্রাচীন ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রথমাবস্থায় নাটকের প্রবলতম শত্রু হয়ে উঠেছিল, কারণ প্রাচীন গ্রীক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছিল "পেগান্ দিওন্যুসাসের" (Pagan Dionysus) পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। চার্চ একদিকে এই পৌত্তলিকতা অন্যদিকে সহজ উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবল বিরোধী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে চার্চ এক মহাসত্য উপলব্ধি করতে পারল তা হল, নাটকের প্রচারকার্য ও জনশিক্ষার ক্ষমতা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চার্চের জন-সমাবেশে প্রার্থনা সঙ্গীত ও বাইবেলের সুসমাচার গাওয়া হত। "কয়ার" (Choir) সঙ্গীতের মধ্যেই গানের সাহায্যে উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে বাইবেলের 'তিনজন মেরীর' (Three Maries) কাহিনীতে এসেই আমরা চার্চের অভ্যন্তরে একটা নির্দিষ্ট নাট্যরূপ পাই।

` মধ্যযুগের থিয়েটারে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, এর আবির্ভাব ঘটেছিল চার্চের মধ্যে খ্রীষ্টের ভোজ সংক্রান্ত উৎসবে এবং সমাপ্তি হয়েছিল সাধারণ উৎসবে।

"বর্বরতার" নতুন বন্যার উদ্বেল তরঙ্গ থেকে ধর্মের সহায়তায় বেরিয়ে এসে

মানবতা আর একবার খুঁজে পেয়েছিল নাটকের মধ্যে সাধারণ বাস্তবতা ও উচ্চাশা প্রকাশের শক্তিশালী অস্ত্র। ঈশ্বরই ছিলেন মধ্যযুগীয় নাটকগুলির দৃশ্য এবং অদৃশ্য নায়ক। এর থেকেই মধ্যযুগে জন্ম নিয়েছিল শ্রদ্ধা ও আনন্দের এবং বন্ধন ও মুক্তির সংমিশ্রণ—তাকেই নাটকের আত্মা বলা যায়।

দশম শতক থেকেই চার্চের অধীনে এই নূতন ধারার আবির্ভাব হয়। এগুলো বাইবেলের কাহিনী নিয়ে গঠিত, অতি ক্ষুদ্র হয়তো বা চার লাইনের নাটিকা হত। যেমন "মার্কের" (Mark) "সুসমাচারের" (Gospel) অংশবিশেষ নাটকাকারে দেখতে পাই। বাইবেলে বর্ণিত আছে,— "... এবং তিনি কবরবেদীতে প্রবেশ করেছেন। ...সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তিনি যেমন তোমাদের কাছে বলেছিলেন।" এইটুকু কাহিনী অংশ নিয়েই খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দৃশ্য রচিত হত।

॥ লিটার্জি নাটক ॥

সর্বজনীন পূজানুষ্ঠান বা "দ্যা লিটার্জিতে" (The Liturgy) এই ক্ষুদ্র কাহিনীই নাট্যরূপ পেত। এর অভিনয় চার্চের অভ্যন্তরেই হত। একজন পুরোহিত বেদীর কাছে সাদা লম্বা পরিচ্ছদ পরে বসে থাকতেন ইনি হতেন দেবদূত। একটি ক্রুশ বেদীর উপরে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হত। অপর তিনজন মেরীর ভূমিকায় অভিনয়কারী পুরোহিত দেবদূতের দিকে এগিয়ে আসতেন। তখন প্রথম পুরোহিত তাঁদের সম্বোধন করে বলতেন, বলা বাহুল্য ল্যাটিন ভাষাতেই—

"হে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী নারীরা! তোমরা কবরবেদীতে কাকে খুঁজছো?"

তিন জন মেরী তখন একসঙ্গে উত্তর করতেন—

"হে স্বর্গীয় পুরুষ! তিনি নাজারাথের যীশু, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।"[১]

ক্রুশের উপর থেকে আচ্ছাদনখানা সরিয়ে নিয়ে তখন দেবদূতরূপী প্রথম অভিনেতা বলতেন—

"তিনি এখানে নেই। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন যেমন তিনি বলেছিলেন। যাও, ঘোষণা কর যে তিনি কবরবেদী থেকে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন।"[২]

এই হচ্ছে পুরো কাহিনী কিন্তু এ যত ছোটই হোক নিঃসন্দেহে এ ছিল নাটক। এতে পরিষ্কারভাবে স্থানের নির্দেশ দেওয়া আছে, তা হল

"সমাধিভূমি" (The Sepulchre) চার্চের পূজাবেদীতেই এই কাজ চলত। যত সংক্ষিপ্তই হোক উপরিউক্ত কথোপকথনও রয়েছে। অভিনেতারা আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা সুসমাচারের কাহিনী বিবৃত করতেন। তিনজন পুরোহিত আর তিনজন পুরোহিত ছিলেন না, তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন তিনজন খ্রীষ্টান নারী—অর্থাৎ তিনজন মেরীর চরিত্রাভিনেতা এবং অপর একক পুরোহিত এই সামান্য সময়ের জন্য হলেন একজন দেবদূত। এ ছাড়া এতে রয়েছে মূকাভিনয়, রয়েছে বিভিন্ন উপকরণের (Properties) ব্যবহার। এরপর ক্রমশঃ এই মূল কাহিনীর সঙ্গে আরো শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়ে বিস্তৃত আকার ধারণ করল। এই ছিল মধ্যযুগের "লিটার্জিকাল্ ড্রামা" (Liturgical Drama), এতে চার্চের সাধারণ লিটার্জি বা "সার্ভিস্ অব্ দ্য ডের" (Liturgy or Service of the day) অংশ বিশেষ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে রূপ পেত। তিনজন মেরী এরপরে আলাদা ব্যক্তিত্বে দেখা দিলেন। প্রথম যাজক নিঃশব্দে এসে নিজের দুই করতল আবদ্ধ করে করবেদীর কাছে বসতেন। তিনজন মেরী তখন গির্জার প্রধান অংশ পরিক্রমা করে এগিয়ে আসতেন। তাঁরা যেন কি হারিয়েছেন, কি যেন খুঁজছেন—এই অভিব্যক্তিপূর্ণ আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে তাঁদের ল্যাটিন ভাষায় বাচিক অভিনয় চলত। তাঁদের বিলাপগাথায়—তাঁরা কখন বুক চাপড়ে, কখন হাত তুলে, কখন নতজানু হয়ে, কখন বা কণ্ঠালিঙ্গনবদ্ধ হয়ে গাইতেন।

কালক্রমে চার্চের দেয়ালের মধ্যে অনুষ্ঠিত, স্বর্গলোকের "ভজনসঙ্গীত" (Services) নিয়ে রচিত, এবং যাজকদের দ্বারা অভিনীত এই নাটক তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলতে লাগল, ক্রমশঃই কৃত্রিম হয়ে উঠল। তাই এই লিটার্জিকাল্ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অভিনয় পদ্ধতি দুই-ই অচিরকাল মধ্যে উচ্চাঙ্গের ইঙ্গিতময় পদ্ধতির হয়ে দাঁড়াল। যার মূলই হল স্বাভাবিক রূপকে কৃত্রিম ছকে বেঁধে ফেলা।

লিটার্জিকাল্ নাটকের বিভিন্ন উদাহরণ ও উল্লেখ ইটালি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। নাটকের এই ইউরোপ-জোড়া ভৌগোলিক বিস্তৃতি—চার্চ যে সুদীর্ঘকাল ধরেই এ ধরনের নাটকের অনুষ্ঠান করে এসেছিল তারি প্রমাণ বহন করে। ক্যাথলিক সংঘের সঙ্গেই এ নাটক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ এই সম্প্রদায় মূলতঃ কোন রাষ্ট্রেরই অধীন ছিল না।

এদের ভাষাও ছিল সর্বত্র ল্যাটিন। তাই চতুর্দিকে নাটক ছড়িয়ে পড়তে এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কাহিনী সংযুক্ত হতে কোন বাধাই ছিল না। তিনজন মেরীর কাহিনীর পর দ্বিতীয় কাহিনী এসেছিল—খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কাহিনী, তৃতীয় কাহিনী যুক্ত হল "মেরী ম্যাগ্ডালিনের" (Mary Magdalene) কাছে খ্রীষ্টের মালীরূপে আবির্ভাবের কাহিনী, এর সঙ্গে আরো একটি দৃশ্য যুক্ত হল, মেরীর সুগন্ধ এবং মশলা ক্রয় করার দৃশ্য।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে অভিনয় কালে প্রথমাবস্থায় শুধুমাত্র কবরবেদীটিই মঞ্চের কাজ করত। কিন্তু এরপরে বিভিন্ন দৃশ্য সংযোজনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানও পরিবর্তিত হতে লাগল। গির্জার জনসমাবেশের প্রধান অংশ দিয়ে মেরীরা পরিক্রমা করতেন, অতএব তাকেও থিয়েটারেরই অংশ বলে ধরা হত। এরপরে মালীবেশে খ্রীষ্টের জন্য "বাগান", মেরীদের গন্ধদ্রব্য ও মশলা কিনবার জন্য 'স্টল'। এই ভাবেই মধ্যযুগের নাটকের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পিতভাবে না হলেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এসে যুক্ত হতে লাগল। প্রথমতঃ দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে আর রেখাঙ্কিত ব্যবধান রইল না, তিনজন মেরী তা ভেঙ্গে দিলেন। তাঁদের বিলাপের মধ্যেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল বিগতযুগের "প্যাশান প্লের" মহাশূন্যতা ও রিক্ততারই আকুতি। মঞ্চের দ্বিতীয় বৈচিত্র্য হল শ্রেণীবদ্ধ "প্লাটফর্ম" (Platform) মঞ্চের আবির্ভাব। ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চবেদীর উপরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট হল। যেমন কবরবেদী, বাগান, মশলার দোকান, ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত স্থানকেই প্রধানতঃ অভিনয় ক্ষেত্র (Acting area) হিসেবে ব্যবহার করা হত। এই মৌলিক ধারা ধরেই দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগীয় মঞ্চ তার পূর্ণ বিস্তৃতির পথে এগিয়ে চলেছিল। নাটকের প্রয়োজনে যা এসেছিল তাই নিয়মের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়তে লাগল।

॥ মিস্ট্রি নাটক ॥

দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নাটক আরো বিস্তৃত আকার ধারণ করল। চার্চ তার সংস্কারের আগারে নাটককে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখতে পারল না। নাটকের ভাষা ক্রমশঃ ল্যাটিন থেকে, মিশ্রিত ল্যাটিন, এবং তারপরে বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়াল; অন্যদিকে পূর্বে যা হয়তো

ছোট একটি ঘটনা ছিল,—ঘটনাবলী গ্রথিত হয়ে তাই পূর্ণ কাহিনীর আকার ধারণ করল। এই ভাবে লিটার্জি থেকে "মিস্ট্রি" (Mystery) এবং তারপরে মিস্ট্রিরও বিভিন্ন উপধারার সৃষ্টি হতে লাগল। এগুলি দেখা দিতে লাগল খ্রীষ্টধর্মের নানান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। যেমন ইস্টারেরদল কাহিনীর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে "প্যাশান প্লে" তৈরী করল, "ক্রিস্‌মাস্‌দল" (Christmas) সৃষ্টি করল যীশুর জন্ম কাহিনী নিয়ে "নেটিভিটি" (Nativity) নাটকের, আর "অ্যাসেন্‌শন্‌" (Ascension) দল করল "পুনরুত্থানের নাটক" (Resurrection Play)। এই সমস্ত কাহিনী যথাসম্ভব বাইবেল থেকেই নেওয়া হত।

বিস্তৃত পর্যায়ে মিস্ট্রি নাটকের সুন্দর এবং উপযোগী সেটিং দেখা যেত প্রধান চার্চ বা ক্যাথিড্রালে। চার্চের দেববেদী এবং প্রার্থনা সঙ্গীতের সমগ্র এলাকা জুড়েই বিভিন্ন সেট পড়ত এবং নাটকের ঘটনা সংঘটিত হত। বেদীর একান্তে হয়তো থাকত আস্তাবলের চিহ্নস্বরূপ জাবনা খাওয়ার কাঠের গামলা, হয়তো থাকত রাজা "হেরোডের" (Herod) সিংহাসন অথবা একদিকে দেখা যেত ইজিপ্টগামী পথের একটা সুদূর ইঙ্গিত। এই সমস্ত সেটে অভিনয় হত যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মেষপালকদের পূজা (Adoration), তিনজন জ্ঞানী বৃদ্ধের আগমন, রাজা হেরোড ও নিরপরাধদের হত্যাকাণ্ড— ইত্যাদি ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন কাহিনীর অংশ। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে পুরোহিতরাই অভিনয় করতেন, মাঝে মাঝে থাকত ধর্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাসঙ্গীত, কখনো বা ভজনসঙ্গীতের বালকরা এসেও যোগ দিত। মিস্ট্রি নাটকের আবির্ভাব যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান থেকে, তবুও দেখা যায় এর প্রবণতা ছিল বাস্তবতার দিকে। অলৌকিক এবং দেবসুলভ হলেও এই সমস্ত নাটকের মূল ভিত্তি ছিল ঈশ্বরপুত্রের মানব লীলারই কাহিনী। উচ্চ দেববেদীর উপরে যখন নাটকের অংশগুলি অভিনীত হত, তখন সেখানে সিংহাসন বসান হত, কিংবা থাকত কাঠের জাবনার গামলা— ফলে এই উচ্চ দেববেদী স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্চের কাজ করত। তা ছাড়া সামান্য কিছু পরিবর্তনের দ্বারা সেখানে স্বর্গ কিংবা নরকের দৃশ্যও দেখানো যেত। কাজেই ক্যাথিড্রালের এই মঞ্চকে আমরা "কলেকটিভ্‌ মিস্ট্রি" (Collective Mystery) মঞ্চ বলেই চিহ্নিত করতে পারি।

॥ মিরাক্‌ল্ নাটক ॥

বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করা ছাড়াও মধ্যযুগের ইউরোপে নাটকের আরো দু'টি উপধারার সৃষ্টি হয়েছিল। তা হল "মিরাক্‌ল্" (Miracle) এবং "মর‍্যালিটি" (Morality) নাটক। গোড়ায় লিটার্জিকাল্ নাটক থেকে উদ্ভূত মিস্ট্রি নাটকের একটা অংশ হিসেবেই মিরাক্‌ল্ নাটকের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মিস্ট্রির সমতুল্য ভাবে এ বৃদ্ধি পায়নি, যদিও এ পথের যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। মিরাক্‌ল্ নাটক—খ্রীষ্টধর্মের সন্তদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত হত।

যেমন "সন্ত নিকোলাসের" (St. Nicholas) জীবনী নিয়ে "জ্যাঁ বোদেল্" (Jean Bodel) দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভে এক মিরাক্‌ল্ নাটক রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে মিরাক্‌ল্ নাটকের প্রায় সকল উপাদানগুলিই দেখা যায়। নাটকের পটভূমিতে রয়েছে দুঃসাহসিক ও রোমান্টিক অভিযাত্রাময় ক্রুসেডের যুদ্ধ। পৌত্তলিক রাজার আক্রমণে বিধ্বস্ত খ্রীষ্টানরা সন্ত নিকোলাসের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই নাটকে বহু চরিত্র, রাস্তা, ঘাট, সরাইখানা, ঝগড়া-ঝাঁটি রয়েছে। ধর্মীয় নাটক হলেও সাধারণ জীবনের কমেডির মিশ্রণ একে বাস্তবানুগ করে তুলেছে।

দ্বিতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য মিরাক্‌ল্ নাটক হল "দ্যা মিরাক্‌ল্ অব্ থিওফিলাস্" (The Miracle of Theophilus)। এই থিওফিলাসের মিরাক্‌ল্ রচনা করেছেন ত্রয়োদশ শতকে "রুটেবাফ্" (Rutebuf) নামে একজন চারণ কবি। এই নাটকটি রচিত হয়েছে এমন একটি মানুষকে নিয়ে যিনি তাঁর আত্মা শয়তানের কাছে পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধির আশায় বিক্রি করে দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে পরবর্তী কালের মার্লো এবং গোটের ডাঃ ফস্টাস্ নাটকের মূল চরিত্রের এখানেই সূচনা। শয়তান ধরা পড়ার ভয়ে খুব সন্তর্পণেই কেনা-বেচাটি করেছিল কিন্তু অমর আত্মা বিক্রি করে দিয়ে থিওফিলের মনে দ্বন্দ্ব ও বেদনার শেষ ছিল না। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তিনি "ভার্জিনের" (Virgin) কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন, তাঁর প্রার্থনা প্রথমে বিফল হলেও পরে ভার্জিন্ সাহায্যের জন্য এলেন। যে সনদে থিওফিল্ সই করে শয়তানকে আত্মা বিক্রি করেছিলেন ভার্জিন্ তা উদ্ধার করে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন।

এই প্রকার মিরাক্‌ল্ নাটকে মিস্ট্রির মত ভগবানের প্রথম সৃষ্টি থেকে

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্যন্ত ঘটনাবলী দেখানো হত না। এতে থাকত ছোট ছোট আলাদা আলাদা নাটক। এই সমস্ত নাটকের দু'টি অংশ থাকত, প্রথম অংশে মূল-চরিত্রের প্রথম পাপকর্ম দেখানো হত, দ্বিতীয় অংশে থাকত বিস্ময়-বিমূঢ়কর মিরাক্‌ল্‌—পাপীর অনুশোচনা এবং সত্যপথের নির্দেশ। অপার্থিব মিরাক্‌ল্‌ ঘটার আগে কাহিনীর মধ্যে থাকত পার্থিব কমিক্‌ পরিস্থিতি ও বাস্তব জীবনের চিত্র।

এই সময় এক বিশেষ শ্রেণীর মিরাক্‌ল্‌ দেখা দিল, তাকে বলা হত "দ্যা মিরাক্‌ল্‌স্‌ অব্‌ আওয়ার্‌ লেডি অথবা লে মিরাক্‌ল্‌স্‌ দ্য নোতর্‌দাম" (The Miracles of our Lady or Les miracles de Notre Dame) এখানে "আওয়ার্‌ লেডি" (Our Lady) অর্থাৎ ভার্জিন্‌। এই ধরনের নাটকের মধ্যে এত বিচিত্রভাবে বাস্তবের মিশ্রণ ঘটেছিল যে তা সত্যিই একান্ত বিস্ময়কর। কাহিনী প্রথমাবস্থায় বলা যায় সম্পূর্ণই বাস্তব ধারায় চলত এবং তা যখন ক্লাইম্যাক্‌সে পৌঁছত নাট্যকার তখন সর্বশেষ বিস্ময়ের দিকে তার মোড় ফিরিয়ে নিতেন। এরপরে কাহিনী শেষ করতে যেখানে মিরাক্‌লের দরকার সেখানে মিরাক্‌ল্‌ এলেও বাস্তব উপাদান তাকে আচ্ছাদিত করে তুলত।

এছাড়া বন্ধুত্বের কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক পেথস্‌, অবৈধ প্রণয় বা অ্যাডভেঞ্চার্‌ কাহিনী নিয়েও মিরাক্‌ল্‌ নাটক রচিত হতে লাগল। এক্ষেত্রে কাহিনীর ব্যাপারে নাট্যকারদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। কাহিনীর মধ্যে একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে রোমান্টিক উপাদান এতই প্রবল হয়ে উঠত যে তাতে শেষ পর্যন্ত আর মিরাক্‌ল্‌ খুঁজে পাওয়া যেত না। চার্চের নাটক যে ক্রমশঃ ধর্মের গণ্ডি পার হয়ে মানবিকতার দিকে অর্থাৎ এক পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল—এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকই দেখা যায় প্রায় এক মত।

জন্‌ গ্যাশ্‌নার্‌ তাঁর "মাস্টারস্‌ অব্‌ দ্যা ড্রামা" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"সেণ্ট প্লের সঙ্গেই ল্যাটিন ভাষায় রচিত এবং গির্জায় অভিনীত গির্জার নাটকগুলির অন্তর্নিহিত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপরে নাটক আরো এগিয়ে যেতে পারত যদি মাতৃভাষায় কথোপকথন এবং জনরুচি ও অনুরাগ অনুযায়ী স্বাধীন নাটকের রচনা হত।"[৩]

এ বিষয়ে অ্যালারডাইস্ নিকল মহাশয়ের মতামতও প্রায় সমতুল্যই বলা যায়, তিনি তাঁর "ওয়ার্লড ড্রামা" গ্রন্থে লিখেছেন—

"মিস্ট্রি থেকে যদি উন্নত গাম্ভীর্য ও ধারণার বিস্তৃতি পাওয়া গিয়ে থাকে, মিরাক্ল্ মানুষকে শিখিয়েছে পারিবারিক দৃশ্য ও দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিবৃত্তকে কি করে নাট্যিক অভিব্যক্তি দেওয়া যায়।"[৪]

মধ্যযুগের নাটকের এই বিবর্তন গতি নিরীক্ষণ করে আমরা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই বুঝে নিতে পারি যে নাটক যেমন ধর্মীয় গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কাহিনী বলতে সুরু করল, মঞ্চ এবং নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টাও তেমনি ধীরে ধীরে চার্চের গণ্ডি পেরিয়ে এবং যাজকদের অধিকার ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের হাতে, সাধারণ জনসমাবেশ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল। অন্যদিকে এটাও লক্ষণীয় যে মিরাক্লের প্রভাব মিস্ট্রি নাটকের উপরেও এসে পড়তে লাগল ফলে তার কাহিনী ও মঞ্চ বিন্যাসের মধ্যেও নানান বাস্তব উপাদান দেখা দিল।

মিস্ট্রি নাটকে বাইবেলের কাহিনীর মাঝে নাটক তার বিষয়বস্তুর অখণ্ডতা লাভ করল ও গতিশীল হয়ে উঠল; যারা ল্যাটিন জানত না তাদের কাছেও হল বোধগম্য। তখন শহরের সক্রিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে নাটকের ভার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠল। অন্যদিকে গির্জার অভ্যন্তর ছাড়িয়ে অভিনয় বাইরে চলে এল গির্জা-প্রাঙ্গণে অভিনয় হতে লাগল—সর্বশেষে অভিনয় রাস্তায় ও নগরোদ্যানে স্থানান্তরিত হল। আর একবার গ্রীসের মত নাটক তার জন্মক্ষেত্র মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল।

॥ মর‍্যালিটি নাটক ॥

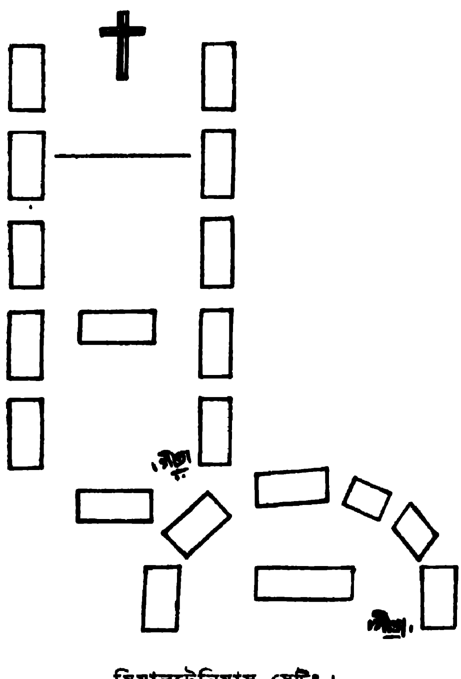
মধ্যযুগের মিরাক্ল্ নাটকের মধ্যে আমরা মানবিকগুণ ও বাস্তবচিন্তা দেখতে পাই। এর বিপরীত ধারার আর একশ্রেণীর নাট্যাভিনয়ও এ সময়ে বেড়ে উঠেছিল তার নাম হল 'মর‍্যালিটি' (Morality) নাটক। মর‍্যালিটি নাটক ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাব্যসাহিত্যে আমরা যাকে "রূপক" (Allegory) বলি নাটকের ক্ষেত্রে "মর‍্যালিটি" ছিল তাই। এই নাটকের চরিত্রগুলি হত মানুষের নানান দোষগুণের ব্যক্তিরূপ। এর মধ্যে কিন্তু নাটকীয় উপাদান বিশেষ কিছু থাকত না, থাকত মানুষের মধ্যে সুর ও অসুরের অথবা মানুষের জন্য সুর ও অসুরের ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব।

সুতরাং মিরাকূল্ নাটকের কাছে মর‍্যালিটি নাটকের উপাদানকে অত্যন্ত একঘেয়ে এবং উপদেশ-মূলক মনে হত। প্রথম দৃষ্টিতে তাই মর‍্যালিটি নাটককে মনে হত নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গামিতা। বাস্তব জীবন এবং চরিত্র থেকে একেবারে দূরে সরে আসা। তবুও এককথায় এ সমাধানে পৌঁছন যায় না। কারণ খাঁটি মর‍্যালিটি নাটকের কাহিনীতে প্রধান চরিত্র হয়ে আসত "ম্যান্‌কাইণ্ড" (Mankind) অথবা "হিউম্যানাম্ জীনাস্ অর্ ইনফ্যান্‌স্" (Humanum Genus or Infans)—প্রলোভনের বশে তার পতন হত কিন্তু আবার সহজাতগুণের বলে সে উদ্ধার পেত। এ ছাড়া মিস্ট্রি নাটকের পুরানো ধারা থেকে এখানে দু'টি চরিত্র এসে গিয়েছিল তাদের একটি হল শয়তানের চরিত্র এবং অন্যটি হল পাপ বা মানবিক দোষের রূপায়িত চরিত্র।

মর‍্যালিটি নাটকের মূল প্রেরণাই ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জনসাধারণকে জীবন সম্পর্কে সৎ-উপদেশ দেওয়া। এরই জন্য রূপকের সাহায্য নিতে হত এবং মানবীয় গুণাবলীর ধারণাগুলি ব্যক্তি চরিত্র পরিগ্রহ করে আসত। নাটকের মধ্যে যখন পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় হত অর্থাৎ জ্ঞান, বিনয়, নম্রতা, সততার জয় হত তখন স্বভাবতঃই দর্শকরা খুশী হয়ে উঠত। আবার তেমনিই তারা খুশী হত যখন গর্ব, অহংকার, কামুকতা এবং অন্যায় আচরণের পরাজয় হত। কেবলমাত্র দোষগুণের নিরাকার ধারণাই যে রূপ পেত তা নয়—তার সঙ্গে খারাপ অভ্যাস, মন্দ অদৃষ্ট, মন্দ জীবন, এমন কি খানাপিনা, উৎসবও স্থান পেত। একদিকে দেখানো হত পাপীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা যাতে দর্শক-অন্তর ভীত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দেখানো হত মানুষের সৎ-গুণাবলী সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে তার আত্মিক উন্নতি ঘটাবার জন্য।

সবরকম মর‍্যালিটি নাটকের মধ্যে "ইঙ্গ-ওলন্দাজ" (Anglo-Dutch) মর‍্যালিটি "এভ্‌রিম্যান্ অর্ এল্‌কারলিক্" (Everyman or Elckerlijk) নাটক একাধারে মর‍্যালিটির সর্বগুণ বিশিষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ছিল। এর কাহিনীও বহুপরিজ্ঞাত। সেখানে—এভ্‌রিম্যান্ বা মানব সাধারণকে নিয়ে আসবার জন্য ভগবান মৃত্যুর হাতে সমন পাঠালেন। এভ্‌রিম্যান্ যেন ভগবানের কাছে অতি সত্বর চলে আসে। এভ্‌রিম্যান্ কিন্তু যথা সম্ভব দেরি করতে লাগল এবং চারদিকে খোঁজ নিতে লাগল তার সঙ্গী হয়ে যাওয়ার মত আর কেউ আছে কি না। প্রথমে তার মনে হল বন্ধুত্বের

(Fellowship) কথা। বন্ধুত্ব উদার হস্তে এভ্‌রিম্যান্‌কে সকলি দিতে প্রস্তুত—এমন কি অনায়াসে জীবনটাও। কিন্তু এভ্‌রিম্যান্‌ যখন জানাল সে তাকে সঙ্গী করে মৃত্যুলোকে যেতে চায়—বন্ধুত্বের গর্বিত উক্তি এবং অহংকার আর রইল না, সে সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। এরপরে স্বজন এবং বিষয় (Kindred and Goods), জ্ঞান (Knowledge), স্বীকারোক্তি (Confession), সৌন্দর্য (Beauty), শক্তি (Strength), বিচক্ষণতা (Discretion), বুদ্ধি (Wits), একে একে সকলেই বিদায় নিল। সর্বশেষে বাকী রইল কেবল সৎ-কর্ম (Good Deeds)। সে ম্রিয়মাণভাবে ধুলোয় লুণ্ঠিত ছিল—কিন্তু এভ্‌রিম্যানের যখন ডাক এল তখন কেবলমাত্র সেই তার সঙ্গে যেতে রাজি হল। এ নাটক এখনো দর্শকদের উপর জাদুমন্ত্রের মত প্রভাব বিস্তার করে—এর সার্বজনীন আবেদনই তার কারণ।



সিমাল্‌টেনিয়াস্‌ সেটিং।

উপরে : রেজারেকশন্‌ নাটকের বিভিন্ন স্টেশন।

নীচে : সন্ত অ্যাপোল্লোনিয়ার তিরোভাব দৃশ্যাবলী।

॥ মঞ্চ ॥

এই সব মর‍্যালিটি নাটকের অভিনয়ও হত মিস্ট্রি নাটকের অনুরূপ মঞ্চেই। এই ধরনেরই ইংরেজী নাটক "কাস্‌ল্ অব্ পার্‌সিভীয়ার‍্যান্সের" (Castle of Perseverance) অভিনয় মিস্ট্রিরই অনুরূপ "যুগপদ্দৃষ্ট দৃশ্যসজ্জায়" (Simultaneous Setting) হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বেশির ভাগ মর‍্যালিটি নাটকের অভিনয়ই একটি মাত্র অভিনয়-বেদী বা মঞ্চের উপর হত। এতেই বোঝা যায় যে এই সব মর‍্যালিটির দল সৌখিন নাট্য প্রতিষ্ঠানের দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তারা মিস্ট্রিদলের মত বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা পেত না। ফলে অধিক ব্যয়বহুল জবড়জং উপাদানসহ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে "ম্যান্‌সন্‌স্ বা পেজ্‌ন্টস্" (Mansions or Pageants) মঞ্চ মিস্ট্রি নাটকের জন্য হত—মর‍্যালিটি ১৫শ শতকের শেষ দিকে তা ত্যাগ করে পেশাদারী দলের সহজ সরল সংক্ষিপ্ত পথ ধরল। সুতরাং মর‍্যালিটি নাটক ও তার রঙ্গালয়ই হল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সত্যকার যোগসূত্র।

এবার আবার আমরা মিস্ট্রি নাটকেই ফিরে এলাম। এতক্ষণ যে মিরাক্‌ল্ ও মর‍্যালিটি নাটকের আলোচনা করা হল তাও প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর মিস্ট্রিগোষ্ঠীরই অংশ বিশেষ ছিল। সুতরাং মিস্ট্রি নাটক এবং মঞ্চের ক্রম-পরিবর্ত্তনের আলোচনা করলেই আমরা এযুগের নাট্যেতিহাসের রূপটি তুলে ধরতে পারব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিস্ট্রি নাটক চার্চের অভ্যন্তর ত্যাগ করে, চার্চের অঙ্গন এবং তারপরে সাধারণ জনসমাবেশ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল। চার্চের ঢাকা বারান্দায় (Porch) আলাদা আলাদা সেট বা "স্টেশনস্" (Stations) তৈরী করা হত। এইভাবে মিস্ট্রি নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি আদর্শ মঞ্চের আবির্ভাব ঘটল। জনসমাবেশ যখন বেশি হত তখন দর্শকরা সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়াত বা বসত এবং সম্মুখের উচ্চ বারান্দা স্বভাবতঃই মঞ্চের কাজ করতে পারত। অভিনয় ছাড়া অনেক সময় চার্চের ধর্মসঙ্গীতও এখানে হত। চার্চগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দায় অভিনয়মঞ্চ তৈরী হওয়ার আর একটি বিশেষ সুবিধা ছিল তা হল চার্চগৃহই এক্ষেত্রে "স্কেনে বিল্‌ডিং" (Skene building)-এর কাজ করতে পারত। বারান্দার পশ্চাদ্‌বর্তী দরজা দিয়ে সহজেই প্রবেশ প্রস্থান করা চলত, তা ছাড়া চার্চগৃহের স্তম্ভশ্রেণী এবং দরজা জানালাও মঞ্চপরিকল্পনায় প্রয়োজন মত সহায়ক হত। উপরন্তু

চার্চের বারান্দা ঢাকা থাকায় মঞ্চও স্বভাবতঃই আচ্ছাদিত হত এবং মঞ্চের যথেষ্ট উচ্চতাও থাকত—তা ছাড়া বারান্দার সোপানাবলীও কাজে লাগানো চলত। চার্চের বারান্দায় এই অভিনয়কালেও যাজক এবং পুরোহিতরাই ছিলেন একমাত্র অভিনেতা।

চার্চের বারান্দায় আলাদা আলাদা স্টেশনস্ গড়ে এই অভিনয়কে আমরা মিস্ট্রিগোষ্ঠীর "লিটার্জি লক্ষণা" (Liturgical Trope) থেকে গিল্ড্ নাটকের (Guild play) অন্তর্বর্তী অবস্থা বলতে পারি। এই কালের অন্যতম প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ ফরাসীদেশের "আদম" (Adam) নাটকখানি আলোচনা করলে আমরা তৎকালীন মঞ্চ নির্দেশ তুলে ধরতে পারব। এই নাট্যাভিনয়ের বর্ণনার মধ্যে আছে যে একটি সমুচ্চ স্থানে স্বর্গোদ্যান তৈরী হয়েছিল; এই স্বর্গোদ্যানটির (Paradise) পরিবেশটি রচিত হয়েছিল অঙ্কিত দৃশ্যপট এবং সিল্কের পর্দা দিয়ে। মঞ্চটি এত উচ্চ ছিল যে কাঁধ সমান উচ্চতা থেকেও স্বর্গোদ্যানের অভিনেতাদের দেখা যাচ্ছিল। চার্চের বারান্দা বলেই মঞ্চে উচ্চতা এত অধিক হয়েছিল বোঝা যায়। উদ্যানটিকে বাস্তব সমতুল্য করে তুলবার চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। এর চারপাশ প্রকৃত গন্ধপুষ্প এবং লতায় আচ্ছাদিত করা হয়েছিল—নানা রকম বৃক্ষে নানা রকম ফলও ঝুলছিল। দেখে সত্যিই মনে হত একটি সুকুমার মনোরম উদ্যান। প্রথম দৃশ্যে :—ঈশ্বর এসে আদম ও ইভকে সেই উদ্যানে উপদেশ দিয়ে রেখে যেতেন। আদমের থাকত লাল পোষাক, ইভ পরত সাদা। দ্বিতীয় দৃশ্যে :—ঈশ্বর চলে গেলেন, আদম ও ইভ মনের বিমল আনন্দে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—ইতিমধ্যে নানান অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে নরকের দৈত্য, দানব সব এসে গেল এবং সর্বশেষে এল স্বয়ং শয়তান। শয়তান প্রথমে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য আদমকে প্ররোচিত করতে চাইল পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে গেল ইভের কাছে। শেষ দৃশ্য :—নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া হয়ে গেছে। এইবার নরকের দরজা খুলে গেল, শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে লোহার শেকল ও কড়া হাতে মঞ্চে প্রবেশ করল এবং প্রচুর হৈ-হল্লোড়ের পর তা আদম ও ইভের গলায় পরিয়ে দিল—তারপর সবাই মিলে আদম ও ইভকে টানতে টানতে নরকে নিয়ে গেল। নরকের মুখ থেকে তখন ধোঁয়া উড়তে লাগল, নরকে এবার উৎসব আয়োজনের সাড়া পড়ে গেল—তারপর শয়তানের ঐ চেলাগুলো মঞ্চে এসেও কিছু লম্ফঝম্ফ দেখাল।

এইখানে আমরা চার্চের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যানুষ্ঠানের রূপ পাচ্ছি। এই ধরনের নাটকের মঞ্চটি হত সম্মুখ সোপানাবলীর সর্বোচ্চ ধাপের বারান্দায়, স্থানটি হত চার্চগৃহের মাঝখানের প্রধান প্রবেশ পথের সম্মুখে খানিকটা অংশে। মঞ্চে স্বর্গোদ্যানের অস্থায়ী সেট তৈরী হত কাঠ ও ক্যান্‌ভাস দিয়ে। এতে খুব ঝকঝকে পর্দা ও দৃশ্যপট ব্যবহার করা হত। ফলে পশ্চাদ্‌বর্তী গির্জাবাড়ির গাম্ভীর্যপূর্ণ স্থাপত্যের গায়ে মঞ্চটি একটি রঙিন কল্পনার মত শোভা পেত। স্বর্গোদ্যানের দু'পাশেই ছোট ছোট কাপড়ের খুপড়ি মত অন্যান্য স্টেশনস্‌ তৈরী হত এবং দর্শকের বাঁদিকে সর্বশেষ কিনারে থাকত ব্যাদিত নরক মুখ। অভিনেতাদের বিচিত্রবর্ণের পোষাক, মঞ্চের উপরে এক মনোরম গতিবেগ ও বর্ণালির সৃষ্টি করত। ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত সঙ্গীত ধারা দর্শকদের দ্বিগুণভাবে প্রভাবিত করত, তারা গির্জার সমুচ্চ জানালার দিকে তাকিয়ে এই অদৃশ্য সুরস্রোত আকণ্ঠপান করত। স্বর্গীয় গাথা সঙ্গীতের এমন সময়োচিত প্রয়োগ অন্য কোন সময়ে হয়েছিল বলে জানা যায় না। আর কোথায়ই বা মহান্‌ ঈশ্বরের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর এমন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অগোচর থেকে ভেসে এসেছে? এই পর্যায়ে অভিনেতারাও কিন্তু মূক অভিনেতা ছিলেন্‌ না। তাঁরা ছিলেন ঈশ্বরের দূত—চার্চগৃহের অভ্যন্তর থেকে তাঁরা যখন মঞ্চে যাওয়া আসা করতেন মনে হত তাঁরা স্বয়ং ঈশ্বরের গৃহ থেকেই যাতায়াত করছেন। সুতরাং প্রয়োগ পদ্ধতির পারিপাট্যের দিক থেকে একে আমরা বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু ক্রমে গির্জার অধীনস্থ নাটকের অভিনয়ে আর পূর্বেকার ধর্মীয় পবিত্রতা অটুট রইল না। এই সময়ে চার্চ নিজেও বিলাস ব্যসনে ঝুঁকেছিল এবং আদর্শ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান মূলক নাটকের ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল নিম্নরুচির অশ্লীল আনন্দ—উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপাত্মক নাটকের অভিনয়। সাধারণ জনতা তাদের নববর্ষ, মে দিবস বা ক্রিস্‌মাস্‌ দিনে যে সমস্ত নিম্নস্তরের প্রচলিত আমোদ উৎসব করত ক্রমশঃ ছোট ছোট ক্লারজিরা এই সব অনুষ্ঠানে চার্চেরও অংশ গ্রহণের দাবি আছে বলে ঘোষণা করতে লাগলেন। চার্চের এই সব নিম্নতম পুরোহিতরা কখনই সাধারণ জনতার মত ঊর্ধ্বতনদের ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিভূ বলে মানতেন না, কারণ তাঁদের পরস্পরকে চিনতে বাকী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই

সকল উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের যাজকদের মধ্যে ছিল ঈর্ষা, ঘৃণা ও রেষারেষির ভাব। সুতরাং নববর্ষ ইত্যাদি সাধারণ উৎসব দিনে নিম্নশ্রেণীর পুরোহিতরা নাট্য-প্রহসন বা ড্রামাটিক্ বার্লেস্ক্ আরম্ভ করলেন, এতে উচ্চস্তরের বিশপদের অশ্লীল অনুকরণ ইত্যাদিও থাকত। নাটকের মধ্যবর্তী এই হাস্য কৌতুকের তাঁরা "ফিস্ট অব্ ফুল্স্" (Feast of Fools), "ফিস্ট অব্ অ্যাসেস্" (Feast of Asses) ইত্যাদি নামকরণ করতেন। এই সমস্ত অভিনয়ে কৌতুক উপভোগের জন্য অনেক সময় তাঁরা হয়তো প্রকৃত গাধাকেই গির্জাবাড়ির সামনে টেনে আনতেন আর তখন স্খলিতচরণ গ্রাম্য দর্শকরা দল বেঁধে সেই গাধাকে ঘিরে গির্জার সুরে গাইত—

বল স্বস্তি! ওঁ তৎসৎ
ওগো, মহাশয় গাধা;
খেয়েছো তো ঘাস, রয়েছো তো ভাল,—
হয়েছে তো গলা সাধা?
ডাকো ব্রে ব্রে, ঘুচাও নীতিরে,
যত কিছু আছে বাধা।
ওগো, মহাশয় গাধা। ইত্যাদি।

মিস্ট্রির এই প্রতিক্রিয়াশীলরূপ ভগবানের যতখানি অপ্রিয়, শয়তানের ততখানি প্রিয় হয়ে দাঁড়াল। অনেক সময় এই সব নাটকের ভাঁড়রাও আসত লম্বা কানওয়ালা গাধার মুখোশ ও পোষাক পরে। তারা নানা রকম নৃত্যগীত করত, মদ খেত, পাশা খেলত, হৈ-হুল্লোড় করত। ফলে চার্চের "পিতারা" একদিন যেমন বেত্র-হস্তে রোমান অভিনেতাদের শাসন করেছিলেন, তেমনিই আবার একদিন আপন গৃহের জঞ্জাল অপসারণে লাগলেন। এরি মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান ও উৎসাহী চার্চপিতা এই সব "ফিস্টস্ অব্ ফুল্স্" ভিন্নপথে পরিচালিত করে নবরূপ দিলেন। তা হল মিস্ট্রির সংশোধিত রূপ অর্থাৎ মিরাক্ল্ নাটক। এই জন্যই মিরাক্ল্ নাটকের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় ও বাস্তবানুগ উপকরণ দেখা যায়। কিন্তু এ ধরনের নাটক ক্রমশঃই চার্চ-প্রাঙ্গণ থেকে দূরে সরে আসতে লাগল, কারণ উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতরা এর প্রবল জনপ্রিয়তা ও জীবন বিশ্লেষণ ক্ষমতায় চকিত হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া নাটকের এই বিস্তৃত রূপকে বজায় রাখতে হলে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক পুরোহিতকে চার্চের ভজন, পূজন, আরাধনা ত্যাগ করে

পেশাদারী অভিনেতা হয়ে উঠতে হয়। অতএব পুনর্বার নাট্যাভিনয় ধর্ম-সংঘের অধিকারের বাইরে চলে এল—এবং চিরদিনের মতই চলে এল। মিস্ট্রি নাটক এর পরের পর্যায়ে জনসাধারণ অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও পৌরপিতাদের পরিচালনায় চলতে লাগল। তখন এর মধ্যে বাইবেলের কাহিনী, সাধু-সন্তদের জীবন, শয়তানের ছলাকলার সঙ্গে গাধা ও ভাঁড়-চরিত্রের কৌতুকও পুনরাবির্ভূত হল।

মধ্যযুগের নাটক যখন নামতঃ চার্চের অধীনে থাকলেও কার্যতঃ জন-মনোরঞ্জনের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল সেই সময়কার ইতালি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অভিনয় প্রচেষ্টার কিছু কিছু লিখিত বিবরণ ও অঙ্কিত চিত্র আমরা পাই—এই থেকেই বিভিন্ন স্থানে মিস্ট্রি ও মিরাকৃল্ নাটকের মঞ্চ-কৌশল ও অভিনয়-পদ্ধতি কেমন ছিল আমরা তা জানতে পারি।

"জ্যাঁ ফুকে" (Jean Fouquet) অঙ্কিত ১৫শ শতকের মিরাকৃল্ মঞ্চের একটি নকশা পাওয়া যায়। এতে দু'টি জিনিস ছিল লক্ষণীয়। এক—হাতে ছড়ি নিয়ে প্রম্পটার মঞ্চেই অভিনয় কালে ঘুরছে। আর দ্বিতীয়—এই সময়কার মঞ্চ পরবর্তী শতক অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মঞ্চের তুলনায় অনেক বাহুল্য বর্জিত ও অনাড়ম্বর রূপে দেখা যায়। এতে কেবল নরক মুখের সেটটাই ছিল অঙ্কিত ও সুসজ্জিত। এ ছাড়া নাটকের ছোট ছোট ঘটনার অভিনয় স্থান ছিল সারি সারি ক্ষুদ্রাকৃতি কাঠ ও ক্যান্‌ভাসে তৈরী খুপড়িগুলি। এই খুপড়িগুলির সম্মুখে থাকত উচ্চ গোলাকৃতি অনাবৃত বড় মঞ্চ এটাই ছিল প্রকৃত অভিনয় স্থান (Acting area)।

মিরাকৃল্ নাটকের প্রধান ঘটনাই হত সন্তদের জীবনী এবং তাঁদের অশেষ দুঃখ ভোগের দৃশ্যাবলী। জ্যাঁ ফুকেরই অঙ্কিত একটি চিত্রে আছে "সন্ত অ্যাপোল্লোনিয়ার" (St. Apollonia) আত্মোৎসর্গের একটি দৃশ্য। এখানে অ্যাপোল্লোনিয়ার সুন্দর দন্তরাজি একটি একটি করে টেনে তুলে ফেলা হচ্ছিল—এবং তারপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। দর্শকরা এই সব নাটকের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রই জানত তাই তারা ব্যগ্রভাবে এর পূর্ণ প্রতিরূপ কামনা করত। সুতরাং এই অত্যাচারের দৃশ্য এতই নিখুঁত ছিল যে বর্তমান কালের মঞ্চও তার কাছে হার মেনে যায়।

ফ্রান্সে ষোড়শ শতকে (১৫৪৭ খ্রীঃ) অভিনীত "ভ্যালেনসিয়েনেজ্ প্যাশন প্লে" (Valenciennes Passion Play) নামে একটি নাটকের নিদর্শন

পাওয়া যায়। এই নাটকে বর্ণিত প্রয়োগ পদ্ধতি থেকেই আমরা সেকালের সুসজ্জিত মঞ্চ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। এর মঞ্চ পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় যে এ সময়কার অশিক্ষিত দর্শকরা নাটকে উল্লিখিত স্থানের হুবহু নকল চাইত। লিটার্জি যুগের সাংকেতিক পদ্ধতিতে কিংবা কোন ইঙ্গিতে তারা আর তৃপ্ত হত না। বিশেষ করে তারা স্বর্গ ও নরকের অলৌকিক দৃশ্যাবলীর পূর্ণ প্রতিরূপ চাইত। এর মধ্যে তাদের সর্বাধিক অনুরাগ আবার ছিল নরকের প্রতি। তাদের অতি প্রিয় কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয় ছিল এটি। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখত, নরক থেকে শয়তান ও তার সঙ্গীসাথীরা বেরিয়ে আসছে। প্রচুর ধোঁয়া ও আগুন মঞ্চকে ছেয়ে ফেলত, আর তারি মাঝে শয়তানের দল পাপীদের পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলত। মধ্যযুগের এই অভিনয়ে বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতারা সকলেই প্রায় শয়তানের দলভুক্ত হয়ে অভিনয় করতেন।

মঞ্চ এবং নাটকের এই যে বিষয় ও আঙ্গিক পরিবর্তন এ কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট সন তারিখ ধরে হয়নি। কারো পক্ষেই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয় যে কবে থেকে লিটার্জিকাল্ নাটক পটপরিবর্তন করে মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল্ নাটক হয়ে দাঁড়াল অথবা ধর্মীয় নাটকের মধ্যে খেলো হাস্য কৌতুক এসে মিশ্রিত হল, তবে এ ঐতিহাসিক সত্য আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে মধ্যযুগের নাটক একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের রূপ নিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। কারণ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে নাটককে চার্চের অধীনে রাখা বা না রাখা নিয়ে বার বার মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তবুও একথা বলা চলে যে চতুর্দশ শতক থেকেই নাটক চার্চের হাত থেকে বাজারের ছাউনিতে অর্থাৎ ক্যাথিড্রালের হাত থেকে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণের হাতে এসে পড়ে।

ভ্যালেনসিয়েনেজ্ প্যাশন প্লের মঞ্চ পরিকল্পনায় আমরা দেখি যে মূল মঞ্চ এলাকাটি যথেষ্ট বিস্তৃত আকারের হত। মঞ্চের দুই কিনারায় অর্থাৎ দর্শকের বাম দিকে থাকত স্বর্গ ও দক্ষিণ দিকে থাকত নরক আর মাঝখানটা হত পৃথিবী। এই পৃথিবীর এলাকায় পরপর হয়তো সাজানো থাকত মন্দির, প্রাসাদ, গৃহ, নগর-প্রবেশপথ, প্রাসাদের উচ্চশীর্ষ, দেববেদী, দুর্গচূড়া, বন্দীশালা, অসিচালন ক্ষেত্র, সমুদ্রের বুকে জাহাজ ইত্যাদি—মঞ্চের এই খসড়াটি থেকেই বোঝা যায় যে অভিনয় কতখানি বিরাট এলাকা জুড়ে হত।

এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সেট নাটকের বিভিন্ন স্থান নির্দেশ ও পরিবেশ রচনা করত বটে, তবে প্রধান অভিনয় ক্ষেত্র হত মঞ্চের "নিম্ন-মধ্য ভাগ" (Down stage centre) দর্শকদের সম্মুখবর্তী এই অংশে এগিয়ে এসেই অভিনেতারা



ভ্যালেনসিয়ার মিস্ট্রি নাটকের মঞ্চ—১৫৪৭ খ্রীঃ।

স্বর্গ : জেরুজালেম : বিশপগৃহ : সমুদ্র : নরক।

প্রধান অংশগুলি অভিনয় করতেন। মঞ্চের একটা কক্ষে অভিনয় করে অন্য কক্ষে যেতে হলে অভিনেতাদের এই খোলা জায়গা পার হয়েই যেতে হত। তাঁদের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের বিভিন্ন কক্ষের আকর্ষণী শক্তিও পরিবর্তিত হত।

কিন্তু এর প্রত্যেকগুলি কক্ষই (Stations) যে তাঁরা একই দিনে ব্যবহার করতেন তা নয়। কোন উৎসব উপলক্ষে হয়তো প্যাশান প্লে-ই পঁচিশ দফায় অভিনীত হত। তিন, চারটা ঘটনা বা দৃশ্য নিয়ে এক একটি অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হত। তারপর এক একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের অভিনয় প্রদর্শন হতে থাকত। এই ভাবে হয়তো প্রথম দিনে দেখানো হত মেরীর পিতামাতার গল্প। চতুর্থ দিনে যীশুর জন্ম; মেষপালকদের পূজা এবং তিনজন জ্ঞানীর আবির্ভাব দেখানো হত। দশম দিনে হত মেরী ম্যাগ্‌ডালিন্‌কে ধর্মান্তরিত করা এবং পাহাড়ে দশবিধ ধর্মোপদেশ (Ten Commandments), অষ্টাদশ দিনে হত শেষ নৈশভোজ (Last Supper) এবং কুঞ্জবনের দৃশ্য (Orchard Scene) এইভাবেই দৃশ্যগুলি সাজানো হত।

বাইবেলের বিশেষ বিশেষ কাহিনীগুলি এবং তার দৃশ্যাবলী বেছে নেওয়া

তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজানো ইত্যাদি থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় যে অনুষ্ঠান কর্তাদের খ্রীষ্টীয় সুসমাচারের প্রতি আনুগত্য যতখানি ছিল তার চাইতে বেশি ছিল দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা। এই জন্যই নরক গহ্বরটি হত সবচাইতে আড়ম্বরপূর্ণ এবং জনপ্রিয়। নরকের এই প্রাধান্য এসেছিল মিরাক্‌ল্‌ নাটক থেকে। মিরাক্‌ল্‌ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় যে সাধু-সন্তদের যারা অত্যাচারকারী শত্রু তাদের পরিশেষে অতি-অবশ্যই নরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হত। কারণ বাস্তব জীবনে যাই ঘটুক না কেন দৈবশক্তির কাছে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

এই ধরনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা থেকে বোঝা যায় যে এতে নগর প্রধানদের সক্রিয় এবং আর্থিক সর্বপ্রকার সহায়তাই থাকত। এতে প্রধানতঃ ১৩ জন পরিদর্শক ও পরিচালকের একটি সংস্থা থাকত—তাঁরাই প্রাথমিক কাজগুলি চালাতেন। তিনজন থাকতেন বই বাছাই করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে "ভূমিকা" ভাগ করে দেওয়ার জন্য। একজন থাকতেন মঞ্চ পরিচালক, আর একজন ছিলেন দৃশ্যপরিকল্পক বা "মিজ্‌-অঁ-স্যেন্‌" (Mise-en-scene) এছাড়া সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করতেন আর একজন বিশেষজ্ঞ। যন্ত্র পরিচালন ও দৃশ্যমায়া সৃষ্টির জন্যও একজন বিশেষজ্ঞ থাকতেন এঁদের সহায়ক কলাকুশলীর সংখ্যাও কম ছিল না। এতেই বোঝা যায় নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ কোনো বলিষ্ঠ কীর্তি না রেখে গেলেও মঞ্চ পরিকল্পনা ও দৃশ্যরচনার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ছিল একাগ্র এবং এক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিও হয়ে উঠেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্মরণযোগ্য।

অপর একজন পরিদর্শকের অধীনে ৩৮ জন অভিনেতা থাকতেন। এক একজন অভিনেতা ২৫ দফা অভিনয়ের মধ্যে বহুবার করেই ঘুরে ফিরে আসতেন, বহু চরিত্রেই অবতীর্ণ হতেন। তা ছাড়া বহু ছোট ছোট চরিত্রের অভিনেতা এবং শিশু অভিনেতাও থাকত। অভিনেতাদের অত্যন্ত কঠিন নিয়মানুবর্তিতা মানতে হত। রিহার্সালে দেরি করা বা অভিনয়কালে মদ্যপান বা পরিচালককে অমান্য করা ইত্যাদি সকল অপরাধেই শাস্তি দেওয়া হত। অভিনেতাদের আর্থিক প্রাপ্য পরিচালকরাই ঠিক করতেন। অনেক সময় তাদের অনেক বিপদের এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অভিনয় করতে হত। যেমন জুডাসের ফাঁসি বা যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় দর্শকরা এতই বাস্তবানুরাগী হয়ে উঠত যে বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে উপায়

ছিল না। এই সব নাট্যাভিনয়ে মঞ্চের উপর ছড়ি হাতে একজন প্রম্পটারকে দেখা যেত। এর কারণ নাটকের লিখিত স্ক্রিপ্ট্ একখানাই মাত্র থাকত এবং অভিনেতাদের একাদিক্রমে বহু চরিত্রে অভিনয় করতে হত। সুতরাং প্রম্পটার প্রথা আপন প্রয়োজনেই দেখা দিল।

ভ্যালেনসিয়েনেজ্ প্যাশন প্লের রঙ্গমঞ্চের বিবরণে দেখা যায় যে, এখানে স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট দর্শকের বসবার জন্য আসন এবং তার উপরে চন্দ্রাতপের আচ্ছাদন দেওয়া হত। কিন্তু সাধারণ দর্শক মঞ্চকে দেখা যায় এমন জায়গায় দাঁড়ান ছাড়া অন্য কোন সুবন্দোবস্তের অধিকারী ছিল না।

ভ্যালেনসিয়ার অভিনয় যতই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল ততই সেখানে অত্যাশ্চর্য যান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ এসে যুক্ত হতে লাগল। মঞ্চে স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য এমন রহস্যময় করে তোলা হত যে তাকে অলৌকিক দৈব ঘটনাই মনে হত। জাদুকৌশলে যেন চরিত্ররা মঞ্চে আসত এবং অদৃশ্য হয়ে যেত। শয়তানের অনুচররা যে কি করে ড্রাগনের পিঠে নরক ভেদ করে আসত কেউ তা বুঝতে পারত না। দর্শকদের চোখের সমক্ষেই হয়তো জল মদে পরিণত হয়ে যেত এবং দর্শকরা সেই মদ আস্বাদন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠত। কিংবা পাঁচটি রুটির টুকরো বা দু'টো মাছ মঞ্চের উপরেই হঠাৎ এত অধিক সংখ্যক হয়ে উঠত যে তা দিয়ে তখন হাজার লোককে ভোজ দেওয়া চলত। শয়তানরা হয়তো মঞ্চের উপরেই বিভিন্ন রূপ ধারণ করত। আবার নরকের সংশোধনাগারে দেখা যেত অগ্নিকুণ্ড, ফুটন্ত তেলের কড়াই, কামান বা পাপীদের বেঁধে চাবকানোর জন্য ঘুরন্ত চাকা। আবার কোথাও কোথাও নরকের মুখটা এমন ভাবেই তৈরী হত যে সে তার ভয়াবহ চোয়ালটা প্রকৃতপক্ষেই খুলত এবং বন্ধ করত। মধ্যযুগের মঞ্চ এবং অভিনয় দৃশ্যাবলীর অনেক অঙ্কিত চিত্র পাওয়া যায়; তার মধ্যে বহুপ্রকার পশ্চাৎপট, নানান গ্রুপিং এবং ঝালর, পর্দা বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী রয়েছে—এগুলি সবসময়ে যে মঞ্চের অনুরূপই হত তা নয় অনেক সময়ই শিল্পীর কল্পিত আতিশয্য থাকত।

অচিরকাল মধ্যেই এই সমস্ত প্যাশান নাটক ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। মঞ্চে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য ঘটনা সৃষ্টির প্রয়াস নিঃসন্দেহে আত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। এরপরে নাটক আবার আর এক পরিবর্তনের মুখে এসে পড়ল এবং তারি ফলে ফরাসী দেশে এক

শতাব্দীর মধ্যে কর্ণেয়্‌ ও রাসিনের লিখিত রোমান্টিক ট্র্যাজেডিগুলি রাজসভার সংরক্ষিত মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। শহরে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এই প্যাশান নাটকগুলি পরিচালনার ভার নিয়েছিল তারাই ছিল পরবর্তীকালের পেশাদারী অভিনেতৃসংঘের পথ প্রদর্শক।

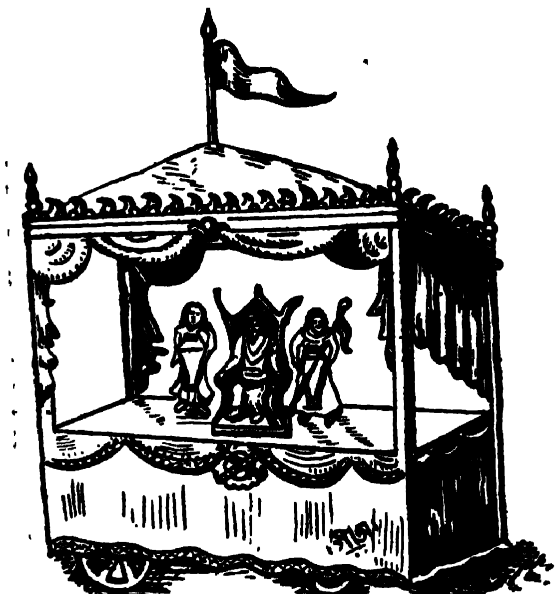
প্যারিস্‌ ও অন্যান্য বড় বড় নগরগুলিতে "ফিস্টস্‌ অব্‌ ফুল্‌স্‌" ইত্যাদির অনুরূপ ধারাটি প্রহসন (Farce) হিসেবে চলে আসছিল। কোন কোন সময়ে তাদের বিদ্রূপবাণ চার্চকে তিক্তভাবে বিদ্ধ করত। আবার অনেক সময় এদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা অনেক সামাজিক অন্যায় আচরণেরও বাধা স্বরূপ হয়ে উঠত। এগুলিই ছিল উত্তরকালের ফরাসী "ভাল্‌গার্‌ কমেডি" (Vulgar Comedy) এবং ইতালীয় "কম্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের" (Commedia dell' Arte) প্রাথমিক অসংস্কৃত সংস্করণ। এই প্রহসনের গতি ধারাই ছিল মলিয়েরের দীপ্ত প্রতিভার পশ্চাদ্‌ভূমি।

এই সমস্ত গাধা ভাঁড় ও বোকার কাহিনী পঞ্চদশ শতকে এসে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকৃত কমেডির রূপ ধারণ করেছিল। ১৪৭০ খ্রীঃ নাট্যকার "মেস্ত্র্‌ পিয়ের্‌ পাৎল্যাঁর" (Maistre Pierre Pathelin) আবির্ভাব হয়, ইনিই ছিলেন মধ্যযুগের ফার্স-কমেডির (Farce comedy) প্রধান হোতা। পাৎল্যাঁ রচিত নাটকের একটি বহু প্রচারিত ছোট্ট উদাহরণ রয়েছে তা হল চোরের উপর বাটপাড়ির গল্প। এক কাপড়ের ব্যবসায়ী এক রাখাল বালকের নামে ভেড়া চুরির মামলা করেছে। রাখাল পরামর্শের জন্য গেল এক কূটবুদ্ধি উকিলের কাছে; উকিল তাকে শিখিয়ে দিল যে, বিচারালয়ে তাকে যে প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হবে সে যেন শুধু তার একটি মাত্রই উত্তর দেয়, তা হল "ব্যা"। রাখালের এই অনর্গল 'ব্যা ব্যা' ধ্বনিতে কাপড় ব্যবসায়ী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং আদালতও তাকে বুদ্ধিহীন ভেবে ছেড়ে দিল। এরপর উকিল যখন তার দর্শনীর টাকা চাইল তখনও সেই রাখাল বালকটি 'ব্যা-ব্যা'ই করতে লাগল। উকিল তখন নিজের চালেই পরাস্ত হয়ে বিমর্ষচিত্তে বেরিয়ে এল।

পরবর্তী নাট্যকার "গ্রেঁগয়ার" (Gringoir)। তিনি ষোড়শ শতকে রাজনৈতিক প্রহসন লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত "বোকাদের রাজকুমার" (The Prince of Fools) নাটকে মহামান্য পোপের উপরেই প্রধান আঘাত করা হয়েছিল।

মধ্যযুগের নাটকে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যতদিন অক্ষুন্ন ছিল ততদিন বিষয়বস্তুর পবিত্রতা ও মঞ্চের সরলতাও অটুট ছিল। নাটক যতই জনগণের মনোরঞ্জন-কামী ও বাস্তবপন্থী হয়ে উঠতে লাগল ততই তারমধ্যে লৌকিক ধারা ও অপবিত্রতার মিশ্রণ ঘটল, মঞ্চেরও জটিলতা এবং কলাকৌশল তেমনি বেড়ে যেতে লাগল।

॥ ওয়াগন্ মঞ্চ ॥



পেজ্‌ণ্ট ওয়াগন্।

গ্রেট-ব্রিটেনে মধ্যযুগের নাট্যধারা ফ্রান্সের মতই চার্চের অধীনে 'লিটার্জিকাল্ নাটকের অভিনয় দিয়ে আরম্ভ হয়, এবং তারপরে যথারীতি মিস্ট্রি, মিরাক্‌ল্ ও মর‍্যালিটির পথেই বিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে ব্রিটিশ নাটক যখন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির হাতে এসে পড়ল তখন তার মঞ্চপ্রয়োগ-পদ্ধতির মাঝে এক সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকের, এক নবরূপায়ণ প্রচেষ্টার আবির্ভাব ঘটল। এখানেও নাটক যখন চার্চের আওতার বাইরে এল তখন তা ল্যাটিন ভাষার খোলস ত্যাগ করে

মাতৃভাষায় রূপ পেল। ধীরে ধীরে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে মাতৃভাষায় রচিত ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে অভিনীত নাটক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষের দিকে অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে চার্চের আর কোন সম্পর্কই রইল না। নাটক ব্যবসায়ীদের হাতে এসে পড়ার পরে মঞ্চের উপযুক্ত ধারার সন্ধানে ব্রিটেনে বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলল—এবং সর্বশেষে "প্যারাম্বুলেটারের" মত একপ্রকার ঠেলাগাড়ির ব্যবহারই মঞ্চ হিসেবে সর্বত্র কার্যকরী হল। এই পদ্ধতিতে ঠেলাগাড়ি বা "ওয়াগনের" (Wagon) উপর সজ্জিত মঞ্চেই অভিনয় হত। এতে মস্তবড় একটা লম্বা মঞ্চে পরপর কতকগুলি সেট তৈরী করার খাপছাড়া প্রথাটা আর রইল না। এক একটা ওয়াগনের উপর এক একটা আলাদা সেট হওয়ায় তার চিত্র মূল্য অনেক বেড়ে যেত। এতে বহুসংখ্যক দর্শক একই সময়ে নাট্যাভিনয় দেখতে পেত, কারণ এক এক সময়ে এক একটি সুসজ্জিত দৃশ্য নিয়ে এক একটি ওয়াগন্ পরপর নগরের এক এক জায়গায় আসত এবং সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকদলের কাছে অভিনয় দেখাত। কার্যতঃ দেখা যেত যে, যে সমস্ত নগরপ্রধানরা এই সঞ্চরণশীল দৃশ্য তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করতেন তাঁদেরি গবাক্ষ সম্মুখে ওয়াগন্-মঞ্চ বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখাত।

"আর্চবিশপ রজার্সের" (Archbishop Rogers) বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি সুসজ্জিত দৃশ্যাবলীসহ ওয়াগন্ থাকত। এই দৃশ্যাবলী-সজ্জিত সঞ্চরণশীল ওয়াগন্গুলির দু'টি অংশ থাকত। প্রথম অংশ বা উপরি অংশে থাকত অভিনয়যোগ্য সজ্জিত প্লাটফর্ম আর তার নিম্নে দ্বিতীয় অংশে থাকত চারদিক আবৃত একটি কক্ষ। এই দোতলা ওয়াগন্টি চারটি চাকার উপর স্থাপিত হত। নীচের কক্ষটি ছিল অভিনেতাদের সাজঘর, সেখানে ঢুকে তারা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ পাল্টাত এবং উপরতলায় উঠে এসে অভিনয় দেখাত। উপরতলায় চারদিক ঘিরে দৃশ্যসজ্জার সামান্য উপকরণ ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য আচ্ছাদন থাকত না। তা ছাড়া ওয়াগন্টি দোতলা হওয়ায় অভিনয় প্লাটফর্মটির যথেষ্ট উচ্চতাও ছিল—সুতরাং চারপাশে ঘিরে দাঁড়ান দর্শকরা ভালভাবে দেখতে ও শুনতে পেত। অভিনয়ের জন্য বিচিত্র পোষাক পরিহিত, সজ্জিত শোভাযাত্রা আরম্ভ হত "অ্যাবির" (Abbey) প্রবেশ পথ থেকে। সেখানে ওয়াগন্-মঞ্চে প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হত। এই

অভিনয় শেষ হলে শোভাযাত্রাসহ প্রথম ওয়াগন্ মেয়রের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলত—এবং তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় অভিনয় হত, এরপরে প্রথম ওয়াগন্‌টি প্রধান প্রধান সড়ক ধরে বিভিন্ন নগরপ্রধানদের গৃহ সম্মুখে থেমে অভিনয় করত, এইভাবেই তাদের নগর পরিক্রমা শেষ হত। প্রথম ওয়াগন্‌টি মেয়রের বাড়ি ত্যাগ করে এগিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে সেখানে এসে দাঁড়াত দ্বিতীয় ওয়াগন্‌টি এবং তারপরে দ্বিতীয় ওয়াগনের স্থান গ্রহণ করত তৃতীয় ওয়াগন্। এইভাবে সব ওয়াগন্‌গুলিই প্রধান সড়কগুলি ধরে পুরো নগরটি পরিক্রমা করত এবং নগরের কতকগুলি বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে পর পর অভিনয় দেখাত। ফলে নগরের প্রত্যেকেই অভিনয় দেখতে পেত এবং একই সময়ে প্রত্যেক রাস্তার লোকই শোভাযাত্রার দৃশ্যাবলী সম্বলিত এক একটি মঞ্চ দেখে আনন্দ পেত। এইভাবে একই সময়ে শহরসুদ্ধ লোক নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখত এবং একই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা পুরো নাটকটাই উপভোগ করত। এক একদিনের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চাবলীতে সেদিনের নাটক অভিনীত হত, এইভাবে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠান সূচী চলত। সর্বকালেই আমরা লক্ষ্য করে এসেছি যে ধর্মকে কেন্দ্র করে সুসজ্জিত শোভাযাত্রার অন্তর্ভুক্ত নৃত্য, গীত ও অভিনয়কে অবলম্বন করেই ক্রমান্বয়ে রঙ্গালয় ও স্থায়ী মঞ্চের আবির্ভাব ঘটেছে, মধ্য-যুগের ইউরোপেও আমরা তার কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাইনি।

কোন কোন দলে, নাটকের অঙ্কটি যদি বড় হত তা হলে একই দৃশ্যের সজ্জিত দু'টি ওয়াগন্ হয়তো একই সঙ্গে শোভাযাত্রায় আসতে দেখা যেত। অভিনেতারা বিশেষ উৎসাহিত বা উত্তেজিত হয়ে উঠলে তাঁরা ওই ওয়াগন্ মঞ্চ থেকে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেই তা প্রকাশ করতেন। আর অভিনয়ে যাঁরা ঘোড়সওয়ার হতেন তাঁরা ওয়াগনে উঠতেন না শোভাযাত্রার পাশে পাশেই ঘোড়ায় চেপে অভিনয় করে চলতেন।

এই শোভাযাত্রার এক একটি ঘটনা সম্বলিত দৃশ্যাবলী বা অঙ্ক পরিচালনার ভার থাকত এক একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (Guilds) উপর। শোভাযাত্রায় বেরোবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব গাড়ি থাকত আর থাকত পোষাক পরিচ্ছদ এবং উপযুক্ত মঞ্চোপকরণ। এই সমস্ত নাটকের অভিনেতারাও হতেন শিক্ষিত এবং পেশাদারী। ব্যবসায়ীরা তাঁদের অর্থ ব্যয় করে আনাতেন—ফলে অভিনয়ের উৎকর্ষও বেড়ে গিয়েছিল। স্বভাবতঃই

এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত, যে কাদের সংঘ অভিনয়ে এবং দৃশ্যাবলীতে সর্বোৎকৃষ্ট হতে পারে। পোষাক পরিচ্ছদও অনেক সময় মূল্যবান ও রাজকীয় হত—এই সমস্ত দলের নানারকম পশুর মুখোশ, পরীদের পাখা এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামও থাকত। এই ওয়াগন্ ও পোষাকগুলি বছরের পর বছর এক "কর্পাস্ ক্রিষ্টির" (Corpus Christi) উৎসব থেকে অন্য উৎসব পর্যন্ত যত্ন সহকারে রাখা হত। এর খরচ চালান হত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের উপর শোভাযাত্রার অর্থ হিসাবে চাঁদা ধার্য করে, এছাড়া সাধারণ নাগরিকদের সাহায্যও থাকত। এই নাট্যাভিনয় ও শোভাযাত্রা প্রায়ই সুরু হত ভোর পাঁচটার সময় যাতে নগরের সকল রাস্তাগুলিই ঘুরে আসবার সময় পাওয়া যায়।

এই সব নাটকের ঘটনাবলী কিছু না কিছু প্রতিবছরই পরিবর্তিত হত। হয়তো দু'টো ঘটনা যোগ করে একই ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করা হত। আবার হয়তো অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের যোগদানকল্পে একই ঘটনাকে ভেঙ্গে অন্য ঘটনার ও দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি করা হত। ফরাসীদের চাইতে ইংরাজদের নাটকে ঘটনার বিস্তৃতি অনেক বেশি। তারা প্রথম সৃষ্টি থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সমস্তগুলি ঘটনাই রূপায়িত করত। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা তাদের যোগ্য ঘটনাবলীই বেছে দিত। যেমন যারা জাহাজ তৈরীর প্রতিষ্ঠান তাদের দেওয়া হত "নোয়ার জাহাজ" তৈরী করতে, নাপিতদের দেওয়া হত যীশুকে "ব্যাপটাইজ্" করতে, মদ্য ব্যবসায়ীদের দেওয়া হত জলকে মদ্যে পরিবর্তিত করার দৃশ্য অভিনয় করতে আর রুটি তৈরীর ব্যবসায়ীদের দেওয়া হত "শেষভোজের" দৃশ্য পরিচালনার ভার। এর ফলে দৃশ্যগুলি সবই প্রায় সুরচিত হত। তবে একথা সত্যি যে উৎসবকালে সবমিলিয়ে হয়তো ৪০।৪৮ বা ততোধিক দৃশ্যাবলী রচিত হত, তাতে সকল সংঘই তাদের পেশা অনুযায়ী উপযুক্ত দৃশ্য রচনার সুযোগ পেত না। যেমন যারা চামড়ার ব্যবসায়ী তাদের হয়তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভূলোক, দ্যুলোক, শয়তান, দেবদূত এবং সর্বজীব সৃষ্টির দৃশ্য পরিচালনার ভার নিতে হত, আর যারা ব্যাপারী তারা হয়তো রাজা ফারাওর সভায় মোজেসের লাঠিকে সাপ করার দৃশ্যভার গ্রহণ করত। এই ভাবেই বাইবেল অবলম্বনে নাটক এবং তার দৃশ্যাবলী রচিত হত।

এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত নিষ্ঠা ও

একান্ত আন্তরিকতার পরিচয় পাই। যদিও শেক্‌সপীয়র মহাশয় তাঁর "এ মিড্‌সামার্‌ নাইটস্‌ ড্রিম" (A Midsummer Night's Dream) নাটকে এই সব কারিগরদের অভিনয় প্রচেষ্টাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংও এদের কাছে তাঁর ঋণ একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন না।

এই সব মিস্ট্রি মিরাক্‌লে শুধু ভক্তি ও নিষ্ঠার গভীরতাই যে ছিল তা নয় তার সঙ্গে ছিল হাসি, তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ইত্যাদি লঘুরসের মিশ্রণ। এখানে এসেই সাধারণ দর্শক অবকাশের নিঃশ্বাস ফেলতে পারত। যেমন ছিল "মহাপ্লাবনে নোয়ার জাহাজের" একটা দৃশ্যে একেবারে গ্রাম্য চাষাভুষার মুখের মস্করা—নোয়ার জাহাজ তৈরী করা হয়ে গেছে, সে তার স্ত্রীকে ডেকে বলল—ছেলেমেয়েকে নিয়ে জিনিস পত্র বেঁধে জাহাজে উঠে পড়তে। নোয়ার স্ত্রী তখন উত্তর করল—"দূর মিন্‌সে ; তুই গিয়ে এখন ঘুমিয়ে থাক, আমি যাচ্ছি না।" নোয়া যতই সাধাসাধি এবং আক্ষেপোক্তি করতে লাগল —নোয়ার পত্নী নাক ঝাম্‌টা দিয়ে ততই বলতে লাগল—"তোমার সাহসটা কি—আমায় নেও তো দেখি, আমি আমার গপ্‌পিনীদের ফেলে গেলুম আর কি? সারা পথ কি আমি মুখ বুজে বসে থাকব? আহা আমার গপ্‌পিনীরা, তারা আমায় কত ভালবাসে গো। তাদের নিয়ে যাও তো দু'টো সুখ-দুঃখের কথা কই। নয়তো বাপু একাই যাও, যেখানে হয় মনের মত আর একটা নোতুন বউ জোগাড় করে নেও গে—আমি নড়ছি নে" —ইত্যাদি।

এখানে এক বয়স্কা, বুদ্ধিহীনা গ্রাম্য নারীর চরিত্র কিংবদন্তীর গাম্ভীর্যপূর্ণ রসের সঙ্গে অদ্ভুত রকম মিশে গেছে।

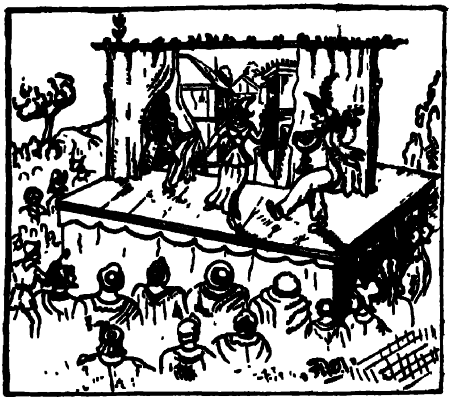
মিস্ট্রি ও মিরাক্‌ল্‌ নাটকের পূর্বোক্ত প্রকার মঞ্চ ছাড়াও এ যুগের শেষের দিকে আর এক শ্রেণীর মঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতি ইউরোপে দেখা দিয়েছিল।

এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান জনসাধারণের ব্যবস্থাপনায়ই অনুষ্ঠিত হত। এর অভিনয় ক্ষেত্র রচিত হত নগরের কোন সাধারণ ক্ষেত্রের সমগ্র অংশটি জুড়েই। এই প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী চত্বরটি বাদ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে অনেকগুলি কক্ষ রচিত হত এবং তাতে আলাদা আলাদা স্থান নির্দেশক সেট তৈরী হত। এখানে দর্শক ও অভিনেতারা এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে (Stations) ঘুরে ঘুরে অভিনয় করত এবং দেখত।

অনেক সময় ইস্টার নাটক রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণেও হতে দেখা যেত। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে হত স্বর্গের দ্বার অন্য প্রান্তে হত নরকের মুখ আর

চত্বরের দু'দিকে থাকত সারিবদ্ধভাবে অন্যান্য স্টেশনগুলি। দর্শকরা এ সব ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরেই অভিনয় দেখত, আবার কোন উঁচু বসবার গ্যালারী থাকলে সেখানেই বসত একক্ষেত্রে মাঝের চত্বরেই নাটকের বেশির ভাগ অংশ অভিনীত হত।

কোন কোন জায়গায় আর এক ধরনের মিস্ট্রি নাটকের মঞ্চ তৈরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে মঞ্চগুলি তৈরী হত তিনতলা আকারে। তিনটি কাহিনী এর তিনটি বস্ত্রাবৃত তলায় পর পর অভিনীত হত। এর মধ্যে যেটা নীচের তলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হত নরক বা সংশোধনা-গার। মাঝের তলাটা হত পৃথিবী—সেখানে থাকত পৃথিবীর ঘটনাবলীর সেটগুলি। সবচেয়ে উপরের তলাটা হত স্বর্গ ও স্বর্গোদ্যান। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি আবার নয়তলা পর্যন্তও উচ্চ হত। সম্ভবতঃ মঞ্চের এই পরিকল্পনা এসেছিল স্বর্গ সর্ব উপরে এবং নরক সর্ব নিম্নে এই ধারণা থেকেই।



অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ।

॥ প্রহসন ও বিষ্কম্ভক ॥

মিরাকল্ নাটকের সঙ্গে মানবিক ধারার সংমিশ্রণে অদূরবর্তী এলিজাবেথীয় যুগের পদধ্বনি বেজে উঠেছিল। মর্যালিটির পরে এবং খাঁটি ইংরেজী কমেডির মাঝে এসেছিল লোয়ার কাহিনীরই সদৃশ ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে রচিত ফার্স এবং ইন্টারলুড, আমরা হ্যামলেটের মধ্যে একটি

ইন্‌টারলুড এবং একদল কমেডিয়ানের সাক্ষাৎ পাই। ইন্‌টারলুডের সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই কঠিন। অনেক সময় যা খাঁটি মর‍্যালিটি তাকেও ইন্‌টারলুড বলা হয়। আবার বৈচিত্র্যের দিক বিচার করলে যে কোন ধরনের ছোট নাটিকাকেই ইন্‌টারলুড গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা যায়। একদিকে যেমন এর বৈশিষ্ট্যের বিস্তার রয়েছে তেমনি আবার এর সংক্ষিপ্ত এলাকার নিজস্ব বিশেষত্বও রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত পার্থিব বিষয় নিয়েই এই নাটকগুলি রচিত হত।

জনসাধারণের কর্তৃত্বাধীনে যখন মিস্ট্রি, মিরাক্‌ল্‌ বা মর‍্যালিটি নাটকের অভিনয় হত তারি অবকাশে আসত ফার্স ও ইন্‌টারলুড, ক্রমশঃ এই ইন্‌টারলুড মধ্যযুগের শেষ ও রেনেসাঁস্‌ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে রঙ্গমঞ্চে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। জার্মানীতে এই শ্রেণীর নাটককে বলা হত "ন্যুরেম্‌বার্গ শ্রোভটাইড্‌ প্লেজ্‌" (Nuremberg Shrovetide Plays) এ থেকেই পরবর্তীকালে "হান্‌স্‌-সাখ্‌স্‌" (Hans Sachs)-এর প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণীর রচনা "দ্যা ওয়ান্‌ডারিং স্কলার্‌ ফ্রম প্যারাডাইস্‌" (The Wandering Scholar from Paradise—১৫৫০ খ্রীঃ) উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায়, এর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় বৈপরীত্য এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রয়েছে। কাহিনীতে আছে এক বয়স্কা মহিলার প্রথম স্বামী মারা গেছে— আর তার দ্বিতীয় স্বামী তার মনোবেদনা বুঝছে না বলে তার মনে খুব দুঃখ। এমন সময় সেই গ্রামে এক ভ্রাম্যমাণ ছাত্র এল, সে বলল—সে প্যারিস্‌ থেকে এসেছে। বৃদ্ধা ভাবল বুঝি "প্যারাডাইস্‌" থেকে এসেছে। তখন তার প্রথম স্বামীর জন্য খুব দুঃখ হতে লাগল। সে মরবার সময় কেবল তার নীল রং-এর টুপি এবং ঢাকা দেওয়া চাদরটাই নিয়ে গেছে, না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। ছাত্রটি এই দুর্বলতার সুযোগ চট্‌ করে ধরে নিল, বলল— তাই তো স্বর্গে এখন তার জুতো, জামা, মোজা, সার্ট কিছুই তো নেই। অন্যরা যখন ভোজ খায় সে তখন ভিক্ষা করে। বৃদ্ধা এই গল্পে খুব বিচলিত হয়ে পড়ল এবং তার দ্বিতীয় স্বামীর কিছু জামা ও কাপড়, পয়সা-কড়ি, বোঁচকা বেঁধে দিয়ে দিল—প্রথম স্বামীকে তা স্বর্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এরপরে যখন তার দ্বিতীয় স্বামী ফিরে এল এবং সে গদ্‌গদ ভাবে আনন্দ উদ্ভাসিত চোখে এই কাহিনী ব্যক্ত করল—মঞ্চে তা সত্যই মনোহর। দ্বিতীয় স্বামী ছাত্রটির শঠতা বুঝতে পেরে খুব উত্তেজিত ভাবে বলল,—

শীগ্‌গির বল কোন্ পথে সেই স্বর্গযাত্রী ছাত্রটি গেল। সে ঘোড়ায় চড়ে ছুটল, কিন্তু পথের মধ্যে সেই ছাত্রটি কৃষক সেজে ভুল পথের সন্ধান দিয়ে তাকে পায়ে হেঁটে পাঠিয়ে ঘোড়াটিও চুরি করল। হতাশ, পরিশ্রান্ত দ্বিতীয় স্বামী ঘরে ফিরে এসে বলল,—ঘোড়াটি সে দান করে এসেছে। কিন্তু স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সত্য ব্যক্ত করতে বাধ্য হল তবে তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, এসব কথা গ্রামের লোকেরা যেন শোনে না, তা হলে তারা এদের নিতান্তই বোকা ভাববে। স্ত্রী তখন আহ্লাদে মাথা নেড়ে বলল,—স্বর্গে তার জিনিসপত্র পাঠানোর খবর অনেক আগেই সে গ্রাম সুদ্ধ মানুষের কাছে বলে এসেছে এবং স্ত্রী—"তারা সকলেই এত ভাল যে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল এবং আমাকে কৌতুক করতে লাগল।"

দ্বিতীয় আর একটি গল্প হল "দ্যা হর্স থিফ্" (The Horse Thief—১৫৫৩ খ্রী:)। এটি একটি ঘোড়া চোরের গল্প। একজন ঘোড়া চোরকে তিনজন কৃষক ফাঁসি দেবে ঠিক করেছে; তারপর হঠাৎ তাদের খেয়াল হল যে—ফাঁসি হলে লোকের ভিড়ে তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট হবে। তখন তারা ফসল না ওঠা পর্যন্ত—অর্থাৎ চার সপ্তাহের জন্য চোরকে মুক্ত করে দেবে ঠিক করল। চোর তাদের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বলল—'হায় রে এ গ্রাম কি এতই দরিদ্র যে একটা চোরেরও খাওয়া-পরা জোটাতে পারে না।' নির্বোধ কৃষকরা তখন চাঁদা তুলে তাকে টাকা দিল—চোরও তার সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর চুরি করে পালাল।

এই ধরনের কমিক্ উপাদান মধ্যযুগের শেষে সমগ্র ইউরোপেই ছড়িয়ে পড়ে। "চসার" (Chaucer) ও এই কমিক্ জগতেরই একজন শক্তিমান স্রষ্টা ছিলেন। অস্থায়ী প্লাটফর্ম মঞ্চে, দুর্গের বা সরাইখানার অভ্যন্তরে এই সব ইন্‌টারলুডের অভিনয় করত মধ্যযুগের ভ্রাম্যমাণ 'মাইমের' দল।

"বিষ্কম্ভক" বা ইন্‌টারলুডকে জন্ গ্যাশ্‌নার তাঁর গ্রন্থে "নাটকীয় বিতর্ক" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর "মাস্টারস্ অব্ দ্যা ড্রামা" গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"যদিও বিষ্কম্ভকে ছিল গতিহীন কথোপকথন, তবুও তা রসিকতা ও পরিহাসে ঝল্‌মল্ করে উঠত, এমন কি এগুলিতে নূতন যুগের সমালোচনার ঝোঁকও প্রতিফলিত হত। রূপক ও নীতি উপদেশের সকল ছল বিগত হল—কারণ বিষ্কম্ভকের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মনোরঞ্জন। যে কক্ষের

মঞ্চবেদীতে তাদের অভিনয় হত, সেই কক্ষ কখনো স্নিগ্ধ হাসিতে, কখনো বিদ্রূপাত্মক হাসিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত।"

মধ্য যুগের মঞ্চের এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তা থেকে কয়েকটি মূল ধারা পাচ্ছি। প্রথমতঃ—চার্চের অভ্যন্তরে দেববেদীর উপরে লিটার্জিকাল্ নাটকের অভিনয়। দ্বিতীয়তঃ—হল মিস্ট্রি ও মিরাক্ল্ নাটকের জন্য "সিমাল্‌টেনিয়াস্ সেটিং" (Simultaneous Setting) বা ধারাবাহিক মঞ্চপরিকল্পনা এতে একই মঞ্চের উপরে আলাদা আলাদা "স্টেশনে" আলাদা আলাদা স্থান বাচক দৃশ্য রচিত হত। তৃতীয় শ্রেণীর মঞ্চ ছিল জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের জন্য অস্থায়ী প্লাটফর্ম মঞ্চ—এ ধরনের মঞ্চেই ফার্স বা ইন্‌টারলুডের অভিনয় সর্বাধিক হত। চতুর্থ শ্রেণীর মঞ্চ ছিল, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মিস্ট্রি নাটকের জন্য ভ্রাম্যমাণ ওয়াগন্ মঞ্চ। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিই এই মঞ্চাভিনয় পরিচালনা করত।

॥ রেনেসাঁস্ ॥

ইতালি

মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে এল নবজাগরণের যুগ। প্লাবনের এক একটানা স্রোতধারার মত সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এই নবধারা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে চিন্তার জগতে এসেছে বিপ্লব এবং শিল্প সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটেছে। এর তীব্রতা সর্বাধিক ধরা পড়ে ১৫শ থেকে ১৬শ শতকের মধ্যেই। কোন একটি যুগের সমাপ্তি ও নূতন যুগের আরম্ভ কোথাও সীমারেখা দ্বারা অঙ্কিত করে দেখানো যায় না। সকলের অলক্ষ্যে পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে, ব্যবধান যখন দুস্তর হয় তখন আমরা চমকে উঠি—এ যে নূতন জগৎ। আবার ওরি মধ্যে থাকে নূতন পুরাতনের কতই মিশ্রণ—আকাশে মিগ্‌, জাম্বো—রাজপথে ভোইল্যাণ্ডার, শেভ্রলে তারি পাশে অতি প্রাচীন গরুর গাড়ি, ঠেলা, রিক্‌শ—ডিঙ্গি নৌকোয় খেয়া পারাপার।

ইউরোপে এই নবজাগরণের ইতালিই ছিল প্রথম পাদপীঠ—সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ব্রিটেনে। রেনেসাঁস্ যুগের ইতালিতে অন্যান্য শিল্পের যেমন নবতর সৃজন ও রূপায়ণ হয়েছিল, নাটকের ক্ষেত্রে ততখানি নবায়ন হয়নি—এখানে প্রধানতঃ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন নাটকের পুনরুজ্জীবন, অনুসরণ ও অনুকরণই হয়েছিল।

এ যুগের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল 'মানবতার' প্রতিষ্ঠা। মধ্যযুগে চার্চের অধীনে মানুষ তার বিচার বিশ্লেষণ, তার ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে ফেলেছিল, হঠাৎ নবজাগরণের আগমনে প্রাচীন নীতি নিয়মের নিগড় ভেঙে তার সম্মুখে এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে মুক্তির আলোয় সবকিছু দেখতে পেল নিজেকে মানুষ বলে সম্মান করতে শিখল—নিজেই হয়ে দাঁড়াল নিত্য নব সৃষ্টির স্রষ্টা। চার্চের নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে শেষ বিচারের দিনের জন্য আর সে অপেক্ষা করল না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, আবির্ভাব ঘটল যুক্তিবাদের। মানুষ উপলব্ধি করল—নিজের চেষ্টায় এই পৃথিবীতেই সুখে বাস করা যায়, সুন্দরের আরাধনা করা যায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাগ্যকে জয় করে নেওয়া যায়। জগৎ জুড়ে বিজয় রথ চালিয়ে যেতে হলে চাই শুধু উৎসাহ, চাই সাহস, চাই উজ্জীবিত আশা।

তারা পুরাতন গ্রীস ও রোমের শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শনের মধ্যে পেল বুদ্ধিদীপ্ত সৃজন আনন্দের শোভা—এই প্রাচীন ঐতিহ্যের কানন মাঝে দাঁড়িয়ে নবসৃষ্টির প্রেরণায় তারা উদ্দীপিত হয়ে উঠল। এই একই কালে ছাপাখানার আবিষ্কার ঘটল, কলকারখানা বসল, নিত্য নোতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হতে লাগল।

রেনেসাঁসের যুগ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যায় যে এই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপ মধ্যযুগীয় ভাবধারার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলল। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য ধ্বংস প্রায় হয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। অর্থনৈতিক বিনিয়োগে নূতন উদ্দীপনা এল, এবং নূতন পৃথিবী আবিষ্কার ও বিজয়ের জন্য সমুদ্রাভিযান খুলে দিল নবদিগন্ত। স্পেন ও ইংল্যাণ্ডে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা জাতির শক্তির পথ মুক্ত করে দিল, তা ব্যক্তি বিশেষকে সমৃদ্ধিশালী এবং উৎসাহী করে তুলল। সুখের অনুধাবন করা এবং আরাম ও আনন্দের উপকরণ পাওয়া কেবল অভিজাতদেরই করায়ত্ত রইল না। ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিষ্ঠাই চারু শিল্পে বিকশিত হয়ে উঠল। আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা ইউরোপীয়দের অনুপ্রাণিত করল এবং তারা আত্মোন্নতির অধিকারকে সমর্থন করল ক্লাসিক্ জগতের সংস্কৃতির উদাহরণ দেখিয়ে।

ইউরোপ জুড়ে এই রেনেসাঁস্ সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগকে বিদায় জানিয়ে আধুনিক যুগের আগমনী গেয়েছে। ইউরোপের দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল তখন নব নব সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছে, উপনিবেশ স্থাপন করেছে—বাউণ্ডুলে, বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী লক্ষ্মীর বরলাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার এবং আবির্ভাব ঘটেছে যুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এমনি পরিবেশেই ১৪৫২ খ্রীঃ তুর্কিরা যখন কন্‌স্টান্টিনোপল সম্পূর্ণ জয় করল তখন সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা ছড়িয়ে পড়লেন পূর্ব ইউরোপে। তাঁরা বিশেষভাবেই ইতালীয় রাজন্যবর্গের অর্থসাহায্য পেয়ে তাঁদেরি আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ১৫০২ খ্রীঃ সর্বপ্রথম সোফোক্লেসের সাতখানি নাটক ছাপানো হয়—একে একে এলেন এউরিপিদেস্ ও আইস্খ্যলস্। ইউরোপে এই "রিভাইভাল্ অব্ লারনিং" (Revival of learning)-এর পুরোধায় কিন্তু গ্রীক নাটক ছিল না, ছিল রোমান নাটক।

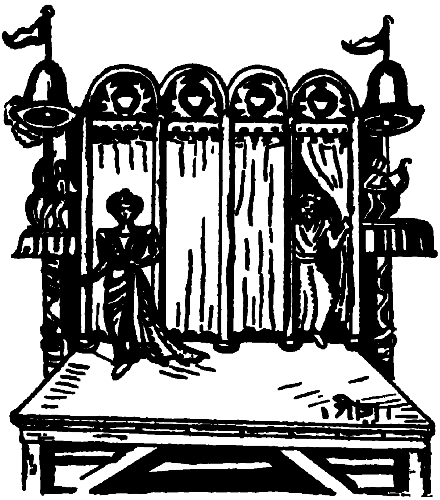
১৪৫০ খ্রীঃ পর থেকেই আমরা দেখতে পাই যে ধর্মীয় নাটক দৈনন্দিন জীবনধর্মী নাটককে পথ ছেড়ে দিচ্ছে এবং মধ্যযুগের "ম্যান্‌সনস্" (Mansions) মঞ্চও নূতন ধারায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ইতালির ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক ভাবেই 'ক্লাসিক্' (Classic) ও "সিউডো-ক্লাসিক্-পেজ্যান্ট্রি" (Pseudo-Classic Pageantry) নাটকের অভিনয় তাঁদের রাজসভাস্থলের চত্বরে বা বড় বড় হলঘরে করাতেন। এই সময়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক নিয়ে পঠন পাঠন সুরু করলেন এবং তাঁরা কোথাও মূল ভাষায় কোথাও বা অনুবাদের সাহায্যে এই সব নাটক যতখানি আনতে পেরেছেন তা অভিনয়ে ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এ যুগে ইতালির শিল্প-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছিল অভিজাতদের মধ্যে—সেখান থেকে শিল্পী ও জ্ঞানীদের মধ্যে এবং পরিশেষে যারা দুঃসাহসী অভিযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং অলস ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিল তাদের মধ্যে।

অভিজাতদের নাটকের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল তাঁদের বলরুম মঞ্চে (Ballroom Stage)। প্রথম অবস্থায় তেরেন্স, প্লাউতুস্ ও সেনেকার নাটক বা নাট্যাংশ অভিনীত হত। এই পুরানো নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে তাঁরা পুরাতন রীতির নাটক ও প্রয়োগপদ্ধতিরও অনুশীলন ও প্রবর্তন করতে লাগলেন। এই সমস্ত অভিজাতদের বলরুম মঞ্চ রাজকীয় অতিপ্রাচুর্যে ভূষিত থাকত।

তখনকার লিখিত বিবরণীতে পাওয়া যায়—যে বড় বড় অভিজাতদের নৈশভোজের পরে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ প্রাসাদের বিরাট বল-ডান্স ঘরে একত্রিত হতেন; সেই হলের এক প্রান্তে বিচার সভার মত এক বেদী ঘরের আড়াআড়ি দুই দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত থাকত, আর হলের মাঝখানে একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ নৃত্য ও অভিনয়ের জন্য তৈরী করা হত। এই বিচার মঞ্চের উপরে বিশিষ্ট মহিলা ও মহোদয়গণ বহুমূল্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে গল্পগুজব করতেন এবং অভিনয় দেখতেন। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে শত শত আলোকমালা সিলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। লক্ষণীয় যে ইউরোপে নাটক এখান থেকেই সর্বপ্রথম গৃহবাসী হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোক সম্পাতের সমস্যাও নিত্য নবরূপে দেখা দিতে লাগল। হল-

ঘরের মধ্যবর্তী মঞ্চে নানা রকম পশুর মুখোশ পরে এবং নানান রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অভিনেতারা কৌতুক অভিনয় করতেন। সুতরাং সেখানে যখন নাটক প্রবেশ লাভ করল তখন তাও প্রথমাবস্থায় বলরুম ব্যালের আকার ধারণ করল। এরপরে প্লাউতুস্, তেরেন্স ও সেনেকার নাটক অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপটে অভিনীত হতে লাগল।



রেনেসাঁসের আরম্ভ যুগ : তেরেন্সের নাটকের জন্য মঞ্চ।

রেনেসাঁস্ যুগে ক্লাসিকাল নাট্যপদ্ধতির পুনরাবির্ভাব ঘটলেও এ তার পূর্ববর্তী ঐতিহ্যধারাকে একেবারে অস্বীকার পেতে পারেনি। তাই এ যুগে ক্লাসিকালের সঙ্গে অন্যান্য ধারারও সংমিশ্রণ ঘটেছিল আর সর্বোপরি ছিল এযুগের মৌলিক উপলব্ধি। রেনেসাঁস্ যুগে ক্লাসিকালের সঙ্গে পূর্ববর্তী থিয়েটারের তিন ধারার মিশ্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটক ইতালিতে এযুগেও টিকে ছিল। ১৪৫৪ খ্রীঃ ফ্লোরেন্সের সুসজ্জিত ২০টি "ম্যানসনে" বা বৃহৎ কুঠিতে বাইবেলের কাহিনী নিয়ে অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া চিত্র শিল্পীদের মুরাল চিত্রেও মিশ্রির "যুগপদ্দৃষ্ট সেটিং" (Multiple setting)-এর অস্তিত্ব প্রমাণাবলী ছিল। মধ্যযুগের এই মিশ্রি ধারার সঙ্গে রেনেসাঁস্ যুগের

ইতালি তার দু'টি নিজস্ব ধারা এনে যুক্ত করেছিল। তার একটি হল "প্যাস্টোরাল প্লে" (Pastoral Play) বা গ্রাম্য গাথা-নাট্য যা ক্রমবিবর্তিত হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে "কোর্ট মাস্কের" (Court Masque) রূপ পেয়েছিল। এর দ্বিতীয় ধারাটি হল "অপেরা" (Opera) যা আজো সমগ্র ইউরোপের মনোরঞ্জন করে চলেছে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল নগরে রাজ-সংবর্ধনার জন্য বিরাট জাঁকজমকভরা দৃশ্য-বহুল শোভাযাত্রা এবং মঞ্চানুষ্ঠান। এগুলি প্রাচীন রোমের বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষদের বিরাট শোভাযাত্রা করে নগর প্রবেশ থেকেই প্রচলিত ছিল। রেনেসাঁস্ যুগেও এই সুসজ্জিত বাহিনীর নগর প্রবেশের বহুতর উদাহরণ রয়েছে। আবার কোন কোন জনপ্রিয় সম্রাট নিজেই দর্শক হতেন এবং কখন এক মাইল বা তারো চেয়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা তাঁর সম্মুখ থেকে অতিক্রম করে চলে যেত—"মার্চ পাস্ট"-এর মত। এই সমস্ত শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত নৌকো, কৃত্রিম আর্চ, টাওয়ার, এমন কি মূকাভিনয়ের জন্য মঞ্চও থাকত। এই শোভাযাত্রা সহস্রাধিক কারু ও চারুশিল্পীরা অঙ্কিত ও সুসজ্জিত করত এবং রাজার দৃষ্টি সুখের জন্য একাধিক সজ্জিত মঞ্চও থাকত। এই সমস্ত মঞ্চগুলির উপরে প্রথম যুগে হত মূকাভিনয় বা "তাব্‌লো ভিভাঁ" (Tableaux Vivants); এই অভিনয়ের মূল আদর্শ ছিল রোমান ভাস্কর্য শিল্প। এগুলি কখন মডেল তৈরী করে হত, কখন বা অভিনেতারা স্থির মূর্তির মত দণ্ডায়মান থাকত।

এই সমস্ত শোভাযাত্রার প্রবেশপথ বা "এন্‌ট্রিজের" (Entries) মধ্যেই আমরা রেনেসাঁস্ যুগের কোর্ট থিয়েটারের ছায়াসম্পাত দেখতে পাই। সুদীর্ঘ শোভাযাত্রাগুলি অনেক সময়ই রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে থামবার পর বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যবহুল অনুষ্ঠান করা হত, তাতে নৃত্য, গীত ও ব্যাঙ্কোয়েট থাকত। ইতালিতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিথায়েলেঞ্জেলোর মত শিল্পীরা এই সব অনুষ্ঠানের চিত্রাঙ্কণ ও পরিকল্পন করতেন।

এই যুগ-পরিবেশে জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের ফলে রোমান ক্লাসিকাল নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল, ক্রমে বহু অভিজাতরাই তাঁদের বড় বড় হলঘর-গুলিতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করতে লাগলেন। এগুলিকে বলা হত "থিয়েত্রাম্" (Theatrum) তাই থেকেই ইংরেজীতে "থিয়েটার" কথাটির

উদ্ভব হয়েছে। এই অস্থায়ী মঞ্চগুলি কোথাও হত বেদীর মত "স্ক্যাফোল্ডেড স্টেজ" (Scaffolded Stage) কোথাও বা হত প্রোসীনিয়াম্ ফ্রেমে বাঁধা মঞ্চ। ১৪৮০ খ্রীঃ ইতালির মঞ্চে দৃষ্টি বিভ্রমকারী অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রাধান্য সুরু হল, এই দৃশ্যপট (Scenery) বস্তুতঃ রেনেসাঁস্ যুগেরই এক নূতন অবদান। আমরা জানি যে গ্রীকদের দৃশ্যসজ্জা অত্যন্ত সহজ সরল এবং বস্তুনির্ভর ছিল, তা ছাড়া তারা এই সমস্ত দৃশ্য রচনার কলাকৌশলও দর্শকদের দৃষ্টি বহির্ভূত রাখবার জন্য উৎসুক ছিল না, কার্যতঃ তার মধ্যে কোন কল্পনাবিলাস বা রহস্যময়তা থাকত না। রোমান যুগে মঞ্চের পশ্চাদ্-দেয়াল বহুপ্রকার স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে অলংকৃত হলেও সেটিং-এর জন্য কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার প্রায় অজানা ছিল। মিস্ট্রি ও মিরাকল্ নাটকে পরপর দৃশ্যাবলী দেখাতে কিছু কিছু পর্দা ও কাঠের ফ্রেম ব্যবহৃত হত—কিন্তু সেও ছিল নগণ্য। তাই রেনেসাঁস্ যুগের চিত্রিত দৃশ্যপটের বিপুল প্রয়াস ও উৎকর্ষ থেকে আমরা এই প্রথাকে এই যুগেরই বিশেষ অবদান বলতে পারি।

এই ধরনের বিভ্রান্তিকর চিত্রিত দৃশ্যসজ্জার পরিকল্পনা বোধ হয় হত দু'টি কারণে। প্রথমতঃ মধ্যযুগে চার্চের পুরোহিতরা মূর্খ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য মিস্ট্রির ঘটনা অঙ্কিত চিত্র ব্যবহার করতেন এবং সেই ধারাই ক্রমে মঞ্চের পশ্চাৎপটে ব্যবহৃত হতে থাকে। তা যখন রেনেসাঁস্ যুগের কমেডিতে ব্যবহৃত হল তখন তার উপর এযুগের ইতালীয় চিত্রশিল্পীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়তে লাগল। তারই ফলে মঞ্চে এল পরিপ্রেক্ষিতে (Perspective) অঙ্কিত দৃশ্যাবলী, পূর্বের একঘেয়ে ছন্দ ভেঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর বৈচিত্র্য ও দূরত্ব দেখা দিল। এই সময় থেকেই মঞ্চে চিত্রিত দৃশ্যের যে প্রাধান্য সুরু হয়েছিল তা বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ জুড়েই রয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ "রোমান প্রিজমের" (Roman Prism) গায়ে ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং সাত্যুরের যে তিনটি দৃশ্য অঙ্কিত থাকত তাই রেনেসাঁস্ যুগের পণ্ডিত এবং শিল্পীরা মিলে মঞ্চ জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যাবলীতে রূপান্তরিত করলেন।

রেনেসাঁস্ যুগের পণ্ডিতেরা রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক এবং তৎসহ আরিস্তোতল প্রভৃতির দর্শন নিয়ে চর্চা করতে লাগলেন। এঁদেরি প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল রোমান আকাদেমি। এখানে তাঁরা ল্যাটিন

কমেডি ও সেনেকার ট্র্যাজেডির অভিনয় সুরু করলেন। ক্রমে অন্যান্য নগরীগুলিতেও বহু "আকাদেমি" স্থাপিত হতে লাগল। তাঁরা নিজেরা রোমান নাটকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, অন্যদিকে রাজা ও রাজকুমারদের উৎসব মণ্ডপে নাটক মঞ্চস্থ করতেও সাহায্য করতে লাগলেন। এই সময় থেকেই তাঁরা ক্লাসিক্ নাটকগুলি ক্লাসিক্ যুগের অনুরূপ প্রেক্ষাগৃহে এবং মঞ্চে—পূর্বসুরীদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এ থেকেই গড়ে উঠল রেনেসাঁস্ যুগের থিয়েটারে ক্লাসিক্ ধারার মঞ্চ পদ্ধতি।

এক শতাব্দীর মধ্যে একদল পণ্ডিত ও অভিজাত মিলে "অলিম্পিক আকাদেমি" (Olympic Academy) স্থাপিত করলেন এঁরাই প্রথম ক্লাসিক্ গঠন ভঙ্গিমায় স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আকাদেমির ইতালীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের মাতৃভাষাকে নাটকের ক্ষেত্রে ভাবের বাহন হওয়ার যোগ্য মনে করলেন না। তাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করলেন সেই ভাষাকেই যে ভাষায় দান্তে ও পেত্রার্ক কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের অধিবেশনেও ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করতেন, এমন কি নিজেদের নামও ল্যাটিনে রাখতেন। অন্যদিকে গ্রীক নাট্যতত্ত্বের অনুসরণও তাঁরা করেছেন অস্বাভাবিক নিষ্ঠার সঙ্গে। এই দুই প্রবল বাধা ডিঙিয়ে তাই আমরা ইতালীয় রেনেসাঁস্ যুগে মৌলিক প্রতিভাধর নাট্যকারের আবির্ভাব দেখতে পাই না।

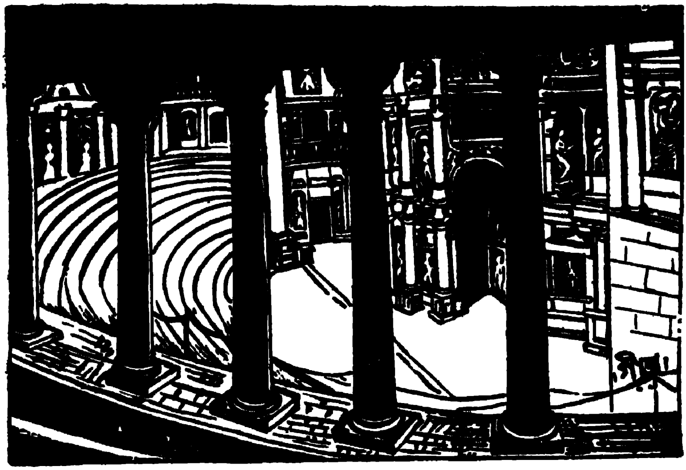
॥ নিও-ক্লাসিকাল রঙ্গালয় ॥

আকাদেমির পণ্ডিতেরা ক্লাসিক্ নাটক নিয়ে চর্চা করতে করতেই সেকালের মঞ্চ স্থাপত্য রীতিরও সন্ধান করতে লাগলেন—এবং ১৪১৪ খ্রীঃ তাঁরা সর্বপ্রথম ক্লাসিক্ স্থপতি ভিত্রুভিয়াসের গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় ছাপান হয় ১৪৮৬ খ্রীঃ। ভিত্রুভিয়াসের রচিত গ্রন্থের নাম ছিল "দ্য আর্কিতেক্চ্যুরা" (De Architectura), এই গ্রন্থ প্রায় তিন শতাব্দী ধরে রঙ্গমঞ্চের গঠনরীতিকে পরিচালনা করেছে। বিগত ঐশ্বর্যের মণিকোঠা খুলবার ক্লাসিক্ থিয়েটারের এই একটিমাত্র চাবিই রেনেসাঁস্ যুগের হাতে ছিল। তার মধ্যে স্থাপত্যকলায় বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এবং বিভিন্ন "মঞ্চ কক্ষের" (Houses) অঙ্কিত চিত্রেরও বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সেগুলি

যে মঞ্চে ঠিক কি ভাবে সজ্জিত হত তা কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রথম দিকের দৃশ্য পরিকল্পনাকারীরা যুগপদ্দৃষ্ট মঞ্চ তৈরী করতেন। তাতে ভিন্ন ভিন্ন আর্চের নীচে পর্দা টানা ৪ বা ৫টি দরজা থাকত এবং তা বিচ্ছিন্ন করা হত অলংকৃত স্তম্ভ দ্বারা। এইভাবে প্রতিটি চরিত্রেরই এক একটি 'গৃহ' থাকত এবং চরিত্রের নাম পরিষ্কারভাবে তার গৃহের উপরে লেখা থাকত। সামনের পর্দাটি সরিয়ে দিলে জানালা, দরজা আসবাবপত্র সহ গৃহের 'সেটটি' দেখা যেত। অভিনেতারা এগিয়ে এসে মঞ্চ প্লাটফর্মের উপরে অভিনয় করত। প্রকৃতপক্ষে ভিক্রুভিয়াস্ স্বয়ংও ছিলেন একজন আদর্শবাদী রোমান স্থপতি। তিনি গ্রীক ও রোমান মঞ্চের প্রামাণ্য আলোচনা ঠিকই করেছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করেছেন—একটি আদর্শ রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, স্থাপত্য শিল্প এবং শব্দ-ক্ষেপণের বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা। তবুও গ্রীকযুগের পেরিয়াকৃতোই বা 'রিভলভিং প্রিজ্‌ম্‌স্' (Revolving Prisms) সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন—তিন শ্রেণীর "ক্লাসিক্ সেটিং"-এর তিনি যে উল্লেখ করেছেন, তাই ছিল পরবর্তী কালের হাতে প্রামাণ্য তথ্য। এই তথ্যই রেনেসাঁস্ যুগের "মান্তেঞা" (Mantegna) "ব্রুনেলেস্‌চি" (Brunelleschi) "গির্লান্দাজো" (Ghirlandajo) "মিখায়েলেঞ্জেলো" (Michaelangelo) "আন্দ্রিয়া দেল্ সার্তো" (Andrea del Sarto) "রাফায়েল" (Raphael) এবং "লিওনার্দো দা ভিঞ্চি" (Leonardo da Vinci) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের বহুক্ষেত্রেই দৃশ্য অঙ্কনে প্রভুত সাহায্য করেছে।

রেনেসাঁস্ যুগে যখন ক্লাসিক্ আদর্শে নূতন রঙ্গালয় তৈরীর পরিকল্পনা হল, তখন পরিকল্পনাকারিগণ ভিক্রুভিয়াসের বর্ণনা পড়লেন এবং তার সঙ্গে প্রাচীন মঞ্চ স্থাপত্যের ভগ্ন নিদর্শনগুলি দেখলেন—তা থেকে তাঁরা যা বুঝলেন এবং গড়ে তুললেন তা রোমান মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারের প্রায় অনুরূপই হয়ে উঠেছিল। এই ক্লাসিক্ ধরনে গঠিত প্রথম স্থায়ী রঙ্গালয়টি—স্থাপিত হল ভিসেন্‌ৎসা নগরীতে তার নাম হল "ত্তা তিয়েত্রো অলিম্পিকো ইন্ ভিসেন্‌ৎসা" (The Teatro Olimpico in Vicenza)-এর উদ্যোক্তা ছিল অলিম্পিক আকাদেমি; এর স্থপতি ছিলেন "আন্দ্রিয়া প্যাল্লাদিয়ো" (Andrea Palladio)। রোমান ধারায় অলিম্পিক থিয়েটারের স্থাপত্য কর্ম সুরু হয় ১৫৮০ খ্রীঃ।

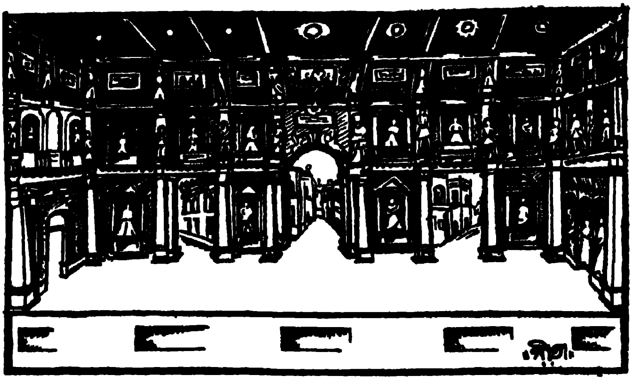
অলিম্পিক থিয়েটারের পরিকল্পনায় ঠিক মঞ্চের নীচেই খোরাসের জন্য একটি সমতল "অর্‌খেস্ত্রা" ভূমি রাখা হয়েছিল—তার পরেই উঠে গিয়েছিল মঞ্চ, মঞ্চের পশ্চাতে ছিল দীর্ঘ, উচ্চ দেয়াল, তাতে ছিল তিনটি বৃহৎ দরজা, আর দুই পার্শ্বের প্যারাস্কেনিয়ায় দু'টি ক্ষুদ্র দরজা ছিল। প্রত্যেক দরজারই ছিল একটি করে প্রবেশ পথ। একেবারে মাঝের দরজাটির জন্য প্যাল্লাদিয়ো রোমান বিজেতারা বিজয়শোভাযাত্রা করে নগরে যে বিজয়তোরণ বা গোপুরম্ দিয়ে প্রবেশ করতেন তারই অনুরূপ তোরণ তৈরী করেন।



অলিম্পিক থিয়েটার : সম্মুখ ভাগের দৃশ্য।

সম্ভবতঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চের এই সুবৃহৎ প্রবেশপথগুলি যবনিকা বা দরজা দ্বারা আবৃত থাকবে, অথবা তার পেছনে পেরিয়াক্‌তোই বসাবেন। কিন্তু ১৫৮০ খ্রীঃ তাঁর আরব্ধকাজ সুরু করেই তিনি মারা যান, তখন এই কাজ সমাপ্ত করার ভার পড়ল স্থপতি "ভিসেন্‌ৎসো স্কামোৎসির" (Vicenzo Scamozzi) উপর। তিনি প্যাল্লাদিয়োর খসড়া পরিকল্পনার তাৎপর্য সর্বত্র ধরতে না পেরে তা স্থানে স্থানে পরিবর্তিত করেন। পাঁচটি দরজার পেছনে তিনি পেরিয়াক্‌তোই বা যবনিকা না রেখে রাজপথের দৃশ্য রচনা করলেন। এই দৃশ্যগুলির মধ্যে এযুগের নবসৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রাঙ্কণ রীতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হল। দৃশ্যগুলি বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির মত কেন্দ্র থেকে

ছড়ানো ছিল। এগুলি কাঠ ও প্লাষ্টার দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, এতে পরিপ্রেক্ষিত রীতির প্রবল শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ত্রি-মাত্রিক অলংকরণ।



অলিম্পিক থিয়েটারের মঞ্চ।

॥ অলিম্পিক রঙ্গমঞ্চ ও প্রোসীনিয়াম্ আর্চ ॥

এই অলিম্পিক মঞ্চ থেকে সূচনা হয়েছিল বর্তমান মঞ্চের এক বিশেষ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের—তা হল প্রোসীনিয়াম্ আর্চ (Proscenium arch)। এই রীতি পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে ক্রমশঃ মঞ্চমুখ সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে আছে। স্কামোৎসির পারস্পেকটিভ অঙ্কিত মাঝের প্রবেশপথ ধীরে ধীরে প্রাধান্য পেতে লাগল ও বৃহৎ হতে লাগল, ফলে ক্লাসিক্ মঞ্চের চিত্রিত পশ্চাদ্‌দেয়াল সম্মুখে এগিয়ে আসতে লাগল, মাঝখানের প্রবেশ পথকে ঘিরে তা এখন অলংকৃত ফ্রেমের মত দাঁড়িয়ে রইল এরই রূপান্তরিত রূপ হল বর্তমান যুগের প্রোসীনিয়াম্ ফ্রেম। দরজার ফাঁক দিয়ে যে সুদূর দৃশ্য দেখা যেত ক্রমে তাই হয়ে দাঁড়াল সমগ্র মঞ্চজোড়া দৃশ্য—অলংকৃত দেয়ালটি এখন মঞ্চদৃশ্যের ফ্রেম হয়ে উঠল, তার সম্মুখে এল যবনিকা, যার অন্তরালে ইচ্ছামত দৃশ্য পরিবর্তন করা হতে লাগল।

১৫৮৪ খ্রীঃ স্কামোৎসির অধীনে ত্যা তিয়েত্রো অলিম্পিকো তৈরী শেষ হয় এবং এর পর বৎসর এর দ্বারোদ্ঘাটন হয় সোফোক্লেসের "অয়দিপউস্ রেক্স" (Oedipus Rex) বা রাজা ইডিপাস্ নাটকের অভিনয় দিয়ে। এই নাটকটি ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া হয় এবং এর জন্য বিশেষ

সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্থাপত্য চাতুর্যের জন্য এই প্রেক্ষাগারটি বিস্ময়করভাবে উত্তপ্ত, বর্তমানকালেও এই রঙ্গালয়ে কখন কখন ক্লাসিক্ নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে।

অলিম্পিক থিয়েটার গড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্থপতি স্কামোৎসি ছোট্ট স্যাব্বিয়োনেতা শহরে একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করতে গিয়ে নূতন ধরনের পরীক্ষা চালান, এতে মঞ্চে তিনি একটি মাত্র প্রোসীনিয়ম্ প্রবেশমুখ (Proscenium Opening) রাখায় আমরা আধুনিকতার দিকে আর একধাপ এগিয়ে আসি।

সম্ভবতঃ এই "স্যাব্বিয়োনেতার" (Sabbioneta) থিয়েটার পরবর্তী আর একজন স্থপতি "জিয়াম্‌বাত্তিস্তা আলিয়োত্তি"কে (Giambattista Aleotti) ২০ মাইল দূরবর্তী "পার্মা" শহরে "ফার্নেস্ থিয়েটারের" (the Teatro Farnese in Parma) পরিকল্পনা গঠনে সাহায্য করেছিল। পার্মার থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল ১৬১৮ খ্রীঃ। এই তিয়েত্রো ফার্নেস্‌কেই বর্তমান রঙ্গমঞ্চের প্রথম উদাহরণ বলা যায়।

এই প্রেক্ষাগৃহটি বাইরের আকারের দিক দিয়ে ছিল একান্তই প্রাচীনপন্থী। এর আকার ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি, ধাপে ধাপে দর্শকদের আসন উঠে গিয়েছিল—মোট ৩৫০০ জন দর্শক বসতে পারতেন। মঞ্চ ও দর্শকদের মাঝখানে যে অর্কেস্ট্রার স্থান ছিল, তাতে প্রয়োজন মত ব্যালে বা বলনৃত্য হতে পারত, দর্শকরা তিনদিক ঘিরে বসে দেখতেন। কিন্তু মূল পরিকল্পনার দিক থেকে এর মঞ্চটি ছিল প্রায় আধুনিক গঠনের। এর সম্মুখে ছিল একটি সুবিস্তৃত প্রোসীনিয়াম্ এবং তার পশ্চাতে ছিল সুগভীর মঞ্চ। প্রোসীনিয়াম্ ফ্রেমে বাঁধা থাকায় মঞ্চের অভিনয় ক্ষেত্র একটি বিশেষ সীমারেখায় অঙ্কিত হল, ফলে মঞ্চে সঞ্চারিত হল নূতন জীবনীশক্তি। অভিনয় ক্ষেত্রটি চারদিকে দৃশ্যাবলী বা দেয়াল দিয়ে আবৃত থাকত তাই অভিনেতারা আর উন্মুক্ত প্লাটফর্মের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারতেন না। অতএব অভিনয়ের দিক দিয়ে মঞ্চের পূর্ব সংজ্ঞা পাল্টে যেতে লাগল। নাটক হয়ে দাঁড়াল ফ্রেমে বাঁধা সদা সঞ্চরণশীল এক একটি বিচ্ছিন্ন চিত্রের একত্রিত রূপ—যার পশ্চাদ্‌ভাগ, মধ্যভাগ ও সম্মুখভাগ স্তরে স্তরে ফ্রেমের মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে। সুতরাং এই দৃশ্যাবলী অঙ্কনের জন্য মঞ্চে চিত্রশিল্পীরা অপরিহার্য হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে পার্মা রঙ্গালয়ে ঘটেছিল বিভিন্ন কালের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই নূতন প্রথার মঞ্চের জন্য মিস্ট্রি, মিরাক্ল্ নাটকের দ্বারা

প্রভাবান্বিত দৃশ্যাবলীও অঙ্কিত হত, আবার প্রেক্ষাগৃহের মেঝে ছিল বলনৃত্যের জন্য বিশেষ ধরনে তৈরী, অন্য দিকে বসবার আসনশ্রেণী ছিল অ্যারিণা সদৃশ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা বর্ষণে ত্যা তিয়েত্রো ফার্নেস্ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সমসাময়িক ভিসেনৎসা ও স্যাব্বিয়োনেতা রঙ্গালয় এখনো টিকে আছে।

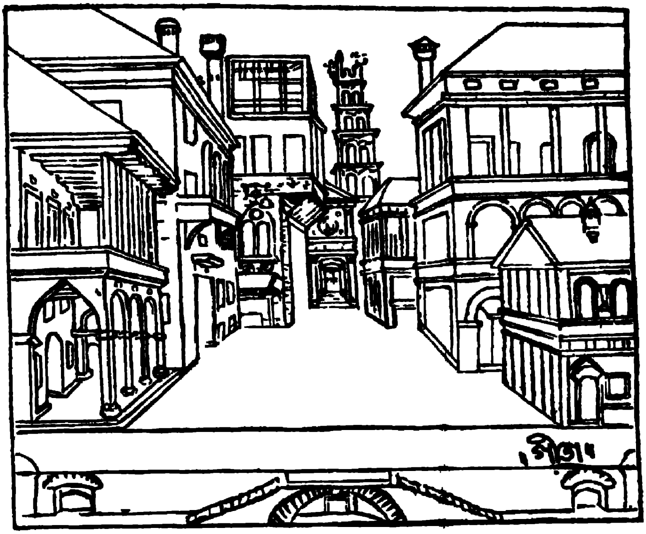
রেনেসাঁস্ যুগের ইতালিতে রাজন্যবর্গ, শিল্পী, পণ্ডিত ও পোপ সকলেই মিলিতভাবে ক্লাসিক্ মঞ্চের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন—এবং তার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি অলিম্পিক থিয়েটার যেখানে পুরাতনের সম্ভাব্য অনুকৃতি ছিল, আর ফার্নেস্ থিয়েটার, যেখানে ছিল ভবিষ্যৎকালের পূর্বপ্রদর্শন।

॥ সেরলিও ও স্যাব্বাতিনি ॥

ভিত্রুভিয়াস্ যেমন একাধারে ছিলেন রোমান রঙ্গালয়ের স্থপতি এবং ক্লাসিক্ স্থাপত্য গ্রন্থের রচয়িতা রেনেসাঁস্ যুগের ইতালিতেও তেমনি দু'জন স্থাপত্য গ্রন্থের রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন সেরলিও এবং স্যাব্বাতিনি তাঁদের রচিত দৃশ্যাবলীর পরিকল্পনা এবং রঙ্গমঞ্চের খসড়া রেনেসাঁস্ যুগের অন্যান্য ক্লাসিক্ শিল্পীদের দীর্ঘকাল ধরে পথপ্রদর্শন করেছে।



সেরলিওর প্রখ্যাত চিত্রাবলী : ট্র্যাজিক্ দৃশ্য।



সের্‌লিওর প্রখ্যাত চিত্রাবলী : কমিক্ দৃশ্য।



সের্‌লিওর প্রখ্যাত চিত্রাবলী : সাত্যুরিক্ দৃশ্য।

ইতালির প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী "পেরুৎসির" (Peruzzi) ছাত্র ছিলেন "সেবাস্তিয়ানো সের্‌লিও" (Sebastiano Serlio), সের্‌লিও একাধারে ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী এবং স্থপতি। ১৫৪৫ খ্রীঃ তিনি দু'খণ্ডে ভিত্রুভিয়াসের অনুরূপ "আর্কিটেক্‌চ্যুরা" (Architectura) নামে একখানি মঞ্চ-স্থাপত্যের গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী ক্লাসিক্‌ থিয়েটারের রীতি প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের মঞ্চ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ক্লাসিক্‌ থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ধারা অঙ্কিত করে দেখান। তাঁর অঙ্কিত ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং সাত্যুরের তিনটি সুনির্দিষ্ট অঙ্কিত দৃশ্য পরবর্তী মঞ্চবিদ্‌দের বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত করে। সের্‌লিওর ট্র্যাজিক্‌ সেটে (Tragic Set) ছিল বিরাট বড় বড় সমুজ্জ্বল প্রাসাদ, কমিক্‌ সেটে (Comic Set) ছিল সাধারণ নগরগৃহ এবং সাত্যুরের সেটে (Satyr Set) ছিল বৃক্ষশ্রেণী, পাহাড় ও কুটীরের দৃশ্য।

এ যুগের মঞ্চে সেটিং শুধু যে কতকগুলি অঙ্কিত দৃশ্যের উপরই নির্ভর করত তাই নয়—তার সঙ্গে ত্রি-মাত্রিক নীতির উপর নির্ভরশীল একটা মিথ্যে পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে নিত। এই রীতি অনুযায়ী পশ্চাদ্‌দিক থাকত সমতল এবং তাতে অঙ্কিত থাকত কোন দৃশ্য কিন্তু উইংগুলি (Wings) বাইরের দিকে ঘুরিয়ে কোনাকুনি রাখা হত আর তার গায়ে কার্নিস্‌ ও অন্যান্য স্থাপত্য অলংকরণ করা থাকত। উইংগুলি উপরদিকে বাঁকা করে কাটা থাকত এবং তার গায়ে এমন বিভ্রান্তিকর পরিপ্রেক্ষিতে চিত্র আঁকা হত যাতে সবগুলি রেখাই পেছনে নীচের দিকে দিগন্ত রেখায় হেলে যেত এবং তারপরে সর্বপশ্চাতে অঙ্কিত দৃশ্যসজ্জার বিলুপ্তি বিন্দুতে (Vanishing point) মিলিয়ে যেত। একেবারে পেছনের দিকের উইংগুলিতে কোন উঁচু কার্নিস্‌ বা কোন ত্রি-মাত্রিক অলংকরণ থাকত না। এখন স্বভাবতঃই এক সমস্যা এসে দাঁড়াল, যে উইংগুলির উপর দিক পেছনে হেলিয়ে কেটে দেওয়ার দরুন যখন সুদূর বিলুপ্তি বিন্দুতে মিলিত হয় তখন ভূমি রেখাই বা উপরে উঠে গিয়ে সেই বিন্দুতে মিলবে না কেন? সের্‌লিও কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিত যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করতে গিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য মঞ্চে এক নূতন পদ্ধতি আনলেন—আমরা তাকে "রেক্‌" (Rake) বলি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী মঞ্চের সম্মুখভাগে কয়েক ফুট থাকবে সমতল, তারপরে মঞ্চ পেছন দিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাবে। সঠিক আমরা বলতে পারি না যে

কবে থেকে এই "রেক্‌ড স্টেজ" (Raked Stage) সাধারণ ব্যবহারে আসল কিন্তু এই ধরনের মঞ্চ পরবর্তী ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত খুবই প্রচলিত ছিল। মঞ্চের ক্রম ঢালু মেঝে এখনো অনেক প্রাচীন ইউরোপীয় পদ্ধতির থিয়েটারে দেখা যায়। মঞ্চের শব্দসম্ভারে আমরা দু'টি শব্দের ব্যবহার সদা সর্বদাই দেখতে পাই "আপ্-স্টেজ' (Up Stage) এবং "ডাউন-স্টেজ" (Down Stage)—রেক্ পদ্ধতিতে মঞ্চের পেছন দিকটা উঁচু থাকে বলেই তাকে "আপ্ স্টেজ" এবং সামনের অপেক্ষাকৃত নীচু অংশকে "ডাউন-স্টেজ" বলা হয়।

সেরলিও কি করে অদৃশ্য তারের যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে মনুষ্য, পশু, বা গাছপালা, মূর্তি ইত্যাদি মঞ্চে আনা নেওয়া করা যায় তাও লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। রেনেসাঁস্ যুগে এসেই ইউরোপীয় থিয়েটার সর্বপ্রথম গৃহবাসী হয়—সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আলোকসজ্জা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। প্রথম অবস্থায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ—ভোজগৃহের মত আলোকদানে অগণিত মোম ও প্রদীপের আলো জেলে আলোকিত করা হত। ক্রমশঃ মঞ্চের জন্য বিশেষ ধরনের আলোক-সম্পাতের কলা-কৌশল দেখা দিল। সেরলিও তাঁর গ্রন্থে লিখে গেছেন কি করে রঙিন আলো—লাল মদ বা রঙিন জলের বোতলের পেছনে টর্চ জেলে করা হত এবং কি করে সেই টর্চের আলোর পেছনে একটি উজ্জ্বল ধাতব বেসিন ধরে সেই আলোকে মঞ্চে প্রতিফলিত করা হত।

দ্বিতীয় স্থাপত্য গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন "স্যাব্বাতিনি" (Sabbatini)—১৬৩৪ খ্রীঃ তিনি তাঁর মঞ্চ-স্থাপত্য গ্রন্থ রচনা করেন এর নাম ছিল, "প্রাকৃতিকা দ্য ফাব্রিকার্ সীন্ এ ম্যাখিনে নে তিয়াত্রি" (Practica di fabricar scene e machine ne' teatri) এই গ্রন্থে তিনি মঞ্চের দৃশ্য সজ্জাগত পরিপ্রেক্ষিত এবং যান্ত্রিক কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি যেমন আকাশে মেঘের অবতারণা অথবা সমুদ্রে ঢেউ সৃষ্টির উপায় উল্লেখ করেন তেমনি মঞ্চে দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনেরও কতকগুলি পন্থা দেখান।

ত্রিকোণ পেরিয়াকৃতোইকে আরো বেশি কার্যকরী করার জন্য তার পাশে আলাদা "ফ্লাট" (Flat) আটকে নেওয়ার কথা তিনি বলেন। অনেক সময় অঙ্কিত কাপড় উইংসের একদিক থেকে আর এক দিকে টেনে নিয়েও নূতন দৃশ্য রচনা করা হত।

স্যাব্বাতিনি উল্লেখ করেছেন যে—মঞ্চের দু'পাশে চারটি—চারটি মোট

আটটি করে হয়তো সকোণ উইংস্ বা বৃক্ষশ্রেণী রাখা হত—এগুলিও আবার স্তরে স্তরে পর পর তিনটি করে সাজানো থাকত, এতে উইংস্শ্রেণীর সম্মুখের একটি স্তর সরিয়ে দিয়ে পুরো সেটটাই পাল্টানো যেত।

এই ধরনের রেক্‌ড স্টেজে সম্ভবতঃ পেরিয়াক্‌তোইর ব্যবহার খুবই অসুবিধাজনক ছিল, ফলে নানা ধরনের উইংস্ই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করেই জনপ্রিয় ছিল "সমতল উইংস্" (Flat wings), মঞ্চে যার সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৬০০ শতকে তারপর থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এর সর্বাত্মক ব্যবহার চলেছে। খুব তাড়াতাড়ি দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য এই ধরনের তিন চারিটি অঙ্কিত উইংস্ একটির পশ্চাতে আর একটি সজ্জিত থাকত। সামনের দিকের উইংগুলি সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাৎপটে অঙ্কিত স্ক্রিনটিও উপরে গুটিয়ে বা নীচে নামিয়ে দেওয়া হত পশ্চাৎপট খুব বড় হলে দু'পাশেও সরিয়ে দেওয়া হত, এবং অন্য দু'অংশে বিভক্ত দু'টি নূতন দৃশ্য এসে জায়গা জুড়ে বসত, এই সমস্ত সমতল উইংস্ অনেক সময়ই কাঠের লম্বা খাত বা "গ্রুভস্" (Grooves)-এর উপর সাজানো থাকত—ফলে রেল লাইনের মত এই কাঠের লাইনের উপর দিয়ে অতি সহজেই উইংগুলি আনা নেওয়া করা যেত এই পদ্ধতি ১৯০০ শতক পর্যন্ত ছোট ছোট অনেক রঙ্গালয়েই দেখা গেছে। এ ছাড়াও মঞ্চের উপরে শ্রেণীবদ্ধ "আর্চ" (Arches) এবং অঙ্কিত আকাশের ব্যবহারও তাঁরা করেছিলেন।

দৃশ্য পরিবর্তনের এই যে সব বিস্তৃত উপায়ের সৃষ্টি হল তার মধ্যে একটা জিনিস বিশেষ ভাবেই কৌতুকজনক ছিল—তা হল উনবিংশ শতকের শেষভাগে আসার আগে পর্যন্তও দর্শকদের চোখের সম্মুখেই এই সমস্ত দৃশ্যসজ্জা পরিবর্তন করা হত, এটাও ছিল আনন্দ বিতরণের একটা অংশ। দর্শকসাধারণ খুব উৎসুক ভাবেই দেখত, যে কি করে জাদু মন্ত্রে একটি দৃশ্য মিলিয়ে গিয়ে আর একটি দৃশ্য জেগে ওঠে। এখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা রোমান, রেনেসাঁস্ ও রেস্টোরেশন্ যুগে সম্মুখ যবনিকার উল্লেখ পেয়েছি—তবে তা দৃশ্যপরিবর্তনের কালে ব্যবহৃত হত না কেন? এর কারণ হল এ সমস্ত যুগে যে সম্মুখ-যবনিকা (Front Curtain) ব্যবহৃত হত, তা কেবল অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে প্রথম দৃশ্যটিকে আবৃত করে রাখত এবং অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য সর্বশেষে নেমে আসত। ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্তও ইউরোপে কোন "অঙ্ক যবনিকা" (Act Curtain) ছিল না।

একটি দৃশ্য বা অঙ্ক যে শেষ হল দর্শকরা তা বুঝত, যখন দেখত অভিনেতারা সকলেই মঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেছে। ১৮৮১ খ্রী: ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ নট ও পরিচালক হেনরী আরভিংই (Henry Irving) সর্বপ্রথম "দৃশ্য-যবনিকার" (Scene Curtain) প্রচলন করেন। তাঁর "দ্য করসিকান্ ব্রাদার্স" (The Corsican Brothers) নাটক অভিনয় কালে সেট পরিবর্তনের সময় সেটের বিরাট বিরাট অংশগুলি আনা নেওয়ার জন্য ১৩৫ জন বিভিন্ন ধরনের সহকারী কাজ করছিল—এই সময়েই তিনি সর্বপ্রথম দৃশ্য-যবনিকার ব্যবহার করে মঞ্চে এই বিরাট দৃশ্যপরিবর্তনটা দর্শক চক্ষুর অন্তরালে ঘটান।

রেনেসাঁস্ যুগের মঞ্চশিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তাঁরা পূর্ণবিশ্বাসে নির্ভর করতেন পরিপ্রেক্ষিত রীতির অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার উপর, কারণ এরই সহায়তায় বাস্তবের অনুরূপ রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায়, যে রূপ এ যুগের ইতালীয় দর্শকরা মিখায়েলেঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের ক্যান্ভাস বা মুরাল চিত্রাবলীতে দেখেছে এবং ভালবেসেছে। কিন্তু ক্রমশ:ই এই পশ্চাৎপটের দৃশ্যাবলী বেশি জায়গা জুড়ে বসতে লাগল, ফলে মঞ্চে স্থাপত্য অংশ কমতে লাগল। কারণ স্থাপত্যের চাইতে এগুলি কম খরচে ও কম সময়ে হত, বিংশ শতাব্দীতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গির আবার পরিবর্তন ঘটল। অঙ্কিত কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিতের মূল উৎস লোকে ভুলেই গেল—একে আর কেউ বাস্তবানুগ প্রচেষ্টা বলল না—বলল কৃত্রিম এবং একেবারেই "থিয়েট্রিকাল" (Theatrical) কারণ বিংশ শতকের দর্শকদের কাছে এর বিভ্রান্তি কেটে গিয়েছে। এই শতকের আধুনিক প্রয়োগশিল্পীরা এই সত্যে উপনীত হলেন যে অত্যধিক পরিমাণে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রয়োগে নাটকের রস সম্যক ব্যাহত হয়, মঞ্চের উপরকার উন্নত নাটকীয় চরিত্রাভিনয় অঙ্কিত দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুগম্ভীর ভাব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু যখন মঞ্চে কৃত্রিম আলোক শিল্পের আবির্ভাব হল তখন অঙ্কিত দৃশ্য আরও অর্থহীন হয়ে উঠল।

অপেরায় ও ব্যালে-নৃত্যে কিন্তু এই আড়ম্বরযুক্ত অঙ্কিত দৃশ্যাবলী এখনো খুব প্রচলিত কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এটা হয়ে দাঁড়াল অপকর্ষ ও দুর্বলতার লক্ষণ। সুতরাং রেনেসাঁস্ যুগে আমরা মঞ্চের যে পরিবর্তন পাই তা স্থাপত্য কাঠামোর কোন রূপান্তর নয়—তা ছিল কেবল বহিরাবরণের অলংকরণ।

॥ প্যাস্টোরাল ও অপেরা ॥

রেনেসাঁস্ যুগের ইতালির অঙ্কিত দৃশ্যসজ্জার এতক্ষণ যে বিস্তৃত আলোচনা হল তা ক্লাসিক্ নাটক ছাড়া প্যাস্টোরাল ও অপেরা নাটকের অভিনয়েও ব্যবহৃত হত। রেনেসাঁস্ যুগেই "প্যাস্টোরাল" (Pastoral) নাটকের গ্রাম্য আনন্দমুখর রাখালীয়া সাহিত্য ধারার উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল কোন গ্রাম্য-কাহিনী বা উপকথা (Mythological fable) অবলম্বনে কোন মধুর, ক্ষুদ্র কাব্য-নাট্য। সাধারণভাবে বলা যায় এক্ষেত্রে গ্রীক পুরাকাহিনীর নায়ক নায়িকার চরিত্রগুলির স্থান অধিকার করেছিল মেষপালক, মেষ-পালিকা, জলদেবী, পরী ইত্যাদিরা এবং এদের বিচরণ ক্ষেত্র অলিম্পাস্, হেডিজ্ বা আভিক রাজপ্রাসাদ না হয়ে, হয়ে উঠেছিল কুঞ্জবন, উপবন বা ঝর্ণাধারা। এই ধারার সন্ধান আমরা রোমান যুগেও পাই—তারা যখন পরস্পরের প্রতি রক্তমাখা ছুরি শানাত, তখনও কিন্তু তাদের বৈচিত্র্য লোভী হৃদয় মুগ্ধ হত শান্ত, নির্জন গ্রাম্য জীবনের কল্পনায়। পরে এই গ্রাম্য দৃশ্যাবলীর প্রভাব ইউরোপের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁসের ইতালি থেকে এই ধারা স্পেন হয়ে এগিয়ে যায় ষোড়শ লুইর ভের্সায় রাজসভার বিলাসক্ষেত্রে—অন্যদিকে প্রভাবিত করে তোলে ইংরেজী নাটক ও কাব্যকে। এলিজাবেথীয় যুগের স্যার ফিলিপ সিডনী, মার্লো এবং শেক্সপীয়রের রচনার মধ্য দিয়ে এই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছয় রোমাণ্টিক যুগের কবিদের মধ্যে। তাঁদের গীতিকাব্যে এই পল্লীনাট্য নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে। আসে সেই রোমাণ্টিক চিন্তাধারা যা "ইউটোপিয়ার" (Utopia) স্বর্গ রচনা করে চলেছে। এই সভ্য জগতের আঘাত, বেদনা, কৃত্রিমতায় জর্জরিত হয়ে তাঁদের মনের পলায়ন প্রবৃত্তি, নিভৃত গ্রাম্যজীবনকে ঘিরে কল্প-স্বর্গ রচনা করে নিয়েছে, যেখানে আছে কেবল আনন্দ, সরলতা, আছে সুকুমার পল্লীর মন্থরতা—সেই স্বর্ণযুগের কল্পনায় তাঁরা বিভোর হয়ে উঠলেন। কবি কণ্ঠের উদ্ধৃতিতে বলা যায়—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—"

রেনেসাঁস্ যুগের এই সব প্যাস্টোরাল নাটকের অভিনয় ষোড়শ শতকের অভিজাতদের বাগান বাড়িতেই হত। তাতে অঙ্কিত পশ্চাৎপট, উইংস্, কুঞ্জবন ইত্যাদি থাকত। এই প্যাস্টোরাল নাটক রাজসভা ও অভিজাতদের মধ্যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—এমন কি অভিজাত রমণীরাও কোন

কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই রাখালীয়া নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল "তরকুআতো তাস্‌সোর (Torquato Tasso) "আমিনতা" (Aminta—১৫৭৩) এবং "বাতিস্তা গুয়ারিনি"র (Batista Guarini) "দ্যা ফেথ্‌ফুল শেফার্ড" (The Faithful Shepherd), এই নাটকগুলি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই ধারার নাটকের মাঝেই একমাত্র ইতালীয় রেনেসাঁস্ অনুকরণের নিগড় ভেঙ্গে আত্মপ্রকাশের সার্থকপন্থা আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন রচনাকেই শ্রেষ্ঠ নাটক নামে ভূষিত করা যায় না। তাদের মধ্যে সৌকুমার্য ছিল, ছিল মৃত্যুর স্নিগ্ধ হাসি, ছিল কুলকুল স্বরা কাব্য মাধুর্য, ছিল ভাবাবেগের মধুর বিস্তার—কিন্তু এর কোনগুণই থিয়েটারের প্রকৃষ্ট শক্তি বলা যায় না। এর মঞ্চও তেমনি এক অঙ্কিত কল্পলোক রচনা করত। এই সব মঞ্চের পার্শ্ববর্তী উইংস্ হত সারিবদ্ধ সাইপ্রেস বৃক্ষ অথবা পবিত্র ওকের কুঞ্জঘেরা; মঞ্চবেদীকে আচ্ছাদিত করে থাকত শ্যামল দূর্বাদল, এই কুঞ্জ ও বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত ত্রিকোণ পথের রেখা দেখা যেত—মঞ্চের পশ্চাতে তা সুদূর দিগন্তে মিশে যেত। মঞ্চের সম্মুখে অশ্বক্ষুরাকৃতি রেখায় দর্শকরা ঘিরে বসত। এর অভিনয় রাজা বা অভিজাতদের উদ্যানে যখন হত তখন অঙ্কিত দৃশ্যের স্থানে স্বাভাবিক বৃক্ষ, লতা ও কুঞ্জবনই ব্যবহৃত হত। ইংল্যাণ্ডের মঞ্চশিল্পী "ইনিগো জোন্‌স্" (Inigo Jones) ইটালি থেকে মঞ্চ-শিল্প শিক্ষা করে গিয়ে এই ইতালীয় প্যাস্টোরাল নাটক অবলম্বনেই রাজসভার জন্য 'মাস্ক্' (Masque) নাটক তৈরী করেন এবং রাণী প্রথম এলিজাবেথ ও রাজা প্রথম জেমসের আনন্দবর্ধন করেন।

ইতালির নিজস্ব ধারার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যাভিনয় হল—"অপেরা" (Opera) বা গীতিনাট্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় প্যাস্টোরাল বা "ইন্‌তারমেৎসির" (Intermezzi) অভিনয়ে প্রচুর পরিমাণে সুর ও সঙ্গীতের যোজনায়ই অপেরার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে এর ধারা ভিন্ন। ১৫৯৫ খ্রীঃ একদল পণ্ডিত ও সঙ্গীত শিল্পী মিলে "দাফ্‌নে" (Dafne) নামে একটি পুরাকাহিনী নিয়ে গ্রীক ট্র্যাজেডির যেভাবে অভিনয় হত বলে তাঁদের ধারণা ছিল তদনুসারে সঙ্গীতমুখর পটভূমির উপরে কাব্যময় কথোপকথনে একটি নাট্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। এর সঙ্গে এসে গ্রাম্য গাথায় সঙ্গীতমূলক আবৃত্তি মিশ্রিত হতে লাগল এবং অপেরা অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন দল গড়ে

উঠল। ক্রমশঃ সমগ্র নাটকীয় কাহিনীকেই সঙ্গীতে পরিবেশন করার প্রবণতা দেখা দিল। অপেরার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল "পোলিশিয়নের" (Politian) রচিত "অর্‌ফিও" (Orfeo) নাটক। অপেরা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইউরোপে—ভেনিস্ ও নেপলস্ থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে। ভেনিস্ শহরেই ১৬৩৭ খ্রীঃ সর্বপ্রথম অপেরার জন্য আলাদাভাবে সাধারণ রঙ্গালয় তৈরী করা হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভেনিস্ শহরে ১১টি অপেরা রঙ্গালয় দেখা দিল এবং তাতে ৩৬০টি অপেরার অভিনয় হল। তারপরে এই তিনশ বছর ধরে সঙ্গীত, নাটক ও দৃশ্যাবলীর মিলিত রূপ এই অপেরা ইউরোপে অতিপ্রিয় হয়ে টিকে রয়েছে। অন্যদিকে বলরুমের নাট্যানুষ্ঠান থেকে 'ব্যালে' নৃত্যের প্রচলন হয় এবং বহু রোমাণ্টিক কাহিনী এমন কি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকও ব্যালেতে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়ে চলেছে।

এখনো পর্যন্ত অপেরায় রেনেসাঁস্ যুগের অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রচলন সমান অটুট রয়েছে। তা ছাড়া সে যুগে অপেরায় যন্ত্রপাতির প্রচলনও যথেষ্ট ছিল। মেঘের উপরে ওঠা, কোন স্বর্গীয় ঘটনা দেখানো, কোন আবির্ভাব বা তিরোভাব কিংবা চলন্ত চন্দ্র, সূর্য সকলি অপেরা মঞ্চে দেখানো হত। এমন কি মঞ্চে আরোহী সহ নৌকোও ভেসে চলে যেত। ক্লাসিকাল নাটকের মঞ্চে মঞ্চবিদ্‌রা যে রহস্যঘন, সুমধুর, কল্পিত দৃশ্যরূপ রচনায় বাধা পেতেন, অপেরা এবং প্যাস্টোরাল নাটকে তারই প্রয়োগ ছিল অবারিত—উদ্দাম।

॥ কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে ॥

ইতালির ক্লাসিকাল নাট্যপ্রচেষ্টা ছিল চার্চ, রাজন্যবর্গ এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাগম ধন্য। তাঁদের মনোরঞ্জন কল্পে দৈবক্রমে প্যাস্টোরাল এবং অপেরা নাটকেরও আবিষ্কার হয়েছিল। এই সকল শ্রেণীর প্রচেষ্টাই কিন্তু চলছিল সৌখিন শ্রেণীর নাট্য রসিকদের দ্বারা। কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই জন মনোরঞ্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল একশ্রেণীর পেশাদারী অভিনেতা। তারা হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলী, নৃত্য, গীত এবং মূকাভিনয়ের সাহায্যে অতি পরিচিত কতকগুলি 'টাইপ' চরিত্র অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলত। এদের মূল ধারাটি ছিল কিন্তু অতি প্রাচীন। রোমের পথে ঘাটে গ্রীক মাইমসের দল নানা রকম শারীরিক

কসরত ও কৌতুকাভিনয় দেখিয়ে বেড়াত। রোমের পতনের পরে এই "মাইমস্" অভিনেতারা রোমের পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী "বাইজানটিয়ামে" (Byzantium) যায় এবং সেখানে তুর্কিদের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে টিকে থাকে। রেনেসাঁস্ যুগে এই মাইমের অভিনেতারা আবার তাদের আপন জন্মক্ষেত্র ইতালির নগরে ও গ্রামে ফিরে আসে। এই ভ্রাম্যমাণ যাযাবরের দল পথে, ঘাটে, পার্কে তাঁবু ফেলে অভিনয় আরম্ভ করত এবং অগণিত সাধারণ মানুষের নির্মল আনন্দের উপকরণ জোগাত। ক্রমশঃ এরা কলেবর বৃদ্ধি করে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তিকালের ইউরোপীয় লঘু কমেডি ও ফার্সের উপরে আপনাদের অমর নাম অঙ্কিত করে দিয়ে যায়।

১৫৫০ খ্রীঃ ঘিরে এই পেশাদার নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই নাট্যাভিনয় গোষ্ঠীগুলিকে বলা হত "কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে" (Commedia dell' Arte) তাদের এই নামকরণ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন তারা তাদের মূল ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছিল। বলা যায় কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে হল "কম্মেদিয়া এরুদিতার" (Commedia erudita) সম্পূর্ণ বিপরীত। "এরুদিতে" (Erudite) অর্থ অ্যামেচার বা সৌখিন দল—আর দেল্ আর্তে (Dell' Arte) ছিল পেশাদারী (The Professional) দলের নাম। রেনেসাঁস্ যুগের অভিজাত অভিনেতারা ছিলেন সৌখিনশ্রেণীর তাঁরাই কম্মেদিয়া এরুদিতা আর এর বিপরীত দেল্ আর্তের দল ছিল পেশাদারী—এরা এই অভিনয় বিদ্যায় সুদক্ষ, সুশিক্ষিত এবং জীবিকাবলম্বী লোক ছিল। "আর্তে" (Arte) শব্দের অর্থ বিশেষভাবে এই কমেডিগুলির অভিনয় কৌশল।

কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের দল যেমন দরবারী মঞ্চের মত সৌখিন দল ছিল না—ছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তেমনি তাদের নাটকও ট্র্যাজেডি, কমেডি, ইন্টারলুড বা অপেরা ধরনের কোন লিখিত সাহিত্য কীর্তি হত না। এর অভিনয় পদ্ধতি এবং কলা-কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ও অনন্য। প্রচলিত নাট্য পদ্ধতিতে আমরা জানি, কবিরা নাট্য রচনা করেন —অভিনেতারা তা শিক্ষা করে মঞ্চে আসেন। কিন্তু কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের আমরা কোন লিখিত নাট্যরূপ পাই না। এতে থিয়েটারের ম্যানেজার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য (Scenario) রচনা করে উইংসের পেছন দিকে অভিনেতাদের প্রবেশ পথে আটকে রাখতেন অভিনেতারা তাতেই

তাদের কর্তব্যকর্মের একটা মোটামুটি নির্দেশ পেত। নাটকের চরিত্রগুলি সকলি প্রায় এক একটি টাইপ চরিত্র হত, তাদের পোষাক, মুখোশ ইত্যাদি দ্বারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট চরিত্রগুলি বোঝা যেত। কথোপকথন এবং আচার আচরণ তারা নিজেরাই প্রয়োজন মত তৈরী করে নিত। এখানে আমরা কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে নাটকের খানিকটা চিত্রনাট্যের অংশ উদ্ধৃত করে তার সাহায্যে এর অভিনয় পদ্ধতি এবং মঞ্চ পরিকল্পনা বোঝাবার চেষ্টা করব। ধরা যাক "পুল্‌চিনেল্লা" (Pulcinella) এবং "কোভিয়েল্লো" (Coviello) এই দু'টি চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করছে—তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যে সাধারণ নির্দেশ পেল তা ছিল এই রকম—

পুল্‌চিনেল্লা প্রবেশ করল সমুদ্রযাত্রা থেকে—সে ঝড়ের কথা বলল, জাহাজ ডুবির কথা বলল, বলল তার সঙ্গী সাথী এবং প্রভুকে হারানোর কথা। এই সময়ে কোভিয়েল্লো প্রবেশ করল, মঞ্চের অন্যদিক দিয়ে সেও পুল্‌চিনেল্লার অনুরূপ কথাগুলিই বলে গেল। তারা পরস্পরকে দেখল এবং ভয়ের ভান (Lazzi করল পরিশেষে পরস্পরকে স্পর্শ করার অভিনয় করে তারা অনুভব করল যে তারা দু'জনেই বেঁচে আছে, তখন তারা প্রভু ও সঙ্গীদের হারানোর কথা বলতে লাগল।

এই চিত্রনাট্য অনুযায়ী কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের ভ্রাম্যমাণ দরিদ্র পেশাদারী একটি দল এসে হয়তো এক স্কোয়ারের এক কোণায় একটি প্লাটফর্ম স্টেজ দাঁড় করাল। মঞ্চের সম্মুখে কয়েকটি বেঞ্চি দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। আর তার চারদিক দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার বিস্তৃত স্থান জুড়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা। অভিনেতারা এখন যে নাটকের অভিনয় করবে তার নাম "ইন্‌চান্‌টেড্‌ আর্কেডি বা আর্কেদিয়া ইন্‌কানতাতা" (Enchanted Arcady or Arcadia Incantata) দৃশ্যসজ্জা বলতে যা আছে তা অতি সামান্য—মঞ্চের দুই পাশে দু'টি লম্বা বাক্সের আকৃতি "সাইড্‌ উইংস্‌" (Side wings) এবং পশ্চাদ্‌দিকে একখানা পশ্চাৎপট তার গায়ে অরণ্য বোঝাবার জন্য গাছপালা অঙ্কিত রয়েছে। জনতার মাঝে অভিনেতাদের একটি মাথার টুপি ঘুরছে—জনতা দর্শনীর পয়সা তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। চারদিকে প্রবল হট্টগোল কিন্তু তা হঠাৎই থেমে গেল—একজন অভিনেতা ধীরে ধীরে এবার মঞ্চে এগিয়ে এল। তার দেহের ভারি আলখাল্লাটার গায়ে নানা রকম জ্যোতির্বিদ্যার

চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। মুখে তার এক মুখোশ, হাতে চামড়া বাঁধান বিরাট এক পুঁথি অন্য হাতে বাঁকানো এক লাঠি। দেখেই বোঝা যায় সে একজন জাদুবিদ্। সে এসে মুখবন্ধ করল—এগুলি কিন্তু সম্পূর্ণই তার স্বরচিত কথা। সে জানাল, সে এই আর্কেডিয়া দ্বীপের হাঁদা বোকা রাখাল ও জলপরীদের একমাত্র অধিপতি তবে সে তার জাদুবিদ্যায় জানতে পেরেছে যে এখানকার নিরালা শান্তি ভঙ্গ করতে শীগ্‌গিরই আগন্তুকরা আসবেন। ভূমিকার পর ম্যাজিসিয়ান চলে গেল।

বনানী অঙ্কিত যে পশ্চাৎপট ছিল এবার তা পরিবর্তিত হয়ে ঝড়ের সমুদ্র অঙ্কিত আর তাতে দূর পাহাড়ের গায়ে একটি ভাঙ্গা জাহাজ এই দৃশ্য দেখা গেল। একদিকের উইংস্ থেকে একটি ছেঁড়া পরিচ্ছদ পরা, কুঁজো, লম্বা নাক ও কোঁচকান ভ্রূ—মুখোশ মুখে ব্যক্তি এগিয়ে এল, তাকে চিনতে কারোই কষ্ট হল না—কারণ বহু নাটকেরই একচ্ছত্র নায়ক সে—সে হল পুল্‌চিনেল্লা। সে এসে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করল কেমন করে জাহাজ ডুবি হয়ে আর সকলেই মারা গেছে এবং সে একা বেঁচে আছে। বলতে বলতেই অন্যদিক দিয়ে অদ্ভুত সাজপোষাক ও লম্বা নাক মুখোশ পরা দ্বিতীয় চরিত্র ঢুকল। তার চোখে এক মস্ত চশমা, ফাঁপানো ট্রাউজার, ছোট ক্লোক, টুপিতে দু'টো লম্বা পালক গোঁজা। সেও বহু পরিচিত চরিত্র কোভিয়েল্লো—সে এসে পুল্‌চিনেল্লার কথাগুলিই প্রায় বলে গেল, জানাল জাহাজ ডুবিতে একমাত্র সেই বেঁচে আছে। তারা কেউই কিন্তু কাউকে তখনো দেখতে পাচ্ছে না—দু'জনেই অন্যমনস্কভাবে কথা বলতে বলতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে—তারপরে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল অন্যজন নিশ্চয়ই ভূত। পরে পরস্পরকে স্পর্শ করে বুঝল তারা দু'জনই জীবিত। তারা চলে গেল—এরপরে আর একজোড়া হাস্যকর চরিত্র এসেও অনুরূপ আচরণই করল—তখন চারজন মিলিত হল।

দৃশ্য আবার পরিবর্তিত হল পশ্চাৎপটে বনভূমি দেখা গেল। চারজন গ্রাম্য লোক এল—তার মধ্যে রাখাল সিল্‌ভিয়ো (Silvio) দর্শকদের জানাল যে সে রাখালিনী ক্লোরিকে (Clori) ভালবাসে এবং ক্লোরি-ফিলেনোকে (Fileno) ভালবাসে, আবার ফিলেনো ভালবাসে ফিল্লিকে (Filli) এবং ফিল্লি ভালবাসে সিল্‌ভিয়োকে। এরপরে মন্দিরের পুরোহিতরা, গ্রামবাসীরা,

সেই চারজন আগন্তুক—প্রেমিকদের দল এবং সর্বোপরি দ্বীপের অধিরাজ জাদুবিদ্—সকলে মিলে নানান হৈ-হট্টগোল জুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পেল এবং নাটকের শেষ হল। অবিশ্যিই দেল্ আর্তের এই তুচ্ছ ব্যঙ্গ-নাট্য সমকালের মহাকবিকে প্রভাবান্বিত করেছিল—তাই এই কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দ্য টেম্পেস্ট ও এ মিড্‌সামার্ নাইট্‌স্ ড্রিম নাটককে।

এখানে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা যে মঞ্চোপকরণের বর্ণনা পেলাম তা নিঃসন্দেহে অতিশয় নগণ্য। একটি অস্থায়ী কাঠের প্লাটফর্ম তার দু' পাশে চট দিয়ে ঘিরে অভিনেতাদের জন্য খানিকটা জায়গা করে নেওয়া, পেছনে দু' একটি কাঁচা হাতের আঁকা দৃশ্যপট, ও দু'পাশে দু'টি উইংস্। উপকরণের যেমন এই দৈন্য দশা, নাটকও তেমনি অবয়বশূন্য একটি খসড়া মাত্র। অতএব কমেদিয়া দেল্ আর্তের নাট্য রূপায়ণে আগাগোড়াই স্বপ্রধান হয়ে যারা থাকত তারা হল অভিনেতারা। অভিনেতাদের তাই বহুকালের অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত ও বহুবিদ্যায় পারদর্শী হতে হত। মঞ্চে উঠে প্রয়োজনীয় কথোপকথন তাদের নিজেদেরই তৈরী করে চালাতে হত। উপরন্তু উপকরণের সর্বাত্মক অভাবও তাদের স্বচ্ছন্দ অভিনয় কৌশল দ্বারা মিটিয়ে নিতে হত, এই ব্যবসায়িক অভিনেতৃগোষ্ঠীর যেমন অভিনয়ে ছিল অবাধ স্বাধীনতা, তেমনিই আবার তাদের কতকগুলি প্রথা মেনে চলতে হত। সাধারণভাবে দেখা যায় যে একই চিত্রনাট্য অবলম্বনে কমেদিয়া দেল্ আর্তের একই দলের কোন দু'টি অভিনয়ও একই রকম হত না। কারণ প্রতি অভিনয়কালেই অভিনেতারা তাদের খুশিমত কথোপকথন ও ক্রিয়া বানিয়ে নিত। তার কোন ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। কিন্তু রীতি অনুযায়ী তাদের চরিত্রের মুখোশ, পোষাক ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যটি অটুট রাখতেই হত, তাছাড়া যে যেমন ভাবেই কথাবার্তা বলুক বা অভিনয় চালাক না কেন, শেষ পর্যন্ত খুব কৃতকার্যতার সঙ্গেই তাদের নাটকটি মিলিয়ে দিতে হত। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতকের রচিত প্রায় ৮০ খানা এই শ্রেণীর চিত্রনাট্য পাওয়া গেছে। সংখ্যায় তারা অধিক হলেও কাহিনী বা চরিত্র সৃজনের মধ্যে তাদের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। একই জিনিস একটু অদল বদল।

যখন নোতুন কোন একটা নাটক সুরু করা হত অথবা পুরানো নাটকেরই

পুনরভিনয় করা হত, তখন দলের অধিনায়ক চিত্রনাট্য পাঠ করে অভিনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন। তিনি নাটকের ক্রিয়া, অঙ্গাভিনয়ের কার্য এবং মঞ্চ উপাদানের ব্যবহার ব্যাখ্যা করে দিতেন।

সৌভাগ্যক্রমে দু'জন ইতালীয় সমালোচক ১৭শ শতকের শেষভাগের কমেদিয়া দেল্ আর্তে সম্পর্কে লিখে গেছেন। তখনও এই শিল্প বেঁচে ছিল, এর মধ্যে আমরা ৭০০ খানা চিত্রনাট্যের নকশা পাই। এর প্রায় সব নাটকই কমেডি, কতকগুলি প্যাস্টোরাল ধরনের আর কতকগুলি ট্র্যাজি-কমেডি।

এই সমস্ত অভিনেতাদের বহু বিষয় সম্পর্কেই সযত্নে শিক্ষা লাভ করতে হত, তারা অধিগত করে রাখত মানুষের সাধারণ স্থায়িভাবগুলি, প্রেমের হতাশা ও উন্মত্ততার বাক্য ও অভিব্যক্তি এবং কি করে দর্শককে হাসানো ও ঠকানো যায় সেই কৌশল।

কমেদিয়া দেল্ আর্তের মধ্যে এক প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক অভিনয়াংশ ছিল। চিত্রনাট্যের মধ্যে পরিচালক হয়তো কৌতুক চরিত্রের দু'জন অভিনেতা "ৎসান্নি"র (Zanni) জন্য নির্দেশ দিয়ে রাখতেন "লাৎসি অব্ ফীয়র" (Lazzi of fear)। অভিনেতারা তাতেই বুঝে নিত তাদের কি করতে হবে—এতে তাদের এক সুপরিকল্পিত নির্দিষ্ট অভিনয় চাতুর্য দেখাতে হত (Stock business)। তা ছিল এক ধরনের রঙ্গাভিনয় অথবা "ভান" দেখানো। এর জন্য কতকগুলি কবিতা তারা রচনা করে নিত, আবার তার সঙ্গে অঙ্গাভিনয় ও আহার্যিক অভিনয়ও যুক্ত হত। সেক্ষেত্রে মূল ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই থাকত না। যেমন দু'জন প্রেমিক যখন তাদের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছে—তখন হয়তো একজন চাকর মঞ্চের উপর এসে এক কাল্পনিক মক্ষিকা ধরতে সুরু করে দিল, অথবা তার টুপি থেকে চেরীফল বের করে খেতে সুরু করল এবং আঁঠিগুলি ছুড়তে লাগল প্রেমিকদের মুখে। কমেদিয়া দেল্ আর্তের নাটক কিংবা মঞ্চ নয়, তার অপর দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তাকে দিয়েছে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ও অমরতা। তার একটি হল সুচতুর, সুকৌশলী অভিনয়ক্রিয়া—যা স্পেনে ও ফ্রান্সে দীর্ঘকাল ধরে অনুকৃত হয়েছে এবং পেয়েছে উদ্দাম জনপ্রিয়তা, আর এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ছকে বাঁধা কতকগুলি নির্দিষ্ট চরিত্র—যা অভিনেতারা নিজেদের স্বাধীন প্রেরণায় ধীরে ধীরে সৃজন করে তুলত। তার বহু চরিত্র ও চেহারাই এখনো আমাদের পরিচিত। তা দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের ক্রিসমাস্

প্যান্টোমাইমসের অনুষ্ঠানে আবার রয়েছে ইউরোপীয় রেডিও, টেলিভিশন্‌ বা বার্লেস্ক ধরনের নাটকের চরিত্র চিত্রণে।

দেল্‌ আর্তের এক একটি দল সাধারণতঃ সাতজন পুরুষ এবং তিনজন নারী নিয়ে গড়ে তোলা হত। এদের মধ্যে প্রায়ই চারজন হত প্রেমিক চরিত্র—তারা সে সময়কার প্রচলিত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাদের পোষাক পরত। অভিনেতাদের এক একজনকে বরাবর একই চরিত্রের অভিনয় করে যেতে হত। কতকগুলি চরিত্রে অন্য চরিত্রের সংঘাতে কিছু কিছু পরিবর্তন এসে যেত। কতকগুলি কিন্তু একেবারেই অপরিবর্তিত থাকত।

কমিক্‌ চরিত্রগুলি হত বহুশ্রেণীর তার মধ্যে প্রায় সব সময়ই দু'জন বৃদ্ধ লোক থাকত—এই চরিত্রের মূল উৎস ছিল, রোম ও গ্রীসের ফার্স। এই বৃদ্ধ চরিত্রের একজন ছিল "পান্‌তালোন্‌" (Pantalone) এবং অন্যজন অর্থপিশাচ ভেনিসীয় চরিত্র। পরবর্তীকালে এই দ্বিতীয় চরিত্রটির দেখা আমরা শেক্‌সপীয়র ও মলিয়েরের রচনায় পেয়েছি। আর একটি চরিত্র ছিল একজন আইনের "দোত্তোর্‌" (the Dottore) এছাড়া থাকত পাদুয়া আকাদেমির একজন ছাত্র, একজন হামবড়া "কাপিতানো" (Capitano)। ৎসান্‌নির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, এই ৎসান্‌নিরা হত একদল অল্পবয়সী ক্লাউন চরিত্র এবং নিপুণ নৃত্যশিল্পী। এই শ্রেণীর হাঁদা বোকা চাকর "আর্‌লেকিনো"-ই (Arlecchino) পরে বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ চেহারা নিয়ে এসে হয়ে উঠেছিল —"হার্‌লিকুইন্‌" (Hárlequin)। এ ছাড়া "পেদ্রোলাইনো" (Pedrolino) ফরাসী প্রভাবে হয়ে উঠেছিলো "ফ্রেঞ্চ পিয়েরো" (French Pierrot) আর পুল্‌চিনেল্লা চরিত্র থেকে হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত "পাঞ্চ" চরিত্র (English Punch)। অন্যদিকে দেল্‌ আর্তের ষড়্‌যন্ত্রকারী, গোপনতাপ্রিয় নায়িকা চরিত্র "কলোম্বিনা"ই (Colombina) পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীকালে হয়েছে "কলাম্বাইন্‌" (Columbine) চরিত্র।

এই সমস্ত দলগুলি অতি সামান্য মঞ্চোপকরণ নিয়ে গ্রামে নগরে অভিনয় করে বেড়াত, আবার তারা যদি অভিজাতদের সুনির্মিত মঞ্চে কখন অভিনয়ের সুযোগ পেত তখন কিন্তু তারা সর্বপ্রকার দৃশ্যসজ্জা ও যান্ত্রিক পদ্ধতির সুযোগই গ্রহণ করত।

নাট্যোন্নতির ইতিহাসে কমেদিয়া দেল্‌ আর্তের অবদান যথেষ্টই ছিল, তবুও আবার এরই মধ্যে সেই কারণ নিহিত হয়ে আছে যে জন্য রেনেসাঁস্‌

যুগের ইতালি কোন শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করতে পারে নি। শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বা কমেডি সৃষ্টির জন্য থিয়েটারের সমগ্র চেষ্টাই একমুখী ও কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন; অল্প এবং খাপছাড়া চেষ্টায় তা হয় না। ইতালির নাট্য প্রচেষ্টা ও মঞ্চের শক্তি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃতী সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অভিজাত সৌখিনদলদের সঙ্গে কখন যুক্ত হয়নি কারণ এই সৌখিনদলগুলি ছিল অত্যন্ত প্রাণহীন, বিধিনিয়মের নিগড়ে বাঁধা, তাঁদের জীবন ধারাও ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আর যারা ছিল এই জনপ্রিয় ব্যবসায়িক ধারার তাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু উচ্চাঙ্গের সৃজন কার্যের মত কোন শিক্ষা, মার্জনা, কিংবা অপর কোন সুযোগই এই দরিদ্র ভ্রাম্যমাণ দলের ছিল না। তারা সামান্য উপকরণ নিয়ে সহজ আনন্দ বিতরণ করেই জীবিকা উপার্জন করত।

রেনেসাঁস্ যুগের ইতালি স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, কাব্য-সাহিত্য এবং মঞ্চ কৌশলে উন্নতি করা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করতে পারেনি। এযুগের অভিজাত মঞ্চে দৃশ্যসজ্জার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করা হয়েছিল কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে, নূতন নাটকের চেয়ে গ্রীক ও রোমান নাটকের অনুবাদ ও অন্ধ অনুকরণের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। নাট্যকাররা পণ্ডিতদের নাট্য-তত্ত্বের বিধিনিষেধের বেড়া কখন তো অতিক্রম করতে পারেনই নি, এমন কি যে ভাষায় দান্তে, পেত্রার্ক অমর কাব্য রচনা করেছেন—তাঁদের সেই মাতৃভাষাও অভিজাত নাটকে ব্যবহার করতে পারতেন না, লিখতে হত ল্যাটিন ভাষায়।

এর মূল কারণ খুঁজতে হলে আমাদের কিন্তু যেতে হবে ইতালির তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সন্ধানে, ইতালি এই সময়ে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল তাদের আলাদা আলাদা সার্বভৌম শাসনকর্তা ছিলেন, অথবা স্পেন, ফ্রান্স বা পোপ (Holy Roman Empire) দ্বারা শাসিত হত। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ এবং মারামারি লেগেই থাকত। হত্যা খুনাখুনি সর্বদাই হত। কৃষ্টিসম্পন্ন সুমার্জিত মানুষ, যাঁদের বলা যায় সম্পূর্ণ মানুষ (The Complete man) যাঁরা সেকালের শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতবোদ্ধা এবং রসিক ছিলেন—তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর—আর এঁদের আশেপাশে ছিল অত্যন্ত অসংস্কৃত অগণ্য জনসাধারণ। এখন একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে যে নাটক ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার শিল্প প্রচেষ্টায় এই সময়ে ইতালি

অভূতপূর্ব উন্নতি দেখাল কি করে? এর উত্তরও অতিশয় সহজ—অন্যান্য শিল্প অর্থাৎ চিত্রশিল্প, কাব্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পীর একেবারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, ব্যক্তিগত এক্তিয়ারের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে—কিন্তু থিয়েটারের জন্য প্রয়োজন গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টা—সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সেখানে সার্থকতা নেই। থিয়েটার শিল্প তাই সর্বকালেই প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনের একখানি প্রাণবন্ত ইতিহাস।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ইতালির নাটক ও থিয়েটার অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে, অত্যন্ত সীমিত দর্শকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের কোন রঙ্গালয়ই ছিল না, এর দর্শকরা ছিলেন, "দ্যা লিভিং স্টেজ" গ্রন্থের লেখা উদ্ধৃত করে বলা যায়—

"সেই বিদ্বান ব্যক্তিরা যাঁরা অনেক সময়ই হতেন পাণ্ডিত্যাভিমানী; ছিলেন সেই যাজকরা—যাঁদের অধিক আকর্ষণ ছিল পার্থিব বিষয়ের প্রতি। আর ছিলেন রাজসভার লোকেরা যাঁরা ছিলেন সবকিছুতেই অমিতাচারী।[১]

ইতালির দর্শকরা ভালয় মন্দে মেশান স্পেনের "লোপে দ্য ভেগা" (Lope de Vega) বা ইংল্যাণ্ডের শেকৃসপীয়রীয় দর্শকদের মত কোন কালেই ছিল না—আর ছিল না কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের স্পেন বা ইংল্যাণ্ডের মত কোন সাধারণ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সাধারণ রঙ্গালয়। ললিতকলা বা চিত্রশিল্প, চার্চের দেয়ালে বা অভিজাতদের রক্ষণশালায় বাঁচতে পারে কিন্তু নাটক সঞ্জীবিত থাকতে পারে একমাত্র সাধারণ রঙ্গালয়ে। থিয়েটার শিল্প—নাট্যকার, অভিনেতা এবং দর্শক এই তিনের পূর্ণাঙ্গ সম্মিলন ছাড়া কখনই সার্থক হয় না। আর শেষ পর্যন্ত ইতালি যখন প্রচুর উপকরণ নিয়ে সত্যিই সাধারণ রঙ্গালয় তৈরী করল, সেখানে অভিনীত হওয়ার মত কোন নাটক রইল না। অপেরা এসে জায়গা জুড়ে বসল।

এই রেনেসাঁস্ যুগের ইতালীয় মঞ্চই কিন্তু সমগ্র ইউরোপের পথপ্রদর্শক হয়েছিল এবং তার নাটকের প্রভাবও কেবল সে যুগেই নয়, সারা ইউরোপে ১৭শ—১৮শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তবুও সেখানে অমর নাট্যসৃষ্টি ও নাট্যপ্রয়োগ হয়নি—এই পরস্পর বিরোধী সত্য আমাদের চমকিত করে। রেনেসাঁস্ যুগের ইতালিতে নাটকীয় উদ্দীপনার কোন অভাব ছিল না, কেবল অভাব ছিল অতি সূক্ষ্ম শক্তি সাম্যের, যার ফলে একটা মহৎ নাটকীয় কীর্তি গড়ে উঠতে পারেনি।

॥ রেনেসাঁস্ ॥

স্পেনের স্বুবর্ণ যুগ

স্পেনের মধ্যযুগের নাটকও ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীর অনুরূপই ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। স্পেনে মধ্যযুগের সূচনা একটু দেরি করেই হয়, কারণ এদেশের প্রধান অংশের উপর প্রাচ্য মুসলমান মুর জাতির রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল দীর্ঘকাল ধরে—অন্য দিকে ছিল ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য। ফলে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় নাট্যধারার আবির্ভাব এখানে যেমন একটু দেরিতে হয়েছিল তেমনি প্রাচ্য মুর সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে ধর্মীয় নাট্যধারার মাঝেও স্বতঃই এসে গিয়েছিল জীবনধর্মিতা। দ্বাদশ শতকে যখন স্পেনের অর্ধাংশ মুর শাসনমুক্ত হয়—তখন আমরা "ম্যাগির" (Magi) নবজাতক যীশুকে দর্শনের কাহিনী নিয়ে মিস্ট্রি নাটক রচিত হতে দেখি। এরপর থেকে স্পেনে চলেছে অবিসংবাদী ক্যাথলিক প্রাধান্য—রেনেসাঁস্ যুগের রিফর্মেশন আন্দোলনের ঢেউ স্পেনের উপকূলে পৌঁছয়নি। তাই ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে আরো দু'শ বছরের বেশিকাল স্পেনে ধর্মীয় নাটক টিকে ছিল এবং এই শ্রেণীর ধর্মীয় নাটক অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রখ্যাত নাট্যকারদের দ্বারাও রচিত হয়েছে; চার্চের মধ্যে অবিশ্যিই গোঁড়ামি ছিল—কিন্তু স্পেনের জনসাধারণের উপর ছিল প্রাচ্য প্রভাব,—তারা ভালবাসত কাব্যগাথা, রোমান্স এবং কমেডি, শুনতে চাইত মহৎ চরিত্রের বীরত্ব গাথা, জীবনের কোন পরম সত্য। ১৫০০ শতক থেকে স্পেনে কিছু কিছু জীবনধর্মী নাটক রচিত হতে থাকে এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই সেই নাটক এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের সমতুল্য হয়ে ওঠে।

স্পেনে প্রথম ধর্মীয় এবং জীবনধর্মী এই উভয় শ্রেণীর নাটকেরই আরম্ভ হয়েছিল "অটো" (Autos = actions or acts) নামে এক বিশেষ ধরনের নাটককে অবলম্বন করে। "কর্পাস্ ক্রিষ্টির" (Corpus Christi) উৎসবেই এই ধরনের অটো নাটকের অভিনয় সুরু হয়, প্রথম অবস্থায় এর কাহিনী বাইবেল থেকে অথবা সন্তদের জীবনী থেকে নেওয়া হত। এই "অটো স্যাক্রামেণ্টা"র (Auto Sacramenta) সঙ্গে ফরাসী মিস্ট্রি নাটকের বিশেষ

মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এর সমতুল্য বলা যায় ইংরেজী মর‍্যালিটি নাটককে। "অটো স্যাক্রামেণ্টালিজের" (Auto Sacramentales) মূল বিষয়বস্তু ছিল—সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম অতিক্রম করে শেষ বিচার পর্যন্ত (from the Creation, through the Nativity, to the Day of Judgement) কিন্তু বাইবেলের এই প্রথম সৃষ্টি থেকে শেষ বিচারের কাহিনীর সঙ্গে স্পেনীয় নাট্যকাররা কিংবদন্তীর বিষয়বস্তুও মেশাতে লাগলেন। বাইবেলের চরিত্রগুলি হয়ে দাঁড়াল তৎকালীন মানুষেরই চরিত্র—শয়তান হয়ে উঠল জলদস্যু বা মুরদেরই প্রতিকল্প। তাছাড়া মানব চরিত্রের দোষ, গুণ বা চিন্তাগুলিও রূপ পরিগ্রহ করে এল। মৃত্যু, সদ্‌গুণ, ঈর্ষা ইত্যাদির চরিত্ররূপ দর্শকরা চোখের সম্মুখে দেখতে পেল, যেমন দেখা যেত ইংরেজী মর‍্যালিটি নাটকে। স্পেনের থিয়েটারে অনেক সময় কল্পিত দৈত্য মূর্তি-পরিগ্রহ করে দেখা দিত—অভিনেতারাই এই অদ্ভুত দৈত্য রূপ ধারণ করত এবং মঞ্চে দিব্যি চলাফেরা করে বেড়াত। আমরা ইউরোপের সর্বত্রই দেখেছি চার্চের হাত থেকে মধ্যযুগীয় নাট্যাভিনয় ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, স্পেনেও তেমনি পুরোহিতদের হাত থেকে এই সকল অভিনয় ব্যবস্থা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কারুশিল্পীদের হাতে প্রথমে আসতে লাগল, কিন্তু স্পেনের নগর-পিতারা ক্রমশঃই প্রধান হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরাই হয়ে উঠলেন থিয়েটারের ব্যয়বহনকারী কর্তা। প্রথম দিককার অটোর অভিনয় করত পুরোহিতরা ও ব্যবসায়ীরা, কিন্তু নগর-পিতারা অভিনয়ের জন্য শারীরিক কসরতকারী ও নৃত্যশিল্পীদের ভাড়া করে আনতে লাগলেন, ফলে পরবর্তী দু' শতকের মধ্যে বহু পেশাদার দল গড়ে উঠল, তারাই এক সময়ে লোপে দ্য ভেগা বা কল্‌দেরোনের মত শ্রেষ্ঠ স্পেনীয় নাট্যকারদের শতাধিক অটোর সার্থক অভিনয় দেখিয়েছে।

স্পেনীয় নাট্যাভিনয়ের একটি অনন্য গুণ ছিল, যে স্পেনীয়রা সব সময়েই মঞ্চে নৃত্য ভালবাসত তাই সর্বপ্রকার নাট্যাভিনয়ে এমন কি চার্চেও নৃত্য প্রচলিত ছিল।

স্পেনের অটো নাটকের অভিনয় অনেক সময়ই চার্চের প্রাঙ্গণ ছেড়ে ইংরেজী মিস্ট্রি নাটকের মত নগর পরিভ্রমণ করে বেড়াত এবং বিভিন্ন স্থানে অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করে দেখাত। স্পেনীয়রা তাদের এই

ভ্রাম্যমাণ পেজ্যেন্ট ওয়াগন্‌কে বলত "কারোজ্" (Carros) এবং তাদের এই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারকে বলা হত "দ্যা ফেস্টিভাল্ অব্ দ্যা কার্টস্" (The Festival of the carts). এগুলিকে ওয়াগন্ বা "ফ্লোট্‌স্" (Floats) অর্থাৎ চলমান ভেলাও বলা হত। এগুলি আকারে হত সুবৃহৎ এবং আড়ম্বরযুক্ত। এই নাট্যাভিনয়ের দু'টো পদ্ধতিকে একান্তই স্পেনীয় বলা যায়। স্পেনের ওয়াগন্ যখন রাস্তার কোন নির্দিষ্ট স্থানে অভিনয় দেখানোর জন্য দাঁড়াত তখন তার পেছনে একটি প্লাটফর্ম দাঁড় করান হত—এই প্লাটফর্মটির উপরই বিশেষ দৃশ্যগুলির অভিনয় হত। দ্বিতীয়তঃ স্পেনে আর এক ধরনের মঞ্চ ছিল তাকে বলা হত "লা রোকা" (La Roca) এগুলি কেবল বড় বড় শোভাযাত্রার সময় ব্যবহৃত হত, এও ছিল এক বিরাট প্লাটফর্ম তা বারোজন লোক বহন করে নিয়ে চলত। এই রোকার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন যীশু, মেরী এবং অন্যান্য সন্তরা।

১৪০০ শ শতকে স্পেনে মাল্টিপল্ স্টেজ আসে। তারপর থেকে প্রায় ১৮০০ শ শতক পর্যন্ত এর জনপ্রিয়তা থেকে যায়। অটো স্যাক্রামেণ্টায় অনেক সময় একসঙ্গে পাঁচটি ম্যানসনস্ বা সেটের ব্যবহার পাওয়া যায়। ফরাসী ধারায় একটি লম্বা মঞ্চেই এগুলি একসঙ্গে সজ্জিত থাকত। আবার এমন সেটিং-এর উল্লেখও পাওয়া যায়, যা একটির উপর আর একটি স্তরে গ্রথিত থাকত—অর্থাৎ তিনতলা বাড়ির মত। এর তিনটি স্তরেই পরপর অভিনয় দেখানো হত। এ ধরনের মাল্টিপল্ মঞ্চের ব্যবহার অনেক সময় রাস্তার অভিনয়েও দেখা যেত।

অটো স্যাক্রামেণ্টার অভিনয় পদ্ধতি ও মঞ্চ পরিকল্পনার এক সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় জর্জ টিক্‌নরের (George Ticknor) ১৮৬৩ খ্রী: রচিত স্পেনীয় সাহিত্যের ইতিহাস (History of Spanish Literature) গ্রন্থে। এতে "অরফিও" বা "দ্যা ডিভাইন অরফিউজ্" (The Divine Orpheus) নাটকের অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এই নাট্য পরিচালনার বিরাট আড়ম্বরের মাঝে রেনেসাঁস্ যুগের ইতালির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই অনুভূত হয়। এই বর্ণনায় রয়েছে বিরাট শোভাযাত্রা এসে পথের বিরতিতে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াত। রাস্তার মাঝখানে অস্থায়ী মঞ্চে সর্বপ্রথম টেনে নিয়ে আসা হত বিরাট আকৃতির কালো রং-এর নৌকাকৃতি এক গাড়ি। তাতে দেখা যেত জলদস্যুর পোষাকে দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকারের রাজকুমার (Prince of

Darkness) ; আর সেই নৌকার হাল ধরে আছে অসূয়া (Envy)। দু'জনে তরণী বেয়ে পার হয়ে আসছেন সৃষ্টির পূর্বেকার আকারহীন বিশৃঙ্খলা, মঞ্চের অপর দিক দিয়ে সৌরগোলকাকৃতির আর একটি গাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল তার গায়ে গাছপালার নিদর্শন চারদিকে তারকামণ্ডল, আর সেই গাড়ি থেকে ভেসে আসছে সুদূরাগত এক বংশীধ্বনি। এই সৌরগোলকে রয়েছেন অর্‌ফিউজ্—তিনিই হলেন বিশ্বস্রষ্টার রূপকমূর্তি (Creator of the things) এরপরে এল তৃতীয় গাড়ি এক পার্থিবগোলক নিয়ে তার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে সাতদিন ও মানব-প্রকৃতি।

এরা সকলে একে একে এসে মঞ্চে পৌঁছল, তখন স্বর্গীয় চরিত্র অর্‌ফিউজ্—তাঁর গীতিকাব্যে সঙ্গীত লহরী বিস্তার করে সৃজন কার্য সুরু করলেন। যতই তাঁর কাজ এগিয়ে চলতে লাগল, ততই এক একটি করে দিবস তাদের আদিম ঘুম ভেঙে জেগে উঠে সম্মুখে এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পোষাক পরিচ্ছদও ছিল ইঙ্গিতধর্মী। সর্বশেষে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল মানব-প্রকৃতি—সে এগিয়ে এল নারীরূপে সেই হল এই কাহিনীর "ইউরিডাইস্" (Eurydice) স্বর্গে তার নিত্যসঙ্গী ছিল 'সুখ' (Pleasure) জেগে উঠে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আনন্দে সে তার স্রষ্টার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে উঠল। ক্রমশঃ লোভ ও মোহ আসতে লাগল, ফলে মানব-প্রকৃতির পতন অনিবার্য হয়ে উঠল, প্রথম কালো নৌকায় অসূয়াকে নিয়ে এসেছিলেন যে অন্ধকারের অধীশ্বর তিনি এবার পাপপূর্ণ মানব-প্রকৃতিকে তাঁর অন্ধকার সাম্রাজ্যে টেনে নিলেন। কিন্তু তা স্বল্পকালের জন্য। বিশ্বস্রষ্টা অর্‌ফিউজ্ তখন আবার মঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করলেন, প্রথমে তিনি মানব-প্রকৃতির এই পতনে বেদনা বিধুর হয়ে কাঁদলেন, তারপরে ধীরে ধীরে তুলে নিলেন তাঁর বীণা—গাইলেন ভালবাসা ও বেদনার গান। ক্রমশঃ তিনি তাঁর সর্বশক্তিমান রূপ গ্রহণ করলেন এবং বজ্রহাতে অন্ধকার রাজ্য বিদীর্ণ করে মানব-প্রকৃতিকে উদ্ধার করে এনে, তাকে সাতদিন বা সপ্তাহের ব্যাপ্তির মধ্যে স্থাপন করলেন। এরপর দর্শকদের সানন্দ সংবর্ধনার মধ্যে নৌকাগুলি আবার শুভযাত্রা আরম্ভ করল তাদের নবতর গন্তব্য স্থানের দিকে।

স্পেনের অটো নাটকের মিস্ট্রি ধারার অভিনয় প্রায় চারশ বছর ধরে জনসাধারণের নাট্যতৃষা মিটিয়েছে। এই চারশ বছরে নাটক, দৃশ্যসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বদিকেই স্থানে স্থানে কালে কালে অটোর

মধ্যে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন। প্রথমে অটোর রঙ্গালয় বড় বড় ক্যাথিড্রাল ও চার্চের প্রাঙ্গণে হত, বিশেষ অনুষ্ঠানে তা রাজপথে শোভাযাত্রা করে বের হত। ক্রমশঃ অটো জনসাধারণের হাতে এসে পড়ল। অটোর দল গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরে বেড়িয়ে অভিনয় দেখাতে লাগল। এতে যে কেবল ধর্মীয় নাটকের অভিনয়ই হত তা নয় প্রখ্যাত নাট্যকারদের নাটকের অভিনয়ও অটো পদ্ধতিতে হত। যেমন সার্‌ভান্টিসের (Cervantes) বিশ্ববিখ্যাত রচনা ডন্ কুইক্‌জোটেরও (Don Quixote) অটো অভিনয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্পেনে যখন স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হতে লাগল তখনও ভ্রাম্যমাণ অভিনেতৃদল যথেষ্ট ছিল। স্পেনের প্রথম প্রখ্যাত নাট্যকার "লোপে দ্য রুয়েদার" (Lope de Rueda) দল ছিল তাদেরই অন্যতম, তিনি নিজে নাটক রচনা করে নিজের এই ভ্রাম্যমাণদল নিয়ে তার অভিনয় দেখাতেন। এই সমস্ত দলগুলি হত খুব ছোট, কোন দলে থাকত একজন মাত্র ভ্রাম্যমাণ অভিনেতা আবার কোন দলে থাকত দু'জন তিনজন বা ততোধিক। এই সব নাটকে কিশোর বালকেরা স্কার্ট পরে নারী চরিত্রের অভিনয় করত।

॥ রাজসভা ও স্কুলের নাটক ॥

অটোর এই মৌলিক ধারা ছাড়া রেনেসাঁস্ আন্দোলনের প্রারম্ভে ইতালি ও ইংল্যাণ্ডের মতই এখানেও কতকগুলি ক্লাসিক্ ধরনের নাটক রচিত হয়েছে, সেগুলি হত যথারীতি গ্রীক ও রোমান নাটকের অনুবাদ, অথবা তার পূর্ণ অনুকরণ। কখন কখন কাহিনীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ছায়া সম্পাতও পাওয়া যেত। এই সমস্ত নাটকের ভাষা হত স্পেনিস বা ল্যাটিন। এই সব নাটকের অভিনয় হত অভিজাতদের প্রাসাদসমূহে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কক্ষে।

স্পেনের স্বর্ণ যুগের শেষ রাজা চতুর্থ ফিলিপ (Philip IV) থিয়েটারকে একান্তভাবে ভালবাসতেন। তাঁর রাজসভায় বহু সংখ্যক নাটকেরই অভিনয় হয়েছে। তিনি রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকীয় দৃশ্যাবলী রচনার জন্য ইতালি থেকে অর্থ ব্যয় করে শিল্পী ও স্থপতিদের আনিয়েছিলেন। রাজ উদ্যানে কৃত্রিম জলাশয়ে অভিনেতা ও দর্শকরা ভাসমান রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতেন ও করতেন। ১৬৩২ খ্রীঃ চতুর্থ ফিলিপ যখন "দ্য গুড রিট্রিট্" (The good

Retreat) নামে তাঁর নূতন রাজ-প্রাসাদ তৈরী করান, তখন তিনি সেই প্রাসাদে একটি মনোরম রঙ্গালয়ও তৈরী করিয়েছিলেন।

এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে সরাই চত্বর ছেড়ে ইংরেজরা যখন প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে তোলে তার পূর্বেই স্পেনীয়রা ঘোড়ার আস্তাবলে তাদের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে তুলেছিল।

প্রথম অবস্থায় বড় অঙ্গনগুলিই এই নূতন প্রয়োজনে লাগান হত। এগুলি ক্রমে কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়ের জন্যই ব্যবহৃত হতে লাগল। এই ধরনের রঙ্গালয়গুলি শেক্‌সপীয়রের গ্লোব্‌ থিয়েটারের পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছিল। ইংরেজদের সরাই চত্বরের মত এগুলোও হত মুক্তাঙ্গন, চারদিক ঘিরেই দু'টি বা তিনটি উঁচু গ্যালারী থাকত যার উপর থেকে তাকিয়ে অভিনয় দেখা যেত এবং রাস্তার দিক থেকে ঢুকবার জন্য একটি আচ্ছাদিত প্রবেশ পথ থাকত—চত্বরের এক কিনারে থাকত মঞ্চ।

উত্তর স্পেনে এই সাধারণ রঙ্গালয়গুলো কতকগুলো বাড়ি দিয়ে ঘেরা ঘোড়ার আস্তাবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই উঠোনগুলো সাধারণতঃ বাড়তি মালপত্র ও আবর্জনায় পূর্ণ থাকত, এগুলোকে বলা হত কর‍্যালিজ্‌ (Corrales) ১৫৫৪ খ্রীঃ এমনিই একটি উঠোনে স্পেনের স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে তা উত্তর ছাড়িয়ে দক্ষিণ স্পেনের "প্যাতোয়া" (Patois) বা গ্রাম্য ভাষায় অভিনীত হতে লাগল এবং গ্রাম্য আস্তাবল ও উঠোনগুলো অধিকার করল।

॥ সাধারণ রঙ্গালয় ॥

ষোড়শ শতকের এই আস্তাবল রঙ্গালয়গুলোর মাঝের চত্বরের এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকত একটি চওড়া মঞ্চ, তার সম্মুখে কোন যবনিকা থাকত না। চত্বরের চারপাশ ঘিরে বাড়ির যে ঘরগুলো এবং জানালাগুলো থাকত, সেগুলোই উচ্চশ্রেণীর দর্শকদের 'বক্স' হিসেবে ব্যবহৃত হত। অভিনয় কর্তারা ঘরগুলো ভাড়া নিতেন, অথবা ঘরের মালিকরাই সেগুলো বক্স হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য বাৎসরিক সর্তে ভাড়া দিতেন। মঞ্চের ঠিক বিপরীত দিকের একটি বড় ঘর মহিলা দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত, এর বিশেষ নাম ছিল 'কাজুয়েলা' (Cazuela)। মঞ্চের সামনের দিকে এবং কর‍্যালের আশে পাশে গ্যালারীর মত উঁচু বসবার আসন পাতা থাকত,

এখানে বসত মার্জিত রুচির পরিশীলিত জনতা আর মঞ্চের খোলা জায়গায় "ইতর শ্রেণীর দর্শকরা" (Groundlings) দাঁড়িয়ে থাকত। তারা অভিনয়ের নিন্দা প্রশংসা দু'টো নিয়েই প্রচণ্ড হট্টগোল বাধাত। নাটক অপছন্দ হলে এরা সব সময়েই হাতের কাছে যা পেত—শশা, টমেটো, ডিম, সকলি ছুড়ত। এই শ্রেণীর দর্শকদের বিদ্রূপ করে বলা হত "মাস্কেটিয়ারস্"।

লণ্ডনের দর্শকদের মতই এই 'গ্রাউণ্ডলিংরা' একটা নগণ্য প্রবেশমূল্য দিয়ে প্রবেশ করত ; অবিশ্যি কিছু একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারলে সে সুযোগ তারা কখনই ছাড়ত না। মঞ্চের বিপরীত-বেঞ্চিগুলি কিংবা উপরের কক্ষশ্রেণীতে যারা বসত তাদের আলাদাভাবে বেশি প্রবেশ মূল্য দিতে হত। প্রবেশ মূল্যের পরিমাণ এক এক সময়ে এক এক রকম ছিল। ১৫৭৫ খ্রী: সাধারণ প্রবেশ মূল্য ছিল অর্ধ 'রিয়াল' (Real) নীচের তলার হাতলওয়ালা চেয়ারের মূল্য ছিল এক রিয়াল বা বেশি এবং বক্স-এর জন্য দিতে হত ৬ রিয়াল। থিয়েটারের ম্যানেজাররাই টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাপনা করতেন। এছাড়াও সেই ষোড়শ শতকের অভিনয় কালে দর্শকদের মধ্যে ফল, জল, মিশ্রি ইত্যাদি বিক্রি করাও পরিচালকদের অন্যতম উপার্জনের পন্থা ছিল। থিয়েটার কম্প্যানী নাট্যকারদের কাছ থেকে নাটক কিনে নিত। এই সব নাটক ছাপানোর প্রশ্ন ছিল না, নাট্যকারের লিখিত স্ক্রিপ্টখানিই কম্প্যানী পেত। একটি অটোর জন্য নাট্যকারকে হয়তো দেওয়া হত ৩০০ রিয়াল কিংবা একটি কমেডির জন্য তারা পেতেন ৫৫০ রিয়াল। একটি নাটকের পর পর পাঁচ-ছ'টি অভিনয় হামেশাই হত।

নাট্যাভিনয় সুরু হত অপরাহ্ণ কালে। প্রথম আমলে রঙ্গালয়গুলি রবিবার এবং অন্যান্য উৎসব দিন বা ছুটির দিনে খোলা থাকত। পরবর্তীকালে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবারও অভিনয় চলত, এমন কি অন্যান্য ছুটির দিনেও সুযোগ পেলে থিয়েটার খোলা রাখা হত। কিন্তু এরই মাঝে আবার নানান ছেদও ছিল, যেমন মড়ক বা রাজ মৃত্যু, শীত, বর্ষা বা গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা ইত্যাদি। ফলে সারা বছরে অভিনয়ের সংখ্যা ২০০শ-র বেশি দাঁড়াত না।

কর‍্যালগুলি মুক্তাঙ্গন ছিল বলে বর্ষাকালে থিয়েটার দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখতে হত—তাই তিক্ত বিরক্ত হয়ে ইতালীয় অভিনেতা 'গানাসা' (Ganasa) ১৫৭৪ খ্রী: মাদ্রিদের "কর‍্যাল্ দ্য লা প্যাচিকা" (Corral de la Pacheca) পুনর্গঠন করেন। এতে তিনি মঞ্চ এবং প্রধান দর্শকদের বসবার আসনের

উপর ছাদ তৈরী করান, আর যে স্থানে গ্রাউণ্ডলিংরা দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেন।

॥ মঞ্চ ॥

এই করাল্ থিয়েটারে অভিনেতাদের জন্য ছিল একটা লম্বা সরু প্লাটফর্ম মঞ্চ, তার সম্মুখে কোন সম্মুখ যবনিকা (Front Curtain) ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পেছনে ও পাশে এমন ভাবে পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হত যে যখন দরকার হত তখন পেছনের পর্দা সরিয়ে অভ্যন্তর মঞ্চ (Inner Stage) দেখিয়ে দেওয়া যেত। অভিনয় মঞ্চের উপরে একটি এগিয়ে আসা ব্যালকনি থাকত, আর সেই ব্যালকনির পেছনে দেখানো হত নগরগৃহের দেয়াল ও জানালা। আমরা একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাব যে স্পেনের এই মঞ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে সেকালের লণ্ডন শহরের সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চপরিকল্পনার সুগভীর মিল রয়েছে। তাতে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে এই দুই স্থানে যে শক্তিশালী নাটক গড়ে উঠেছিল তাতে একদিকে এযুগের সাধারণ মানুষের কামনা বাসনা, অন্যদিকে অভিনেতাদের সুযোগ সুবিধা এ দুই-ই সমন্বিত রূপ পেয়েছিল। এই বাহুল্যবর্জিত রঙ্গমঞ্চে যখন থিয়েটারের অভিনেতারা মূল্যবান পোষাকে ভূষিত হয়ে একের পর এক অভিনয় দেখিয়ে যেত তখন তা দর্শকদের কাছে সঞ্চরণশীল, ইন্দ্রধনুর মত বহু বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ বলে প্রতিভাত হত। এই মঞ্চ ছিল কাব্যময় সুদীর্ঘ পংক্তিগুলি আবৃত্তির অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র; দর্শকদের কল্পনাও এই মঞ্চে এসে সক্রিয় হয়ে উঠত। এই প্রসঙ্গে শেক্‌সপীয়রের সুবিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করা যায়—তোমাদের কল্পনা দিয়ে আমাদের অসম্পূর্ণতা সংযুক্ত করে নাও (Piece out our imperfections with your thoughts)।

এরপরে ক্রমে পরিবর্তন আসতে লাগল মাদ্রিদে ১৫৭৯ খ্রীঃ এবং তারপরে ১৫৮৩ খ্রীঃ "কোফ্রাদিয়াজ্" (Cofradias) কর্তৃক দু'টি স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হল। পরিকল্পনার দিক দিয়ে তা অনেকটা করাল্ দ লা প্যাচিকার মতই ছিল। তবুও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছিল যেমন গ্যালারী ও বক্স আসনগুলিতে গিয়ে বসবার জন্য সিঁড়ি বানান হয়েছিল এবং মঞ্চের পশ্চাতে ড্রেসিং রুম (Dressing room) তৈরী করা হয়েছিল। অল্পকাল মধ্যে মাদ্রিদের পুরানো রঙ্গালয়গুলি অবলুপ্ত হয়ে গেল। ক্রমশঃ স্পেনের

"তোলেদো" (Toledo), "সেভিল্লে" (Seville), "গ্রানাদা" (Granada) প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরগুলিতে রঙ্গালয় গড়ে উঠতে লাগল। সেভিল্লে শহরের রঙ্গালয় "দ্য কোলিস্কোর" (the Colisco) অভ্যন্তরভাগ কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তাতে ছিল ৪০টি স্তম্ভ। ১৬৩২ খ্রীঃ মঞ্চটির পুনর্গঠন হয়—তাতে চার, পাঁচ হাজার দর্শক একই সময়ে অভিনয় দেখতে ও শুনতে পেত। কর‍্যাল্ ধারার মঞ্চের কোথাও প্রোসীনিয়াম্ এবং সম্মুখ যবনিকার নির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একথা আমরা ধরে নিতে পারি যে স্পেনের সুবর্ণযুগে রাজা তৃতীয় এবং চতুর্থ ফিলিপের রাজসভায় যে সমস্ত ইতালীয় স্থপতিরা এসেছিলেন—তাঁরা সেখানে এগুলোর প্রবর্তন করেছিলেন। ১৭০৮ থেকে ১৭১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত মাদ্রিদে এক ইতালীয় দলের অপেরা ও কমেডি অভিনয়ের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা ও মঞ্চ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ অভিজাত স্থায়ী মঞ্চের বহু দৃশ্যাবলী ও যান্ত্রিক পদ্ধতি এই মুক্তাঙ্গন থিয়েটারে এসে যুক্ত হতে লাগল এবং জাঁকজমক বেড়ে চলল। প্রখ্যাত নাট্যকার লোপে দ্য ভেগা কিন্তু এজন্য অনুযোগ প্রকাশ করে বলেছেন এর ফলে নাটকের সত্যকার প্রাণধর্ম হারিয়ে যেতে বসেছিল। লোপে দ্য ভেগার ভাষায়—

"পরিচালক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেন, কবিরা গ্রহণ করেন ছুতোর মিস্ত্রীর সহায়তা—আর দর্শকরা পান নয়নের পরিতৃপ্তি।"

রেনেসাঁস্ যুগের স্পেনের থিয়েটারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের থিয়েটারের বহুদিকে মিল থাকলেও কতকগুলি অমিলও ছিল। রেস্টোরেশন্ (১৬৬০ খ্রীঃ) যুগ পর্যন্তও ইংল্যাণ্ডে নারী চরিত্রের অভিনয় বালকরাই করত। স্পেনে কিন্তু গ্রাম্য মঞ্চগুলিতে নারী চরিত্রের অভিনয় বহুকাল ধরে নারীরাই করে আসছিলেন, ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মাদ্রিদে অভিনেত্রীরা মঞ্চে আসবার হুকুমনামা পেলেন। এরপর থেকে অভিনেত্রীরা ক্রমশঃই প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলেন। চতুর্থ ফিলিপের রাজপ্রাসাদের অভিনয়ে অভিনেত্রীরা দস্তুরমত পূজা পেতেন—এবং রাজঅঙ্কশায়িনীও হতেন।

স্পেনের সাধারণ মঞ্চের অভিনয়ে জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিকতার প্রভাব সর্বতোভাবেই বিধৃত ছিল। অভিনেতাদের অভিনয়কালে যে যুগের যে চরিত্রই হক না কেন, তাঁরা পোষাক পরতেন সমকালীন। এ সম্পর্কে

লোপে দ্য ভেগা বিদ্রূপ-মন্তব্য করে বলেছেন—"বর্তমানের নাটকাভিনয় বর্বরতায় পূর্ণ, একজন তুর্কী ধারণ করে খ্রীষ্টানের গলবন্ধ, একজন রোমানকে দেখা যায় আঁট ব্রিচেস্ পরতে।"

এমন কি অভিনেত্রীরাও মাঝে মাঝে ব্রিচেস্ পরতেন। স্পেনের কর‍্যাল্ মঞ্চ সর্বদিক দিয়েই জনসাধারণের ধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। তাদের প্রোসীনিয়াম্ এবং সম্মুখ যবনিকা না থাকলেও পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে অভ্যন্তরমঞ্চ দেখানো হত। এই মঞ্চের উপকরণগুলি ছিল অত্যন্ত অসংস্কৃত। মঞ্চের সেট তৈরীর উপকরণগুলি বেশির ভাগই হত পেস্টবোর্ড এবং লিনেন—এরই উপরে গাছপালা অঙ্কিত হত। মঞ্চের পার্শ্ববর্তী দরজা দিয়ে অভিনেতারা প্রস্থান করে মঞ্চ শূন্য করে দিলে—দর্শকদের চোখের সম্মুখেই সামান্য উপকরণগুলি পাল্টে সেট পরিবর্তন করা হত। পরে আবার অন্য দরজা দিয়ে অভিনেতারা প্রবেশ করতেন। সাধারণ মঞ্চের উপরেও কখন কখন রাজসভার জটিল মঞ্চ পদ্ধতির প্রভাব এসে পড়ত কিন্তু অর্থের স্বল্পতা ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য তা অনেক সময় অভিনয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। ১৬২২ খ্রী: মুদ্রিত একটি কমেডির প্রস্তাবনায় লোপে দ্য ভেগা একালের দৃশ্যসজ্জা ও যান্ত্রিক পদ্ধতিকে সোজাসুজিই আক্রমণ করেছেন। প্রস্তাবনায় দু'টি চরিত্র ছিল, একটি একজন আগন্তুক অন্যজন থিয়েটারের চরিত্ররূপ। দু'জনের কথোপকথনে ছিল—

থিয়েটার—দেখতে পাচ্ছ না আমি কি ভাবে আহত? আমার হাত পা ভেঙ্গে গেছে, হাজারো রকমের গুপ্ত দরজা ও পেরেকের আঘাতে আমার সারা গা গর্তে ভরে গেছে।

আগন্তুক—কে তোমার এই দুর্দশা করল?

থিয়েটার—ছুতোর মিস্ত্রীরা থিয়েটার পরিচালকদের আদেশে। পরিচালকরা নির্ভর করেন যন্ত্রপাতির ওপর—লেখক করেন ছুতোর মিস্ত্রীর ওপর আর দর্শকরা তাদের নয়নের উপর।

স্বর্ণযুগের স্পেনে ভিক্টোরীয় যুগের ব্রিটিশ থিয়েটারের মতই বহুশ্রেণীর নাট্যাভিনয় হত—অটো স্যাক্রামেণ্টার ট্র্যাজেডি, ছোট ছোট ফার্স, ব্যালে, কমেডি, মেলোড্রামা ইত্যাদির অভিনয় চলত।

এ ধরনের অনির্দিষ্টতা ও বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের উদ্ভব কার্যতঃই প্রায় অসম্ভব, তবুও তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল, কারণ তাঁরাও

তাঁদের সৃষ্টিতে ও চরিত্রে ছিলেন অদ্ভুত বৈচিত্র্যমণ্ডিত মানুষ। এসম্পর্কে "লিভিং স্টেজ" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে—

—"এটা অসাধারণ বলে মনে হতে পারে যে এ রকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে নাট্যরচনা সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু স্পেনীয় নাট্যকাররাও অসাধারণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীর জীবন যাপন করতেন এবং অনেকেই নিজের জীবনের কামাসক্তি প্রচুর পরিমাণে মঞ্চে আনয়ন করতেন।"

স্পেনের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবিশ্যিই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল—ছিল ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতাদের বহু অনুযোগ, অভিযোগের ক্ষেত্র, কিন্তু তথাকথিত ক্লাসিক্ বন্ধন-ছিন্ন এই মঞ্চে সর্বোপরি ছিল প্রাণপ্রাচুর্যেভরা নাট্যকীর্তি গড়ে তোলার সুযোগ। স্পেনের অভিজাতরা, কারুকৃৎ এবং জনসাধারণ একই সঙ্গে ভালবেসেছিলেন মঞ্চকে। অভিনেতা ও মঞ্চবিদ্রা পেয়েছিলেন স্বাধীনতা, আর নাট্যকাররা জানতেন উন্মুক্ত মঞ্চে, উদ্গ্রীব দর্শকদের কাছে তাঁদের কাব্যকীর্তি উপযুক্ত সমাদর পাবে।

এযুগের অন্যান্য নাটকের তুলনায় স্পেনীয় নাটকগুলি কথোপকথনের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। এমন কি স্পেনের উপন্যাসেও কথোপকথনের প্রাবল্য দেখা যায়। স্পেনের নাট্যকাররাও এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের মতই ধ্রুপদী রীতির বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং স্বভাবজ গতিতে অনন্য-সাধারণ শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। এজন্য স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের সাধারণ রঙ্গালয় চিরকালই নাট্যরসিকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবে, কারণ এদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই নাট্যকাররা পেয়েছিলেন বন্ধন মুক্ত স্বাধীনতা, পেরেছিলেন যুগচেতনাকে তুলে ধরতে। সাধারণ রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকদের পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না, তারা অত রীতি নীতি বা নিয়ম মেনে পা বাড়াত না—তাদের বিচার পদ্ধতি ছিল সোজাসুজি ভাল লাগা মন্দ লাগা নিয়ে—প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং বাস্তব জীবন চিন্তা যেখানেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—তারা পুলকিত চিত্তে সেখানেই দু'হাত বাড়িয়ে সাদর সংবর্ধনা জানিয়েছে, আবার যখন তাদের চিত্ত হয়েছে বিরূপ তখন তারা পথের কাদা, পাথর কিছুই ছুড়তে বাকী রাখেনি।

স্পেনের নাট্যকাররা গ্রীক নাট্যতত্ত্ব অনুযায়ী স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চলেননি কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁরা বৃত্তের বা কার্যের ঐক্য মেনে চলতেন।

তাঁরা পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রাচীন রীতিকে অলঙ্ঘনীয় বলে ভাবেন নি। তাঁরা চার অঙ্ক নাটক লিখেছেন, এমন কি কমেডির ক্ষেত্রে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকও রচনা করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তাঁরা প্রাচীন ধারাকেই আঁকড়ে থাকেন নি, এযুগের বিচার বিশ্লেষণ, চিন্তার স্বাধীনতা এবং রোমান্টিক ভাবধারাকেও তাঁরা সাদরে নাট্য রচনাকালে গ্রহণ করেছেন। এজন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা ডন্ কুইক্জোটের রচয়িতা নাট্যকার সার্ভান্টিসেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য কারণ তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ আর তারপরে একে সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যরূপ দেন লোপে দ্য ভেগা।

একটা বিষয় কিন্তু বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে স্পেনের নাট্যসাহিত্যে সুবর্ণযুগ তখনই এসেছিল যখন স্পেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দিন। স্পেনিস আর্মাডার পরাজয় ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের চিন্তাজগতে দুই বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃজন করেছিল। এর ফলে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল আত্মবিশ্বাস, জেগে উঠেছিল জাতীয় চেতনা ও স্বাজাত্যাভিমান, আর স্পেনের চিন্তা নায়কদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল আত্মবিশ্লেষণ, বাস্তব সমস্যার নিরাবরণ মূর্তি এবং আত্মচেতনা, ফলে কোথাও কোথাও ভেগার রচনার মধ্যে আধুনিক যুগমানস ও গণচেতনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বয়ং সার্ভান্টিসকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দক্ষিণ হস্ত হারাতে হয়েছিল—তাঁর ডন্ কুইক্জোটের বিদ্রূপবাণের মধ্যেও এযুগের হৃতগৌরব স্পেনকেই দেখতে পাই।

॥ লোপে দ্য ভেগা ॥

রেনেসাঁস্ যুগে স্পেনের প্রথম প্রতিভাশালী নাট্যকার "লোপে দ্য রুয়েদা"র (Lope de Rueda) প্রদর্শিত পথে একের পর এক বহু নাট্যকারই এলেন। সুতরাং ১৫৮৫ খ্রীঃ স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার "লোপে ফেলিক্স দ্য ভেগা কার্পিও" (Lope Felix de Vega Carpio) যখন রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হলেন তখন থিয়েটার মহলে বেশ জমজমাট ভাব। তিনি কেবল নাট্যপ্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সাধারণ রঙ্গালয়ই পেলেন না; তার সঙ্গে পেলেন নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার।

শেক্সপীয়রের সঙ্গে নাট্যকার ভেগার জীবন-কীর্তির যথেষ্টই মিল

রয়েছে। শেক্‌সপীয়রের দু'বছর আগে ১৫৬২ খ্রীঃ লোপে দ্য ভেগা জন্ম গ্রহণ করেন তবে মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে তাঁরা দু'জন একই সময়ে আসেন। তাঁদের জীবনের এবং রচনার দৈর্ঘ্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। শেক্‌সপীয়র ৫২ বছর বয়সে ৩৭ খানা নাটক রচনা করেন, সেক্ষেত্রে লোপে ৭৩ বছর বাঁচেন এবং সর্বপ্রকার রচনা মিলিয়ে মোট ১৭০০ খানারও বেশি নাটক লেখেন। লোপের এই সুবিপুল রচনা সম্ভারের বেশির ভাগ অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে—তবুও তাঁর ৪৭০ খানি নাটক এখনো টিকে আছে—আজ পর্যন্ত অন্য কোন নাট্যকারই এত বিপুল সংখ্যায় নাটক রচনা করেননি।

লোপের রচনার উপর যদিও তাঁর পূর্বসুরীদের প্রভাব কোথাও কোথাও ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ সম্পদই ছিল তাঁর নিজস্ব। স্পেনের রঙ্গালয় লোপের কাছ থেকে তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যের অনেক উত্তরাধিকারই পেয়েছে। ট্র্যাজিক্-কমেডির শৈলী এবং ট্র্যাজিক্-ক্রিয়া (Tragic action) সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরবর্তীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি কমেডিকে তরবারি হস্তে যুদ্ধের প্রথা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে এক দিকে এগিয়ে নিয়ে যান রোমান্টিক কাহিনী বিন্যাসের পথে, অন্য দিকে নিয়ে যান কমেডি অব্ ম্যানার্সের (Comedy of manners) ধারায়।

নাট্যরচনার কালে ভেগার ঐকান্তিক মনোযোগ ছিল দর্শকদের মনোরঞ্জনের প্রতি। দর্শকরা যা চাইত তিনি তা দেওয়ার জন্য এত বেশি ব্যগ্র হয়ে না উঠলে হয়তো এর চেয়ে আরো অনেক ক্রটিহীন নাটক লিখতে পারতেন।

তাঁর নাটক ছিল গীতিগুণ সম্পন্ন, কারণ ইংল্যাণ্ডের মতই স্পেনের স্বর্ণযুগে শ্রোতারা আবেগময় কাব্যধর্মী কথা শুনতে ভালবাসত। লোপের রচনায় বাস্তবতা ছিল—কিন্তু তাঁর সে বাস্তবতা বর্তমান কালের মত প্রাণহীন, উৎসাহহীন, শুষ্ক বাস্তব চিত্র মাত্র ছিল না—তা ছিল চিন্তার গভীরতাময়, কল্পনার রসসমৃদ্ধ।

লোপের নাটককে প্রায় ক্ষেত্রেই কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায় না। তার মধ্যে উচ্চ-নীচ, ট্র্যাজিক্-কমিক্, পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি সকলই আছে। বহুকাহিনীই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপিত, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাকে তিনি নাটকীয় ঘটনায় পর্যবসিত করে নিয়েছেন। বহুকিছুই আবার

রোমান্সের সূত্র থেকে এসেছে—তাই জীবন্ত চিত্র রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। লোপের মধ্যে উপাদানের অভাব ছিল না—অভাব ছিল উপাদানের সম্বদ্ধতা ও গভীরতার—অভাব ছিল গৃহিণীপণার। শেক্‌সপীয়রের সমতুল্য উপাদান থাকলেও, হ্যামলেটের চিন্তাশীলতা, টেম্পেস্টের বিস্ময় তাঁর ছিল না। আমরা লোপের মধ্যে পেয়েছি—লাভস্ লেবরস্ লস্ট, মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং এবং অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল-এর পরিবেশ এবং উপাদান, পাই নি ট্র্যাজেডির বিশাল নৈতিক পতন এবং দার্শনিক চিন্তাশীলতা।

বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত লোপের বিশাল নাট্যকীর্তির সবিস্তার আলোচনা করা আমাদের এই স্বল্প পরিধির মধ্যে অসম্ভব। লোপের একটি মাত্র নাটকেরই আমরা এখানে উল্লেখ করব। প্রায় চারশ বছর পূর্বেকার নাট্যকার লোপে তাঁর "ফুয়েন্তে ওভেজুনা" (Fuente Ovejuna) নাটকে যে গণমানসের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার সমতুল্য উদাহরণ এই বিংশ শতকের নাট্য-জগতেও দুর্লভ। লোপের এই নাটকের সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে গোর্কির "লোয়ার ডেফ্‌থ" নাটকখানির। লোপে পুরাতন সকল ঐতিহ্য, সকল সংস্কার, এমন কি সে যুগের রোমান্টিক আদর্শবাদিতা পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে তাঁর এ নাটকখানি রচনা করেছেন। আমরা জানি ট্র্যাজেডি নাটকের মধ্যে কোন মহৎ চরিত্রের পতন দেখানো হয়, কিন্তু লোপের এই অনন্য নাটকখানির মধ্যে কোন মহৎ চরিত্র নেই, তার পতনও নেই। লোপের ফুয়েন্তে ওভেজুনা নাটকের এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে এ নাটকের নায়ক-চরিত্র কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় একটা গোটা সমাজ। কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর সুগভীর দরদ, তাদের মর্মব্যথা, তাদের শক্তির উৎস—এই নাটকখানির মধ্যে পরিস্ফুট। যদিও এ নাটক বিশ্ববিশ্রুত কোন যশ অর্জন করেনি, তবুও বলা যায়—সর্বহারার থিয়েটার (Proletarian theatre) নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এখানেই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এই নাটকখানির মুখ্য চরিত্র (Pivotal Character) হল ফুয়েন্তে ওভেজুনা গ্রামের কৃষকরা। এই গ্রামের নামেই নাটকখানির নামকরণ হয়েছে।

এক কামুক প্রকৃতির সেনানায়ক এই গ্রামের "লরেন্‌সিয়া" (Laurencia) নামে একটি কৃষক তরুণীকে বলাৎকার করতে চাইল। এই গ্রামেরই আর একটি তরুণ "ফ্রোন্‌দোসো" (Frondoso)—ভালবাসত লরেন্‌সিয়াকে—

অতএব সে সেনানায়ককে ভীতি প্রদর্শন করে বাধা দিতে চেষ্টা করল। সেনানায়ক তখন রেগে গিয়ে এই যুবককে বন্দী করে ও লরেন্‌সিয়ার পিতাকে হত্যা করে কন্যাকে কেড়ে নিয়ে যায়। এরপরে সমগ্র ওভেজুনা গ্রাম জুড়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটা চাপা ক্রোধ এবং অপমানবোধ দানা বাঁধতে থাকে। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা তখন একত্রিত হয়ে পরামর্শ সভা বসায়। এই সভার মাঝেই ধর্ষিতা, বিস্রস্তবাসা লরেন্‌সিয়া প্রবেশ করে এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত ও উত্তেজক বাক্যে গ্রামবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তার সেই ভাষণও অপূর্ব শক্তিশালী। ক্ষিপ্ত জনতা তখন সেই সেনানায়কের প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলল, এবং তাদেরই মধ্যে "এস্তিবান্" (Esteban) নামে একজন তরুণ সেনানায়ককে হত্যা করল।

পরের দৃশ্যে আবার গ্রামবাসীদের সভা বসেছে—তারা জানে এখন সরকারি অফিসার ও বিচারকের দল আসবে এবং এই অপরাধের প্রতিশোধ তুলবে। তাই তারা পরামর্শ করে ঠিক করল যে এরপরে অতি তীব্র যন্ত্রণার মুখেও তারা কেউ-ই সেনানায়কের সঠিক হত্যাকারীর নাম বলবে না। তারা সকলেই অত্যাচারের মুখে এক উত্তরই বলবে যে, সমগ্র গ্রামবাসীই হত্যাকারী। হত্যাকারীর নাম—ফুয়েন্তে ওভেজুনা গ্রাম—এই গ্রামবাসীর সম্মিলিত দুঃসহ ক্রোধই হত্যা করেছে সেনানায়ককে। যথা সময়ে বিচারক ও সরকারি কর্মচারীরা এল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামবাসীর উপর চরম অত্যাচার চালিয়েও সকলের কাছ থেকে সেই এক উত্তরই পেল—অপরাধী ফুয়েন্তে ওভেজুনা। এখানে মঞ্চের পরিকল্পনাটিও অপূর্ব। মঞ্চের বাইরের অংশে দেখা যাচ্ছে লরেন্‌সিয়া এবং ফ্রোন্‌দোসোকে ভেতরের অংশে বিচারকমণ্ডলী এক এক জন গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে নানা ভাবে উৎপীড়ন চালাচ্ছে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, প্রলোভন দেখিয়ে সত্যকে বের করতে চাইছে। ভেতরের এই নির্যাতন, প্রতিটি গ্রামবাসীর সহনশীলতা, একতা এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই উত্তরে আসা—এর প্রতিটি প্রতিক্রিয়া, উদ্বেগ, উত্তেজনা, কথোপকথনের অংশ দর্শকরা বাইরের অপেক্ষমান দু'জনের মধ্যে প্রতিফলিত দেখছে—তারা অস্থিরভাবে পায়চারী করছে, পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে, অত্যাচার, আর্তনাদ এবং কথোপকথনের অংশ শুনছে, আবার উত্তেজিতভাবে ফিরে আসছে। গ্রামবাসীর এই সহনশীলতা এবং এর অপূর্ব কথোপকথনের কোন তুলনা রেনেসাঁস্ যুগে নেই। এর মধ্যে যে

তীব্রতা, দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের রূপ ফুটে উঠেছে সত্যিই তা অত্যাশ্চর্য। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গণমানসের এই সচেতনতা, ডিমক্রাসির প্রাথমিক লীলাস্থল ইংল্যাণ্ডে জন্মায়নি—জন্মেছিল গর্বিত, আভিজাত্য-বিলাসী স্পেনে।

লোপের এই একটি নাটকেরই উদাহরণ দেওয়া হল, এ ছাড়াও লোপের বিপুল সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় যে, অত্যন্ত সহজভাবে তিনি অগণিত বিষয়-বস্তুকে অসম্ভাব্য উপায়ে হঠাৎ টেনে এনে দৃশ্যতঃ প্রথাগতরূপে দাঁড় করিয়ে দিতেন। লোপের নাট্য সৃষ্টি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া কঠিন—তবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী শিল্পী ছিলেন। বিচিত্র বিষয়পূর্ণ ও বহু বর্ণে সমাচ্ছন্ন এক জগৎ তিনি আমাদের সম্মুখে অঙ্কিত করেছেন। তবুও তাঁর মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল। আর কোন নাট্যকারই তাঁর মত এত অগণিত লেখা লিখতে পারেননি—লেখার পরিধি এত বিপুল বলেই তা সকলি অত্যুচ্চ প্রতিভা-মণ্ডিত হবে সে আশাও বৃথা। প্রায়ই তাঁর কাহিনী তাড়াহুড়ো করার জন্য প্রার্থিত পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে যেত। তিনি যদি তাঁর নাটকের সংলাপে ও চরিত্রে আরো একটু সময় দিতেন তা হলে তারা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারত। এই জন্যই স্পেনের বাইরে লোপের নাটকের ভাগ্যলিপি অদ্ভুত—অন্যত্র তাঁর নাটকের অনুবাদ ও প্রযোজনা খুব কমই হয়েছে কিন্তু বহু নাট্যকারের উপরেই পড়েছে তাঁর প্রভাব। শেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়বস্তু, চরিত্র, চিন্তা এবং প্রয়োগশিল্পের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখি আর লোপের নবতম বিষয় উদ্ভাবনে আমরা বিস্মিত হই কিন্তু তেমনি হতাশ হই তার নাটকীয় ব্যবহারে।

তবে আমরা আশা করি যে এতকালের অজানার অন্ধকার ও অবহেলা থেকে তিনি হয়তো এখন তাঁর প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী হবেন। বর্তমান যুগের পঠন পাঠন তাঁর বিচিত্রধর্মী রচনা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। তাঁর ফুয়েন্তে ওভেজুনার মত মহান্ কীর্তিও দীর্ঘকাল অজানা ছিল, এখন কিছু কিছু নাট্যবিশেষজ্ঞরা তার অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা আশা করি ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমেই এই অজানা শিল্পীকে জগৎ একদিন জানবে।

॥ কল্‌দেরোন্ ॥

লোপের পরেই স্পেনে এলেন নাট্যকার "পেড্রো কল্‌দেরোন্ দ্য লা বার্কা" (Pedro Coldero'n de la Barca) তাঁর ভাগ্য কিন্তু লোপের চেয়ে অনেক দিকেই ভাল ছিল। প্রথমতঃ রাজসভা তাঁকে আর্থিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ লোপের মত বহু বিষয়বস্তু আবিষ্কারে এবং বহু সংখ্যক নাট্য রচনায় তাঁর অভিনিবেশ না থাকায় তিনি তাঁর নাটকগুলি অনেক বেশি মাজাঘষা করে নিখুঁত করতে পেরেছিলেন। তবুও অন্যান্য নাট্যকারদের তুলনায় তাঁর রচনা সংখ্যার বাহুল্য কিছু কম ছিল না। তিনি মোট ১১১ খানা নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে ৭০ খানা ছিল 'অটো' বা ধর্মীয় নাটক।

লোপে ছিলেন স্পেনের সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার। তাই তিনি নির্ভয়ে সমকালীন স্পেনীয়দের জীবন ও আচরণ অঙ্কিত করেছেন। লোপের রচনার মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ, প্রকৃতিপ্রসূত ভাব ছিল—তাঁর নাটকে রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরেও স্বাভাবিক মানবজীবনই ফুটে উঠেছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বল্প উপকরণ, সাধারণ মানুষের বাস্তব রুচির প্রতি শ্রদ্ধা লোপের রচনায় এক অকৃত্রিম সাবলীল গতি এনে দিয়েছিল। কল্‌দেরোন্ ছিলেন রাজপ্রসাদপুষ্ট—রাজসভার নাট্যকার। তাঁর মনোযোগ ছিল অভিজাত দর্শকদের প্রতি, সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন তিনি চাননি। তাই কল্‌দেরোনের রচনায় ফুটে উঠেছে—"ম্যানারিজম্", তাঁর কাছে স্বাভাবিক মানব জীবন এবং প্রকৃতি রাজসভার প্রথানুগ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে সহজ আত্মপ্রকাশ হারিয়েছে। তাই কল্‌দেরোন্ একজন নিখুঁত নিয়মানুগ শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন কিন্তু লোপের মত সজীব জীবনের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি লোপের প্রাণোচ্ছ্বাস হারিয়ে স্থানে স্থানে রোমান্টিক উদ্দীপনা প্রকাশ করেছেন। এদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে লোপের চেয়ে কম প্রতিভাধর ছিলেন। এ সম্পর্কে নিকল বলেছেন—"লোপে দ্য ভেগা একটি জাতির প্রতিভাকে রূপায়িত করেছিলেন আর কল্‌দেরোন্ প্রকাশ করেছিলেন একটি যুগের শক্তিকে।"

আর একটু ঘুরিয়ে বলা যায়—কল্‌দেরোন্ জাতির একটা বিশেষ যুগকে রূপ দিয়েছেন আর লোপে রূপ দিয়েছেন সাধারণ মানবতার। যে মানবতা

চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তাঁর চরিত্রগুলির সমকালীন রূপের মধ্য দিয়ে সেই চিরন্তন মানবপ্রকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে।

এঁদের দু'জনের তফাতের মূল সূত্র এখানেই যে—লোপের কাহিনীর বেশির ভাগ বিষয়-বস্তুই ছিল—ভালবাসা এবং আত্মত্যাগ। এই চিরন্তন সত্যই সেখানে প্রতিভাত হয়েছে যে—হৃদয় সমর্পণ করে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আর কল্‌দেরোনের মধ্যে প্রায়শঃই প্রকাশ পেয়েছে এক কৃত্রিম, আবদ্ধ, আত্মসম্মানের ধারণা—যা ছিল নিতান্তই তাঁর যুগের অভিজাত সমাজ-সম্ভূত প্রথা।

তবু এটুকু আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, কল্‌দেরোনের সম্মান আজ জগৎ জুড়ে কিন্তু নিজের দেশের বাইরে লোপে অজানা। কারণ লোপের প্রতিভা ছিল, শক্তি ও সাহস ছিল, ছিল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক দৃষ্টি—কিন্তু সৃজন কর্মে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নহীন। তাঁর এই মার্জনার অভাব ও যত্নহীনতাই তাঁকে তাঁর মনীষার পাওনা সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। শেক্‌সপীয়র স্বয়ংও যদি যত্নহীন শিল্পী হতেন তবে তিনিও আজকে সম্মানের এই সমুচ্চ আসন হয়তো পেতেন না। লোপে হারলেন কারণ তিনি অনেক নূতন বৈশিষ্ট্য এবং ধারা আনয়ন করলেও তাঁর নাটকের গঠন ভঙ্গি মোটেই নিখুঁত ছিল না, আর কল্‌দেরোন্ জিতলেন তাঁর কারুকর্মের নিপুণতার জন্য।

লোপে এবং কল্‌দেরোন দু'জনই নাট্যকাহিনীর উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন—এবং তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতও বটে। লোপে সন্তুষ্ট ছিলেন কাহিনী এবং চরিত্র চিত্রণ নিয়েই—কল্‌দেরোন্ সেখানে নিয়ে এলেন দার্শনিক তত্ত্ব। নাটক যদি কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতেই শেষ হয় তবে তা কখনই মহৎসৃষ্টি হয় না, যখন এই উপাদানগুলি কোন এক উদ্দেশ্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয় তখনি হয় তা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কল্‌দেরোনের দার্শনিক তত্ত্ব সম্ভূত নাটকগুলির প্রকৃষ্ট উদাহরণ—ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিরচিত তাঁর অটো নাটকগুলি। এই অটো স্যাক্রামেন্টা নাটকের বিস্তৃত বিবরণ আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দিয়ে এসেছি—সুতরাং তার পুনরালোচনা বাহুল্যমাত্র। কল্‌দেরোনের বেশির ভাগ নাটকই ছিল অটোর সমতুল ধর্মীয় নাটক। যেমন ছিল তাঁর—"দ্যা ডিভোশন্ অব্ দ্যা ক্রস্" (The Devotion of the Cross) "দ্যা পার্গ্যাটরি অব্ সেন্ট প্যাট্রিক বা এল্ পার্গাতোরিও দ্য সাঁ পাত্রিসিও" (The Purgatory of St. Patrick

—El Purgatorio de San Patricio—১৬৩৩ খ্রী:), "দ্য টু লাভারস্ অব্ হেভেন্ বা লজ্, ডজ্, আমান্তেজ্, দেল্ সিয়েলো" (The two lovers of Heaven—Los dos amantes del cielo—১৬৩৬ খ্রী:)।

এ ছাড়াও আত্মসম্মানের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কতকগুলি নাটক রয়েছে। আবার তাঁর কতকগুলি নাটকের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব ও হাস্যরস মিলিত রূপ পেয়েছে, যেমন "দ্য ফিজিসিয়ান্ অব্ হিজ ওন্ অনার্ বা এল্ মেদিকা ভ সু ওরা" (The Physician of his own Honour—El me´dica de su houra—১৬৩৫ খ্রী:) এবং "কীপ ইওর্ ওন্ সিক্রেটস্ বা নাদি ফিয়ে সু সিক্রেতো" (Keep your Own Secrets—Nadie fie su Secreto মতান্তরে ১৬২৪ খ্রী:) এ ছাড়াও ছিল তাঁর নানান রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক।

॥ রেনেসাঁস্‌ ॥

ইংল্যাণ্ড : এলিজাবেথীয় যুগ

ইংল্যাণ্ডে প্রটিস্ট্যাণ্ট্‌ ধর্মের প্রতিষ্ঠা গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে হয়নি। ইংরেজ জাতি রিফর্মেশন আন্দোলন জাত এই নবধর্ম গ্রহণ করেছিল রাজধর্ম হিসেবে। রাজা অষ্টম হেনরী রাজনৈতিক এবং বৈবাহিক কারণে পোপের সঙ্গে কলহ করে প্রটিস্ট্যাণ্ট ধর্মগ্রহণ করেন। গ্রহণ তিনি যে কারণেই করুন না কেন—এই নব-ধর্মমত কিন্তু এ যুগের দাবিকেই পূরণ করেছিল—ইংরেজ জাতির মধ্যে এনে দিয়েছিল আত্মোপলব্ধি—উন্মুক্ত করে দিয়েছিল কল্যাণের পথ।

অষ্টম হেনরীর কালেই ইংল্যাণ্ডের রাজসভায় ক্রমশঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে যেতে থাকে। রেনেসাঁস্‌ যুগের দু'জন প্রধান সনেট রচয়িতা ছিলেন তাঁর রাজসভায়—"সার্‌ টমাস ওয়াইআট্‌" (Sir Thomas Wyatt) এবং "হেন্‌রী হাউয়ার্ড" (Hanry Howard-Earl of Surrey)। অষ্টম হেনরীব রাজসভায় নানা ধরনেব উৎসব ও নাট্যানুষ্ঠান হত যেমন ইন্‌টারলুড, মাস্ক, বিভিন্ন পোষাকে বল-নৃত্য, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা—ইত্যাদি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা কববার জন্য হেনরী স্থায়িভাবে একজন রাজকর্মচারীর আসন নির্দিষ্ট করেন। এই রাজকর্মচারীটিকে বলা হত—মাস্টার অব্‌ দ্যা রেভেল্‌স্‌ (Master of the Revels), রাজসভার এই আসনটি পরবর্তীকালেও অক্ষুন্ন ছিল। হেনরীর রাজসভায় রেনেসাঁস্‌ যুগের অন্যান্য রাজসভার মতই ক্লাসিক্‌ ধারার ল্যাটিন নাটকের অভিনয় হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটেনে রোম সাম্রাজ্যের প্রভাব অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলির চেয়ে কম থাকায়—ল্যাটিন নাটকের অভিনয়েও তারা ক্লাসিক্‌ ধারার সেটিং-এর অন্ধ অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও রাজসভার অনুকরণে নাট্যানুষ্ঠান আরম্ভ করে। পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক্লাসিক্‌ নাটকগুলোর অভিনয় সুরু হয়—প্লাউটুস্‌, তেরেন্স ও সেনেকার প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে—অনুরূপ ল্যাটিন নাটকও রচিত হতে লাগল। হেনরীর সময়ে পাই "নিকোলাস্‌ উদালের—র‍্যালফ্‌ রোইস্টার ডোইস্টার" (Nicholas Udall's —Ralph Roister Doister) নাটক। এর পরে প্রথম এলিজাবেথের

ক্লাসে পাই আর দু'খানি ইংরেজী ভাষায় রচিত, শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্ ধারার নাটক—একখানি স্যর্ ফিলিপ সিড্নীর রচিত "গোর্বোডাক্ (Gorboduc" —Sir Philip Sidney) এবং অনির্দিষ্ট লেখকের "গ্যামার্ গার্টনস্ নীড্ল্" (Gammer Gurton's Needle) লক্ষণীয় যে এই নাটক দু'খানিও ক্লাসিক্ রীতিনীতি ভঙ্গ করেই অভিনীত হয়েছে। অবশ্য অচিরকাল মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে সেনেকার কণ্ঠস্বর এবং আরিস্তোতলের তত্ত্ব শেক্সপীয়র ও তাঁর অনুগামীদের কলকল্লোলে ভেসে গেল।

॥ রাজসভার নাট্যাভিনয় ॥

ইংল্যাণ্ডে প্রথম এলিজাবেথ সিংহাসন আরোহণ করেন ১৫৫৮ খ্রীঃ। এলিজাবেথের সাম্রাজ্য লাভের পর রাজসভার নাটকে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। হেনরীর মত তিনি অন্তঃসার শূন্য দৃশ্যরূপে অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর মানসিক গঠন অনেক বেশি পরিশীলিত ছিল। তিনি দৃশ্যাবলীর উদ্দামতা কমিয়ে দিলেন এবং তার পরিবর্তে প্রকৃত নাটকের সমাদর করলেন। রিচার্ড এডোয়ার্ডসের (Richard Edwards) পরিচালনায় চ্যাপেল রয়ালের (Chapel Royal) বালকেরা রাজসভায় অভিনয় করত। এই বালকদের সমগ্র রাজ্য থেকে তাদের অপূর্ব রূপ ও মধুময় কণ্ঠস্বরের জন্য বেছে আনা হত। এরাই রাজসভায় উপাসনা সঙ্গীত গাইত (Worship Service) এই জন্য এদের অতি যত্নে লালন করা হত এবং যথেষ্ট ভাল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এদের শিক্ষা পরিচালনার জন্য ছিলেন এডোয়ার্ডস্। তিনি একাধারে ছিলেন একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ, লিরিক কবি ও নাট্যকার। তিনি নিজেই এই সব বালকদের জন্য নাটক লিখতেন এবং তাদের শিক্ষা দিতেন। হালকা রোমান্টিক কমেডিই তিনি ভাল রচনা করতেন। ক্রমশঃই কোর্টের এই নাটকগুলি এবং তার পোষাক পরিচ্ছদ, অভিনয়, সভাজনদের প্রীতিকর হয়ে উঠতে লাগল। এডোয়ার্ডসের পর চ্যাপেল রয়ালের শিক্ষার ভার পেলেন "উইলিয়াম্ হানিস্" (William Hunnis) এই সময়ে এলিজাবেথ আরো কয়েকটি কিশোর-দল করলেন—একটি "সিবাস্টিয়ান্ ওয়েস্টকটের" (Sebastian Westcott) পরিচালনাধীনে সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালে, অন্যটি গড়ে উঠল রাণীর গ্রীষ্মকালীন আবাস "উইণ্ডসোর্ প্যালেসে" (Windsor Palace) এটির পরিচালনার ভার

পেলেন "রিচার্ড ফ্যারাণ্ট" (Richard Farrant)। এই ফ্যারাণ্টের মনে এক পরিকল্পনা আসে, তিনি উইণ্ডসোর্ প্যালেসে রাণীকে নাট্যপ্রদর্শনের পর—রাজকীয়-দলের অভিনীত সেই নাটকটি নির্দিষ্ট অভিজাত দর্শকদের মহলে পুনরভিনয়. করার কথা ভাবেন। এর স্বপক্ষে তিনি এই যুক্তি দেখালেন যে—এর ফলে বালক অভিনেতাদের নাট্যকলার শিক্ষা এবং অভ্যাস আরো ভাল হবে কারণ শিক্ষক এবং শিল্পীরা নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে আরো বেশি উৎসাহশীল হয়ে উঠবে, অন্য দিকে রাণীর অর্থ নৈতিক সাশ্রয়ও কিছুটা হবে,—এতগুলো দল রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কিছুটা বাঁচবে। অনুমতি মিলল। রাণী এলিজাবেথ কি রাজনীতি কি অর্থনীতি সর্বত্রই সাবধানী পদক্ষেপে চলেছেন। অর্থের অপচয় তিনিও চাইতেন না। ১৫৭৫ খ্রীঃ রিচার্ড ফ্যারাণ্ট "ব্লাকফ্রাইয়ারস্" (Black friars) হলঘর লীজ নিলেন এবং নিজ পরিচালনায় অভিনয় সুরু করলেন। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত সার্থক হল। রাজভোগ্য অভিনয় দেখবার জন্য অভিজাতরা বহু অর্থ ব্যয় করে ছুটে আসতে লাগলেন। আবার পরিচালক হানিস্‌ও তাঁর চ্যাপেল রয়ালের দল নিয়ে এসে ব্লাকফ্রাইয়ারসে অভিনয় দেখাতে লাগলেন—ফলে প্রতিদিনই সেখানে একদল না একদলের অভিনয় অভিজাতদের জন্য চলত।

ইতিমধ্যে পেশাদারী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিও জনমনোরঞ্জনের জন্য নাট্যাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পেশাদারীদলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল দলের যে নাটকগুলি সর্বজন প্রশংসা লাভ করত, তা রাজসভায় অভিনীত হত। এই নাটক রাজদরবারের মাস্টার অব্ দ্যা রেভেল্‌স্ বেছে নিয়ে রাণীর সামনে উপস্থিত করতেন। রাণী তাঁর সভাজনদের কাছে স্বীকার করেছেন যে এই পেশাদারীদের অভিনয়েই তিনি অধিক আনন্দ লাভ করেন। ফলে অনেকেই রাণীকে খুশী করবার জন্য নাট্যদল গঠন করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এই সমস্ত দলগুলি লর্ডদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে লাগল। এই ভাবে একদিকে রাজসভার উৎসাহ পেয়ে অন্যদিকে কিশোর অভিনেতাদের প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে ব্যবসায়ী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নাটক এবং প্রয়োগ শিল্পের যুগপৎ উন্নয়ন করতে লাগল। ফলে সংখ্যায় এবং মানে থিয়েটার ক্রমবর্ধমান হয়ে চলল।

শেক্স্‌পীয়রের সমসাময়িক—নাট্যানুষ্ঠান মধ্যযুগের জনসাধারণের নাটকীয়

ধারা থেকে সোজা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। পরে তা লক্ষণীয় ভাবেই রাজসভার নাটক এবং স্কুল নাটকের ক্লাসিক্ ধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি শেক্সপীয়রের নাটক কি কি উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছিল, তথা মঞ্চকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল—আবার মঞ্চই বা কি ভাবে নাট্য সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল ইত্যাদি সমস্যাগুলির বিশদ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজদের জাতীয় জীবনের সম্মুখে যে বিচিত্র সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল—যে উদ্দীপনাময় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

স্পেনিস আর্মাডার পরাজয়ের পর ফ্রোবিশার (Frobisher), ডেভিস্ (Davis) এবং ড্রেক (Drake) প্রভৃতির নৌ-অভিযান সুরু হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ড ক্রমান্বয়ে যে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল তা কেবল ইংরেজ জাতির গর্বকেই বাড়ায়নি, এর ফলে রেনেসাঁসের আদর্শে বিশ্বাসও তাদের জীবনে বাস্তব রেখায় রূপায়িত হয়েছে। এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে—যে কোন ব্যক্তির জীবনেই এককভাবে পূর্ণতর বিকাশের সুযোগ রয়েছে। রেনেসাঁসের ইংরেজরা ল্যাটিন, গ্রাক, ইতালীয় এবং ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে অন্য কাল ও স্থানের প্রবাহিত ধারায় স্নাত হয়ে উঠেছিল। নোতুন অভিযান, ব্যবসায়ের বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আকার পরিবর্তন করে চলেছিল—সামন্ততন্ত্র মৃতপ্রায়—এক নূতন জগতের জন্মলগ্ন তখন সমুপস্থিত।

সর্বদেশের সর্বকালের মতই ব্রিটিশ থিয়েটার তৎকালীন যুগচেতনা এবং মানুষের প্রতিচ্ছবিই ফুটিয়ে তুলেছিল। সমকালের জীবন, তাদের বিশ্বাস, পূর্বপুরুষের ধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ, সাধারণ রুচি, জীবনের লক্ষ্য সকলি রূপায়িত হয়ে উঠল নাটকে। এলিজাবেথীয় নাটক তাই একদিকে যেমন ছিল জাতীয় ঐতিহ্যময়, স্বতঃস্ফূর্ত, সর্বজনপ্রিয়, অন্যদিকে তাতে তেমনি ছিল অপরিত্যাজ্য সহৃদয়তা, শৈল্পিক উৎকর্ষ, কাব্যিক মাধুর্য এবং বহু বিচিত্র ভাবধারার অভিনবত্ব—যা এর পূর্বে বা পরে অন্য কোন কালে রচিত হয়নি।

আজকের দিনে নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র যে দায়িত্ব নিয়েছে—এলিজাবেথীয় যুগে একমাত্র নাট্যাভিনয়কে সেই দায়িত্ব

পালন করতে হয়েছিল। এই নাটকে তাই স্থান পেয়েছিল গ্রীস ও রোমের নাটকীয় কাহিনী, ইতালির উপন্যাস, ইংরেজ জাতির ইতিহাস—এমন কি সেকালের লণ্ডন শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র যাই হোক, তারা চরিত্র বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠেছিল একান্তই একজন খাঁটি ইংরেজের চিত্ররূপ। এই যে একান্ত ভাবেই সব কিছুর জাতীয়করণ—এখানেই ছিল পূর্বকালের সঙ্গে এলিজাবেথীয় নাটকের ব্যতিক্রম। এই ধারাই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিলেন পরবর্তীকালের রেস্টোরেশন্ যুগের নাট্যকাররাও।

জ্ঞান, বিজ্ঞানের জগতে যত রকম ক্রমোন্নতি হচ্ছিল এলিজাবেথীয় যুগের নাটক তারি সাক্ষ্য বহনকারী। ইতিহাস, বিজ্ঞান, নূতন নূতন নৌ-আবিষ্কার, আইনকানুন, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, জনতার গালগল্প সকলি ঠাঁই পেয়েছিল তাদের নাট্যাভিনয়ে এবং জনসাধারণ প্রবল উৎসাহে তা গ্রহণ করেছিল। সব রকম খবরাখবরকেই সব সময়েই সাদর অভ্যর্থনা জানাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল এলিজাবেথীয় দর্শকদের। মুখের কথার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের জন্য চির-চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই প্রাণচঞ্চল দর্শকরা। শেক্সপীয়রীয় থিয়েটার এবং দর্শক, বলা যায় এরা ছিল অভিন্ন এবং একাত্মক। দর্শকদের আত্মতুষ্টির জন্যই যেন তাদের মধ্য থেকে একদল উঠে এসে নটনটী সেজে অভিনয় করছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞানের বই পড়ার চেয়ে—কানে শোনা ও চোখে দেখা অনেক সহজ—তাই দর্শকদের মধ্যে সর্বপ্রকার ছন্দ, সুর, কাব্য, ভাবাবেগ এবং নাটকীয় কলা-কৌশলই তড়িৎ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলত। একটা জাতির জীবনে এমন সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করা এবং বিরাট জনতার প্রবল অনুরাগ আকর্ষণ করা—আর কোন কালের কোন নাট্য প্রচেষ্টায়ই সম্ভবপর হয়নি।

এলিজাবেথের রাজসভায় প্রথম অবস্থায় মধ্যযুগের মর‍্যালিটি নাটক পরিবর্তিত হয়ে "ক্রোনিকল্" (Chronicle) নাটকের রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রোনিকল্ নাটকের উপর ব্যালাডের প্রভাব ছিল। মাঝে কিছু দিনের জন্য এসেছিল রাজনীতি বিষয়ক নাটক। এলিজাবেথ স্বয়ং নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বটে ; তবে সেটা প্রধানতঃ ছিল রাজসভার আড়ম্বর ও সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য। তিনি চাইতেন সুসজ্জিত "মাস্ক" (Masque) এবং কমেডি নাটক—কিন্তু এযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল যে উচ্চশ্রেণীর নাটক এবং

নাট্যশালা, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল না। মার্লো, শেক্‌সপীয়রের মহান্ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এযুগের প্রাণপ্রাচুর্য এবং পরিবেশের আনুকূল্যে। তাঁদের নাটকের ধাত্রী ছিল সাধারণ রঙ্গালয় যা হাট-মাঠ, সরাইখানা থেকে রূপান্তরিত হয়ে স্থায়ী আকার পেয়েছিল।

রাজসভায় উচ্চশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর নাট্যকাররাই নাটক রচনা করতে থাকেন। ইংরেজী ট্র্যাজেডি গোর্বোডাক্ এবং গ্যামার্ গার্টনস্ নীড্‌ল্ রচিত হওয়ার পর জন্ লিলিকেই (John Lyly) বলা যায় প্রথম স্বাধীন নাট্যকার। লিলি ছিলেন রাজসভার কবি, অতএব তাঁর রচনায় এসে গিয়েছিল কৃত্রিমতা। তিনি রোমাণ্টিক জীবন অনুসরণে লিরিক কমেডি রচনা করেছেন। বলা যায় এর ঠিক বিপরীত ধারার নাটক ছিল "টমাস্ কীডের" (Thomas Kyd) "দ্যা স্পেনিস ট্র্যাজেডি" (The Spanish Tragedy) "জর্জ পীলও" (George Peele) জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন কিন্তু তিনিও ছিলেন রাজসভারই নাট্যকার। রাণীর মনোরঞ্জনই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। "রবার্ট গ্রীনও" (Robert Greene) ছিলেন রাজসভার নাট্যকার কিন্তু আমরা তাঁর মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার শেক্‌সপীয়রের পূর্বসূরীকে পাই। এছাডাও এই সময় অনেকেই রাজসভা ও সরাইখানার অভিনয়ের জন্য তড়িৎগতিতে নাটক লিখতেন, এগুলি আবার তেমনি—তাড়াতাড়িই ভুলে যাওয়াও হত। এই শ্রেণীর অনেক নাটকেরই ক্ষীণ ছায়া সম্পাত হয়েছিল শেক্‌সপীয়রের বলিষ্ঠ রচনায়।

সাধারণ রঙ্গালয়ে শেক্‌সপীয়রের আবির্ভাবের পরে রাজসভা এবং অভিজাতদের রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাট্যকারদের আবির্ভাব হয় তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন "বেন্ জন্‌সন্" (Ben Jonson) "জন্ ফ্লেচার" (John Fletcher) এবং "জন্ ওয়েবস্টার" (John Webster)।

রাজসভা যেমন পাগল ছিল মাস্ক নাটকের জন্য—তেমনিই তারা পাগল হয়ে উঠেছিল প্যাস্টোরাল নাটকের জন্য। পুরাতন মাস্ক থেকেই পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল প্যাস্টোরাল নাটকের। এলিজাবেথের রাজসভায় সেট, সিন ও স্থাপত্য শিল্প ফ্রান্স ও ইতালীয় নিও-ক্লাসিকাল নাট্যশিল্পের অনুকরণেই তৈরী হত। শেক্‌সপীয়রের রচিত রোমাণ্টিক কমেডির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রাজসভার প্যাস্টোরাল নাটকের সজীবতা ও মধুরতার মিশ্রণ ঘটেছিল। ফ্লেচার, জন্‌সন্ ইত্যাদির নাটকের মধ্যেও এই ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্যাস্টোরাল নাটকে নাটকীয়ত্ব বিশেষ ছিল না, তার প্রধান গুণ ছিল মধুর কাব্যশক্তির মধ্যে। জন্‌সন্‌ রাজসভায় নাট্যকার ছিলেন—তাই বহু মাস্ক নাটক রচনা করেছেন, তাঁর নাটকের উপর পেজ্যণ্ট নাটকের ও প্যাস্টোরাল নাটকের প্রভাব ছিল। মিল্‌টন্‌ অনেক "কোমাস্‌" (Comus) রচনা করেছেন—সেগুলি মূলতঃ ছিল রূপক কাব্য (Allegorical Verse) অনেক অভিজাত লর্ডদের প্রাসাদেই তার অভিনয় হয়েছে।

রাণী এলিজাবেথ এবং তাঁর পরবর্তী স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেম্‌সের সময়ে রাজসভা মাস্ক নাটকের জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। ১৭শ শতকের প্রারম্ভ থেকেই ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে একটি উজ্জ্বল নাম দেখা যায়—এই নামটি হল "ইনিগো জোন্‌স্‌" (Inigo Jones), এই প্রতিভাশালী স্থপতি ইংল্যাণ্ডের রাজসভায় ইতালীয় রঙ্গমঞ্চের রীতি প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। তিনি ইতালীতে গিয়ে চিত্রাঙ্কন এবং মঞ্চস্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি ইতালীয় মঞ্চের অঙ্কিত দৃশ্যপট এবং যবনিকা ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা ধরতে পেরেছিলেন এবং ইতালীয় দর্শকশ্রেণী যে সমস্ত শৈল্পিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন সে সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ভিসেন্‌ৎসো ও প্যাল্লাদিয়োর মঞ্চস্থাপত্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লেখেন এবং সেই ধরনের পরিপ্রেক্ষিত সম্বলিত দৃশ্যের অঙ্কন করেন, তার সঙ্গে রোমান স্কেনে থিয়েটারের পদ্ধতিও অনুসরণ করেন। ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে তিনিই সর্বপ্রথম "প্রোসীনিয়াম্‌ ফ্রেম" নিয়ে আসেন। অঙ্কিত দৃশ্যাবলী ছাড়াও তিনি রূপক চরিত্রের জন্য বহু বিচিত্র ধরনের পোষাক তৈরী করান। তাঁর এই সমস্ত নব নব রীতির প্রবর্তনা ইংল্যাণ্ডের সরাই প্রাঙ্গণের মঞ্চকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল—এবং সাধারণ রঙ্গালয়কে এক ক্রমোন্নতির পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এলিজাবেথের রাজসভায় প্রথম আমলে অভিনয়ের জন্য যে প্লাটফর্ম মঞ্চ ছিল, জোন্‌সের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাই প্রোসীনিয়াম্‌ সম্বলিত হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে প্যাস্টোরাল নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ মনোরম দৃশ্যে সজ্জিত হত। দেখা যেত বৃক্ষশ্রেণী এবং কুটীরের মাঝখান দিয়ে সুদূরের পথ চলে গেছে। সেখানে আবার সুসজ্জিত কুঞ্জবনের অনুরূপ মর্মরমূর্তিও স্থাপিত হতে দেখা যেত।

॥ সানড্রি রুফড্-ইন্ থিয়েটার ॥

রাজসভার থিয়েটার এবং সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও এ সময়ে ইংল্যাণ্ডে আর এক শ্রেণীর আবৃতকক্ষ রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। এর নাম ছিল "সানড্রি রুফড্-ইন্ থিয়েটার" (Sundry roofed-in theater)। কোন কারণ বশতঃ না হলেও এগুলিকে "ব্যক্তিগত" (Private) রঙ্গালয় বলা হত। আসলে এগুলি ছিল স্কুল কলেজের রঙ্গালয় এবং অভিজাত শ্রেণীর নিজস্ব রঙ্গালয়। আমরা জানি এই ধরনের রঙ্গালয়ের প্রথম স্থাপনা হয়েছিল ফ্যারান্টের প্রচেষ্টায় ব্লাকফ্রাইয়্যারসে, তিনিই কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্য আলাদা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৯৭ খ্রীঃ জেম্‌স্ ব্লাকফ্রাইয়্যারসের রঙ্গালয়টি লীজ নিয়ে পুনর্গঠন করেন। বারবাজ্ ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও এই থিয়েটারটিকে তিনি সাধারণ রঙ্গালয় হিসেবে ব্যবহার করেননি—অভিজাতদের জন্যই রাখেন। বারবাজের পুত্রও এটি লীজ নিয়ে চ্যাপেল রয়ালের বালকদের দ্বারা অভিনয় করান। সর্বশেষে ১৬০৮ খ্রীঃ শেক্‌সপীয়রের দল এসে এই রঙ্গালয়টির আবার ভাঙ্গা-গড়া করেন এবং "মেনস্ কম্প্যানী" (Men's Company) গঠন করে অভিনয় চালাতে থাকেন। ব্লাকফ্রাইয়্যারস্ তার পূর্বতন হল-ঘর আকৃতি যেখানে নাচ, গান, অভিনয় সকলি হত তা পরিত্যাগ করে আয়ত আকার গ্রহণ করল। রঙ্গালয়ের এক কিনারায় মঞ্চ গঠন করা হল। এই সময়ে রাজসভায় ইতালীয় দৃশ্যসজ্জার একাধিপত্য চলছিল তারি প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল এই অভিজাত মঞ্চে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য বেঞ্চ পেতে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের মত দাঁড়াবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এ ধরনের অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাইভেট থিয়েটারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল "হোয়াইট্‌ফ্রাইয়্যারস্" (White friars) "স্যালিস্‌বেরী কোর্ট" (Salisbury Court) "দ্যা ফিনিক্স ইন্-ড্রুরি লেন" (the Phoenix in Drury Lane) এবং "দ্যা কক্‌পিট্-ইন্-কোর্ট" (the Cockpit-in Court) ইত্যাদি। শেষোক্ত দ্যা কক্‌পিট্-ইন্-কোর্ট রঙ্গালয়টি ইনিগো জোন্‌সের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী করা হয়েছিল, ফলে এখানে ইতালীয় গঠন ভঙ্গিমা অনুসারে স্থায়ী স্থাপত্য গত সেটিং গড়ে উঠেছিল।

এই প্রাইভেট রঙ্গালয়গুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের চেয়ে আকারে অনেক

ছোট হত। দর্শকদের আসন সংখ্যাও তাই হত স্বল্প। অন্যদিকে সাধারণ রঙ্গালয় থেকে এদের প্রবেশ মূল্যও ছিল অনেক বেশি। অভিজাতরা বেশি অর্থব্যয় করতে পারতেন বলেই অভিনয় কালে প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা ঘটত না এবং নানান কলা-কৌশল অবলম্বন করা সম্ভবপর হত।

রাজা এবং লর্ডদের প্রাসাদে রেনেসাঁস্ যুগের প্রারম্ভে ইতালীয় রাজন্যদের প্রাসাদের মতই বড় বড় হল-ঘরগুলিতেও নাট্যাভিনয় হত। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সময় অস্থায়িভাবে হল-ঘরটিকে রঙ্গালয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়া হত। এছাড়া স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিত্তালয়েও নাট্যাভিনয় প্রদর্শনের জন্য আলাদা কক্ষ নির্মিত হতে লাগল। এই সমস্ত মঞ্চে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ক্লাসিক্ ধারার নাটকেরই অভিনয় হত—কখন কখন ছাত্রদের রচিত নাটকেরও অভিনয় হতে দেখা যায়। এই সমস্ত অভিনয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে—অভিনয় কক্ষ প্রায় ৭০´ ফুট দীর্ঘ হত। তাতে একটি "স্ক্যাফোল্ডেড্ স্টেজ" (Scaffolded Stage) থাকত। কিন্তু এই মঞ্চটি কক্ষের মাঝখানে ছিল—কি এক পাশে ছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না। এ থেকে এইটুকু আমরা ধরে নিতে পারি যে এলিজাবেথীয় রেনেসাঁস্ যুগের ইংল্যাণ্ডে নানা ধরনের মঞ্চে নানা ধরনের নাট্যাভিনয় হত।

কোর্ট নাটকের পরিদর্শক মাস্টার অব্ দ্যা রেভেল্‌সের অফিসও দিনের পর দিন বিপুল আকার ধারণ করতে লাগল। তারা ভাল নাটক বাছত, ভাল ব্যবসায়িকদলের কলা-কৌশল দেখে অভিনেতাদের ঠিক করত, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করাত, মঞ্চদৃশ্যাবলী এবং অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করাত। বিভিন্ন কিশোরদলগুলির নাট্যাভিনয় পর্যবেক্ষণের ভারও এদের উপরই ছিল। প্রথম জেম্‌সের (১৬০৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণের পর রাজসভা সুন্দর, সুসজ্জিত মাস্ক নাটকের অভিনয়ের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকল। এরই জন্য এই সময়ে ইনিগো জোন্‌স্ এবং বেন্ জন্‌সন্ দীর্ঘকাল ধরে রাজসভার ছায়াতলে তাঁদের সকল নাট্য এবং মঞ্চ প্রচেষ্টাকে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

॥ সরাইখানার রঙ্গালয় ॥

এবার আমরা ইংল্যাণ্ডের সাধারণ রঙ্গালয় এবং তার নাট্যকারদের মহান্ কীর্তির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে রাখতে চাই যে—

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা যে মার্লো, শেক্‌সপীয়রের অমর সৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হই—এই নাট্যকারদের আবির্ভাবই অসম্ভব হয়ে উঠত যদি তাঁদের সম্মুখে সাধারণ রঙ্গালয় পথ বিস্তৃত করে না রাখত। শেক্‌সপীয়রের মঞ্চ আমরা ভুলে গিয়েছি—মনে রেখেছি তাঁর নাটককে— কিন্তু আমরা যদি তাঁর নাটককেই একটু বিশ্লেষণী চোখে দেখি—তবে দেখব তারি মধ্যে সেই সহজ, সাবলীল মঞ্চ পরিকল্পনার সাক্ষ্য অঙ্কিত হয়ে রয়েছে—ভাষায়, কাব্যে, প্রয়োগ রীতিতে ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করছে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিবেশ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের পেশাদার অভিনেতারা সরাইখানার প্রাঙ্গণস্থিত রঙ্গমঞ্চে স্থায়িভাবে অভিনয় করতে আরম্ভ করে। তখনকার দিনে এই সমস্ত সরাইখানাগুলি দেশজোড়া ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্বরূপ ছিল। সরাইগুলিতে ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র আসত, তার লেনদেন হত, ঘোড়া বদলের এবং ভাড়া নেওয়ারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ-স্থল ছিল এগুলি। কাঁচা টাকা হাতে নিয়ে ব্যবসায়ীরা আসত, দু' চার দিন থাকত, জীবনকে এরা যথাসম্ভব উপভোগ করেই নিতে চাইত। প্রথমে অভিনেতারা বিভিন্ন সরাই-এ অভিনয় দেখিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু যখন দর্শক সংখ্যা বেড়ে চলল, তখন অনেক সরাইর পরিচালকরাই ঘোড়া এবং গাড়ির ব্যবসার মতই নাট্যাভিনয়ের ব্যবসা সুরু করল।

লণ্ডনবাসী এবং সমগ্র ইংরেজ জাতির পক্ষেই সাধারণ রঙ্গালয় যে একমাত্র প্রমোদ উপভোগের স্থান ছিল তা অবশ্য নয়—ছিল প্রধানতম জনপ্রিয় আনন্দসম্ভোগের স্থল। এই ব্যবসায়িক অভিনেতৃদলগুলিকে আশ্রয় দিত বলে অথবা ঐতিহ্যগত কোন যোগসূত্রের খাতিরে এই দলগুলির নামকরণ কোন না কোন অভিজাত ব্যক্তির নামানুসারে হত। যেমন ছিল, "আর্ল অব্ লীস্টার্‌স্ মেন" (Earl of Leicester's Men), "দ্যা লর্ড অ্যাডমিরাল্‌স্ মেন" (The Lord Admiral's Men), "লর্ড হান্‌স্‌ডনস্ মেন" (Lord Hunsdon's Men) "দ্যা আর্ল অব্ পেমব্রোক্‌স্ মেন" (The Earl of Pembroke's Men), "দ্যা লর্ড চেম্বার্‌লিন্‌স্ মেন" (The Lord Chamberlain's Men) ইত্যাদি। এই সব অভিজাত পৃষ্ঠপোষকরা অন্ততঃ ব্যারণের চেয়ে কম হতে পারতেন না। এই প্রথাটা মধ্যযুগ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। যখন ছোট ছোট ভ্রাম্যমাণ দলগুলি সংখ্যায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল বলে তাদের উপর রাজকীয় বিধিনিষেধ আরোপিত হতে

লাগল—তখন তাদের মধ্যে যোগ্যতমরা টিকে থাকবার তাগিদে কোন না কোন অভিজাত লর্ডের আশ্রয় নিতে লাগল। আশ্রয়দাতার নাম তারা অবশ্য সর্বসময়েই ব্যবহার করত না—বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই এই পৃষ্ঠ-পোষকদের নাম তারা গ্রহণ করত। অন্য সময়ে স্বাধীনভাবেই চলত। প্রতিযোগিতায় যারা নিম্ন মানের হত তারা ধ্বংস পেতে বাধ্য হত। এই পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্য শেক্‌সপীয়রের যুগে তো ছিলই—এমন কি রেস্টোরেশন্ যুগেও এর যথেষ্ট প্রাবল্য দেখা যায়। শেক্‌সপীয়রের আমলে লণ্ডনের এই সমস্ত নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট ছিল। পৃষ্ঠপোষকরা এদের কাজকর্ম নিয়ে বড একটা মাথা ঘামাতেন না। দলগুলি এই অভিজাতদের নামের সুবিধাটাই পেত এবং কখন কখন সেই লর্ডদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আদায় করে নিত। প্রকৃতপক্ষে এই দলগুলি স্বাধীন প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জনপ্রিয় সংঘই ছিল। শেক্‌সপীয়রের সময়ে রঙ্গালয়ের প্রকৃত দায়িত্ব কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের হাতে ছিল দেখা যায়। তারাই প্রেক্ষাগৃহের খরচপত্র চালাত, নাটক পছন্দ করত, লাভের অংশ অভিনেতাদের ভাগ করে দিত। অনেক সময় তারা বেশি টাকা দিয়ে বিশেষ অভিনেতা ও মঞ্চবিদ্‌কেও ডেকে আনত।

ষোডশ শতাব্দীতে সমগ্র ইংরেজ জাতিই নাট্যশিল্পের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্থায়ী রঙ্গালয় একমাত্র লণ্ডন শহরেই গড়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মকালে লণ্ডনেরদল বা অন্যান্য প্রাদেশিকদলগুলি গ্রামে ও শহরে নাট্যাভিনয় করে বেডাত। তারা এজন্য নিমন্ত্রণ লিপি ছাপাত ও অন্যান্য নানাভাবে প্রচারকার্য চালাত। যাঁর নামে দল চলত তিনি হয়তো একখানা পরিচয়পত্র অন্য কোন অভিজাত ব্যক্তি বা পৌর প্রধানের কাছে লিখে দিতেন। তারা গ্রামের অভিজাত জমিদারদের প্রাসাদে অভিনয় করলে তাঁর দুর্গের প্রধান হল ঘরে মঞ্চ তৈরী করে নিত। শহর এলাকায় তারা মেয়রের সঙ্গে দেখা করত, মেয়র তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিত বলে আতিথেয়তা জানাতেন এবং তাদের সম্মানে নৈশ ভোজেরও আয়োজন করতেন। সেখানে তারা নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক দর্শকদেরই অভিনয় দেখাত। এর খরচ চালাতে হত পৌর সংস্থাকে। সেই শহরেই তারা এরপরে অভিনয় দেখাত টাউন হলে—এটা সর্বসাধারণের জন্য হত এবং প্রবেশ মূল্য থাকত। এই সব ভ্রাম্যমাণ দলের অস্তিত্বের প্রমাণ ব্রিস্টল, বাথ,

ডোভার, কভেন্ট্রি, নটিংহাম প্রভৃতি বহু প্রাচীন শহরেই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শেক্‌সপীয়র নিজেই তাঁর জন্মস্থান "স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের" (Stratford) 'গিল্ড্‌ হলে' (Guild Hall) যখন আর্ল অব্‌ লীস্টারের দল এসেছিল তখন তাদের অভিনয় দেখেছিলেন।

লণ্ডন শহরে এবং তার আশেপাশে এই সমস্ত দলেরা যখন অভিনয় করত তখন তা বেশির ভাগই হত স্থানীয় সরাইখানার মাঝের চত্বরে। মধ্যযুগের সরাই চত্বরগুলি অভিনয়ের পক্ষে যথেষ্টই উপযোগী ছিল। এই সরাইগুলির গঠন ভঙ্গিমা প্রায় সর্বত্রই এক রকমের হত। এর এক দিকে একটি সুবিস্তৃত তোরণ থাকত, তা দিয়ে বোঝাই মাল নিয়ে ঘোড়া ও গাড়িগুলি প্রবেশ করতে পারত। এই তোরণ পার হয়ে ছিল বিরাট চত্বর— তার চারদিকে ঘিরে সরাইর বহুতলা উচ্চ গৃহগুলি। বাড়িগুলির চত্বরের দিকে মুখ করে বারান্দা ও অলিন্দ তার পেছনে থাকত ঘরগুলি,—এই অলিন্দ এবং বারান্দাগুলিই গ্যালারীর কাজ করত, এই গ্যালারী ও অতিথি-ভবনের পেছনের দিকে থাকত প্রধান প্রবেশ পথ। থিয়েটারদলের একজন সেখানে দাঁড়িয়ে যারা চত্বরে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে আসত তাদের টিকিট নিত। মধ্যযুগের এই চত্বরের এক কিনারে ভ্রাম্যমাণদলের ওয়াগন্‌ মঞ্চ এনে দাঁড় করিয়ে অভিনয় দেখানো হত—সেই প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ীই ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে এর উপকরণ এবং আয়োজন ছিল অত্যন্ত স্বল্প এবং অস্থায়ী। সরাইর এই নাট্যমঞ্চ কতকগুলো মদের পিপের উপর কাঠের তক্তা পেতে প্লাটফর্ম তৈরী করে করা হত। প্লাটফর্মটা চত্বরের সুবিধা মত কোন একদিকে বসান হত। সরাইর ইতরজনেরা চত্বরে দাঁড়িয়ে হৈ-হুল্লোড় করত এবং অভিনয় দেখত—অর্থশালী অতিথিরা গ্যালারীতে বসত বা দাঁড়াত। কখন বা সরাই মালিকের সঙ্গে থিয়েটার দলের বন্দোবস্ত থাকত এবং সেই অনুসারে বাইরের দর্শকরাও টিকিট করে এসে গ্যালারীতে অভিনয় দেখতে পেত—চত্বরের দর্শকদের চাইতে তাদের টিকিট মূল্য বেশি দিতে হত। সরাইখানার এই মৌলিক ছকটি লণ্ডন শহরে ষোড়শ শতকের শেষ পাদে যে স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তৈরী হয়েছে তাতেও রক্ষিত হয়েছে।

এরপরে পার্লামেন্ট আইন করল যে অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন থিয়েটারদল গ্রামে কিংবা শহরে ঘুরে বেড়াতে পারবে না এবং পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও মফঃস্বলে যেতে হলে সরকারি অনুমোদন লাগবে।

ফলে লণ্ডন শহরে থিয়েটারদলগুলি স্থায়িভাবে একত্রিত হতে লাগল। সেখানেই তারা বেশিরভাগ সময় অভিনয় দেখাত, একমাত্র গ্রীষ্মকালে অনুমোদন মিললে বাইরে যেত। শেক্সপীয়রের সমকালে লণ্ডনে প্রায় ছ' সাতশ সরাইখানা ছিল। অভিজাত সরাইগুলি প্রচণ্ড হট্টগোল, ঝগড়া ইত্যাদির ভয়ে চত্বরে অভিনয়ের অনুমতি দিত না, তা ছাড়া সাধারণ সকল সরাইখানাতেই প্রায় অভিনয় চলত, কিছু টাকার বিনিময়ে থিয়েটারদলের হাতে তারা চত্বর ছেড়ে দিত। এই সব অভিনয় দু'টো কি তিনটের সময় আরম্ভ এত। অভিনয়ের প্রচার কার্যের জন্য অভিনেতারা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে ঢাক ঢোল বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই কতকগুলি কারণ বশতঃ সরাইখানার এই অস্থায়ী নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা বহুরকম বাধার সম্মুখীন হল। প্রথমতঃ সরাইখানাগুলির মালিক যে সমস্ত জমিদারশ্রেণীর অভিজাতরা ছিলেন, তাঁরা ঘড়ি ঘড়ি নিজেদের মতামত পাল্টাতেন, ফলে থিয়েটার দলের ভাগ্যাভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে ছিল না—সরাই-এর মালিকের দয়ার উপরে তাদের নির্ভর করতে হত। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত নাট্যাভিনয় স্বভাবতঃই সরাইখানার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কাজকর্ম এবং হৈ-হাঙ্গামার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হত। ক্রমশঃ অভিনেতৃদলগুলির মধ্যে অসন্তোষ জমা হতে লাগল। ইতিমধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রবল জনপ্রিয়তা কিছু কিছু ব্যবসায়ীলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পরল। তারা লণ্ডনের কতকগুলি বড় সরাই ভাড়া নিয়ে স্থায়ী অভিনয়ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য লেগে গেল। সেখানে সরাই চত্বরে তারা স্থায়িভাবে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করাল। এই নবপ্রচেষ্টায় মঞ্চ যথেষ্ট উন্নত ধরনের হয়ে উঠল; মঞ্চ এবং অভিনয়ের উপকরণও বহু বেড়ে গেল—নাট্যাভিনয়ের দলগুলিরও ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থাপনায় ভাগ্যাভাগ্যের স্থায়িত্ব মিলল। গ্যালারীতে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বসবার জন্য বেঞ্চি পাতা হল। যে ব্যবসায়ী কম্প্যানী সরাই ভাড়া নিত, তারাই নাট্যাভিনয়ের সর্বাধিকারী হত এবং সমগ্র ব্যবস্থাপনার ভার নিত। তারা হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করে প্রচারকার্য চালাত। গেটের সামনে এক পেনি ঢুকতে পারে এমন মুখওয়ালা বাক্স হাতে টিকিটের পয়সা আদায়ের জন্য এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে রাখত। এই সমস্ত ব্যবসায়ী দলগুলির মধ্যে—দ্যা বুল (The Bull) দ্যা বেল (The Bell) দ্যা ক্রস্ কীজ্ (The Cross Keys) দ্যা বেল স্যাভেজ্ (The Bell

Savage) দ্যা বোর্‌স্ হেড্ (The Boar's Head) ইত্যাদি নাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। যতদিন পর্যন্ত না নাট্যাভিনয়ের জন্য স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়েছে ততদিন পর্যন্ত সরাইর নাট্যাভিনয় এই সমস্ত কম্প্যানীগুলির পরিচালনাধীনেই চলেছে।

সরাইখানার একটা বিশেষ ধরনের গঠন ভঙ্গিমা ছিল। আয়তক্ষেত্র প্রাঙ্গণের চারদিক ঘিরে চারটি স্তর বিভক্ত থাকত। এটা ছিল আকাশের নীচে অনাবৃত মুক্তাঙ্গন থিয়েটার। প্রাঙ্গণ ঘিরে সরাইখানার দেয়ালের সঙ্গে দু'তিন সারি গ্যালারী ছিল। এই গ্যালারীগুলি পাশের দিক খোলা থাকত কিন্তু উপরটা হত আচ্ছাদিত। সাধারণত: প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে, গ্যালারী অভিমুখী সিঁড়ির কাছে মঞ্চ তৈরী হত। মঞ্চের পশ্চাতে সম্ভবত: একটা পর্দা থাকত, তার পেছনের অংশ অভিনেতাদের সাজপোষাকের কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। মঞ্চের সন্নিকটবর্তী গ্যালারীগুলি অনেক সময় নাটকীয় ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হত বলে এই স্থান অভিনেতাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকত। সামনের চত্বরটিতে অনায়াসেই তিন, চারশ দর্শক ধরে যেত, তারা একপেনি বা দু'পেনির টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাট্যরস উপভোগ করত। অভিজাত এবং সম্মানিত ব্যক্তিরাও অনেক সময় সরাই প্রাঙ্গণের নাটকে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে আসতেন, তাঁরা বসতেন গ্যালারীতে।

লণ্ডন শহরে সরাইখানার অভিনয় যখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠল তখন কিন্তু নাট্যশিল্পকে কতকগুলি বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হতে হল। ১। প্রথমত: পুরাতন যুগের খ্রীষ্টানদের মত পিউরিটানরা (Puritan) নাট্যাভিনয়ের বিরোধিতা করতে লাগলেন। অভিনেতাদের তাঁরা অসৎ, চরিত্রহীন, ঈশ্বরহীন এবং পৌত্তলিক মনে করতেন। অভিনেতারা জীবনের ভানকারী, মিথ্যাচারী বলে আখ্যা পেতে লাগলেন। রবিবারের আনন্দ উৎসবের প্রতিও ছিল তাঁদের প্রবল বিরূপতা।

২। দ্বিতীয়ত: নগরের পৌর প্রতিষ্ঠান এবং শান্তি রক্ষকরাও আপত্তি তুলতে লাগল। তাদের মতে এখানে প্রচুর অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় হচ্ছিল, আর তার ফলে সমাজ দেহে আবর্জনা স্বরূপ জমা হচ্ছিল কতকগুলি নিষ্কর্মা ও নির্বোধ যুবক। নাট্যাভিনয়ের হুজুকের জন্য নগরের শান্তি সর্বদাই বিঘ্নিত হত। সরাইখানায় এবং রাজপথে নানান উপদ্রব, ঝগড়া, হাতাহাতি, মারামারি এবং খুন-জখম লেগেই থাকত। এই অভিনেতৃগোষ্ঠী

কোন না কোন অভিজাত লর্ডের অনুগত থাকায় নগররক্ষীরা তাদের বাধাও দিতে পারত না, কারণ ব্যাপারটা তা হলে হয়তো প্রিভিকাউন্সিল পর্যন্ত উঠত। ইতিমধ্যে বিরোধীদের হাতে কতকগুলি সুযোগ এসে গেল—প্রথমতঃ লণ্ডন শহরে তখন প্লেগ দেখা দিল, দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে লর্ড মেয়র হয়ে এলেন একজন খাঁটি পিউরিটান। প্লেগের ভয়ে শহরের সর্বপ্রকার জনসমাবেশই বন্ধ করে দেওয়া হল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সুযোগে পৌরসভা সমস্ত রকম নাট্যাভিনয়ও আইন করে বন্ধ করে দিল। অভিনয়ের দলগুলি ভেঙ্গে যেতে লাগল এবং অভিনেতারা দেশময় আবার যাযাবর পাখীর মত ছড়িয়ে পড়লেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৫৮৭ খ্রীঃ মধ্যে প্রায় ২৩টি যাযাবর দল স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অঞ্চলে গিয়েছিল বলে মনে হয়। এরই ফলে শেক্‌সপীয়র তাঁর যৌবনে প্রচুর অভিনয় দেখেছেন এবং অভিনেতাদের সহজ সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছেন। এই সব দলগুলি অভিজাত এবং সাধারণ অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর মানুষেরই চিত্ত বিনোদন করত। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন শেক্‌সপীয়র স্বয়ং। তাঁর নাটকে তাই পণ্ডিত, কবি, যুদ্ধবিদ্‌ এবং সাধারণ মানুষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার চরিত্রেরই সমাবেশ দেখতে পাই। লণ্ডন শহরে প্লেগের বিপদকাল একসময়ে কেটে গেল কিন্তু তখনও নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা অটুট রইল। নাট্যসংস্থাগুলি তাই তাদের অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের কাছে আবেদন নিবেদন করতে লাগল। পরিশেষে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। পৌর প্রতিষ্ঠান কিন্তু থামল না। ১৫৭৪ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর তারা কতকগুলি বাধা নিষেধ নাট্যাভিনয়ের উপর চাপিয়ে দিল—সেগুলো মেনে নিয়ে নাট্যাভিনয় চালানোই অসম্ভব হয়ে উঠল। পৌরসভার এই নূতন আইন অনুসারে সপ্তাহে তিনদিনের বেশি নাট্যাভিনয় করা চলত না। তাছাড়া অভিনয় দেখানোর পূর্বে নাটকের সেন্‌সর করাতে হত। সরাইওয়ালাদের থিয়েটার চালানোর জন্য লর্ড মেয়রের অল্ডারম্যানের (Alderman) কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিতে হত আর তখন প্রপ্রাইটরকে একটা বণ্ডে লিখে দিতে হত যে অভিনয় প্রসঙ্গে কোনপ্রকার বিশৃংখলা বা অনৈতিক ঘটনা ঘটবে না। মেয়রের নিষেধ থাকলে সে নাটক চলত না। এছাড়া কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা শহরে কোন সংক্রামক ব্যাধি চলা কালেও অভিনয় বন্ধ রাখা হত। তদুপরি প্রপ্রাইটারকে থিয়েটারের অনুমতি আদায়ের জন্যও ট্যাক্‌স দিতে হত।

রাণী এলিজাবেথ নাট্যাভিনয় ভালবাসলেও ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি স্বয়ং রাজসভার নাটকই উপভোগ করতেন অতএব সাধারণ রঙ্গালয়ের উপর তাঁর কোন পক্ষপাতিত্বের কারণ ছিল না, যার জন্ম তিনি তাঁর পারিষদদের বিরোধিতার সৃষ্টি করবেন। উপরন্তু আর্থিক ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন, সুতরাং নাগরিক সংস্কার আইনকে তিনি বাধা দিলেন না, বরং সেন্সর ও লাইসেন্স দেওয়ার ভার তিনি মাস্টার অব্ রেভেল্সের হাতে তুলে দিলেন। থিয়েটার কম্প্যানীগুলি এই গুরুভার বহনে ক্রমশঃই একেবারে অসমর্থ হয়ে উঠল।

॥ সাধারণ রঙ্গালয় ॥

শেষ পর্যন্ত "জেম্স্ বারবাজ" (James Burbage) মাথা খাটিয়ে থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখবার জন্য একটি বিপরীত পরিকল্পনা বের করলেন। বারবাজ্ ছিলেন একজন ভাল অভিনেতা, সূত্রধর ও মঞ্চশিল্পী—রঙ্গালয়ের প্রতি তিনি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি লণ্ডনের এক প্রান্তে একটি নাট্যালয় তৈরী করলেন। লণ্ডনের সাধারণ দর্শক যেখানে আসতে পারে কিন্তু লণ্ডন পৌরসংস্থার আইন যাকে স্পর্শ করতে পারে না।

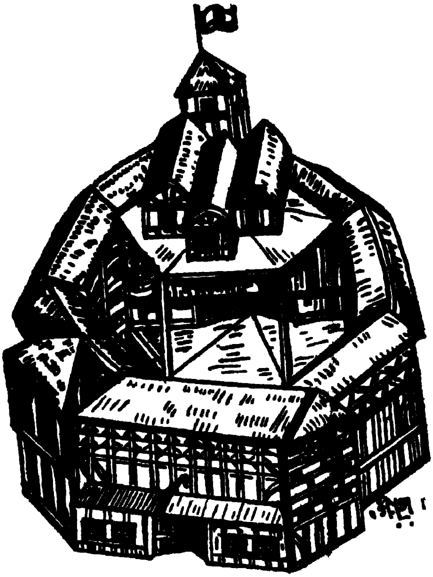
বারবাজ্ রঙ্গালয়ের জন্য বিশপস্‌গেটের যে জমিটি বেছে বের করলেন তা ছিল টেমস্ নদীর অপর তীরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীনে। সে জমি রাজ-অধিকৃত ছিল না বলে পৌর সভার কোন আইনও সেখানে খাটত না। ক্যাথলিক চার্চও রাণীর প্রতি বিরূপ ছিল, তাই তারা থিয়েটার পছন্দ না করলেও এই পতিত জমিটা বারবাজের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হল। বারবাজ্ এক একর জমি নিয়ে "আর্ল অব্ লীস্টারের" (Earl of Leicester) দলের নামে একটি রঙ্গালয় তৈরী করলেন, তিনি ছিলেন এই দলেরই ম্যানেজার। জনবহুল সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের নিকটবর্তী ব্লাক-ফ্রাইয়্যার এবং হোয়াইট্‌ফ্রাইয়্যারে ও ক্যাথলিক চার্চের অধিকৃত স্থান ছিল —বারবাজ্ বেশি ভাড়া দিতে হবে বলে সেখানে গেলেন না, "ক্লিন্‌কের" (Clink) এলাকাও তিনি ত্যাগ করলেন, কারণ এখানে নৈতিক সহানুভূতি পাওয়ার সম্ভবনা ছিল না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বিশপস্‌গেটের নিকটবর্তী "হোলিওয়েল"কেই (Holly Well) যোগ্য স্থান বলে বুঝলেন। যদিও এই এলাকাটা জনবহুল ছিল না—তবুও কয়েকটি সুবিধা এখানে ছিল। এই

স্থানটির একদিকে ছিল নগর উদ্যান (the City Park) অন্যদিকে পড়েছিল খেলার মাঠ "ফিনস্‌বেরী ফিল্ড্‌" (Finnsbury Field) এখানে একটি মনোরম গ্রাম্য পরিবেশ ছিল। সোজা বড় রাস্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে না পেরে, বারবাজ্‌ হোলিওয়েল এবং ফিন্‌স্‌বেরী ফিল্ডের মধ্যবর্তী যে ইটের দেয়াল ছিল তা গর্ত করে পথ বের করলেন। তিনি যে জমিটি বেছে নিলেন তা তার মালিক "গাইল্‌স্‌ অ্যালেনের" (Gyles Allen) কাছ থেকে ২১ বছরের জন্য লীজ নিলেন। এরপরে তিনি ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁস্‌ যুগের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা তৈরী করতে বসলেন। এই পরিকল্পনাটিতে ছিল রঙ্গমঞ্চের বহুধারার একটি সমন্বিত রূপ। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি জায়গাটি লীজ নেন এবং এ বছরেরই শেষের দিকে "দ্যা থিয়েটার" (The Theatre) রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হল। দ্যা থিয়েটার এ যুগের রঙ্গালয় স্থাপত্যের এক মহৎ অবদান হয়ে রইল—সৃষ্টি করল শহরময় এক বিরাট উত্তেজনা। এর পরের বছর "হেনরী ল্যান্‌ম্যান্‌" (Henry Lanman) বারবাজের পার্শ্ববর্তী জমিটি লীজ নিয়ে আর একটি রঙ্গালয় স্থাপন করলেন। এই রঙ্গালয়টির নাম হল "দ্যা কার্টে্‌ন্‌" (The Curtain) সম্ভবত: এই নামটি হয়েছিল যে জায়গায় এই রঙ্গালয়টি তৈরী হয়েছিল তারি নাম থেকে—তার নাম ছিল "কার্টেন্‌ ক্লোজ্‌" (Curten Close)। ১৫৮৫ খ্রী: বারবাজ্‌ দ্যা কার্টে্‌ন্‌কেও নিজ অধিকারে নিয়ে এলেন। এই ভাবেই থিয়েটারে প্রথম একচেটিয়া ব্যবসায়ের আবির্ভাব হল।

এই সমস্ত যখন চলছে তখন "ব্যাঙ্ক্‌সাইডের" (Bankside) বিরাট সম্পত্তির অধিকারী মি: উড্‌ওয়ার্ডের (Mr. Woodward) ধুরন্ধর চাকর 'ফিলিপ্‌ হেন্‌স্লো' (Philip Henslowe) তাঁর প্রভু উড্‌ওয়ার্ডের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকার পেলেন। জমিদারীর কার্যের সঙ্গে তিনি বহুরকম ব্যবসা সুরু করে দিলেন এবং ব্যবসার খাতিরেই ১৫৮৫ খ্রী: ব্যাঙ্ক্‌সাইডে চার্চের অধিকারভুক্ত একখণ্ড জমি কিনে বারবাজেরই পরিকল্পনার নকলে এক উৎকৃষ্ট ধরনের নিপুণ রঙ্গালয় অনেক অর্থব্যয়ে তৈরী করালেন। ১৫৮৭ খ্রী: এর দ্বারোদ্ঘাটন হল—এই রঙ্গালয়টির নাম হল—"দ্যা রোজ্‌" (The Rose)।

পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে লণ্ডন শহরে আরো পাঁচটি সাধারণ রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে বারবাজের "দ্যা গ্লোব্‌" (The Globe)

থিয়েটারই ছিল সুপ্রসিদ্ধ। ১৫৯৯ খ্রীঃ ব্যাঙ্ক্‌সাইডে তিনি দ্যা থিয়েটার রঙ্গালয়ের ভরাডুবির টাকায় "দ্যা গ্লোব্" রঙ্গালয়টি তৈরী করেন। এর

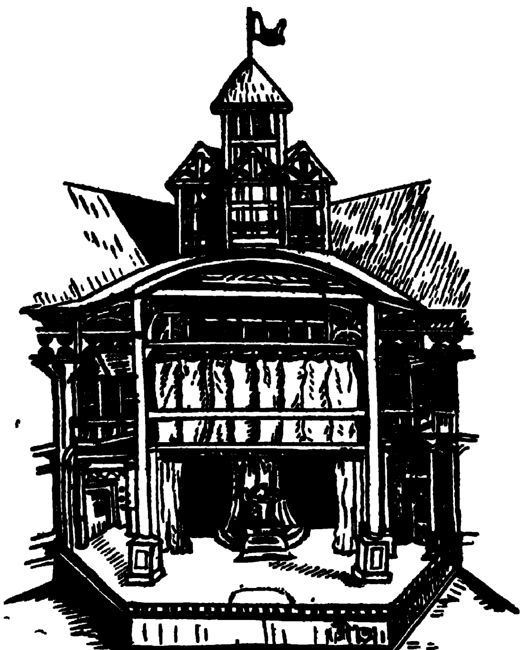


এলিজাবেথীয় সাধারণ রঙ্গালয়।
দ্যা গ্লোব্ থিয়েটার : জন্. সি. অ্যাডম কর্তৃক পুনর্গঠিত।
১। বহির্দৃশ্য।

স্বত্বাধিকারও তিনি অতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গাইল্‌স্ অ্যালেনের কাছ থেকে প্রথম আমলে দ্যা থিয়েটারের জন্য যে জমি লীজ নিয়েছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন। এই সমস্তগুলি রঙ্গালয়েরই মূল পরিকল্পনা ছিল এক।

শেক্‌সপীয়রের যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর গঠন যে ঠিক কি রকম ছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ রয়েছে। তার প্রধান কারণই হল একালের সাধারণ রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি ইত্যাদি ক্ষণভঙ্গুর ও দাহ্য উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছিল—কোন রকম পাথর বা ইটের স্থাপত্য তাতে ছিল না—অতএব বারবার বহু ভাঙ্গাগড়া ও অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পার হতে হতে একসময় তার প্রামাণ্য চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যান্য কতকগুলি

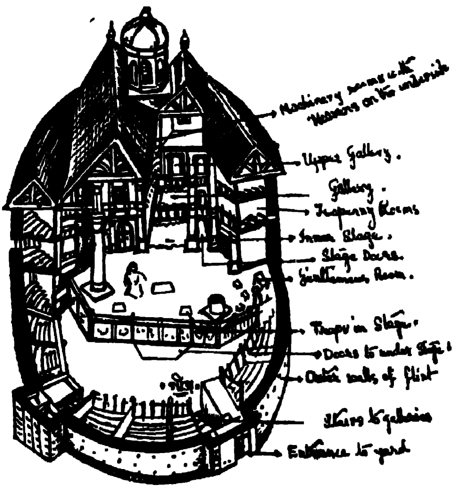
উপকরণের সাহায্যে একালের মঞ্চসম্পর্কে মৌলিক ধারণা আমাদের গড়ে নিতে হয়েছে। সমসাময়িক কালের সাহিত্য বর্ণনায় এবং নাটকের উপস্থাপনায় এ কালের মঞ্চের কতকগুলি খুঁটিনাটি উপকরণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া রয়েছে এ যুগের মঞ্চের কতকগুলি অঙ্কিত চিত্র। ১। আমরা 'ডি উইট্'



দ্যা গ্লোব্—২। অভ্যন্তর দৃশ্য।

(De Witt) অঙ্কিত 'দ্যা সোয়ান্' (the Swan) থিয়েটারের একটি চিত্রের অনুলিপি পেয়েছি। ২। এর কিছুকাল পরবর্তী কালে অ্যালাব্যাস্টারের (Alabaster's) রচিত "রোক্সানা" (Roxana—১৬৩২ খ্রীঃ) গ্রন্থের এবং রিচার্ড লিখিত "মেসালিনা" (Messallina—১৬৪০ খ্রীঃ) গ্রন্থের উপরের পাতায় অঙ্কিত থিয়েটারের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া রেড্ বুলের (সরাই) একটি অঙ্কিত চিত্র পাওয়া যায় "কার্কম্যানের" (Kirkman) 'দ্যা উইট্স্ (The Wits ১৬৭২ খ্রীঃ) গ্রন্থে। ৩। অ্যালেইনের কাগজ পত্রে এবং হেন্‌স্লোর ডাইরীতে "দ্যা ফরচুনের" (The Fortune) ও তথ্যবহুল বিবরণ পাওয়া

যায়। ৪। এর শেষ উপকরণ হচ্ছে এযুগের নাটকে নাট্যকাররা মঞ্চসম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারি অনুধাবন।



Interior design of Elizabethan public
the Swan Playhouse.

দ্যা সোয়ান্ রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর নকশা।

(ক) দ্যা সোয়ান্ থিয়েটারের যে অঙ্কিত চিত্রটি পাওয়া যায় তার স্থাপত্যগত মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা যায় যে একটি উন্মুক্ত "প্লাটফর্ম স্টেজ" প্রেক্ষাগারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এসেছে, কোন কোন সমালোচক চত্বরের অন্তবর্তী তিনদিক মুক্ত মঞ্চের এই পুরোভাগকে "এপ্রোন্ স্টেজ" (Apron Stage) বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যাভিনয় কালে এই অংশের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। মঞ্চের একেবারে পশ্চাদ্ভাগে ছিল একটি দেয়াল—তার দু'পাশে ছিল দু'টি দরজা। মঞ্চাংশের উপরে একটি আচ্ছাদন এগিয়ে এসেছিল—তাকে ধরে রেখেছিল দু'টি স্তম্ভ। মঞ্চের চারদিক ঘিরে তিন শ্রেণী গ্যালারী ঘুরে আসত ফলে প্রেক্ষাগৃহটিকে দেখাত বৃত্তাকার। এর একটি গ্যালারী মঞ্চের পেছন দিকেও ঘুরে যেত—দর্শকরা কখন কখন সেখানেও বসত। ডি উইট্ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে মঞ্চের এই গঠন-বিন্যাস রোমান রঙ্গালয়ের অনুরূপ ছিল। ইতালীয় রেনেসাঁস্ আন্দোলনের

পথ ধরে তা এসেছিল ইংল্যাণ্ডে। তিনি বলেন শেক্‌সপীয়রীয় রঙ্গালয়ের যে 'পিট' (Pit) বা মাঝের উন্মুক্ত চত্বর তাকে তুলনা করা চলে রোমান "অ্যারিণার" সঙ্গে মঞ্চকে বলা চলে ক্লাসিক্ 'প্রোসীনিয়াম্' এবং মঞ্চ দেয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশকে বলা চলে 'বিশ্রাম কক্ষ' (The tiring house) এ ছাড়া চার পাশের বৃত্তাকার গ্যালারী স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রীক "অর্‌খেস্ত্রা" বৃত্তকে। রঙ্গালয়ের ছাদ, আসনশ্রেণী, পোর্টিকো এগুলিকে তিনি পরবর্তী কালের যোজনা বলেছেন। ডি উইট্ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবং নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

(খ) এবার 'দ্যা ফর্‌চুন্" থিয়েটার সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেয়েছি তাই দেখা যাক।

১।, দ্যা ফর্‌চুন্ রঙ্গালয়ের ভূমিটি ছিল সম্পূর্ণ বর্গাকার। বাইরের দিক দিয়ে এর পরিমাণ ছিল ৮০´ ফুট দীর্ঘ ও ৮০´ ফুট প্রস্থ। ভিতরের দিক দিয়ে গ্যালারীর অংশ বাদ দিয়ে চত্বরের মাপ ছিল ৫৫´ ফুট দীর্ঘ ও ৫৫´ ফুট প্রস্থ।

২। গ্যালারীগুলি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট, সর্বোচ্চ তলার উচ্চতা ছিল ১২´ ফুট, দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ছিল ১১´ ফুট এবং সর্বনিম্ন তলার উচ্চতা ছিল ৯´ ফুট। এই গ্যালারীগুলির গভীরতা ছিল ১২´ ফুট ৬" ইঞ্চি। অর্থাৎ বাইরের ৮০´ ফুট থেকে দু'দিকে ১২½´+১২½´=২৫´ ফুট বাদ গিয়ে ভিতরের মাপ থাকত এক একদিকে ৫৫´ ফুট করে।

৩। অভিজাত ভদ্রলোকদের বসবার এলাকা চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল, তা ছাড়া ছিল ২ পেন্স টিকিটের নির্দিষ্ট স্থান।

৪। মঞ্চ এবং তার পশ্চাদ্‌বর্তী বিশ্রামকক্ষের উপরে আচ্ছাদন ছিল। সম্পূর্ণ মঞ্চটি গভীরতায় হত ৪৩´ ফুট এবং এটির এপ্রোন্ অংশ সামনের চত্বরের অর্ধভাগ মত এগিয়ে আসত।

৫। মঞ্চের মেঝেটি শক্ত, নূতন ওক কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত এবং তার সম্মুখ অংশ মজবুত লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকত।

৬। পেছনের টায়ারিং হাউজে আলো প্রবেশের জন্য জানালা ছিল। মঞ্চের ছাদটি নীচের দিকে হেলানো থাকত।

৭। অন্যান্য গঠন প্রণালী ছিল সম্পূর্ণই দ্যা গ্লোব্ থিয়েটারের মত, কেবল স্তম্ভগুলি গ্লোবের মত বৃত্তাকার না করে করা হয়েছিল চতুষ্কোণ।

(গ) রোক্সানা গ্রন্থের অঙ্কিত চিত্রে পরিষ্কার দেখা যায় যে মঞ্চের পশ্চাৎ-অংশের উপরদিকের গ্যালারীও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মেসালিনা এবং স্বা উইট্স্ গ্রন্থদ্বয়ের চিত্রিত নকশায় পাওয়া যায় যে মঞ্চের পশ্চাদ্‌দেয়ালটি যবনিকা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত। আবার রোক্সানা ও মেসালিনার নকশায় দেখা যায় যে মঞ্চের সম্মুখ দিক বর্ধিত হয়ে এসেছে এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে।

(ঘ) এইবার আমরা এলিজাবেথীয় মঞ্চ সম্পর্কে সর্বশেষ প্রমাণের উল্লেখ করব; তা হল এর সমকালে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে মঞ্চ সম্পর্কিত যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে তাই বিশ্লেষণ করে দেখা। নাট্যকার কোথাও মঞ্চ নির্দেশ স্পষ্টভাবে লিখে দেন আবার কোথাও তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন না,—কিন্তু অঙ্ক বিভাগ, দৃশ্য বিভাগ ইত্যাদি এমন ভাবেই করেন যা সমকালীন মঞ্চে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর। "থিয়েটার" কেবল মাত্র নাট্য-সাহিত্য নয়—নাটক, মঞ্চ ও অভিনয় ক্রিয়ার একটি সমন্বিত প্রয়োগশিল্প। এই জন্যই দেখা গেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সংশ্লিষ্ট থেকেছেন এবং তাঁদের সেই প্রয়োগশিল্পগত জ্ঞান নাট্যরচনা শৈলীতে কাজে লাগিয়েছেন। সুতরাং রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটকের কিছু কিছু অংশ উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন মঞ্চে তার সম্ভাব্য রূপটি ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে নাট্য রূপায়িত করার এই বাস্তব সুবিধাগুলি তাঁর নাটকের গঠন রীতিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

আসুন আমরা এবার কল্পনায় শেক্সপীয়রের কোন নাটকের কিছু অংশ সেকালের রঙ্গমঞ্চেই প্রত্যক্ষ করে আসি।

টেমস্ নদীর অপর পার থেকে ঐক্যতান বাদন জানিয়ে দিচ্ছে আজ নাট্যাভিনয় হবে। রঙ্গালয়ের উপরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ থেকে এই সুরধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে। আর রঙ্গালয়ের একেবারে উপরে উড়ছে একটি ছোট কালো নিশান—কারণ আজ শেক্সপীয়রের "ওথেলো" কিংবা মার্লোর "ডাঃ ফস্টাস্" নাটকের অভিনয়। ওই কালো নিশানটি ট্র্যাজেডির চিহ্ন। আবার যেদিন হবে "অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্" অথবা "এ মিড্ সামার্ নাইট্স্ ড্রিম্" নাটকের অভিনয় সেদিন থিয়েটারের শীর্ষে উড়বে একটি শুভ্র পতাকা —ওটি কমেডির চিহ্ন।

দ্বিপ্রহর থেকেই দলে দলে নগরবাসীরা ছুটছে থিয়েটার এলাকায়,

অপরাহ্ণ অর্থাৎ বেলা তিনটে নাগাদ অভিনয় সুরু। খড়ের চাল ও কাঠের বেড়ায় চারদিক ঘেরা রঙ্গালয়টি। সামনে প্রবেশ পথ—রঙ্গালয়ে ঢুকলে তিনদিকে রয়েছে দর্শকদের গ্যালারী তা প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে রঙ্গ-মঞ্চের উপরের অংশের সঙ্গে মিশে ঘুরে এক হয়ে গেছে। মাঝখানের খোলা অংশে রয়েছে সাধারণ দর্শকদের দাঁড়িয়ে দেখবার জন্য উন্মুক্ত চত্বর বা পিট এবার দেখা গেল রঙ্গমঞ্চের প্রধান স্থাপত্য অংশকটি, তাতে রয়েছে—

১। চত্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট "এপ্রোন্ স্টেজ"—তিন দিকেই দর্শকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। এটি যেন পিটের-ই এক অখণ্ড অংশ। এই এপ্রোন্ তিনদিকে অনুচ্চ রেলিং দিয়ে ঘেরা।

২। সুবৃহৎ এপ্রোনের পেছনে প্রোসীনিয়াম্ অংশ। প্রোসীনিয়ামের পেছনে দেয়াল, তাতে তিনটি দরজা। পাশের দু'টি ছোট দরজা অভিনেতাদের সাধারণ প্রবেশ-প্রস্থান পথ। মাঝের দরজাটি বড। প্রোসীনিয়ামের উপরে আচ্ছাদন রয়েছে, মঞ্চের উপর দু'টি স্তম্ভ সেই আচ্ছাদন ধরে আছে। এই অংশটি এপ্রোনের চেয়ে পরিমাপে অনেক ছোট।

৩। পেছনের দেয়ালে মাঝের বৃহৎ দরজাটি পর্দা দ্বারা আবৃত, এই যবনিকাটি সরিয়েই "ইনার্ স্টেজ" অথবা মঞ্চের অভ্যন্তর অংশ দেখানো হত।

৪। এই ইনার্ স্টেজের উপরে রয়েছে "আপার্ স্টেজ" বা মঞ্চের উর্দ্ধাংশ। এর সামনে রয়েছে রেলিং ঘেরা ব্যালকনি—পেছনে পর্দা ঢাকা বৃহৎ দরজা, যা দিয়ে দোতলার গৃহাভ্যন্তর দেখানো যায়।

৫। মঞ্চের সর্বোপরি রয়েছে ক্ষুদ্র একটি কক্ষ, এখানে সঙ্গীত শিল্পীরা বসেন।

৬। কাঠের মঞ্চপীঠের নিম্নাংশ ফাঁপা। এই মঞ্চপীঠে অর্থাৎ এপ্রোন্ ও প্রোসীনিয়ামের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে অন্তত চারটি গুপ্তদরজা বা "ট্রাপ-ডোর্"।

রঙ্গমঞ্চের যে এই বিভিন্ন স্থাপত্যাংশের উল্লেখ করলাম তার প্রথম চারটি, অর্থাৎ এপ্রোন্, প্রোসীনিয়াম্, ইনার্ স্টেজ ও ব্যালকনি সহ আপার্ স্টেজ—এরাই ছিল নাটকের অভিনয় ক্ষেত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে কোথাও না থেমে পরপর মঞ্চের চারটি অংশেই অভিনয় করে যাওয়া যেত। এজন্যই এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের স্থান এবং কালের কোন অনুশাসনই মানতে হয়নি। মঞ্চে অঙ্কিত দৃশ্য, সেট, ইত্যাদির বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না।

কিছু কিছু মঞ্চ উপকরণ বা "স্টেজ প্রপস্" হলেই চলত, মাঝে মাঝে গুলি-গোলা, কামান, ধোঁয়া বা তরবারি যুদ্ধ এসব থাকত। কিন্তু মঞ্চে উপকরণ বাহুল্য না থাকায় এবং একাধিক অভিনয় ক্ষেত্র থাকায়, প্রবল গতিবেগের যে সম্ভাবনা ছিল তা নাট্যকারদের নাট্যরচনার কলাকৌশল দেখলেই বোঝা যায়।

এখন আমরা ওথেলো নাটকখানিই শেক্সপীয়রীয় মঞ্চে অভিনীত হতে দেখব।

নাটকের নাম—

ওথেলো (Othello) রচনা ১৬০৪ সালে।

দ্যা মুর অব্ ভেনিস্ (The Moor of Venice)

ভেনিস্ শহরের মুর।

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য।

নাটকে স্থান নির্দেশ রয়েছে : "ভেনিস্। এ স্ট্রীট্", অর্থাৎ ভেনিস্ শহরের একটি রাজপথ।

প্রথা অনুযায়ী এক ব্যক্তি "ভেনিস্" নাম লেখা প্লাকার্ড দেখিয়ে জানিয়ে গেল অথবা ঘোষণা করল—স্থান : ভেনিস্; রাজপথ। দর্শকরা এতেই অভ্যস্ত, অতএব তারা ভেনিস্ শহরের কোন কাল্পনিক দৃশ্যসজ্জা চাইল না, তা ছাড়া নাট্যকারও জানেন মঞ্চে উপকরণের স্বল্পতা তাই উল্লেখ করলেন "রাজপথ"। মঞ্চের এপ্রোন্ অংশকে রাজপথ ভেবে নিতে এই প্রথায় অভ্যস্ত দর্শকদের কোন কষ্টই হল না। আসবাব-পত্রেরও প্রয়োজন রইল না।

এই দৃশ্যের মোট লাইন সংখ্যা ১৮১—অতএব বলা চলে মাঝারি আকারের দৃশ্য। এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে পশ্চাদ্দেয়ালের দুই পার্শ্ববর্তী দরজা দিয়ে অর্থাৎ প্রোসীনিয়ামের অংশ পার হয়েই অভিনেতারা যাতায়াত করছেন,—অভিনেতাদের মূল অভিনয় ক্ষেত্র এপ্রোন্ হলেও তাঁরা প্রোসীনিয়ামের এলাকায়ও বিচরণ করতে পারছেন।

প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান : ভেনিস্ শহরের আর একটি রাস্তা (Another Street)। এবারে দৃশ্য পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই হচ্ছে না। প্রথম দৃশ্যের শেষ

অভিনেতাদল চলে গেলে দ্বিতীয় দৃশ্যের অভিনেতারা প্রবেশ করলেন। সময়ের একটি নির্দেশ আছে, ওথেলো ও ইয়াগোর অনুচরদের হাতে মশাল (torches) রয়েছে। সুতরাং সময় : রাত্রি। এই দৃশ্যে মোট পংক্তিসংখ্যা ৯৯—দৃশ্যটি বেশ ছোট।

প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান : পরিষদ কক্ষ (A Council Chamber)। ডিউক এবং সেনেটরর বসে আছেন টেবিল ঘিরে, অন্যান্য সরকারি-কর্মচারী ও অনুচররা দাঁড়িয়ে আছেন।

দৃশ্যারম্ভে এই হল নাট্যকারের নির্দেশ।

এবার আমরা কল্পনায় দৃশ্যটি সাজিয়ে নেব। মন্ত্রণা-কক্ষটি (পরিষদ) প্রোসীনিয়ামের এলাকায়ই সাজানো হল। অভ্যন্তর মঞ্চের (Inner Stage) সম্মুখবর্তী যবনিকার সামনে ডিউকের সিংহাসন। তাঁর দু'পাশে অর্ধ-বৃত্তাকারে সভাজনদের আসন। আশে পাশে পেছনে অন্যান্যরা দাঁড়িয়ে। প্রোসীনিয়ামের পশ্চাদ্‌দেয়ালটিই স্বল্প ইঙ্গিতে সভা-কক্ষ বুঝিয়ে দিচ্ছে। কয়েকটি কাষ্ঠাসন এবং দরকার হলে ডিউকের সামনে একটি টেবিল রাখলেই দৃশ্যটি সাজানো হল। ডিউকের পশ্চাদ্‌বর্তী পর্দা একটি সঙ্গতরূপ ফুটিয়ে তুলছে।

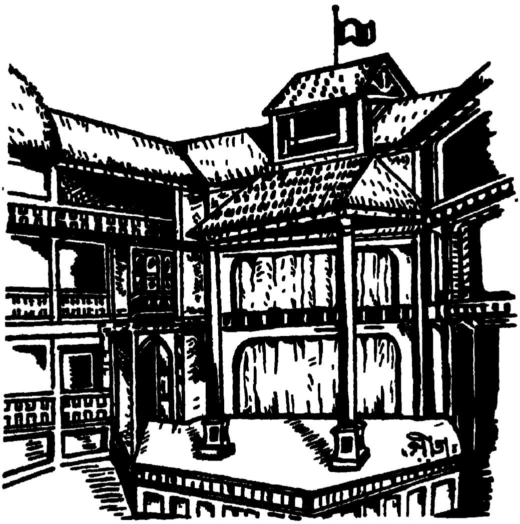
দৃশ্যটি বেশ বড়। মোট পংক্তি সংখ্যা ৩৯০। গদ্যে, পদ্যে মেশানো। এই দৃশ্যে ওথেলোর একটি বৃহৎ ভাষণ আছে। তার প্রতি ডেস্‌ডেমোনার প্রণয় জাগরণের আনুপূর্বিক বর্ণনা। এটি স্বগতোক্তি নয়—একক ভাষণ। ওথেলো এই দীর্ঘ উক্তির কালে এপ্রোন্‌ ও প্রোসীনিয়াম্‌ দুই-ই ব্যবহার করেছে। এপ্রোন্‌টি সম্পূর্ণই সে এবং ডেস্‌ডেমোনা, ইয়াগো ইত্যাদি যে সমস্ত চরিত্র পরে মঞ্চে প্রবেশ করেছে তাদের ব্যবহারের জন্য খোলা ছিল। এখানেই প্রথম অঙ্ক শেষ।

মঞ্চের এই এপ্রোনের অংশ আরো একটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই ব্যবহৃত হত বলে আমাদের ধারণা। তা হল প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির দীর্ঘ স্বগতোক্তি অভিনয় কালে। এ ধরনের প্রখ্যাত স্বগতোক্তি একালের সব নাট্যকাররাই যে রচনা করতে পেরেছেন তা নয়। সর্বপ্রথম মনোমুগ্ধকর স্বগত ভাষণ আমরা পাই ক্রিস্টোফার মার্লোর "ডক্টর ফস্টাস্‌" নাটকে।

এই ধরনের বৃহৎ স্বগতোক্তি দ্বারা দর্শকসাধারণকে বিমুগ্ধ করে রাখতে হলে নাট্যকারের একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন ; তা হল শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রতিভা। এই বিশেষ প্রতিভা ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে অবিসংবাদীরূপে ছিল দু'জনার —ক্রিস্টোফার মার্লো এবং উইলিয়ম্ শেক্‌সপীয়রের। শেক্‌সপীয়র তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে এই ধরনের ভাষণ বহুল ব্যবহার করেছেন। লেডি ম্যাকবেথের মুখে, হ্যামলেটের মুখে, ওথেলো এবং কিং লীয়রও বলেছে। এদের উক্তি বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ লিরিক কাব্যের সমতুল্য— যার আবৃত্তিমাত্রই রসিক শ্রোতার চিত্ত রসবিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। নাটকের এই বিশেষ অংশগুলির মধ্যে বহিরঙ্গের কোন নাটকীয় ক্রিয়া-সংঘাত (Action) নেই—প্রধান চরিত্র একাকী আপন মানস লোকে বিচরণ করছে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে খোরাস তার কাব্যময় উক্তিতে ঘটনা ও চরিত্রের যে বিচার বিশ্লেষণ করত, তার সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত দিত—এলিজাবেথীয় নাটকের সুবৃহৎ স্বগতোক্তিগুলিও স্থান বিশেষে সেই কাজই করেছে। খোরাসের অভিনয়ের জন্য কোন মঞ্চ বা দৃশ্যসজ্জা ছিল না, ছিল "অর্কেস্ট্রা" কারণ— নাটকের এই অংশ ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হত না—শ্রোতাদের শ্রুতিতে নির্ভুল বাক্য সুললিত কণ্ঠে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এলিজাবেথীয় মঞ্চ এদিক থেকে স্বগতোক্তির পক্ষে ছিল আদর্শ স্থানীয়। আমরা কল্পনা করতে পারি মঞ্চের সম্মুখবর্তী যে অংশ চত্বরের দর্শকদের মধ্যে এগিয়ে এসেছে সেই এপ্রোন্ মঞ্চে এগিয়ে এসে—অর্থাৎ মূল মঞ্চ ছেড়ে দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়েই চরিত্র এই স্বগতোক্তি করত। চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের জন্য কোন মঞ্চোপকরণের প্রয়োজন ছিল না—দর্শকরা তাদের মধ্যে দণ্ডায়মান অভিনেতার প্রতিটি কথা শুনতে ও বুঝতে পারত। মঞ্চের নিরাভরণতা ট্র্যাজিক্ নায়কের বিষাদকে মূর্ত করে তুলত।

এলিজাবেথীয় মঞ্চ যে বিরামবিহীন ভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর অভিনয়ের পক্ষে একান্তই উপযোগী ছিল তা আর দু' একটা দৃশ্য পর্যালোচনা করলেই আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নিতে পারব। এবার আমরা উদাহরণ হিসেবে একটি শেক্‌সপীয়রের কমেডি গ্রহণ করব "দ্য মার্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিস্" (The Merchant of Venice)। এটি ওথেলোর আট বছর পূর্বে—১৫৯৬ সালে রচিত, বলা যায় নাট্যকারের প্রথম যুগের রচনা। এই নাটকেরও পরপর কয়েকটি দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব নাট্যকার

রঙ্গমঞ্চের প্রতি কতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে দৃশ্যগুলি একের পর এক সজ্জিত করেছেন। একবার সম্মুখ মঞ্চে, একবার অভ্যন্তর মঞ্চে কোথাও সময়ক্ষেপ না করে এবং বিরাট গতিবেগ সৃস্টি করে নাটক এগিয়ে চলেছে।



এলিজাবেথীয় মঞ্চ : আনলোকালাইজড্
নির্দিষ্ট স্থান বাচক নয়।

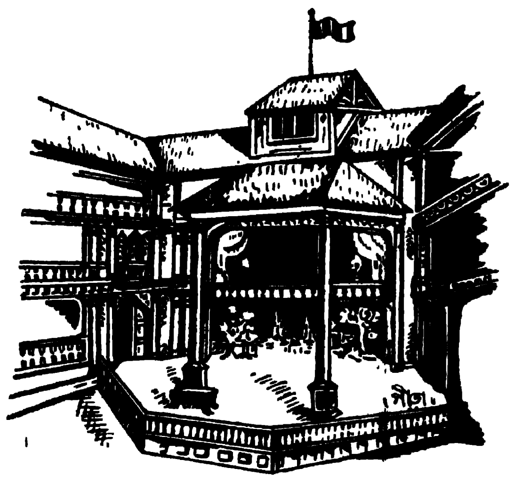
॥ দ্যা মার্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিস্ ॥

বা

ভেনিস্ নগরীর সওদাগর

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য : নাট্যোল্লিখিত স্থান :—ভেনিসের একটি রাস্তা। মঞ্চে প্লাকার্ড টাঙ্গিয়ে বা ঘোষণা করে মুহূর্তেই ভূমণ্ডলের যে কোন স্থান বুঝিয়ে দেওয়া যেত। ভেনিস্ থেকে বেলমোণ্টে যাতায়াত তাদের কাছে কোন সমস্যারই বিষয় ছিল না। কল্পনা করা চলে মঞ্চে এই দৃশ্য দেখানোর সময় মঞ্চের পেছনের বৃহৎ পর্দাটা টানা থাকত ইনার্ স্টেজকে ঢাকা দিয়ে এবং মঞ্চের সম্মুখবর্তী অংশ অর্থাৎ এপ্রোন্ স্টেজে অভিনয় চলত।

২য় দৃশ্য : স্থান—বেলমোণ্ট। পোর্শিয়ার প্রাসাদের একটি কক্ষ। এই কক্ষ দেখানোর জন্য সম্ভবত: পশ্চাতের পর্দা সরিয়ে সজ্জিত অভ্যন্তর অংশ দেখানো হত। সেখানে আসবাবপত্র এবং দৃশ্যাবলীর সাহায্যে পোর্শিয়ার



এলিজাবেথীয় মঞ্চ : লোকালাইজড্।
নির্দিষ্ট স্থান বাচক : ব্যালকনি ও অভ্যন্তর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

কক্ষটি সাজানো থাকত। পোর্শিয়া ও নেরিসাকে গৃহাভ্যন্তরে দেখা যেত, অতঃপর তাদের কথারম্ভে তারা নিশ্চয়ই মঞ্চের সম্মুখ ভাগে (Front Stage) এগিয়ে আসত, যেখান থেকে তাদের ভালভাবে দেখা ও শোনা যেত।

৩য় দৃশ্য : ভেনিস্। সাধারণ স্থান। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ মঞ্চের সম্মুখ অংশ (এপ্রোন্) দেখানো হত।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ ১ম দৃশ্য : বেলমোণ্ট। পোর্শিয়ার প্রাসাদ কক্ষ। অতএব প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের সেটেই চলত।

২য় দৃশ্য : ভেনিস্। রাস্তা। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের সেট।

৩য় দৃশ্য : ভেনিস্। শাইলকের গৃহে একটি কক্ষ।

সম্ভবত: তখন পর্দার অন্তরালে পোর্শিয়ার গৃহের দৃশ্যাবলী ও আসবাবপত্র ২য় দৃশ্য অভিনয় কালে সরিয়ে নেওয়া হত এবং নূতন দৃশ্য যোজনা করে পর্দা সরিয়ে শাইলকের কক্ষ দেখানো হত।

এইভাবে নাটক এগিয়ে চলত। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরে, কোথাও থামবার বা যবনিকা পাতের প্রয়োজন হত না। অভিনেতাদের চলাফেরা, আচরণ এবং নাটকীয় ঔৎসুক্যে এক ছন্দোবদ্ধ গতিশীলতা এসে যেত। কখন কখন প্রোসীনিয়াম্ দরজার উপরকার রেলিং দিয়ে ঘেরা ব্যালকনিতে অভিনয় দেখানো হত—যেমন রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্ নাটকে। আবার কখন কখন ব্যালকনির পশ্চাদ্‌ভাগের পর্দা সরিয়েও দোতলার অভ্যন্তর দৃশ্য দেখানো হত—যেমন "অ্যান্টোনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার—মনিউমেণ্ট্ দৃশ্য" (Antony and Cleopatra : Monument Scene`।

অতএব এই মঞ্চ পরিকল্পনার আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারি না, কারণ সর্বত্রই দেখি নাট্যপ্রবাহ অক্ষুন্নগতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাট্যকাররাও মঞ্চের গঠন বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখেই নাটকের স্থান নির্বাচন করছেন। শেক্‌সপীয়রের নাটকে বারবার তাই আসছে—রাজপথ, সাধারণ ক্ষেত্র, অরণ্য, দুর্গ সম্মুখ, জাহাজ ঘাট ইত্যাদি—বহির্দৃশ্য। সুনির্দিষ্ট পরিবেশ রচনার প্রয়োজন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে এপ্রোন্ ও প্রোসীনিয়াম্ অর্থাৎ মঞ্চের প্লাটফর্ম অংশটিই অভিনয়ের জন্য যথাযোগ্য। এই বহির্দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসছে অভ্যন্তর কক্ষ।

এবার আমরা নাটকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত মঞ্চ নির্দেশ পাই তারি আলোচনা করব। নাটকের মধ্যে নাট্যকাররা স্পষ্টতঃ যে সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছেন অবশ্যই সেকালের মঞ্চে তা সংঘটিত করার মত যান্ত্রিক পদ্ধতি বা মাঞ্চিক কলাকৌশল ছিল। নাটকের মধ্যে এই স্পষ্ট নির্দেশগুলি কি ছিল এবং কেমন করেই বা মঞ্চে তা রূপ পরিগ্রহ করত তা একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাব।

শেক্‌সপীয়রের এবং এ যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক পর্যালোচনা করলে তার মধ্যে "উপরে" (Above) এবং "অভ্যন্তরে" (Within) বলে মঞ্চ নির্দেশ পাওয়া যায়। এ থেকে শেক্‌সপীয়র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে তৎকালীন মঞ্চ সামনের চত্বরের দিকে খানিকটা এগোন ছিল, মঞ্চের তিন দিক ঘিরে দর্শকরা বসত। মঞ্চের পশ্চাতে যে গৃহ ছিল তা স্থায়িভাবে অভিনয় ক্ষেত্র এবং দৃশ্যাবলী রচনার জন্য ব্যবহৃত হত। মনে হয় মঞ্চের পশ্চাতে সেটিং-এর জন্য প্রকৃত দরজা জানালাই ছিল। মঞ্চের মাঝের

দরজাটি ছিল বিশাল বড়। একটি কক্ষের আসবাবপত্র ও দৃশ্যাবলী সেখানে সজ্জিত থাকত, প্রয়োজনমত তাকে ঢেকে রাখবার জন্য বিরামবোধক একখানি যবনিকা টানা থাকত। এই অভ্যন্তর অংশ বোঝানর জন্যই নাটকে "উয়িদিন্" (Within) শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। মঞ্চের দোতলায় থাকত ব্যালকনি—তার পশ্চাতেও পর্দা ঢাকা একটি কক্ষ থাকত সেই পর্দা সরিয়ে দরজা জানালা সংযুক্ত একটি গৃহের সেট দেখানো চলত। "রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্" নাটকে এই ব্যালকনির ব্যবহার আমরা দেখেছি। তিনতলায় থাকত একটি গ্যালারী, একে বলা হত "আপার্ গ্যালারী" (Upper Gallery)। এই গ্যালারীতে দর্শকরা বসত; কখন দরকার হলে অভিনেতারাও ব্যবহার করতেন। এই তিনতলার গ্যালারীর উপরে একেবারে চারতলায় বসতেন বাদ্যকর এবং সঙ্গীত শিল্পীরা। কারণ "মিউজিক্ এবভ্" (Music Above) এই মঞ্চ নির্দেশ আমরা শেক্সপীয়রের রচনায় যেখানে সেখানে পাই। মঞ্চের খানিকটা অংশ আচ্ছাদিত করে একটা ছাদ ছিল, সম্মুখে দুইটি স্তম্ভ তা ধরে রাখত। এই ছাদটি যে কেবল মাত্র বহিঃপ্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় মাত্র ছিল তা নয়। এখান থেকে ক্রেনের সাহায্যে অভিনেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মঞ্চে ওঠা নামা করানো যেত অথবা কোন চরিত্রের আবির্ভাব তিরোভাবও দেখানো চলত। মঞ্চে এই ছাদের অংশকে বলা হত "স্বর্গ" কারণ "দ্যা হেভেন্স্" (The Heavens) বলে নাটকের বহু স্থানে নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার 'নরক' বা "হেল্" (The Hell)-এর ব্যবহারও হত নাটকে। মঞ্চের নিম্নতলই ছিল "হেল্"। এই হেল্ ছিল গ্রীক হেডিজেরই (Hades) নামান্তর। হেডিজ্ অর্থাৎ প্লুতোর রাজত্ব পাতালের যমালয়। এক্ষেত্রে মঞ্চের নিম্নাংশকে হেল্ ভাবা যথেষ্ট যুক্তিসিদ্ধ। পেছনের দৃশ্যাবলীর অন্তরাল দিয়ে ঢুকে মঞ্চের মধ্যে গুপ্ত দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করা যেত। হ্যামলেট নাটকে তার পিতৃ-আত্মার পরলোক থেকে আবির্ভাব এই পথেই দেখানো হত।

মঞ্চের হেল্‌কে শেক্সপীয়রের নাটকে কোথাও কোথাও "বিনিথ্" (Beneath) বা "নীচে" বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন "হ্যামলেট" নাটকে হ্যামলেটের সঙ্গে তার পিতৃ-আত্মার কথোপকথনের দৃশ্যে রয়েছে।

হ্যামলেট। ডেনমার্কের রাজকুমার (Hamlet : Prince of Denmark)।

প্রথম অঙ্ক : পঞ্চম দৃশ্য। স্থান : দুর্গ প্রাচীর সম্মুখে, প্লাটফর্মের একটি অংশ।

মারসেলাস্ : আমরা ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রভু।

হ্যামলেট : ভাল; আমার তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করো।

প্রেতাত্মা (বিনিথ্ বা নিয়ে) : প্রতিজ্ঞা করো।

... ...

হ্যাম : প্রতিজ্ঞা করো, তরবারি স্পর্শ করো।

প্রেতাত্মা : (বিনিথ্) প্রতিজ্ঞা করো।......

এই দৃশ্যেরই অন্যত্র মঞ্চে যখন হ্যামলেট (Hamlet) ও প্রেতাত্মা (Ghost) রয়েছে, তখন হোরেশিও (Horatio) এবং মারসেলাস্ (Marcellus) হ্যামলেটের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, অন্তরাল থেকে হয়তো পেছনের বৃহৎ যবনিকার আড়াল থেকেই তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—নাট্যকার নির্দেশ দিয়েছেন এক্ষেত্রে 'উয়িদিন্'।

হোরেশিও : (উয়িদিন্ বা অভ্যন্তর—Within)—প্রভু! আমার প্রভু!

মারসেলাস্ : (উয়িদিন্)—প্রভু হ্যামলেট!

হোর : (উয়িদিন্)—দেবতারা তাঁকে রক্ষা করুন।......

এলিজাবেথীয় যুগের এই সাধারণ রঙ্গালয়ের বিভিন্ন গঠনভঙ্গির সমালোচনা করে অনেক সমালোচকই একে প্যাল্লাদিয়ো রচিত 'তিয়েত্রো অলিম্পিকোর' অনুকরণ বলে মনে করেন। মাঝের বিরাট দরজাটি যার পর্দা সরিয়ে অভ্যন্তর দৃশ্য দেখানো হত, তার দক্ষিণ ও বামে আর দু'টি দরজা ছিল। এই দরজা, জানলা, ছাদ এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলি, ইতালীয় ক্লাসিক্ মঞ্চকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃত্তাকার প্রেক্ষাগারের কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ বলেন, সরাই প্রাঙ্গণে "রিং" (Ring)-এর মধ্যে যে ষাঁড়ের লড়াই হত তাই থেকেই সরাইখানায় এবং পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রেক্ষাগৃহের বৃত্তাকার পরিকল্পনা আসে। আবার অনেকে মনে করেন, বারবাজ্ নিশ্চয়ই মূর্খ এবং অমার্জিত গ্রাম্যশিল্পী ছিলেন না, তিনি ইতালীয় রীতিপ্রকৃতি সকলই জানতেন এবং ভিসেন্‌ৎসোর মঞ্চ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বারবাজের পূর্ববর্তী ষোড়শ শতকের "ঘেন্ট্" (The Theatre at Ghent—১৫৩৯ খ্রী:) নামে ডাচ্ রঙ্গমঞ্চে পাঁচটি দরজা ও উপরে ছাদ দেখা যায়। অবশ্য যুগের প্রভাব বশতঃ এই সব সাদৃশ্য ঘটাও কিছু মাত্র বিস্ময়কর নয়।

ইতালীয় ক্লাসিক্ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বারবাজের উপর পড়লেও তাঁকে আরো কয়েকটি বাস্তব সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মঞ্চ গঠন করতে হয়েছিল। প্রথমতঃ সরাইখানার রঙ্গালয়ের প্রভাব বারবাজ্ এড়াতে



ডাচ্ থিয়টার ঘেণ্ট—১৫৩৯ খ্রীঃ।

পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ রোমানধারার ইতালীয় রঙ্গালয়ে যে বিপুল অর্থব্যয় করা হত—নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য সাধারণ রঙ্গালয় গঠন করতে গিয়ে দরিদ্র বারবাজ্ সে অর্থের অংশমাত্রও ব্যয় করতে পারেন নি। অতএব প্যাল্লাদিয়োর মঞ্চসজ্জা এবং অঙ্কিত দৃশ্যাবলী, এর কোন কিছুই বারবাজ্ ব্যবহার করেন নি। অন্যদিকে তিনি অভ্যন্তর মঞ্চ (Inner Stage) এবং উপরের মঞ্চের (Upper Stage) পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বারবাজের মঞ্চ মধ্যযুগের যুগপদ্দৃষ্ট বহু সেট বিশিষ্ট (Multiple Setting) মঞ্চ অবশ্য ছিল না কিন্তু এক ম্যাণ্টপল্ সেটের অভিনয়-অনুকূল সুযোগটি বারবাজ্ পূর্ণমাত্রায়ই তাঁর মঞ্চে পেয়েছিলেন।

আবার এই সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সমস্ত যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ হত

তার মধ্যে দেউস্ একস্ ম্যাখিনার মত ক্রেনের ব্যবহারও ছিল, হয়তো এই ক্রেনের সাহায্যেই ম্যাকবেথের ডাইনীরা আসা যাওয়া করত। কদাচিৎ হয়তো দেখা যেত পেরিয়াক্‌তোই বা এক্কুক্লেমা কিন্তু মূলতঃ মঞ্চের যান্ত্রিক কলা কৌশল মধ্যযুগীয় মিস্ট্রি নাটকের যান্ত্রিক কলাকৌশল দ্বারা একান্তভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল। কোর্টের মঞ্চ বহুকাল ধরেই বজ্র-বিদ্যুতের প্রদর্শন করে এসেছে, ক্রমশঃ তা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে গিয়েছিল। এ যুগের এই সাধারণ রঙ্গালয়ের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তাই অ্যালারডাইস্ নিকল তাঁর "দ্যা ডেভেলপ্‌মেন্ট অব্ দ্যা থিয়েটার" গ্রন্থে বলেছেন :—

"বাস্তব সত্য হল এই যে, বারবাজ্ এবং তাঁর সহকারীরা স্বয়ং শেক্‌সপীয়রের মতই ইতালীয় এবং ফরাসীদের সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পথে তাঁরা ছিলেন একক যাত্রী। এই পথই তাঁদের নূতন আদর্শে এবং নবতম পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।"[১]

মঞ্চ এবং তার সমস্ত পশ্চাৎ-অংশ জুড়ে ছিল অভিনেতাদের রাজত্ব। মঞ্চপীঠের এবং পশ্চাদ্‌বর্তী স্কেনে অংশের পেছনে ছিল পোষাক-পরিচ্ছদের ঘর (Dressing rooms) জিনিসপত্রের ঘর (Prop rooms) এবং অন্যান্য দরকারী যন্ত্রপাতি রাখবার জায়গা। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজসজ্জা মঞ্চের দরজা দিয়ে আনা-নেওয়া করানো যেত তাই তাঁরা ব্যবহার করতেন। মঞ্চগৃহের একেবারে উপরে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ তৈরী করা হত। সেখান থেকেই নাট্যারম্ভের ঢক্কানিনাদ বেজে উঠত। মঞ্চের উপরের ছাদ ও এই গম্বুজটি এবং তদুপরি বিজ্ঞাপক পতাকা রঙ্গালয়ের বহির্গঠন সৌষ্ঠবেরও প্রধানতম অঙ্গ ছিল। অভিনয়কালে বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টির জন্যও যান্ত্রিক কৌশল গ্রহণ করা হত; এমন কি কামান পর্যন্তও ছোড়া হত। তাতেই শেক্‌সপীয়রীয় যুগের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় "দ্যা গ্লোবের" খড়ের চালে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে যায়।

এলিজাবেথীয় মঞ্চের নেপথ্য যে কি রকম ছিল এবং অভিনেতারা মঞ্চে সঠিকভাবে কি সব উপকরণ ব্যবহার করতেন তা সমস্তই প্রায় অজানার অন্ধকার রহস্যে আবৃত। তবু বিশেষজ্ঞরা এসম্পর্কে বহুপ্রকার তথ্যই আবিষ্কার করেছেন এবং তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই বিংশ শতকের শেক্‌সপীয়র বিশেষজ্ঞ "লেস্‌লী হট্‌সন্" (Leslie Hotson—Shakes-

peare's Wooden 'O'—১৯৬০ খ্রী:) তাঁর প্রখ্যাত শেক্‌সপীয়রস্ উডন্ 'ও' গ্রন্থে শেক্‌সপীয়রীয় মঞ্চ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। পুরো শেক্‌সপীয়রীয় রঙ্গালয়টির স্থাপত্য উপকরণ ছিল কাঠ ও খড, এই স্থাপত্যটি পাখীর মত উর্ধ্বাকাশ হতে তাকালে (Bird's eye view) ইংরেজী 'O'-এর আকার বলে ভ্রম হত তাই হট্‌সন্ তাঁর গ্রন্থের এই নামকরণ করেছেন। তিনি তাঁর দ্যা গ্লোব্ থিয়েটারের পুনর্গঠিত নকশা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এলিজাবেথীয় যুগের থিয়েটার-শিল্পীরা খুব ভাল ভাবেই ইতালীয় মঞ্চ শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই জন্যই এযুগের ব্রিটিশ থিয়েটারে পশ্চাতে দৃশ্যপট সংযুক্ত প্রোসীনিয়াম্ স্টেজ (Proscenium Stage এবং সম্মুখে অভিনয়ক্ষেত্রযুক্ত মধ্যযুগীয় প্লাটফর্ম স্টেজ (Platform Stage) এই দুই রীতিরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু তাঁর মতে মূলত: শেক্‌সপীয়রীয় মঞ্চ ছিল ইংরেজী নাটকের মধ্যযুগীয় পেজ্যান্ট ওয়াগনেরই বিবর্তিত রূপ। তিনি সমসাময়িক বহু সূত্র ধরে গবেষণা করে বলেছেন যে পেজ্যান্ট ওয়াগনে যেমন হত তেমনিই এতে মঞ্চের নিম্নবর্তী ফাঁকা স্থানটি অভিনেতারা সাজঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। মঞ্চের চারকোণে যে চারটি গুপ্তদরজা ছিল তাই দিয়ে তাঁরা মঞ্চে আগমন নির্গমন করতেন। দর্শকরা কেবল তিনদিক নয় চারদিকই ঘিরে বসত। মঞ্চের উপরে যে গ্যালারী সেখানেই লর্ডদের বসবার আসন ছিল (Lords' rooms) তাঁরা মঞ্চের দরজা দিয়েই এই গ্যালারীতে উঠে যেতেন। হট্‌সনের মতে মঞ্চে যথেষ্ট পরিমানে দৃশ্যোপকরণ ব্যবহৃত হত। মঞ্চের সমতলে এক বা একাধিক বড় বড় দরজা ছিল, এই দরজা দিয়ে সঞ্চরণশীল বড বড মঞ্চোপকরণগুলি আনা নেওয়া হত। মঞ্চে সম্মুখ যবনিকা ছিল না, অতএব দর্শকদের সামনেই দৃশ্যপরিবর্তন করা হত। এই সময়টা যাতে দর্শকদের কাছে বিরক্তিকর না হয়ে ওঠে তার জন্য উপকরণ সহ ঠেলার সম্মুখভাগে ফুলবাবুর একটি ক্লাউন জমিয়ে বসে থাকত, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হত যেন সে মঞ্চেই অভিনয় করছে, ফলে জিনিসপত্রের আনা নেওয়া সম্পর্কে দর্শকরা আর সতর্ক থাকত না। সেটিং সম্পর্কে হট্‌সনের এই ধারণা যদি সত্যি হয় তবে শেক্‌সপীয়রীয় যুগের মঞ্চ সম্পর্কে দৃশ্য পরিকল্পনা এবং তার ব্যবহার প্রণালী সম্পর্কে পুনরায় ভেবে দেখতে হয়। তা ছাড়া একই যুগের বিভিন্ন মঞ্চে অথবা একই মঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন নাটকে বিভিন্ন রকমের

প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। তার সবগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে এ যুগ সম্পর্কে সকল বিশেষজ্ঞই অন্তত: একটি বিষয়ে একমত—তা হল এ সময়ে লণ্ডন শহরে যে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তৈরী করা হয়েছিল মূলতঃ তারা ছিল একই গঠনভঙ্গির। বাইরের আকারের দিক দিয়ে তারা কেউ ছিল অষ্টকোণ, কেউ চতুষ্কোণ, কেউ ছিল গোলাকার কিন্তু এদের সাধারণ গঠন পরিকল্পনা ছিল অভিন্ন। বারবাজের প্রাথমিক পরিকল্পনাই কিছু ভাঙ্গাগড়া করে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। বারবাজের এই রঙ্গালয় পরিকল্পনাটি গড়ে উঠেছিল সরাইখানার অনুরূপ ছাঁচেই। মঞ্চের এই সাধারণ গঠন প্রায় প্রত্যেক নাট্যকারকেই নাট্যরচনায় প্রভাবিত করেছে—কারণ মঞ্চের এই বিশেষ ধরনের গঠনশৈলী প্রায় সবরকম নাটকেরই ছিল একান্তভাবে প্রয়োগসহায়।

পূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি, নিকল প্রভৃতি পণ্ডিতরা মনে করেন যে, স্থাপত্য সমাকীর্ণ এলিজাবেথীয় মঞ্চে প্যাল্লাদিয়োর তিয়েত্রো অলিম্পিকোর অনুকৃতি রয়েছে। কিন্তু ভেরা মাওরী রবার্টস্ তাঁর "অন্ স্টেজ" গ্রন্থে প্রামাণ্যভাবে বলতে চেয়েছেন যে ইতালীতে তিয়েত্রো অলিম্পিকোর স্থাপনা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের অন্ততঃ দশ বছর পরে। সুতরাং অলিম্পিক থিয়েটারের প্রত্যক্ষ প্রভাব তার উপর পড়েছিল তা স্পষ্টতঃই বলা যায় না। বরং বলা চলে রেনেসাঁসের আরম্ভকালে গ্রীক ও রোমান নাটক এবং মঞ্চের যে পুনর্জাগরণ হয় সেই সূত্রেই রোমান থিয়েটারের ও নাটকের প্রভাব একালের উপর পড়ে। ইতালীয় নিও-ক্লাসিক্ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ইংল্যাণ্ডে পড়েছিল সপ্তদশ শতকে প্রথম জেম্স্ ও প্রথম চার্লসের রাজসভার দৃশ্য পরিকল্পক শিল্পী ইনিগো জোন্সের মাধ্যমে। জোন্স্ রাজসভার নাট্যাভিনয়ের জন্য স্বগ্রথিত "প্রোসীনিয়াম্ তোরণ" (Proscenium Arches), দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য সম্মুখ যবনিকা এবং আকাশের গায়ে মেঘের প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সেরলিওর পরিকল্পিত সেটিংও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে সেরলিও দ্বারা বিশেষ ভাবেই দৃশ্যাঙ্কনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ক্রমশঃ স্টুয়ার্ট যুগের মাস্ক নাটকে সুবিস্তৃত দৃশ্যসংযোজন বেড়ে যেতে লাগল এবং নব নব আবিষ্কারের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। স্টুয়ার্ট রাজসভায় জোন্স্ ছিলেন মাস্ক নাটকের দৃশ্য পরিকল্পক এবং বেন্ জনসন্ ছিলেন

নাট্যকার। এই দুইজন শিল্পী প্রবলভাবে নিজের নিজের শিল্পের অগ্রাধিকার ও আধিপত্য নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতেন এবং সব সময়ই জোন্‌স্ তাঁর যুক্তি পারম্পর্য হারিয়ে ফেলতেন।

এলিজাবেথীয় মঞ্চে পশ্চাদ্‌ভাগের বৃহৎ যবনিকা সরিয়ে যে অভ্যন্তর মঞ্চ দেখানো হত বলে অনেক সমালোচকই উল্লেখ করেছেন তার সম্ভাব্য কল্পনাকে অধ্যাপক হট্‌সন্ অস্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয় যে একজন নাট্যকার তাঁর সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যগুলি দর্শকদের কাছ থেকে অতটা দূরে অভিনীত হওয়াকে অনুমোদন করবেন। তা ছাড়া ওখানে অভিনয় হলে তা মঞ্চের উপরকার গ্যালারীর ভদ্রলোকদের কাছে একান্তই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক হট্‌সন্ এই মতকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে বলেন যে, মঞ্চের অক্ষদণ্ডটি (Axis) তেরছা বা আড়াআড়ি রকমের ছিল। মঞ্চের দক্ষিণ ও বাম দিকের কোণে গর্ত করা থাকত, এই গর্তে খুঁটি বা স্তম্ভ পোঁতা থাকত, তারি সঙ্গে দরজা জানালা সংযুক্ত কাঠের ফ্রেমে পর্দা ঝোলান হত। মঞ্চ পরিচালকগণ নাটক সুরু হওয়ার পূর্বে দৃশ্য সজ্জিত করে পর্দা ঝুলিয়ে দিত। দর্শকচোখের আড়াল থেকেই সম্ভবতঃ নাটকের প্রয়োজন মত যবনিকা টেনে দৃশ্যকে আবৃত কিংবা অনাবৃত করা হত। আবৃত অবস্থায় অস্থায়ী মঞ্চউপকরণ সরিয়ে নূতন মঞ্চ দৃশ্য রচনা করা হত। নূতন মঞ্চ দৃশ্য বসানকে বলা হত "সেটিং" (Setting) এবং দৃশ্য শেষে তা খুলে নেওয়াকে বলা হত "স্ট্রাইকিং" (Striking)। অধ্যাপক হট্‌সনের মতে দৃশ্য-যবনিকা খোলা ও টাঙানয় "সেটিং" ও "স্ট্রাইকিং" এই শব্দ দু'টির ব্যবহার জাহাজের পাল খাটানো (Setting) ও পাল নামানো (Striking) বা গোটানো শব্দ দু'টি থেকেই এসেছে। রঙ্গমঞ্চটা অনেকটা—ভেতরে গর্ত উপরে কাঠের পাটাতন সমন্বিত জাহাজ আকৃতিরই ভাবা হত।

এত আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করার পরেও একথা বলব যে এলিজাবেথীয় মঞ্চের সঠিক আকার প্রকার ও প্রকৃতি আমাদের এখন জানা নেই। আমরা এটুকু বলতে পারি যে এযুগের মঞ্চ অত্যন্ত বর্ণবহুল জাঁকজমকের সঙ্গে লোক-মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। বারবাজ্ যে থিয়েটার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটাই ছিল সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও সুবিধাজনক। এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চই এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যোন্নতির

পক্ষে সর্বাধিক সহায়ক ছিল। এই নাট্যানুষ্ঠান ছিল সকল শ্রেণীর ইংরেজদের পক্ষেই আনন্দভোজ স্বরূপ। অতি বিচিত্র শ্রেণীর জনসাধারণকে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক এবং নাট্যকাররা সমবেত ভাবেই পরিতুষ্ট করতে চেয়েছেন। কারণ ছাপাখানার প্রসার তখন ছিল না, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সার্থকতার উপরই নাট্যকারের নাট্য রচনার সার্থকতা নির্ভর করত। যা কিছু দেনা পাওনা দর্শকরা হাতে হাতেই নাট্যকার ও নট নটীদের তা মিটিয়ে দিত—অতএব সর্বশ্রেণীকে তুষ্ট করেও অমর কবিকীর্তি রচনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা তাঁদের করতে হয়েছে।

॥ শেক্‌সপীয়রের দর্শক ॥

মহাকবি শেক্‌সপীয়র যে দর্শক সাধারণকে তুষ্ট করেছেন তারা যেমন চরিত্রে ছিল বিচিত্র তেমনি শ্রেণীতেও ছিল বিভিন্ন। রঙ্গালয়ের উপর যখন নাট্যারম্ভসূচক ড্রাম বাজত এবং পতাকা উড়ত তখন দর্শকদের আগমন সুরু হত। আসত মজুর শ্রেণীর লোকেরা, শহরের অকর্মণ্য গল্পবাজরা, নিম্ন-শ্রেণীর বেহায়া মেয়েমানুষরা, আগন্তুক ও ভ্রমণকারীরা, অবকাশ উপভোগী যোদ্ধারা এবং সমুদ্রভ্রমণ শেষে ডাঙ্গায় ফিরে আসা নাবিকরা—এরা সকলেই ছিল "পিটের" দর্শক—মাঝের চত্বরে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত। আর গ্যালারীর উচ্চ আসনশ্রেণীর উপর বসত ছাত্ররা, বুদ্ধিজীবী ও কবিরা এবং কিছু কিছু আভিজাত্য প্রয়াসী নাগরিকরা। এছাড়া মঞ্চের উপর বসত ফুলবাবু এবং বিলাসী ও অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা—তারা দেখার চাইতে নিজেদের দেখানোই বেশি পছন্দ করত। এখন আমরা বুঝতে পারব যে, এলিজাবেথীয় যুগের নাটক ও মঞ্চকে কি গভীরভাবে প্রভাবিত ও চালিত করেছিল তার এই অদ্ভুত রকম সংমিশ্রিত দর্শক শ্রেণী। এই দর্শকের একাংশ ছিল কৃষ্টিসম্পন্ন ছাত্র ও কবি, অন্য অংশ ছিল অশিক্ষিত; একদল ছিল অভিজাত শ্রেণীর, অন্যদল ছিল পথের মানুষ; একদল আসত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে, অন্যদল আসত নাটককে ভালবেসে নাটক দেখতে। অতএব এদের মিলিত রুচিকে আমরা সার্বজনীন রুচি বলতে পারি—তারি পরিতৃপ্তি ঘটাতে হত এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের। এযুগের ইংরেজরা ছিল অদম্য শক্তি ও যৌবনের অধিকারী তারা চাইত উৎসাহোদ্দীপক কাব্য ও তড়িৎদ্রুত নাটকীয়-ক্রিয়া। মঞ্চে যদি তারা শ্লথ গতি ও নির্বাপিত

আবাবেগ দেখত তবে ক্ষেপে যেত। দর্শকরা বরং অসংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ পছন্দ করত, কিন্তু উন্নতধরনের কাব্য বিভূতি থাকলেও বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে অধিকাংশ দর্শকেরই ভাষণ শুনবার অবকাশ হত না। মঞ্চের কোন কিছু যদি দর্শকদের একঘেয়ে লাগত তবে তারা তাস কিংবা পাশা নিয়ে বসত। এ ছাড়া সব সময়ই দর্শকদের মধ্যে চলতে থাকত গান করা এবং নানা রকম মিষ্টি দ্রব্য ও ফল আহার করা। অনেক সময় এমনও হত যে নাট্যাভিনয় যদি দর্শকদের বেশিক্ষণ ভাল না লাগত তবে তারা প্রবলভাবে আপত্তি জানাত এবং তাদের ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি শেষ পর্যন্ত রক্তপাতে এসে পৌঁছত। নাট্যাভিনয় ছিল সে যুগের একান্ত উত্তেজনাময়, বিচার বিবেচনাহীন বাস্তব জীবনেরই প্রতিরূপ। সে যুগে মানুষের সামাজিক জীবনে যথেচ্ছাচার ও খুনখারাবি যে যত্রতত্রই চলত তার পরিচয় পাওয়া যায় নাট্যকার গ্রীন এবং মার্লোর অকাল মৃত্যুতে। মজুর, জাহাজী ও বাউণ্ডুলে লোকদের আচরণ প্রায় ভালুক যুদ্ধের মত হয়ে দাঁড়াত। তাই এযুগের নাট্যকার কিংবা অভিনেতাদের অতি সতর্ক থাকতে হত—খেলো ধরনের শিল্পকর্ম হলে চলত না। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের বহুভাবেই সুশিক্ষিত হতে হত। অভিনেত্রী ছিল না—তাই স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ও তাদের জানতে হত। আবার নাট্যকাররাও নাটক রচনার সময় খেয়াল রাখতেন যে পুরুষ অভিনেতাদের দ্বারাই নারী চরিত্রের অভিনয় হবে। কিশোর বয়স্ক ছেলেরাই নারী চরিত্রের অভিনয় বেশি করত। শেক্সপীয়রের মার্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিস্ (১৫৯৬) টুয়েলফ্থ্ নাইট্ (১৬০১) অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্ (১৬০৪) ইত্যাদি বহু নাটকেই দেখি নারী চরিত্ররা যতক্ষণ সম্ভব পুরুষের ছদ্মবেশেই মঞ্চে কাটাত। নাট্যকার এই পরিকল্পনা তৎকালীন অভিনয়কারীদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই যে করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে নারী চরিত্রের এই ছদ্মবেশধারণ তিনি কমেডির রসের সঙ্গে যতখানি খাপ খাওয়াতে পেরেছেন ট্র্যাজেডিতে তা পারেন নি, বড় শিল্পী বলেই সে অপচেষ্টাও তিনি করেননি। তাই তাঁর নাটকে দেখি একজন খাঁটি লেডি ম্যাকবেথ, একজন খাঁটি ডেসডেমোনা। নাট্যকারদের যারা প্রাঙ্গণের দর্শক তাদের খেলো রুচিকে তৃপ্ত করতে হত, আবার যারা ছিল সত্যিকার জ্ঞানী গুণী তাঁদের মার্জিত, সূক্ষ্ম রুচিকেও তৃপ্ত করতে হত। এই সমস্ত মানুষেরাই আজ আমাদের কাছে বিশ্বকবি

শেক্‌সপীয়রের অমর নাটকগুলির পশ্চাৎপট এবং পারিপার্শ্বিক হিসেবে অতি প্রখ্যাত হয়ে রয়েছে।

শেক্‌সপীয়র এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক বিচার করবার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে কোন রঙ্গমঞ্চের জন্য তা সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা একালের রোমান্টিক গঠনভঙ্গির অবাধ গতি-প্রকৃতির মূল তাৎপর্য বুঝতে পারব। পূর্বে এ যুগের প্রভাব সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি—এই যুগ প্রভাবেই ইংল্যাণ্ডের নাট্যকারদের মধ্যে রোমান্টিক ভাবকল্পনা এসেছিল। বিশেষ করে যাঁরা ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার তাঁদের পণ্ডিত লোকদের ক্লাসিক্ ভাবকল্পকে, তত্ত্বজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে তুষ্ট করার কোন বাধ্যতা ছিল না—তাঁরা যে জনসাধারণের সভাকবি ছিলেন তাঁদের মানসলোকই ছিল উদ্দাম আশা আকাঙ্খার রোমান্টিক ভাবাবেগে ভরা। কর্ণেয়্, রাসিনের ভাবাবেগে রোমান্টিকতা থাকলেও রাজসভার মঞ্চ এবং বিচার-বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের ক্লাসিক্ গঠন প্রকৃতি ভাঙ্গতে দেননি। এক্ষেত্রে শেক্‌সপীয়র প্রভৃতির স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। তাঁরা তাঁদের কল্পনাকে যথেচ্ছ রূপ দিতে পেরেছেন। কারণ দর্শক ও মঞ্চ দুই-ই ছিল তাঁদের অনুকূল। মঞ্চে যদি নির্দিষ্ট সেটের জন্য নগণ্য ক্যান্‌ভাসে অঙ্কিত দৃশ্য-সজ্জার সাহায্য নিতে হত তবে নাট্যকারদের ভাবের অসীমতা নিতান্তই ক্ষুণ্ন হত। শেক্‌সপীয়র তাঁর নাটকে দর্শকদের কল্পনা-বিহারের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন মঞ্চে উপকরণের স্বল্পতা থাকায় এবং পরপর চারটি ক্ষেত্রে (এপ্রোন্, প্রোসীনিয়াম্, অভ্যন্তর মঞ্চ ও ব্যালকনি) অব্যাহত গতিতে অভিনয় চলত বলে, নাটকের উচ্চাঙ্গের কাব্য ও পরিবেশ কোন কৃত্রিম উপাদানে নষ্ট হয়ে যেত না। নাট্যকারদের কাব্যোচ্ছ্বাস সুরসিক দর্শকদের কল্পরাজ্যের বল্গা শ্লথ করে দিত।

এ সম্পর্কে নিকলের একটি উক্তি স্মরণ হয়—

"ঝড়ের দৃশ্য যদি নিরাভরণ মঞ্চে অভিনীত হয়—তবেই তার দৃশ্য মায়া অটুট থাকে, আর যদি বৃদ্ধ লীয়রের পশ্চাতে অঙ্কিত দৃশ্য টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় তবে তার চেহারা হয়ে উঠবে চটকদার, তার কথাও মনে হবে বাগাড়ম্বর।"[২]

॥ শেক্‌সপীয়রের পূর্বসূরী মার্লো ॥

সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা এযুগের বৈচিত্র্যময় নাট্যসৃষ্টির কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। জন্‌ লিলি (John Lyly) এবং জর্জ পীল (George Peele) এঁরা দু'জনই পেশাদার বালক-দলের (Boy Company) জন্য নাটক লেখেন। এঁরা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এবং এঁদেরি আমরা শেক্‌সপীয়রের পূর্বসূরী বলতে পারি। কিন্তু একদিকে এঁরা ছিলেন রাজসভার এবং রাণীর মনোরঞ্জনকারী—অন্যদিকে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাধরও ছিলেন না, তাই এঁদের রচিত "কমেডি অব্‌ রোমান্সে"র মধ্যে রয়েছে বালকদেরই উপযোগী হালকা ও অগভীর কাহিনী বিন্যাস। নবযুগের শক্তিশালী থিয়েটার রূপ গ্রহণ করে পেশাদারী বয়স্কদের অভিনয়ে—আসে আরো গভীরতা এবং রসবৈচিত্র্য।

শেক্‌সপীয়রের পূর্বসূরীদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বশেষ ছিলেন—"ক্রিস্টোফার্‌ মার্লো" (Christopher Marlowe) বলা যায় এই পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার অধিকারী। যদি তাঁর পরে শেক্‌সপীয়র নাও আসতেন তবুও মার্লোর স্বল্প রচনাই এলিজাবেথীয় যুগকে ট্র্যাজিক্‌ নাট্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখত। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সরাইখানার কলহে তিনি নিহত হন—তখন তিনি কেবলমাত্র চারখানা নাটক লিখেছেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা থেকে বিশ্ববাসী বঞ্চিত হলেও যে চারখানা নাটক তিনি রেখে গেছেন তাতেই তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও নাট্যদক্ষতার পরিচয় অত্যুজ্জ্বল। ক্রিস্টোফার্‌ মার্লোর সঙ্গে একই বছরে জন্মেছিলেন শেক্‌সপীয়র কিন্তু তিনি তাঁর নাট্যকার জীবন বেশ দেরিতেই সুরু করেছেন, তেমনি তা দুই পুরুষ ধরে সমান গৌরবে চালিয়ে গেছেন। মার্লো তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন অনেক বেশি দুঃসাহসী। দুরন্ত বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন আবার তেমনিই কয়েকটি বর্ষ পরে নির্বাপিত হয়ে গেলেন।

মার্লোর প্রথম নাটক ছিল—"টাম্বার্‌লেইন্‌ দ্যা গ্রেট্‌" (Tamburlaine the Great—সম্ভাব্য ১৫৮৭ খ্রীঃ), তৈমুরের বিশাল বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা সে যুগের ইংরেজ জাতির মানসলোকেরই পরিচয় বহন করে আনে। এই সময় সাধারণ থিয়েটার একটা ভাঙ্গাগড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।

শেক্‌সপীয়রের পূর্বে অতিশয় স্বচ্ছন্দেই এলিজাবেথীয় দর্শকদের সম্মুখে নূতন যুগের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছিলেন মার্লো। তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ —তাঁর চলার ছন্দ ছিল প্রবল, হাতের মশাল ছিল উজ্জ্বল, হৃদয়ে ছিল অভিযাত্রীর দুঃসাহস। টাম্বারলেইন্‌ বড় নাটক নয়, কিন্তু এটা একটা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি। দর্শকদের মনোযোগ এ কেড়ে নিল এর বর্ণোজ্জ্বল কথায়, এর বীরত্বময় কাহিনীতে, এর গুরুগাম্ভীর্যে। মার্লো প্রমাণ করলেন যে, বীরত্ব এবং চরিত্র মাহাত্ম্যও দর্শকদের ধবে রাখতে পারে—সেজন্য খেলো ফচকেমি কিংবা নানান মঞ্চ কৌশল অথবা কোন বহিরঙ্গ জলুসের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কাব্য এবং ভাবাবেগময় কথা সাধারণ দর্শকরাও শুনতে ভালবাসে, অভিনেতাদের পক্ষেও প্রকাশ সুখকর।

মার্লোর দ্বিতীয় নাটক হল "দ্যা ট্র্যাজিকাল হিস্ট্রি অব্‌ ডক্টর ফস্টাস্‌" (The Tragical History of Dr. Faustus—সম্ভাব্য ১৫৮৮ খ্রীঃ)। ডাঃ ফস্টাস্‌ নাটকখানি টাম্বারলেইনের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণই ভিন্নতর ছিল—অর্থাৎ ডাঃ ফস্টাসের রচনা প্রকৃতি আমাদের জানা ট্র্যাজেডির গঠন বিন্যাসেরই অনুরূপ। বস্তুতঃ টাম্বারলেইনে রয়েছে এক বীরচরিত্রের পরপর জয় লাভের গাথা—পরিশেষে এল 'মৃত্যু' কিন্তু ট্র্যাজেডির বহু পরিজ্ঞাত 'পতন' নয়। দর্শক বিস্ময়ে চকিত হয়ে এখানে দেখে একটি মানুষের কি ক্ষমতা, কত সাধারণ জন্ম থেকে সে নিজের পুরুষকারে উঠে এসেছে কত উচ্চে—ভাগ্য এখানে দৈবায়ত্ত নয়। এ কাব্যে গাওয়া হয়েছে মানুষেরই জয়গান। কিন্তু ডাঃ ফস্টাসে আমরা যে মানুষটিকে দেখি তাঁর অতি উচ্চাশাই হয়েছে তাঁর পতন ও ধ্বংসের কারণ। নায়ক চরিত্র ফাউস্ট্‌ চারদিক থেকেই অন্যায় বুদ্ধির জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। টাম্বারলেইন্‌ এদিক থেকে পূর্ববর্তী সকল ট্র্যাজেডি থেকেই ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু ডাঃ ফস্টাস্‌ নিঃসন্দেহেই একখানি "ট্র্যাজিকাল হিস্ট্রি"।

ডাঃ ফস্টাস্‌ নাটকখানি বহুদিক থেকেই নূতন পথের দিশারী। ট্র্যাজেডির নায়ককে যে প্রখ্যাত বংশের রাজা বা রাজপুরুষ হতে হবে এই প্রাচীন ধারণা ও প্রথাগত পন্থাকে মার্লো এখানে ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই নাটকের প্রধান চরিত্রটি রাজপুরুষ নন,—আবার একজন সাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রও নন, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তৈমুরলং বা টাম্বারলেইন্‌ রাজা হয়ে না জন্মালেও শেষ পর্যন্ত রাজা হয়েছিলেন এবং

নাটকের প্রধান অংশেই তিনি সম্রাটের সিংহাসনে আসীন। ডাঃ ফস্টাস্ এর সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফাউস্ট্ তাঁর গ্রন্থাগারের পরিবেশেই আবদ্ধ। তাই ডাঃ ফস্টাস্ আসার পর থেকে নায়ক চরিত্রে বিপ্লব ঘটে গেল। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যোগ্য সাধারণ মানুষ। ফাউস্টের ট্র্যাজিক্ রস বাস্তবলোক এবং বহির্জগৎ থেকে অন্তর্লোকের দিকে তথা আত্মিকতার দিকে ধাবিত হয়। সোনা, রূপায় ঘেরা রাজ চরিত্রেই কেবল ট্র্যাজেডি সম্ভব এ আর নাট্যকাররা মনে করলেন না, এখন মার্লো তাঁদের দেখালেন যে ট্র্যাজেডির প্রকৃত উপাদান রয়েছে অন্তর্লোকে এবং দীনতম চরিত্রও গভীরতম আবেগকে জাগরিত করতে পারে।

এ নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ট্র্যাজেডির উপাদানকে ভাগ্য এবং দৈববাদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নীতিবাদের উপাদানের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা। সবদিক দিয়েই ডাঃ ফস্টাস্ নাট্য বিপ্লবের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে নাট্য বিপ্লবের "এভ্রিম্যান্" (Everyman) থেকে সূচনা হয়েছিল ডাঃ ফস্টাসে এসে তা একটিমাত্র মানবে পর্যবসিত হয়েছে। যে মানুষটির অসাধারণ গুণাগুণ দর্শকদের প্রশংসা পায় ও বিস্ময় বিমুগ্ধ করে তোলে।

মার্লোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল নাটকে নবপ্রচলিত রোমান্টিক গঠন ভঙ্গিকে সম্পূর্ণ কাজে লাগান। ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির ছোট পরিধির মধ্যে চরিত্র বিশ্লেষণ করা, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ ছিল কম। কিন্তু রোমান্টিক গঠন ভঙ্গির নাটকে ডাঃ ফস্টাস্ চরিত্র যে আত্মবিশ্বাস ও উচ্ছাশা দিয়ে যাত্রারম্ভ করেছিল শেষ পর্যন্ত তার একে একে নিভিল দেউটি; ফাউস্ট্ উপলব্ধি করল তার আত্মার চরম পরিণতি—মৃত্যু নয়, পতন নয়, শয়তানের চিরদাসত্ব,—সীমারেখাহীন শূন্যতা।

প্রথমে এ নাটকে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার কথা ফাউস্ট্, টাম্বার্লেইনের মতই বর্ণোজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত করেছে। তার সঙ্গে "মেফিস্টোফেলিসের" (Mephistopheles) জালে আবদ্ধ সর্বহারা মানুষটির কতই তফাৎ, অস্থির চিত্তে একাকী সে অপেক্ষা করছে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা ধ্বনির—যেখানে তার সব শেষ।

আঃ, ফস্টাস্,
বাকী শুধু এক ঘণ্টা তব জীবনের

তারপর চির অভিশপ্ত তুমি।
স্থির হও,-আকাশের অন্তহীন চলমান জ্যোতিষ্ক সকল।
সময়েরে ক্ষান্ত করে দাও—মধ্য-রাত্রি না আসে কখনো।
সুন্দরী প্রকৃতির আঁখি! ওঠো তুমি উদয় শিখরে,
এনে দাও অন্তহীন দিন।
কিংবা এই ঘণ্টাকেই করে দাও,
এক বর্ষ, এক মাস, সপ্তাহ, কি মাত্র একদিন।
যাতে অনুতাপ করে গো ফস্টাস্
রক্ষা পায় অমরাত্মা তার।

ফস্টাসের এই সুবৃহৎ এবং প্রখ্যাত স্বগতোক্তি এই নাটকের চতুর্থ গুণ ব্যক্ত করে। ট্র্যাজেডিতে যুক্তিবদ্ধ লম্বা উক্তির যদিও প্রচলন ছিল—কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য কোন ইংরেজ লেখক এতখানি কাব্যময়, ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণ মঞ্চে আনেন নি। এই সেই প্রখ্যাত স্বগতোক্তি যার সমতুল্য উদাহরণ আর আমরা একমাত্র পাই শেক্‌সপীয়রে। যা দর্শকদের বিমুগ্ধ করে রাখত আত্মবিশ্লেষণে এবং অলৌকিক কাব্য বিভূতিতে। মার্লোর এর পরবর্তী অপর দু'খানা নাটক হল—"দ্যা জু অব্ মাল্টা" (The Jew of Malta) এবং "দ্বিতীয় এডোয়ার্ড" (Edward II), দ্যা জু অব্ মাল্টার প্রভাব রয়েছে শেক্‌সপীয়রের দ্যা মার্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিসের উপরে। প্রধান চরিত্রের বিশ্লেষণ এই দু'খানা নাটকেই চমৎকার, কিন্তু মার্লোর চেয়ে শেক্‌সপীয়রের রচনায় নিষ্ঠুর ভয়াবহতা অনেক কম, এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যও অনেক বেশি। মার্লোর ভাষার আড়ম্বর ও ভাবের ভয়ানকত্বে সেনেকার প্রভাব খুব স্পষ্ট। দ্বিতীয় এডোয়ার্ডকেও মার্লোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায় কারণ এতে তাঁর চরিত্র চিত্রণ অতিশয় নিপুণ।

শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই সময়কার আর একটি নাটক—তা হল "টমাস্ কীডের" (Thomas Kyd) "দ্যা স্পেনিস্ ট্র্যাজেডি" (The Spanish Tragedy)। মার্লোর ফস্টাসের মধ্যে ছিল কাব্যময়তা ও ভাবের গভীরতা আর কীডের মধ্যে ছিল বৈচিত্র্যময় নিপুণ কাহিনীর বিন্যাস। এই নাটকের নায়কও কোন রাজপরিবার থেকে নির্বাচিত হন নি—নাটকখানা প্রতিশোধমূলক।

॥ শেক্‌সপীয়র ॥

শেক্‌সপীয়র তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সকল প্রচেষ্টাই সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপন প্রতিভার সংযোগে যে কালজয়ী, সুগভীর, সুপরিণত নাট্য সৃষ্টি করেছেন—সামগ্রিক মূল্যায়নে তার সঙ্গে একমাত্র সোফোক্লেসের নাট্যাবদানেরই তুলনা করা চলে। তিনি তাঁর নাটকে প্রধান কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর (Sub plot) ধারাগুলিকে অতি নিপুণ হস্তে গ্রথিত করেন। তিনি ট্র্যাজেডি নাটকের প্রথম অংশে কমেডির অনুরূপ মিলন দেখিয়ে, শেষের দিকে ট্র্যাজেডির বেদনাবোধে অত্যন্ত গভীরতা এনে ফেলতেন। তিনি যে সর্বকালের মানুষের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পাচ্ছেন তা কেবলমাত্র তিনি যে মহৎ চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য নয়, অথবা তিনি যে মনোমুগ্ধকর সুললিত কাব্য রচনা করেছেন তার জন্যও নয়—এর প্রধান কারণই হল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ যার ফলে এসেছিল নাটকীয় কলাকৌশলে তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা এবং তিনি তা তাঁর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে অতি নিপুণ হস্তে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধারা ও মধ্যযুগের উত্তরাধিকার দুই-ই আশ্চর্যজনকভাবে ফুলের গায়ে পরিমলের মতো ঐকীভূত হয়ে মিলিয়ে রয়েছে। তাঁর উত্তরসূরীরা এটাই পারেননি—এই বিভিন্ন উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান করে একই সূত্রে গ্রথিত করা, এরই ফলে তাঁর পরবর্তীকালেই নাট্যশিল্পের অবনতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

এলিজাবেথীয় নাট্যশিল্পের উন্মেষ, পূর্ণবিকাশ এবং পতনের রেখাটি ছেদহীন—রাণী এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণের পর (১৫৯৪ খ্রীঃ)-এর উন্নয়ন সুরু হয় এবং পরবর্তী বিশ বছর ধরে এ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছয়। এর পরেই সুরু হয় গৌরবসূর্যের অস্তগমন।

এবার এযুগের নাটকগুলির মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আমরা উল্লেখ করব। এলিজাবেথীয় যুগের নাটককে প্রধানতঃ ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১। কমেডি বা মিলনান্ত (Comedy) নাটক, ২। ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) ৩। ঐতিহাসিক নাটক (Chronical Plays) ৪। ক্ষুদ্রাকার হাস্যরসাত্মক নাটক (the Masques), এছাড়া ছিল স্কুল

নাটকের একটি আলাদা শ্রেণী। এই বড় রকম বিভাগগুলির মধ্যে আরো কতকগুলি উপবিভাগ রয়েছে। যেমন ট্র্যাজেডি ছিল দুই শ্রেণীর (ক) প্রাচীন ধারার (Classical) (খ) দেশজ ধারার (Native)। কমেডিও ছিল বহু শ্রেণীর (ক) প্যাস্টোরাল নাটক (the Pastoral) (খ) ম্যাজিকাল্ নাটক (the Magical) (গ) বুর্জোয়া নাটক (the Bourgeois) (ঘ) অ্যালিগরিকাল্ নাটক (the Allegorical) (ঙ) স্যাটিরিকাল্ নাটক (the Satirical) এবং ছিল এই সর্বশ্রেণীর মিশ্রণে সৃষ্ট বিচিত্র স্বাদের কমেডি। ঐতিহাসিক নাটকেও ছিল কতকগুলি উপবিভাগ। (ক) ঐতিহাসিক উপকথামূলক নাটক (Historical legendary) (খ) ঘটনামূলক ঐতিহাসিক নাটক (the Factual-historical) (গ) জীবনীমূলক নাটক (the Biographical) (ঘ) জনপ্রিয় গাথামূলক নাটক (the Popular legendary)। মাস্ক নাটকের আরম্ভ হয়েছিল অষ্টম হেনরীর রাজসভায় ছদ্মবেশ ধরে আমোদ প্রমোদ করা থেকে পরে তা প্রধাবিত হয়েছিল মিল্টনের "কোমাস্" কাব্যনাট্য পর্যন্ত। এ যুগে অনেক সময়ে একই নাট্যকাহিনী অবলম্বন করে বহু নাট্যকার বহুতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাট্য রচনা করে গেছেন। আবার কখন বা একই নাটক একাধিক নাট্যকার মিলে লিখেছেন। এলিজাবেথায় রেনেসাঁস্ নাটকের দিগন্ত তাই গ্রীস ও রোমের ঐতিহ্য থেকে লণ্ডনের রাস্তা বা সরাইখানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই বিচিত্র শ্রেণীর নাটকগুলির স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যাক।

ট্র্যাজেডি—প্রথমতঃ ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির ধারা :—এলিজাবেথীয় যুগে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং জ্যাকোবিন্ আন্দোলনের হোতারা ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির প্রযোজনার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন—তাঁদের প্রচেষ্টা মূলতঃই ছিল সেনেকাধর্মী। এই নাটকগুলিকে বলা হত "রক্ত ও বজ্রের নাটক" (Blood and thunder plays) কারণ এই নাটকে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হতে থাকত। এই ধরনের নাটকের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য টমাস্ কীডের—দ্যা স্পেনিস্ ট্র্যাজেডি। এই নাটকের প্রধান চরিত্র "হিয়ারোনিমোর" (Hieronimo) অভিনয় করতেন তৎকালীন প্রখ্যাত জনপ্রিয় অভিনেতা "এডোয়ার্ড অ্যালেইন্" (Edward Alleyn); এছাড়া শেক্সপীয়রের দলের বারবাজ্ পুত্র রিচার্ড বারবাজ্‌ও এই চরিত্রে সাফল্যের

সঙ্গে অভিনয় করতেন। এই নাটকখানা যখন শেষ হত, তখন দর্শকরা আতঙ্কিত অন্তরে দেখত এই তমসাচ্ছন্ন প্রতিশোধ মূলক ট্র্যাজেডিতে মঞ্চ রক্তাক্ত মৃতদেহে ভরে উঠেছে। মার্লোর টাম্বারলেইন্ নাটকেও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যালেইন্। এই দুর্ধর্ষ বীর চরিত্র অভিনয়কালে তিনি যখন ইংরেজী ব্লাঙ্কভার্স (Blank verse) আবৃত্তি করতেন তখন দর্শকদের প্রাণ শিহরিত হয়ে উঠত। এই ধারার নাটক ছিল মার্সটনের (Marston) "অ্যান্টোনিওস্ রিভেঞ্জ্" (Antonio's Revenge—১৫৯৯ খ্রী:) চ্যাপম্যানের (Chapman) "দ্য রিভেঞ্জ্ অব্ বুসি ডি' অ্যাম্বোইস্" (The Revenge of Bussy D' Ambois—সম্ভাব্য ১৬০০ খ্রী:) ওয়েব্স্টারের "দ্য ডাচেস্ অব্ ম্যালফি" (The Duchess of Malfi—সম্ভাব্য ১৬১৪ খ্রী:)। শেক্সপীয়রও এই ধরনের নাটক লেখার প্রয়াস করেছেন, তাঁর সে প্রচেষ্টা হল "টিটাস্ অ্যাণ্ড্রোনিকাস্" (Titus Andronicus—সম্ভাব্য ১৫৯৪ খ্রী:) নাটক। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ইত্যাদি প্রখ্যাত ট্র্যাজেডি চতুষ্টয়ের উপরও সেনেকাপন্থী রক্ত ও বজ্রের প্রভাব পড়েছে।

স্কুল কলেজে যারা ট্র্যাজেডির অভিনয় করত তারা গ্রীক আদর্শ অনুযায়ী স্থান, কাল, ক্রিয়ার ঐক্যে বিশ্বাসী ছিল। গ্রীক ক্লাসিকাল নাটকে মৃত্যু এবং ভয়াবহ ঘটনা মঞ্চে সংঘটিত করার রীতি ছিল না, সেগুলো ঘটত মঞ্চের বাইরে—দূতের মুখে দর্শকরা তার সংবাদ পেত, এই সংবাদ শুনে মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত তারি ফলে দর্শক হৃদয়ে ট্র্যাজিক্ রসের নিষ্পত্তি ঘটত। কিন্তু এলিজাবেথীয় দর্শকরা মঞ্চের উপরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দু'টোই দেখতে ভালবাসত—কেবলমাত্র সংবাদ শুনে তারা খুশী হত না। সেই জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অনেক সময় হত্যাকাণ্ডগুলি ঐতিহ্যগত না হলেও জোর করে মঞ্চে ঘটানো হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব নাট্যবিদ্‌রা গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে চাইতেন, তাঁরা এই সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লেখক ও অভিনেতাদের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারতেন না। সুতরাং নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত পবিত্রতম মূর্তিটি সাধারণ রুচির স্থূল আঘাতে বিচূর্ণ হল।

দ্বিতীয়ত: ট্র্যাজেডির দেশজ ধারা :—ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির আদর্শ ছিল যে নাটকের কাহিনী একটি ধারা ও একটি ক্রিয়াকে (action) অবলম্বন করেই ভবিতব্যের অন্ধকার আবরণ উন্মোচন করে এগিয়ে চলবে। বলা যায় দেশজ

ভালবেসেছিলেন কিন্তু তার চূড়ান্ত একঘেয়েমীর কথা মানবচরিত্র মন্থনকারী এই কবি-নাট্যকারের চেয়ে আর কেউই হয়তো বেশি জানতেন না। ·

শেক্‌সপীয়র তাঁর অন্যান্য বহু কমেডিতেই নিরালা গ্রাম্য সুরখানি ধ্বনিত করে না তুললেও রোমান্সের অগ্রাধিকার কৌতুক-হাস্যে দিয়েছেন। এগুলিকে আমরা "কমেডি অব্ রোমান্স" বলতে পারি। শেক্‌সপীয়রের প্রথম দিককার কমেডি "লাভস্ লেবরস্ লস্ট্" (Love's Labour's Lost), "দ্যা টেমিং অব্ দ্যা শ্রু" (The Taming of the Shrew) এবং "দ্যা কমেডি অব্ এরারস্" (The Comedy of Errors—১৫৯৩ খ্রী:) ইত্যাদি নাটকগুলির কাহিনী বয়নে রয়েছে যান্ত্রিক পদ্ধতি, চরিত্র চিত্রণে দেখি গভীরতার অভাব। নাটকের হাস্যকৌতুকও চেষ্টাকৃত সৃষ্টি বলে মনে হয়। কিন্তু এই মহানাট্যকার শীঘ্রই তাঁর ত্রুটিগুলি অপসারিত করে পূর্ণ বিভায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি হল—দ্যা মার্চ্যান্ট্ অব্ ভেনিস্, "মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট্ নাথিং" (Much Ado A'out Nothing—সম্ভাব্য ১৫৯৮ খ্রী:) "টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট্" (Twelfth Night, or, What You Will) এই সবগুলি নাটকেরই স্থান হল ইতালি। কারণ কবির রোমান্টিক স্বপ্নের জগৎ ইংল্যাণ্ডে হলে বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যেত। এই নাটকগুলি সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা যায় যে, তাতে রোমান্টিক বাস্তবতাই প্রধান—অর্থাৎ দুই বিপরীত গুণের সমন্বয়। পরিবেশের দিক থেকে এগুলি হল রোমান্টিক, আবার তারি মধ্যে বাস্তবের যুক্তি ও সঙ্গতি রক্ষা করে কাহিনীকে অবয়ব দিতে হয়েছে। এ কাজ শেক্‌সপীয়রের মত বিরাট প্রতিভার পক্ষেও ছিল দুরূহ—এর চেয়ে "সেণ্টিমেণ্টাল্ রোমান্টিসিজম্" (Sentimenta romanticism) গড়ে তোলা অনেক সহজ। "রিয়ালিস্‌টিক্ রোমান্টিসিজমে" (Realistic romanticism) অনেক সতর্কভাবে কাহিনী বয়ন ও চরিত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন, কারণ সুখকল্পনা ও বাস্তব সত্য এতই বিপরীত যে—যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে নাট্যকারের সৃষ্ট জগৎখানি ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট্ নাথিং এবং টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট নাটক দু'খানিতে কবি সঙ্গতি ও নিখুঁত পরিবেশ অর্থাৎ "মুড"কে পুরোপুরি রক্ষা করতে পেরেছেন কিন্তু দ্যা মার্চ্যাণ্ট্ অব্ ভেনিস্ এবং "মেঝার্ ফর্ মেঝার্" (Measure for Measure) নাটকে কবি সৃষ্ট জগৎ আর নিখুঁত—নিটোল নেই, মাঝে মাঝেই চিড়

খেয়েছে, খণ্ডতা দেখা দিয়েছে। এমন কি শাইলকের (Shylock) মূর্তির মধ্যে—তার চরিত্র সৃষ্টিতে যেখানে ট্র্যাজেডির গভীর সুরই বেজে উঠবার কথা ছিল সেখানে একটি কমিক্ চিত্র ফুটে উঠেছে। মেঝার্ ফর্ মেঝারের কাহিনী তো প্রায় পরীদের গল্পের মতই। সেখানে পাপ, অন্যায় এবং মৃত্যুর পরোয়ানা এ সকলি হাস্যপরিহাসে শেষ হয়েছে।

শেক্‌সপীয়রের এই কমেডির সঙ্গে মৌলিকভাবে আর কোন কালের কোন কমেডিরই মিল নেই।

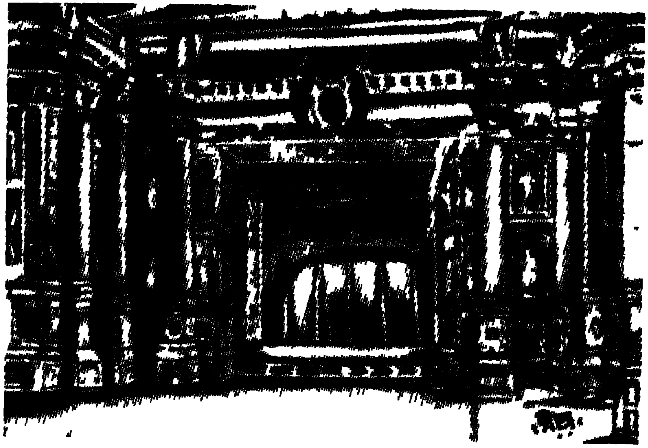
আরিস্তোফানেসের উচ্ছ্বসিত আত্মসমর্পণ, প্লাউতুসের আনন্দোচ্ছল দৃশ্যাবলী, তেরেন্সের কেতাদুরস্ত ভাবপ্রবণতা এবং মধ্যযুগের প্রহসনের স্থূলতা,—এসব থেকেই তা ছিল সমভাবে ভিন্ন। এতে রয়েছে একটি অতীন্দ্রিয়তা যেখানে বস্তু ও ভাবের মিলন ঘটেছে। লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় তাদের ওপারে রয়েছেন, তাই সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি পরিণত হয়েছে ভাবাবেগে—ভাঁড় হয়েছে বিজ্ঞ, এবং বুদ্ধিমানরা বোকা। শেক্‌সপীয়রের রোমান্সধর্মী কমেডি তাই হয়ে উঠেছে অনন্য।

শেক্‌সপীয়রের নাটকে দৃশ্যের স্থান আর্ডেনের অরণ্যই হোক, প্রাচীন আথেন্‌সই হোক, অথবা ইতালি নগরীই হোক, মানুষগুলি কিন্তু এলিজাবেথায় যুগের বলে বেশ চেনা যায়। তারা আত্মগোপনের প্রায় কোন চেষ্টাই করেনি। তবুও চরিত্রগুলির এও ছিল বাইরের পরিচয়। ইংরেজ নাট্যকারটি মানব প্রকৃতির মূল সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। স্পেনীয় নাট্যকাররা যেখানে সেকালেরই ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, ইংরেজ নাট্যকার সেখানে এলিজাবেথায় যুগের মানুষকেই চিরন্তন মানুষের অখণ্ড সত্তায় পর্যবসিত করেছেন।

বাস্তব ও আদর্শ, চরিত্র ও বিষয়বস্তুর তিনি এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন, এখানেই তাঁর কারুকর্ম। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের প্রদর্শিত ব্লাঙ্কভার্সকে গ্রহণ করে তা অনেক বেশি নমনীয় ও প্রাণপূর্ণ করে তুলেছিলেন। এ অতি উচ্চ গীতিময়তা থেকে, অতি সাধারণ মানুষেরও ভাবের বাহন হয়ে ওঠে। কখন বা কথোপকথনে গানের সুর বেজে উঠেছে, আবার পর মুহূর্তে দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কথা। কেবল পদ্যই নয় তার সঙ্গে বৈচিত্র্য আনবার জন্য অতি সহজ, সরল গদ্যও তিনি গ্রহণ

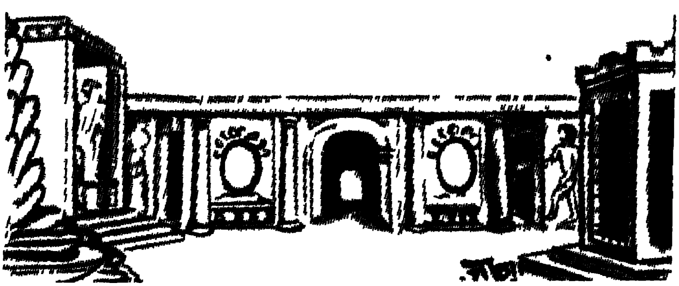
এমন বহু নাট্যকারই ছিলেন যাঁদের নাম পর্যন্তও আমরা জানি না। এ কথা কেই বা নিশ্চয় করে বলতে পারে শেক্‌সপীয়রের নামে যে ৩৮ খানা নাটক পরিজ্ঞাত তার সব কখানাই তিনি স্বয়ং রচনা করেছিলেন। নাট্যকাররা যখন নাটক লিখতেন তখন তাঁরা বিশেষ কোন নাট্যসংস্থা বা রঙ্গালয়কে উদ্দেশ্য করেই লিখতেন। এই সমস্ত নাটকগুলি জনসাধারণের হাতে চলে যাওয়ার ভয়ে ঈর্ষাপরায়ণ নাটুকেদলগুলি তা মুদ্রিত হতে দিত না। সুতরাং পরবর্তী যুগের হাতে এসে পৌঁছনর আগেই বহু কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে একাল সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে অন্য কোন দেশে, অন্য কোন কালে এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এত অসংখ্য নাটক আর লেখা হয়নি।

প্লেট নং—১



পার্মার ফার্নেস থিয়েটার।

(১৬১৮-১৬১৯ খ্রীঃ)। পৃঃ ৩৪৩

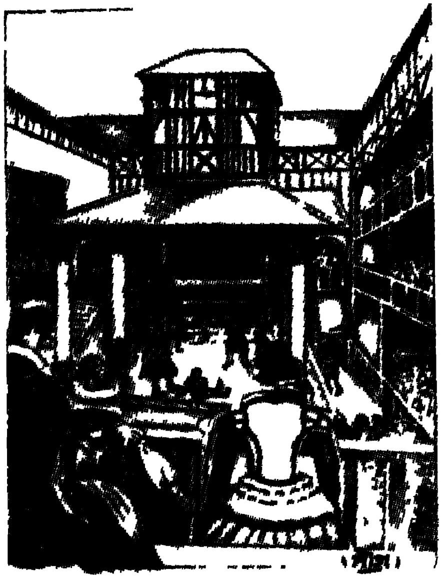


সিমাল্‌টেনিয়াস্‌ সেটিং।

সমুদ্র : দেলকির মন্দির : এপিরাসের প্রাসাদ : কারাগার

ওতেল দ্য বুর্গো।—১৭শ শতক। পৃঃ ৪৩৫

প্লেট নং—২



গ্রা ফর্‌চুন থিয়েটার।
পুনর্গঠিত। পৃঃ ৩৭৮

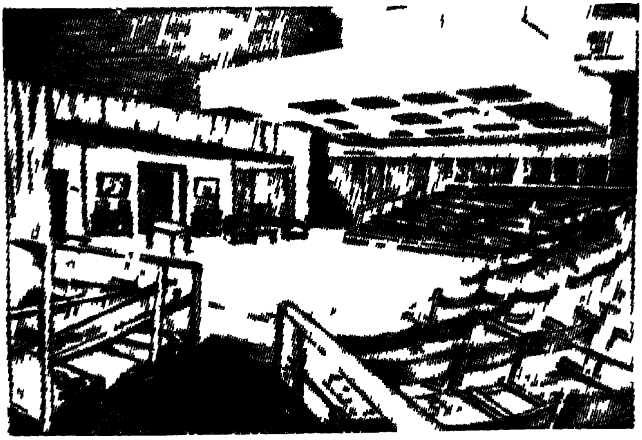


একস্‌প্রেশনিস্টিক সেটিং।
জেস্‌নেরের সিঁড়ি। পৃঃ ৫৭৮

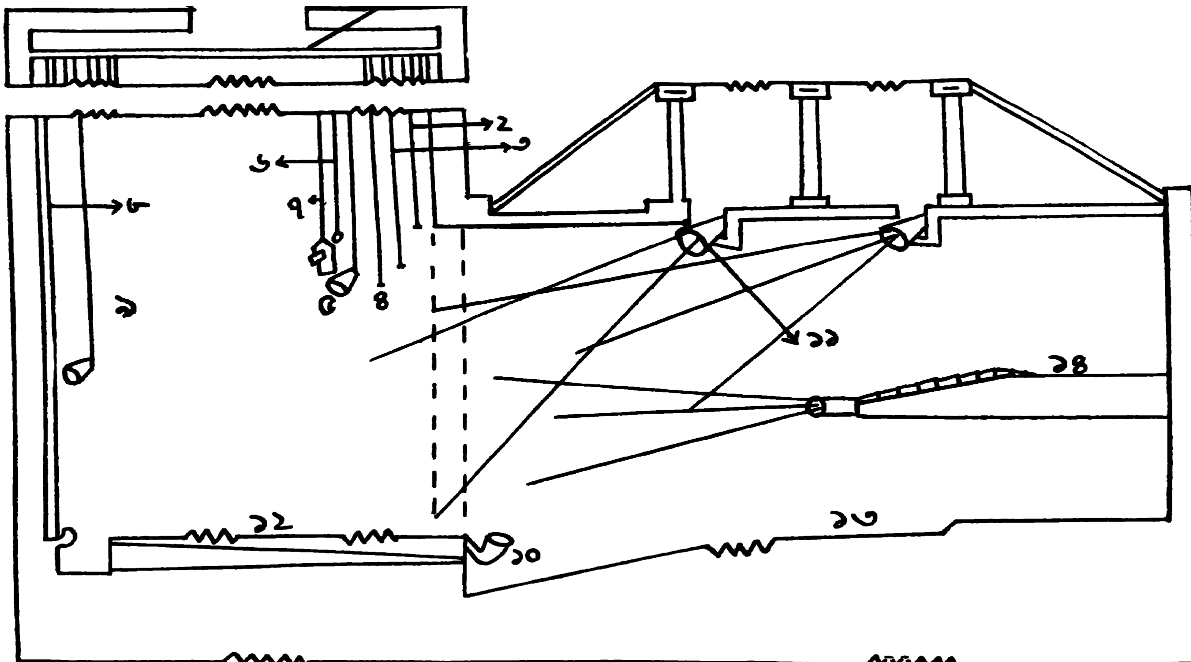
প্লেট নং—৩



এপিক্ নাটক : বেরটোল্ট ব্রেখ টের পরিকল্পিত :
দ্যা ককেশিয়ান সার্কেল অব চক এর একটি দৃশ্য। পৃঃ ৬০৪



মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ রঙ্গালয়। পৃঃ ৬০৪



১. আয়াবৃন্ (G. I). ২. ফ্রন্ট্ কার্টেন্ (F. C). ৩ অ্যাক্ট কার্টেন্ (A. C). ৪. টিজার বা উপরের ঝালর (T). ৫. টিজার লাইট্ ইউনিট (T. L). ৬. ব্রিজ লাইট্ (B. L). ৭. বর্ডার লাইট্ (L. B). ৮. সাইক্লোরামা (C). ৯. সাইক্লোরামা লাইট্ (C L). ১০. ফুট লাইট (F. L). ১১. ফোকাস অব্ দ্য হাউজ্ (Fo. H ১২. মঞ্চ (S). ১৩. প্রেক্ষাগৃহ (A. ১৪. দোতলা ব্যালকনি (B). পৃঃ ৫৯৩

॥ রেনেসাঁস্ ॥

ফ্রান্স

ফ্রান্সে রেনেসাঁস্ নাটকের ইতিহাসও অনেকটা ইতালির মতই। এখানেও গ্রীস ও রোমের ক্লাসিকাল নাটকের অনুকরণে ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটক রচনার প্রয়াস চলছিল। এখানেও রেনেসাঁস্ আন্দোলন সুরু হওয়া থেকে ১৭শ শতকের মধ্য পর্যন্ত কোন শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হয়নি। ফরাসী থিয়েটারে ইতালির কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের মত কোন গণপ্রতিষ্ঠিত নাট্যাভিনয়েরও আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু ইতালির মতই ফ্রান্সেব ট্র্যাজেডির উপর সেনেকার এবং কমেডির উপরে প্লাউতুসের প্রভাব পড়েছিল। সেনেকার নাটক প্যারিসে আসে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং গ্রীক নাটকেরও ল্যাটিনভাষায় অনুবাদ হয় ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ফ্রান্সে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নিজস্ব নাট্য-সাহিত্য তৈরী হয়। রেনেসাঁস্‌যুগের চিন্তাধারাকে পরিচালনা করেছিলেন "মানবতাবাদী" (Humanist) নেতারা। এঁদেরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে প্রথম নাট্যকার "এতিয়েন্ জোদেল্" (Etienne Jodelle) হিউম্যানিস্ট নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত "ক্লেওপাত্রে ক্যাপ্‌তিভ্" (Cléopâtre Captive) নামাঙ্কিত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নাটকখানি মোটেই সুগ্রথিত হয়নি। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে "আলেক্‌জাঁদ্রে হার্ডি" (Alexandre Hardi) ফরাসী দেশের ফার্সের সঙ্গে ইতালীয় কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে সংমিশ্রিত করে ফরাসী কমেডি ধারার সৃষ্টি করেন। তিনি যে ট্র্যাজেডি রচনা করেন তা ছিল শিথিল গ্রন্থনের প্রণয় মূলক।

ফ্রান্সে এসে ক্লাসিকাল অনুপ্রেরণা কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল— ইতালীয় বিভিন্ন ধারার মাঝে সে পথের সন্ধান করতে লাগল। ইতালির সৌখিন কমেডির (Commedia erudita) অনুবাদ হতে লাগল—যেমন অনুবাদ হল "আরিয়োস্তোর" (Ariosto) "ইল্ নেগ্রোমান্তে" (Il negromante) নাটকের—এগুলি কিন্তু রোমান নাট্যগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে কর্নেয়্ ও রাসিনের পূর্ববর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার "পিয়ের দ্য লারিভের" (Pierre de Larivey) রচনায় রোমান কমেডির অন্তর্গত ফার্সের সঙ্গে ইতালীয়

সৌখিন কমেডি মিশ্রিত হয়ে যায়। তিনি মঞ্চে কমেডির অনেক সজীব উদাহরণ এনে যোগ করেন। ইতালির যে নাটকগুলি তিনি গ্রহণ করেন সেগুলি খুব উঁচুদরের নাটক ছিল না সত্য কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত রচিত ফরাসী কমেডির চাইতে তার সৌকুমার্য বেশিই ছিল। শীগ্‌গিরই এগুলি পুরোপুরি ফরাসী আকার পেতে লাগল এবং চরিত্রগুলিও ফরাসী হয়ে উঠল। এগুলি প্রশংসনীয় ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু এগুলির সংখ্যাল্পতা দেখে ১৬শ শতকের ফরাসী ক্লাসিকাল মঞ্চের দৈন্য দশা বোঝা যায়। আসন পাতা হল কিন্তু প্রকৃত ট্র্যাজেডি বা কমেডির প্রতিষ্ঠা ইতালির মত এখানেও হল না। ফ্রান্সের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তিও রেনেসাঁস্ যুগের গভীর ভাবাবেগ প্রকাশে সক্ষম হয়নি। এর মূল কারণই রাজসভার পক্ষপুটে ফরাসী নাটকের লালন পালন এবং ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল নাটকের নির্দেশিত পথে অনুবর্তন।

ফ্রান্সের থিয়েটারে দ্বাদশ শতক অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এমন কি আজকের দিন পর্যন্তও এক আশ্চর্য ধারাবাহিকতা রয়েছে। রেনেসাঁসের যুগেও সাধারণ জনতা খোলা মাঠে, জনসমাবেশ ক্ষেত্রে, রোমান আম্ফিথিয়েটারে, অভিজাতদের প্রাসাদে এমন কি প্রেক্ষাগৃহেও মধ্যযুগের মিস্ট্রি নাটকের অভিনয় দেখেছে। ফ্রান্সের অভিজাতদের পৃষ্টপোষকতায়, জনসাধারণের কাছে নাট্য প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি মঞ্চগৃহ তৈরী হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদল অভিনয় দেখাত, ক্যাথলিক ও প্রটিস্টাণ্ট্‌দলের উৎসাহে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনেও অভিনয় চলত। ফলে এই সব মঞ্চে মধ্যযুগের মিস্ট্রি নাট্যমঞ্চের প্রভাবই বেশি পড়েছিল। প্যারিসে ১৪০২ সালে একটি সৌখিনদল "ওপিতাল দ্য লা ত্রিনিতের" (Hôpital de la Trinite) একটি হলে মিস্ট্রি নাটকের অভিনয় করেছিল বলে জানা যায়। মধ্যযুগের নাটকের ধারা সেখান থেকে নাপোলিঅঁর যৌবন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসার পরিষ্কার সূত্র পাওয়া যায়।

ইতিহাসের পাতায় ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই তাঁর ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ভের্‌সায়্-এর বিরাট প্রাসাদ ও উদ্যান, রাজসভার অভিজাত নরনারী, তাদের সাজপোষাক, রাজকীয় বিলাস ব্যসন ইত্যাদির জন্য ভুবন-খ্যাত ছিলেন। সপ্তদশ শতকের আরম্ভ থেকেই প্যারিস্ ফরাসী রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল,—ফলে রঙ্গালয়ের আকার প্রকার নাটক, মঞ্চ, দৃশ্য সব কিছুই প্যারিস্ তথা রাজসভার রুচি ও চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হতে লাগল।

১৬০০ শতকে প্যারিসে একটি মাত্র রঙ্গমঞ্চ ছিল "ওতেল দ্য বুর্‌গোঁ" (Hôtel de Bourgogne) এই মঞ্চের ধরন ছিল অনেকটা পুরাতন মিরাক্‌ল্ মঞ্চের মত। রেনেসাঁস্ যুগে ফ্রান্সের শিক্ষিত অভিজাতদের জন্য দুই শ্রেণীর মঞ্চ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথম শ্রেণী ছিল ফার্স অভিনয়ের জন্য একটি অতি সাধারণ খোলা প্লাটফর্ম মঞ্চ। এই সহজ, সরল, সাধারণ মঞ্চবেদীর উপরে ১৫শ শতকের জনপ্রিয় অভিনেতাদের দল মুক্তাঙ্গনে অর্থাৎ হাটে, বাজারে কিংবা টেনিস্ কোর্টে অভিনয় দেখাতেন। ফ্রান্স ক্লাসিক্ পদ্ধতির ট্র্যাজেডির আবির্ভাব ও নাটকের ক্রমোন্নতির সঙ্গে বুঝতে পারল যে থিয়েটারকে হাট-মাঠের মুক্তাঙ্গন থেকে এবার আবৃত রঙ্গালয়ে নিয়ে আসতে হবে। ক্রমে প্রযোজকরা আবৃত টেনিস্ কোর্টেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটকের অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করে দিলেন কারণ এটাই খুব সহজ ছিল। তার দু'পাশে ব্যালকনি রইল এবং মাঝখানে দর্শকদের জন্য রইল কিছু বেঞ্চি। ব্যালকনি থাকত, দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে আর মঞ্চের মুখোমুখি থাকত বেঞ্চি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মঞ্চ পদ্ধতির মধ্যে ছিল, ওতেল দ্য বুর্‌গোঁর রঙ্গালয়—এর মধ্যে বিভিন্ন ধারার মিশ্রণে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। টেনিস্ কোর্টের অনুসরণে এই রঙ্গালয়টি ছিল লম্বা, সরু আকারের—তার একদিকে ছিল মঞ্চ। মঞ্চের ধরন ছিল মধ্যযুগের মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল্ মঞ্চের মতন। মাঝখানে ছিল অভিনয়ের সাধারণ স্থান, আর দু'পাশে ও পেছনে ছিল ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যাভিনয়ের জন্য আলাদা আলাদা 'ম্যান্‌সন্‌স্' তার কোনটা হত রাজসভা, কোনটা রাজপ্রাসাদ, কোনটা তরুণীদের অন্তঃপুর, কোনটা বা অভিজাত মহল—পরপর এই সমস্ত সেট-এ অভিনয় চলত। এর সঙ্গে আবার এসে মিশ্রিত হয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁসের ক্লাসিক্-পদ্ধতি এবং পরিপ্রেক্ষিত রীতি অঙ্কিত উইংস্। প্রথম দিককার মিস্ট্রির জন্য অঙ্কিত দৃশ্যাবলী এ মঞ্চে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ ফ্রান্সে যখন নিয় শ্রেণীর ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডি ও কমেডি রচিত হতে লাগল তখন স্বভাবতঃই মঞ্চ পদ্ধতিরও পরিবর্তন করতে হল। এল প্রবেশ প্রস্থানের পথ-যুক্ত পশ্চাদ্-যবনিকা (Back Curtain), বিভিন্ন প্রকার নাট্যাভিনয়ের জন্য তৈরী হতে লাগল 'সাইড্ উইংস্' (Side Wings) কিন্তু ক্লাসিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করে এ যুগের ফরাসী নাট্য রচিত হওয়ায় নাট্যকাররা স্থানের ঐক্য যথাসাধ্য বজায় রাখবার খুব চেষ্টা

করতেন ; ফলে একই মঞ্চে বিভিন্ন ম্যান্‌সন্‌সের বিবর্তিত রূপ হিসেবে আলাদা আলাদা স্থান (Locality) দেখানো হতে লাগল। পেছনের পর্দা বা পার্শ্ববর্তী উইংস্‌ দিয়ে এই স্থানের বিভাগগুলি দেখানো হত। এই ধরনের প্রথম দিককার নাট্যকার "রোত্রু" (Rotrou) রচিত "লে কাসিয়োঁ পের্দ্যুর" (Les Occasions Perdues—১৬৩৩ খ্রী:) সেটে দেখা যায়—পশ্চাদ্‌ভাগে একটি বাগানের মধ্যে একটি প্রাসাদ রয়েছে এবং তাতে সত্যকার দরজা, জানালা ও সিঁড়ি দেওয়া, দু'দিকে বনের মাঝে ঝরণা, ভাঙ্গা প্রাসাদ ইত্যাদি রয়েছে। এই মঞ্চে ইতালীয় অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রভাব থাকলেও মূল কাঠামো ম্যান্‌সন্‌সেরই। এর কারণ হল ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্তও ওতেল দ্য বুর্‌গোঁতে ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠানই হত—তারপরে এল দৈনন্দিন জীবন অবলম্বনে নাট্যাভিনয়—মঞ্চেও সুরু হল দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ।

ইতালির মঞ্চে আমরা দুই কালের, দুই শক্তির বিরোধ দেখি—কিন্তু ফ্রান্সে দেখতে পাই সম্মেলন ও সহাবস্থান। একদিকে কম্মেদিয়া দেল্‌ আর্তের মত আভরণশূন্য প্লাটফর্ম মঞ্চ, অন্য দিকে পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত দৃশ্যাবলী, যার সাহায্যে স্থানের ঐক্য রাখা হত। একই মঞ্চে দুই, তিন বা চারটি আলাদা আলাদা স্থান বা "লোকালিটি" ইতালীয় মঞ্চে ছিল না। এই সময়ে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় যে থিয়েটার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় তাতে দেখা যায় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্যারিসে রাজার নিজস্ব অভিনেতাদের এক স্থায়ী দল ছিল। তাদের পরিচালক হলেন আলেক্‌জান্দ্রে হার্ডি এবং ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হল প্রিন্স-অব্‌-অরেঞ্জের কম্প্যানী। পরিবর্তিত টেনিস্‌ চত্বর মারে ছিল এর প্রধান কার্যালয়।

॥ কর্ণেয়্‌ ॥

মারের (Marais) এই টেনিস্‌ কোর্ট মঞ্চে ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং পোলাইট্‌ ট্র্যাজেডির (Polite Tragedy) পথিকৃৎ "কর্ণেয়্‌র" (Corneille) "ল্য সাদ্‌" (Le Cid) নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। মারে রঙ্গালয়টি ছিল এই সময়ে ওতেল দ্য বুর্‌গোঁ মঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই টেনিস্‌ কোর্ট থিয়েটারটি ছিল আবৃত—অতএব অভিনয়কালে নৈশ ভোজনসভার মত মৃদু মোমবাতির আলোয় প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করা হত। এই নাট্যাভিনয়কালে উপস্থিত দর্শকরা ছিলেন

নানান শ্রেণীর—সম্মুখের বক্সে, প্রধান বেঞ্চির সারিতে এবং ব্যালকনিতে ছিলেন রাজসভার অভিজাতশ্রেণী, সৌখিন নাগারক বাবুরা, আর ছিলেন সাহিত্য-সেবীর দল, সরকারি কর্মচারী, ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদল—এছাড়াও জড়ো হয়েছিল নিষ্কর্মা ও ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা. টেনিস্ কোর্টের আসনহীন অংশে তারা দাঁড়াত। এই মঞ্চে কোন যবনিকা ছিল না। একই মঞ্চে স্থানের ঐক্য বজায় রাখবার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দেশক 'স্টেশন' (Station) তৈরী হয়েছিল। মাঝের স্থানটি ছিল সাধারণ অভিনয় ক্ষেত্র, তার সঙ্গে বিভিন্ন সেটগুলি সংযুক্ত ছিল—এ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মঞ্চসজ্জা ছিল না।

কর্ণেয়্ তাঁর সীদ্ নাটকখানি মন্ত্রীপ্রবর রিশলিউর উদ্দেশে অর্পণ করেন। তাঁর এই নাটকখানিকে রাজা ত্রয়োদশ লুই এবং তাঁর রাণী বিশেষ প্রশংসাপত্র দেন। এই নাটকখানি এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল যে সমালোচনার ক্ষেত্রে সীদ্-ই হয়ে উঠেছিল সর্বজন স্বীকৃত মানদণ্ড—যত্রতত্র শোনা যেত লোকমুখে "ল্য সীদের মত সুন্দর"। সীদ নাটকখানিই ছিল প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদেশের জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে সৃষ্ট রেনেসাঁস্ যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক। কর্ণেয়্ই পুরাতন যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে নূতন যুগের সূচনা করেন। নূতন যুগের এই নবতম সৃষ্টির মাঝে স্পেনের লোপে দ্য ভেগা বা ইংল্যাণ্ডের শেক্সপীয়রের নাটকের রোমান্টিক উদ্দামতা ছিল না। চিন্তার জগতে কর্ণেয়্ রোমান্সকে একেবারে বাদ দিতে পারেননি কিন্তু নাটকের গঠনভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল ক্লাসিক্ নাটকের রীতিপদ্ধতির দিকে। কারণ শেক্সপীয়র কিংবা লোপে ছিলেন জনসাধারণের নাট্যকার আর কর্ণেয়্ এবং রাসিন্ ছিলেন রাজসভা ও অভিজাতদের নাট্যকার। অতএব তাঁরা ট্র্যাজেডির মহৎ চরিত্রের ভয়ংকর পতনের দিগ্ব্যাপী বিষাদকে অনেকটা সহনীয় করে আনলেও পণ্ডিতদের সমালোচনার শাসন একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না, তাই ক্লাসিক্ ট্র্যাজেডিকেই তাঁরা তাঁদের যুগ ও কালের উপযোগী করে তুলতে চাইলেন—ফলে নূতন এক ক্লাসিক্ নাট্যধারার সৃষ্টি হল, তা হল "নিও-ক্লাসিক্ ট্র্যাজেডি" (Neo-Classic Tragedy)। জন্ গ্যাশ্নার একেই বলেছেন "পোলাইট্ ট্র্যাজেডি" (Polite Tragedy) অথবা কমনীয় ট্র্যাজেডি। কর্ণেয়্র সীদ্ সম্মান ও কর্তব্যের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিল এবং এখানেই তা নূতন যুগকে প্রতিফলিত করেছে। এ যুগে

॥ রাসিন্ ॥

কর্ণেয়্‌র পরে ফ্রান্সে এলেন রাসিন্। "রাসিন্" (Racine) তথাকথিত ক্লাসিক্ রীতির বাঁধন কতকাংশে শিথিল করে ট্র্যাজেডিকে অনেকখানি মুক্তি দিলেন। রাসিন্ তাঁর ট্র্যাজেডিগুলি রচনা করেছিলেন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেসের আদর্শে—তাঁর নাটক ছিল নারী-চরিত্র প্রধান। এর কারণ হয়তো তাঁর ছিল সুমধুর কাব্যরচনার স্বভাবজ প্রতিভা এবং তিনি সহজাত অনুভূতি প্রভাবে নারীচরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতেন। এউরিপিদেস্ ছিলেন তিনজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতার মধ্যে বাস্তববাদী —তিনি পূর্বতন ক্লাসিক্ রীতি অনেক ক্ষেত্রেই ভঙ্গ করেছেন। রাসিন্‌ও তেমনি তথাকথিত ক্লাসিক্ বাঁধন শিথিল করে দিয়েছিলেন। এই জন্যই রাসিন্ ফ্রান্সের নব-ক্লাসিক্ আন্দোলনের মাঝে শৃঙ্খলা ও যুক্তিবাদ আনতে পেরেছিলেন। শৃঙ্খলা, যুক্তি, সংযত ভাবাবেগ এবং লাবণ্য বিকাশের মধ্যেই রাসিনের নাট্য প্রতিভার উৎস নিহিত রয়েছে।

কর্ণেয়্ এবং রাসিন্ উভয়ের নাটকই প্রধানতঃ রচিত হয়েছিল অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সে সব নাটকের দর্শক ছিল উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত জনসমাজ ও রাজসভা। এইসব নাটকের অভিনয় আবৃত টেনিস্ কোর্ট মঞ্চে বা অভিজাত রঙ্গালয়েই হত। রাসিন্ তাঁর শেষ জীবনে রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তখন রাজা চতুর্দশ লুই-এর রাজসভা ভরে উঠেছিল শূন্যগর্ভ আড়ম্বরে ; লিপ্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে। যুক্তিবাদী সত্যসন্ধানী শিল্পীর তাই সেখানে স্থান হল না।

১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে রিশলিউ তাঁর বলরুমে একটি মঞ্চ তৈরী করিয়েছিলেন, এই মঞ্চের সম্মুখে প্রোসীনিয়াম্ ছিল এবং তৎকালীন ইতালীয় পদ্ধতিতে যতখানি যান্ত্রিক কৌশল ও দৃশ্যপটের উন্নতি সম্ভব, তা সবই ছিল। রাজার নিজস্বও একটা রঙ্গালয় ছিল, তাঁর "প্যাতি বুর্‌বোঁ" (Petit Bourbon) প্রাসাদে এই মঞ্চও ছিল সম্পূর্ণ ইতালীয় পদ্ধতিতে রচিত। এই সমস্ত মঞ্চেই হত অভিজাত নাট্যকারদের নাটকের অভিনয়।

॥ ভোল্‌তের্ ॥

ফ্রান্সের থিয়েটার আন্দোলনে আর একটি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত নাম পাওয়া যায়—সে নাম হল "ভোল্‌তের্ (Voltaire)। নাট্যকার হিসেবে

তিনি খুব বিখ্যাত না হলেও, ট্র্যাজেডির তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যা করে নীতি-নিয়ম বেঁধে দেন। ফ্রান্সের থিয়েটার জগতে তিনি ধর্ম জগতে পোপের মতই মাননীয় ছিলেন। এমন কি "তেয়াত্র্ ফ্রঁাসে"র (Théatre Francais) মঞ্চের মাঝখানে ভোল্‌তেরের এক মূর্তি বসান হয়েছিল। আর শুধু ফ্রান্সই নয়, বিদগ্ধ জন হিসেবে ভোল্‌তেরকে তৎকালীন ইউরোপ পরম সম্মানের চোখে দেখত। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ভোল্‌তেরের মতবাদ ক্লাসিক্‌পন্থী ছিল—এবং সমগ্র ইউরোপেই তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ভোল্‌তেরের অভিমত ছিল যে—

ট্র্যাজেডির কাজ হল দুই বা তিন ঘণ্টার ঠাস্ বুনানিতে কোন প্রখ্যাত চমকপ্রদ ঘটনাকে তুলে ধরা। চরিত্রগুলি কেবল অনিবার্য প্রয়োজনেই উপস্থাপিত হবে। মঞ্চকে কখনই খালি রাখা চলবে না। এমন একটি কাহিনীকে বলা হবে যা যুগপৎ সম্ভাব্য এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। কিছুই অপ্রয়োজনীয় বলা হবে না—যা বলা হবে তা হবে শিক্ষামূলক ও হৃদয় আলোড়নকারী। ট্র্যাজেডির ভাষা হবে উচ্চাঙ্গের কাব্য যা চরিত্রানুগ ভাব্ প্রকাশ করবে এবং এগুলি উচ্চারিত হবে বহুব্যবহৃত গদ্যের মত যেন চরিত্র তার নিজের ভাষায়ই কথা বলে চলেছে—অর্থাৎ কথাকে ছান্দোবদ্ধ করার প্রচেষ্টা কোথাও চিন্তাকে ব্যাহত না করে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একটি পংক্তিও কষ্টকর, দুর্বোধ্য বা নিন্দাযোগ্য না হয়।

বলা চলে ভোল্‌তেরের এই উক্তিই হল ক্লাসিক্ ট্র্যাজেডির উপর সর্বকালের আরোপিত সর্তাবলী।

ভোল্‌তেরের এই অভিমতের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক গঠন ভঙ্গির ট্র্যাজেডির মিল ছিল না, তবুও সমসাময়িক লোক হয়েও তিনি শেক্‌সপীয়রকে মুক্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন আদর্শ ট্র্যাজেডির মাপকাঠিতে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি বহু ত্রুটি সম্বলিত, তবুও জ্ঞানীজন যেমন স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্যকে মৃদুহাস্যে গ্রহণ করেন—যেমন আকাটা হীরাকে খাঁটি জহুরী সাদরে তুলে নেন, তেমনিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন শেক্‌সপীয়রকে।

নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভোল্‌তেরের মতামত যেমন ছিল স্পষ্ট এবং প্রভাব-বিস্তারকারী তেমনি মঞ্চ এবং নাট্য প্রয়োগ ব্যাপারেও তাঁর কতকগুলি প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। মঞ্চে ভোল্‌তেরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল যে, তৎকালীন

মঞ্চে অভিজাতশ্রেণীর ফুলবাবুরা অনেকেই আসন গ্রহণ করত, এদের দর্শন আমরা শেক্স্‌পীয়রীয় মঞ্চেও পেয়েছি—ভোল্‌তের্‌ উপস্থিত এই দর্শকশ্রেণীকে মঞ্চ থেকে বিদায় দেন। এইজন্য নাট্যকার, অভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালকরা চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। এই বিলাসী বাবুরা মঞ্চকে দূষিত করত এবং অভিনয়ের ও নাটকের শৈল্পিক মানকে অবনমিত করত, কারণ তারা মঞ্চে অভিনেতাদের পাশে বসে নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ, হামবড়া ভাব দেখাতেই ব্যস্ত থাকত। এতে নাটকীয় রসের একাগ্রতা প্রতিক্ষণেই ভঙ্গ হত। প্যারিসে যখন কর্ণেয়্‌র্‌ ল্য সীদ্‌ নাটকের গৌরবময় অভিনয় চলছিল তখনও এই ফুলবাবুরা মঞ্চ অলংকৃত করে মঞ্চের দু'পাশে সারিবদ্ধ আসনে বসত এবং মাঝের অপ্রশস্ত স্থানে অভিনেতাদের কোন ক্রমে অভিনয় চালাতে হত। এই সৌখিন বাবুরা যখন খুশী বাইরে যেত, মঞ্চে বসে খানা-পিনা করত, যখন যা মনে আসত সরবে সেই উক্তি করত এবং সাধারণ দর্শকদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। ভোল্‌তের এই কুগ্রহদের স্থায়িভাবেই তাঁর প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিতাড়ন করেন এবং মঞ্চানুরাগীদের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে থাকেন।

॥ মলিয়ের্‌ ॥

কর্ণেয়্‌র্‌ চৌদ্দ বছর পরে এবং রাসিনের সতের বছর পূর্বে অর্থাৎ এ দু'জন ট্র্যাজেডি রচয়িতার মাঝামাঝি সময়ে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে "জঁ। বাপতিস্ত পোকুয়েল্যঁ" (Jean Baptiste Poquelin) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে ছিল মার্জিত শিক্ষা এবং জন্মগত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের রাজবাড়ির আসবাবপত্র রক্ষকের পুত্র। ছাত্রাবস্থায় পোকুয়েল্যঁ নানান কাব্য-গাথার সঙ্গে রোমান কমেডিও পাঠ করেন এবং প্যারিসে যে সমস্ত কমেদিয়া দেল্‌ আর্তের ভ্রাম্যমাণদল আসে তাদের অভিনয় দেখেন। ১৬৪৩ খ্রীঃ ইতালীয়-কমেডির একটিদল প্যারিসের একটি টেনিস্‌কোর্ট রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে থাকে। দল বেশিদিন টেকে না কিন্তু পোকুয়েল্যঁ এই দলে যোগ দেন এবং এই ১৬৪৩ খ্রীঃ থেকেই অভিনয়কে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। স্বনামে অভিনয় করলে পরিবারের মর্যাদাহানি ঘটবে এই ভয়ে তিনি রঙ্গমঞ্চের জন্য "এম্‌. দ্য মলিয়ের্‌" (M de. Moliare)

এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই ভুবনবিখ্যাত হন। প্রথমে তিনি ভ্রাম্যমাণদল গড়ে তাই নিয়ে বাইরে বাইরে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ান—কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই প্যারিসে ফিরে আসেন। তাঁর দলের অভিনয় সৌকর্যের জন্য তিনি রাজা চতুর্দশ লুই-এর ভ্রাতা ডিউক অব্ আঞ্জুর (Duke of Anju) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজসভায় তখন কর্ণেয়্‌র ট্র্যাজেডির অভিনয় চলছিল এর মাঝে তিনি "ল্য লাভ্‌ সিক্ ডক্টর" নামে একটি ইন্‌টারলুডের অভিনয় দেখান। তাতে রাজা লুই এবং তাঁর রাজসভা এতই খুশী হয়ে যান যে রাজ অনুমতিতে তিনি ইতালীয়-কমেডির সঙ্গে ভাগ করে "প্যতি বুর্‌বোঁ" (Petit Bourbon) থিয়েটারে অভিনয় করবার সুযোগ পান।

অভিনয় দেখানোর জন্য মলিয়ের্ যে রঙ্গালয়টি পেয়েছিলেন তার মঞ্চটি ছিল একটি অগভীর প্লাটফর্ম, সম্মুখে ছিল অর্কেস্ট্রা। এই অর্কেস্ট্রায় পিটের মতই সাধারণ দর্শকরা দাঁড়াত। পেছনে ছিল গ্যালারী তাতে বসলে দণ্ডায়মান দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে মঞ্চটি দেখা যেত। গ্যালারীর বক্সে মুখ্যতঃ মহিলারাই বসত। অতএব বলা চলে মলিয়ের্ যে রঙ্গালয় ও মঞ্চ পেয়েছিলেন তা প্রায় এলিজাবেথীয় রঙ্গালয়েরই অনুরূপ। মঞ্চে দৃশ্যসজ্জার আয়োজন ছিল যৎসামান্য। রাজসভার মঞ্চে অবশ্য দৃশ্যসজ্জার অপ্রতুলতা ঘটত না। এলিজাবেথীয় রঙ্গালয় ছিল মুক্তাঙ্গন কিন্তু এ রঙ্গালয়টি ছিল সম্পূর্ণ আবৃত। নাট্যাভিনয় আরম্ভ হত সায়াহ্নকালে কিন্তু আলোর ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক—মাত্র কয়েকটি মোমবাতি জ্বলত। শেক্‌সপীয়রের রঙ্গমঞ্চের উপরে যেমন লর্ডরা এবং অভিজাতরা অনেকে আসন নিতেন মলিয়েরের রঙ্গমঞ্চের উপরেও তেমনি হামবড়া বাবুরা বসতেন। মঞ্চে চলাফেরার সময় অভিনেতাদের অনবরত এঁদের কনুয়ের গুঁতো খেতে হত। একমাত্র মলিয়ের্ যখন কোন নবসৃষ্ট ব্যালে-নাটক রাজসভার মঞ্চে অভিনয় করতেন তখনি কিছুটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারতেন। পরিবেশনার এই বাধা না থাকলে তাঁর নাটক হয়তো আরো উন্নতমানের হত, বিদ্রূপ-কশাঘাত আরো তীক্ষ্ণধার হত। তবুও বলতে হবে মলিয়ের্ কিছু মার্জিত রুচির দর্শকও পেয়েছিলেন যাঁরা কর্ণেয়্‌র ল্য মেন্‌তেরের মত নাটকেরও রসগ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। এই দর্শকদের প্রতি আস্থা ছিল বলেই তিনি তাঁর নাটকে কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের পরিশীলিত ও প্রাণশক্তিপূর্ণ হাই-কমেডির মিশ্রণ ঘটাতে পেরেছেন।

মলিয়েরের নাটকের মধ্যে বহুধারারই সংমিশ্রণ ঘটেছিল—তার মধ্যে ছিল—১। ফরাসী দেশের নিজস্ব ধারা, ২। "পিয়ের্ পাৎলাঁ"র (Pierre Pathelin) নির্দোষ হাসি-তামাশা, ৩। ছিল স্পেনীয় নাটকের অসংখ্য ঔৎসুক্য জাগরণকারী ঘটনা, ৪। প্লাউতুসের কমেডির প্রভাব, ৫। সর্বোপরি ছিল ইতালীয় কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের ব্যঙ্গ, কৌতুক ও টাইপ্ চরিত্র চিত্রণ। এটাই বিস্ময়কর যে তিনি এতগুলো ধারা গ্রহণ করেও তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা সৃজন করেন এবং বিশ্বের কমেডি রচনার সর্বোচ্চ আসনে উপনীত হন। এমনিই বহুধারার সংমিশ্রণ ঘটা সত্ত্বেও অনন্য হয়ে উঠেছিলেন নাট্যকার শেক্সপীয়র।

শেক্সপীয়রও একজন শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর কমেডিকে আমরা প্রহসন (Farce) শ্রেণীভুক্ত করতে পারি না, সেগুলি যতখানি মিলনান্ত ছিল, ততখানি হাস্যরসাত্মক (Comic) ছিল না। শেক্সপীয়রের নাটককে আমরা বলতে পারি অর্ধ কমেডি এবং অর্ধ অলীক-কল্পনা বিলাসময় নাটক, তাই নির্ভেজাল কমেডি বলতে গেলে মলিয়েরেরই ছিল শ্রেষ্ঠ আসন।

তিনি কর্নেয়্‌র "ল্য মেন্‌তের্" (Le Menteur) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে হিরোইক্-ট্র্যাজেডি (Heroic Tragedy) "ডন্ গারসি" লেখেন এবং এই ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করতে থাকেন কিন্তু তাতে যথেষ্ট জনসমর্থন পান না। তখন তিনি তাঁর ভ্রাম্যমাণ যুগের লেখা "দ্যা ব্লাণ্ডারার্" (The Blunderer or L' E'tourdi) এবং "দ্যা লাভ্ টিফ্" (The Love Tiff or Le Dépit Amoureux) ফার্স দু'খানির অভিনয় করেন তাতে প্যারিস্-বাসীরা বিমুগ্ধ হয়ে যায়। অতএব এতেই উৎসাহিত হয়ে তিনি একের পর এক বিদ্রূপাত্মক নাটিকা রচনা করতে থাকেন। কেতাদুরস্ত রোমান্টিক প্রেমের অভিলাষিনীদের নিয়ে লেখেন "দ্যা হাই ব্রাউ লেডিজ্" (The High-Brow Ladies or Précieuses Ridicules) নাটক।

এরপরে তিনি একটি একাঙ্কিকা লেখেন "দি ইম্যাজিন্যারি কাকল্ড্" (The Imaginary Cuckold or Sganarelle) এতেই তিনি সর্বপ্রথম মধ্যবিত্তদের চরিত্র চিত্রণে আগ্রহশীল হন। একজন অমার্জিত সাধারণ লোক যে মনে করত তার অসতী স্ত্রী তাকে প্রতারণা করছে—এই বাস্তবানুগ প্রহসনটি প্রধান মন্ত্রী মাজার্যাঁর (Mazarin) আনুকূল্য লাভ করে। ক্রমে তিনি

সকল শ্রেণীর দর্শকেরই হৃদয় জয় করে নেন "দ্যা স্কুল ফর্ হাজব্যাণ্ডস্" (The School for Husbands) রচনা করে। এই নাটকটির কাহিনী তিনি প্লাউতুসের আদেল্‌ফি এবং লোপে দ্য ভেগার একটি কমেডি অবলম্বনে বয়ন করেন। দুই ভাই এবং তাদের বাগ্‌দত্তা কন্যাদের নিয়ে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। এতে তিনি রাজা লুইরও অনুকম্পা লাভ করেন। রাজসভার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সভাসদদের ব্যঙ্গ করে লেখেন "দ্যা বোর্‌স" (The Bores or Les Facheux)।

মলিয়ের্ চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট "আর্‌মাঁদ্"কে (Armande) বিবাহ করেন। আর্‌মাঁদ্ ছিলেন অহংকারী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মলিয়েরের জীবন-নাট্যের এটাই "পেরিপেটি" বা পরিস্থিতি-বিপর্যাস যে দুর্ভাগ্যবশতঃ যিনি এতকাল অসতী পত্নীদের ঈর্ষাকাতর স্বামীদের নিয়ে বিদ্রূপনাট্য রচনা করতেন তিনি নিজেই তাঁর বাস্তবজীবনে সেই ধরনের হতভাগ্য চরিত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর তিনি নিজেই নিজের শব ব্যবচ্ছেদ করলেন তাঁর "দ্যা স্কুল ফর্ ওয়াইভ্‌স্" (The School for Wives—১৬৬২ খ্রীঃ) নাটকে সন্দেহপরায়ণ স্বামীর চরিত্র চিত্রণ করে। ১৬৬৫ খ্রীঃ তিান লেখেন "লাভ্ ইজ্ দ্যা বেস্ট্ ডক্টর" (Love Is the Best Doctor or L' Amour Médecin); এবং একের পর এক তিনি লিখতে থাকেন "দ্যা মিসান্‌থ্রোপি" (The Misanthrope), "ফিজিসিয়ান অ্যাগেন্‌স্ট হিজ্ উইল্" (Physician Against His Will or Médecin malgrè lui), ডন্ জুয়ানের রোমান্টিক প্রেমকে বিদ্রূপ করে লেখেন "ডন্ জুয়ান্" ব্যঙ্গনাট্য। প্লাউতুসের আউলুলারিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন "দ্যা মাইজার্" (The Miser or L' Avare)। মলিয়েরের তিন অঙ্কের প্রখ্যাত প্রহসন হল "তারতুফ্" (Tartuffe) এই নাটকখানিতে তিনি ধর্মান্ধতার উপর আঘাত করেন। ভণ্ড গুরু তারতুফ্ যখন শিষ্য পত্নীর শালীনতা হরণে সচেষ্ট হয় তখন শিষ্যের কাছে তার মুখোশ খুলে পড়ে। রাজা লুই এই নাটক দেখে বুঝতে পারেন তাঁর রাজসভার ভাঁড়টি অনেকদূর এগিয়ে যাচ্ছে। চার্চ ও আপত্তি তুলতে থাকে অতএব এই নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। জনসমক্ষে এই নাটকখানির অভিনয় পরবর্তী পাঁচ বছর বন্ধ ছিল অতঃপর সংশোধিতরূপে এর সাধারণ মঞ্চে অভিনয় হয়।

মলিয়েরের রচনার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম কারণ আমাদের

বাংলাদেশের জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি প্রহসন রচয়িতারা এককালে তাঁর দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি মলিয়েরের প্রভাব থেকে তীক্ষ্ণধী বার্নার্ড শ'ও বাদ পড়েন নি। মলিয়েরের মধ্যে ছিল সামাজিক জীবনের তীব্র সমালোচনা। জীবনের হাস্যকর নীতিনিয়ম, সমাজদেহের নানান ভুল-ত্রুটি, অসঙ্গতি এবং মানব চরিত্রের অবিমৃষ্যকারিতা কিংবা ধর্মান্ধতা—এগুলিকে অবলম্বন করেই তিনি প্রহসন লিখেছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই হাস্য-পরিহাসের মধ্যে অন্তর্লীনভাবে ফুটে উঠেছিল দার্শনিক নীতিজ্ঞান ও সামাজিক দোষ ত্রুটির সমালোচনা।

মলিয়ের্ নাট্যরচয়িতা হিসেবে যত বড় প্রতিভার স্বাক্ষরই রাখুন না কেন, তৎকালীন ফরাসী মঞ্চ ছিল রাজা, অভিজাত ও পণ্ডিতদের হাতে। তাঁরা মঞ্চকে রাজসভারই অনুরূপ কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন। এই সমস্ত মঞ্চে ইতালীয় পদ্ধতির সর্বপ্রকার মঞ্চসজ্জাই ব্যবহার করা হত কিন্তু সেখানে ছিল না জনসাধারণের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা, ছিল না প্রাণবন্যার উদ্দামধারা—যে প্রাণঢালা হাস্য পরিহাস ছিল ফার্সের প্রকৃত লীলাভূমি। তাই মলিয়ের্ জীবদ্দশায় অনেক বিরূপ সমালোচনা এবং দুঃখ দৈন্য সহ্য করেছেন কিন্তু ভবিষ্যৎকালের ফার্স রচয়িতাদের জন্য রেখে গেছেন এক প্রাণবন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজসভার ছত্রছায়ায় নিও-ক্লাসিক্ পরিবেশে থেকেও মলিয়ের্ তাঁর প্রতি রচনায় সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি, ভণ্ডামী ও ব্যর্থতার উপরে কশাঘাত করেন এবং তুলে ধরেন মধ্যবিত্ত মানুষের টাইপ্ চরিত্র ইতিপূর্বে নাটকে যার ঠাঁই ছিল না।

॥ রেস্টোরেশন্ ও অষ্টাদশ শতক ॥

ইংল্যাণ্ড

ইংলাণ্ডের প্রথম চার্লস্ ও প্রথম জেমসের স্টুয়ার্ট রাজত্বকালে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ ক্রমান্বয় জটিলতর আকার ধারণ করতে থাকে। এই বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে ছিল পিউরিটানদের বিপ্লব। এদের নেতা হয়ে এলেন অলিভার ক্রমওয়েল। সাময়িকভাবে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটল এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। পিউরিটানরা একদিকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে, আর অন্যদিকে চেয়েছে থিয়েটারের উচ্ছেদ। পিউরিটান বিপ্লব রাজ অধিকারকে সম্পূর্ণই পরাভূত করতে পেরেছিল, থিয়েটারকে কিন্তু সেইমত সর্বদিকেই পরাভূত করতে পারেনি। থিয়েটারের প্রতি বিরূপতা পিউরিটানরা এলিজাবেথীয় যুগেও প্রদর্শন করে। পরবর্তীকালে থিয়েটার নিয়ে এই কলহ ও সংগ্রাম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতই তিক্তাস্বাদী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের নাটক ইংরেজ জাতির এতই প্রিয় ছিল যে, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা কোন দিনই সম্ভব হয়নি। মঞ্চের বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্সের পরে অর্ডিন্যান্স জারি হতে থাকে, কিন্তু ১৬৪২ সাল থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে অর্থাৎ পিউরিটানদের সর্বাধিক প্রাধান্যের কালে এমন একটিও বছর কাটেনি যখন নাট্যানুষ্ঠান হয়নি। পার্লামেন্টের সৈন্য বাহিনী নাট্যাভিনয় বন্ধ করতে এসেছে, নাট্যকারদের বন্দী করেছে, জিনিসপত্র আটক করেছে, থিয়েটারের লোকদের জেলে পুরেছে, রঙ্গালয় ভেঙ্গে দিয়েছে। এই একটানা প্রচেষ্টা থেকেই বোঝা যায় যে পিউরিটানরা কোনদিনই নাট্যানুষ্ঠান একেবারে বন্ধ করতে পারেনি। তবে একথাও সত্য যে একেবারে বিলুপ্ত না হলেও উপর্যুপরি এই আঘাতে নাট্যশিল্প মরণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তির আবার পুনরাগমনে তাই থিয়েটারও নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছিল। থিয়েটারের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল বলেই এযুগকে বলা হয়েছে "রেস্টোরেশন্" (Restoration) বা পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগ।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় রাজকীয় নাট্যদল ভেঙ্গে যায় তার কিছু অংশ ইংল্যাণ্ডে থেকে গেলেও প্রধান অংশ নির্বাসিত রাজপুত্রের সঙ্গে প্যারিস্,

মূল্যও ছিল মাঝারি ধরনের। যে টিকিট বিক্রি করা হত তার জন্য একটি করে পিতলের প্রতিলিপি দেওয়া হত; বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে ছাপানো কাগজের টিকিটও বিক্রি করা হত। অভিনেতা ও নাট্যকারদের জন্য ছিল হাড়ের তৈরী গেটপাস, তাদের এর জন্য কোন আর্থিক বিকল্পের প্রয়োজন হত না। যুবকদের কাছে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারা ছিল একটা মস্ত বড় কৃতিত্বের বিষয়—এবং প্রায়শঃই তারা তা করে থাকত। উর্দিপরা বড়লোকদের অনুচররাও বিনা টিকিটে একেবারে উপরের গ্যালারীতে বসে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত নাটক দেখবার অনুমতি পেত। এই সুযোগগুলি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হত বলে এই শতাব্দীর শেষের দিকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নূতন নাটকের প্রথম রজনীতে টিকিটের দাম দ্বিগুণ নেওয়া হত, অপেরায় অনেক সময় তিনগুণ মূল্যও প্রথম রজনীতে নেওয়া হত।

দ্বিতীয় চার্লস্ দর্শকদের মঞ্চের উপরে বসার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তাই মঞ্চের খুব কাছে ইংরেজ ফুলবাবুদের একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল, সেখানে তারা এলিজাবেথীয় যুগের বা ফরাসী ফুলবাবুদের মতই আচরণ করত। বিশ্রামকালে কমলালেবু, আপেল, মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি বিক্রিরও ব্যবস্থা ছিল।

অভিজাত দর্শকরা অনেক সময় মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে অভিনেতা অভিনেত্রীদের, "ড্রেসিং রুম" বা খাস কামরায় যেত, সেখানে তাদের আচার আচরণ সর্বদা ভদ্রজনোচিত হত না। রেস্টোরেশন্ যুগেই ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাঁরা ছিলেন জনসাধারণের বিপুল কৌতূহল এবং মনোযোগের বিষয়। অনায়াসেই তাঁরা উচ্চতর সমাজের বাসিন্দা হয়ে উঠলেন এবং মহার্ঘ উপহার পেতে লাগলেন। তাঁরা রাজানুরাগ হতেও বঞ্চিত হতেন না।

ইংরেজ দর্শকরা এরই মধ্যে কখন কখন বা ভ্রাম্যমাণ ফরাসীদের অভিনীত ইতালীয় কমেডি দেখতে পেত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁর "হোয়াইট্ হল্" সংলগ্ন "গ্রেট-হলে" (Great Hall) এবং "ককৃপিট্-ইন্-কোর্টে" (Cockpit-in-Court) দেশী বা বিদেশী নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করাতেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে বাছাই করা লোকদের আমন্ত্রণ করা হত। রাজানুষ্ঠান-গুলিতে বেশির ভাগই বল-ডান্স বা মাস্ক অভিনয় হত—কারণ রাজা স্বয়ং

হামেশাই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে যেতেন এবং সেখানেই তিনি কমেডি বা ট্র্যাজেডির রস উপভোগ করতে পারতেন।

একালের থিয়েটার পরিবেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে এই রেস্টোরেশন্ থিয়েটার ছিল ইংরেজ অভিজাতদের নানান দরকারি কাজকর্ম, গল্পগুজব, অভিসার সংকেত ও বাবুয়ানার স্থান এবং প্রায়শঃই নাটককে মনে হত তার আনুষঙ্গিক মাত্র। এক ক্ষীয়মাণ কৃষ্টি জন্ম দিয়েছিল এই বৈদেশিক প্রভাবান্বিত নাট্যশিল্পের। এতে আমদানী করা হয়েছিল বিদেশীয় রীতি প্রকৃতি ও মনোভাবের যাকে দেশীয় অভ্যাসের দ্বারা নিশ্চয়ই সাঙ্গীকৃত ও পরিবর্তিত করা যেত—কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের ইউরোপ প্রীতির জন্য তা সম্ভব হয়নি।

রেস্টোরেশন্ যুগের নাটকের উপর যেমন ফরাসীদেশের "নিও-ক্লাসিক্" নাটকের প্রভাব পড়েছিল, তেমনি এযুগের অভিজাতদের রঙ্গালয়ে পড়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁস্ দৃশ্যসজ্জা দ্বারা সীমাঙ্কিত ফরাসী মঞ্চের প্রভাব। রেস্টোরেশন্ যুগের মঞ্চশিল্প সম্পর্কে আমরা জানতে পারি "জন্ ওয়েবের" (John Webb) প্রামাণ্য রচনায়। জন্ ওয়েব্ ছিলেন ইতালীয় দৃশ্যসজ্জায় শিক্ষিত "ইনিগো জোন্সের" (Inigo Jones) শিষ্য ও সহকারী।

চিত্রদ্বারা স্থানের মায়ারূপ সৃষ্টি করার বাসনা পঞ্চদশ শতকেই আবির্ভূত হয়। এই সময়ে রেনেসাঁসের চিত্রশিল্পে রেখাদ্বারা নব নব দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করা এবং বস্তুকে যথাযথ দূরত্বে ও জ্যামিতিক স্থানে স্থাপন করার শৈল্পিক নৈপুণ্য মঞ্চশিল্পে এক নব দিগন্ত রেখার সৃষ্টি করেছিল। এই রেনেসাঁস্ যুগের কয়েকজন বড় বড় ইতালীয় চিত্রশিল্পী এমন কি মহান্ স্রষ্টা রাফায়েল পর্যন্তও একালের মঞ্চে দৃশ্যপরিকল্পনা করেন। রেনেসাঁস্ যুগের প্রারম্ভে অঙ্কিত তৈলচিত্রের পশ্চাৎপট বর্তমান যুগের মত সহজ, সরল রঙে ঢাকা না হয়ে নিসর্গ দৃশ্যাবলীতে চিত্রিত হত, তেমনি ছিল সেযুগের মঞ্চের পশ্চাৎপট। এতে প্রধান হয়ে উঠেছিল পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞানসঙ্গত যান্ত্রিক কৌশল। অঙ্কন. শিল্পীর একান্ত বাসনাই ছিল দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে যথা-সম্ভব দূরের দৃশ্যকে বাস্তবানুগ করে তোলা। সেরলিওর বিখ্যাত দৃশ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে আমরা এই পদ্ধতির পরিস্ফুট রূপ পাই। এই রীতিতে স্থাপত্য গঠনের অঙ্কিত রূপই প্রধান হয়ে উঠেছিল। ভাবাবেগ ও অনুপ্রেরণা প্রসূত না হয়ে তা ছিল অনেক বেশি যান্ত্রিক ও বুদ্ধিগত। তাই এই

রীতিকে পরবর্তী রোমান্টিক শৈলীর তুলনায় ক্লাসিক্ বলা যায়। ক্রমশঃ এই স্থাপত্য ভঙ্গি এতই প্রাধান্যযুক্ত হয়ে উঠেছিল যে, তা আর তখন শুধুমাত্র সমতল ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যেই অঙ্কিত হত না। যেখানে সেখানে সম্ভবপর হলেই খোদাই-এর কাজও ব্যবহার করা হত; ব্যবহার করা হত ত্রি-বেধ যুক্ত সত্যকার ভাস্কর্য মূর্তি বা কোন সুকঠিন অবয়ব।

সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ইংরেজরা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ রাজদরবারের মাস্ক নাটক বা নৃত্যগীতবহুল নাট্যাভিনয়ের জন্য অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ নিজস্ব এক দৃশ্যসজ্জাপ্রণালী গড়ে তুলেছিল। এই দরবারী দৃশ্যাবলী রচনায় যিনি প্রধান হোতা ছিলেন তিনি হলেন ইনিগো জোন্‌স। এই নবতম সৃজনপদ্ধতির জন্য তাঁকে অনেক দুরূহ অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে যেতে হয়েছে। তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক শিখেছেন, এবং যাত্রাপথে অনেক বাধা পেয়েছেন। ইংরেজদের কাছে তিনি নিয়ে এলেন, ইতালীয় পরিপ্রেক্ষিত রীতি, "প্রোসীনিয়াম্ তোরণ" (Proscenium arch) এবং সমসাময়িক ইউরোপের মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্যাপসরণ পদ্ধতি। জোন্‌সকে এই পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে ইংল্যাণ্ডে অনেক বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সেরলিওর চাইতে জোন্‌সের নকশা ও পরিকল্পনাগুলি অনেক স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল ছিল। তাঁর বেশির ভাগ কাজের মধ্যেই কল্পনাশক্তির প্রয়োগ এবং তাকে নিপুণ হাতে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়, যা ছিল সম্পূর্ণই তাঁর ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য-বহনকারী। সম্ভবতঃ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল কাঠের সরু সরু লম্বা খাতে (Grooves) সরন্ত দৃশ্যাবলীর প্রবর্তন করা। এই পদ্ধতি পরবর্তীকালে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে প্রত্যেক রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

জোন্‌সের পদ্ধতি অনুসারে মঞ্চের অঙ্কিত ফ্লাটগুলি (Flats) উপরে ও নীচে কাঠের গ্রুভের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো থাকত যাতে তার যে কোন একটি ফ্লাট টেনে মঞ্চের অভ্যন্তরে বা পাশে সরিয়ে নেওয়া যায়। এই ফ্লাটগুলি পর পর কয়েকটি শ্রেণীতে সজ্জিত থাকত, প্রথম দৃশ্যের পরে সম্মুখবর্তী ফ্লাটগুলি সরিয়ে নিলেই—পশ্চাতের ফ্লাটগুলি বেরিয়ে এসে নূতন দৃশ্যাবলী রচনা করে ফেলত।

ইনিগো জোন্‌স ইংরেজ রাজসভায় যে সমস্ত দৃশ্য-পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন তা ১৬৪২ খ্রীঃ পিউরিটান অভ্যুত্থান ও প্রজাতন্ত্রের আগমনে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। ইতালির দৃশ্য-পরিকল্পনাকারীরা কিন্তু এ ধরনের বাধা

পাননি। ইতালীয় নাট্যসাহিত্য তখন হৃত গৌরব। নূতন কোন প্রতিভার দর্শন মিলছে না, সুতরাং মঞ্চদৃশ্যাবলী শিল্পও অন্তঃসারশূন্য আঙ্গিক-প্রধান ভাবে এগিয়ে চলতে লাগল। ভেনিসের গিয়াকোমো তোরেল্লি সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি তাঁর দৃশ্যরূপায়ণের অদ্ভুত প্রভাবে সমকালীন নগরবাসীদের এমনি বিভ্রান্ত করে তুলেছিলেন যে তারা তাঁকে শয়তানের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ মনে করে হত্যা করতে চেয়েছিল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্যারিসে পলায়ন করেন এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে সেখানে তাঁর অপূর্ব দৃশ্যাবলী ও তাঁর সুবিস্তৃত প্রভাবকে প্যারিস্বাসীরা ভেনিস্বাসীদের মত ভয়াবহ উপায়ে প্রশংসা করতে চায়নি। তোরেল্লি এবং তাঁর অনুগামীদের চেষ্টায় দৃষ্টি বিভ্রমকারী অদ্ভুত দৃশ্যাবলী ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। এই সব ইতালীয় দৃশ্যশিল্পীদের বাহুল্যমণ্ডিত, অপূর্ব দর্শন নকশা ও মণ্ডনশিল্প সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মঞ্চে অবিসংবাদী ছিল।

এই শিল্পীদের মধ্যে "বিবিয়েনা" (Bibiena) নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি পরিবারের নাম। এই নাম চার পুরুষ ধরে মঞ্চ শিল্পে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। "জিওভান্নি বিবিয়েনা" (Giovanni Bibiena) এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন। তারপরে আসেন পুত্র "অ্যালেসান্দ্রো" (Alessandro) ও তাঁর প্রপৌত্র "কার্লো" (Carlo)। এই বিবিয়েনারা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে অদ্ভুত রকমের দৃষ্টি বিভ্রমের সৃষ্টি করতেন। এই সমস্ত দৃশ্যাবলী যদিও আজকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রাচীনপন্থী ও প্রচলিত ধারা বহির্ভূত—অলংকার ভারাক্রান্ত মনে হবে, তবুও এই সমস্ত শিল্পীদের কারুকৌশল, ধৈর্য ও নিপুণতার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। ইতালীয় ও ফরাসী মঞ্চের এই কল্পলোকসম্ভূত অলংকৃত দৃশ্যসজ্জার প্রভাব রেস্টোরেশন্ যুগের অভিজাত রঙ্গালয়ের উপরও এসে পড়েছিল। কিন্তু তা বিবিয়েনাদের মত এত উদ্দাম পথ অনুসরণ করেনি। রেস্টোরেশন্ মঞ্চ পেয়েছিল শেক্সপীয়রীয় সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে এই দরবারী মঞ্চের এক সমন্বিত রূপ।

রেস্টোরেশন্ যুগ ইংল্যাণ্ডের মঞ্চ শিল্পে এক বিবর্তনের যুগ। এলিজাবেথীয় রঙ্গালয়ের শেষ এবং আধুনিক রঙ্গালয়ের আরম্ভই ছিল এ যুগের মূল বৈশিষ্ট্য। এই নূতন প্রেক্ষাগৃহগুলি ফ্রান্সের মতই গঠন পদ্ধতির ছিল, সেই রকমই লম্বা, সরু, আয়তাকার টেনিস্-লনের উপর গড়ে উঠত।

এলিজাবেথীয় যুগের মত অভিনেতারা দর্শকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকত না, মঞ্চ থাকত সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রঙ্গালয়ের এক কিনারায়। প্রথম চার্লসের সময়ে যে কোর্ট মাস্কের অভিনয় হত প্রজাতন্ত্রের সময় সেই অভিনেতারা ভ্রাম্যমাণ দল হিসেবে বিচ্ছিন্ন ভাবে টিকে ছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে তারাই আবার দৃশ্যসজ্জা সম্বলিত নূতন মঞ্চে অভিনয় দেখাতে আরম্ভ করল। এদেরি প্রভাবে এলিজাবেথীয় ধারাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হল না। বেশির ভাগ ইউরোপীয় (কন্টিনেণ্টাল্) থিয়েটারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মঞ্চের সম্মুখ রেখা তীক্ষ্ণভাবে কাটা থাকবে—এলিজাবেথীয় মঞ্চের প্রভাবে রেস্টোরেশন্ রঙ্গালয়ে এর ব্যতিক্রম দেখা দিল। যবনিকা ছাড়িয়ে এর সম্মুখ অংশ বক্ররেখায় এগিয়ে এল। মঞ্চের ভাষায় এই অংশের নাম হল "এপ্রোন্" (The Apron), এই এপ্রোন্ই যে এলিজাবেথীয় "প্লাটফর্ম" মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ তা বেশ বোঝা যায়। এর সঙ্গে আবার একটি ক্লাসিক্ পদ্ধতিও এসে যুক্ত হয়েছিল, পশ্চাতের "প্রোসীনিয়াম্ ফাসাদ্" (Proscenium Facade)-এর গায়ে কোথাও দু'টো কোথাও চারটে প্রবেশ পথ থাকত। অভিনেতারা সাধারণতঃ এগুলি দিয়েই মঞ্চে প্রবেশ বা প্রস্থান করত। এর সঙ্গে এপ্রোন্ যুক্ত হয়ে অভিনেতাদের দর্শক-সাধারণের আরো নিকটবর্তী করে তুলল। এরপরে এপ্রোনে প্রবেশের জন্য পার্শ্ববর্তী দরজা হল—এবং আমরা একথাও ধরে নিতে পারি যে মঞ্চের বেশির ভাগ অভিনয়ই এই সম্মুখবর্তী অংশে অভিনীত হত। ফলে মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা কার্যতঃ অভিনেতাদের পশ্চাৎপটেরই কাজ করত। ধীরে ধীরেই অভিনেতারা পেছনে সরে গিয়ে সেটের অভ্যন্তরে অভিনয় করতে অভ্যস্ত হয়।

রেস্টোরেশন্ যুগে এলিজাবেথীয় থিয়েটারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল "দ্যা রেড্ বুল" (The Red Bull)। একটি সরাইখানাকে পরিবর্তন করে এই রঙ্গালয়টি গড়ে উঠেছিল, এর মঞ্চটি তৈরী হয়েছিল ১৬০৭ খ্রীঃ, কিছু কিছু পণ্ডিতের মতে এর উপরের আচ্ছাদন পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছিল, পূর্বে এটি উপরে আচ্ছাদনহীন শেক্সপীয়রীয় স্ট্যাণ্ডিং-পিট-থিয়েটার (Standing-Pit Theatre) ছিল।

"দ্যা ফিনিক্স" (The Phoenix) অথবা "দ্যা ককপিট-ইন্-ড্রুরি লেন" (Cockpit-in-Drury Lane) প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির পূর্বেকার থিয়েটার ছিল এবং পিউরিটানদের আধিপত্য কালে বেশির ভাগ সময়ই এটা নিয়ে মামলা,

মকদ্দমা চলছিল। রেস্টোরেশন্ যুগে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে "জন্ রোড্স্" (John Rhodes) এটা লীজ নেন, ডাভেনান্ট্ সেখানে একদল তরুণ অভিনেতা নিয়ে "দ্যা ডিউকস্ কম্প্যানী" (The Duke's Company) গড়ে তোলেন। পিউরিটানরা এই রঙ্গালয়ের সকল আসবাবপত্রই নষ্ট করে দিয়েছিল। সুতরাং ডাভেনান্ট্কে আবার থিয়েটারটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবেই সাজাতে হল। তিনি তাঁর "দ্যা সীজ্ অব্ রোড্স্" (The Siege of Rhodes) নাটকের জন্য ফরাসী ধরনের সেটিং, যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং মঞ্চোপকরণ এনে রঙ্গালয়ের পুনর্গঠন করেন। পরবর্তী কালে এই রঙ্গালয়টিতে ফরাসী ও ইতালীয় ভ্রাম্যমাণ কমেডি দলগুলি প্রায়ই অভিনয় করত।

কালের কবল হতে রক্ষাপ্রাপ্ত এলিজাবেথীয় যুগের আর একটি থিয়েটার ছিল ফ্লীট্ স্ট্রীটে অবস্থিত "সল্স্বেরী কোর্ট" (Salisbury Court—Fleet Street)। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এর অভ্যন্তর ভাগ ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু রেস্টোরেশন্ যুগের সুরুতে একে আবার পুনর্গঠিত করা হয়। এতে পর পর ডাভেনান্ট্, "জর্জ জোলি" (George Jolly) এবং "উইলিয়ম্ বীস্টোনের" (William Beeston) অধীনে অভিনয় হয়। শেষে ১৬৬৬ খ্রীঃ লণ্ডনের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেড্ বুল, সল্স্বেরী কোর্ট—এই রঙ্গালয়গুলির পুরানো দেয়ালের গায়ে বিগত গৌরবোজ্জ্বল যুগের প্রতিধ্বনি ছিল। নূতন দিন এসে সেখানে বাসা বাঁধতে চাইল, কিন্তু পুরানো দেয়ালে আর নয়, নূতন দিনের জন্য গড়ে উঠল নূতন দেয়াল।

১৬৬০ খ্রীঃ ডাভেনান্ট্ এবং কিলিগ্রু নূতন রঙ্গালয় তৈরী করে পুরানো অভিনেতাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নিজেদের দল তৈরী করেন। ডাভেনান্ট্ দ্যা রেড্ বুলের পুরানো অভিনেতাদের দ্বারা গড়া সল্স্বেরী কোর্ট রঙ্গালয়টি অধিকার করেন, আর কিলিগ্রু তাঁর দল নিয়ে এলেন "গিবোন্স্ টেনিস্ কোর্টে" (Gibbons' Tennis Court), এটাকে একটা রঙ্গালয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছিল। ফরাসী অভিনেতারা যেমন রেনেসাঁসের প্রথম যুগে টেনিস্ কোর্টকেই নাট্যাভিনয়ের উৎকৃষ্ট স্থান বলে মনে করেছিলেন। গিবোন্স্ও তেমনি ২৩০´ ফুট লম্বা ১৬০´ ফুট চওড়া একটি জমিতে রঙ্গালয় গড়ে তোলেন, তাতে যে মঞ্চটি ছিল তা এলিজাবেথীয় মঞ্চের অনুরূপই স্থাপত্য গঠন পেল। এলিজাবেথীয় যুগের মতই এতেও

মঞ্চের দু'পাশে বিশিষ্ট দর্শকরা বসবার আসন পেত। কিলিগ্রু নূতন থিয়েটার—"দ্যা ফার্স্ট থিয়েটার রয়্যাল" (The First Theatre Royal) যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই রঙ্গালয়েই কাজ করেছেন। থিয়েটার রয়্যালই ছিল রেস্টোরেশন্ যুগে স্থাপিত প্রথম থিয়েটার। এটি ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিজেস্ স্ট্রীট ও ড্রুরি লেনের মধ্যস্থলে নির্মিত হয়েছিল।

ইতিপূর্বেই ডাভেনান্ট্ আয়তনে কিছু ছোট একটি জমি নিয়ে "টেনিস্ কোর্ট থিয়েটার" গড়ে তোলেন। জমিটি ছিল "লিঙ্কন্স্ ইন্ ফিল্ডসের" (Lincoln's Inn Fields) কাছে নাম ছিল "লাইল্" (Lisle) তাঁর দল তখন সলস্বেরী কোর্টে অভিনয় করছিল, সেখান থেকে ১৬৬১ খ্রী: নূতন রঙ্গালয়ে উঠে এলেন। তিনি এটিকে যথাসম্ভব আধুনিক দৃশ্যসম্ভার ও যন্ত্রদ্বারা সজ্জিত করেন।

রঙ্গালয়টির নাম রাখা হয় "ডিউকস্ প্লে হাউজ" (Duke's Playhouse) এটি প্রায় ৩০´ ফুট চওড়া ও ৭৫´ ফুট লম্বা ছিল। ইচ্ছামত দৃশ্যসজ্জা করার জন্য তিনি মঞ্চের পার্শ্ববর্তী আরো কিছুটা জমি নেন।

ডাভেনান্ট্ এই নূতন রঙ্গালয় তৈরী করায় কিলিগ্রু তাঁর গিবোন্স্ টেনিস্ কোর্ট ছেড়ে, দ্যা ফার্স্ট থিয়েটার রয়্যাল তৈরী করে ১৬৬৩ সালে সদলে সেখানে আসেন। এই রঙ্গালয়টির প্রচলিত নাম ছিল "দ্যা ফার্স্ট ড্রুরি লেন" (The first Drury Lane) এই গৃহটির পরিমাপ ছিল ১১২´ ফুট লম্বা ও ৫৮´ ফুট চওড়া।

কিলিগ্রুর থিয়েটার ১৬৭২ খ্রী: অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপরে "সার্ ক্রিস্টোফার্ রেন্" (Sir Christopher Wren) সেই একই জমির উপর নূতন একটি রঙ্গালয় তৈরী করেন। এটিতে প্রবেশ করা হয় ১৬৭৪ খ্রী:। এর পরিকল্পনাতে দেখা যায় যে পিটের মধ্যে আসনগুলি অর্ধবৃত্তাকারে সারি সারি দ্রুত ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে। তার পেছনে রয়েছে গ্যালারী। পিটের সম্মুখ সারি যে বৃত্তে সমাপ্ত হয়েছে সেখান থেকেই মঞ্চ সুরু হয়। মঞ্চে ছিল এক বিরাট বিস্তৃত প্রোসীনিয়াম্ এবং তার এক এক পাশে চারটি করে দরজা, সামনে ছিল একটি সুগভীর এপ্রোন্ এবং তার পশ্চাতে ছিল বিশাল "রেক্ড স্টেজ" (Raked stage) যা পেছনে উঁচু ও সামনে ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে এসেছে। এপ্রোনের সামনে থেকে একেবারে পশ্চাদ্-দেয়াল পর্যন্ত স্থানের দৈর্ঘ্য ছিল পুরো বাড়ির প্রায় অর্ধেক। এই পরিকল্পনায়

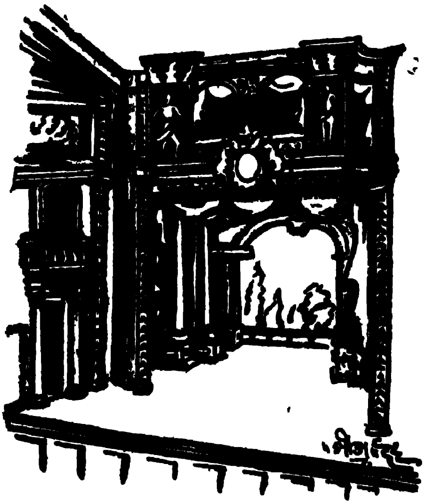
আমরা দেখতে পাই, পূর্বেকার্ টেনিস্ কোর্টের পরিকল্পনা থেকে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে।



ড্রুরি লেন থিয়েটার : সম্মুখ দৃশ্য।

এরপরে দ্বিতীয় ড্রুরি লেনের থিয়েটার তৈরী হয়, এতে খরচ আরো বেশি পড়ে, প্রায় চার হাজার পাউণ্ড। রঙ্গালয়টির আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ১৪০´ ফুট এবং প্রস্থে ৫৮´ ফুট, এতেও মঞ্চ ছিল পুরো রঙ্গালয়ের অর্ধাংশ জুড়ে। এর এপ্রোনের অংশ প্রোসীনিয়ামের পেছনে মঞ্চ যতখানি গভীর ছিল তারই অনুরূপ গভীর ছিল। এপ্রোন্ ও মঞ্চ দু'টোই পশ্চাদ্-দেয়ালের দিকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে। মঞ্চের দু'পাশে উইংস্ ছিল, এপ্রোনের দু'পাশে দু'টি করে প্রোসীনিয়াম্ দরজা ছিল। দ্বিতীয় ড্রুরি লেনের পরে এল "দ্যা থিয়েটার অ্যাট্ ডোরসেট্ গার্ডেন" (The theatre at Dorset Garden) এর পরিকল্পনা ছিল আরো জটিলতর। ডোরসেট্ গার্ডেনে ১৬৭১ খ্রীঃ "দ্যা ডিউক্স্ থিয়েটার" (the Duke's Theatre) খোলা হয়। এই রঙ্গালয়টির পরিমাপ ছিল, ১৪০´ ফুট লম্বা ও ৫৭´ ফুট চওড়া, এটি তৈরীতে খরচ পড়েছিল ন' হাজার পাউণ্ড। সম-কালীন আলোচনা থেকে মনে হয় এই রঙ্গালয়টির ব্যবস্থাপনা অনেকটা

দ্বিতীয় ড্রুরি লেনের থিয়েটারের মতই ছিল। প্রোসীনিয়ামটি ছিল সুপ্রচুর অলংকৃত। এপ্রোনের উপর দিয়ে মঞ্চের ছাদ খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। তাতে দু'টি জানলা ছিল এবং তার গায়ে দু'টি পুরো রিলিফ্ মূর্তি খোদিত ছিল। সেই জানলা দু'টির পেছনে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল, সেই ঘরটি ছিল "সঙ্গীত গৃহ" সম্ভবতঃ "পেপিস্" (Pepys') এই কক্ষকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন "মিউজিক্ এবভ্", বা উর্ধ্বে সঙ্গীত।



ডোরসেট্ গার্ডেন : রেস্টোরেশন্ রঙ্গালয়।

মঞ্চটি রেক্‌ড ছিল এবং তাতে "গ্রুভ্‌ড উইংস্" (Grooved Wings) ও "সাটারস্" (Shutters) ছিল অনেকটা ড্রুরি লেনের মতই। গৃহটি মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে সাড়ম্বরে অলংকৃত ছিল।

ইনিগো জোন্সের সহকারী জন্ ওয়েব্ ডাভেনান্টের দ্যা সীজ্ অব্ রোডস্ নাটকের জন্য দৃশ্য পরিকল্পনা করেন। এ জন্য তিনি যে পাঁচটি দৃশ্যের নকশা করেন তার উপর মাস্ক নাটকের প্রভাবই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এ ছাড়া তিনি দু'টি কোর্ট থিয়েটারেরও পুনঃপরিকল্পনা করেন। "দ্যা কক্‌পিট" (The Cockpit) এবং "গ্রেট হল্" (Great Hall), এর মঞ্চ ও রঙ্গালয় দু'য়েরই পরিকল্পনা ছিল ওয়েবের। তাঁর এই সমস্ত পরিকল্পনা ও স্কেচ্‌গুলির মধ্যে দেখা যায় যে তিনি ইনিগো জোন্সের দরবারী উপস্থাপনা রীতিই অনুসরণ করেছেন বিশেষভাবে। তাঁর নকশায় দেখা যায়—তিনি

এপ্রোনের পশ্চাতে প্রচুর অলংকৃত প্রোসীনিয়াম্ তোরণ, স্তম্ভ এবং তার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কিত উইংস্, ফ্ল্যাট্‌স্ (Flats) এবং সাটার্স্ ব্যবহার করেছেন।

জন্ ওয়েব্ হোয়াইট্ হল্ থিয়েটারে "ওরেরির" (Orrey) "মুস্তাফা" (Mustapha) নাটকের দৃশ্য রচনা করেন। এই ট্র্যাজেডি নাটকটিতে ওয়েব্ "ফল্‌স প্রোসীনিয়াম্" (False proscenium) ব্যবহার করেন। এই মঞ্চে প্রোসীনিয়ামের প্রবেশ মুখ ছিল ২৫´ ফুট, আর তার পেছনে ফল্‌স প্রোসীনিয়াম্‌টি প্রস্থে ছিল ৩´ ফুট ৮´´ ইঞ্চি। মূল রঙ্গালয়টির এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত প্রস্থ ছিল ৩৯´ ফুট ৬´´ ইঞ্চি। ফল্‌স প্রোসীনিয়ামের পেছনে চারটি করে অঙ্কিত দৃশ্যের শ্রেণী ছিল। এগুলি গ্রুভগুলির মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। এখানে একটি অঙ্কিত আকাশ প্রোসীনিয়ামের উপর থেকে একেবারে পশ্চাদ্-দেয়ালের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সঙ্গীত-শিল্পীরা পশ্চাদ্-দেয়ালের পেছনে একটি পরিবর্ধিত গ্যালারীতে বসত। তার দু'টি পরিকল্পনায়ই দেখা যায় যে পরিপ্রেক্ষিতের দৃষ্টি-ভ্রম সৃষ্টির জন্য মঞ্চটি রেকৃড্ ছিল। এই দৃশ্যাবলীর উপর যেমন ছিল ইনিগো জোন্‌সের প্রভাব, তেমনি আবার স্মরণ করিয়ে দেয় সপ্তদশ শতকের ইতালীয় মঞ্চ শিল্পী বিবিয়েনাদের "ব্যারোক্ দৃশ্যাবলী" (Baroque settings)।

এ ছাড়া ড্রুরি লেনের থিয়েটারের জন্য সার্ ক্রিস্টোফার্ রেন্ বিরচিত কতকগুলি নকশা পাওয়া যায়। এই মঞ্চপরিবেশেই "গ্যারিক্" (Garrick) ও "বেটার্‌টনের্" (Betterton) কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং যে সমস্ত প্রখ্যাত কমেডিগুলিকে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের রত্নভাণ্ডারে সজ্জিত করে রেখেছি তাও এই সব মঞ্চেই অভিনীত হয়েছে। রেনের পরিকল্পনায় দেখা যায় কোথাও কোথাও পিটের দর্শকরা এপ্রোনের চিত্তচমৎকারী কারুকার্যই কেবল দেখতে পেত, তার পেছনের দর্শকরা অতি অলংকৃত প্রোসীনিয়াম্ তোরণের মধ্য দিয়ে মঞ্চকে দেখতে পেত। এই সমস্ত রঙ্গালয়-গুলির ব্যয়বাহুল্য দেখলে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে তার ব্যয়ভার বহন করা সাধারণ জনতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মূল তত্ত্ব হিসেবে বলা যায় যে রেস্টোরেশন্ যুগের রঙ্গালয়ে কাঠের গ্রুভগুলির মধ্যে উইং, ফ্ল্যাট্ ও সাটারের ব্যবহার দ্বারাই দৃশ্য রচনা করা হত। মঞ্চের সামনের অংশে থাকত

এপ্রোন্, প্রোসীনিয়াম্, ফলস-প্রোসীনিয়ামের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যময় গঠন। তবে এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি যে, সমস্ত নূতন নাটকের জন্যই আলাদাভাবে দৃশ্য অঙ্কিত করাত তা নয়। যারা হামেশাই অভিনয় করাত তাদের ট্র্যাজেডি ও কমেডির জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সেট অঙ্কিত করা থাকত। সাধারণতঃ ট্র্যাজেডির সেটে থাকত একটি কুঞ্জবন, একটি মন্দির বা প্রাসাদ-কক্ষ ইত্যাদি। কমেডিতে থাকত একটি শয়নকক্ষ, একটি মহিলাদের খাসকামরা এবং একটি পার্ক। কমেডির দৃশ্যগুলি লণ্ডনের বাড়ি ঘরের মতই বাস্তবানুগ হত। এগুলি বিভিন্ন ফ্ল্যাটের উপর অঙ্কিত থাকত।

এই ধরনের মঞ্চে এলিজাবেথীয় রঙ্গালয়ের মতই অভিনয় অনেক সহজ-সাধ্য ছিল এবং দ্রুতলয়ে হতে পারত। "তিন নম্বর সঙ্গীত" (Third music) হয়ে যাওয়ার পর একজন অভিনেতা প্রোসীনিয়ামের কোন একটি দরজা দিয়ে এপ্রোনে এসে ঢুকতেন এবং নাটকের "মুখবন্ধ" (Prologue) বলতেন, তাঁর পেছনে তখন পর্যন্তও রঙ্গমঞ্চে সম্মুখ যবনিকাটি আবৃতই থাকত। মুখবন্ধের অভিনেতা চলে গেলে নাট্যারম্ভ হত, প্রোসীনিয়ামের যবনিকা তখনি সরে যেত। রঙ্গালয়ের সম্মুখ যবনিকা মূল অনুষ্ঠানের মধ্যে কখনই প্রায় পড়ত না। নাট্যারম্ভে তা উত্তোলিত হত এবং নাটকের "স্বস্তিবচন" (Epilogue) যখন শেষ হত তখন যবনিকা পতন হত। নাটকের মধ্যে দৃশ্য-যবনিকা কখনও ব্যবহৃত হত না, দর্শকদের চোখের সম্মুখেই অতি অল্প সময়ে এবং অপূর্ব কৌশলে মঞ্চশিল্পীদের দৃশ্য পরিবর্তন করে নূতন সেট তৈরী করে নিতে হত। নাটকের মূল অংশগুলি এপ্রোনেই অভিনীত হত—প্রোসীনিয়ামের দরজা দিয়ে অভিনেতারা এখানে প্রবেশ বা প্রস্থান করতেন। মঞ্চের পশ্চাদ্বর্তী আপ্‌স্টেজের অংশ অনেকটা পশ্চাৎপটেরই কাজ করত। অভিনয়কালে অভিনেতারা কখন বা পেছন দিকের দৃশ্যাবলীর দিকে এগিয়ে যেতেন, আর তখন দেখা যেত গ্রুভগুলির কাঠের লাইনের মধ্য দিয়ে দু'দিক থেকে সাইড্ ফ্ল্যাটগুলি এসে তাকে আবৃত করে ফেলত। আবার কখন বা বিপরীত ব্যবস্থায়—অর্থাৎ সাইড্‌ফ্ল্যাট সরে গিয়ে দৃশ্যাবলী ও অভিনেতাদের দৃষ্টিগোচর করে দিত। নাটকটি যদি ট্র্যাজেডি হত তবে মধুরেণ সমাপয়েতের জন্য নাটকের শেষে একটি "জিগ্" (Jig) অথবা "কৌতুক সমাপনোক্তি" থাকত এবং তারপরে যবনিকা পতন হত।

এই সময়কার নাটকের অনেক "স্ক্রিপ্টে" নির্দেশ পাওয়া যায় যে—দৃশ্য সরিয়ে দেওয়া হল (the scene draws off) অথবা দৃশ্য উঠিয়ে দেওয়া হল (draws over)—এতে কি উপায়ে মঞ্চ দৃশ্য সরে যেত এবং অভিনয় হত তা কিছুটা বোঝা যায়। এগুলি সাইড্ ফ্লাট্ এবং পেছনের ড্রপ্সের সাহায্যেই করা হত। দুই দৃশ্যের মাঝে কোথাও কোন ছেদ বা সময় বিরতি থাকত না, ধারাবাহিক অভিনয়ের সুযোগ এখানে অবারিত ছিল।

মঞ্চের ফ্লাট্ এবং পেছনের সাটার্গুলিতে ত্রি-বেধযুক্ত খোদাই মূর্তি বা "সেট্ পিসেস্" (Set-pieces) থাকত। কখনও বা ফ্লাট্গুলিকেই গাছ, মন্দির বা বাড়ি ঘরের আকারে কেটে নেওয়া হত। অনেক সময় সেগুলি স্বচ্ছ উপকরণে তৈরী হত, যার মধ্য দিয়ে পেছনের দৃশ্যাবলী অস্পষ্ট ভাবে দেখা যেত। এই উপায়ে চন্দ্রালোকের প্রভাব আনয়ন করা হত। বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে রঙ্গালয়ে নূতন দৃশ্যাবলী রচনা করার রেওয়াজ ছিল। ১৬৯০ খ্রী: নাগাদ মঞ্চে অঙ্ক-যবনিকা (Act curtain) এল। এই অঙ্ক-যবনিকার ব্যবহার সাধারণ নাটকের মধ্যে হত না—এর ব্যবহার চলত হঠাৎ করে বিস্ময় উৎপাদনকারী কোন দৃশ্যকে চোখের সম্মুখে আনবার জন্য, অথবা যখন কোন জটিল দৃশ্য রচনা করতে হত। এই অঙ্ক-যবনিকার প্রয়োগ সাধারণ রঙ্গালয়ে মোটেই জনপ্রিয় ছিল না, সেখানকার দর্শকরা দৃশ্য পরিবর্তনের জাদুখেলাটা চোখের সামনেই ঘটা বেশি পছন্দ করত। অঙ্ক যবনিকার সর্বাধিক প্রচলন তাই ছিল অপেরায়। রেস্টোরেশন্ যুগের একটি কৌতুককর প্রথা ছিল যে, ট্র্যাজেডি অভিনয়কালে সবুজ রঙের মোটা পশমী কার্পেট মঞ্চের উপর পেতে দেওয়া হত। এই প্রথাটির একটি নাটকীয় তাৎপর্য ছিল—তা হল এ যুগের ট্র্যাজেডিতে খুন-খারাবি, মৃত্যু অবশ্যই কয়েকটা ঘটত, সুতরাং মঞ্চে পতনও অনিবার্য ছিল। এ যুগের নাটক রচিত হত অভিজাতদের জন্য এবং নাটকের মধ্যেও থাকত অভিজাত সমাজের চরিত্র; অতএব অভিনেতাদের অতি মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করতে হত। মঞ্চের উপরেই যাদের পতন ও মৃত্যু হত—ভাল কার্পেট থাকায় অতি সুন্দর উপায়ে তাদের পোষাকটা বেঁচে যেত। তাই এই কার্পেটের নামই ছিল মৃত্যু-কার্পেট (Death carpet)।

শেক্সপীয়রীয় যুগের মতই মঞ্চে গুপ্তদরজা (trap doors) ছিল, তার সাহায্যে কবর বা কোন চরিত্রের অন্তর্ধান ইত্যাদি কলাকৌশল প্রয়োগ করা

যেত। কোন কোন চরিত্রের জন্য ক্রেনের সাহায্যে উড়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হত,—যেমন ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনী চরিত্ররা। কারণ রেস্টোরেশন্ মঞ্চে এ যুগের কমেডি ট্র্যাজেডি ছাড়াও নিজেদের প্রয়োজন মত কাটা ছেঁড়া করে শেক্‌সপীয়রের নাটকেরও অভিনয় চলত। কারো প্রতি অত্যাচার বা অঙ্গচ্ছেদ দেখানোর জন্য মনুষ্যদেহাকৃতির বিকল্প মূর্তি (dummies), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মাথা তৈরী করানো হত। বাস্তবানুগ দৃশ্য রচনার জন্য রক্তপাতের বিভ্রান্তিও অতি যত্নের সঙ্গেই তাদের করতে হত। অঙ্কিত আগুনের বাস্তবতা বাড়িয়ে তোলার জন্য তারা ধোঁয়ার সৃষ্টি করত। অঙ্কিত পর্দা টেনে নিয়ে যে আকাশ ও মেঘের দৃশ্য রচনা করা হত, সেটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। রেস্টোরেশন্ রঙ্গমঞ্চে বাস্তব ও প্রথার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ এবং সমন্বয় ঘটেছিল। চেয়ার, টেবিল ও বই প্রায়ই পর্দায় অঙ্কিত করা থাকত, কিন্তু যখন কোন চরিত্রকে ছুরিকাহত করা হত তখন তাকে এমনভাবে রক্তপাতের অভিনয় করতে হত যেন সত্যিকার রক্তপাতের মতই দেখায়।

রেস্টোরেশন্ থিয়েটার একান্ত ভাবেই অভিজাত শ্রেণীর ছিল বলে—এর রঙ্গালয় হত আচ্ছাদিত গৃহাভ্যন্তরে। ফলে আলোক-সজ্জা ও আলোক-সম্পাত এক প্রধান সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছিল। আলোক-সজ্জার জন্য বড় বড় বলরুম বা নৈশভোজন কক্ষের মত, তারা আলোকাধারে অগণিত মোমবাতি মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে সমভাবে প্রজ্জ্বলিত করে চতুর্দিক আলোকিত করে তুলত। পেপিস্ তাঁর রচনায় অভিযোগ করে বলেছেন যে, তিনি যখন গ্যালারীতে বসে অভিনয় দেখতেন তখন এই আলোগুলির ঔজ্জ্বল্য খুবই বিরক্তিকর ভাবে তাঁর চোখে লাগত। আজকের মত কেবলমাত্র মঞ্চে আলোক-সম্পাতের কথা তখনকার কোন মঞ্চবিদের হয়তো সুদূর কল্পনায়ও ছিল না। মঞ্চে কখন কখন সম্মুখ অংশের মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ ডাউন স্টেজ সেণ্টারে শ্রেণীবদ্ধ "ফুট্ লাইট্" (Foot lights) থাকত বেশির ভাগই এই আলোকগুলি মোমবাতি হত, আবার কখন তেলের বাতিও থাকত। অনেক সময় বাতি নীচে নামিয়ে দিয়ে ফুট্ লাইট্ কমানো বাড়ানো হত। তেলের উপর একটি ভাসমান কর্কে পলতে লাগান থাকত এবং পুরো তেলের আধারটিই দড়ির সাহায্যে নীচে নামানা হত—ফলে এই মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ প্রোসীনিয়ামের পেছন দিককার অংশ আলোকিত

করত। এতে দেখা যাচ্ছে অভিনয়কালে আলোকসজ্জার প্রাথমিক আকারে প্রচেষ্টা চলছে।

সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা জনক স্থান ছিল "ব্যাক্ স্টেজ" (Back stage) বা "এবভ্. স্টেজ" (Above stage) যদিও হোয়াইট্ হলে আমরা অন্যপ্রকার চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দেখতে পেয়েছি। তাতে সঙ্গীত শিল্পীরা মঞ্চের যে কোন একদিকের পিটে বা সামনেও বসতেন, কখন মঞ্চের সন্নিকটে গ্যালারী যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও তাদের দেখা যেত। মোটের উপর যে অনুষ্ঠানে যে রকম অবস্থান মানাত তাদের জন্য সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হত।

॥ রেস্টোরেশন্ ট্র্যাজেডি ॥

রেস্টোরেশন্ যুগের মঞ্চ সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল—এ মঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটলেও এর মূল প্রবণতা ছিল রেনেসাঁস্ যুগের নিও-ক্লাসিক্যাল গঠনভঙ্গির দিকে। এযুগের ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটকের বিশ্লেষণেও আমরা দেখতে পাই যে এর উপর ফ্রান্সের মতই গ্রীক এবং রোমান নাটকের প্রভাব এসে পড়েছে। তাই বলা যায় রেস্টোরেশন্ যুগ থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে নিও-ক্লাসিকাল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে রেস্টোরেশন্ নাটক এবং মঞ্চ একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। একই উৎসে তাদের জন্ম, একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের প্রগতি। ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় শ্রেণীর নাটকেরই একটা ধরা বাঁধা গঠনশৈলী ও দৃশ্যকল্পনা ছিল সুতরাং মঞ্চে প্রচুর ব্যয় বহুল হলেও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সেট তৈরী রাখলেই চলত।

ফরাসী নিও-ক্লাসিক্ যুগে রাসিন্ এবং মলিয়ের্ দু'জনই রাজা চতুর্দশ লুইর রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। অতএব ধরা যায় ফ্রান্স অভিজাতদের জন্যই নাট্য রচনা করেছে। তবুও রাসিন্ ও মলিয়ের্ দু'জনই রাজসভাকে এবং উচ্চশ্রেণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও সমকালীন অভিজাত পরিবেশকেই কেবলমাত্র স্বীকার করে চলেন নি। তাই আমরা দেখি মলিয়েরের প্রধান শক্তিই নিয়োজিত ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নাট্য রচনায়। যদিও তিনি রাজসভার জন্য রাজার আদেশে নাট্যরচনা করেছেন, তবুও তাঁর কমেডিগুলির প্রধান চরিত্রই ছিল মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর—কিংবা আরো নীচে কৃষক, দোকানদার, গাড়োয়ান অথবা দাসী, চাকর। এ সমস্ত নাটকগুলির উপর কিন্তু রাজসভার আকর্ষণ ছিল যথেষ্টই। সুতরাং এযুগে প্রকৃতই অভিজাত শ্রেণীর জন্য, অভিজাত পরিবেশ নিয়ে রচিত নাটক পেতে হলে আমাদের ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। প্রজাতন্ত্রের যুগে পিউরিটান বিরোধিতা নাটককে প্রায় ১৮ বছরের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল—যা কিছু চলত অতি গোপনে। এযুগের শেষের দিকে নাটক বাধ্য হয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানের ছদ্মবেশ ধারণ করল। প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে সার্ উইলিয়ম্ ডাভেনাণ্ট্ তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা সর্বপ্রথম অপেরা দিয়েই সুরু করেন এবং তখনি তিনি করান দ্য সীজ্ অব্ রোডস্ গীতি নাট্যের অভিনয়। ১৬৬০ খ্রীঃ রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ সিংহাসনে ফিরে এলেন, ইংল্যাণ্ডে মঞ্চগৃহের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হল। এযুগের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই পিউরিটান মনোভাবাপন্ন ছিল, সুতরাং রাজসভাসদ এবং তাদের সঙ্গীরাই থিয়েটারের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল।

ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের যুগে নাট্যকারদের সম্মুখে প্রচুর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাঁরা ক্লাসিকাল কমেডির কড়া অনুশাসন মেনে আঙ্গিক ঐক্য বজায় রেখেও পরিচিত কাহিনীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে লাগলেন। ক্লাসিকাল ঐক্য রক্ষার বাতিক রেস্টোরেশন্ যুগে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শেক্সপীয়র এবং তাঁর সমসাময়িকদের নাটকের মধ্যে ক্লাসিকাল ঐক্যের অভাব রয়েছে বলে সমালোচিত হতে লাগল। এই বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকারদের রচনা যখন রেস্টোরেশন্ মঞ্চে অভিনীত হত তখন ঐক্য রক্ষার জন্য তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমত নাটককে কাটা ছেঁড়া করে সংশোধন করে নিতেন। ফলে রাজা লীয়র নাটক থেকে ভাঁড় (Fool) চরিত্র বাদ দেওয়া হত। হ্যামলেট থেকে কবরখননকারীর (Gravediggers) চরিত্র এবং ম্যাকবেথ থেকে নাচগানের দৃশ্য বাদ চলে যেত। কিংবা রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্ নাটককে মিলনান্ত করে দেখানো হত। এমনিই আরো বহু পরিবর্তন তাঁরা প্রয়োজন মত করে নিয়েছেন।

অনেক সময় রেস্টোরেশন্ যুগের নাট্যকাররা ট্র্যাজেডির জন্য পুরানো প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করে তাকে আবার ক্লাসিক্ধারায় ঢেলে সাজিয়ে নিতেন। যেমন ড্রাইডেন "অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার" (Antony and Cleopatra) কাহিনীই কালোপযোগী করে সাজিয়ে রচনা করেন—"অল ফর্

লাভ্" (All for Love, or the World Well Lost—১৬৭৭ খ্রী: ড্রাইডেনের এই নাটক শেক্সপীয়রের সমতুল্য না হলেও সম্ভবত: রেস্টোরেশন্ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছিল। এতেই বোঝা যায় যে প্রকৃত প্রতিভা কেমন করে সকল বাধাকে অতিক্রম করেও কালজয়ী হতে পারে।

রেস্টোরেশন্ যুগের সুরুতেই আসেন ক্ষমতাশালী নাট্যকার "জন্ ড্রাইডেন" (John Dryden), সম্ভবত: এই রাজকবির শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি ছিল "দ্যা কঙ্কোয়েস্ট অব্ গ্রানাডা" (The Conquest of Granada—১৬৭০ খ্রী:) এই নাটকখানি দুইখণ্ডে রচিত, প্রতিখণ্ড পঞ্চাঙ্ক। ড্রাইডেন অপেরা এবং কমেডিও রচনা করেন কিন্তু ট্র্যাজেডিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কমেডির মধ্যে তাঁর ব্লাঙ্কভার্সে লিখিত অল্ ফর্ লাভে যথেষ্টই কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। তাঁর ট্র্যাজেডিগুলি "হিরোইক্ কাপ্‌লেটে" (Heroic Couplet) রচিত। যদিও এ ছন্দ নাটকীয় কথোপকথনের যথেষ্ট উপযোগী ছিল না, তবুও সমসাময়িক ক্লাসিক্ বচয়িতাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি এই ছন্দ গ্রহণ করেন। কর্ণেয়্, রাসিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই ধরনের "হিরোইক্ ড্রামা" (Heroic Drama) রচনার দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর রচনাগুলি পূর্বসূরীদের সমতুল্য ছিল না, তবুও তাতে কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের অভাব ঘটেনি। তাঁর "টিরানিক্ লাভ্", (Tyrannic Love) "দ্যা রয়্যাল মার্টার্" (The Royal Martyr—১৬৬৯ খ্রী:), "আউরেং-জেব্" (Aureng-Zebe—১৬৭৫ খ্রী:) ইত্যাদি নাটকের মধ্যে হিরোইক্ ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভালবাসা এবং সম্মান এই দুই বিপরীত শক্তির যাতনায় বিক্ষুব্ধ নায়ককে বেছে নিতে হয়েছে পথ। কিন্তু এই নাটকগুলি বিশেষ সার্থক হয়নি, কারণ তাদের পুরো পরিবেশটাই ছিল বানানো এবং তাদের বিষয়বস্তুতেও ছিল অনিশ্চয়তা। হিরোইক্ ট্র্যাজেডির গঠন রীতির এবং তাঁর হিরোইক্ কাপ্‌লেট্ ছন্দের পরাজয়ের কথা ড্রাইডেন নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পথ পরিবর্তন করে শেক্সপীয়রের অনুরূপ বিষয় গ্রহণ করে ব্লাঙ্কভার্সে লেখেন "অল্ ফর্ লাভ্" এবং সার্থকতা লাভ করেন।

ড্রাইডেনের অনুরূপ হিরোইক্ ট্র্যাজেডি রচনায় একালে "ন্যাথানিয়েল লী" (Nathaniel Lee—সম্ভাব্য ১৬৫৩-১৬৯২ খ্রী:) এবং "জন্ ব্যাঙ্কস্"

(John Banks—সম্ভাব্য ১৬৫০-১৭০৬ খ্রীঃ) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্যাঙ্কস্ সমকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করেই বিশেষভাবে নাট্য রচনা করেন যেমন ছিল তাঁর "অ্যানে বোলীনের" (Anne Boleyn) জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত—নাটক "ভার্চু বিট্রেড্" (Virtue Betrayed)। ড্রাইডেনের পরে সর্বাধিক জনপ্রিয় ট্র্যাজেডি রচয়িতা ছিলেন, "টমাস্ অট্‌ওয়ে" (Thomas Otway) তিনি কিন্তু ছিলেন সাধারণ ক্ষমতাশালী নাট্যকার। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালে খাপ খায় এমন ট্র্যাজেডির শৈলী গড়ে তুলবার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। ক্লাসিকাল গঠন রীতির দিকে তাঁর আকর্ষণে রাসিনের প্রভাব ছিল সুগভীর। আবার তাঁর নাটক—"অ্যাল্‌কিবিয়াডিস্" (Alcibiades—১৬৭৫ খ্রীঃ) এবং "ডন্ কার্‌লোজ" (Don Carlos—১৬৭৬ খ্রীঃ) শেক্‌সপীয়রের প্রভাবও অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সবদিকে ব্যর্থ হয়ে তিনি ইংরেজদের জাতীয় ধারার দিকে ফিরে যান এবং রোমান্টিক আবেগময় গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি লেখেন "দি অর্‌ফান বা দি আন্‌হ্যাপি ম্যারিজ্" (The Orphan or The Unhappy Marriage ১৬৮০ খ্রীঃ) আর লেখেন ইতালীয় ধারার রোমান্টিক ট্র্যাজেডি "ভেনিস্ প্রিজার্ভড্" (Venice Preserved—১৬৮২ খ্রীঃ) এই দু'খানিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ দু'খানি নাটক অভিনেতা ও দর্শকদের কাছে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ট্র্যাজিক্ রীতি নিয়ে এই বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষায় এটাই বোঝা যায় যে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ট্র্যাজিক্ নাটক অনিশ্চিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের দিকে দোল খাচ্ছিল। নাট্যকারদের সম্মুখে ক্লাসিক্ দৈববাদ, বীরত্বপ্রীতি, কারুণ্যানুভূতি এবং শেক্‌সপীয়রীয় ঐশ্বর্য সকলি ছিল—কিন্তু তাঁরা নিজেরা দিগ্-ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

এই অনিশ্চয়তায় এটাই বোঝা যায় যে রেস্টোরেশন্ যুগের প্রতিভার পক্ষে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই দেওয়ার ছিল না। রেস্টোরেশন্ ট্র্যাজেডির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও৲ নিও-ক্লাসিকাল প্রবণতার প্রতি কেতাদুরস্ত অভিবাদনের অতিরিক্ত আর কিছুই প্রায় ছিল না। আজকাল তা প্রায়ই পড়া হয় না—অভিনয় তো আরোই হয় না।

॥ রেস্টোরেশন্ কমেডি ॥

রেস্টোরেশন্ যুগের দর্শকরা ট্র্যাজেডির চেয়ে কমেডিতেই বেশি উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করত। একালে অভিজাত ইংরেজ দর্শকরা ছিল অত্যন্ত অহংবোধ সম্পন্ন এবং বিলাসপ্রিয়। খাঁটি শিল্পের প্রতি তারা একান্তই অনুরাগহীন ছিল, কাজেই অভিনয়-শিল্পে সুগভীর রসসৃষ্টির চেয়ে বহ্বাড়ম্বরটাই বেশি হত। এই সমস্ত হামবড়া সুদর্শন যুবকবৃন্দ ট্র্যাজিক্ নাটকের যথোপযুক্ত আদর করার মত সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্নও ছিল না। এইজন্য ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের কতকগুলি অলীক পরিবেশ এবং তলোয়ারের খেলা দেখিয়ে দর্শক চিত্ত আকৃষ্ট করতে হত। অন্যদিকে কমেডির লঘুরসাস্বাদের দিকে ছিল এদের স্বাভাবিক অনুরাগ। কোন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দৃশ্য এলে তাদের চক্ষু কর্ণ মঞ্চেই সংলগ্ন হয়ে থাকত। সামাজিক কথা-বার্তার মধ্যে ঠাট্টা, তামাশা তাদের জীবনের এক অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। নাটকের স্বাদের দিক থেকে তারা গভীরতার চাইতে তীক্ষ্ণতার অভিলাষীই বেশি ছিল।

তাই এই রেস্টোরেশন্ যুগের মত এত সুগঠিত, উজ্জ্বল, কার্যকরী, সাধারণ জনতার পরিবেশ থেকে দূরবর্তী কমেডির রচনা ইংরেজি সাহিত্যে আর আমরা দেখতে পাই না। এগুলি মলিয়েরের মত সাধারণ কিংবা মধ্যবিত্ত মানব চরিত্র টেনে আনে নি; তেমনি হৃদয় বিদ্ধকারী সামাজিক বিদ্রূপও করে নি। আমাদের অতি পরিচিত সামাজিক টাইপ্ চরিত্রগুলির দর্শন সেখানে পাই না, অন্যদিকে রেস্টোরেশন্ কমেডির মধ্যে শেক্সপীয়র, ডেকার বা গ্রীনের শাশ্বত মানবচরিত্রের আবেগময় রূপায়ণও ছিল না। রেস্টোরেশন্ কমেডির চরিত্রগুলি ছিল অত্যন্ত সীমিত, অভিজাত পরিবেশের। কথোপকথনে ছিল ব্যঙ্গময় দীপ্তি—এবং কাহিনীতে ছিল প্রধানতঃ মহিলাদের খাসকামরার প্রণয় চক্রান্ত। "সার্ ফ্রেডরিক্ ফ্রলিক" (Sir Frederick Frolick), "সার্ ফোপ্লিং ফ্লাটার্" (Sir Fopling Flutter) "লেডি ফ্লিপান্ট্" (Lady Flippant) ইত্যাদি রেস্টোরেশন্ কমেডির নামগুলির মধ্যে ছিল বেন্ জন্সনের নাট্য চরিত্রের নামগুলির প্রতিধ্বনি। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সমতুল্য সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।

ফ্রান্সের ভের্সায়্ রাজসভার সঙ্গে একালের ইংরেজ রাজসভার তুলনা করলে মূল ব্যবধানটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফরাসী ভদ্র সমাজের উদ্ধত সুর সত্ত্বেও, আমরা দেখেছি যে, মলিয়ের্ তাঁর পরিধির মধ্যে মধ্যবিত্ত

শ্রেণীকে নিয়ে আসতে পারতেন এবং এর ফলেই এক বিস্তৃত পরিধিতে বৈচিত্র্যময় কমেডির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যে সভাসদ্‌রা ড্রুরি লেন, লিঙ্কন্‌স ইন্‌ ফিল্ডস্‌ ও ডোরসেট্‌ গার্ডেনে ভিড় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোন অস্তিত্ব ছিল না, এই সভাজনরা কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব ব্যাপারেই উৎসুক ছিলেন এবং তার বাইরে সব কিছুই হত উপেক্ষিত। এইভাবেই একেবারে এক নূতন ধারার নাটকের আবির্ভাব ঘটল—তাকে বলা যায় অভিজাত শ্রেণীর আচার-ব্যবহারের কমেডি বা "দ্যা কমেডি অব্‌ অ্যারিস্টোক্রাটিক্‌ ম্যানারস্‌ (The Comedy of Aristocratic Manners.)।

রেস্টোরেশন্‌ কমেডির মূল তত্ত্বই ছিল তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের বহিরঙ্গের কৌতুক চিত্রায়ণ—যা নিয়ে কারো কোন ক্ষোভের কারণ ঘটত না। এর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে আমরা শ্রেষ্ঠ কমেডি অব্‌ ম্যানারস্‌ বলতে পারি। অতি সন্তর্পণে গড়ে তোলা একটি বিশেষ পরিবেশে দু'টি চরিত্রের সংঘাত ছিল যার মূল বিষয়। এই রেস্টোরেশন্‌ কমেডির ধারাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে এথারেজ্‌ থেকে শেরিডান্‌ পর্যন্ত। সম্ভবতঃ রেস্টোরেশন্‌ যুগের বিশেষ সমাজ-পরিবেশটি ছাড়া অন্য কোথাও—"জর্জ এথারেজ্‌" (George Etherege) "উইলিয়াম্‌ ওয়াইচার্লি" (William Wycherley) এবং "উইলিয়াম্‌ কন্‌গ্রীভের" (William Congreve) মত নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটতে পারত না। এ ছাড়াও আরো অনেক নাট্যকারই এযুগে ছিলেন কিন্তু এই তিনজনের মধ্যেই রেস্টোরেশন্‌ কমেডির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

প্রকৃত কমেডি অব্‌ ম্যানারসের জন্য যে উদ্দেশ্যের একাগ্রতা ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন তা সর্বপ্রথম জর্জ এথারেজের রচনায় দেখা যায়। এথারেজ্‌ প্রথম জীবনে লণ্ডন শহরবাসী এক বিলাসী তরুণ ছিলেন, তারপরে অবসর গ্রহণ করে তিনি যান প্যারিসে, এই অবসরকালেই তিনি পরপর কয়েকখানি নাটক লেখেন, যা লণ্ডন শহরে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তিনি নিজে একালের ফ্যাশানদুরস্ত ব্যক্তি ছিলেন বলেই অভিজাত জীবন-চিত্র অঙ্কিত করা তাঁর পক্ষে ছিল অনেক সহজ। তাঁর প্রথম নাটক হল "দ্যা কমিকাল্‌ রিভেঞ্জ্‌ অর্‌ লাভ্‌ ইন্‌ এ টাব্‌" (The Comical Revenge or Love in a Tub—১৬৬৪ খ্রীঃ) এই নাটকে তিনি কমিক্‌ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে হিরোইক্‌ দৃশ্যাবলী মিশ্রিত করেছিলেন—তবে সে মিশ্রণ খুব সার্থক হয়ে ওঠেনি।'

তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাটক হল—"শী উড্ ইফ্ শী কুড্" (She Would If She Could—১৬৬৮ খ্রী:) এবং "দ্যা ম্যান্ অব্ মোড্ অর্ সার্ ফোপ্লিং ফ্লাটার্" (The Man of Mode or Sir Fopling Flutter—১৬৭৬ খ্রী:) এই নাটকগুলিতে তিনি একালের কমিক্ রচয়িতাদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি অপূর্ব তাৎপর্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মুখ্য হল সুদর্শন যুবকদের প্রেমাভিযানের দিকে আগ্রহ। প্রেমিকদের চিত্র তিনি তাঁর যুগের অনুরূপই চিত্রিত করেন। তাঁর "শী উড্ ইফ্ শী কুড্" নাটকে কোর্টাল্ (Courtall) এবং ফ্রীম্যান্ (Freeman) এই চরিত্র দু'টির চিত্র দর্শকদের সম্পূর্ণ জানা ছিল, অথবা বলা যায় এই চরিত্র দু'টি হচ্ছে সেই শ্রেণীর তারুণ্যের প্রতীক যা দর্শকরা নিজেরাই হতে চাইত। এই কমেডিগুলি ছিল এদিক থেকে বাস্তব জীবনেরই রেখাচিত্র—অতএব মঞ্চে যখন তারা উপস্থাপিত হত তখন তার দৃশ্যাবলী, সেট সবকিছুর মধ্যেই বাস্তব পরিবেশ এবং অঙ্কিত দৃশ্যরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হত। এই কমেডিকে বাস্তবধর্মী বলা যায়, কারণ এর পরিবেশ ছিল লণ্ডন শহর এবং এর চরিত্রগুলিও ছিল সেই শহরেরই অভিজাত নারী পুরুষের বিশেষ চরিত্র, তবুও এ ছিল আদর্শবাদী। এর আদর্শবাদিতা ছিল সেখানেই যেখানে নাট্যকাররা তাঁদের নৈপুণ্যে এই জীবনকে মার্জিত, সুষমামণ্ডিত, মহিমময় করে গড়তে চেয়েছিলেন যা তৎকালীন বাস্তবজীবনে ছিল দুর্লভ। এই রসিক সভাজনদের এ ছিল এমনি এক স্বপ্নলোক, যা কল্পনা-বিলাস মাত্র নয়—অত্যন্ত চেনা জানা ঘরোয়া জগতের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এযুগের মঞ্চেও আমরা তাই দেখি বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের এক অদ্ভুত সমন্বয়। এই সমস্ত কমেডিতে অতীতের কোন চিন্তা ছিল না, ছিল না ভবিষ্যতের কোন ভাবনা। এই চরিত্রগুলি ছিল সম্পূর্ণই বর্তমানের বাসিন্দা।

এথারেজের পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য এক একটি দৃশ্য বা চরিত্র দেখা গেলেও তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় চার্লসের সভানাট্যকার উইলিয়াম্ ওয়াইচার্লি। ওয়াইচার্লি প্যারিস্ শহরে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তিনি তাঁর পরিচিত মণ্ডলীতে পরিহাস প্রিয়, রসিক ব্যক্তি বলে পরিখ্যাত ছিলেন—এই দলে মলিয়েরের প্রভাব ছিল প্রবল। লণ্ডনে তাঁর প্রথম নাট্যাভিনয় হয় ১৬৭১ খ্রী: "লাভ্ ইন্ এ উড্" (Love in a Wood), তাঁর দ্বিতীয় নাটক ছিল—"দ্যা জেণ্টেল্ম্যান্ ডান্সিং মাস্টার"

(The Gentleman Dancing Master)। তাঁর সর্বাধিক প্রশংসিত নাটক হল "দ্যা কান্ট্রি ওয়াইফ্" (The Country Wife—১৬৭৫ খ্রীঃ) এবং "দ্যা প্লেইন্ ডিলার্" (The Plain Dealer—১৬৭৬ খ্রীঃ) এই নাটক দু'খানির মধ্যে তাঁর প্রকৃত শক্তি, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও সংযত অভিব্যক্তি দেখা যায়।

এথারেজ্ যে যুগের সামাজিক আদব কায়দা অঙ্কিত করেছেন তিনি সেই যুগের সেই পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ওয়াইচার্লি বাইরে থেকে এই আচার ব্যবহারকে দেখেছেন—তার রীতিনীতি অর্জন করেছেন। সুতরাং প্রথম জনের মনে কোন সংশয় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় জনের এই জীবন সহজাত ছিল না বলে তার চিত্রাঙ্কনে অনেক বাহুল্য রূপায়ণ হয়েছে। তিনি ক্ষমতাশালী চরিত্র রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর নাটকীয় পরিবেশে তা স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

রেস্টোরেশন্ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন উইলিয়াম্ কন্‌গ্রীভ্। বর্তমান কালেও যোগ্য পরিচালকের হাতে পড়লে তাঁর নাটক অখণ্ড আনন্দ বিতরণ করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনি শেষের দিকে এসেছেন—এবং এই শ্রেণীর কমেডি অব্ ম্যানারসের তিনি চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে গেছেন। তিনি যে কেবলমাত্র বিদ্রূপময় কমিক্ কথোপকথনেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা দেখিয়েছেন তা নয় তিনি উচ্চ শ্রেণীর আকর্ষণীয় চরিত্রায়ণও করে গেছেন। তাঁর কয়েকটি নায়িকা চরিত্র অত্যুজ্জ্বল, আনন্দময় হয়ে উঠেছে—যেমন তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক "দ্যা ওয়ে অব্ দ্যা ওয়ার্ল্ড্" (The Way of the World—১৭০০ খ্রীঃ) এর নায়ক নায়িকা "মিল্যামাণ্ট্" (Millamant) ও "মিরাবেল্" (Mirabell) হল শেক্সপীয়রীয় যুগের প্রেমিক প্রেমিকার রেস্টোরেশন্ যুগীয় প্রতিরূপ। কন্‌গ্রীভের অন্যান্য নাটক হল "দ্যা ওল্ড ব্যাচেলর্" (The Old Bachelor—১৬৯৩ খ্রীঃ) "দ্য ডাব্‌ল্ ডীলার" (The Double Dealer—১৬৯৩ খ্রীঃ) এবং "দ্যা লাভ্ ফর্ লাভ্" (The Love for Love—১৬৯৫ খ্রীঃ)। তিনি তাঁর চারপাশে যে সমাজ দেখেছেন, তা সংশোধনের কণা মাত্র চেষ্টা না করে নাটকে নিরাসক্তভাবে তার চিত্রাঙ্কন করেছেন।

এছাড়াও রেস্টোরেশন্ যুগে উল্লেখযোগ্য আরো অনেক কমেডি রচয়িতা ছিলেন। যেমন ছিলেন ১। "জন্ ড্রাইডেন্", (John Dryden) ২। "চার্লস্ সেড্‌লী" (Charles Sedley) ৩। "টমাস্ শ্যাডওয়েল্" (Thomas

Shadwell) ৪। "মিসেস্ অ্যাফ্রা বেন্" (Mrs Aphra Behn) ৫। "জর্জ ফার্কুহার" (George Farquhar) ইত্যাদি। এ যুগের সর্বশেষ সার্থক নাটকার ছিলেন "রিচার্ড ব্রিন্‌স্‌লে শেরিডান্" (Richard Brinsley Sheridan) তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে যদিও এ যুগের অভিজাত জীবন-যাত্রাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন—তবুও তিনি এযুগেরই একজন ছিলেন। তাঁর "দ্যা রাইভালস্" (The Rivals—১৭৭৫ খ্রী:) "দ্যা স্কুল ফর্ স্কান্‌ডাল্" (The School for Scandal—১৭৭৭ খ্রী:) নাটক দু'খানিতে, রেস্টোরেশন্ যুগের অশিষ্টতা ছিল না—নাট্যকারের বিদ্রূপ ও কৌতুকে ফুটে উঠেছিল সে যুগের জীবনের কৃত্রিমতা ও অসঙ্গতি।

রেস্টোরেশন্ যুগের মঞ্চশিল্পে আমরা ইংরেজদের স্বদেশী ও বিদেশী পদ্ধতির এক অদ্ভুত সমাবেশ পেয়েছি। এর রেকৃভ স্টেজ, উইং, সাটার্, পারস্‌পেকৃটিভ্, ফ্রন্ট্ কার্টেন্ ইত্যাদি সবই ছিল ইউরোপ মহাদেশের অবদান। আবার এর ট্রাপ্‌ডোর, এপ্রোন্, প্রোসীনিয়াম্ দরজা নি:সন্দেহে বিবর্তিত হয়ে এসেছিল শেক্‌সপীয়রীয় মঞ্চগৃহের বিন্যাস থেকে। রেস্টোরেশন্ মঞ্চ আরো অতীতের দিকে হাত বাড়িয়ে মধ্যযুগীয় ম্যান্‌সন্ মঞ্চ পদ্ধতিও গ্রহণ করেছিল।

এই ভাবেই রেস্টোরেশন্ মঞ্চ বিভিন্ন ধারার উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিল। সেই ধারাগুলো সম্মিলিত হয়ে এ যুগের নাট্যপ্রয়োগ রীতিতে এনেছিল এক নমনীয় ও মনোহারী সৃজন সম্ভাবনা। কিন্তু রেস্টোরেশন্ নাটক ছিল খাঁটি ইংরেজী—সমকালীন জীবন, পরিবেশের ফসল।

॥ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ ॥

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দ্বিতীয় চার্লস্‌ই বলা যায় প্রথম থিয়েটার শিল্পকে একচেটিয়া ব্যবসা আকারে প্রবর্তন করেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ড্রুরি লেন (Drury Lane) এবং কোভেন্ট্ গার্ডেন (Covent Garden) রঙ্গালয়গুলির পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল। এই সমস্ত থিয়েটারগুলি যে কেবল ১০০ বছরের মধ্যে আকারেই বড় হল তা নয়, মঞ্চের এপ্রোন্ অংশ কেটে দর্শক আসনসংখ্যা বাড়ান হয়েছিল। তা ছাড়াও তারা রাজধানীতে অনেকগুলি নূতন থিয়েটার গৃহেরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই

নবকালের যুবকরা কম রসিক এবং অধিক দায়িত্বশীল ছিল। অভিজাত শ্রেণী ক্রমশঃ তাদের ড্রইংরুমে এবং এটিকেট্ দুরন্ত স্ত্রীদের এলাকায় আবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ধারা থেকেও বিচ্যুত হয়ে পড়ল।

এই পরিবর্তন অবশ্য খুবই শ্লথ গতিতে ঘটেছিল। মলিয়েরের কমেডি ও রেস্টোরেশন্ নাটকেই নূতন কালের আগমনী শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই এই পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ফ্রান্সে কর সংগ্রহকারীরা রাজসরকারের নির্বোধ নীতির ফলে অর্থশালী হয়ে উঠেছিল এবং এক নূতন সম্পদ্‌শালী শ্রেণী গড়ে উঠল। ইংল্যাণ্ডেও ব্যবসা বাণিজ্যের পথে বিত্তশালী শ্রেণী গড়ে উঠল— প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে তারা সম্পদ্ আহরণ করে আনতে লাগল। এর ফলে এক নূতন থিয়েটার রসিকদলের সৃষ্টি হল যারা পূর্বতন নাট্যকীর্তির চাইতে ভিন্নতর কিছু চাইল। অষ্টাদশ শতকে পরীক্ষামূলকভাবে নানা ধরনের নাটকই মঞ্চে এসেছে তার মধ্য থেকে মূল ধারাটি অনুধাবন করা সত্যই কঠিন—যে ধারা ধরে আমরা রাসিন্ থেকে পিক্‌জেরেকোর্টের রোমাণ্টিক মেলোড্রামায় আসতে পারি।

এর একটি ধারাকে বলা যায় পূর্ব ঐতিহ্যের ধারা। এই ধারাটি এসেছে সপ্তদশ শতকের "সিউডো-ক্লাসিক্" (Pseudo Classic) ট্র্যাজেডি এবং কমেডি অব্ ম্যানারস্ থেকে পরিবর্তিত হয়ে। কিছু কিছু মধ্যবিত্তশ্রেণীর দর্শকরা অভিজাত শ্রেণীর অনুরূপ রুচির প্রকাশ করতে লাগল এবং এই সমস্ত ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রতি প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে চলল। কিন্তু তারা অভিজাত রীতির সূক্ষ্ম আঙ্গিকেরও গুণগ্রাহিতা দেখাতে পারল না আবার তাদের শ্রেণীগত নীতিবোধকেও ত্যাগ করতে পারল না। মধ্যবিত্তশ্রেণী জন্মগত ভাবেই পায়ের নীচে মাটি খোঁজে, উদ্দাম কল্পনা বিলাস তার পক্ষে সম্ভব নয়—নিজের অলিখিত গণ্ডির মধ্যেই সে চির আবদ্ধ।

এ ছাড়া আরো একটি শক্তি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল। অভিজাত শ্রেণীর দীর্ঘকালের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা কতকগুলো রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল—তাদের মানসলোকেরও একটা স্থায়ী গঠন এসে গিয়েছিল। এরি ফলে তাদের এক নিজস্ব সাহিত্যিক রুচি তৈরী হয়েছিল যার সহায়তায় তারা খাঁটি কমেডি এবং খাঁটি ট্র্যাজেডিকে রীতিসিদ্ধভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেখানে এসে গিয়েছিল এক ধরনের "ফর্মালিজম্"। এই

রীতিনীতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষায় ও চেতনায় খাপ খাচ্ছিল না, তাদের কাছে এগুলি ছিল বিরক্তিকর। তারা মিশ্রিত রূপই পছন্দ করত এবং অনির্দিষ্টভাবে বাস্তববাদের জন্য উতলা হত। আজকের বিচারে আমরা এই বাস্তববাদকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলতে পারি কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পর থেকে থিয়েটারে এই রিয়ালিজমই হল এক মূল শক্তি।

এ ছাড়া আর একটি নূতন ধারা এল যাকে আমরা দার্শনিক তত্ত্বগত বলতে পারি। নাটকের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আমরা মধ্যযুগ থেকে দেখে আসছি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এসে জনসাধারণই সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণভাবে সামাজিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে সুরু করল। এই চিন্তায়ন সুরু হয় এডিসনের "দ্যা স্পেক্‌টেটরের" প্রবন্ধ রচনা থেকে এবং চরম রূপ পায় রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায়। নাটকের মধ্যেও এই প্রচার-ধর্মিতা ও যুক্তিবাদ আসতে লাগল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করতে হয়েছে—দীর্ঘকাল ব্যাপী সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসায় করে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে। অভিজাত যুবকদের যত্নহীন স্বাধীনতা, তাদের মুহূর্তের আনন্দ উৎসব, তাদের পরস্পরকে ধ্বংসকামী ডুয়েল এবং বাধাহীন ভাবে জুয়া খেলা—এগুলি ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণীর অভিসম্পাতযোগ্য। তারা চাইত সেই ধরনেরই অগণিত নাটক যাতে এই অভিজাত "পাপের" নিন্দা এবং বুর্জোয়া "পুণ্যের" জয়গান গাওয়া হয়। ফলে একালের নাটক উন্নতমানের নীতিবোধের সেন্টিমেন্টে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

অষ্টাদশ শতকে ট্র্যাজেডি ক্রমশঃ ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হল, বহু নাট্যকারই পুরাতন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন কিন্তু এই গুরুগম্ভীর বিষাদঘন শিল্পরূপ গ্রহণ করবার মত দর্শকশ্রেণীর অভাব থাকায় তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হল না। বরং এই একই কারণে এ যুগে অপেরা সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার সমগ্র ইউরোপময় ঘটেছিল। এটাই ছিল আধুনিক থিয়েটারের জন্মলগ্ন—কেবল প্রধান প্রধান শহরগুলিতেই নয় গ্রামাঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা চলতে লাগল এবং থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল। এ সময়কার ট্র্যাজেডিগুলির গাল ভরা কথা, সদর্প পদক্ষেপ, কৃত্রিম কিংখাপের পোষাক নূতন দর্শকরা গ্রহণ করল না তাই অষ্টাদশ শতকের শেষে যতদিনে না রোমান্টিক আবেগময়তার আবির্ভাব ঘটল ততদিনে এ ধরনের খুব মঞ্চ

সংখ্যক ট্র্যাজেডিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারল। এই শতাব্দীর সূচনা কালে ইংল্যাণ্ডে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল "জোসেফ্ এডিসনের" (Joseph Addison) "কাটো" (Cato—১৭১৩ খ্রীঃ) নাটকের প্রতি। কিন্তু এই উত্তেজনার মূল কারণ ছিল শৈল্পিক সৌন্দর্য নয়—রাজনৈতিক। প্রায় একই সময় "নিকোলাস্ রো" (Nicholas Rowe) নারী চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে কতকগুলি "শী-ট্র্যাজেডি" (She-tragedies) লেখেন—যেমন "দ্য ফেয়ার্ পেনিটেন্ট্" (The Fair Penitent-১৭০৩ খ্রীঃ) "জেন্ শোর্" (Jane Shore—১৭১৪ খ্রীঃ) ইত্যাদি—এ নাটকগুলি কেবল শীতল বেদনাময়তারই সৃজন করতে পেরেছিল। "জেম্‌স্ টমসনের" (James Thomson) রচনায় কিছুটা শক্তির পরিচয় ছিল—তবুও তাঁর ক্লাসিকাল ধারার নাটক "সোফোনিসবা" (Sophonisba—১৭৩০ খ্রীঃ) এবং "এডোয়ার্ড অ্যাণ্ড এলিয়োনোরা" (Edward and Eleonora—১৭৩৯ খ্রীঃ) যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে নি। এমন কি শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী "স্যামুয়েল জন্‌সন্‌ও" (Samuel Johnson) যখন "আইরিণ" (Irene—১৭৪৯ খ্রীঃ) নাটকে ট্র্যাজিক্ আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন তখনও ব্যর্থ হয়েছেন।

স্পেনের গুরুগম্ভীর নাটকের স্রোত আরো নিম্নস্তরে প্রবাহিত হচ্ছিল। তা প্রায় অসম্ভাব্যতার শ্রেণীতে গিয়ে পৌঁছেছিল। "অগাস্তিন্ দ্য মোন্তিয়ানো ই লুইয়ান্দো" (Agustin de Montiano Y Luyando) তাঁর "ভার্জিনিয়া" (Virginia—১৭৫০ খ্রীঃ) নাটকে রাসিনের আঙ্গিক একান্তভাবে অনুসরণ করেও যুগের দাবি পূরণ করতে পারেন নি।

জার্মানীতে নাট্য উদ্দীপনা কিছু বেশি ছিল কিন্তু জার্মানী তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলো রাজ্যে বিভক্ত—তাদের পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ, বিসংবাদ লেগেই থাকত তাই সেখানেও উন্নত মানের নাট্য প্রযোজনা হতে পারল না।

রাশিয়াতেও অন্যান্য দেশের মত ফরাসী প্রভাব ছিল বেশি। দীর্ঘকাল ধরেই "আলেক্‌জান্দার্ পেত্রোভিচ্ সুমারোকোভ্"-ই (Alexander Petrovich Sumarokov) ছিলেন সেখানকার নাট্যশৈলীর নিয়ন্তা। তিনি ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে লেখেন "খোরেভ্" (Khorev—১৭৪৭ খ্রীঃ) এবং "ৎসেমির" (Zemir—১৭৫১ খ্রীঃ)। তিনিই হ্যামলেট নাটকখানি ফরাসী অনুবাদ থেকে প্রথম রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জনগণের কাছে পরিচিত করান।

ফরাসীদেশের প্রতিভা রাসিনের সঙ্গেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধভাগ এবং পুরো অষ্টাদশ শতকের মধ্যে গুরুগম্ভীর শ্রেণীর নাটকের অভিনয় এখানে খুব কমই হয়েছে। একের পর এক নাট্যকার রাসিনের বহিরঙ্গের অনুসরণ করেছেন কিন্তু তাঁর রচনার অন্তর্লোকে পৌঁছতে পারেন নি। একজন ছাড়া অন্য সকলের প্রচেষ্টায়ই ছিল নিরানন্দ শীতলতা ও রক্তাক্ত ঘটনা—এই একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন ভোল্‌তের্‌। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের হাত থেকে লরেলের মুকুট পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালের কাছ থেকে পেয়েছেন আরো অনেক অধিক সম্মান। সর্বকালের কাছ থেকে এ সম্মান তিনি তাঁর নাটকীয় দক্ষতার জন্য ততটা পাননি যতটা পেয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যের বলিষ্ঠতা ও তীক্ষ্ণতার জন্য। তাঁর প্রথম নাটক হল "অয়দিপে" (Œdipe—১৭১৮ খ্রী:) এটি ছিল রাসিন্‌ রীতিরই অনুকরণে লেখা তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল গ্রীক প্রভাব। এই যুক্ত প্রভাবই তাঁর সমগ্র রচনাকে প্রভাবিত করে। "ব্রুটাস্‌" (Brutus—১৭৩০ খ্রী:), "সীজারস্‌ ডেথ্‌" (La mort de César—১৭৩৫ খ্রী:) এবং "মেরোপে" (Mérope—১৭৪৩ খ্রী:) এগুলি ছিল তাঁর প্রথম দিককার রচনা। তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাটক হল—"ৎসাইরে" (Zaire—১৭৩২ খ্রী:), "আলৎসিরে" (Alzire—১৭৩৬ খ্রী:), "ৎসুলিমা" (Zulima—১৭৪০ খ্রী:), "দি অর্‌ফ্যান্‌ অব্‌ চায়না" (The Orphan of China or L' orpheline de la Chine —১৭৫৫ খ্রী:)। এর মধ্যে ৎসাইরেই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। এর নায়িকা ৎসাইরে জেরুসালেমের মুসলমান সুলতান ওরোসমানের অন্তঃপুরে স্থান পায়—দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসে। ৎসাইরে ছিল খ্রীষ্টান—তার ভাই নেরেস্তান্‌ তাদের মুক্তির জন্য ফ্রান্সে অর্থ সংগ্রহ করতে যায়, সেই অর্থের সাহায্যে সে সকল দাসদেরই মুক্ত করতে পারল, কেবল বৃদ্ধ লুসিগ্‌নান এবং ৎসাইরে মুক্তি পেল না। লুসিগ্‌নান ছিল নেরেস্তানের পিতা এবং ৎসাইরে ছিল ভগ্নী। ট্র্যাজেডির এখানেই সুরু। সুলতানের ধারণা ছিল ৎসাইরে নেরেস্তানের প্রেমাসক্ত তাই মুক্তি তো দিলেনই না সন্দেহ পরবশ হয়ে ৎসাইরেকে হত্যা করলেন পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে নিজে আত্মহত্যা করলেন।

ভোল্‌তেরের ট্রাজিক্‌ রীতির মূল বৈশিষ্ট্য এই নাটকখানিতে বিধৃত হয়েছে—এর কাহিনীর প্রাচ্য পরিবেশ তাঁকে খুব বর্ণোজ্জ্বল বিস্ময় সৃষ্টির

সুযোগ এনে দিয়েছিল। তিনি নূতন বিষয়বস্তু সংগ্রহের প্রেরণায় যেমন পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত গেছেন তেমনি "লে আমেরিকাইন্‌স" (Les Américains) নাটকে পশ্চিমের সুদূর পেরুতে তরণী ভাসিয়েছেন। ৎসাইরে নাটকে খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলিম ধর্মের দ্বন্দ্বের মাঝে দার্শনিক মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল কিন্তু চরিত্রগুলো সেদিকে না গিয়ে হয়েছে সেন্টিমেন্টের উপর অধিক নির্ভরশীল। তাদের কর্মপ্রেরণা অন্তর্লোক থেকে জাগরিত না হয়ে বাইরের পরিবেশ থেকে হয়েছে। তবুও এ নাটকের প্রভাব সমকালীন ট্র্যাজেডির উপর যথেষ্টই পড়েছিল।

ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, স্পেন এবং রাশিয়ার মত ফরাসী প্রভাব ইতালিতেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে এই ক্লাসিকাল রীতি খুব সার্থক রূপ পায় নি। কিন্তু ১৭১৩ সালে "ফ্রান্সেস্‌কো সিপিয়োনে দি ম্যাফেই" (Francesco Scipione di Maffei) "মেরোপে" (Merope—১৭১৩ খ্রী:) নাটকখানি এমন রীতিতে রচনা করেন যে বোঝা যায় ইতালীয় ট্র্যাজেডিতে অন্তঃশক্তির অধিকারী নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল—পরিণত সময় এগিয়ে এল। ফ্রান্স তার মহান্ কীর্তি পশ্চাতে ফেলে এসেছে, ইংল্যাণ্ড পারছে না শেক্‌সপীয়রকে বিস্মৃত হতে। স্পেনের থিয়েটার অবনমিত—জার্মানী সবেমাত্র থিয়েটার সম্পর্কে সজাগ—সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে, ইতালিতে ক্ষেত্র প্রস্তুত। ক্লাসিকাল রীতি নিয়ে নূতন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। মেরোপে নাটকখানি উচ্চাঙ্গের না হলেও এই শতকের সকল বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছিল। এই নাটকে ছিল প্রকৃত বাস্তব চরিত্র চিত্রণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ—শীতল, কৃত্রিম কাব্যছন্দ মাত্র নয়। ম্যাফেইর পরে এখানে ওখানে অনেকেই হীন পর্যায়ের এই শ্রেণীর নাটক লিখতে লাগলেন। এরপরে এলেন এযুগের ক্লাসিকাল নাটকের প্রকৃত স্রষ্টা "কাউন্ট্ ভিত্তোরিও অ্যালফিয়েরি" (Count Vittorio Alfieri)। তিনি পুরাতন আঙ্গিকের মধ্যে নূতন জীবন ও শক্তি সঞ্চারিত করলেন। তাঁর শক্তির মূল উৎস ছিল তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ ভাবাবেগ—রাসিনের কৃত্রিম সৌকুমার্য তিনি দূরে সরিয়ে রাখলেন, তুলে ধরলেন বাস্তব আদর্শকে। তাঁর উপর একদিকে ছিল মূল গ্রীক নাটকের প্রভাব অন্যদিকে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাও তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে।

অ্যালফিয়েরির নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণা ছিল।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ট্র্যাজেডির ভাবাবেগ হবে অত্যন্ত সুগভীর কিন্তু তার প্রকাশ ভঙ্গি হবে একান্ত সহজ ও সংযত। বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিক সত্যের সঙ্গে থাকবে শৈল্পিক সত্য—সৌন্দর্য ও নীতিবাদ মিশ্রিত—থিয়েটার হবে শিক্ষালয়। তাঁর নাটকের সম্পূর্ণ সংখ্যা ছিল ২১ খানা—শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে ছিল "ক্লিওপাত্রা" (Cleopatra—১৭৭৫ খ্রী:), "সাউল্" (Saul—১৭৮২ খ্রী:) এবং "মিরা" (Mirra—১৭৮৯ খ্রী:) এ ছাড়া গ্রীক নাট্যকারদের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখেন "ওরেস্তে" (Oreste—১৭৭৬ খ্রী:) এবং "আন্তিগোনে" (Antigone—১৭৮৩ খ্রী:)। আন্তিগোনের কাহিনী সোফোক্লেসের অনুরূপই কিন্তু চরিত্র উপস্থাপনায় আধুনিক মনোভাব ছিল। তাঁর ওরেস্তেই সর্বাধিক বিখ্যাত। এর মধ্যে তিনি নূতন সুর জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। মাতৃহত্যার পরে ওরেস্তেসের মনোবিকলন ফুটিয়ে তুলেছেন—ফিউরিরা বাইরের শক্তি নয় তার মনেরই অখণ্ড অংশ।

অ্যালফিয়েরি ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে রোমান্টিসিজমের উদ্দামতা এসে গিয়েছে। তাঁর মধ্যে যে মুক্তি ও স্বাধিকারের ভাবাবেগ ছিল তাও ছিল সেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারারই অংশ। তাঁকে অনুসরণ করে যে সমস্ত ইতালীয় নাট্যকাররা আসেন তাঁদের উপরও এই প্রভাব ছিল অত্যধিক। এটাই স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল যে এ যুগে ক্লাসিকাল কাহিনীর দিন শেষ হয়ে এসেছে, এগিয়ে এসেছে রোমান্টিক নাট্যকাহিনীর দিন।

॥ অপেরা ও কমিক্ ॥

এ যুগে ট্র্যাজিক্ ভাবাবেগ আত্মপ্রকাশের সহজপথ পেয়েছিল অপেরার সুকুমার সৌন্দর্যের মধ্যে। এই শ্রেণীর নাটকের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল রেনেসাঁস্ যুগে তারপরেই আরম্ভ হয় এর ক্রমোন্নতি এবং সমুজ্জ্বল ঐশ্বর্য-মণ্ডিত ক্রমবিকাশ। রাজা ও রাজকুমারদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলত অপেরার রঙ্গালয় তৈরী করার জন্য। আবার অষ্টাদশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অপেরার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

এর গুণগ্রাহিতার জন্য কোন বুদ্ধি প্রদীপ্ত প্রচেষ্টা বা ভাবাবেগের অনুশীলন করার প্রয়োজন ছিল না—এর দৃশ্যগত সৌন্দর্য নয়নানন্দকর ছিল এবং এর গীতিকাব্য বিমুগ্ধ করত শ্রুতিকে। ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত "হেমার্কেট"

(Haymarket—১৭০৫ খ্রী:) রঙ্গালয়ের মত সমগ্র ইউরোপময় অপেরা-হাউজ তৈরী হতে লাগল। কিন্তু এর মূল পীঠস্থান ছিল ইতালি। "গিওভান্নি বাত্তিস্তা লুল্লি" (Giovanni Battista Lulli) যদিও ফরাসী রাজসভায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁর জন্মস্থান ও শিক্ষা ছিল ইতালিতেই। ইংল্যাণ্ডের "হেনরী পারসেল্" (Henry Purcell) এবং "জি. এফ্. হ্যাণ্ডেলের" (G. F. Handel) মত সঙ্গীত রচয়িতারাও মৌলিক উপাদানের জন্য অপেরার উৎস ইতালির দিকেই হাত বাড়াতেন।

অপেরার কাহিনী কিছু উঁচু দরের ঐতিহ্যবাহী ছিল না—তবু তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাও করা যেত না। ড্রাইডেন শুধু গানের জন্য তাঁর কতকগুলো নাটক লেখেন, মেতাস্তাসিওর মত কবি-নাট্যকাররাও অপেরামঞ্চের জন্য উল্লেখযোগ্য নাট্য রচনা করেন। ক্রমে অপেরা থেকেই সাধারণ শ্রেণীর মেলোড্রামার অবির্ভাব ঘটেছিল।

ভিয়েনার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের সভাকবি "আপোস্তোলো ৎসেনো" (Apostolo Zeno) তাঁর পূর্বসূরীদের কীর্তিকে অনেক ঘষামাজা করে একটা সুনির্দিষ্ট গঠনভঙ্গি দেন। তিনি সঙ্গীতমূলক নাটককে ট্র্যাজেডির সমতুল্য আভিজাত্যের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর কোন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না তবুও তিনি তাঁর ৬০ খানা কাব্যমূলক অপেরার মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট গঠনরীতির প্রবর্তন করেন। এরপরে বাকী ছিল উপাদানের সুষম মিশ্রণ—এই কর্তব্য পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উত্তরসুরী "পিয়েত্রো মেতাস্তাসিও" (Pietro Metastasio or Pietro Trapassi)। মেতাস্তাসিওর রচনা তাঁর কালে সর্বত্রই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ভোল্তের তাঁকে রাসিনের সমতুল্য বলেই উল্লেখ করেছেন এবং রুশো তাঁকে সঙ্গীতের জাদুকর—হৃদয়ের কবি বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাসোর পরে তিনিই ছিলেন অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির উচ্চ শ্রেণীর কবি। তাঁর গীতিকাব্য প্রতিভার সমতুল্য প্রতিভা তৎকালীন ইউরোপে আর ছিল না। আজকের দিনে তাঁর রচনা আমাদের কাছে কৃত্রিম গঠনভঙ্গির মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর "আদ্রিয়ানো" (Adriano—১৭৩১ খ্রী:), "ইস্সিপিলে" (Issipile—১৭৩২ খ্রী:) এবং "লা ক্লেমেন্ৎসা দি তিতো" (La Clemenza di Tito—১৭৩৪ খ্রী:) এই সমস্ত রচনার মধ্যে আমরা তাঁর অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের গীতিকাব্য গুণ দেখতে পাব।

এই সমস্ত নাটকগুলির চরিত্র চিত্রণ হত একঘেয়ে—সকলি এক ছাঁচে তৈরী। তার মধ্যে থাকত একজন আদর্শ চরিত্র উন্নতমনা নায়ক, থাকত একটি দুর্বল চরিত্র দুর্ভাগিনী নায়িকা আর থাকত কালো মসীলিপ্ত এক দুর্বৃত্ত চরিত্র। এতেই বোঝা যায় রাজসভার অপেরাধারা অতি সহজ পথ অনুসরণ করেই মেলোড্রামার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। অপেরার সঙ্গীত অংশ কমিয়ে আঙ্গিক ক্রিয়ার অংশ বাড়িয়ে মেলোড্রামা বিস্তার লাভ করেছিল। তা ক্রমে দৃশ্যাবলী ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অন্যদিকে অপেরায় নাট্যকারদের চেয়ে সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকাররাই প্রধান হয়ে উঠতে লাগলেন। যেমন ইংল্যাণ্ডে এলেন হ্যাণ্ডেল, জার্মানীতে গ্লুক্ এবং মোৎসার্ট—এঁরাই তখন অপেরা জগতের অধিকর্তা হয়ে উঠলেন।

কমিক্ অপেরার গতিধারা ছিল আবার ভিন্ন। এর আরম্ভের সূত্র খুঁজতে হলে নেপ্‌লসে যেতে হবে। এতে ছিল রাজসভার বিপরীত ধারা—ছিল আনন্দোৎফুল্ল গ্রাম্যজীবন। রাজপুত্রদের স্থানে এল কৃষকরা। রীতি নীতি নিয়মসৌষ্ঠবের স্থানে এল হাস্য-কৌতুক। যখন "গেন্নারান্‌তোনিও ফেদেরিকো" (Gennarantonio Federico) কমিক্ অপেরার কাহিনী রচনা করতে আরম্ভ করলেন এবং "গিওভান্নি বাত্তিস্‌তা পের্গোলেসি" (Giovanni Battista Pergolesi) "ল্য সের্‌ভা পেদ্রোনা" (La Serva Padrona) নাটকের সুর ও সঙ্গীত রচনা করলেন তখন এই অপেরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করল। এই "অপেরা-কমিক্" (Opéra-Comique) প্যারিসেই স্থায়ী আসন বিছিয়ে বসে। ইংল্যাণ্ডে তখন রচিত হতে লাগল শতশত হালকা রসের সঙ্গীতমূলক নাটক। এই গীতিমূলক কমেডিই ব্যালাড্ অপেরায় পর্যবসিত হল। ইংল্যাণ্ডের নবজাগরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ব্যালাড্-অপেরা ও বার্লেস্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল।

॥ বুর্জোয়া কমেডি ॥

এথারেজের সময়কার একজন অভিজাত নবযুবক নিশ্চিন্ত চিত্তে যা খুশী তাই করতে পারত কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক যুবককে তার সমাজের নিন্দামন্দের ভয়ে সদাই সতর্ক থাকতে হত। এই কারণে অভিজাত কমেডি ক্রমবিবর্তিত হতে লাগল, অষ্টাদশ শতকে তা হয়ে উঠল সংযত কমেডি। রেস্টোরেশন্ যুগের নবযুবক ক্ষণিকের আনন্দকেই বড় করে দেখত—অর্থকে

এই আনন্দ উপভোগের এক উপায় বলে ভাবত—এবং অবাধে ব্যয় করত কিন্তু মধ্যবিত্ত যুবককে এই অর্থ উপার্জন করতে হত, তারা আগামী কালের চিন্তা থেকে কখনই মুক্ত হতে পারত না। বাস্তববাদের দর্শনই ছিল তাদের দর্শন। এরই ফলে অষ্টাদশ শতকে সেন্টিমেন্টাল ড্রামার উদ্ভব হল তাই থেকেই এসেছে আধুনিক সমস্যামূলক নাটক।

ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের নাটক ধীরে ধীরেই সেন্টিমেন্টাল ড্রামার দিকে মোড় ফিরেছিল। ইংল্যাণ্ডে কন্‌গ্রীভের পরে এসেছিলেন "সার্ জন্ ভ্যান্‌ব্রাঘ" (Sir John Vanbrugh) এবং "জর্জ ফার্ক্‌হার্" (George Farquhar)। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের দু'জনকে রেস্টোরেশনের উত্তর সাধকই মনে হয় কিন্তু নিবিষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তাঁরা নূতন আলো হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন। ভ্যান্‌ব্রাঘের হাস্যরস কন্‌গ্রীভের বুদ্ধিদীপ্তি থেকে অনেক আলাদা। তাঁর "দ্য প্রভোক্‌ড ওয়াইফ্" (The Provoked Wife—১৬৯৭ খ্রীঃ) নাটকের স্ত্রী চরিত্রটি স্বামীর বহু অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও বিশ্বাসহন্ত্রী হয়নি, আর তাঁর "দ্য প্রভোক্‌ড হাজ্‌ব্যাণ্ডের" (The Provoked Husband—১৭২৮ খ্রীঃ) স্ত্রীটি যদৃচ্ছ আচরণ করলেও স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের ভয় দেখাতেই সংযত হল। সহজেই বোঝা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিজ্ঞান ও চিন্তাধারা নাটকে প্রযুক্ত হচ্ছে।

ফ্রান্সে এই নূতন যুগধর্ম কথঞ্চিৎ মলিয়েরের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের রেস্টোরেশন্ যুগের নাট্যকাররা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অভিজাত গোষ্ঠীর চরিত্র চিত্রণ করেছেন—মলিয়ের্ তা করেন নি। তবে মলিয়েরের রচনায় সামাজিক পরিবেশ অনেক সময়েই অবহেলিত হয়েছে—কেবলমাত্র কাহিনীর পরিপুষ্টির জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকুই তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুসরণকারী "জাঁ ফ্রাঁসো রেগ্নার্" (Jean Francois Regnard) ও সমকালীন নাট্যকারদের রচনায় চরিত্র চিত্রণের পরিধিই যে কেবল ব্যাপ্ত হল তা নয় তার সঙ্গে এল সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুগভীর বিশ্লেষণ।

॥ গোৎসি ও গোল্‌দোনি ॥

সমগ্র সপ্তদশ শতকে ইতালিতে কমেদিয়া দেল্ আর্তের প্রাচীন ধারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল—তার সঙ্গে "ব্যারোক্" (Baroque) মঞ্চ

যুক্ত হল, ক্রমশঃ তা কমেডিতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হতে লাগল। "কার্লো মারিয়া মাগ্‌গি" (Carlo Maria Maggi) এই প্রভাব অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন "মেনেঘিনোর" (Meneghino) মত টাইপ্ চরিত্র। কম্মেদিয়ার এই প্রভাব একালের অন্যান্য কমেডি রচয়িতাদের উপরও যথেষ্ট পড়েছিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে প্রকৃত প্রতিভাধর দু'জন নাট্যকার এলেন—তাঁরা হলেন "কাউন্ট্ কার্লো গোৎসি" (Count Carlo Gozzi) এবং "কার্লো গোল্‌দোনি" (Carlo Goldoni)। তাঁরা দু'জনেই কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে যে ভেনিসে শিকড় বিস্তার করেছিল সেখানেই লালিত পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই মৌলিক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী।

গোৎসির কাছে কম্মেদিয়া দেল্ আর্তে ছিল উন্মুক্ত কল্পনা এবং আনন্দের উপকরণ। একদিকে তাঁর নাটকে সৌকুমার্যের চাইতে বিদ্রূপ রসই ছিল প্রধান, অন্যদিকে তিনি বিস্ময় এবং জাদুর জগতেই উধাও হতে চাইতেন। তাঁর নাটকে সুগভীর কোন মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ছিল না। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই জনপ্রিয় কমেডি সমাজের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত এই দু'শ্রেণীর মানুষকেই সমভাবে তুষ্ট করেছিল। সকলেই এই নাটকে এমন একটি ছক দেখতে পেত যার মধ্যে তারা তাদের স্বপ্নের জাল বুনে চলতে পারে। গোৎসির রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল তাঁর "ফিয়াবে" (Fiabe) শ্রেণীর নাটক—তাতে থাকত একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত পরীর গল্প। অত্যন্ত কাল্পনিক, অসম্ভব, যত নাটুকে বিস্ময়ে ভরা কিন্তু তারি মাঝে তা হত বাস্তবের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত। রূপকথার বিস্ময়ভরা উপকরণের সঙ্গে সাহিত্যিক স্যাটায়ার মিশ্রিত হয়ে আছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল "দ্যা লাভ্ অব্ দ্যা থ্রি অরেঞ্জেস্" (The Love of the Three Oranges or L'amore delle tre melarance —১৭৬১ খ্রীঃ)। এর নায়ক বিষাদরোগগ্রস্ত রাজকুমার "তারতাগ্‌লিয়া" (Tartaglia), ফাতা মোর্‌গানা তাকে অভিশাপ দিয়েছে সে যদি না হাসে তবে মারা যাবে। তাকে হাসাবার জন্য দৈহিক ক্রীড়াবিদ্ ত্রুফাল্‌দিনো এল এবং পরিশেষে সে রাজকুমারকে হাসাল। বৃদ্ধা মোর্‌গানা আবার তাকে পাঠিয়ে দিল তিনটি কমলালেবু আনবার জন্য। রাজকুমার "ত্রুফাল্‌দিনোকে" (Truffaldino) সঙ্গে নিয়ে দুর্গম সুদূর দুর্গে গেল এবং মোর্‌গানার

প্রতিদ্বন্দ্বী জাদুকর সেলিওর সহায়তায় কমলালেবু পেল। পিপাসায় কাতর হয়ে একটা কমলা তারা কাটল তা থেকে বেরোল এক কন্যা সে জল চাইল, জল দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কমলালেবু কাটা হল তা থেকেও আর এক কন্যা বেরিয়ে জল চাইল—জলের অভাবে তারা দু'জনেই মারা গেল। তৃতীয় লেবুটি কাটল তারা এক সরোবরের কাছে এসে, এটা ভেঙ্গে যে রাজকন্যা বেরোল তাকে তারা হ্রদের জল খেতে দিল। সে দুষ্টবুদ্ধি মুরকন্যা স্মেরাল্‌দিনার অভিশাপে ঘুঘুপাখী হয়ে গেল, ত্রুফাল্‌দিনোর চেষ্টায় রাজকন্যা আবার স্বরূপে ফিরে এল এবং রাজপুত্র তাকে বিবাহ করল।

বাইরের দিক থেকে এই কাহিনী ছিল শিশু সুলভ পরীর গল্প। কিন্তু এই সমস্ত গল্পে কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের উত্তরাধিকার লব্ধ দক্ষতা নিয়ে যে অভিনেতারা অভিনয় করতেন তাঁরা সত্যিই ছিলেন মঞ্চের জাদুকর। তারতাগ্‌লিয়া যে দৃশ্যে ত্রুফাল্‌দিনো ও দুই মৃত কমলালেবুজাত কন্যার সঙ্গে রয়েছে—নাট্যকার গোৎসি তার বর্ণনা মাত্র দিয়ে বলেছেন—এই দৃশ্য রচনায় অভিনেতারা যে দক্ষতা প্রকাশ করতে পারবে কোন নাট্যকারের সাহিত্য-প্রচেষ্টাই তা পারবে না। অতএব এই নাটককে অনুধাবন করতে হলে আমাদের কল্পনায় নেত্রে দেখতে হবে ঠিক কিভাবে সেই অনুষ্ঠানটি হত। কিন্তু এ সব কিছুর মধ্যে নাট্যকারের এক সুচতুর ব্যঙ্গ কার্যকরী ছিল, নাটকের দুই জাদুবিদ্ ফাতা মোর্‌গানা ও সেলিও ছিলেন গোৎসির সমকালীন দুই নাট্যকার কার্লো গোল্‌দোনি ও "পিয়েত্রো চিয়ারির" (Pietro Chiar) ব্যঙ্গ চিত্র। তিনি তাঁদের আবেগময় নীতিপরায়ণতাকে অপছন্দ করতেন। তাঁর ধারনা ছিল এঁরা এঁদের নীতিবাদ দ্বারা থিয়েটারের হাস্যরসকে হত্যা করছে। তাই ছদ্মচিত্রের সাহায্যে তিনি তাঁদের চরিত্রকে হাস্যকর করে তুললেন। তাঁর পরবর্তী ফিয়াবেগুলিও এই পথ ধরেই চলেছিল—তার মধ্যে তিনি সংলাপের অংশ কিছু বাড়িয়েছিলেন। তাঁর এই সব নাটকগুলি হল "দ্যা ক্রো" (The Crow or Il Corvo—১৭৬১ খ্রীঃ), "দ্যা কিং স্ট্যাগ্" (The King Stag or Il re cervo —১৭৬২ খ্রীঃ), "দ্যা উম্যান্ সার্‌পেন্ট্" (The Woman Serpent or La Donna Serpente), এ ছাড়া তিনি কিছু ট্র্যাজি-কমেডিও লেখেন—যেমন "দ্যা টার্কিশ ওয়াণ্ডার্" (The Turkish Wonder—১৭৬৪ খ্রীঃ), "দ্যা ফরচুনেট্ বেগার্‌স্" (The Fortunate Beggars—১৭৬৪ খ্রীঃ) ইত্যাদি। এই

নাটকগুলিতে কথোপকথনের সঙ্গে তিনি ক্রিয়াকৌশলও লিখে দিয়েছেন। পরীর গল্পের পাশেই রয়েছে জীবনের বাস্তব চিত্র; আছে গুরুগম্ভীর দৃশ্যের পাশেই বিদ্রূপের কশাঘাত—কথ্য গদ্য আর সুকুমার পদ্য।

গোৎসি নিজে ছিলেন অভিজাত সমাজের লোক; তিনি মনে করতেন আর এক শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি সুখী হতেন। বুর্জোয়া বিশ্বাসের যে ভণ্ডামী অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের অধিকার করেছিল তিনি তার উপর বিরক্ত ছিলেন। অন্যদিকে গোল্‌দোনি স্বয়ং ছিলেন এই বুর্জোয়া যুগের বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। গোৎসির মত তিনিও তাঁর নাট্যকার জীবন আরম্ভ করেন কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের অভিনেতাদের জন্য লেখনী ধরে কিন্তু শীঘ্রই তিনি মনে করলেন যে, এই সব পরীর গল্প ও ভাঁড়ামীতে আনন্দ থাকলেও কোন সুগভীর মননশীলতা নেই। নাট্যকার গোল্‌দোনির প্রতিভা সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা সত্যই কঠিন। তাঁর কলম সর্বদাই সচল থাকত। তাঁর ২৫০ খানি ছোট বড় নাটকের মধ্যে অনেকগুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আবার কোথাও দেখা যায় তাঁর কৌতুক রস সৃজনের সহজ ক্ষমতা। এই সব নাটকের দৃশ্যগুলি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত হত। তিনি সে যুগের দার্শনিক চিন্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তবে তাকে তিনি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সমকালের অন্যকোন নাট্যকারও তাঁর মত এত নূতন পথ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন নি। মঞ্চকে তিনি প্রকৃত কমিক্ দৃশ্য দ্বারা ঐশ্বর্যশালী করেছেন, বলা যায় তাঁর মত যুগ পরিবেশকে আর কেউ চিত্রিত করেন নি।

তিনি তাঁর সমকালীন থিয়েটারেব পরিবেশকে অঙ্কিত করেছেন তাঁর "দ্যা কমিক্ থিয়েটার" (The Comic Theatre or Il teatro comico—১৭৫০ খ্রীঃ) নাটকে। তার মধ্যে একদল অভিনেতা, পরিচালক ওরাৎসিওর অধীনে গোল্‌দোনিরই লেখা একটি ফার্স "দ্যা ফাদার্ এ রাইভাল্ টু হিজ্ সান্" (The Father a Rival to his Son)-এর রিহার্সাল দিচ্ছিল, এর মধ্যে রঙ্গমঞ্চের নানান দোষ, ত্রুটি তিনি চিত্রিত করেছেন। অভিনেতাদের নির্বোধ ও বিরক্তিকর দাবি; তাদের ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি ছড়াকাটা, হৈ-হুল্লোড় করা, অশ্লীল কথা বলা—অর্থাৎ তাদের নৈতিক উদ্দেশ্যহীনতাই ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর প্রখ্যাত নাটকগুলি হল "দ্যা লায়ার্" (The Liar or Il bugiardo),

"দ্য কফি হাউজ" (The Coffee House or La bottega del Caffé), "দ্য মিস্ট্রেস্ অব্ দি ইন্" (The Mistress of the Inn or La locandiera—১৭৫৩ খ্রী:)। গোল্‌দোনির নাটকগুলির মধ্যে নারী চরিত্রই প্রধান। মেয়েদের ছোটখাট মূর্খতা, তাদের খাসকামরার গল্প, মেকি প্রশংসা, ঈর্ষা এ সকলি তাঁর সুতীক্ষ্ণ নজরে পড়েছিল, তিনি তা তাঁর নাটকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর 'ডোনা' বা নারীপ্রধান নাটক হল "ফিমেল কিওরিওসিটি" (Female Curiosity or Le donne curiose —১৭৫৩ খ্রী:), "দ্য জেলাস্ উয়িমিন্" (The Jealous Women or Le donne gelose—১৭৫২ খ্রী:), "দ্য লাভারস্" (The Lovers or Gli innamorati—১৭৫৯ খ্রী:), ইত্যাদি।

গোৎসি ও গোল্‌দোনি এই দু'জনই দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের পারিপার্শ্বিক তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরা দু'জনই ছিলেন প্রতিভাশালী দু'জনেই কম্মেদিয়া দেল্ আর্তের পথ দু'দিক দিয়ে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সে যুগ ছিল সুগভীর তাৎপর্যময় তাঁরা তার সামাজিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি—দু'জনেই তার কৌতুক স্মৃতি মাত্র রচনা করে গেছেন।

॥ আধুনিক যুগ ॥

ইউরোপ

ক্লাসিকাল যুগের ট্র্যাজেডি ও কমেডিতে যে সুর-ধ্বনি জেগে উঠেছিল রেনেসাঁস্ যুগের নবনির্মিত বীণা যন্ত্রেও আমরা তার অনুরণন শুনেছি কিন্তু তা এসে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ল সর্ব প্রথম জার্মানীতে। ঝংকৃত হয়ে উঠল নূতন যুগের আগমন বার্তা। এই বার্তাবহ কেবল একজনই ছিলেন না—কিন্তু যাঁর বিজয় কেতন কি কাব্যলোকে কি নাট্যলোকে সর্বোচ্চে উড্ডীন হয়েছিল তিনি হলেন গ্যেটে—"যোহান্ ওলফ্‌গ্যাং ফন্ গ্যেটে" (Johann Wolfgang Von Goethe) জার্মানীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই যুগারম্ভের সমগ্র ঐশ্বর্য নিয়েই এসেছিলেন। তিনি তাঁর অত্যুজ্জ্বল বিভা নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত ছিলেন দীপ্যমান। আধুনিক যুগের পথপ্রদর্শন করবার মত একদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি অন্যদিকে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থেকেই জন্মলাভ করেছিল আধুনিক নাটক। এক নূতন আদর্শবাদী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যাঁদের মূল মন্ত্র ছিল স্বাধীনতা (Liberty) ও মানবাত্মার মুক্তি। এই চিন্তাধারাই রূপ পরিগ্রহ করল রোমান্টিসিজম্ নামে। নব নব আশার বাণী কাব্যে, সাহিত্যে, নাট্যে, চিত্রশিল্পে তাঁরা দিগ্‌বিদিকে বিচ্ছুরিত করতে লাগলেন। সেকালের কবি, শিল্পীদের মধ্যে যে এক অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, বর্তমানকালের কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহী কাটাছেঁড়া সমালোচনার সূত্রে তাকে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ সেকালের ব্যথা বেদনা, আশা মূলতঃ ছিল অনুভূতি সাপেক্ষ, সেই প্রাণময় সত্ত্বার অনুভব তখন ছিল একান্ত সত্য। ১৭৮০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ আমরা পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সমাপ্তিকাল বলতে পারি। মধ্যযুগের শেষ থেকে অর্থাৎ রেনেসাঁস্ আন্দোলনের আরম্ভ থেকে যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল, তাদের পূর্ণ বিজয়েই সামন্ততন্ত্রের সমাপ্তি ঘোষিত হল—এর পরে ধনতন্ত্রই হয়ে উঠল সর্বপ্রধান। অবিশ্যি ব্যবসা ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব, বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়—কথাটার

প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। যে বিপ্লব ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল এবং ভূকম্পনে ইউরোপের অন্যান্য রাজসিংহাসনও প্রকম্পিত করেছিল, তাকে কেবলমাত্র ব্যবসা জগতের একটা ওলট পালট বলেই সামগ্রিক মূল্যায়ন করা যায় না। এই যুগের মানুষ সব কিছুই বিরাট পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল করে দেখেছিল, তাই তাদের আনন্দ, বেদনা, নবোদ্ভূত আশা সকলি ছিল তীব্রতম। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়তো কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা এবং অ্যাসেম্ব্লিতে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু প্রতিটি যুগেরই আত্মিক-প্রগতির জন্য তাদের কতকগুলি নিজস্ব আদর্শ এবং দর্শন থাকে। জনমানস একবার যখন জাগরিত হয় তখন তাদের আর নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাদের ভাবাবেগ ও আদর্শ নিজস্ব যুগচেতনার পথে তখনকার মত এগিয়েই চলে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আবার ফিরে এসেছিল রেনেসাঁসের স্বপ্ন। সে যুগ ছিল দর্শনের যুগ, বৈপ্লবিক চিন্তার যুগ, জীবনের নূতন মূল্যায়নের যুগ। রুশো, ভোল্‌তেয়রের তত্ত্ব এসে প্রাণহীন আভিজাত্যের আবরণ ছিন্ন করে সর্বমানুষের স্বাধীনতা, তাদের নিষ্কলংক ভালত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবিকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত করল। এই যুগেই গণদেবতার জাগরণের উদ্দাম স্বপ্ন মানুষ প্রথম দেখেছিল। যদি মানুষ শুভকামনা নিয়ে ন্যায় বিচারের পথে এগোয় তবে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের মধ্যে গণতন্ত্রের পদধ্বনি সর্বপ্রথম শ্রুত হল। জনসাধারণ দীক্ষিত হল সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের মন্ত্রে এই নূতন বিপ্লবীরা ধর্মকে সরিয়ে যুক্তিকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইল। যদিও ফরাসী বিপ্লব সার্থক ফলপ্রসূ হয়নি, এক মহৎ আদর্শ ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল—কতকগুলি স্বার্থসন্ধানী লোকের হাতে গিয়ে পড়েছিল এবং সর্বশেষে নাপোলিয়ঁর বিজয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু ইউরোপ যে এক উদার, মহৎ, নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখল, তার পরিসমাপ্তি আজো ঘটেনি। নাপোলিয়ঁর পরবর্তীকালেও এই চিন্তার কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা হয়েছে—জার্মানীর নাৎসী আন্দোলন একে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে—কিন্তু যুগ থেকে যুগান্তরে এক আদর্শ জীবনের স্বপ্ন মানুষের কল্পনায় ভিন্ন

ভিন্ন রূপে চিরঞ্জীব হয়ে রয়েছে। এই স্বপ্নই পক্ষ বিস্তার করে মহাকাশ পাড়ি দিতে চেয়েছিল রোমান্টিক নাটকে। কখন বা তার রূপ ছিল দৃষ্টি গ্রাহ্য, কখন বা তা ছিল অলৌকিক, অদৃশ্য, কখন বা রূপ পেত অজানা, অসংলগ্ন মানসলোকের। রোমান্টিক নাটককে সহজভাবে বলা যায় নব নব আশা আকাঙ্ক্ষার রূপকল্প। এই রোমান্টিক চিন্তাধারা বস্তুত: ছিল এক কাব্যিক ভাবাদর্শ, তাই যিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নাট্যকার ছিলেন—তিনি ছিলেন গ্যেটে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিই কেবল নন—মহাকবি।

রোমান্টিক ভাবনার আশা, আকাঙ্ক্ষা, জাগতিক পরিবেশে অপূর্ণতার সুতীব্র বেদনা আর ক্লাসিকাল যুগের সুদূর অতীতে সর্বপূর্ণতাময় ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখা,—এক সময় নাটক ও মঞ্চের জগতে এই ভাবাবেগের সমাপ্তি ঘনিয়ে এল। ততদিনে পশ্চিম ইউরোপ মধ্যবিত্তশ্রেণীর জগৎ হয়ে উঠেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একান্তভাবেই ছিল বাস্তববাদী। তারা পায়ের নীচে পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে দাঁড়াতে চেয়েছে। জাগতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতিই তাদেব কৌতূহল—বাস্তবকে তারা বোঝে, চেনে, বিশ্বাস করে। সুতরাং মধ্যবিত্তশ্রেণীব যে নাট্যকারবা, তাঁরা রোমান্টিক কল্পনা ত্যাগ করে বাস্তববাদী হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁদের পরিবেশ ও জীবনের মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যকে আবিষ্কাব করে নিয়ে কাব্যে, নাট্যে, শিল্পে তা প্রকাশ করতে লাগলেন, ফলে আবির্ভাব ঘটল বাস্তববাদিতার বা "রিয়া'লজমে"র (Realism)। নাট্যে এই বাস্তববাদিতা কোথাও বা গড়ে উঠত তার যথাযথ চিত্রণে, কোথাও বা হত তার ব্যাখ্যা এবং সমালোচনায়। অষ্টাদশ শতকেব শেষ থেকে আজ পর্যন্ত মঞ্চে বহু প্রকার নাট্যশৈলীবই আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে—কিন্তু রিয়ালিজমের প্রাধান্য কমে গেলেও ধাবাবাহিকতা অক্ষুন্নই রয়েছে। এই বাস্তববাদিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে—সম্মুখে আর নূতন সৃষ্টিব কোন পথ না পেয়ে, নাট্যধারাকে প্রত্যাবর্তন কবতে হল এবং সেখানে সে শতধা বিভক্ত হয়ে বহুতর 'ইজম্' (Ism) বা মতবাদের সৃষ্টি করল। পর্বতগাত্রে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে—তার উত্তাল তরঙ্গে হয়েছে থিয়েটার ও নাটকের রোমান্টিসিজম্ নামক প্রাথমিক গতি, রিয়ালিজমেব সমভূমিতে সাবধানী চলায় হয়েছে নবযুগের মধ্যগতি, আর তারপরে অজানা সমুদ্রের ডাকে বহু-ইজমের শতধারায় ছুটে চলা তার এই আধুনিক গতি। রিয়ালিজম্ থেকে

নাটকের বহু-ইজমের পথে প্রধাবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—উনবিংশ শতক থেকেই এক শিল্পরীতির অনুধাবন করত অন্য রীতি, এক ধারা অবলুপ্ত হয়ে যেত অন্যধারায়, আর তখন দর্শকরাও সবরকম নাট্যরীতিকেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নাটক এবং প্রয়োগশিল্প হয়ে উঠল কতকটা বাস্তববাদী, প্রতীকবাদী, অভিব্যক্তিবাদী এবং অতিবাস্তববাদী।

থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই বহু-ইজমের আবির্ভাব বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দেখা দিয়েছে। প্রথম এবং তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পশ্চিম ইউরোপের তথা সমগ্র বিশ্বেরই জীবনের প্রাচীন নীতি ও মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সবই ভাঙ্গনের মুখে—একের পর এক বিবর্তনের মুখে ঠেলে দিতে লাগল—অন্যদিকে তার সহায়ক হয়ে এল বিজ্ঞান। এরই ফলে চিন্তার জগতে দেখা দিল পরম অস্থিরতা ও আলোড়ন। মানব সভ্যতার গতিবেগ অনেক বেড়ে গেল—আগে যে পরিবর্তন আসতে শতাব্দী লেগে যেত—এখন তা আসে হয়তো দশ বছরে। এই একান্ত অনিশ্চয়তা, প্রচণ্ড অস্থিরতা, আত্ম-অবিশ্বাস এবং অদ্ভুত গতিবেগ থিয়েটারকে নিত্য নূতন পথে আবর্তিত করে নিয়ে চলেছে। এযুগকে সর্বতোভাবেই আমরা বলতে পারি পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ—যা হয়তো সভ্যতার এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও নব অধ্যায়ের সূচনা গাইছে।

বর্তমান যুগের থিয়েটারের দিকে তাকালে দেখতে পাব আমরা চারদিকে বিশৃঙ্খলা এবং ঐক্যের অভাব। মনে হবে বিচিত্র সম্ভারের মেলা বসে গেছে—যার যা অভিরুচি বেছে নেও। আমরা বলতে পারি এই বহু-বাদের বৈচিত্র্যই একালের নীতি, এবং তার সমন্বয়ই হল যুগ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে থেকে আমরা দু'টি বিপরীতমুখী ধারাকেই স্পষ্টতঃ তুলে ধরতে পারি। একদিকে রয়েছে বাস্তববাদের ধারা (Realistic) এবং অন্যদিকে অ-বাস্তববাদের ধারা (Non-Realistic)।

আধুনিক যুগের থিয়েটার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিবর্তনগুলি বুদ্ধিজীবীদের মানসলোকেই প্রথম ধরা দিয়েছিল। এই নূতন নূতন তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্বতন্ত্র লেখনী ধরেন সাহিত্যিক ও নাট্যকাররা। বিভিন্ন তত্ত্বের আবির্ভাব প্রথমে হয়েছে নাটকে এবং তা প্রয়োগ করতে গিয়ে মঞ্চে এসেছে বিভিন্ন "বাদ"। অবিশ্যি মঞ্চে একক ভাবেও যে

কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়নি তা নয়। এ যুগে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে মঞ্চ এক অপূর্ব সম্পদের অধিকার পেয়েছে—তা হল বৈদ্যুতিক আলোক। বর্তমানকালে আলোক সম্পাতের সাহায্যে মঞ্চে অনেক অত্যদ্ভুত ঘটনাই ঘটিয়ে ফেলা যায়। মঞ্চের এই বিশেষ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে নাটককেও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। আর একটি ক্ষেত্রেও নাটকের চেয়ে মঞ্চশিল্পের দক্ষতা প্রকাশের অবকাশ রয়েছে অনেক বেশি। এই ক্ষমতা হল "বিমূর্ত শিল্পের" (Abstract Art) ক্ষেত্রে, আলোক এবং চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মঞ্চ যে ঊর্ধ্বমার্গে উন্নত হতে পারে—দেহধারী অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাধ্যমে নাটক তা অনেক সময়ে পেরে ওঠে না। তবুও আমরা এ কথাই স্বীকার করে নেব যে, এ যুগের প্রধান পরিবর্তনগুলি চিন্তার জগৎ থেকে প্রথমে এসে ধরা দিয়েছিল নাট্য-সাহিত্যে—এবং সেখান থেকে বিস্তার লাভ করেছিল মঞ্চে। সুতরাং আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একালের নাটকের পূর্বাধিকার মেনে নিয়েই অগ্রসর হব।

॥ জার্মানীর রোমান্টিক আন্দোলন—লেসিং, গ্যেটে, শিলার ॥

আমরা শেক্‌সপীয়র বা কল্‌দেরোনের নাটককেও রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে থাকি। তাঁরা রোমান্টিক, সোফোক্লেসের ক্লাসিক্ কাহিনী বন্ধন অথবা রাসিনের নিও-ক্লাসিক্ ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে। উনবিংশ শতকের রোমান্টিক নাটক ছিল কিন্তু একেবারে ভিন্ন জাতের। এই রোমান্টিক-ধর্মিতার মূলে রয়েছে "স্টর্ম্ অ্যাণ্ড স্ট্রেস্" (Storm and stress) এই আন্দোলন সুরু হয় গট্‌হোল্‌ড এফ্রাইম্ লেসিং, গ্যেটে ও শিলারের যৌবনোচ্ছল অভিযাত্রা দিয়ে। গ্যেটের জীবন ছন্দোদোলায় দুলেছে—সব ভেঙ্গে ফেলার আবেগময়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশীলতার মাঝে। তাঁর মধ্যে একদিকে রয়েছে কৈশোর বেদনা, আর অন্য দিকে মানবাত্মার অসীম, অনন্ত লোকের জন্য ক্রন্দন আবার তিনিই ফিরে সাধারণ মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করেছেন। অন্য দু'জন জার্মান নাট্যকারের মধ্যে আমরা দেখেছি রোমান্টিক-ধর্মিতা ও যুক্তিবাদ পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। গ্যেটের পূর্বেই থিয়েটারে এসেছিলেন "গট্‌হোল্‌ড এফ্রাইম্ লেসিং" (Gotthold Ephraim Lessing) আর গ্যেটের পরে এসেছিলেন "ফ্রিড্‌রিশ্ ফন্ শিলার" (Friedrich Von Schiller) কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী গ্যেটের বহু পূর্বেই বিগত হয়েছিলেন।

রোমান্টিক নাট্যকার হিসেবে লেসিং নাট্যে ও মঞ্চে ফরাসী ক্লাসিসিজমের বন্ধনকে ছিন্ন করে উন্নত চিন্তা এবং আদর্শবাদিতার মুক্তি দেন। যদিও নাট্যকার হিসেবে তাঁর মধ্যে রোমান্টিক উন্মাদনার প্রকাশ বিশেষ ছিল না, তবুও তিনি স্মরণীয় নূতন চিন্তার জন্মদাতা বলে, পথিকৃৎ হিসেবে। রোমান্টিসিজম্ অনেক সময় ভাঙ্গনের জয়গান গেয়েছে—এই ভাঙ্গনের মূল প্রেরণা ছিল মুক্তির আকুতি। রোমান্টিসিজম্ চেয়েছে নিও-ক্লাসিকাল ধারার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে তার কঠিন প্রথানুগ নিয়ম শৃঙ্খলার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে। ফরাসী নাটকের প্রাণহীন অনুবৃত্তিকে রোমান্টিসিজম্ মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। এমনকি তার সঙ্গে দীর্ঘকালের জনপ্রিয় ফার্স "হার্লিকুইন্ বা আর্লাকাঁ"র (Herlequin) জার্মান রূপ "পিকেলহেরিং" (Pickelherring)-এর ক্লাউন চরিত্রেরও গতানুগতিকতার খোলস ভেঙ্গে পড়ল। থিয়েটারের বন্ধনমুক্তির জন্য লেসিং-এর এই সংগ্রাম ঘোষণা কোন সচেতন সংস্কারকের রূপ ধরে আসেনি। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় তিনি মলিয়েরকেই অনুকরণ করতে চেয়েছেন—কিন্তু এরপর তাঁর "মিস্ সারা স্যাম্পসন্" (Miss Sarah Sampson) নাটকের মধ্যে বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পেলাম প্রথম মধ্যবিত্ত ট্র্যাজেডি যেখানে বাস্তব জীবন অঙ্কিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাষায় কথোপকথন বলছে। লেসিং তাঁর সর্বশেষ নাটক লেখেন "নাথান্ দ্যা ওয়াইজ্" (Nathan the Wise—১৭৭৯ খ্রী:) এই নাটকেই আমরা অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোক-মণ্ডিত মানুষটিকে দেখতে পাই—দেখতে পাই গোটের 'ফাউস্ট্' চরিত্রের পূর্বাভাস। কিন্তু লেসিং-এর সার্থকতা কেবল সেখানেই নয়—এই নাটকের পরিসমাপ্তিতে তিনি এক আত্মিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন—দেখিয়েছেন ধর্মের মূল ভিত্তি অন্ধ সংস্কার নয়, সুযুক্তি। লেসিং এক মহান্ চরিত্র অঙ্কিত করলেন, যে চরিত্র স্বভাব ধর্মের উপর (Natural religion) দাঁড়িয়ে আছে। সে সংস্কারবদ্ধ ইহুদীও নয়, খ্রীষ্টানও নয়, মুসলমানও নয়, তবুও সর্বধর্মের মূল সত্য তার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে—প্রকৃত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার দাবি সর্বোত্তম। তাই নাথান্‌কে বলা যায় খ্রীষ্টধর্মকে অস্বীকার পেয়েও যীশুর অনুগামীদের চেয়ে একজন খাঁটি খ্রীষ্টান। কোন ধর্মকে স্বীকার না পেয়েও জীবন ধর্মের বিশ্বাসে নাথান্ মহীয়ান। এই নাটকে নাথানের পালিতা কন্যা ক্রুশেড্ যুদ্ধে মাতাপিতৃহীনা রেবেকা, যে ছিল সুলতান সালাদিনের ভ্রাতুষ্পুত্রী

যখন তার সহোদর ভাই—"টেম্পলারকে" (Templar) পরিচয় না জেনে ভালবাসল তখন তা পূর্ণ রোমান্টিক রূপ পরিগ্রহ করল। সালাদিনের বিচার সভায় নাথান্ এর পরে ঘোষণা করলেন—বিভিন্ন ধর্ম মতে বিরোধ থাকলেও মূলতঃ তারা একই—মানবতার তত্ত্বের উপর যিনি দাঁড়িয়ে তিনিই প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী এবং সর্বজনপ্রিয়।

লেসিং-এর অনুবর্তী গোটে এবং শিলার ১৮০১ সালে জার্মানীর "ভাইমার্" (Weimer) মঞ্চে নাথান্ দ্যা ওয়াইজ্ নাটকের সার্থক রূপায়ণ করেন কিন্তু লেসিং তা দেখে যেতে পারেন নি। এরপরে এই নাটক অনূদিত হয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এবং অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশটি তার মঞ্চ-উপস্থাপনা হয়।

শিলার প্রথমে কাব্যলোকে পক্ষবিস্তার করেন—সেখানে রয়েছে নিঃসঙ্গ বেদনা এবং পীড়িত আত্মার নৈরাশ্যময় ভাবাবেগ। তাঁর পিতা ক্যাপ্টেন ছিলেন—কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের চরিত্রের স্পর্শকাতরতা. নীল চোখ এবং বাদামী কেশগুচ্ছ। তিনিও সৈন্য বিভাগে ডাক্তারি বিদ্যাশিক্ষা করে প্রবেশ করেন, এবং সে সময়ে লেখেন তাঁর প্রথম নাটক "দ্যা রবার্স্" (The Robbers) এই নাটকের একদিকে রয়েছে রোমান্টিক বিদ্রোহী মন অন্য দিকে রয়েছে অনন্ত বিষাদ। "ম্যান্হাইমে" (Mannheim—১৭৮২ খ্রীঃ) এই নাটক যখন অভিনীত হল তখন চারাদকে এক বৈদ্যুতিক আলোড়ন জেগে উঠল। কিছুদিন পরেই ফরাসী বিপ্লবীরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান জ্ঞাপন করল—এবং বিপ্লবের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাল। সুতরাং ডিউকের আদেশে তাঁর লেখনী বন্ধ হল, তিনি তাঁর জন্মস্থান "উয়েরটেম্বার্গ" (Württemberg) থেকে পলায়ন করে এলেন ম্যান্হাইমে। এরপরে তাঁর দ্বিতীয় নাটক ছিল "ফিয়েসকো" (Fiesco) এটা তাঁর প্রথম নাটকের ছাঁচে ঢালাই। তাঁর তৃতীয় নাটকখানি আবার সশব্দে চতুর্দিক সচকিত করে আবির্ভূত হল এখানির নাম "ইন্ট্রিগ্ অ্যাণ্ড লাভ্" (Intrigue and Love) এখা'ন হল লেসিং-এর প্রদর্শিত পথে মধ্যবিত্ত ট্র্যাজেডি। এর মধ্যে জার্মানীর রাজসভাগুলির চরম অধঃপতনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অভিজাত পিতার আদেশ অমান্য করে নায়ক ভালবেসেছিল এক সাধারণ ঘরের কন্যাকে। এই সময় শিলার ম্যান্হাইম্ থিয়েটারের পরিচালক "ডলবার্গের" (Dalberg) সুনজরে পড়লেন এবং পর পর তাঁর দু'খানা নাটকই মঞ্চে অভিনীত হল;

তিনি হলেন এই থিয়েটারের কবি। শিলার সমালোচনা ও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকার জন্যও তখন লেখনী ধরেন। শিলারের পরবর্তী নাটক "ডন্ কার্লোজ্" (Don Carlos) ১৭৮৭ সালে লেখা হয়। এই নাটকের জন্য তিনি ভাইমারের "ডিউক্ কার্ল অগাস্টের" (Duke Karl August) অনুরাগভাজন হন, ক্রমশঃ শিলারের পরিবেশের মধ্যে একটা সাম্য ও শান্তি আসে তাঁর হৃদয়ও প্রশান্ত হয়—তিনি স্নিগ্ধসুরে গীতিকাব্য রচনা করতে বসেন। শিলার এর পরে গ্যেটের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন এবং আরো নোতুন কয়েকখানি নাটক লেখার প্রেরণা লাভ করেন। যার মধ্যে রয়েছে সৈনিকের জীবনালেখ্য, তার কোথাও কোথাও উচ্চ ভাবাদর্শ এবং দার্শনিক চিন্তা ফুটে উঠেছে, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে রইল তাঁর ডন্ কার্লোজ্।

শিলার তাঁর সমগ্র দার্শনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়েও একজন সাধারণ শ্রেণীর কবি হয়ে রয়েছেন। গ্যেটের কাব্যপ্রতিভা ছিল ভিন্ন জাতের—আরো, আরো অনেক গভীরে তা হারিয়ে গেছে, মনে হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থল তিনি দেখতে চান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, আত্মানুভূতিতে, আদর্শবাদিতায় গ্যেটে ছিলেন রোমান্টিক মননের সর্বোত্তম উদাহরণ। মনে হত তিনি তাঁর কল্পলোকেই বাস করতেন, তারি কথা লিখতেন—সে জগৎ, সে স্বর্গ ছিল প্রতি আবর্তনেই নূতন, নিয়ে আসত নবীন আদর্শ, অজানা ভাবাবেগ।

গ্যেটের প্রথম নাটক একখানি মধ্যযুগীয় ট্র্যাজেডি, "গোয়েৎস্ ফন্ বর্লিসিজেন্" (Goetz Von Berlichingen)। গোয়েৎস্ ছিলেন সত্যবাদী এবং সাদাসিধা একজন সৈনিক। কৃত্রিম সমাজের উপর গ্যেটে আক্রমণ চালান—বিপরীত চরিত্রকে টেনে এনে আঘাত করে—গ্যেটের এ এক বিদ্রোহ।

গ্যেটের বহু প্রণয়িনী ছিল, তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি, কিন্তু প্রেমে পড়েছেন বহুবার। একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুর প্রেমিকারই প্রেমে পড়েন এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করবার জন্যই তৈরী হলেন। কিন্তু পরিশেষে আত্মহত্যার পরিবর্তে জন্ম নিল বেদনামণ্ডিত এক উপাখ্যান "দ্যা সরোজ্ অব্ ওয়ার্থার" (The Sorrows of Werther—১৭৭৪ খ্রীঃ) এই গ্রন্থ রোমান্টিক কবিদের বাইবেল হয়ে উঠল। এরপরে তিনি বস্তুনির্ভর দু'খানি নাটক লেখেন—"ক্লাভিগো" (Clavigo) এবং "স্টেলা" (Stella—১৭৭৫ খ্রীঃ)।

গোটে তাঁর "ফাউস্ট্" (Faust) নাটক রচনার প্রথম পরিকল্পনা করেন ১৭৭৪ খ্রীঃ এবং এই ট্র্যাজেডিখানির প্রথম খণ্ড শেষ করেন ১৮০৮ খ্রীঃ। ফাউস্ট্ দুই খণ্ডে বিভক্ত, এর দ্বিতীয় খণ্ড কবির মৃত্যুর বছরেই—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। অনেক সমালোচক এর প্রথম খণ্ডকে একখানা সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে ধরেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট—বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্যমাত্র বলে থাকেন তাঁদের এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত ভুল, এই দুই খণ্ড মিলিয়েই সম্পূর্ণ ফাউস্ট্ ট্র্যাজেডি—নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের ম্যামথ আকৃতির মহানাটকের দর্শন যে একেবারে দুর্লভ তা নয়।

আকারের দিক দিয়ে নাটককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—১। মহানাটক (Epic Drama), ২। নাটক, ৩। নাটিকা,—যে নাটকের অঙ্ক সংখ্যা দশ বা ততোধিক এবং সকল প্রকার পতাকা (উপকাহিনী) রয়েছে তাকেই মহানাটকের পর্যায়ে ফেলা হয়। কারণ দশাঙ্ক নাটকের আয়তন ও বিষয়বাহুল্য মহাকাব্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এই অতিকায় প্রজাতির প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষেই পাওয়া যায় তা হল "বালরামায়ণম্"—তারপরেই পশ্চিমে গেটের "ফাউস্ট্"। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডে এই মহানাটকের পুনরাবির্ভাব ঘটে—সেখানে দেখি টমাস্ হার্ডির অনভিনেয় নাটক "দ্যা ডাইন্যাস্টস্" (The Dynasts—৩ খণ্ড) এ নাটকটি বিশাল আকারের, উনিশটি অঙ্কে এবং একশ ত্রিশটি দৃশ্যে উপস্থাপিত—রাজবংশের দশ বছরের ইতিহাস বিধৃত। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন যে ডাইন্যাস্টস্ নাটকখানি পাঠকের মানসলোকেই অভিনীত হওয়ার জন্য—মঞ্চের জন্য নয়। অবিশ্যি দৃশ্যকাব্যকে—"দৃশ্য" নয় বলাতে সমালোচকরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। বার্ণার্ড শ'য়ের "ব্যাক্ টু মেথুসেলা" (Back to Methuselah) মহানাটক সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য—একে আমরা একখানা নাটক না বলে একাধিক নাটকের সমন্বিত রূপ বলতে পারি। শ' নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এ ধরনের নাটক অভিনয়ের জন্য নয় এবং অভিনীত হলেও তা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাধারণ দর্শকদের জন্য তো নয়ই। ফাউস্টেরও অভিনয় যোগ্যতা নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ফাউস্ট্ নাটকখানা মঞ্চে অভিনীত হওয়া সম্ভব নয়। ঘটনা কিন্তু বিপরীত সত্যকেই প্রকাশ করে—ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এমন কি আজকের দিনেও

গ্যেটের ফাউস্ট্‌ নাটকের অভিনয় হতে দেখা যায়, তবে একথাও জোর করে বলা যায় না যে সম্পূর্ণ ফাউস্ট্‌ অভিনয়যোগ্য, কারণ অভিনয়কালে নানা রকম কাটা ছেঁড়া করে তাকে অভিনেয় করে নিতে হয়েছে। আসলে নিখুঁত আঙ্গিকের নাটক লেখার মেজাজই গ্যেটের ছিল না। ফাউস্ট্‌ চিন্তালোকে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ। কবি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সমস্ত জ্ঞানই আয়ত্ত করতে সমর্থ। তিনি স্বয়ং কাব্য, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সব রকম শিল্প-বিদ্যাই শিক্ষা করেছেন—আবার বিজ্ঞানের সমস্ত রকম শাখা, দর্শন ও রাজনীতিতেও ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করেছেন। সকল বিদ্যাতেই তিনি যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তা নয় কিন্তু এই বিচিত্র জ্ঞানের সঞ্চয়—এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁর এক স্বতন্ত্র মানসলোক সৃষ্টি করেছিল। তিনি সেই মানুষকেই দেখেছেন যে অনন্ত পিপাসা, চির জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে। ফাউস্ট্‌ দার্শনিক, কবি, জ্ঞানী ও আংশিকভাবে নাট্যকার গ্যেটের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ। এমন অনেক দৃশ্যই আছে যেখানে গ্যেটে নিজের চিন্তার সঙ্গে খেলা করেছেন এবং আনন্দলোকে বিরাজ করেছেন। তাঁর এই অলৌকিক কল্পনা বিহারই ছিল চরম রোমান্টিসিজমের ফল। অন্যদিকে জ্ঞানের রাজ্যে অভিযাত্রায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আধুনিক। গ্যেটের ফাউস্ট্‌ তাই আর প্রাচীন গ্রাম্য কাহিনীর একজন ম্যাজিসিয়ান মাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধানী চিরন্তন মানবাত্মা।

ভাইমারের রাজসভা তখন ছিল সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এখানকার রাজসভায় গ্যেটে বহুকাল ধরে বহুকর্মেই লিপ্ত ছিলেন। এখানে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অনেক বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন এবং শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিশীলিত রূপ ধারণ করেন। প্রথমে কয়েকটি তিনি শিক্ষামূলক উপন্যাস লেখেন। কিছুকাল মধ্যে ইতালি ভ্রমণান্তে তাঁর দৃষ্টি ক্লাসিক্‌ জগতের দিকে ফেরে—তিনি দু'খানি নাটক লেখেন "ইফিগেনিয়া ইন্‌ তাউরিজ্‌" (Iphigenia in Tauris) এবং "তোরকুয়াতো তাস্‌সো" (Torquato Tasso)।

ইফিগেনিয়া নাটকে তিনি প্রাচীন এট্রুস্‌ বংশের উপর যে অভিশাপ ছিল তা অপসারণের এক ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন, তা হল মানুষ আত্মত্যাগ ও ন্যায়ধর্মের পথেই মুক্তি পেতে পারে। নিখাদ মানবতারই জয়গান করেছেন। গ্যেটে তাঁর কাব্যে বলেছেন—

মাহুষের সমস্ত ভ্রান্তি ও অকৃতকার্যতাই মানবতার তর্পণে পরিশুদ্ধ হয়—

(For each human fault and failure
Pure humanity atones).

তোরকুয়াতো তাস্‌সো ছিল এক সুগভীর মনঃসমীক্ষা মূলক নাটক। সর্বদিক দিয়ে বিচার করে ফাউস্ট্‌ই ছিল গোটের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কীর্তি।

॥ লণ্ডনের ও প্যারিসের রোমান্টিক মেলোড্রামা ॥

ফরাসী বিপ্লবের সমকালে প্যারিসের মঞ্চে চলেছিল জার্মান রোমান্টিসিজমেরই একটি নিম্ন শ্রেণীর অনুকৃতি। ফরাসী দেশে এ যুগটা ছিল আদর্শবাদ ও হিংস্রতার এক চমকপ্রদ বৈপরীত্যের যুগ। এই আদর্শের লোকেরাই ব্যাষ্টিল দুর্গ ভেঙেছিল—তারা জানত রাজতন্ত্রের আতঙ্ক, ভয় ও বেদনা। তাই জার্মানীর রোমান্টিক চিন্তাধারাকে তারা সহজেই স্বাগত জানাল। কিন্তু যুগ-অনিশ্চয়তার জন্যই চিন্তার সেই উর্ধ্বলোকে তারা উঠতে পারল না। সৃষ্টি হল "রোমান্টিক মেলোড্রামার" (Romantic Melodrama) এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন "গিলবার্ট-ডি-পিক্‌জেরেকোর্ট" (Guilbert-de-Pixérécourt)। থিয়েটারের সম্পর্কে এসে তিনি প্রথমাবস্থায় নাট্যরচনার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করেছেন মঞ্চের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে এবং তার দৃশ্যগুণ বাড়িয়ে তোলার জন্য। কিন্তু এরপরে হঠাৎ ১৭৯৭ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ১০০ খানি ছোট বড় নাটক লিখে ফেললেন। তাঁর অর্ধেক নাটকই পরীর কাহিনী নিয়ে সঙ্গীতে রচিত—অনেকটা অপেরা ধরনের। বাকি অর্ধেকে রয়েছে কল্পনার উদ্দামতা।

জার্মান রঙ্গালয়ের প্রভাব ১৭৮৬ খ্রীঃ মধ্যেই লণ্ডনেও ছড়িয়ে পড়ল। নাট্যকার লেসিং, গোটে, শিলার এবং "ইফ্‌ল্যাণ্ডের" (Iffland) নাটকগুলি লণ্ডনে এসে পৌছল। তার অনুবাদ হতে লাগল এবং লণ্ডনের মঞ্চে অভিনয় চলল।

ফরাসী বিপ্লবে প্রভাবান্বিত ইউরোপের রোমান্টিক আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে এসে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ইংরেজী সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর এই রোমান্টিক কবিদের মহান্‌ সৃষ্টিকে আমরা একমাত্র এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গেই তুলনা করতে পারি। কোলরিজ্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শাদী, ব্রাউনিং, শেলী, বায়রণ, কীটস্‌ ইত্যাদি একের পর এক

প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক কবিরা এসেছেন এবং বহু বিচিত্র বিভূষণে কাব্য-লক্ষ্মীকে সুসজ্জিত করেছেন। এই কবিগোষ্ঠী অন্যান্য রোমান্টিক সাহিত্য-কর্মের দিকেও হাত বাড়ালেন। বহু রোমান্টিক উপন্যাস কাব্যরূপ পেতে লাগল এবং মেলোড্রামারও আবির্ভাব ঘটল। রোমান্টিক কবিরা মঞ্চ অধিকার করার জন্য সচেষ্ট হলেন। কোলরিজ্ লিখলেন—"দ্যা ফল্ অব্ রোব্স্পিয়ের" (The Fall of Robespierre) এবং "ওজোরাইও" (Osorio)। বায়রণ রচনা করলেন "সার্ডানাপলাস্" (Sardanapalus) এবং "ম্যান্‌ফ্রেড্" (Manfred)। শেলী লিখলেন "দ্যা চেঞ্চি" (The Cenci), এই নাটকখানিকে ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে মৌলিক শক্তিসম্পন্ন একমাত্র ট্র্যাজেডি বলা যায়। সুইন্‌বার্ণ (Swinburne) ক্লাসিক্ ও রোমান্টিকের মিশ্রিত রূপে নাটক লেখেন। টেনিসন্ লেখেন "হ্যারল্ড্" (Harold), "দ্যা কাপ" (The Cup) এবং "বেকেট" (Becket) ইত্যাদি। রবার্ট ব্রাউনিং রচনা করেন—"স্ট্র্যাফোর্ড" (Strafford), "এ ব্লট্ অন্ দ্যা স্কাচন্" (A Blot on the 'Scutcheon) এবং "কলোম্বজ্ বার্থডে" (Colombe's Birthday)। এছাড়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্—এঁরাও নাট্য রচনা করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই রোমান্টিক কবিদের নাটক অনেক ক্ষেত্রেই মঞ্চ সাফল্যের দিক থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল না। দর্শকরা ছুটত—শেরিডান্ (Sheridan) এবং "এডোয়ার্ড বুলওয়ার্ লীটনের" (Edward Bulwer Lytton) বড় বড় কথায় ভরা "ব্লাঙ্কভার্সের" নাটক দেখতে। এই সব নাটকের অভিনয় ড্রুরি লেনে হয়েছে, "অ্যাস্ট্‌লের" (Astley) অ্যাম্ফি-থিয়েটারে হয়েছে। এখানে একটি সার্কাস রিং-এর পিটকে মঞ্চ করা হয়েছিল—সেখানে দর্শকদের খুব ভিড় হত। প্রচণ্ড যুদ্ধবহুল, দৃশ্যসম্ভারযুক্ত বা মেলোড্রামা শ্রেণীর নাটকের সেখানে অভিনয় হত।

ফ্রান্সে রোমান্টিক চিন্তাধারার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল রুশোর কাল থেকে কিন্তু ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসীদেশ তথাকথিত ক্লাসিকাল রীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করতে পারেনি। ফরাসীদেশে "ভিক্তর্ হ্যুগো" (Victor Hugo) এবং "বড় আলেক্সান্দ্র্ দ্যুমা" (Elder Alexandre Dumas) খাঁটি রোমান্টিসিজমের প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন। এঁদের উপর প্রভাব পড়েছিল—পিক্‌জেরেকোর্টের রোমান্টিক মেলোড্রামার। হ্যুগো রচনা করেন তাঁর ছ'ঘন্টা ব্যাপী নাটক "ক্রোমওয়েল" (Cromwell—১৮২৪ খ্রীঃ)

এবং দ্যুমা রচনা করেন "হেনরী দ্য থার্ড অ্যাণ্ড হিজ্ কোর্ট" (Henry III and His Court—১৮২৯ খ্রীঃ) হ্যুগো এবং দ্যুমা দু'জনারই ঔপন্যাসিক হিসেবে রয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সুতরাং তাঁদের নাট্যপ্রচেষ্টা ছিল খানিকটা পরীক্ষামূলক। হ্যুগোর নাটকে ক্লাসিক্যাল ধারার কিছু ছিল না, ছিল মধুর কাব্য এবং মেলোড্রামা।

স্পেন, রাশিয়া এবং ডেনমার্কেও এই রোমান্টিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। স্পেনের ষোড়শ শতকের নাটকেই আমরা রোমান্টিসিজমের উন্মেষ দেখেছি। সে নাটকের মূল তত্ত্ব ছিল "সম্মান রক্ষা" (Point of Honour) সেজন্য মানুষ কবর থেকেও উঠে এসে প্রতিশোধ নিত। স্পেনে উনবিংশ শতকে "জ্যোস্ জোরিলা ই মোর‍্যাল্" (José Zorrila y Moral) বিখ্যাত প্রণয়ী "ডন্ ইয়ুয়ান্ তেনোরিওর" (Don Juan Tenorio—১৮৪৪ খ্রীঃ) কাহিনী নিয়ে এক নাট্য রচনা করেন।

রাশিয়ায় "আলেক্জেন্দার পুশ্কিন্" ও (Alexander Pushkin) ডন্ ইয়ুয়ান্‌কে নিয়ে নাট্যরচনা করেন। পুশ্কিন্ রোমান্টিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মনোবিশ্লেষক। এছাড়া পুশ্কিন্ শেক্সপীয়রের মত গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে কয়েকখানি নাটক লেখেন।

পুশ্কিন্ ও ফরাসী রোমান্টিক কবিদের কালেই ডেনমার্কে এক কবি নাট্যকারের আবির্ভাব হয়, "অ্যাডাম্ ইলেন শ্লীগার্" (Adam Oehlen Schlaeger) তিনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকথা নিয়ে এবং ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে কতকগুলি কাব্যময় নাটক লেখেন। ইব্‌সেনের প্রথম দিককার নাটকে এই রচনার খুবই প্রভাব পড়েছিল।

॥ ন্যাচারালিজম্ ও রিয়ালিজম্ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় নাট্যকাররা একদিকে ভিক্তর্ হ্যুগোর রোমান্টিসিজম্ অতিক্রম করে এলেন অন্য দিকে তাঁরা পার হয়ে এলেন—কর্ণেয়্ এবং রাসিনের নিও-ক্লাসিসিজম্। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিসিজম্ থিতিয়ে এল। সর্বত্রই যুক্তিবাদ পেতে লাগল পূর্ণাধিকার। থিয়েটারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল মধ্য-বিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তবের মাটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় এবং এই সুনিশ্চিত সতর্ক পদক্ষেপেই তাদের অর্থনৈতিক

ভারসাম্য ও নীতিবাদ টিকে থাকে—তারা শান্তি পায়। অতএব জীবন্ত মানুষগুলিকে যখন মঞ্চে চরিত্রাভিনয় করতে দেখা গেল তারা সেখানে কোন অসম্ভব কল্পনাবিলাসের অবকাশ খুঁজে পেল না। রঙিন স্বপ্ন তারা দেখে না, নিত্য নূতন অভিযানের পথেও তারা পা বাড়ায় না—তাই তারা মঞ্চে চাইল বাস্তব জীবনেরই যুক্তিপূর্ণ কোন রূপকল্প। শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা তাই সুগভীর হয়ে উঠল। যুক্তিবাদের ক্রম-প্রসারের সঙ্গে শিল্পী-সমালোচকদের মনে একটি প্রশ্ন স্বতঃই প্রতিষ্ঠা লাভ করল—তা হল "কলাকৈবল্যবাদ" (Art for Art's Sake)। শিল্পের পরিসমাপ্তি কি শিল্পেরই মধ্যে না তা হবে উদ্দেশ্যমূলক? যাই হোক, এই প্রশ্নের মীমাংসা শিল্পের ক্ষেত্রে কোন দিন হয়নি এবং সম্ভবতঃ তা হবেও না—তবে বলা যায় বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাবের মূল উৎস এখানেই। রিয়ালিজমের যুগে শিল্পকে উদ্দেশ্যমূলকই ভাবা হতে লাগল। বাস্তব জীবনেরই একটি অংশ ঘরের একখানি দেওয়াল সরিয়ে নাট্যকাররা দর্শকদের দেখাতে চাইলেন। "স্ক্রিব্" (Scribe) এবং "সাদু" (Sardou) ইত্যাদির নাটক থেকে যাত্রারম্ভ করে রিয়ালিজমের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ঘটে "ইব্সেনে" (Ibsen), এবং এখান থেকে অন্য বহু "ইজমের" পাশাপাশি এখনও এই রিয়ালিজমের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

রিয়ালিজমের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি কথা প্রায় সমার্থেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। সেটি হল "ন্যাচারালিজম্" (Naturalism)। রিয়ালিজম্‌কে আমরা যদি "বাস্তববাদ" বলি—ন্যাচারালিজম্‌কে বলতে পারি "স্বভাববাদ"। এখানে দু'টি 'বাদে'র ব্যবধানের মধ্য দিয়েই তাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার চেষ্টা করব।

"রিয়ালিজম্" কথাটা অতি সহজ উক্তি। এর আগে পর্যন্ত যাঁরা নাট্যকার ছিলেন তাঁরা মূলতঃ ছিলেন কবি। নাটক কাব্যের ভাষায়ই লিখিত হত—কোথাও কোথাও অবশ্য পদ্যের সঙ্গে গদ্যেরও মিশ্রিত রূপ ছিল। কিন্তু কাব্যেরই ছিল অগ্রাধিকার। এর কারণ ছিল দু'টি। প্রথম কারণ আদি যুগ থেকে কাব্যই ছিল সাহিত্যের ভাষা। নৃত্য এবং গীতে মানুষ প্রথম আত্মভাবাবেগ ব্যক্ত করতে সুরু করে। তারপর থেকে ছন্দোবদ্ধ কথাই সাহিত্যের বাহন হয়ে এসেছে—নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এর আগে পর্যন্ত নাটক তথা থিয়েটার ছিল "নাট্যধর্মী" (Presentational)। তার মধ্যে শিল্পরূপই ছিল প্রধান। জীবনকে যথাযথভাবে

শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলতে চাননি—চেয়েছেন জীবনের ভাবসত্যকে আদর্শ কোন শিল্প অবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে। অতএব সেখানে কাব্যের ভাষায় কোন বাধা ছিল না, উপরন্তু কাব্যের নিজেরই শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা ছিল এবং শ্রোতারা তা গ্রহণ করত। বাস্তবধর্মী নাটক যখন লিখিত হতে লাগল—তখন তা হল "লোকধর্মী" (Representational), তখন এই কাব্যের ভাষাই বাধা স্বরূপ হয়ে উঠল। বাস্তবের রূপ এবং বাস্তবজীবনের সমস্যা দৈনন্দিন জীবনের ভাষাতেই দর্শকদের হৃদয়-গ্রাহ্য হত বেশি, রূপকল্পও ফুটে উঠত পরিচ্ছন্ন ভাবে। দ্বিতীয়তঃ কথাসাহিত্যের ও ছোট গল্পের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে—কাব্যের পাশাপাশি গদ্যও সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠল। নাটকও কাহিনী প্রধান হওয়ায় কথ্য গদ্য ভাষায় লিখিত হতে লাগল। অবিশ্যি এই গদ্য ভাষার বিরুদ্ধবাদীরাও জেগে উঠলেন—ইয়েট্স, টি. এস্ এলিয়ট্, প্রভৃতি কবিরা কাব্যের ভাষায়ই নাটক লিখে তার পুনঃপ্রচার করতে চাইলেন। আধুনিকযুগের দিকে তাকিয়ে একথাই আমরা বলতে পারি গদ্যই বাস্তবধর্মী নাটকের একমাত্র ভাষা হবে এমন কোন সর্ত নেই। তবে রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি—শ্রেষ্ঠ কবিরাই হয়েছেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কিন্তু রিয়ালিজমের যুগে এসে আমরা দেখলাম শ্রেষ্ঠ কবি না হয়েও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হওয়া যায়—যেমন হয়েছেন ইব্সেন এবং তাঁর অনুগামী জর্জ বার্ণার্ড শ'।

বাস্তবধর্মী নাটকের কাল যে বর্তমান যুগই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সে নাটক হ্যানিবলের সময়কারও হতে পারে, যেমন দেখি "শেরউডের" (Sherwood) "দ্যা রোড্ টু রোম" (The Road to Rome) নাটকে। কিন্তু এর চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়া চাই—তাদের কথাও হবে স্বাভাবিক। এছাড়া তাদের মানসগঠন বা মনোবিজ্ঞানও হবে আজকের দিনের মানুষের মানসগঠনের অনুরূপ—যাদের আমরা চিনি, জানি এবং বুঝি। বাস্তবানুগ নাটকে দর্শকদের সামনে মঞ্চে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হবে—তা বাস্তবজীবনে যেমন কার্য কারণের অপ্রতিহত গতিতে ঘটনা সংঘটিত হয় তেমনিই হবে যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত এবং অবশ্যম্ভাবী। এই সর্ত অনুযায়ী রিয়ালিজমের দু'টি কঠিন দায়িত্ব রয়েছে—একটি হল জীবনচেতনা ও অভিব্যক্তির উন্নতি আর অপরটি হল স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করে উত্তেজনামূলক নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করা।

রিয়ালিজম্‌কে চেনা এবং তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সত্যই সহজ। এর মূল-তত্ত্ব হল নাটককে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ জীবনানুগভাবে উপস্থাপিত করা। একে আমরা "ফোর্থ ওয়াল্‌ কনভেন্‌শন্‌" (Fourth Wall Convention) বলে উল্লেখ করতে পারি। অর্থাৎ ঘরের একখানি দেয়াল সরিয়ে চরিত্রগুলির অজানিতে তাদের বাস্তব জীবনযাত্রার একাংশ যেন দর্শকরা উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে। তুলনামূলক আলোচনায় রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা অনেক প্রাচীন। গ্রীসের ক্লাসিকাল নাট্যকারদের মধ্যেও এউরিপিদেস্‌কে রিয়ালিস্ট্‌ বা বাস্তববাদী বলা হয়েছে। "ন্যাচারালিজম্‌" (Naturalism) কথাটি কিন্তু বলতে গেলে মাত্র শতবর্ষ পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে এটা একটি বিশেষ ধারার "প্রকৃতির" অনুগমন অর্থাৎ "ন্যাচারাল্‌নেস্‌" (Naturalness)। ১৮৬৮ সাল থেকে এই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সর্বপ্রথম "এমিল্‌ জোলা" (E´mile Zola) তাঁর উপন্যাসকে এই নামে অভিহিত করেন। "এড্‌মণ্ড" (Edmond) এবং "জুল দ্য গোঁকুরের" (Jules de Goncourt) উপন্যাস এই বিশেষণ পায়—ঔপন্যাসিক জোলা তাঁর নাটকেও এই রীতি প্রয়োগ করেন। জোলার ন্যাচারালিজমের ধারণা এসেছে "চার্লস্‌ ডারউইনের" (Charles Darwin) "অন্‌ দি অরিজিন্‌ অব্‌ স্পেসিস্‌" (On the Origin of Species) নামক গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে। মূলতঃ তা ছিল বংশক্রম ও বিবর্তনবাদের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য জোলার উপর ফরাসী লেখকদের বিশেষ করে রুশো, ভোল্‌তেয়ের বিপ্লবকালীন সমাজতত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তারও প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

ন্যাচারালিজমের দার্শনিক পটভূমি হল—প্রতিটি মানবই বংশক্রম এবং পরিবেশের তথাকথিত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশও আবার জীবজগতে বংশক্রমেরই সৃষ্টি যেমন আমাদের সমাজব্যবস্থা। এই পরিবেশ ও বংশক্রমের দ্বারাই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাহত হয় এবং তারা বেদনাহত, ক্ষতবিক্ষত বঞ্চিত হৃদয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছয়। প্যারিস্‌ নগরীতে সম্রাট দ্বিতীয় লুই নাপোলিঁওর (Louis Napoleon) সময় পাপময় পঙ্কিল জীবনযাত্রার ফলে সমাজজীবনের প্রতি এই নিরাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে এবং এটা একটা তত্ত্ব হিসেবে সাহিত্যের আসরে এসে পড়ে। জোলার কাছে একখানি নাটক বা একখানি উপন্যাস লেখা মানেই ছিল, জীবনকে দেখা এবং তার ঘটনাপঞ্জীর যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করে রাখা। এরমধ্যে

কল্পনা সূত্রে কাহিনী বিন্যাস বা নবতম সত্য আবিষ্কার প্রচেষ্টা ছিল একান্তই অপ্রয়োজনীয়। একটি নাটক মানেই ছিল একখানি বৈজ্ঞানিক নথি বা প্রমাণপত্র। সোজা কথায়—জীবনের একটি নির্ভেজাল অংশ (A slice of life) কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে—জীবনে যা খাঁটি সত্য নাটকে তা খাঁটি শিল্প নাও হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের নাটকগুলিতে চরিত্র এবং তাদের আচার আচরণ ঠিক যেমন তেমনিই তুলে ধরা হয়—শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সাজানো গোছানো—যোগ বিয়োগ করে গড়ে তোলা অপ্রয়োজনীয়। জোলা এবং তাঁর অনুগামীরা কিন্তু একথাটা ভেবে দেখেননি যে, উপন্যাসে যদিও বা চলে দৃশ্যকাব্যে অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে এভাবে অসংস্কৃত বাস্তবকে তুলে ধরা একেবারেই অসম্ভব। সর্বজনবিদিত এমন বহু সত্যই আছে যা হয়তো বা আমরা একা ঘরে বসে পাঠ করতে পারি কিন্তু মঞ্চের উপরে দর্শকদের দৃষ্টি সম্মুখে অভিনেতা অভিনেত্রীরা তা তুলে ধরতে পারেন না। শিল্পের ক্ষেত্রে এ কথা সর্বদাই সত্য যে—বাস্তব পরিলক্ষণ ছাড়াও বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে বাছ বিচার আছে, সাজিয়ে তোলা আছে, আছে কল্পনা ও নবাবিষ্কার এ না হলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না—এবং সেই থিয়েটার দর্শকদের উপর কোন আশাপ্রদ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

জোলা বা গোঁকুরভ্রাতৃদ্বয় যে নাটক লিখেছেন তা যেমন সার্থক ন্যাচারালপন্থী হয়নি, তেমনি নাট্যরূপের দিক দিয়ে হয়েছে অসংযত এবং কিম্ভুতকিমাকার। তবুও এই তিনজনের নাট্য প্রচেষ্টা এবং উপন্যাসের প্রভাব পরবর্তী ফরাসী নাট্যকারদের উপর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু জোলার ন্যাচারালিজম্ এখনও মানুষের মনে সংশয়ে ঘেরা। সাধারণ দর্শক এবং সমালোচকরা এখনও যত্রতত্র "রিয়ালিজম্" কথাটির সঙ্গে "ন্যাচারালিজম্" কথাটি গুলিয়ে ফেলে। তারা অনেক সময় বাস্তববাদ এবং প্রকৃতিবাদ এই শব্দ দু'টি সমার্থেই ব্যবহার করে থাকে।

১৮৫০ সালের পূর্বপর্যন্ত বাস্তববাদী নাট্য রচনার প্রয়াস ফ্রান্সের বাইরেই বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে জার্মানী ও রাশিয়ার অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে "জর্জ বাকনার্" (Georg Büchner) নামে এক তরুণ জার্মান বিপ্লবের প্রচার কার্য ছেড়ে জীবনের শেষের তিন বছর নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। "লিওন্স্ অ্যাণ্ড লেনা" (Leonce and Lena)

আভিজাত্য নিয়ে লেখা তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক নাটক। অতঃপর বাক্‌নার্‌ লেখেন "দাঁতন্‌স্‌ ডেথ্‌" (Danton's Death—১৮৩৫ খ্রী:) নামে একখানা বিয়োগান্ত নাটক। এই নাটকখানি ১৯১৬ সালে "ম্যাক্‌স্‌ রাইনহার্ট" (Max Reinhardt) কর্ত্তৃক একান্ত সার্থক ভাবে প্রযোজিত হয়েছিল। অতি গভীর এই ট্র্যাজেডি—সেকালের সস্তা রোমান্টিক মনোভাব তাতে নেই। তাঁর "ওইচেক্‌" (Woyzeck—১৮৩৬ খ্রী:) নাটকে মনোবিশ্লেষণ মূলক ট্র্যাজেডির আবির্ভাব দেখি—এবং "এক্‌সপ্রেশনিজম্‌" (Expressionism)-এরও প্রথম ইঙ্গিত পাই। এই নাটকখানা বাক্‌নার্‌ অসমাপ্তভাবে কাটাছেঁড়া অবস্থায় রেখে গেছেন বলেই হয়তো তার মধ্যে রিয়ালিজমের সঙ্গে ন্যাচারালিজম্‌ এবং এক্‌সপ্রেশনিজমের ধারণাও মিশ্রিত হয়ে আছে—তার কোন সংশোধনের চেষ্টা হয়নি।

জার্মানীতে "ফ্রিড্‌রিশ্‌ হেবেল" (Friedrich Hebbel) কাব্যের ভাষায় ঐতিহাসিক নাটক রচনা ছেড়ে দিয়ে রিয়ালিস্টিক্‌ ট্র্যাজেডি লেখা সুরু করেন। তার মধ্যে ন্যাচারালিজমের অগ্রগামী পদধ্বনি শোনা যায়। এই শ্রেণীর তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক ছিল—"মারিয়া মড্‌লেনা" (Maria Magdalena—১৮৪৪ খ্রী:) জার্মানীতে শিলার এবং "হাউপ্‌ট্‌ম্যানের" (Hauptmann) মধ্যবর্ত্তী কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই ছিলেন এই হেবেল। বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে তিনি তিনখানি প্রখ্যাত ট্র্যাজেডি রচনা করেন তা হল "জুডিথ্‌" (Judith—১৮৪১ খ্রী:), "হেরড্‌ অ্যাণ্ড ম্যারিয়ামনী" (Herod and Mariamne—১৮৫০ খ্রী:) এবং "ডি নাইবেলাঙ্গেন্‌" (Die Nibelungen—১৮৬২ খ্রী:) কিন্তু তাঁব প্রধান কীর্ত্তিই ছিল রিয়ালিজমের অগ্রদূত হিসেবে।

রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার এবং সেন্‌সর বহু রাশিয়ান নাট্যকারকেই স্যাটায়ার্‌ এবং কমেডির দিকে প্রধাবিত করেছিল। এই সমস্ত নাটকে রিয়ালিজমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল আজগুবী সব কল্পনা। আঠারশ বিশ শতকে এ ধরনের নাটক লেখেন "আলেক্‌জাণ্ডার গ্রীবয়েদভ্‌" (Alexander Griboyedov) "উও ফ্রম্‌ উইট্‌" (Woe from Wit) এবং "নিকোলাই গোগোল" (Nikolai Gogol) লেখেন—"দি ইন্সপেক্‌টর্‌ জেনারাল্‌" (The Inspector General), "দ্যা গ্যাম্ব্‌লার্‌স্‌ (The Gamblers) ইত্যাদি নাটক। এগুলি ত্রিশ থেকে চল্লিশ দশকে লেখা। ১৮৪৬ সালে "আলেক্‌জাণ্ডার অস্ট্রোভ্‌স্কি" (Alexander Ostrovsky) মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে কয়েকখানি

রিয়ালিস্টিক্ কমেডি লেখেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "এনাফ্ স্টুপিডিটি ইন্ এভরি ওয়াইজ্ ম্যান্" (Enough Stupidity in Every Wise Man) এবং "দ্যা ব্যাংক্রাপ্ট্" (The Bankrupt)। অস্ট্রোভ্স্কির "দ্যা থাণ্ডারস্টর্ম" (The Thunderstorm) এবং "টুর্গেনিভের" (Turgenev) "এ মান্থ ইন্ দ্যা কান্ট্রি" (A Month in the Country) প্রকৃতই বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিল কিন্তু তারা ইব্‌সেনের নাটকের মত নিখুঁতভাবে বিরচিত নয়। তাঁদের এই নাটকের প্রভাব পরবর্তীকালে "আন্তন্ চেখভের" (Anton Chekhov) উপর পড়েছিল।

রিয়ালিজমের আন্দোলন জার্মানী ও রাশিয়া ছাড়িয়ে অতঃপর ফরাসী দেশে ছড়িয়ে পড়ে। "ওনরে দ্য বাল্‌জাক্‌কেই" (Honoré de Balzac) ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট্ বলা যায়। যদিও জোলা তাঁকে প্রথমে ন্যাচারালিস্ট্ নামেই অভিহিত করেন। বাল্‌জাক্ প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক—তিনি তাঁর বহুসংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই নাটকগুলি রচনা করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে ১৮৪৮ সালে লেখা "দ্যা স্টেপ্‌মাদার্ বা লা মারাত্র্" (La Marâtre) নাটকখানিই ছিল শ্রেষ্ঠ রচনা। সম্ভবতঃ এই নাটকখানি থেকেই উৎসাহ পেয়ে টুর্গেনিভ্ তাঁর প্রখ্যাত নাটক "এ মান্থ ইন্ দ্যা কান্ট্রি" লেখেন। ১৮৫১ খ্রীঃ বাল্‌জাকের "মারকাডেট্" এবং "দ্যা জবার্" (Mercadet and the Jobber) নাটক রচিত হয়। এই সময় ছোট ডুমা তাঁর "লা দাম্ ও কামেলিয়া" (La Dame aux Camélias) নামক উপন্যাসখানিকে "কামিল্" (Camille) নামে নাট্যরূপ দেন।

ফরাসীদেশে এই সময়ে অন্যতম রিয়ালিস্ট্ নাট্যকার ছিলেন "এমিল্ ওজিয়ে" (E´mile Augier)। তিনি রিয়ালিজমের দিকে পুরোপুরি ফেরার আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে কতকগুলি কাব্য-নাট্য লেখেন। প্রথম দিকে ওজিয়ে "দ্যা ম্যারিজ্ অব্ অলিম্পিয়া" বা "ল্য মারিয়াজ্ দ্য' লিম্প্" (Le Mariage d'Olympe) লেখেন—তারপরে ডুমার সঙ্গে ওজিয়ে যুক্ত হয়ে কতকগুলো সমাজ সংস্কার মূলক "থিসিস্ প্লেজ্" (Thesis Plays) রচনা করেন। দু'জনার নাটকের মধ্যেই যৌন বঞ্চনা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। ডুমা লেখেন "দ্যা ইলেজিটিমেট্ সান্" (The Illegitimate Son) ইত্যাদি নাটক। ১৮৫৪ সালে ওজিয়ে লেখেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক—"দ্যা সান্ ইন্ ল

অব্ মসিয়ে পোয়ারিয়ে" বা "ল্যা জন্‌দ্রা দ্য মেসিয়্ পোয়ারিয়ে" (Le Gendre de M. Poirier) এখানা একখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত ব্যক্তি এবং তার অলস অভিজাত জামাতাকে নিয়ে রচিত ব্যঙ্গাত্মক কমেডি। ওজিয়ে এবং দ্যুমা এঁরা পথপ্রদর্শক হলেও কেউই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাস্তববাদিতায় পৌঁছতে পারেন নি—যেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ইব্‌সেন ও তাঁর অনুবর্তীরা।

আধুনিক থিয়েটার বিংশ শতাব্দীতে এসে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। তার একটি হল নাট্য প্রযোজনায় রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি হল তথাকথিত "আধুনিক স্টেজ ক্রাফ্‌টের" (New Stage Craft) প্রবর্তন—যা একাধারে বাস্তবধর্মী এবং কল্পনাসম্ভূত নাটককে সহায়তা করবে। এই দু'টি রীতিই পুরোপুরি অস্তিত্ব নিয়ে এসে মঞ্চে দেখা দিল ১৯০৫ সাল থেকে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাস্তবানুগ থিয়েটারের আগেই এসেছেন বাস্তববাদী নাট্যকারগণ। এই জন্যই নাটক ও নাট্যকারদের আলোচনা আমাদের পূর্বাহ্নে করে নিতে হচ্ছে। অভিনেতারা অভিনয় করবার জন্য এবং দর্শকরা তা গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হওয়ার আগেই আমরা দেখতে পাই নাট্যকারদের হাতে এই শ্রেণীর নাটক পূর্ণপ্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা জোলা এবং গোঁকুর থেকে আরম্ভ করে ইব্‌সেন এবং স্ট্রিণ্ডবার্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউই সমালোচকদের হাতে রেহাই পাননি—যার জন্য তাঁদের গভীর হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পরিচালক "আঁদ্রে আঁতোয়ান্" (André Antoine) তাঁর "তেয়াত্র লিব্রতে" (Théâtre Libre) ন্যাচারালিস্টিক্ এবং রিয়ালিস্টিক্ নাটকের প্রযোজনার উদ্দেশ্যে জোলার উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে ইব্‌সেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপ্‌ট্‌ম্যান্ সকলেরই নাটক মঞ্চস্থ করেন। আঁতোয়ানের মঞ্চ উপস্থাপনা এই সমস্ত নাট্যকারদের প্যারিসে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে।

॥ জার্মানীর ফ্রি থিয়েটার ॥

আঁতোয়ানের প্রভাব ফরাসী মঞ্চের চেয়ে জার্মান রঙ্গমঞ্চের উপরই বেশি পড়েছিল। জার্মানীতেও থিয়েটার দর্শকদের অর্থে চলত। "অটো ব্রাহ্‌ম্" (Otto Brahm) আঁতোয়ানের অনুসরণ করে নিজস্ব থিয়েটারে পেশাদারী

অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল রসিক দর্শকদেরই বার্ষিক চাঁদার উপর টিকিট বিক্রি করতেন। ব্রাহ্‌ম্ সৌখিন অভিনেতাদের চেয়ে পেশাদারী অভিনেতাদেরই বেশি পছন্দ করতেন—কারণ তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মাত্রায়, যোগ্য ভূমিকায় কাজ পাওয়া যেত। তিনি ছোট হল্ ভাড়া না নিয়ে রবিবার বিকেলে কোন বড ভাল হল্ টাকা দিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়ে নিতেন। আঁতোয়ানের মত ব্রাহ্‌ম্ ও আশা করতেন যে, তিনি যে এই সমস্ত নূতন নাট্যকারদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—এর ফলে পেশাদার মঞ্চও অতঃপর তাঁদের গ্রহণ করবে।

ব্রাহ্‌ম্ "গোস্ট্‌স্" (Ghosts) দিয়েই তাঁর পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনা সুরু করেন কিন্তু পরে তা বার্লিনে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমশঃ বার্লিন থিয়েটারের রুচি পাল্টাল। এক নূতন নাট্যামোদীর দল "নিউ ফ্রি পিপ্‌ল্‌স স্টেজ" (New Free People's Stage) সৃষ্টি করলেন, এই সমিতির সভ্যসংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৫০,০০০ তাঁরা নিজেরাই রঙ্গালয় তৈরী করলেন।

এবার আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান যুগের প্রখ্যাত নাট্যকারদের নাট্যকীর্তির কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

॥ হাউপ্‌ট্‌ম্যান্ থেকে ওয়েদেকাঁদ্ ॥

"হাউপ্‌ট্‌ম্যান্" (Hauptmann) ভাস্কর্য ছেড়ে নাট্য রচনা করতে আসেন ১৮৮৯ খ্রীঃ এবং নাট্য রচনা চালিয়ে যান ১৯৪৬ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর রচনা বৈচিত্র্যে এবং গুণাগুণে ছিল বহুধারার। কিন্তু সবসময়ই তিনি তাঁর রচনার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে গিয়েছেন। তিনি শ্রমিক-শ্রেণীর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নিয়ে "বিফোর্ সান্‌রাইজ" (Before Sunrise) নাটক লেখেন। এরপরে তাদের সার্বজনীন বেদনা রূপ পায় "দ্য উইভার্স" (The Weavers) নাটকে। কৃষকদের জীবন কথা নিয়ে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক হল "রোজ্ বার্ণড্" (Rose Bernd), তিনি ইব্‌সেনের ধারা অনুসরণ করে লেখেন "লোন্‌লি লাইভ্‌স্" (Lonely Lives) এবং "মাইকেল ক্র্যামার্" (Michael Kramer)। তাঁর রচিত কমেডি হল "দ্য বীভর্ কোট বা ডের্ বীবরপেলৎস্" (The Beaver Coat or Der Biberpelz), তাঁর ঐতিহাসিক নাটক হল "ফ্লোরিয়ান্ গেয়ার্" (Florian Geyer) এবং "দ্য হোয়াইট্ রিডীমার বা ডের্ উইস হেইলাণ্ড" (The White Redeemer or Der

Weisse Heiland)। এ ছাড়া তিনি কাব্যধর্মী নাটক লেখেন "হানেল্" (Hannele) এবং তাঁর ইঙ্গিতধর্মী নাটক হল "দ্যা সান্‌কেন্ বেল্ বা ডি ভার্‌সাঙ্কেনে গ্লক্" (The Sunken Bell or Die Versunkene Glocke)।

গেরহার্ট হাউপ্‌ট্‌ম্যানের পরে অনেক জার্মান নাট্যকারই এই পন্থায় নাট্যরচনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন "ফ্রাঙ্ক ওয়েদেকাঁদ্" (Frank Wedekind) তিনিও স্ট্রিণ্ডবার্গের মত যৌন-ট্র্যাজেডির প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ১৮৯০ সালে তিনি লেখেন "দ্যা ওয়ার্ল্‌ড্ অব্ ইউথ্" (The World of Youth) এবং পর বৎসর লেখেন—"দি অ্যাওয়েকেনিং অব্ স্প্রিং" (The Awakening of Spring) নাটক দু'টির মাঝে ওয়েদেকাঁদ্ অপ্রাপ্ত বয়স্ক অভিভাবকহীনদের যৌন সমস্যা ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর "প্যাণ্ডোরাজ্ বক্স" (Pandora's Box—১৯০২ খ্রী:) নাটকখানিতে দুর্দমনীয় যৌন আকাঙ্ক্ষার ভয়াবহ পরিণতি রূপ পেয়েছে। ওয়েদেকাঁদের নাটকগুলি যেমন নৈতিক শিক্ষাদায়ক তেমনি আবার বিষাদঘন ও পীড়াদায়ক। তাঁর নাটকগুলিতে "প্রকৃতিবাদ" (Naturalism) "বাস্তববাদ" (Realism) এবং তার সঙ্গে কিছুটা বিংশ শতাব্দীর "অভিব্যক্তিবাদ" (Expressionism) মিশ্রিত হয়ে আছে। যেমন "দি অ্যাওয়েকেনিং অব্ স্প্রিং" ট্র্যাজেডিখানাকে বাইরের দিক থেকে বাস্তব বলে মনে হবে—কিন্তু এ একটা যুক্তিহীন বিমূঢ়তার মধ্যে শেষ হল যখন দেখি দুই বালক-বীর কবর থেকে উঠে এসে অন্যদের আত্মহত্যায় প্রণোদিত করছে। আবার "এ মাস্কড্ ম্যান্" (A Masked Man) নাটকে দেখি জীবনের প্রতীকধর্মী প্রকাশ।

॥ শ্নীজ্‌লার এবং অস্ট্রিয়ানরা ॥

বিংশ শতাব্দীর সুরুতে অস্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন "আর্থার শ্নীজ্‌লার" (Arthur Schnitzler) তিনি কমেডি এবং ট্র্যাজেডি উভয়শ্রেণীর নাটকই লেখেন। তাঁর প্রথম রচনা ১৮৯৩ সালে একখানি আনন্দঘন, অবকাশ বিনোদনযোগ্য একাঙ্ক নাটক—"আনাতোল্" (Anatol) দু' বছর বাদে আসে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি "লাইট্ ও'লাভ্" (Liebelei or Light o' Love)। তাঁর আর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক তৈরী হয় ১৮৯৮ সালে "দ্যা গ্রীন্ কোক্যাটু বা ডের্ গ্রূয়েন্ কাকাডু" (The Green Cockatoo : Der Grüne Kakadu), শ্নীজ্‌লারের "দ্যা লোন্‌লি ওয়ে" (The Lonely Way) একখানি

চমৎকার প্রহসনের নাটক। সেকালের ফ্যাশান দুরন্ত ভদ্রলোকের মুখে যা একান্তই শোভা পেত না, সেই কথা আমরা নাট্যকারের মুখে শুনি "ভালবাসা মানেই অপর কারো জন্য বেঁচে থাকা" (To love is to live for some one else)।

এই বিষাদাত্মক ধারার পরে ভিয়েনাবাসী 'হেরম্যান্ বার্' (Hermann Bahr) কমেডির দিকে ফেরেন এবং তরুণ নাপোলিওঁর জীবন নিয়ে "জোসেফাইন্" (Josephine—১৮৯৮ খ্রী:) নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

॥ লণ্ডনের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট্ থিয়েটার ॥

একজন ডাচ্ এসে লণ্ডনে "ফ্রি থিয়েটারের" পরিকল্পনা করেন। ব্রাহ্মের মতই "জে টি. গ্রেইন্" (J.T. Grein) ছিলেন এই নব আন্দোলনের নেতা। গ্রেইন্ "উইলিয়ম্ আর্চার্" (William Archer), "জর্জ মুর" (George Moor) প্রভৃতি নাট্যকার ও নাট্যবিদ্‌দের মধ্যে বিশ শতকের নবধারা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন। ব্রাহ্মের মত গ্রেইন্‌ও অবশ্যি গোস্টস্ নাটকের অভিনয় দিয়ে যাত্রা সুরু করেন এবং অচিরকাল মধ্যে কয়েকশত আলোচনা, সমালোচনা, ও চিঠির কশাঘাত লাভ করেন। কিন্তু তিনি থামলেন না এরপরে ধরলেন জোলার "তেরেস্ রাকাঁ" (Thérèse Raquin) অবশেষে এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট্ থিয়েটার ১৮৯২ খ্রী: জর্জ বার্ণার্ড শ'র প্রথম নাটক "উইডোয়ার্স্ হাউজেসের" (Widowers' Houses) অভিনয় করে। এই ভাবে ব্রাহ্ম্ যা করেছিলেন হাউপ্ট্‌ম্যানের জন্য গ্রেইন্ তাই করলেন শ' এর জন্য। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী নাট্যকারকে তাঁর দেশবাসীর কাছে পরিচিত করিয়ে দিলেন। গ্রেইন্ তাঁর পরবর্তী নাটক ধরেন ইব্‌সেনের দ্যা ওয়াইল্ড ডাক্।

॥ ইব্‌সেন ও বিয়র্ণসন্ ॥

ইব্‌সেন ও বিয়র্ণসন্ এই দুই মহারথীর আলোচনা আমাদের ধারাবাহিক ভাবে করতে গেলে কিছু আগেই করা উচিত ছিল। কারণ ইব্‌সেনের কাল ছিল ১৮২৮ সাল থেকে ১৯০৬ সাল এবং বিয়র্ণসনের সময় ছিল ১৮৩২ থেকে ১৯১০ সাল। কিন্তু নাট্য জগতে এঁরা যে ভূকম্পন এবং আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন তার প্রভাব উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ থেকে আজ

পর্যন্ত—অর্থাৎ শতবর্ষোপরি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সুতরাং রচনাকাল ধরে এঁদের ক্রমানুসরণের চেষ্টা নিরর্থক। আঁতোয়ান্ তাঁর তেয়াত্র লিব্র খোলার পূর্বেই নূতনধারার বাস্তববাদী নাটক লেখা হতে থাকে। এই নব আন্দোলনের প্রথম উদ্গাতা ছিলেন "হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন" (Henrik Ibsen) এবং "বিয়র্ণস্তার্ণ বিয়র্ণসন্" (Bjornstjerne Bjornson) এঁরা দু'জনই জন্মেছেন নরওয়ের প্রত্যন্তে।

এই দুই স্কাণ্ডিনেভিয়ান্ নাট্যকারই তাঁদের সাহিত্য-জীবন প্রথম সুরু করেন ঐতিহাসিক ও কাব্যধর্মী নাট্য রচনা দিয়ে। যা তৎকালীন নরওয়ের দর্শকদের কাছে অতিপ্রিয় ছিল। বিয়র্ণসন্ ছিলেন, একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সংবাদপত্রের এডিটর্ ইত্যাদি। ইব্‌সেনের "দ্যা লীগ্ অব্ ইউথ্" (The League of Youth—১৮৬৯ খ্রী:) এবং "দ্যা পিলারস অব্ সোসাইটি" (The Pillars of Society—১৮৭৭ খ্রী:) লিখিত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বেই বিয়র্ণসন্ রিয়ালিজমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দু'জনই ছিলেন বিদ্রোহী। বিয়র্ণসন্ রাজনৈতিকদলের নেতা ছিলেন এবং ইব্‌সেন কিছুকালের জন্য সোশ্যালিস্ট্ ছিলেন। এঁরা দু'জনই তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক পাপের উপর আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের উভয়ের মেজাজ ছিল ভিন্ন। বিয়র্ণসন্ তাঁর "এ ব্যাংক্রাপ্ট্‌সি" (A Bankruptcy) নাটক এক অসৎ ব্যবসায়ীকে নিয়ে লেখেন—আর তাঁর "এ গণ্ট্‌লেট্" (A Gauntlet) নাটকে তুলে ধরেন নৈতিক সমস্যা। এই সমস্ত সুচিন্তিত বাস্তব সমস্যা তুলে ধরলেও বিয়র্ণসন্ নাটকের পরিসমাপ্তি সুখময় করতেন যা ইব্‌সেনের মধ্যে ছিল না, তিনি বাইরের সৌষ্ঠবময় পর্দাটা ছিন্ন করে—অতি নির্মম সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন—এবং তার চরম পরিণতি দেখিয়েছেন। ইব্‌সেন বেশি জোর দিয়েছেন মনোবিশ্লেষণ এবং চরিত্রের গভীরতার উপরে। বিয়র্ণসনের রচনা তুলনায় অনেক অগভীর স্তরের ছিল। তবুও স্বদেশে বিয়র্ণসন্ ছিলেন ইব্‌সেনের ভ্রাতৃকল্প বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। বরং বলা যায় স্বদেশে বিয়র্ণসন্‌ই ইব্‌সেনের চেয়ে বেশি মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছেন। দু'জনার দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের কারণ কৈশোরে ও যৌবনে দু'জনার দুই ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া। আশাবাদী বিয়র্ণসন্ ধনী পিতামাতার সন্তান ছিলেন। নরওয়ের একটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা এলাকায় সুখে লালিত হয়েছেন। ইব্‌সেনের

পিতামাতার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে যখন তাঁর মাত্র ৮ বছর বয়স। যখন তাঁর ১৫ বছর বয়স তখন তাঁকে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয় এক মফঃস্বল শহরে একজন ঔষধ প্রস্তুতকারীর কাছে। সমগ্র পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন। এই নিরাশা ও বেদনা তাঁর উত্তরকালের রচনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৫৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৫ খ্রীঃ মধ্যে বিয়র্ণসন্ বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক নাটক ও কাব্য লেখেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা স্কাণ্ডিনেভিয়ার বাইরেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সময়েই ইব্‌সেন প্রাচীন নরওয়ের কতকগুলি ব্যালাড্ ও স্যাগা নিয়ে কাব্য-নাট্য রচনা করেন—যেমন "দ্যা ভাইকিংস্ অ্যাট্ হেলগেল্যাণ্ড" (The Vikings at Helgeland—১৮৫৮ খ্রীঃ) এবং "দ্যা প্রিটেণ্ডারস্" (The Pretenders—১৮৬৪ খ্রীঃ)। এঁদের মধ্যকালীন রচনাই ছিল বলিষ্ঠ বাস্তববাদী শেষের দিকে তাঁদের ঝোঁক যায় সামাজিক মূল্যবোধ ও আত্মিকতার দিকে। বিয়র্ণসনের শেষের দিকের শ্রেষ্ঠতম নাটক হল—"বিয়ণ্ড্ হিউম্যান্ পাওয়ার্" (Beyond Human Power—১৮৮৩ খ্রীঃ)। ইব্‌সেন তাঁর "দ্যা মাস্টার বিল্ডার্" (The Master Builder—১৮৯২ খ্রীঃ) থেকে সুরু করে "লিট্‌ল্ ইয়োল্‌ফে" (*Little Eyolf*—১৮৯৪ খ্রীঃ) একটু একটু করে "সিম্বলিজম্" (Symbolism) বা প্রতীকধর্মিতার দিকে ঘুরে যেতে থাকেন। ইব্‌সেনের দু'খানা নারীচরিত্র প্রধান প্রখ্যাত ট্র্যাজেডি হল "দ্যা লেডি ফ্রম্ দ্যা সী" (The Lady from the Sea—১৮৮৮ খ্রীঃ) এবং "হেড্‌ডা গাব্‌লার্" (Hedda Gabler—১৮৯০ খ্রীঃ)।

আধুনিক নাট্য ইতিহাসে দু'খানি নাটক নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা হয়েছে—তার একদিকে অনুরাগ এবং অন্যদিকে বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে। দু'খানাই হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের—একখানা "এ ডল্‌স্ হাউজ্" (A Doll's House or Et dukkehjem—১৮৭৯ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়খানা "গোস্টস্" (Ghosts or Gengangere—১৮৮১ খ্রীঃ)। এই নাটক দু'টির বিশদ আলোচনায় আমরা যেতে চাই না। কেবল ইব্‌সেনের প্রধান অনুগামী বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার বার্নার্ড শ'র দৃষ্টি ভঙ্গিতে এর বৈশিষ্ট্যটুকু তুলে ধরতে চাই। এই ধরনের আধুনিক নাটক যা "স্ক্রিব্" (Scribe) এবং "সাদু" (Sardou) থেকে আরম্ভ করে ইব্‌সেনে এসে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে—এ নাটকের প্লট্ সম্পর্কে শ' বলেছেন, "You have exposition,

situation and discussion"। শ' এর মতে প্রকৃত আধুনিক নাটক তখনি জন্মলাভ করল যখন "নোরা" (Nora) তার স্বামীকে বসতে এবং তাদের বিবাহ সম্পর্কে মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য করল। ডল্‌স্ হাউজের এই শেষ দৃশ্যে আসার আগে পর্যন্ত ঘটনার গতি অত্যন্ত সাধারণ—মোড় ঘুরে সেটা মোলোড্রামা হতে পারত কিংবা ক্রাইম্ ড্রামাও হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু শেষ দৃশ্যের একটা বিশেষ জায়গায় এসে অপরিণত বুদ্ধি, আদরিণী নোরা যখন পরিণত বয়সের স্থিতধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুখোমুখী আলোচনায় বসল তখন সমস্ত পরিস্থিতিই মুহূর্তে পাল্টে গেল—ভয়ে সমাজের অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠল।

ইব্‌সেনের নাটক আধুনিক এবং বাস্তববাদী—বাস্তবের হুবহু চিত্রাঙ্কনের জন্য নয়। ইব্‌সেনে এসেই আমরা দ্বিধাহীনভাবে বুঝতে পারলাম রিয়ালিজম্ কেবল "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" নয়। পরিবেশের বাস্তবতার বাইরেও আছে সমাজ সত্য, আছে জীবন সত্য, আছে মানস গঠন এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অমোঘ স্বীকৃতি। আধুনিক কালের মনোবিশ্লেষণে দেখা যায় আমরা একের পর এক স্বার্থ, অর্থ অনেক কিছুই বলি দিতে পারি কিন্তু যখন আমার "অহম্" (Ego) নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—যখন দেখি আমার ব্যক্তিসত্তা পরম অবহেলিত, অপমানিত তখন এ সংসারকেও আমার সংসার; পিতা, পুত্র, স্বামীকে আমার বলে ভাববার কোন অবকাশ থাকে না। এ খেলা ভেঙ্গে যায়। নোরা ও টোর্‌ভাল্‌ডের যখন আলোচনা হচ্ছে—টোর্‌ভাল্‌ড্ জিজ্ঞেস করল—

টোর: তুমি কি এখানে সুখী নও?

নোরা: না, শুধু খুশী।

সে তার কারণ ব্যাখ্যা করল:—

—"আমাদের এ গৃহ একটি খেলাঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে পুতুলের মত আমি তোমার খেলনা স্ত্রী, যেমন বাড়িতে ছিলাম বাবার খেলনা সন্তান। আর আমার সন্তানরা এখন আমার খেলনা। আমার খুব কৌতুক লাগে যখন তুমি আমার সঙ্গে খেলা কর, যেমন আমার সন্তানরা খুশী হয় যখন আমি তাদের সঙ্গে খেলা করি। এই হল আমাদের বিবাহ টোর্‌ভাল্‌ড্।"

সুতরাং যে নাটক শেষের কয়েকটি লাইন বাদ দিলে বাস্তব জীবনের

একটি অতি সাধারণ চিত্র ধারণ করত, সেই নাটকই নোরা এবং টোর্‌ভাল্‌ডের নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে—এবং শেষ বিচ্ছেদে, আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নূতন আলোক সম্পাত করল—তাকে ভিন্ন সুরে বেঁধে দিল। "গোস্টস্‌" নাটকেও আমরা দেখি এই বিপ্লবাত্মক বিশ্লেষণী আলোচনার রীতি। নাটকের এই নূতন গঠন প্রকৃতি নিয়ে শ' বলেছেন :—

"আমার কয়েকটি নাটককে নিয়েই আমরা এখন এমন নাটক পেলাম যা আরম্ভ হয় আলোচনায় এবং শেষ হয় কর্মে, এবং আর কতকগুলি নাটকে আলোচনাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যের ব্যাখ্যা করছে।"[১]

তাই আমরা বলতে পারি আধুনিক নাটকের এক নূতন যুগারম্ভ হল ইব্‌সেন থেকেই। যার মূল তাৎপর্য—সমাজকে এবং ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ও যুক্তিবাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করা।

॥ স্ট্রিণ্ডবার্গ ॥

স্কাণ্ডিনেভিয়া আধুনিক থিয়েটারকে আর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উপহার দিয়েছে—তিনি "সুইড্‌ অগাস্ট্‌ স্ট্রিণ্ডবার্গ" (Swede August Strindberg)। ইব্‌সেন ও বিয়র্ণসনের যদিও একপুরুষ পরে স্ট্রিণ্ডবার্গ এসেছেন, তবুও তিনি পুরোধাদের মতই ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক নাট্য-রচনা দিয়ে তাঁর যাত্রা সুরু করেন, মধ্যাবস্থায় রিয়ালিজমে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব জীবনের ইঙ্গিতধর্মী রূপ দিতে থাকেন—যা তাঁকে ক্রমশঃ অভিব্যক্তিবাদের (Expressionism) দিকে নিয়ে যায়। আধুনিক যুগের নাট্যেতিহাসে তাই স্ট্রিণ্ডবার্গকে বলা হয়—অভিব্যক্তিবাদের অগ্রদূত। তাঁর প্রতিভা ইব্‌সেন ও বিয়র্ণসনের চাইতে বেশি পরিমাণে বহুমুখী ছিল। তিনি নাট্যপরিচালনা ছাড়াও দু'টো রঙ্গালয়ের ম্যানেজার ছিলেন এবং ছোট বড় প্রায় ৫০ খানি নাটক লেখেন। মঞ্চ প্রয়োগপদ্ধতির উপরেও তিনি অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, ইতিহাস এবং নিজের জীবনচরিতও লেখেন। তাঁর জীবনচরিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, মনে হয় তিনি যেন নীলাভ আলোয় মনো-বিজ্ঞানীর কৌচে গা এলিয়ে আছেন।

স্ট্রিণ্ডবার্গের শৈশব ও কৈশোরকাল বহু অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য এবং

পারিবারিক জীবনে পিতামাতার উপর অবিশ্বাসে কেটেছে—যার ফলে তিনি স্বয়ং মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। এরই প্রভাবে তাঁর নাটকে এসেছে সুবিপুল গভীরতা, অসংযত ঔদ্ধত্য, অভিনব বিশ্লেষণ এবং মানসিক সমস্যা। অন্য দু'জন নরওয়েবাসী নাট্যকারের সঙ্গে তাঁর মৌলিক ব্যবধান নির্দেশ করে সমালোচকেরা বলেছেন—

তিনি তাঁর বাস্তববাদের যুগে এবং বিশেষ করেই শেষের দিকের রচনায়, ক্রমেই অনেক বেশি গভীরতা এবং প্রচণ্ডতা নিয়ে লিখেছেন। তিনি জীবনের উপকরণ ব্যাখ্যা করেছেন, রূপান্তরিত করেছেন যা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউ পারেন নি। তাঁর প্রতিভার মধ্যে ছিল একটু পাগলামির খাদ।

স্ট্রিণ্ডবার্গের রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রবল নারী বিদ্বেষ। তাঁর "দ্যা ফাদার্" (The Father—১৮৮৭ খ্রী:) নাটক থেকে সুরু করে "কম্‌রেডস্", (Comrades—১৮৮৮ খ্রী:), "ক্রেডিটরস্" (Creditors), "দ্যা স্ট্রংগার্" (The Stronger—১৮৯০ খ্রী:) এবং অন্যান্য নাটকগুলির অংশ বিশেষে দেখা যায় যে, —তাঁর বিচিত্র নারীচরিত্রগুলি পুরুষকে সব সময়ই কামনা করে এবং বিবাহের মধ্য দিয়ে অথবা বাইরে থেকে তাদের ধ্বংস করে। এই বিষয়-বস্তুতেই তিনি তাঁর সকল শৈল্পিক প্রতিভা এবং ভয়ংকরতা প্রয়োগ করেন। তাঁর মানসিক ব্যাধির কাল থেকে আরম্ভ করে ১৯১২ খ্রী: ক্যানসারে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বহু ধরনের বিষয় নিয়েই নাটক লেখেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক আছে "গুস্তাভাজ্ ভাসা" (Gustavus Vasa—১৮৯৯ খ্রী:), যৌন দ্বন্দ্বমূলক নাটক "দ্যা ডান্স্ অব্ ডেথ্" (The Dance of Death), ধর্মীয় এবং সিম্বলিক্ নাটক হল—"ইস্টার্" (Easter—১৯০১ খ্রী:), এ ছাড়াও অন্যান্য প্রখ্যাত নাটক "দ্যা ড্রিম্ প্লে" (The Dream Play—১৯০২ খ্রী:), তিন খণ্ডে ১৮৯৮ এবং ১৯০৪ সালে লেখা "টুওয়ার্ড ডামাস্কাস্" (Toward Damascus), "দ্যা স্পুক্ সোনাটা" (The Spook Sonata—১৯০৭ খ্রী:) ইত্যাদি। তাঁর নাটকের মধ্যে জীবনকে মূলত: ধ্বংসাত্মক দেখানো হয়েছে, এর প্রাবল্য জার্মান অভিব্যক্তিবাদী ওয়েদেকাঁদের চেয়েও বেশি।

স্ট্রিণ্ডবার্গই সেই নাট্যকার যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকারোক্তি করেছেন—তিনি ভগবানের খোঁজে বেরিয়ে শয়তানকে পেয়েছেন। তবুও তাঁর প্রতিভা ছিল অনস্বীকার্য, আধুনিক যুগের অনেক সমালোচক এবং শ্রেষ্ঠ দু'জন

নাট্যকারের কাছ থেকেও তিনি উত্তপ্ত প্রশংসা পেয়েছেন—যা ইবসেনের ভাগ্যেও জোটেনি। "জুনো অ্যাণ্ড দ্য পেকক্" (Juno and the Paycock) নাটকের রচয়িতা "ও' কেজী" (O' Casey) উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখেছেন,—

: স্ট্রিণ্ডবার্গ, স্ট্রিণ্ডবার্গ, স্ট্রিণ্ডবার্গ তাঁদের সকলের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ।· স্ট্রিণ্ডবার্গ জীবন্ত গ্রহ থেকে, স্থির নক্ষত্র থেকে আলোর শিখা ঝরিয়েছেন। ইবসেন শান্ত ভাবে যখন তাঁব "ডল্‌স্-হাউজে" বসে থাকেন স্ট্রিণ্ডবার্গ তখন স্বর্গ ও নরক জুড়ে আলোড়ন তোলেন :

নাট্যকার "ও' নীল" (O' Neill) বলেছেন—

তিনিই হলেন আমাদের বর্তমান থিয়েটারে সমস্ত আধুনিকতার অগ্রদূত। (The Precursor of all modernity in our present theater)।

এবং স্ট্রিণ্ডবার্গ সম্পর্কে ইবসেন স্বয়ং অভিমত জানিয়েছেন—সেই একজনই আছেন, যিনি আমার চেয়ে বড়। (There is one who will be greater than I)।

স্ট্রিণ্ডবার্গ তাঁর নাটকের মধ্যে বাইরেব এবং পরিবেশের দ্বন্দ্বের চেয়েও প্রধান করে তুলেছেন মনস্তত্ত্বমূলক দ্বন্দ্বকে। এই মনেব দ্বন্দ্বই পরস্পবের আলোচনা পর্যালোচনা ও যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশক হয়ে উঠেছে। স্ট্রিণ্ডবার্গের দ্য ফাদার্ নাটক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে—নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং সংলাপ দুই-ই পবস্পবকে ভেঙ্গে চুরে যুগপৎ ক্লাইম্যাক্সে উঠছে. এখানে কার্যই যেন চিন্তা এবং চিন্তাই যেন কার্য।

॥ বাশিয়া ॥

রাশিয়া থেকে এ সময়ে তিনজন শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা হলেন "তল্‌স্তয়" (Tolstoy), "চেখভ্" (Chekhov) এবং "গোর্কি" (Gorky), এঁদের তিনজনের সৃজনকর্মই বর্তমান কালের অন্যতম ইতিহাস প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান "দ্য মস্কো আর্ট থিয়েটারের" (The Moscow Art Theater) সঙ্গে নিবিড় ভাবে বিজড়িত। ১৮৯১ সালে এর দু'জন পরিচালকের একজন—"কন্‌স্তান্তিন্ স্তানিস্লাভ্‌স্কি" (Constantin Stanislavsky) তখনও তিনি ছিলেন একজন সৌখিন পরিচালক মাত্র—তিনি তল্‌স্তয়ের বিদ্রূপাত্মক কমেডি—"দ্য ফ্রুট্‌স্ অব এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের" (The Fruits of Enlightenment—১৮৯১ খ্রী:) পরিচালনা করেন। তল্‌স্তয়ের

প্রথম প্রখ্যাত নাটক হল কৃষক জীবনের একখানি প্রোজ্জ্বল চিত্র—"দ্যা পাওয়ার অব্ ডার্কনেস্" (The Power of Darkness), এখানি লেখা হয়েছিল আঁতোয়ানের তেয়াত্র লিব্র তৈরী হওয়ার পূর্বেই। এই নাটকটি মস্কো আর্ট থিয়েটারে স্তানিস্লাভ্স্কিই প্রথম পরিচালনা করেন কিন্তু অসফল হন। এর পরে স্তানিস্লাভ্স্কি মস্কো আর্ট থিয়েটারে চেখভের "দ্যা সী গাল্" (The Sea Gull—১৮৯৮ খ্রীঃ) নাটকের প্রযোজনা করে দারুণ সাফল্য অর্জন করেন। চেখভ্ থেকে এই রঙ্গালয় গোর্কির দিকে ফিরল এবং তাঁর শক্তিশালী ট্র্যাজেডি "দ্যা লোয়ার ডেফ্থস্কে" (The Lower Depths) মঞ্চস্থ করল।

আধুনিক যে কোন রঙ্গালয়ের চেয়েই মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্পর্কে অনেক বেশি লেখা ও আলোচনা হয়েছে। কন্স্তান্তিন্ স্তানিস্লাভ্স্কি অর্থশালী পিতামাতার সন্তান ছিলেন; তাঁরা তাঁকে গ্রামের বাড়িতে একটি ছোট কাঠের থিয়েটার (Log Cabin Theater) গড়ে দিয়েছিলেন এবং অন্য আর একটি রঙ্গালয় করে দিয়েছিলেন "মস্কো টাউন্ হাউজে" যেখানে তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় করতেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ তিনি "সোসাইটি অব্ লিটারেচার্ অ্যাণ্ড আর্ট" (Society of Literature and Art) স্থাপনে সাহায্য করেন। এরপরে আমরা জানি যে "ভ্লাদিমির্ নেমিরোভিচ্ ডান্‌চেন্‌কোর" (Vladimir Nemirovitch Danchenko) সঙ্গে শিল্পীদের একটি প্রখ্যাত রেস্টুরেণ্টে স্তানিস্লাভ্স্কির দেখা হয় এবং সেখানে ১৫ ঘণ্টার আলোচনায় তাঁরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের পরিকল্পনা ও খসড়া তৈরী করেন। ক্রমে এই দুই নাট্যবিদের চেষ্টায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের ছাত্ররা এবং সৌখিন অভিনেতারা বহু অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে থিয়েটার শিল্পের শিক্ষা লাভ করতে থাকে। আমরা যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য প্রযোজনা রীতিকে "দ্যা স্তানিস্লাভ্স্কি মেথড্" (The stanislavsky Method) বলে জানি তার মূল কথা একটি উক্তির সাহায্যে অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে—

"...Not to achieve the surface aspects of naturalism, but to capture and convey what Stanislavsky described as the truth of feeling and experience."—অর্থাৎ বাইরের পরিবেশকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরলেই বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয় হয় না। সেগুলো হল শুধুমাত্র

প্রাণহীন উপকরণ। অভিনেতাকে নিজের মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের সাহায্যে আন্তর আবেগগুলি অনুভব করতে হবে এবং তা প্রকাশ করতে হবে। মস্কো আর্ট থিয়েটার যে নব পদ্ধতি সৃষ্টি করল যাকে বলা যায় নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা তাতে স্তানিস্লাভ্স্কি ও ডান্‌চেন্‌কোর মত একই সঙ্গে বহু পেশাদারী এবং সৌখিন অভিনেতা এসে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বহু অভিনেতা এবং পরিচালকই উত্তরকালে বিরাট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এঁদের অনেককে আমরা বিপ্লবোত্তর কালে ১৯২২-২৩ সালে রাশিয়া ছেড়ে নিউইয়র্কবাসী হতে দেখেছি।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত যখন কোন প্রতিষ্ঠান অতি উন্নত এবং নিখুঁত বিস্তৃত আকার ধারণ করে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে পরিচালিত হয়, তখন তার বহু বিষয়ই সমালোচকদের চোখে অবহেলিত হয়। আঁতোয়ান্ যে আর্থিক সুযোগ পাননি—স্তানিস্লাভ্স্কি এবং ডান্‌চেন্‌কো উচ্চ শ্রেণীর এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের পারিবারিক দিক থেকে এবং উচ্চতর বুর্জোয়া সমাজের দিক থেকেও সেই আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। তাছাড়া "সাভ্ভা মোরোজভ্" (Savva Morozov) নামে একজন পৃষ্ঠপোষক চেখভের বই অভিনয় হওয়ার পূবে রঙ্গালয় পুনর্গঠনের জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন

মস্কোরই অন্যতম থিয়েটার "পিপল্‌স্ থিয়েটারসের" (People's theaters) ম্যানেজার ছিলেন "লেণ্টভ্স্কি" (Lentovsky), তাঁরই বিশেষ উৎসাহে তলস্তয় তাঁর "দ্যা পাওয়ার্ অব্ ডার্কনেস্" নাটকখানি লেখেন, অভিনয়কালে তা সেন্‌সরে বাধা পেল এবং পরে স্তানিস্লাভ্স্কি ও ডান্‌চেন্‌কোর শক্তিশালী রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ নাটকের আর অভিনয় হয়নি। লেণ্টভ্স্কিই প্রথম অভিনেতাদের স্বেচ্ছাধীন আবোল তাবোল অভিনয়ের মাঝে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পরিচালকের ভূমিকা কাজে লাগান। এ ছাড়া রাশিয়ার রঙ্গালয়ে তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুতালোক নিয়ে আসেন। আমরা একথাই বলতে চাই যে, কোন একটি প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার পূর্বে অখ্যাত অবজ্ঞাত বহুলোককেই—"সলতে পাকানোর" কাজটি করে যেতে হয়।

ডান্‌চেন্‌কো নিজে অভিনেতা না হওয়ায়, কিংবা হয়তো বা স্তানিস্লাভ্স্কি "মাই লাইফ্ ইন্ আর্ট" (My life in Art) গ্রন্থ লিখে নিজের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের ইতিহাসে

নাটকখানিতে সমাজকে অন্য দিক দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। এক ধনী ব্যবসায়ী ক্যানসারে মরণোন্মুখ, তিনি চারদিকে ত্রস্ত, নির্বোধ, দুর্নীতি-পরায়ণ বন্ধু পরিবৃত হয়ে রয়েছেন, বাইরের রাস্তা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলশেভিক্ বিপ্লবীদল গান করে চলেছে—তাই শুনে ইগরের শেষ প্রখ্যাত উক্তি হল,—আমার কবর সঙ্গীত, আমাকে গান গেয়ে পরলোকের পথে এগিয়ে দিচ্ছে (the burial service—singing me out of the world)। এই নাটকখানির গঠন পদ্ধতিতে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য রয়েছে—এখানি একদিকে যেমন প্রতীকধর্মী অন্যদিকে তেমনি বলিষ্ঠ বাস্তব চরিত্র সমন্বিত, একদিকে যেমন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রাঙ্কন রয়েছে অন্যদিকে তাই আবার সমষ্টির রেখাচিত্র হয়ে উঠেছে।

আঁতোয়ান্ কিংবা ব্রাহ্ম্, স্তানিস্লাভ্স্কি কিংবা ডান্চেন্কো এঁরা কেউ নাটক রূপায়িত করবার জন্য থাকুন আর নাই থাকুন—"লীও তলস্তয়" (Leo Tolstoy) একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হতেনই, তিনি চারখানা মাত্র নাটক লেখেন। তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস "ওয়ার্ অ্যাণ্ড পীস্" (War and Peace) গ্রন্থখানিরও নাট্য রূপ দেন—এখানির জন্য তিনি বিশ্বজোড়া সম্মান অর্জন করেন। তাঁর প্রথম নাটকখানির উল্লেখ করেছি "দ্যা পাওয়ার্ অব্ ডার্কনেস্" এ নাটকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিষণ্ণ কৃষক জীবন তুলে ধরা হয়েছে—তাঁর দ্বিতীয় নাটক "দ্যা ফ্রুট্স্ অব্ এন্লাইটেন্মেন্টে" (The Fruits of Enlightenment—১৮৯১ খ্রীঃ) এক গ্রাম্য ভদ্রলোককে বিদ্রূপ করা হয়েছে। তৃতীয় নাটক "রিডেম্শন্" (Redemption or The Living Corpse—১৯১১ খ্রীঃ) একখানি শক্তিশালী করুণরসাত্মক নাটক। তাঁর শেষ নাটক "দ্যাট্ শাইন্স্ ইন্ ডার্কনেস্" (That Shines in Darkness) এখানি অসমাপ্ত ছিল—এর মধ্যে তিনি এক ধনী পরিবারের অপ্রয়োজনীয়তা ও ট্র্যাজেডি ফুটিয়ে তোলেন এবং তার সঙ্গে বৈপরীত্য দেখান এক উপবাসক্লিষ্ট কৃষক পরিবারের। তলস্তয় ছিলেন মুখ্যতঃ ঔপন্যাসিক তাই নাট্যরচনা করতে গিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দ মানস বিহারে বাধা পেয়েছেন ফলে স্থানে স্থানে নাটকের আঙ্গিকে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব নাটকের চরিত্রগুলির মাঝে এমন এক গভীরতার সৃষ্টি করেছে—দৃশ্যগুলিকে এমন গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছে, যা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই অভিনব ও দুর্লভ।

॥ ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড ॥

ইউরোপ জুড়ে তখন রিয়ালিজমের আন্দোলন চলছে—নিউ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—ফ্রান্সে আঁতোয়ান্, জার্মানীতে ব্রাহ্ম্ এঁদেরই অনুসরণে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা হয়ে এলেন "জে. টি. গ্রেইন্" (J. T Grein)। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "ইন্ডিপেণ্ডেন্ট্ থিয়েটার" (Independent Theatre) স্থাপন করেন। গ্রেইনেরই প্রদর্শিত পথে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে বিভিন্ন থিয়েটার স্থাপিত হতে থাকে—ম্যাঞ্চেস্টারে স্থাপিত হয় "রেপার্টরি কম্প্যানী" (Repertory Company), ডাবলিনে "দি অ্যাবি থিয়েটার" (The Abbey Theatre) তাছাড়া দেখা দেয় দ্যা কোর্ট থিয়েটার, দ্যা স্টেজ সোসাইটি এবং অন্যান্য রেপার্টরি গোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে দু'জন নারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"লেডি গ্রেগরি" (Lady Gregory) এবং "মিস্ এ. ই এফ্. হর্নিম্যান্" (Miss. A.E. F. Horniman) তাঁরা ডাবলিনে, ম্যাঞ্চেস্টারে এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ শহরে অভিনয় করে বেড়ান। আঁতোয়ান্ প্রদর্শিত বাস্তববাদী প্রয়োগশৈলীর পন্থা অনুসরণ করার জন্য এই সব মঞ্চ অত্যন্ত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল।

আইরিশ নাট্যকাররা মঞ্চের দিকে ফিরলেন—কারণ তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অ্যাবি থিয়েটাব প্রস্তুতই ছিল। "সিঞ্জ্" Synge) থেকে "ও' কেজী" (O' Casey) পর্যন্ত সকল নাট্যকারই আইরিশ জীবন নিয়ে নাটক লেখেন। "ইয়েট্স" (Yeats) এই দলের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন কিন্তু তাঁর কাব্যধর্মী নাটকের ধারা এঁদের সঙ্গে ঠিক মিলত না। নাটক তখন কাব্য ছেড়ে গদ্যের ভাষায়ই রিয়ালিজমের দিকে এগিয়ে চলেছিল, ইয়েট্স ছিলেন বিপরীত-পথগামী।

রিয়ালিজমের আর একটি ধারা ১৮৮০ সালে "হেনরী আর্থার জোন্স্" (Henry Arthur Jones) এবং "আর্থার উইঙ্গ পিনেরো" (Arthur Wing Pinero) এই দু'জন নাট্যকার ব্রিটিশ নাটকে নিয়ে আসেন। দু'জনেই কিছুটা হয়তো ইব্সেনের কাছ থেকে নিয়েছেন কিন্তু বেশি অংশ নিয়েছেন ফ্রান্সের ওয়েল-মেড্-প্লে থেকে। জোন্স্ ১৮৯০ সালের কাছাকাছি যথেষ্ট সচেতন ভাবেই লেখনী ধরে রচনা করেন "মাইকেল অ্যাণ্ড হিজ লস্ট্

সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই জোর করেই বুদ্ধি ও মানবতার প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। জ্ঞানী এবং নিষ্পাপদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কোথাও অস্বীকার করা যায় না। শ' ছিলেন গভীর চিন্তাশীল এবং স্বপ্ন দেখেছেন পরিপূর্ণ মানবতার—তাঁর এই সুন্দর স্বপ্ন বেশিরভাগ অপূর্ণই রয়ে গেছে। শ' এর মধ্যে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল সেই গুণাবলী দিয়ে একজন ভাল সমালোচক ও প্রবন্ধকার হওয়া যেত কিন্তু এ সব কিছুর মধ্যে অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে মোৎসার্টের সঙ্গীত—এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং মানবিকতার দার্শনিক চিন্তা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হওয়ার পথ দেখিয়েছে।

শ' সঙ্গীত ছাড়াও বহু পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা এবং নাটকের সমালোচনা করতে থাকেন। দ্য সাটার্‌ডে রিভিউতে লেখা তাঁর নাট্য-সমালোচনাগুলোই পরে "ড্রামাটিক্ ওপিনিয়ন অ্যাণ্ড এসেজ্" (Dramatic Opinion and Essays) নামে প্রখ্যাত গ্রন্থরূপে গ্রথিত হয়।

উইডোয়াবস্ হাউজেজ্ রচনার পরে ১৮৯৪ খ্রী: তিনি "আর্মস্ অ্যাণ্ড দ্য ম্যান্" (Arms and the Man) নাটকখানি লেখেন। এই নাটকখানির মধ্যে পাশাপাশি দু'টো সত্যের উপরই কঠিন আঘাত হেনে তিনি তাদের নির্মোক খসিয়েছেন, একটা হল যুদ্ধ সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণা এবং অন্যটি হল ভালবাসা সম্পর্কে রোমান্টিক কল্পনা। এরপরে তিনি "মিসেস্ ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন্" (Mrs Warren's Profession—১৮৯৮ খ্রী:) লেখেন। বেশ্যা-বৃত্তির উপরে এই নাটকখানি লেখাকালে শ' সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাধিক শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্রগুলিই ব্যবহার করেন। বেশ্যাবৃত্তির মূল উৎস নারীজাতির অসংযত কামনা নয়—আর্থিক অসঙ্গতি। কামানের গোলার মত এই কঠিন সত্য সমাজের মুখের উপর তিনি ছুড়ে দিয়েছেন। সমাজে নারী পুরুষ সকলেই যদি সৎভাবে উপার্জনের পথ পায় তা হলে পাপের পথও রোধ হয়। ইবসেনের নোরা বহু বেদনার পথ অতিক্রম করে জীবনের চরম সত্যে উপনীত হয়েছিল—শ' এর "ক্যান্‌ডিডা" (Candida—১৮৯৫ খ্রী:) নাটকের নায়িকা ক্যান্‌ডিডা জন্মকাল থেকেই মুক্ত সমাজের স্বাধীন নারীর সত্তা নিয়ে এসেছে। ক্যান্‌ডিডা আধুনিক কালের নবজাগরিত নারী যে প্রাচীন সমাজ-সংস্কার ভেঙে দেয়, কিন্তু ওরি মধ্যে তার চিরন্তন নারী সত্তাকে চিনতে দেরি হয় না। শ' এর বিদ্রূপাত্মক প্রতিভা এই নাটকে প্রোজ্জ্বল।

শেক্সপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ' কয়েকখানা ঐতিহাসিক নাটকও লেখেন এই নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক দিয়ে কিছুটা শিথিলভাবে গ্রথিত। একখানি ছোট কমেডি "দ্যা ম্যান্ অব্ ডেস্টিনি" (The Man of Destiny); নাটকখানায় নাপোলিঅঁর চরিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে তিনি কত সাধারণ বুদ্ধির—কিন্তু নির্দয়, কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। "সীজার্ অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা" (Cæsar and Cleopatra—১৮৯৯ খ্রী:) ট্র্যাজিক্-কমেডিখানির নাটকীয় দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে সীজার্ ও পম্পেঈ, ক্লিওপাট্রা ও তার ভাই এবং জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বার্ণার্ড শ' এর নিজস্ব রীতিই প্রকটিত হয়েছে তা হল প্রথিতযশা ঐতিহাসিক চরিত্রের বহু প্রচলিত আবরণ ছিন্ন করে তাদের রোমাঞ্চহীন চাকচিক্যহীন সাধারণ চেহারাটি তুলে ধরা।

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "ম্যান্ অ্যাণ্ড সুপারম্যান্" (Man and Superman) রচিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বলা যায় এই নাটকখানি নাটকাকারে দার্শনিক তত্ত্ব। এই কমেডিখানার বাইরের দিকে প্রেমের দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা সকলি রয়েছে কিন্তু তার অভ্যন্তর থেকে ফুটে উঠেছে সুগভীর চিন্তাশীলতা। গৃহের ভালবাসা মানুষের পূর্ণসত্তার অংশমাত্রকেই কেবল তৃপ্ত করতে পারে—বলা যায় একই সঙ্গে এই নাটকখানা মানুষের দার্শনিক উপলব্ধি ও ভালবাসার কাহিনী। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "পিগ্ম্যালিয়ন্" (Pygmalion) ও "অ্যাণ্ড্রোক্লেস্ অ্যাণ্ড দ্যা লায়ন্" (Androcles and the Lion) নাটক দু'খানা লেখেন। পিগ্ম্যালিয়ন্ একখানা সামাজিক ব্যঙ্গ—এতে এক গ্রাম্য ফুলওয়ালীকে গড়ে পিটে অভিজাত রমণী করে তোলা হয়েছে। যে সংস্কৃতি এবং বৈভব নিয়ে আমরা এতই মত্ত আসলে তার কোন সুগভীর মৌলিক ভিত্তি নেই, সকলি পরিবেশগত। তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নাটক হল—"দ্যা গ্রেট্ ক্যাথেরিন্" (The Great Catherine), "মেজর্ বারবারা" (Major Barbara), "ইউ নেভার্ ক্যান্ টেল্" (You Never Can Tell—১৮৯৮ খ্রী:), "দ্যা ডেভিল্স্ ডিসাইপ্‌ল্" (The Devil's Disciple—১৮৯৭ খ্রী:) ইত্যাদি।

তাঁর এই সমস্ত নাটকগুলি একের পর এক প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সবগুলিই মঞ্চে সমান সাফল্য অর্জন করেনি। বরং বলা যায় সুধীজনের পাঠ্য নাটক হিসেবে এগুলি যেমন যুগিয়েছে চিন্তার খোরাক তেমনি

হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ। সমসাময়িক কালে মঞ্চে যখন "গল্‌স্‌ওয়র্দির" (Galsworthy) সামাজিক সমস্যামূলক নাটক "দ্যা সিল্‌ভার্‌ বক্স" (The Silver Box—১৯০৬ খ্রী:), "জাস্টিস্‌" (Justice—১৯১০ খ্রী:), "দ্যা স্কিন্‌ গেম্‌" (The Skin Game) প্রভৃতি নাটক একের'পর এক সাফল্য অর্জন করেছে তখনও তুলনামূলকভাবে শ' এর নাটক মঞ্চে অসফলই ছিল।

শ' এর মাত্র দু'বছর পূর্বে ডাবলিনে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে "অসকার্‌ ওয়াইল্ডের" (Oscar Wilde) জন্ম হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর চারখানা নাটকের মঞ্চাভিনয় দেখে গেছেন। লণ্ডন শহর ওয়াইল্ডের বৈরাগ্যধর্মী, অসূয়ক সংলাপের বিশেষ অনুরাগী ছিল। যা সবচেয়ে উন্নত রূপ পেয়েছিল তাঁর "দি ইম্‌পর্ট্যান্স্‌ অব্‌ বিইং আর্নেস্ট্‌" (The Importance of Being Earnest —১৮৯৫ খ্রী:) নাটকে। এ সময়ে দর্শকরা তাঁর কৃত্রিম কাহিনীমূলক নাটক "লেডি উইণ্ডারমিয়ারস্‌ ফ্যান্‌" (Lady Windermere's Fan—১৮৯২ খ্রী:), "এ উম্যান্‌ অব্‌ নো ইম্‌পর্ট্যান্স" (A Woman of No Importance—১৮৯২ খ্রী:), "অ্যান্‌ আইডিয়্যাল্‌ হাজ্‌ব্যাণ্ড" (An Ideal Husband—১৮৯৫ খ্রী:) প্রভৃতি নাটকগুলিকে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। "সমরসেট্‌ মম্‌" (Somerset Maugham) ও সমকালে কয়েকখানা বাস্তবপন্থী নাটক লেখেন। তবুও একথা অবিসংবাদী সত্য যে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে শ'ই হলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সমগ্র ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে শেক্‌সপীয়রের পরেই শ' এর স্থান।

॥ আমেরিকা ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন নাট্যধারার স্রোত আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায় যে সমস্ত নাট্যকাররা খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন "ক্লাইড্‌ ফিচ্‌" (Clyde Fitch), তিনি দু'খানা নাটক লেখেন তা ছিল অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর কমেডি। অন্যদিকে "অগাস্টাস্‌ টমাস্‌" (Augustus Thomas) লেখেন কয়েকখানা মেলোড্রামা, "ল্যাঙ্ডোন্‌ মিচেলের" (Langdon Mitchell) বহু উপন্যাসও নাট্যরূপ পেয়েছিল এবং মঞ্চে সাফল্য অর্জন করেছিল। এ সময়ে আর একজন ক্ষমতাশালী নাট্যকার আসেন তিনি হলেন "উইলিয়ম্‌ মুডী" (William Moody)। "ডরিস্‌ কীন্‌"

(Dores Keane) লেখেন পাঁচখানি নাটক—"এলমার্ রাইস্" ও (Elmer Rice) নাট্য রচনা করতে আরম্ভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বলা যায় আমেরিকায় যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে মূলতঃ তা ইউরোপীয় নাটকের ছাঁচে ইউরোপীয় জীবন ও পরিবেশকেই রূপ দিয়েছে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকায় এমন কয়েকজন নাট্যকার এলেন যাঁরা খাঁটি আমেরিকানদের জীবন নিয়ে নাট্যরচনা করতে বসলেন এবং একটি নূতন যুগের সূচনা করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন—"সিডনী হাউয়ার্ড" (Sidney Howard), "জর্জ কাউফম্যান্" (George Kaufman), "রবার্ট শেরউড্" (Robert Sherwood), "পল্ গ্রীন" (Paul Green), "লিলিয়ান্ হেলম্যান্" (Lillian Hellman) এবং এলমার্ রাইস্—কিন্তু এঁদের সকলের মধ্যে "ইউজিন্ ও'নীলের" (Eugene O' Neill) এমনি এক অনন্য প্রতিভা ছিল যে তিনি নিজেকে সর্বোত্তম বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

॥ ইউজিন্ ও' নীল ॥

ইউজিন্ ও' নীলের জন্ম হয় ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম যৌবনে তিনি দীর্ঘদিন ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে স্যানাটরিয়ামে শয্যাগত ছিলেন—মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের জটিল তাৎপর্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন সব রকম ক্লাসিকাল নাটক তো পড়েনই তার সঙ্গে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েন ইব্‌সেন, ওয়েদেকাঁদ্ স্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারদের নাটক। এই নাটকগুলির কেবল বিষয়বস্তু নয় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ত্রিশোর্ধে এসে তিনি নাট্যকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। "প্রভিন্স্ টাউন্ প্লে হাউজে" (Province town Playhouse—১৯১৬ খ্রী:) তাঁর একটি ছোট একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়—নাটকটির নাম ছিল "বাউণ্ড্ ইস্ট্ ফর্ কার্ডিফ্" (Bound East for Cardiff—১৯১৪ খ্রী:)। ১৯:৮ সালে তাঁর "বিয়ণ্ড্ দ্যা হরাইজন্" (Beyond the Horizon) নাটকের অভিনয় হয় ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রভিন্স্ টাউন্ প্লে হাউজ্ ও "গ্রীনউইচ্ ভিলেজ্ থিয়েটার" (Greenwich Village Theatre) ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি "রবার্ট এড্‌মণ্ড জোন্স্" (Robert Edmond Jones) এবং "কেনেথ্

ম্যাক্‌গোউয়নের" (Kenneth Macgowan) "থিয়েটার গিল্ডের" (Theatre Guild) প্রধান নাট্যকার রূপে দেখা দেন এবং সমগ্র আমেরিকাবাসীর কাছে পরিচিত হন। এর পরে তাঁর নাটকের আমেরিকা ও আমেরিকার বাইরে সংখ্যাতীত অভিনয় হয়। ১৯৩৬ সালে নোবেল্ পুরস্কার তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন করে তোলে—তিনিই একমাত্র আমেরিকান নাট্যকার যিনি এই সম্মান পেলেন। ও'নীল ছিলেন খাঁটি আমেরিকান—তাদেরি মত থিয়েটার জগতে আকাশচুম্বী-সৌধ নির্মাণ করেন। ও'নীল শেক্‌সপীয়রের প্রখ্যাত উক্তির বিপরীত সত্যকেই প্রমাণ করলেন—শেক্‌সপীয়র এই জগৎকেই নাট্যশালা বলেছেন (all the world's a stage) ও'নীল জগতের সকল বৈচিত্র্যকেই রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরলেন। স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি থাকলে জীবনের সকল তথ্যকেই মঞ্চে প্রতিভাত করা যায় তা দর্শকদের তিনি প্রত্যক্ষ করালেন। একের পরে এক নব নব পথ তিনি পরিক্রমা করে চললেন—প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী তারপরে "দ্যা ফাউণ্টেইন্" (The Fountain) নাটকে গতি বদলান রোমাণ্টিসিজমে, আসে সিম্বলিজম্ "দ্যা হেয়ারি এপ্" ও "দ্যা গ্রেট্ গড ব্রাউন" নাটকে ; তারপরে মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাসধর্মী নাটক লেখেন স্ট্রেঞ্জ্ ইন্টারলুড—যিনি এমন বিশ্ব পরিক্রমা করেন শিল্পের জগতে তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনার কখন অভাব হয় না।

ও'নীলের বিয়ণ্ড্ দ্যা হরাইজন্ আধুনিক থিয়েটার জগতে অন্যতম শ্লেষপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা। রবার্ট (Robert) এবং এন্‌ড্রু (Andrew) দুই ভাই—রুথ (Ruth) এদের মধ্যে রবার্টকেই জীবনের যোগ্য অংশীদার বলে বেছে নিল এবং বিবাহ করল। রবার্ট দেশে রয়ে গেল—চাষবাস দেখতে লাগল এন্‌ড্রু করল সমুদ্রযাত্রা। কিছুকালবাদে অশান্তির ঝড় উঠল—রবার্ট যথেষ্ট স্বচ্ছন্দে রাখবার মত টাকা উপার্জন করতে পারছিল না, রুথের ভালবাসাও তাই জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল, সে জানাল এন্‌ড্রুকেই সে প্রকৃত ভালবাসে—রবার্টকে নয়। ক্রমান্বয়ে তাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। "ডিফ'রেণ্ট্" (Diff'rent) নাটকখানি লেখেন ১৯২০ সালে—অত্যন্ত কঠিন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানুষের অবদমিত ইচ্ছাগুলি মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি করে—তারি ব্যাখ্যা রয়েছে এ নাটকে।

"অল্ গড্‌স্ চিল্লান্ গট্ উইংস্" (All God's Chillun Got Wings —১৯২৩ খ্রীঃ) এটি নিগ্রোদের সমস্যা নিয়ে রচিত নাটক। এই নাটকখানিতে

একটি নিগ্রোর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনীর বিবাহ দেখানো হয়েছে—নাটকখানি আমেরিকার চারদিকে আলোড়ন তোলে ও বিতর্কের ঝড় ওঠে। "ডিজায়ার্ আণ্ডার্ দি এল্‌মস্" (Desire Under The Elms—১৯২৪ খ্রী:) নাটকের মধ্যে ফুটে উঠেছে মানুষের জমির জন্য চিরন্তন আকাঙ্খা। জমি চাইলেই পাওয়া যায় না আর তাতে ফসল ফলানোও সহজ নয়। নাটকের প্রধান চরিত্র এফরেইম্ ক্যাবট্ (Ephraim Cabot) বহু পরিশ্রমে পাথুরে জমিতে ফসল ফলিয়েছে। সে পাগলের মত এই জমি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়—পাহারা দেয়। তার এই সম্পদের জোরেই বৃদ্ধ বয়সে এক তরুণীকে বিবাহ করল। কিন্তু শান্তি নেই, প্রথম পক্ষের পুত্র ও তরুণী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস—নবজাতক পুত্র সম্পর্কে সন্দেহ—এই নাটকের ট্র্যাজেডিকে ক্রমশ: ঘনীভূত করে তুলেছে। এই নাটকের চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপ দুই-ই অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্যে বিষয় উৎকর্ষ ও গঠন সৌকর্যের জন্য এ নাটকখানি সর্বোচ্চ আসন পাবে। ও'নীল তাঁর নাটকে বরাবরই বাস্তবধর্মিতা আঁকড়ে থাকেননি সত্য কিন্তু তিনিই এ ধারার আমেরিকান নাটকের খাঁটি পথ প্রদর্শক।

"দ্যা এম্পেরর্ জোন্‌স্" (The Emperor Jones—১৯২০ খ্রী:) অভিব্যক্তিবাদী নাটক। এ নাটকের মধ্যে পূর্বপুরুষার্জিত আদিম ভয় কাজ করছে। এ নাটকখানাকে অনেক সময়ই লেখকের পশ্চাদ্‌গামিতা বলে মনে করা হয়, কিন্তু এক সময় এ নাটক বিরাট আলোড়ন তুলেছিল।

"দ্যা হেয়ারি এপ্ (The Hairy Ape—১৯২১ খ্রী:) নাটকখানিও একখানা এক্‌সপ্রেশনিস্টিক বা অভিব্যক্তিবাদী নাটক। ইয়াংক্ (Yank) জাহাজের ইঞ্জিনে কয়লা দেয় সে নিজেকে অ্যাটলাসের সমতুল্য শক্তিমান বলে ভাবে, তার ধারণা এত বড় জাহাজটা সে-ই চালায়। জাহাজেই সে দেখতে পায় মিল্‌ড্রেড্‌কে (Mildred) সে সুপুরুষ, সংস্কৃতিবান, অর্থশালী—সবদিকেই পরিপূর্ণ জীবন—কুদর্শন, অশিক্ষিত, খালাসী ইয়াংক্ এতদিনে নিজের হীনতা উপলব্ধি করতে পারল এবং চাকরি ছেড়ে দিল। এই অর্ধপশু এবারে ঢুকল এক কারখানায়—পরিবেশের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছায় সে কারখানাটি ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু সহকর্মীদের বাধায় তা পেরে উঠল না। শেষে সে চিড়িয়াখানার এক গরিলার সঙ্গে ভাব করল—সে যেমন পুরো মানুষ নয় তেমনি যে সে পুরো পশুও নয় তা উপলব্ধি

করতে পারল যখন গরিলা তাকে একদিন পিষে মেরে ফেলল। এই অর্ধমানবের কাহিনী নিয়ে ও'নীল ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। লেখকের মতে এর পেছনে এক দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে। মানুষ আজ আর পশুর মত প্রকৃতির অখণ্ড অংশ নয়, একই সূত্রে গাথা নয়, আবার আত্মিক উন্নয়ন ছাড়া পশুত্বকেও সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারছে না। ইয়াংক্ মনুষ্যত্বের দিকে এগোতে পারেনি—তাই পশু হতে চেয়েছে কিন্তু পশুও তাকে অনাত্মীয় ভাবল। ইয়াংকের মানসিক উন্নয়ন হয়নি, তার বিশ্বাস ছিল শারীরিক শক্তির উপর তাই অতি সহজেই সে আত্ম-বিশ্বাস হারাল। অবশ্য সমালোচকরা এ নাটকে ইয়াংকের পাশবভাবের যথেষ্ট জীব বিজ্ঞান গত ব্যাখ্যা পাননি। আবার তার অর্থনৈতিক ও আত্মিক অপকৃষ্টতারও কারণ পাননি—তাই তাঁরা নাট্যকারকে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এ নাটকে ও'নীলের চিন্তার মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর সর্বাধিক প্রভাবশালী এবং প্রখ্যাত নাটক হল "মোর্নিং বিকামস্ ইলেক্ট্রা" (Mourning Becomes Electra—১৯৩০ খ্রী:) এবং "স্ট্রেঞ্জ্ ইন্টারলুড" (Strange Interlude—১৯২৬ খ্রী:)। স্ট্রেঞ্জ্ ইন্টারলুড নাটকের নায়িকা নিনার (Nina) চরিত্রে মানবিক সম্পর্কের বহু বৈচিত্র্য একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ পরিবেশের মধ্যে এবং মানসলোকেও মানুষ বহু মাত্রা বিশিষ্ট। নিনার সকল ভাবাবেগ কেবল একজন পুরুষকে কেন্দ্র করেই পূরণ হচ্ছে না। একই সঙ্গে তাদের পারিবারিক বন্ধু, তার স্বামী, তার প্রেমিক সকলকেই সে চায়। স্ট্রেঞ্জ্ ইন্টারলুডের নিনা মধ্য বয়স পর্যন্তও তার এই বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার চেষ্টা করে চলেছে। এ নাটকে মনোবিজ্ঞান সঙ্গত চরিত্রের এই মানস বিশ্লেষণ নাটকখানিকে এক বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে।

গ্রীক ক্লাসিকাল ট্রিলজির অনুরূপ গঠন ভঙ্গিমাযুক্ত তেরটি অঙ্কের আধুনিক ট্রিলজি হল মোর্নিং বিকামস্ ইলেক্ট্রা—ও'নীলের ট্রিলজির তিনটি অংশের নাম হল "হোম্-কামিং" (Home Coming), "দ্যা হান্টেড্" (The Hunted), "দ্যা হন্টিড্" (The Haunted)। এই ট্র্যাজেডির কতকগুলি চরিত্রকে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিক্ চরিত্রের সমতুল্য মনে হয়; কাহিনী বিন্যাসও আইস্খাইলসের "ওরেস্থেইয়ার" ধ্রুপদী গঠনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে ম্যানোন (Mannon) পরিবারকে নিয়ে।

একটি ফরাসী মেয়েকে পাওয়ার জন্য এই পরিবারের অ্যাবে (Abe) তার ছোট ভাই ডাভ্‌কে (Dave) হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে ডাভের কবি প্রকৃতির ছেলে অ্যাডাম ব্রাণ্ট্ (Adam Brant) জাহাজে কাপ্তেন হয়ে বিদেশে পাড়ি দেয় আর অ্যাবের ছেলে এজরা ম্যানোন (Ezra Mannon) গৃহেই থাকে এবং ক্রিস্টিনকে (Christine) বিবাহ করে। ম্যানোনরা নিউ ইংল্যাণ্ডের অভিজাত পরিবার তাই প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দূরে দূরেই কাটাত—ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় পরিবারের মধ্যে তাদের নিজেদের আচার আচরণও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, বিয়ের রাতেই এজরা তার পত্নীর সঙ্গে অত্যন্ত পশুসুলভ আচরণ করে। তাই এজরার স্ত্রী তাকে কোন দিনই ভালবাসতে পারেনি। এজরা যখন গৃহ-যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তখন তার অনুপস্থিতিতে গৃহ-প্রত্যাগত অ্যাডাম ব্রাণ্টের সঙ্গে ক্রিস্টিনের প্রণয় গড়ে ওঠে, এর ফলে যুদ্ধ থেকে এজরা যখন ফিরে এল তখন তাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হল। এজরার পুত্র ছিল ওরিন্ (Orin) এবং কন্যা ল্যাভিনিয়া (Lavinia), ল্যাভিনিয়া বারবার ভাইকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করতে থাকে। ওরিন্ অ্যাডাম ব্রাণ্ট্‌কে হত্যা করে কিন্তু তারপরে সে যখন আবিষ্কার করল যে ভগ্নীর প্রতিই তার প্রেমের আকর্ষণ রয়েছে তখন সুগভীর হতাশায় সেও আত্মহত্যা করল। সর্বশেষে তাদের মা-ও আত্মহত্যার মধ্যে জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেল। এই নাটকের তীব্র সমালোচনা হতেও দেরি হয়নি—সমালোচকদের মতে আধুনিক জীবনে এ ধরনের পরিবেশ থেকে এ নাটকের সকল চরিত্রের পক্ষেই বেরিয়ে আসা সম্ভবপর ছিল, তারা ইচ্ছে হলেই অন্য উপায়ে সমাধান খুঁজতে পারত সেজন্য রক্তপাত, আত্মহত্যা ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। এ যেন লেখক জোর করে পৌরাণিক ধারাকে বজায় রাখার জন্যই কাহিনীকে এভাবে গড়ে তুলেছেন। অবশ্য লেখকের স্বপক্ষে এও বলা হয় যে—আধুনিক জীবনেও হত্যা, খুনোখুনি ইত্যাদি সর্বদাই সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলোও হয়তো এড়ানো যেত, অন্যপথ ধরা যেত তবুও তা হয় না কারণ মানুষের মধ্যে এই অপরাধ প্রবণতা রয়েছে—সে অন্যায় করে এবং অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়। তা ছাড়া ১৯৩০-৩১ সালে যখন এ নাটক লেখা হয়েছে তখন এ ধরনের মেলোড্রামা চলত, তখনকার মানুষের মানসিকতা ঠিক আজকের মানুষের মত ছিল না। ও' নীল নিজে নাটকের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

এটাই বলেছেন যে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থাকার দরুণ চরিত্রগুলির কতকগুলি নির্দিষ্ট গুঢ়ৈষা গড়ে উঠেছিল (Fixation of complexes) ধীরে ধীরে তারা অপরাধ প্রবণতার দিকে এগোচ্ছিল। এজন্য যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতায় মানসিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়—পত্নীর প্রতি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সে ঘরে ফিরে আসে কিন্তু তার সে কমনীয় ইচ্ছা পূরণ হয় না—মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছিল—এখানেই ট্র্যাজেডির ভয় (Fear) ও করুণা (Pity) জাগরিত হয়। নাটকের শেষে একমাত্র ইলেক্ট্রা-রূপিণী ল্যাভিনিয়া বেঁচে রইল—সে কি হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য চিরকাল বিলাপ করবে বলে ?

"আ, ওয়াইল্ডারনেস্" (Ah, Wilderness—১৯৩৩ খ্রী:) একটি হাস্য-রসাত্মক পারিবারিক কমেডি। বলা যায় এটিই ও' নীল রচিত একমাত্র কমেডি—এ নাটকে পরিবারের চিত্রটি অত্যন্ত মমতার সঙ্গে ছোট খাট উপকরণ তুলে এনে চিত্রিত করা হয়েছে। কমেডি হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রগুলি ভাবাবেগের বিপুল গভীরতা পেয়েছে—এর মধ্যে পরিণত লেখনীর প্রকাশ রয়েছে।

॥ রাইস্, উইলিয়মস্ ও মিলার্ ॥

"এল্মার্ রাইস্" (Elmer Rice) সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে অভিব্যক্তিবাদ ও বাস্তববাদের মিশ্রণে নাটক রচনা করতে থাকেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিব্যক্তিবাদের প্রারম্ভ যুগেই তিনি লেখেন "দি অ্যাডিং মেশিন" (The Adding Machine)—আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে এটি রাইসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নাটক। যান্ত্রিক সভ্যতা কি ভাবে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং সংস্কৃতিকে প্রস্ফুটিত হতে বাধা দেয়, তার ধীশক্তিকে অপরিণত করে রাখে তাই স্টাইলাইজড্ উপায়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর "স্ট্রীট্ সীন্" (Street Scene—১৯২৯ খ্রী:) নাটকখানি নিউইয়র্কের অগণিত বাড়ি ও বস্তিজীবনের চিত্ররূপ। "দ্যা লেফ্ট ব্যাঙ্ক" (The Left Bank) নাটকে চিত্রিত হয়েছে আমেরিকানদের আত্মবিধ্বংসী বাউণ্ডুলে জীবনযাত্রা। তাঁর "কাউন্সেলর-এট্-ল" (Counsellor-at-Law—১৯৩১ খ্রী:) নাটকে ফুটে উঠেছে পূর্বে বস্তিবাসী বর্তমানে আইন ব্যবসায়ের উচ্চচূড়ায় অধিষ্ঠিত এক ব্যক্তির চিত্র।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "উই দ্য পিপ্‌ল" (We the People) নাটকে সমগ্র জাতির মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। এতে আভিজাত্যের অহংকার থেকে ক্ষুধা, আবার কামনার বিকৃতি থেকে নিখাদ প্রেম, মহাযুদ্ধের ফলাফল, শ্রমিক অসন্তোষ একের পর এক সকলি নাট্যকার তুলে ধরেছেন এবং সবশেষে যেন দর্শকদের বলেছেন এর সমাধান খুঁজতে। এটা নিঃসন্দেহে এক মহৎ প্রচেষ্টা তবে বহু বিষয়ের ভিড়ে বক্তব্যের জোর কিছু কমে যায়। এছাড়া তিনি লিখেছেন "জাজ্‌মেণ্ট্ ডে" (Judgement day), "বিটুইন্ টু ওয়ার্ল্ড্‌স্" (Between Two Worlds) ইত্যাদি প্রখ্যাত নাটক।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসিসিপিতে "টেনেসী উইলিয়মসের" (Tennessee Williams) জন্ম হয়। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক হল "দ্য গ্লাস্ মিন্যাজারি" (The Glass Menagerie—১৯৪৫ খ্রীঃ)। তিনি বহু একাঙ্ক নাটক লেখেন—তাঁর একাঙ্ক নাটকের বিখ্যাত সংগ্রহ হল—"টুয়েন্টিসেভেন ওয়াগন্‌স্ ফুল্ অব্ কট্‌ন্ অ্যাণ্ড আদার্ ওয়ান অ্যাক্ট্ প্লেজ" (27 Wagons Full of Cotton and Other One Act Plays)। এ ছাড়া তাঁর প্রখ্যাত নাটক হল—"এ স্ট্রীট্ কার্ নেমড্ ডিজায়ার্" (A Street car Named Desire—১৯৪৭ খ্রীঃ), "সামার্ অ্যাণ্ড স্মোক্" (Summer and Smoke) এবং "দ্য রোজ টাটু" (The Rose Tattoo—১৯৫১ খ্রীঃ)।

উইলিয়মস্ তাঁর সকল নাটকেই উদ্দাম ভাবাবেগপূর্ণ জীবনের সমস্যাবলীর কাব্যরূপ মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর গ্লাস্ মিন্যাজারি নাটকের আরম্ভেই নাট্যকার বিস্তৃত মঞ্চ নির্দেশ এমন কি আলোকের নির্দেশ পর্যন্তও দিয়েছেন। সম্ভবতঃ ব্রডওয়ের ক্ষুদ্র মঞ্চে এর অভিনয়কালে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেই জন্যই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। গ্লাস্ মিন্যাজারি হল বিফল মনোরথ ও ভগ্ন আশা নারী চরিত্রের চিত্র। উইলিয়মসের নায়িকারা মনোবিকারের পাত্রী, তিনি এদেরি মনোবিশ্লেষণ করেছেন। পরিবেশের সঙ্গে এই নারী চরিত্রগুলি খাপ খাওয়াতে পারছে না—বাইরের সংঘাত এবং আশাভঙ্গ তাদের ভিতরে ক্রমশঃ বিকৃতির সৃষ্টি করছে। এ স্ট্রীট্ কার নেমড্ ডিজায়ার এবং সামার্ অ্যাণ্ড স্মোক্ নাটকেও এই মনোবিশ্লেষণই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ স্ট্রীট্ কার নেমড্ ডিজায়ারের নায়িকা তার অবদমিত ইচ্ছে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও অসঙ্গতির ফলে পরিশেষে পাগল হয়ে গেল।

"আর্থার্ মিলারের" (Arthur Miller—জন্ম ১৯১৬ খ্রীঃ) দু'টি প্রখ্যাত নাটক হল "অল্ মাই সান্স্" (All My Sons—১৯৪৭ খ্রীঃ) এবং "ডেথ্ অব্ এ সেল্স্ম্যান্" (Death of a Salesman—১৯৪৯ খ্রীঃ)। তাঁর এ নাটক ব্রডওয়ে থিয়েটারে প্রচুর অভিনীত হয়েছে। অল্ মাই সান্স্ নাটকে একজন ফ্যাক্টরী মালিকের জীবন কাহিনী বলা হয়েছে। মালিক জো কেলার্ (Joe Keller) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লাভজনক কন্ট্রাক্টের আশায় খুঁতওয়ালা মেশিন সরকারের কাছে বিক্রি করে। এই মেশিনের ক্রটির জন্য কর্মরত বহু শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ক্রমে প্রলোভন বড় হয়ে উঠল এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে জো অসাধু পথ ধরল। জো ভেবেছিল তার এই অর্থ-সম্পত্তি তার ছেলেরাই উত্তরাধিকারী হয়ে ভোগ করবে কিন্তু কার্যকালে তার বিপরীত ঘটনা ঘটল। পিতার অপরাধের কথা জানতে পেরে তার এক ছেলে আত্ম-হত্যা করল—অন্য ছেলে পিতাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরী হল। জো তখন আত্মহত্যাকেই শ্রেয় মনে করল। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করল—পরিবারের পার্থিব সুখ-সম্পদের চাইতে মানবতাই বড়। নাটকখানি বাস্তববাদী। মিলারের সমাজ বিশ্লেষণের উপর ইব্‌সেনের প্রভাব স্পষ্ট।

ডেথ্ অব্ এ সেল্সম্যান্ নাটকে উইলি লোম্যানের (Willy Loman) স্বপ্ন তার ছেলেরা জীবনে বড় হবে—সার্থক হবে। কিন্তু তা হল না। সে নিজে ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানুষ কর্মজীবনে এক নগণ্য সেল্স্ম্যান্। সে তার জীবনের সকল ব্যর্থতা তুচ্ছ করতে পারত পিতা হিসেবে সার্থক হতে পারলে। এবারেও সে ব্যর্থ হল, তার ছেলেরা কেউই তার আশা পূরণ করতে পারল না। তার শেষ আশা ছিল তার ছোট ছেলে, সেখানেও যখন অন্ধকার জমা হল উইলি আত্মহত্যা করল। তার জীবনের ট্র্যাজেডি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত। জীবনের সকল ব্যর্থতা বহন করেই সে তার মৃত্যুভূমিতে এসে দাঁড়াল।

॥ পিরান্দেল্লো ॥

আধুনিক যুগের ইতালীয় নাট্যকারদের মধ্যে ইউরোপীয় বাস্তববাদ প্রথম আনয়ন করেন নাট্যকার "গিয়াকোসা" (Giacosa)। তারপরে আসেন "ভের্গা" (Verga), "রোভেত্তা" (Rovetta), "ব্রাক্কো" (Bracco) এবং "লুইগি পিরান্দেল্লো" (Luigi Pirandello)।

পিরান্দেল্লো ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রথম নাম করেন। ১৯১৫ সালে "ইফ্ নট্ সো" (If Not So) নাটকখানি নিয়ে তিনি নাট্যকার রূপে দেখা দেন। অবিশ্যি এর আগে ১৯১০ খ্রীঃ তিনি "সিসিলিয়ান্ লাইম্স্" (Sicilian Limes) নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে পিরান্দেল্লোকে নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে বিচিত্র বিষয়বস্তু তুলে ধরলেও তাঁর সব নাটকই তত্ত্বের দিক থেকে একই বক্তব্যের সুরে বাঁধা। ইব্‌সেনের চরিত্রগুলিতে বহু জটিলতা রয়েছে কিন্তু পিরান্দেল্লোর চরিত্রগুলি যেন আণবিক সংঘাতে বিচূর্ণ। একই চরিত্রের মধ্যে দেখি অসংখ্য সত্তার উপস্থিতি। বাইরের যে মানুষটাকে আমরা দেখি আর জানি সে সম্পূর্ণ মানুষের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা সকলেই যেন মুখোশ পরিহিত হয়ে রয়েছি। আবার এই মুখোশও দু'রকম—আসল মানুষ তার ভিতরের মুখোশটি জানে আর বাইরের লোকেরা দেখে অন্য একাধিক মুখোশ। বাইরের এই মুখোশ হয় সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে না হয় তার উপর সমাজ-পরিবেশ আরোপ করেছে এবং তা সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। সুতরাং পিরান্দেল্লোর প্রশ্ন—এর মধ্যে আমরা খাঁটি মানুষটাকে কোথায় খুঁজে পাব? সকল রূপই যখন আপেক্ষিক তখন ব্যক্তি-মানসের এটাই সঠিক পরিচয় একথা কোথাও বলা যায় না।

শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আমরা যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির অসীম তাৎপর্য এবং গভীরতাই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না সেখানে কোন শিল্পীর নিজেকে প্রকৃতির সমতুল্য একজন স্রষ্টা বলে অহংকার করবার কিছু নেই। মঞ্চে আমরা যাই উপস্থিত করি না কেন তা কিছুতেই বাস্তব নয়—সুতরাং বাস্তববাদিতা কথাটাই কার্যতঃ অর্থহীন।

পিরান্দেল্লোর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা একের পরে এক বহু নাটকের জন্ম দিয়েছে। তাঁর প্রথমদিককার নাটক হল—"দ্যা ভাইস্" (The Vice—১৯১৩ খ্রীঃ), "দ্যা ইম্‌বিসীল্" (The Imbecile), "অ্যাট্ দ্যা গেট্" (At the Gate), "রাইট্ ইউ আর্—ইফ্ ইউ থিঙ্ক ইউ আর্" (Right You Are—If You Think You Are)। ১৯১৭ সালে লেখেন—"ক্যাপ্ অ্যাণ্ড বেল্‌স্" (Cap and Bells) এবং "দ্যা প্লেজার্ অব্ অনিস্টি" (The Pleasure of Honesty)। পিরান্দেল্লোর উপরে কমেদিয়া দেল্

আর্ভের যথেষ্টই প্রভাব ছিল। তাঁর প্লেঝার্ অব্ অনিস্টি অভিজাতদের সমাজ-জীবন নিয়ে লেখা। ১৯১৯ সালে তিনি লেখেন "ম্যান্, বিস্ট্, অ্যাণ্ড ভার্চিউ" (Man, Beast, and Virtue, or Say it with Flowers)। এরপরে রচিত হয় তাঁর প্রখ্যাত নাটক "সিক্স ক্যারেক্টারস্ ইন্ সার্চ অব্ অ্যান্ অথর্" (Six Characters in Search of an Author —১৯২১ খ্রীঃ)। এতে আছে—পিরান্দেল্লোরই একটি নাটকের রিহার্সাল চলছে, হঠাৎ সেখানে ছ'টি চরিত্র প্রবেশ করল, এরা একজন শিল্পীর সৃষ্টি—এর কতকগুলো চরিত্রের সৃজনকর্ম সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ তাদের উপর প্রার্থিত ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছে কিন্তু কতকগুলো তখনো অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত চরিত্ররা একজন লেখক খুঁজছে কারণ তারা তাদের অজানা ভাগ্যকে জানবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব—এই নিয়েই পরিচালকের সঙ্গে চরিত্রদের চলল নানাম যুক্তিতর্ক। ১৯৩৭ সালে তিনি লেখেন "দ্য জাইয়্যান্ট্স্ অব্ দ্য মাউন্টিন্" (The Giants of the Mountain)।

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে পিরান্দেল্লোর একটি অনন্য আসন রয়েছে। তিনি প্রকৃত সত্য এবং বাইরের সত্য এই দুই-এর বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে তিনি অতি তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আব তাঁর আশ্চর্য শিল্প কুশলতা ফুটে উঠেছে যেখানে তিনি বাহ্যতঃ বুদ্ধিগত চিন্তাকে মানুষের অন্তরাবেগের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন।

॥ আধুনিক যুগ ॥

রঙ্গমঞ্চ

আধুনিক থিয়েটারের কাল আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে বর্তমান যুগ অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরতে পারি। মূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা যায় রেনেসাঁস্ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরে নবযুগের প্রস্তুতি-পর্বের কাল। তারপর থেকে একেবারে হাল আমল পর্যন্ত আমরা থিয়েটার আন্দোলনে তথা শিল্পের জগতে বহু রীতি-নীতি কিংবা সম্মিলিত রূপের আবির্ভাব তিরোভাব দেখতে পাই। এই বহু বৈচিত্র্যকে আমরা তিনটি মৌলিক পর্যায়ে বিভক্ত করে নিতে পারি তাতেই পর্যালোচনা সহজ-সাধ্য হবে। প্রথম পর্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নাটকে ও মঞ্চে "রোমান্টিক" আন্দোলনের যুগ। দ্বিতীয় পর্যায়ে "রিয়ালিজমের" অভ্যুত্থান এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত কলেবরে অবস্থিতি। তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনকে আমরা বলতে পারি "অ্যান্টি-রিয়ালিস্টিক্" (Anti Realistic) আন্দোলন— অর্থাৎ বাস্তব-বিরোধী আন্দোলন। রিয়ালিজম্ এগোতে এগোতে অতি বাস্তবতার সীমারেখায় এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল—দেখল এই বাস্তবের দেয়াল অনতিক্রম্য। বাস্তবমাত্রেই শিল্প নয় জীবনের ভাবানুকীর্তনই শিল্প হতে পারে—নির্ভেজাল জীবন নয়। বাস্তব বিরোধীদের আত্মানুসন্ধান এখান থেকেই সুরু।

কবির ভাষায় বলা যায়—

"আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিংকিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।"

যুগলক্ষ্মীর কঙ্কণের আঘাতে মানবচিত্তও যেমন পথহারা দিশাহারা—উতলা, আকুল, অশান্ত, বিমূঢ়—শিল্পও তেমনি শতধা বিভক্ত জীবনসত্যে বিশ্বাসহীন, কোথাও বা পলায়নপর, কোথাও চঞ্চল, কোথাও বা প্রাণ ছেড়ে বুদ্ধির পূর্ণ আশ্রয়ী। মঞ্চে রোমান্টিক, বাস্তব ও বাস্তববিরোধী এই তিনটি পর্যায়ের ক্রমবিবর্তিত রূপায়ণ অনুসরণ করেই আমরা শিল্পের বহুবিচিত্র ধারাকে বুঝতে পারব।

রেনেসাঁস্ যুগ থেকেই আমরা জানি অঙ্কিত দৃশ্যাবলী মঞ্চে অখণ্ড একাধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে পুরো অষ্টাদশ শতক জুড়ে ইতালিতে অপেরারই ছিল প্রাধান্য। তারি জন্য এ সময়ে ইতালিতে বিশালাকার সব ব্যারোক্ রঙ্গমঞ্চ ও ক্লাসিক্ থিয়েটার গৃহ তৈরী হতে থাকে। ক্রমে ইতালীয় অপেরার সঙ্গে এই ব্যারোক্ দৃশ্যসজ্জা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকে ইতালিতে প্রখ্যাত বিবিয়েনা পরিবারের "ফ্রান্সেস্কো গ্যাল্লি বিবিয়েনার" (Francesco Galli Bibiena) পরিকল্পনাক্রমে ভেরোনায় অতি সুন্দর "তিয়েত্রো ফিলারমণিকো" (Teatro Filarmonico) তৈরী হয়েছিল। বিবিয়েনাদের প্রভাবেই "অ্যান্তোনিও মেদ্রানো" (Antonio Medrano) ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনা করেন "দ্যা তিয়েত্রো সান্ কার্লোর" (The Teatro San Carlo) এবং মিলানের প্রখ্যাত "স্কালা" (Scala—১৭৭৮ খ্রী:) থিয়েটারের। অপেরার এই সমস্ত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হত। ইতালীয় স্থপতিরা নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নানান যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কার করতেন ও দৃশ্যমায়া রচনা করতেন। বহু ক্ষমতাশালী শিল্পীই এঁদের মধ্যে ছিলেন—যেমন মেসিনার "ফিলিপ্পো জুভারা" (Filippo Juvarra), ফ্লোরেন্সের "গিওভান্নি সার্ভান্দোনি" (Giovanni Servandoni), নেপ্ল্সের "ভিন্সেন্ৎসো রে" (Vincenzo Re), ভেনিসের "গিয়াম্বাত্তিস্তা পিরানেসি" (Giambattista Piranesi)। এ ছাড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল অ্যান্দ্রনোর "গ্যাল্লিয়ারি" (Galliari) পরিবার। গ্যাল্লিয়ারিরা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও ইউরোপে

বিবিয়েনাদের সম আসন অধিকার করে বর্তমান ছিলেন। অতএব বলা চলে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ এই তিন শতাব্দী ধরে ইউরোপের মঞ্চে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই শিল্পীরা সকলেই যে বিবিয়েনাদের মত আড়ম্বরপূর্ণ উদ্দাম পথ অনুসরণ করে চলেছিলেন তা নয়। বলা চলে অপেরার সঙ্গে এই সমস্ত সুবিস্তৃত অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর ব্যবহার মঞ্চে অখণ্ডভাবে জড়িত হয়েছিল।

রেনেসাঁস্ যুগ থেকেই আমরা জানি যে মঞ্চ-পরিকল্পনাকারী এবং চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে একটা অখণ্ড সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রেনেসাঁসের পরবর্তী-কালেও মঞ্চ-পরিকল্পক এবং চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এই ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হয়নি। মঞ্চ দৃশ্য-শিল্পীদের মধ্যে যে, সে যুগের চিত্রশিল্পের নির্ধারিত পথ অনুসরণের প্রবণতা দেখা যাবে এর মধ্যে আশ্চর্য কিছুই নেই। কারণ এটাই যুক্তিসঙ্গত যে, ব্যক্তিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল চিত্রশিল্পে নাট্যাভিনয়ের মত সমষ্টিগত প্রচেষ্টার চেয়ে রীতিনীতি ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। সুতরাং তারাই সহজে নূতন পথের দিশারী হতে পারতেন। সবসময়ে যে চিত্রশিল্প পদ্ধতি সোজাসুজিই মঞ্চে এসে পৌঁছেছে তাও নয়। যেমন রোমান্টিক ধারার ল্যাণ্ডস্কেপ্ চিত্র আমরা সর্বপ্রথম পাই—নিকোলাস্ পুসাঁ্যা, স্যাল্ভাটর্ রোজ্, ক্লোদ্ লরেন প্রভৃতি সপ্তদশ শতকের শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে। এটা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে রেনেসাঁস্ যুগেও চিত্রের পশ্চাৎপটে কিছু কিছু পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত দৃশ্যাবলী থাকলেও পুরো একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ্ চিত্র অঙ্কনের কোন রেওয়াজ ছিল না। ক্লোদ্ লরেনের ছবিতেই পুসাঁ্যার চেয়েও ল্যাণ্ডস্কেপ্ মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ক্লোদ্ লরেনকেই (১৬০০-১৬৮২ খ্রী:) অনেকে ল্যাণ্ডস্কেপ্ চিত্রশিল্পের প্রবর্তক বলেন। তিনি আবার ল্যাণ্ডস্কেপের চেয়েও সমুদ্রের দৃশ্য আঁকতে বেশি ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁকে "সীস্কেপ্" শিল্পীও বলা যেতে পারে।

ক্লোদ্ লরেনের পরে আবার ফরাসী বিপ্লবের যুগে এসে চিত্রশিল্পে আমরা ক্লাসিকাল রীতির প্রবর্তন দেখতে পাই। রাজদরবারেরই চিত্রশিল্পী ছিলেন "জ্যাক্ লুই দাভিদ্" বিপ্লবের নব পথে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিপ্লববাদীদের আদর্শ ছিল পুরানো রোমান গণতন্ত্র। তাঁরা হতে চাইলেন তেমনি শক্তিমান ও নির্ভীক। এর ফলেই ফরাসী বিদ্রোহের পর রোমান বীরদের নকল করা

একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল। দাভিদ্ তাঁর চিত্রশিল্পের মধ্যে সেই রোমান পোষাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র আনতে লাগলেন,—এমন কি এই সব সাজপোষাকের প্রবর্তন তিনি তৎকালীন ফরাসী থিয়েটারেও করেছিলেন। দাভিদের পরবর্তী চিত্রশিল্পীরা ক্লাসিকাল রীতির বাঁধাধরা আইন কানুন মেনে চলছিলেন কিন্তু তাতে ক্ষেপে উঠলেন "য়োজেন্ দেলাক্রোয়া" (১৭৯৮-১৮৬৩ সাল)। ক্লাসিকাল চিত্ররীতির বিরুদ্ধে তিনি সুরু করলেন বিদ্রোহের অভিযান। দেলাক্রোয়ার দলের নাম হলো "রোমান্টিসিস্ট্স্"। এঁরা গ্রীক ও রোমানদের অনুকরণে ছবি আঁকবার কোন সার্থকতা দেখলেন না। এঁরা ব্যস্ত হলেন চারপাশের জগতে যা ঘটছে তাই আঁকতে। ক্লাসিকাল রীতির বিরুদ্ধে তাঁদের কেবল বিষয় বস্তুর বিপ্লবই ছিল না—রোমান্টিসিস্ট্দের প্রধান বিদ্রোহ ছিল বর্ণে। তাঁরা বহু বর্ণ সম্ভারের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, নকশা বা রেখার চেয়ে ছবিতে রঙ-ই অনেক বেশি মূল্যবান।

এই পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্ব পর্যন্ত মঞ্চে চিত্রাঙ্কনের এই নব-অনুশীলিত রোমান্টিক প্রথা প্রবেশলাভ করতে পারে নি। ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে রোমান্টিক ল্যাণ্ডস্কেপের প্রথম প্রবর্তন করেন "ফিলিপ্ লুথারবুর্গ" (Philip Loutherbourg—সম্ভাব্য ১৭৪০-১৮১২ খ্রীঃ)। তিনি ড্রুরি লেনে ডেভিড গ্যারিকের (David Garrick) নাট্য রূপায়ণের জন্যই বিশেষ করে দৃশ্যসজ্জা ও সেটিং তৈরী করতেন। এগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যথেষ্টই ছিল। কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৃশ্যাবলীতে তিনি আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়েছিলেন, যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন বনানী বা বন্য পাহাড়ের গায়ে ফাটল। এই কুয়াশাচ্ছন্ন রোমান্টিক দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলতে তিনি এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। তিনি দৃশ্যাঙ্কন সমাপ্ত করে, তার সু-অঙ্কিত সম্মুখ মঞ্চে একটি আলো চুইয়ে আসার মত স্বচ্ছ, সাদা পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন। ফলে এমন একটি পরিবেশ ও প্রভাবের সৃষ্টি হত যা সমস্ত দর্শকদের বিস্মিত করে দিত এবং তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করত। মঞ্চে রোমান্টিক নাটককে অনুসরণ করে রোমান্টিক দৃশ্যাবলী এসে পড়লেও ক্রমশঃ তার শৈল্পিক গুণাবলী হারাতে লাগল। মঞ্চ-পরিকল্পনাকারীরা চিত্রশিল্পীদের যখন অনুকরণ করেন তখন প্রায়শঃই তা সৃজনধর্মী হয়ে ওঠে না, তাঁদের অঙ্কিত দৃশ্যাবলী বা সেটিংগুলি সোজাসুজিই হয়তো প্রখ্যাত চিত্রাবলীর অনুকৃতি

হত। আর নিম্নস্তরের মঞ্চশিল্পীদের হাতে পড়লে এ অনুকরণও নিপুণ এবং যথাযথ হত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের ব্যবসায়ী জগতে একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে নানান কলকারখানা এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিরও উন্নয়ন ঘটে। আর তা ছাড়া এই সময় থিয়েটার শিল্প অভিজাতদের নির্দিষ্ট পরিধি ছাড়িয়ে জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের উপায় হয়ে ওঠে। মঞ্চের পৃষ্ঠপোষক এই দর্শকরা ছিল বেশির ভাগ মধ্যবিত্তশ্রেণীর এবং মজুর শ্রেণীর, এদের স্বল্পমূল্যে অভিনয় দেখানো প্রয়োজন—একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা তার ব্যবস্থাপনা গ্রহণে দ্বিধা করল না। শৈল্পিক উৎকর্ষ সেখানে প্রশ্ন নয়—দরকার হল সস্তায় আনন্দ বিতরণের ব্যবস্থা করা। অতএব এ কালের বেশিরভাগ মঞ্চদৃশ্যাবলীই কারখানায় তৈরী হতে লাগল। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে কম সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে একই ছাঁচে ঢালাই বেশি জিনিস উৎপাদন করে বেশি থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। কারখানায় যে সমস্ত মজুররা কাজ করত তারা ছক বাঁধা নকশা, একই রীতি পদ্ধতি এবং স্টেনসিলের ব্যবহার করত। এই ছক বাঁধা শিল্পকর্ম যে অতি অল্পই সৃজনধর্মী হয়ে উঠত, সে কথা বলাই বাহুল্য।

থিয়েটারের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে স্বল্পমূল্যে অভিনয় উপভোগের প্রথম সূচনা করেন প্যারিসের এক নাট্যকার "লুই মের্সিয়ে" (Louis Mercier)। ১৭৮৩ সালে বিপ্লবের পরে প্যারিসে প্রায় ৮০টি নাটুকে দলের আবির্ভাব হয়। বিপ্লবের পালা বদল সাঙ্গ হলে নাপোলিওঁ ক্লাসিকাল নাটকের পুনঃপ্রবর্তন স্বীকার করেন। কিন্তু এই সময়ে কি ক্লাসিকাল নাটকের দিকে, কি রোমান্টিক নাটকের দিকে নূতন করে কোন শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যই রচিত হয়নি। রোমান্টিক নাটকের নিম্নস্তরের এক অবশ্যম্ভাবী ফসল হল "মেলোড্রামা" (Melo-Drama) তাই প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অসংখ্য রঙ্গালয় থাকলেও, রঙ্গালয়ে মেলোড্রামা এবং কিছু কিছু মিউজিকাল্ কমেডি ও অপেরা ছাড়া আর কোন প্রার্থিত সৃষ্টিই আমরা দেখতে পাই না।

লণ্ডনে এই সময়ে ছোট ছোট রঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক "মাইনর্ থিয়েটার" (Minor theatre) দেখা দেয় তারা প্যান্টোমাইম্ দেখাত এবং অপেরা জাতীয় সঙ্গীত মূলক নাটক করত। অষ্টাদশ শতকের এ ধরনের অনুষ্ঠানকে

বলা হত "বার্লেট্টাস্" (Burlettas)। এই নাটকগুলি বেশির ভাগই তিনাঙ্ক বিশিষ্ট হত। এবং প্রতি অঙ্কে কথোপকথনের স্থানে ৫।৬ টা করে গান থাকত। ১৯শ শতকে লণ্ডন থিয়েটারগুলির অনেক ম্যানেজারই শেক্স্‌পীয়রের গান-বহুল কমেডিগুলি অথবা নূতন কোন নাটকের প্রযোজনা করতে গিয়ে তার নীতিনিয়ম ভেঙ্গে দিতে লাগলেন। এই জন্য তাঁদের শাস্তি পেতে হত, ফাইন দিতে হত। তবুও ভাঙ্গাগড়া চলল, নিয়মতন্ত্রের চারপাশ ঘিরে নূতন পথ গড়ে উঠতে লাগল।

প্যান্টোমাইমের মধ্যে গোটানো লেখা এনে খুলে দেখিয়ে অনেক সময় নূতন চরিত্র আনা হতে লাগল। লিনেনের গায়ে হয়তো এক লাইন কথা লিখে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করা হত। নির্বাক চলচ্চিত্রের সময়ে হলিউডের কলা-কুশলীরা তাঁদের "সাব্‌টাইটেলের" (Subtitles) জন্য এই উপায়ই গ্রহণ করেছিলেন। আর এক ধরনের বার্লেট্টাস্ তৈরী হল তাতে গদ্যকে নিকৃষ্ট কবিতার আকার দিয়ে পিয়ানোর সঙ্গে টুং টাং শব্দে গাওয়া হত।

এই সমস্ত মাইনর্ থিয়েটারগুলির প্রতিযোগিতা করতে ত্রিশ দশকের কাছাকাছি আরো প্রায় এক ডজন ক্ষুদ্র রঙ্গালয় লণ্ডনে দেখা দিল, তাদের ইচ্ছে ছিল স্বল্পব্যয়ে নিম্নবিত্ত ও মজুর শ্রেণীর অশিক্ষিত জনতাকে তুষ্ট করা। ফলে ড্রুরি লেন এবং কোভেণ্ট্ গার্ডেনের হাওয়া শেক্স্‌পীয়রকে ছেড়ে জার্মান মেলোড্রামার দিকে এবং মিল্টনের "মাস্ক কোমাস" (Masque Comus) ছেড়ে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশাবৃত অভিনয়ের দিকে বইতে লাগল। এই দু'টি রঙ্গালয়ের বিরাট আয়তনে অন্ততঃ তিন হাজার দর্শক বসতে পারত। তারা শেক্স্‌পীয়রের নাট্যাভিনয় হারিয়ে শুনতে লাগল উচ্চ কণ্ঠের আবৃত্তি। বৃহদাকৃতি কিংবা ক্ষুদ্রাকৃতি দুই রকম থিয়েটারেই মেলোড্রামার অভিনয় কালে সুবিস্তৃত দৃশ্যসজ্জা করা হত। যেমন জাহাজ ভেসে চলেছে, কিংবা ডুবে গেল, বাড়ি অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে এবং তারপরেই অগ্নি নির্বাপক গাড়ি মঞ্চের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। জল সম্পর্কিত দৃশ্যাবলী দর্শকরা মঞ্চের উপর খুবই পছন্দ করত। ড্রুরি লেনে "দ্য ক্যাটারাক্ট্ অব্ দ্য গ্যাঞ্জেস্" (The Cataract of the Ganges) নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রায় ৫,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয় কালে এর পশ্চাৎপটে চলমান দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছিল। "দ্য ওল্ড ভিক্" (The Old Vic) রঙ্গালয়ে আয়না

ঝুলিয়ে যবনিকা তৈরী করা হয়েছিল। এই সমস্ত রঙ্গালয়ে দর্শকদের ভিড় যেমন প্রচণ্ড হত তেমনি তাদের হৈ হল্লোড়, মারকাট লেগেই থাকত।

॥ প্রেক্ষাগারের পরিবর্তন ॥

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের থিয়েটারে প্রেক্ষাগৃহ, পোষাক, দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং অন্যান্য আঙ্গিকে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেল।

লণ্ডনে ১৬৬০ খ্রীঃ অর্থাৎ রেস্টোরেশন্ যুগের পূর্ব পর্যন্ত মাঝের চত্বরে অর্থাৎ পিটে কোন বসবার আসন এমন কি বেঞ্চি পর্যন্ত ছিল না। ফরাসীদেশে "কমেদিয়্‌ ফ্রাঁসেসের" (Comédie-Francaise) দর্শকরা ১৭৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত রঙ্গালয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখেছে, এর পরে যখন বেঞ্চি পেতে দেওয়া হল তখন একজন ফরাসী নাট্যকার বিরোধিতা করে বললেন—এর ফলে দর্শকরা অত্যন্ত আয়েসী হয়ে উঠবে।

রেস্টোরেশনের পরে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ রঙ্গালয়ে পিটের আসনশ্রেণীর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের কোন পথ ছিল না। দর্শকরা হেলানের ব্যবস্থাহীন লম্বা বেঞ্চিতে বসত। আসনটিকে অধিকারে রাখবার জন্য দর্শকরা চার পাঁচ ঘণ্টা বসে একটানা অভিনয় দেখে যেত, একবারও উঠত না। এরপরে রঙ্গালয় পরিবর্তিত হয়ে এপ্রোন্ স্টেজের গভীরতা কমে যেতে লাগল। সুতরাং মঞ্চের সম্মুখভাগে কতকটা বাড়তি অংশ পাওয়া গেল। এখানে বসানো হল পশ্চাৎযুক্ত কতকগুলি আসন। এগুলি ক্রমশঃ সুবিস্তৃত ও আরামদায়ক হয়ে উঠল। পিটের আসনের মূল্য ছিল ২ শিলিং ৬ পেন্স করে আর এই বিশেষ আসনের মূল্য ছিল ৬ শিলিং করে। এরপরে ১৮৫০ সালে লণ্ডনের কতকগুলি থিয়েটার পিটকে আরো পেছনে কয়েকধাপ সরিয়ে দিল—যা আজো কোথাও কোথাও আছে। এই স্থানে দু'পাশের দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন চার-পাঁচ সারি বক্স আসন এসে গেল। এই বক্সের শ্রেণী কিছুটা উঁচু করা হল—'পিট' তার নীচে রইল। মঞ্চ অনেক উঁচুতে বলে পিটের দর্শকদের আসনশ্রেণী আরাম-দায়ক না হলেও দেখার বিশেষ অসুবিধা রইল না। কয়েকটি অধিক মূল্যের আসন উপরের ব্যালকনির সঙ্গেও সংলগ্ন হল। ফলে প্রেক্ষাগৃহের দর্শক আসন অনেক বেড়ে গেল। এপ্রোনের অংশ কমতে লাগল—এবং তার

ফলে সামনের ফুট্ লাইট্ এবং মঞ্চের সম্মুখবর্তী যবনিকা এ দুই-এর মাঝে এপ্রোনের পার্শ্ববর্তী যে প্রবেশপথ ছিল এবং তাতে এসে অভিনয়ের যে সুযোগ ছিল—অভিনেতাদের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা ক্রমশঃই অবলুপ্ত হতে লাগল। এখন এল দর্শকদের মুখোমুখি প্রোসীনিয়ামের ফ্রেমে বাঁধা মঞ্চ।

জার্মানী থেকে যে রোমান্টিক নাটকের আন্দোলন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল—উনবিংশ শতকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে পড়ে তাই মেলো-ড্রামা এবং মিউজিকাল কমেডির আকারে আত্মবিকাশ করতে থাকে।

১। মঞ্চে রোমান্টিক ধারায় অঙ্কিত যে সব দৃশ্যাবলী এসেছিল একচেটিয়া উৎপাদনের প্রভাবে তা আর কোন সৌন্দর্য সৃজনকারী শিল্পই রইল না। তা রোমান্টিক চিত্রাবলীর নিম্ন শ্রেণীর অনুকরণ মাত্র হয়ে উঠল। এবং এর ফলে উনবিংশ শতকের শেষভাগে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। রেনেসাঁসের কাল থেকে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে এই অঙ্কিত দৃশ্যাবলী মঞ্চে একাধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। এখন দর্শকদের এবং প্রয়োগশিল্পীদের বিরূপতা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অঙ্কিত দৃশ্যাবলীকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিল।

২। অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রাণহীন যান্ত্রিক উৎপাদন বেড়ে যাওয়াই এই বিদ্রোহের একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরো কয়েকটি জটিল বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে প্রধান কারণই ছিল, আবার করেও মঞ্চশিল্পীরা একান্ত অনুরাগে চিত্রশিল্পীদের পন্থানুসরণ করল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই চিত্রশিল্প বাস্তববাদের দিকে পুরোপুরি এগিয়ে চলেছিল। সুতরাং মঞ্চ আর কাল্পনিক স্বপ্নসম্ভব দৃশ্যাবলী আঁকড়ে থাকতে পারল না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, নূতনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরাতন সরে দাঁড়াল।

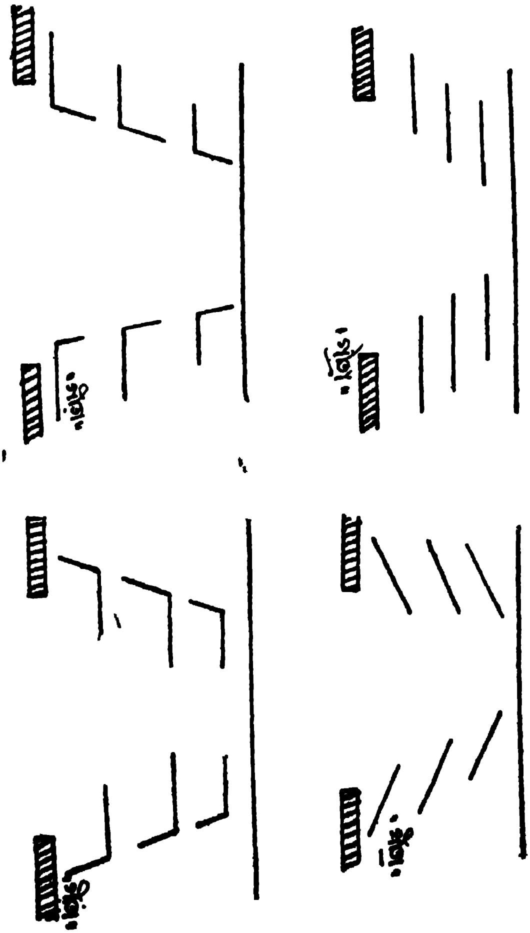
৩। ইতিমধ্যে নাটকের ক্ষেত্রেও "রিয়ালিজম্" পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বরং বলা যায় ইব্সেনের পর থেকে নাটক বাস্তববাদ পার হয়ে অতি আধুনিকবাদের দিকে এগিয়ে চলছিল তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল বাস্তব বিরোধী প্রবণতা। সুতরাং মঞ্চে বাস্তববাদী নাটকের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদী রূপায়ণ পদ্ধতিও একটু একটু করে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

৪। প্রাচীন প্রথা চলে যাওয়ার চতুর্থ কারণ বলা যায়—নব নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কার। এই সময়ে ক্যামেরা বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি তুলে তার অভূতপূর্ব ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। ফলে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রতি দর্শকরা ক্রমশঃই বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল। তারা চাইল বাস্তব পরিবেশ এবং মঞ্চে বাস্তব উপকরণ। এখানে একটি লক্ষণীয় বিস্ময়কর ঘটনা হল এই যে, ক্যামেরার প্রথম আবির্ভাব মঞ্চকে বাস্তবানুগ সেট রচনায় প্রণোদিত করেছিল সত্য, আবার চলচ্চিত্রে এই ক্যামেরার জয়যাত্রাই একালের মঞ্চকে বাস্তব বিমুখ করে তুলেছে।

৫। পঞ্চম কারণ ছিল আমরা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্তও রঙ্গালয়ে তৈল প্রদীপ এবং মোমবাতির আলোক সজ্জা দেখেছি, এই আলোকসজ্জা প্রেক্ষাগার এবং রঙ্গমঞ্চকে সমভাবেই আলোকিত করত। কোথাও কোথাও অবিশ্যি মঞ্চে আলোক সম্পাতের প্রয়াস চলেছিল—কিন্তু তা বিশেষ উন্নত পর্যায়ে উঠতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মঞ্চে প্রথমে গ্যাস এবং পরে বৈদ্যুতিক আলোক আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। মঞ্চে "ফুট্ লাইট্" (Foot Light), "বর্ডার্ লাইট্" (Border Light), "স্পট্ লাইট্" (Spot Light) ইত্যাদি এসে গেল। এদের উজ্জ্বল আলোকে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর মিথ্যে পরিপ্রেক্ষিত, অঙ্কিত ছায়া, অসঙ্গত প্রপোর‍্শন্ এবং সমুচ্চ স্তম্ভের ভ্রান্তি ধরা পড়ে যেতে লাগল। এই উজ্জ্বল আলোকের মাঝে যখন একজন অভিনেতা মঞ্চের সম্মুখ থেকে অভিনয় করতে করতে পেছন দিকে অর্থাৎ আপ্-স্টেজে অনেকখানি চলে যেতেন, তখন তাঁকে হয়তো পশ্চাতে অঙ্কিত পাহাড়ের চাইতেও বড় মনে হত। তিনি অনায়াসে বৃক্ষরাজি কিংবা পাহাড় পর্বত ঢেকে ফেলতে লাগলেন। অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর যেখানে যা কিছু অবাস্তবতা, অসঙ্গতি সকলি উজ্জ্বল আলোকে ধরা পড়ে যেতে লাগল। এছাড়া অঙ্কিত দৃশ্যাবলীতে বস্তুর প্রকৃত ত্রি-মাত্রা ছিল না—ছিল দুইটি মাত্রা। কিন্তু আলোকশিল্পের ক্রমোন্নতি মঞ্চে আকাশের রং, বস্তুর বাস্তব রূপ এমন কি একান্ত স্বপ্নলোককেও প্রতীয়মান করে তুলতে লাগল।

অভিনেতারা ছিলেন "ত্রি-মাত্রিক", মঞ্চের অঙ্কিত দৃশ্যাবলী ছিল "দ্বি-মাত্রিক", এ দুই-এর মধ্যে যে একান্ত ছন্দঃপতন ছিল, প্রবল অসঙ্গতি ছিল—তিন শতাব্দী ধরে তা অবহেলিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর প্রতি এক সর্বাত্মক বিরূপতা প্রকট হয়ে উঠল।

এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ও মঞ্চে এক এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা নূতন নূতন পথের সন্ধান দিতে লাগল। এই বিরুদ্ধাচরণ যে সর্বত্রই একমতাবলম্বী হল তা নয়। এর মধ্যে প্রধানতঃ দু'টি চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদল চাইলেন অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর স্থানে মঞ্চে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী কিছু আনতে যাকে সত্য বলেই মনে হবে—ভ্রম হবে। আর অন্যদল চাইলেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, পুরোপুরি নাটকীয় দৃশ্যাবলী রচনা করতে—যে শিল্প বাস্তবের অনুকৃতি হবে না, হবে একান্তই কল্পনা প্রসূত—এদের আমরা



উইংসের চার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অবস্থান।

"অবাস্তববাদী" (Anti Realists) বলতে পারি। এই দুই চিন্তাধারা নাটকে এবং রঙ্গালয়ে বলা যায় পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। এমন কি একই নাট্যকার কিংবা মঞ্চবিদ্ এই দুই বিরুদ্ধ মতকেই হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশ্রয় করেছেন। কখন বা নাটক হয়েছে এক রীতির, তার প্রয়োগ কৌশল হয়েছে ভিন্ন রীতির। আমরা এখানে বাস্তববাদী প্রচেষ্টা-গুলিকে প্রথমে তুলে ধরব কারণ তারি পরিপ্রে'ক্ষতে অবাস্তববাদকে বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

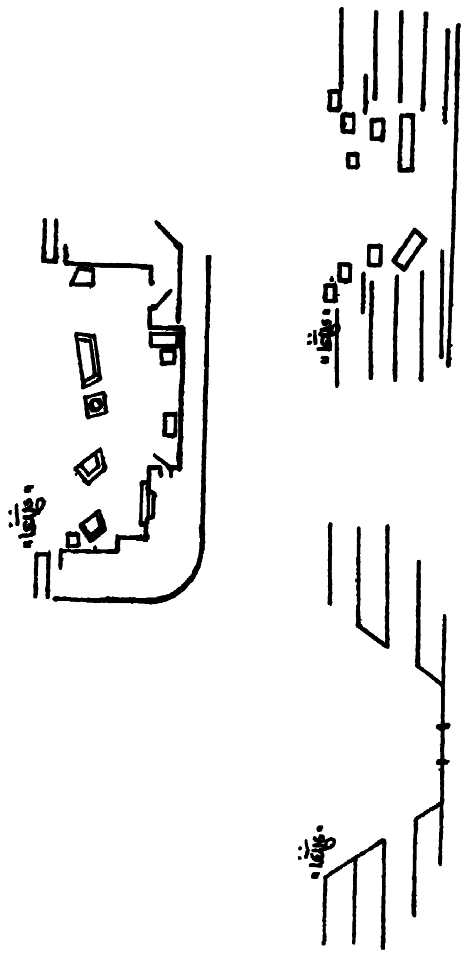
॥ মাদাম্ ওয়েস্ত্রিস্ ও বক্স সেট ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ইউরোপ চাইল থিয়েটারের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সেটিং, এ সবকিছুর মাঝেই ঐতিহাসিক-সত্যতা বজায় থাকুক। অর্থাৎ হ্যামলেট নাটকের যদি অভিনয় করতে হয় তবে তার পোষাক, সেট, ইত্যাদি সে কালের অনুরূপই হতে হবে। আধুনিক কালের পোষাক বা দৃশ্যাবলীতে চলবে না।

ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে রক্ষা করবার এই প্রচেষ্টার ইংল্যাণ্ডে অগ্রদূত ছিলেন—"মাদাম্ ওয়েস্ত্রিস্" (Mme. Vestris)। ১৮৩১ খ্রী: তিনি নিজেই থিয়েটার খোলেন, কিন্তু তার পূর্বে এই অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী অপেরায় গান গাইতেন কিংবা শেক্সপীয়র বা শেরিডানের বইতে অভিনয় করতেন। অভিনয়ের সর্বক্ষেত্রেই ওয়েস্ত্রিসের ছিল অসামান্য দক্ষতা। নৃত্যে ও গীতে তিনি যেমন ছিলেন পারদর্শিনী তেমনি চরিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল—অত্যন্ত স্বাভাবিক আচার আচরণের মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া। ওয়েস্ত্রিসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান হল—লণ্ডনের অলিম্পিক্ থিয়েটারটিকে ঘষে মেজে নূতন করে গড়ে তোলা এবং তাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা। একটি অতি অবজ্ঞাত থিয়েটারকে তিনি অচিরকাল মধ্যে রাজ থিয়েটারের পরবর্তী আসনের যোগ্য করে তুললেন। এই রঙ্গালয়ে লণ্ডনের রসিক এবং বুদ্ধিজীবী দর্শকরা আসতে খুব পছন্দ করতেন। ওয়েস্ত্রিস্ দর্শকদের পক্ষে অভিনয় দেখা আরো সহজসাধ্য করে তুললেন নাট্যানুষ্ঠানের কালকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে। পূর্বে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নাট্যাভিনয় চলত ওয়েস্ত্রিস্ তা রাত ১১টার মধ্যে শেষ করে দিতেন। "ম্যাক্রেডির" (Macready) মত তিনিও অতি সযত্নে রিহার্সাল

দেওয়াতেন। নাট্য উপস্থাপনা যাতে নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

ওয়েস্ত্রিস্ এবং তাঁর সঙ্গী "প্ল্যাঁশে" (Planché) এই দু'জন মিলে অলিম্পিক্ থিয়েটারে এক অদ্ভুত ধরনের বাস্তবতা প্রবর্তন করেন। মঞ্চের আসবাব পত্রগুলি যথাযথ হয়ে উঠল—ড্রইংরুমটা ঠিক ড্রইংরুমের মতই সাজানো হল—এবং অভিনেতারা এই বাস্তব মঞ্চ উপকরণগুলির সঙ্গে যথাযথ আচরণ করতে



উইংস থেকে বক্স-সেট।

লাগলেন। অর্থাৎ মঞ্চে একটা চেয়ার থাকলে নাটকের ‘অ্যাক্‌শনে’ তার উপযুক্ত ব্যবহার হতে লাগল। কিন্তু যে সমস্ত আসবাবপত্র অভিনয়ে ব্যবহৃত হবে না সেগুলো মঞ্চের পশ্চাৎ-যবনিকা বা উইংসের গায়ে অঙ্কিত থাকত। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, মাদাম্‌ ওয়েস্ট্রিস্‌ই লণ্ডনে আধুনিক যুগের বক্স-সেটের প্রথম প্রবর্তন করেন।

মঞ্চে "বক্স-সেটের" (The Box-Set) আবির্ভাব যে কবে থেকে হল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। প্রথমাবস্থায় ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বক্স-সেটের ধারণাটা মঞ্চবিদ্‌দের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই বক্স-সেট এবং আলোক-সম্পাত এই দু'টিই ছিল বাস্তববাদী মঞ্চশিল্পের দুই প্রধান হাতিয়ার।

এতকাল রঙ্গপীঠের উপরে—সামনের দিকে ছিল "ফুট্‌-লাইট্‌" আর তার সমান্তরালভাবে মঞ্চের দু'পাশে দাঁড় করানো থাকত উইংগুলি। ক্রমে তার মধ্যে পরিবর্তন এল এবং কক্ষের ডাইনে বাঁয়ে টানা দেয়াল দেখা দিল। ১৮শ শতক পর্যন্তও প্রোসীনিয়ামের পর থেকে পশ্চাৎপট পর্যন্ত উইংগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকত। ১৮০৪ খ্রীঃ জার্মানীতে "ম্যান্‌হাইমের" (Mannheim) কোর্ট থিয়েটারে একজন শিল্পী দু'টো দু'টো উইংস্‌কে ফ্লাটের সঙ্গে যুক্ত করে তাতে বাস্তবানুগ দরজা জানালা লাগিয়ে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে দেন—এটাই ছিল প্রাথমিক "বক্স-সেট"। এই সময় দিয়েই ফরাসী রঙ্গমঞ্চে বক্স-সেটের সঙ্গে কিছুটা দেয়ালের অংশ এসে গেল। লণ্ডনের ড্রুরি লেনে ইতিপূর্বেই বক্স-সেটের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩২ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মাদাম্‌ ওয়েস্ট্রিস্‌ বক্স-সেট ব্যবহার করেছিলেন বলে যথেষ্ট, প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বক্স-সেটের তিনদিকে দেয়াল এবং তাতে দরজা জানালা এসে একটি ব্যক্তিগত কক্ষের আকার ধারণ করল, পুরানো আমলের উইং বসানো সেটের চেয়ে এ হল শতগুণে উন্নত।

১৮৩৪ খ্রীঃ ওয়েস্ট্রিসের সহকারী প্ল্যাঁশে ড্রুরি লেনে যখন নূতন নাটক প্রযোজনা করেন—তখন সমালোচকরা দেখলেন—মঞ্চ ছিল সর্বদিক দিয়ে আবদ্ধ। তাঁরা সচকিত হয়ে উঠলেন যখন দেখলেন উপরে ঝুলানো বর্ডার্‌ লাইটের জায়গায় ঘরের সিলিং দেখা যাচ্ছে।

বাস্তবানুগ বক্স-সেট গড়ে তুলবার জন্য মাদাম্‌ ওয়েস্ট্রিসের অবদান যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সুধীজনও এর সমাদর করতে ত্রুটি করেননি। তবুও ওয়েস্ট্রিস্‌ যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি—কারণ তিনি নিজের প্রযোজনাকে

নিখুঁত করবার জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। শেক্‌সপীয়রের অনেক নাটকই নবানুসৃত পন্থায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন।

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি কয়েকজন অভিনেতা তথা ম্যানেজার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার দ্বারা শেক্‌সপীয়রের কয়েকখানি নাটক—ঐতিহাসিক সততার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করেন। তাঁরা হলেন—"সামুয়েল্ ফেল্‌প্‌স্" (Samuel Phelps), "চার্লস্ কীন্" (Charles Kean) ও "চার্লস্ ফেক্‌টার" (Charles Fecter)। ফেক্‌টার হ্যামলেট অভিনয় কালে ফুট্-লাইটের ঔজ্জ্বল্য ঢেকে দেওয়ার মত চরিত্রগুলিকে পোষাক পরিয়েছিলেন এবং বর্ডার্-লাইট্ ঢাকা দিয়ে উপরে সিলিং তৈরী করিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে দৃশ্যসজ্জায় এগুলি বিরাট পরিবর্তন এনেছিল।

বক্স-সেট তৈরী হওয়ার পূর্বে দর্শকদের চোখের সম্মুখেই দৃশ্য পরিবর্তন ঘটানো হত। কারণ পূর্বেই আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে তখন পর্যন্ত মঞ্চে "অ্যাক্ট্-কার্টেন্" বা অঙ্ক-যবনিকা আসে নি। সম্মুখ যবনিকা পড়ত নাট্যারম্ভের পূর্বে এবং পরে—মধ্যে কোন যবনিকা ছিল না। ১৮৮১ খ্রীঃ "হেন্‌রী আর্‌ভিং" (Henry Irving) সর্বপ্রথম অঙ্ক-যবনিকা ব্যবহার করেন। কারণ মঞ্চের বিরাট বিরাট সেট—বহু সংখ্যক মঞ্চকর্মী যখন দীর্ঘ সময় ধরে সরিয়ে নিত এবং পরবর্তী সেট এনে বসাত তখন তা দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠত, তাছাড়া আরভিং তাঁর মঞ্চের কলাকৌশল দর্শকদের দেখাতেও চাননি—তাই তিনি অঙ্ক-যবনিকা আনেন। সাধারণ নাটকগুলিতে পূর্বপ্রথায় ড্রপ্‌স্, সাটার্‌স্ এবং উইংসের সাহায্যে মঞ্চ দৃশ্য বেশ তাড়াতাড়িই পরিবর্তিত করা হত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পেছনের ব্যাক্-ড্রপ্ হয়তো তুলে নিয়ে নূতন অঙ্কিত ড্রপ্ ফেলা হত। সাটারগুলি দু'পাশে সরিয়ে নেওয়া হত। সেটের দু'পাশে পেরিয়াক্‌তোই বা সাইড্-উইংস্ ঘুরিয়ে বা সরিয়ে দৃশ্য পরিবর্তন করা হত। ইউরোপে কোথাও কোথাও মঞ্চের নীচ থেকে গাড়ির সাহায্যে উইংস্ উপরে ওঠানো বা নামানো হত; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বেশিরভাগ গ্রুভ্‌সের সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তন করাই মঞ্চশিল্পীরা পছন্দ করতেন।

বক্স-সেট পরিবর্তন করতে এই পুরাতন পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দৃশ্যের শেষে যে সময় পাওয়া যেত তাতেই পূর্ববর্তী সেট সরিয়ে পরবর্তী সেট লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু শেক্‌সপীয়র বা অন্যান্য বহু নাট্যকারই

ছিলেন, যাঁদের নাটকে একই অঙ্কে পর পর বহু দৃশ্যের ব্যবহার রয়েছে—সেখানেই দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের অন্য কোন পন্থা খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন হল। মাদাম্ ওয়েস্ত্রিস্ এবং তাঁর সহকারী প্লাঁশে এ সম্পর্কে ভেবে বক্স-সেটের সঙ্গে পাহাড়, গাছ-পালা বা অন্যান্য সেটের অংশ মঞ্চ বেদীর মাঝের ফাঁক থেকে অর্থাৎ নীচ থেকে উপরে তুলে আনবার ব্যবস্থা করলেন। ওয়েস্ত্রিসের দলের একজন অভিনেতার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে তাঁরা মঞ্চকে কতকগুলো অংশে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন, যেগুলো দরকার মত ওঠানো বা নামানো যেত। মনে হয় এই পদ্ধতিতে সেটের চেয়ে আসবাবপত্রের পরিবর্তনটাই বিশেষ কার্যকরী হত। কারণ সেকালে চাকররা মঞ্চে দর্শকদের সামনেই যখন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি টেনে আনত তখন গ্যালারীর দর্শকরা উচ্চ হাস্য করে উঠত।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক রঙ্গালয়ে পুরো রঙ্গমঞ্চটাকেই কতকগুলো ট্রাপ্-ডোরে ভাগ করে নেওয়া হত। এর মধ্য থেকে সেটের অংশ বিশেষ মঞ্চের নীচ থেকে উপরে তুলে আনা যেত আবার তাকে নীচে অদৃশ্য করে দেওয়া হত। কোথাও কোথাও, এবং সম্ভবতঃ ফেক্‌টারের থিয়েটারে "কাট্‌স্" (Cuts) নামে মঞ্চের ডাইনে, বাঁয়ে সম্মুখ থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত সরু ফাঁকা পথ থাকত—এই ফাঁকা পথ দিয়ে বক্স-সেটের পার্শ্ববর্তী দেয়াল মঞ্চের সম উচ্চতায় তুলে আনা হত এবং তাকে পেছনের দেয়ালের সঙ্গে আটকে দেওয়া হত। এইভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান একটু একটু করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পের সহায়ক হিসেবে এগিয়ে আসতে লাগল।

॥ মাল্টিপল্ সেটস্ ॥

একই মঞ্চে একই সঙ্গে একাধিক সেটের ব্যবহার আমরা মধ্যযুগে দেখেছি, শেক্‌সপীয়রের যুগেও দেখেছি। উনবিংশ শতকে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে এক অভিনব ধরনের মাল্টিপল্ সেটের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। মধ্যযুগের সিমাল্‌টেনিয়াস্ সেটিং-এ দেখেছি যে মঞ্চের একদিকে রয়েছে স্বর্গ অন্য দিকে নরক—আর মাঝখানে ইডেন-উদ্যান, বেথেল্‌হেম, ভূমধ্যসাগর ইত্যাদি বহু ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় ক্ষেত্র। নবযুগে যে মাল্টিপল্ সেট এল তাতে একই বক্স-সেটের মধ্যে এতগুলি অংশ না দেখিয়ে দুই বা

তিনটি অভিনয় ক্ষেত্র দেখানো হত। এতে নাটকের গতিবেগ অনেকখানি বেড়ে যেত। এই ধরনের সেটে হয়তো দেখানো হত—একতলার একটি সুসজ্জিত গৃহ, তারপাশে সিঁড়ি এবং দরজা, জানালা, বারান্দার খানিকটা অংশ সহ দোতলার একটি গৃহ। নীচের ঘর, মাঝের সিঁড়ি এবং উপরের বারান্দা ও ঘর এই তিনটি স্থানেই অভিনয় দেখানো যেত। অথবা দেখানো হত একটি সুবৃহৎ কক্ষ এবং তার সংলগ্ন একটি উদ্যান, কিংবা থাকত একটি কক্ষ এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজপথ। ১৮১৭ খ্রীঃ লণ্ডনে "দি অ্যাক্ট্‌র্ অব্ অল্ ওয়ার্ক ; অর্ ফার্স্ট্ অ্যাণ্ড সেকেণ্ড ফ্লোর্" (The Actor of All Work ; or First and Second Floor) নাটকে একই সঙ্গে দু'টি কক্ষ দেখানো হয়েছিল। একতলা ও দোতলার দু'টি কক্ষে পর পর অভিনয় হয়ে যেত। ভেনিসীয় নাট্যকার "জোহান্ নেস্ট্রয়" (Johann Nestroy) একখানি নাটক লেখেন—"অন্ দ্যা গ্রাউণ্ড ফ্লোর্ অ্যাণ্ড ইন্ দ্যা সেকেণ্ড স্টোরি" (On the Ground Floor and in the Second Story) নামে, এতেও নীচে ও উপরে দু'টি কক্ষ দেখানো হয়েছে। মাল্টিপল্ সেটের ব্যবহার এ যুগে শেক্‌সপীয়রের নাটকেও হতে দেখা গেছে। যেমন রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্ নাটকের সেটে ছিল একদিকে দেয়াল এবং দুর্গদ্বার, পাশে প্রখ্যাত ব্যালকনি এবং নীচে রাজপথ—ইত্যাদি। মাল্টিপল্ মঞ্চসজ্জাকে আবার শতাব্দী পার হয়ে এ যুগের আমেরিকায় ফিরে আসতে দেখি। ইউজিন ও' নীল রচিত "ডিজায়ার্ আণ্ডার্ দি এল্‌মস্" এবং ব্রড্‌ওয়ের অনেক জনপ্রিয় নাটকেই এ ধরনের মাল্টিপল্ সেটের প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। একালের দ্যা গ্লাস্ মিন্যাজারি এবং ডেথ্ অব্ এ সেল্‌স্‌ম্যান্ ইত্যাদি আরো অনেক নাটকেই মাল্টিপল্ সেট নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। অর্থাৎ আধুনিক যুগে মাল্টিপল্ সেটিংও একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগপন্থা বলে গৃহীত হয়েছে।[৩]

॥ বাস্তববাদ ॥

বাস্তববাদী মঞ্চপদ্ধতি দ্রুতবেগে রঙ্গালয়ে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কৃতকার্যতা এনে দিল। সুতরাং এই পদ্ধতি পরিণতরূপে দেখা দিতে খুব বেশি দেরি হল না। ইংল্যাণ্ডে ১৮৫০ খ্রীঃ থেকেই টম্ রবার্টসন্ এবং ব্যান্‌ক্রোফ্‌ট্ সুগঠিত বক্স সেটিং-এর ব্যবহার সর্বাত্মকভাবে উইংস্ ও ড্রপ্‌স্ অপসারণ করে আরম্ভ করেন। বক্স-সেটিং বলতে বোঝায় যে সেটের উপরে

সিলিং রয়েছে পেছনে এবং দু'পাশে দেয়াল রয়েছে। একটি কক্ষের একখানি দেয়াল সরিয়ে দিলে যা হয়। এর ফলে প্রকৃত দরজা, জানালা এমন কি ত্রি-মাত্রা যুক্ত ফায়ার্ প্লেসেরও ব্যবহার হতে লাগল। "রবার্টসন্" (Robertson) এবং "ব্যান্‌ক্রোফ্‌ট্" (Bancroft) এ দু'জনই ছিলেন ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরীয় যুগের নাট্যকার। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁরা বহুসংখ্যক বাস্তবপন্থী নাটক লেখেন। তার সঙ্গে রবার্টসনের পরিচালনা এবং মঞ্চপরিকল্পনাও ছিল অতি বাস্তবধারার—দর্শকদের মনে হত এ যেন তারা তাদেরি ঘরে বসে, তাদেরি ঘরের কাহিনী প্রত্যক্ষ করছে। রবার্টসনের নাটকের নামগুলিও ছিল তেমনি ছোট ছোট—"সোসাইটি" (Society—১৮৬৫ খ্রী:), "আওয়াস্" (Ours—১৮৬৬ খ্রী:), "কাস্ট্" (Caste) এবং "স্কুল" (School—১৮৬৯ খ্রী:) ইত্যাদি। এ সময়ে ইংল্যাণ্ডে বাস্তববাদী নাট্যকারদের মধ্যে রবার্টসনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন "ডিওন বুসিকোণ্ট্" (Dion Boucicault)—তিনি নাট্যকার, অভিনেতা এবং মঞ্চকুশলী ছিলেন। "লিটন্" (Lytton) ছিলেন "দ্যা লেডি অব্ লিয়ন্স্" (The Lady of Lyons) "রিশলিউ" (Richelieu), "মানি" (Money) ইত্যাদির নাট্যকার এবং "টম্ টাইলর্, (Tom Taylor) "আওয়ার্ আমেরিকান কাজিনের" (Our American Cousin) নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে টাইলরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পাঞ্চ পত্রিকার এডিটর্ হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমেরিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে "ডেভিড্ বেলাস্কো" (David Belasco) বাস্তববাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু ও অসম্ভব সম্ভবকারী শিল্পী বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাস্তবানুগ জীবনরূপকে মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে তিনি অর্থ বা সময় কোনটাই ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

"দি ইজিয়েস্ট্ ওয়ে" (The Easiest Way) নামে একটি হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ নাটক প্রযোজনার সময় বেলাস্কোর নাকি একটি ভগ্নপ্রায় গৃহকক্ষ দেখানো প্রয়োজন হয়েছিল, অনেক খুঁজে ভগ্নপ্রায় জীর্ণ বস্তিবাড়ি তিনি পেয়ে গেলেন। সেই গৃহাভ্যন্তরের সমস্ত জিনিসপত্র—এমন কি তার দরজা, জানালা, দেয়ালকাগজ সুদ্ধ্ নিয়ে এসে থিয়েটারের সেটে অক্লান্ত পরিশ্রমে, সুকৌশলে জুড়েগেঁথে সেগুলি আবার পুনরায় একত্রিত করলেন। মঞ্চে বেলাস্কোর উগ্র বাস্তববাদিতা এই উদাহরণেই বোঝা যাচ্ছে। অন্যান্য

অনেক নাটক মঞ্চস্থ করার সময়েও তিনি তাঁর সহকারীদের একেবারে যথাযথ মঞ্চ উপকরণ আনতে দেশবিদেশে পাঠিয়েছেন।

আবার তত্ত্বের দিক দিয়ে স্তানিস্লাভ্‌স্কি, আঁতোয়ান্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদীবা বেলাস্কোর দৃশ্যসজ্জাসম্ভূত বাস্তবাদকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁদের পরিচালনায় অভিনেতারা অনেকসময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই রিহার্সাল দিতেন, তাঁদের পারিপার্শ্বিক এতই প্রকৃত হয়ে উঠত যে, এর মধ্যে ঠিক কোন দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দর্শকরা এসে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটা একটু উঁকি মেরে দেখবে তা তাঁরা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারতেন না।

রিয়ালিজম্‌ বা ন্যাচারালিজমের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনর প্রচেষ্টা এদের অন্তর্নিহিত সীমারেখাকেই প্রকট করে তোলে। যে সীমারেখা বহু সমালোচকই প্রথম থেকে অনুভব করে এসেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস্তববাদ কার্যতঃ অসম্ভব। বেলাস্কো মঞ্চে আদত ঘোড়া নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত লেক, পাহাড় বা আকাশখানা যথাযথ মঞ্চে নিয়ে আসতে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। স্তানিস্লাভ্‌স্কি মঞ্চে একখানি প্রকৃত কক্ষ ও তার প্রকৃত আবহাওয়াই সৃষ্টি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও তাকে যথাযথভাবে অক্ষত রাখতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত দর্শকদের জন্য তার একখানা দেয়াল সরিয়ে দিতেই হয়েছে। এছাড়া রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সময়ের একটি মস্তবড় বাধা ছিল। জীবনের ঘটনা যা হয়তো একটি বছর বা তারো চেয়ে অধিক সময় ধরে ঘটেছে, মঞ্চে সেই ঘটনার পরিণতিই মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে দেখাতে হত। এখানেও খাঁটি বাস্তব তুলে ধরা সম্ভব ছিল না। মঞ্চে চেয়ার-টেবিল, কাপ-ডিস্‌ চায়ের সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে তা নিয়ে অভিনয় দেখানো চলতে পারে—কিন্তু স্টোভে চায়ের জল ফোটানো বা চা ভেজানো, দুধ, চিনি ইত্যাদি সহযোগে পরিবেশন করা এই আধ ঘণ্টা ব্যাপী সমগ্র প্রক্রিয়াটি মঞ্চে নাটকের গতির দিক দিয়েই দেখানো একেবারে অসম্ভব।

এর চেয়েও বড কথা হল পুরোপুরি বাস্তববাদ কিংবা বাস্তবের যথাযথ পুনরুক্তি মঞ্চে একান্ত কাম্যও নয়। তা হলে তা বাস্তবই হয় শিল্প হয় না—তার আস্বাদনে শৈল্পিক পরিতৃপ্তিও আসে না। এই প্রসঙ্গে একটি প্রখ্যাত উক্তির উল্লেখ করতে হয়—"আমরা জানি যে প্রকৃতির অনুকৃতিই শিল্প নয়, প্রকৃতির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ বেছে নিয়ে

নোতুন কিছু গড়ে তোলাই শিল্প” (We know that Nature is not Art, selection from Nature is Art.)। যেমন সঙ্গীত কোন পর্যন্ত এগোবে তা কি প্রকৃতির শব্দকে অনুকরণ করে সীমাবদ্ধ করা যায়? ধরা যাক, অর্কেস্ট্রা এক সপ্তাহ ধরে রিহার্সাল দিচ্ছে—একেবারে জীবন্তভাবে পাখীর কলকাকলী বা প্রবাহিত কোন প্রস্রবণের ধ্বনি অথবা বায়ু কম্পিত পাইন বৃক্ষ শ্রেণীর শব্দের অনুরূপ সুরলহরী সৃষ্টি করবার জন্য। এখানে আমরা সঙ্গীতকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলাম কারণ সঙ্গীত অতি সহজেই অমূর্ত হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—গান হল গগনের। অর্থাৎ সঙ্গীত অতি সহজেই বাস্তবকে ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ শিল্পের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। এখন আমাদের যে অর্কেস্ট্রা রিহার্সাল দিচ্ছিল, তারা যদি প্রকৃতির শব্দসম্ভার যেমন আছে তেমনি তুলে আনে, তা হলে তার মধ্যে অনেক এলোমেলো ছন্দঃপতন থেকে যায়। অতএব তাকে একটা পদ্ধতি মত সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া দরকার হয়—এখানেই সে প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে শিল্পীর শিল্পকর্ম। সান্ধ্য গগনে জীবন্ত পাখীর কলকাকলী আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলছে—তখন যে তারি মাঝে দু'চারটে কাক এলোমেলো ডেকে উঠবে না একথা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। যদিও কাকের ডাকও সঙ্গীতে আনা যায়—কিন্তু কোকিল পাপিয়ার গীতি মাধুরীর সঙ্গে তাকেও সুরে ছন্দে বেঁধে নিতে হবে—এখানেই প্রয়োজন স্রষ্টার। অর্থাৎ সঙ্গীতের ছন্দ, তাল, লয়, তথা সুরের মূল উৎস প্রকৃতির শব্দসম্ভার হলেও কোনটাকেই প্রকৃতির সীমারেখায় আবদ্ধ করে রাখা যায় না। চিত্রশিল্পেও বাস্তবানুগ অঙ্কন পদ্ধতি একটা সীমারেখায় এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। শিল্পী যদি একটি আপেল আঁকেন যতই তা নিখুঁত হোক—তবুও তা একটি আপেলের মত হবে, কিছুতেই প্রকৃত আপেল হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ প্রকৃতির বস্তুসম্পদের মধ্যে যে প্রাণ আছে, যে দ্যুতি আছে শিল্পী তা কিছুতেই আনতে পারেন না,—এখানেই বাস্তববাদী চিত্রশিল্পীর সীমারেখা। এক বর্গ ইঞ্চি আকাশের গায়ে যে আলোক, যে দ্যুতি রয়েছে, কোন কেমিকাল বর্ণেরই কাজ নয় বস্তা বস্তা রং ঢেলেও সে দীপ্তিকে ফুটিয়ে তোলা। এমন কি একটি গাছের পাতায়ও বর্ণের যে অন্তর্নিহিত ঔজ্জ্বল্য আছে শিল্পীর সাধ্য নেই তা আনতে পারেন। এখানে বিশ্বস্রষ্টার কাছে অবশ্যই নত মস্তকে শিল্পীকে হার মানতে হবে এবং অন্যকোন নিজস্ব সৃজন পন্থা খুঁজতে হবে।

অতএব চিত্রশিল্পের যদি শিল্পকলা হিসেবে কোন ভবিষ্যৎ উন্নতির কামনা থাকে তবে সে প্রকৃতির সীমাবন্ধন ছিন্ন করেই এগিয়ে যাবে। সে হবে প্রস্ফুটিত ফুলের মত। গাছের শিকড় থাকবে মাটিতে ফুল থাকবে আকাশে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একদা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—মঞ্চে এসে একটি পাগলের চরিত্র যখন পাগলামি করবে তখন তারো মধ্যে একটা ছন্দ বজায় রাখতে হবে। বাস্তব পাগলের যদৃচ্ছ স্বাধীনতা তার নেই—অর্থাৎ সমগ্র নাটকের সুরের সঙ্গে অদৃশ্য ছন্দে চরিত্রটি মিলিয়ে নেওয়া চাই, তবেই সে পাগলামির অভিনয়ও শিল্প হয়ে উঠবে। এখানে একটি কথা আমাদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার—মানুষের এই বাস্তব জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি—এর মধ্যে যে ছন্দ, সুর, তাল লয়ের অভাব রয়েছে তা নয়। এখানেও নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু সে তাল, লয়গুলি সময়ের অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে কোথায় কখন পড়ে, কোথাকার ভারসাম্য কোথায় গিয়ে রক্ষিত হয়—ক্ষুদ্র পরিধির মানবজীবনে সেই সমগ্রকে, বিরাটকে অনুধাবন করা, অনুসরণ করা অসম্ভব। আমরা যে খণ্ড-কাল, খণ্ডজীবনকে দেখি কোন একটি সত্য উপলব্ধির সুতোয় তার আদি, মধ্য, অন্তকে সুষমামণ্ডিত করে গড়ে তোলাই আমাদের শিল্প।

মঞ্চে বাস্তববাদী প্রয়োগ শিল্পের বিরুদ্ধে আরো কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিযোগ রয়েছে। হুবহু বাস্তবতা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা প্রথমতঃ ব্যয়সাপেক্ষ; দ্বিতীয়তঃ এতে নানা রকম অবাস্তর ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তৃতীয়তঃ তা বিশেষ সময় সাপেক্ষ। কার্যতঃ বলা চলে অতি বাস্তবতা শিল্পের সৌকুমার্য বাড়িয়ে তোলার চাইতে অতি সহজেই ধ্বংস করে। তা ছাড়া মঞ্চে যতই চেষ্টা করা যাক চলচ্চিত্রের অনুরূপ বাস্তবতা ও গতিশীলতা আনা যায় না, সুতরাং সে পথেও তার পরাজয় অনিবার্য।

আধুনিক মঞ্চ পরিকল্পনাকারীগণ যেমন একদিকে বলছেন যে, অতি বাস্তবতা মঞ্চের পক্ষে বিশেষ হানিকর, আবার তার বিপক্ষে এ যুক্তিও প্রবল হয়ে রয়েছে যে মঞ্চে বাস্তবতাকে একেবারে বাদ দিয়ে জীবন্ত নটনটীদের সাহায্যে জীবনের কোন গভীর সত্যকেই ফুটিয়ে তোলা যায় না। চিত্রশিল্প, কাব্য এবং সঙ্গীত যতখানি বিমূর্তবাদী হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মুষ্টিমেয় শ্রোতা বা দর্শকরা যতখানি সুশিক্ষিত ও রসিক হতে পারেন—নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় না। নাটক অনেক সার্বজনীন শিল্প এবং বহুজনের

সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। সেখানে যে জীবনের আলেখ্যটি ফুটে উঠবে সর্বশ্রেণীর মানুষকে তার পরিতৃপ্ত করার শক্তি থাকা চাই। প্রযোজনার জটিলতা এবং ব্যয় বাহুল্যের দিক চিন্তা করলে মঞ্চশিল্পীদের পক্ষে একটি নাটকের সাময়িক সাফল্যের কথাও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। অল্পকিছু সুধী দর্শকের দেখা শেষ হল—সাধারণ দর্শকরা নিচ্ছে না তবুও রাতের পর রাত সেই নাটকের অভিনয় চলছে এমন ঘটনা মঞ্চের ইতিহাসে দেখা যায় না। তাছাড়া জীবন্ত নট নটীরা যতই চেষ্টা করুন একটি তুলির আঁচড়ের বিমূর্ত ভাবকে কিছুতেই তুলে আনতে পারেন না। তাঁদের দেহই যে তাঁদের শিল্পের মাধ্যম, দেহকে বিদেহ করে তোলা কার্যতঃ অসম্ভব। এই জন্যই সমালোচকরা মঞ্চে বাস্তব পরিবেশকে একেবারে বাদ না দিয়ে পরিশীলিত বাস্তববাদের (Modified Realism) সফলতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যার ফলে মঞ্চে আর একটি নূতন মতবাদ এল, তা হল "সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়ালিজম্‌" (Selective Realisn)। অর্থাৎ মঞ্চে হুবহু বাস্তবকে আনবার চেষ্টা না করে তার কিছু অংশ নিয়ে এসে বাস্তবের প্রতীতি জন্মান এবং পরিবেশ রচনা করে নেওয়াই এই রীতির উদ্দেশ্য। কালক্রমে ন্যাচারালিজম্‌ এবং উগ্র রিয়ালিজম এক ভিন্ন মঞ্চ প্রয়োগ শৈলীকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল—একে আমরা সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়ালিজম্‌ নামেই সঠিক অভিহিত করতে পারি। সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়ালিজমের বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করব। ধরা যাক ওথেলো নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য। নাট্যকার নির্দেশ দিচ্ছেন—"সাইপ্রাসের একটি সমুদ্র বন্দর। জাহাজের জেটিঘাটের কাছে খানিকটা খোলা জায়গা।" মোণ্টানো এবং দু'জন ভদ্রলোকের প্রবেশ। এখানে ওথেলোকে জাহাজ থেকে নেমে এলে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ইয়াগো, ক্যাশিও, এমিলিয়া, ডেসডেমোনা ইত্যাদিরাও উপস্থিত হলেন। এখন সাইপ্রাসের সমুদ্র বন্দরটি যদি নিখুঁতভাবে আধুনিক কালের মঞ্চে দেখাতে হয়, তবে তা মঞ্চের উপর ধরানোই অসম্ভব। একটি জাহাজ ঘাটায় কতরকম খুঁটিনাটি থাকে—কত অগণিত লোক মালপত্র আনা নেওয়া করে, আর জাহাজও তো একটা নয়। এর সবটুকু কি যথাযথ তুলে ধরা সম্ভব? অতএব একটি পাল আর একটি মাস্তুল মঞ্চের পশ্চাৎপটে দেখিয়ে দেওয়া হল—রইল তার কিনারায় তক্তাফেলা জেটিঘাটের সামান্য ইঙ্গিত। আর তার সামনেই আমাদের

অভিনয় ক্ষেত্র। দর্শকরা বুঝে নিল জাহাজ ঘাটা, তৈরী হল পরিবেশ। কিংবা যদি দেখাতে হয় দরিদ্রগৃহ,—বাস্তবানুগ করতে গিয়ে একরাশ উপকরণের প্রয়োজন নেই, পেরেকের গায়ে একটা ছেঁড়া সার্ট অথবা একটা ভাঙ্গা লণ্ঠনই যথেষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে—এই সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়্যালিজম্‌ই আরো যখন সূক্ষ্মতর ভাবব্যঞ্জনায় ওঠে—তখনি শিল্পে আসে প্রতীকধর্মিতা বা সিম্বলিজম্‌।

॥ আলোক-সম্পাত ॥

আসবাবপত্রে, পোষাক-পরিচ্ছদে ঐতিহাসিক সততা রক্ষা করা, মঞ্চে বক্স-সেটের ব্যবহার করা, উপরে সিলিং দেখানো কিংবা "ক্যাট্‌স্‌ ওয়ের" সাহায্য গ্রহণ করা—উনবিংশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ জুড়ে মঞ্চের উপর কেবল যে এই পরিবর্তনগুলিই এসেছিল তা নয়, আর একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটল ১৮০৩ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। লণ্ডনের মঞ্চে গ্যাস আলোকের আবির্ভাব হল। জার্মান মঞ্চবিদ্‌ "ফ্রেড্রিক্‌. এ. উইন্‌সোর্‌" লণ্ডনের "লেসিয়াম্‌ থিয়েটারে" এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। রঙ্গালয়ে আলোক সংখ্যা গ্যাস আসায় অনেক বেড়ে গেল। গ্যাস আলোকের দু'টি প্রধান সুবিধা ছিল,—এই আলোক স্থিতি-স্থাপক রবার টিউবের মধ্য দিয়ে অতি দীর্ঘপথ বাহিত হতে পারত। মূলকেন্দ্র থেকে একে আনা হত "ফুট্‌ লাইটে" তারপরে "বর্ডার্‌ লাইটে" এবং তারো পরে সমগ্র গৃহের আলোককেন্দ্রগুলিতে। দ্বিতীয়তঃ গ্যাসের এই প্রবাহকে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করা চলত। ফলে রঙ্গমঞ্চের বা প্রেক্ষাগৃহের যে কোন একটা অংশের আলোকে কমিয়ে কিংবা নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই গ্যাস আলোকে "ইলেক্‌ট্রিক স্পার্কের" সাহায্যে একেবারে নিভিয়ে দেওয়া বা প্রজ্জ্বলিত করার পন্থা আবিষ্কৃত হল। ফলে মঞ্চকুশলীদের হাতে এল এক অপূর্ব সুযোগ। এই প্রথম তারা পারল প্রেক্ষাগৃহকে একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে মঞ্চে আলোকে কেন্দ্রীভূত করে তুলতে—যার কল্পনা ছিল মোমবাতি এবং তৈলপ্রদীপের যুগে আকাশ-কুসুম মাত্র। এই শতাব্দীর শেষের দিকে হেনরী আরভিং-এর প্রযোজনায় এই উপায়কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপে গ্রহণ করা হয়।

গ্যাসের আলোক অতি উজ্জ্বল হওয়ায় বর্ডার্‌ লাইট্‌ হিসেবে একটি

আলোক শ্রেণী রাখলেই চলত, ফলে বক্স-সেটে "সিলিং পিস্‌গুলির" ব্যবহার করা আরো সহজ হয়ে উঠল।

তেলের আলোক এমন কি মোমবাতিও বহু ছোট খাট রঙ্গালয়ে দীর্ঘকাল ধরেই টিকে ছিল। কিন্তু ১৮০০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বল আলোক, কলাকুশলীদের হাতে এসে গিয়েছিল। গ্যাসের আলোর সমকালেই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এল "লাইম্ লাইট্" (Lime Light) এটা ছিল অতি তীব্র সাদা একটি আলোক। এ আলো তৈরী করা হত এক টুকরো চুনাপাথরকে (Lime Stone) অতি উত্তাপ দিয়ে উত্তপ্ত গ্যাসমালার সৃষ্টি করে। সেই আলোক একখানি বাঁকানো আয়নায় প্রতিফলিত করে তার সাহায্যে অতি উজ্জ্বল "স্পট্ লাইট্" (Spot Light) সৃষ্টি করা হত। "আর্ক লাইট্" (Arc Light) ও অনেকটা এই ধরনেরই ছিল। সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় প্যারিস্ অপেরা হাউজে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই আলোক তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে কার্বণের দু'টো রডকে উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত করে তৈরী করা হত। প্রথম অবস্থায় এই আলোকে অত্যন্ত কম্পন হত এবং কার্বণ জ্বলার দরুণ শব্দ হতে থাকত তাই তা মঞ্চে ব্যবহারের কিছু অসুবিধা ছিল।

॥ বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী মঞ্চকে দিল বাস্তববাদী নাটক এবং চতুর্থ দেয়ালখানি সরিয়ে প্রোসীনিয়ামের মধ্য দিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার তত্ত্ব অথবা "চতুর্থ দেয়াল প্রথা" (Fourth Wall Convention)। বিংশ শতাব্দী আনল নব নব শৈলীর মঞ্চ-দৃশ্য তথা সেটিং এবং আলোক সম্পাত। এই দুই উপাদানে মঞ্চে সে যে সৌন্দর্য এবং ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করল তা পূর্বতন জগতে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। নূতন যে "মঞ্চ শিল্প" (Stage Craft) এল তার আন্দোলন নাট্যপ্রয়োগ-শৈলীর মধ্যে নিয়ে এল বিরাট পরিবর্তন। এমন কি এই নব প্রয়োগ কৌশল নাট্যকারদেরও নূতনভাবে চিন্তা করতে ও নাটক রচনা করতে প্রণোদিত করল। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাটকই অগ্রণী হয়ে মঞ্চকে প্রভাবিত করেছে বেশি। বিংশ শতাব্দীর মঞ্চ ও আলোক সম্পাত পূর্বতন বাস্তবাযুগ নাটককে আরো অনেক মোহময় করে তুলল তো বটেই—তদুপরি নিত্য নূতন "ইজম্" বা মতবাদ চিত্রকলা, আলোকশিল্প ও যান্ত্রিক কৌশলের মাধ্যমে মঞ্চে অতি দ্রুত এসে পৌঁছতে লাগল ফলে নাট্যকাররা চমকিত হয়ে উঠলেন এবং

একেবারে ভিন্ন শৈলীর নাট্য-সাহিত্য রচনা করতে প্রণোদিত হতে লাগলেন। এমন কি মঞ্চে চিত্রশিল্প ও আলোক সম্পাত যে বিমূর্তবাদকে অনায়াসে তুলে ধরতে পারল—নাট্যসাহিত্য সেখানে এসে বরং হতচকিত হয়ে পড়ল।

ইউরোপে ১৯০৫ সাল এবং আমেরিকায় ১৯১৫ সাল পর্যন্তও মঞ্চসজ্জা হত উইংস্, বর্ডারস্ এবং অঙ্কিত ড্রপস্ দিয়ে এগুলি ছিল অত্যন্ত সাদামাটাও মোহজালমুক্ত। "বক্স-সেট" তৈরী হত কোন কোন বিশেষ নাটকের জন্যই। ফুট্ লাইট্ এবং বর্ডার্ লাইটের অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্যে এই দুই শ্রেণীর সেটিংই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ১৮৮০ খ্রীঃ জোলা উইংস্ ও ব্যাক্-ড্রপের সঙ্গে ফুট্ লাইটের একান্ত বৈষম্য নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলেন। আঁতোয়ান্ কতকগুলি নাটকে ফুট্ লাইট্কে কেটে বাদ দেওয়ার জন্য উপর থেকে স্বাভাবিক আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা করেন। স্ট্রিণ্ডবার্গ নিজেও ফুট-লাইটের বিরুদ্ধে লিখেছেন যে, এর ফলে অভিনেতার মুখের গঠন বদলে যায় এবং মোটা দেখাতে থাকে। তাছাড়াও চিবুকের কাছে সূক্ষ্ম মুখাবয়ব রেখা মুছে যেতে চায়। অতএব মুখটা সমতল হয়ে ওঠে। ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে ইংরেজ নাট্যকাররাও ফুট্ লাইটে আপত্তি জানাতে থাকেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ ইতালীয়রা মঞ্চে সম-আলোক সম্পাতে আপত্তি জানান। তাঁরা প্রভাব সৃষ্টির জন্য আলো ছায়ার বৈপরীত্যের দাবী তোলেন। কারণ এই আলোছায়ার অপূর্ব খেলা তাঁরা "রেম্‌ব্রাণ্টের" (Harmenz Van Rijn Rembrandt) প্রখ্যাত চিত্রশিল্পে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সমালোচনার মধ্যে লক্ষণীয় এটাই যে মঞ্চের কৃত্রিম আলোককে তাঁরা বাস্তব আলোকের সমপর্যায়ে দেখতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে প্রকৃতির রাজ্যে আলোর উৎস মাথার উপরে, পায়ের নীচে নয়। আমরা এই আলোকেই সমস্ত বস্তুর গঠন সম্পর্কে ধারণা করে নি—ভিন্নপন্থী আলোক হলে তাই সব কিম্ভূত-কিমাকার ঠেকে। আর তা ছাড়া প্রাকৃতিক আলোকে বস্তুজগৎ দ্বি-মাত্রিক, কিংবা ত্রি-মাত্রিক হওয়ায় স্বভাবতঃই ছায়াপাত হয়। এই সময়ে চিত্রশিল্পীরা দলে দলে খোলা আকাশের তলে ছবি আঁকা জুড়ে দিয়েছিলেন। আলোই যে বস্তুকে রূপ দেয় একথা তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন। আর সেই আলো আর ছায়া যে সূর্যের গতির সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টায় এ ও তাঁদের দৃষ্টি এড়াল না। সকাল ১০টার পৃথিবী যে দুপুর ১২টায় থাকে না, আবার দুপুর ১২টার পৃথিবী যে বিকেল ৪টায় হারিয়ে যায়, এ কথা তাঁদের

জানতে বাকী ছিল না। তাই মঞ্চে যখন কৃত্রিম আলোক সম্পাত এল তখন আলোর জাদুকরী বিদ্যা রসিক জনের জানা হয়ে গেছে—তাই সে দাবী তারা ছাড়তে চাইল না।

জার্মান স্থপতি এবং মঞ্চ দৃশ্য পরিকল্পক "শিঙ্কেল্" (Schinkel) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আক্রমণ আরো প্রবল করে তোলেন। তিনি নীচ থেকে বা পেছন থেকে পড়া অস্বাভাবিক আলোক সম্পাতে আপত্তি না তুলে আপত্তি তোলেন অঙ্কিত ছায়ায়। অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর কৃত্রিম পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁর অনুরূপ আপত্তি ছিল। কারণ অভিনেতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বা "প্রপোর্শন্" (Proportion) ঠিক থাকে না। তাঁর মতে প্রত্যেকটি বস্তুই খানিকটা স্থান অধিকার করে—মঞ্চের অঙ্কিত দৃশ্য তাকেই অস্বীকার করছে।

॥ অ্যাডল্ফ্ আপ্পিয়া ও গর্ডন ক্রেগ্ ॥

এইভাবেই মঞ্চসজ্জা এবং আলোক সম্পাত নিয়ে প্রায় ১৫০শ বছর ধরে বহুপ্রকার সমালোচনা চলল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা মঞ্চে কোন উল্লেখ-যোগ্য প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারলেন না। কেবল সমস্যাগুলিই সামনে দাঁড়িয়ে রইল। পরিশেষে তার উত্তর নিয়ে এলেন—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইস্ মঞ্চবিদ্ "অ্যাডল্ফ্ আপ্পিয়া" (Adolphe Appia) এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ মঞ্চবিদ্ "এডোয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ্" (Edward Gordon Craig)। এ দু'জনই মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাত সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে লেখেন এবং স্কেচ্ এঁকে দেখান। আপ্পিয়া তাঁর তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ ভাবে মঞ্চে প্রয়োগ করে দেখাননি। কিন্তু গর্ডন ক্রেগ্ তাঁর লেখা ও স্কেচ্ ছাড়াও ৬টি নাটকের প্রযোজনা করে দেখান। এই দুই চিন্তাশীল শিল্পীর নবাবিষ্কার দৃশ্যসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের ক্ষেত্রে মৌলিক বিবর্তন নিয়ে এল। এই বৈপ্লবিক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ-ভাবে জার্মানীর মঞ্চে যিনি প্রতিষ্ঠিত করে সংগ্রামে জয়ী হলেন—তিনি হলেন অস্ট্রিয়াদেশীয়—জাত পরিচালক "ম্যাক্স রাইনহার্ট" (Max Reinhardt)।

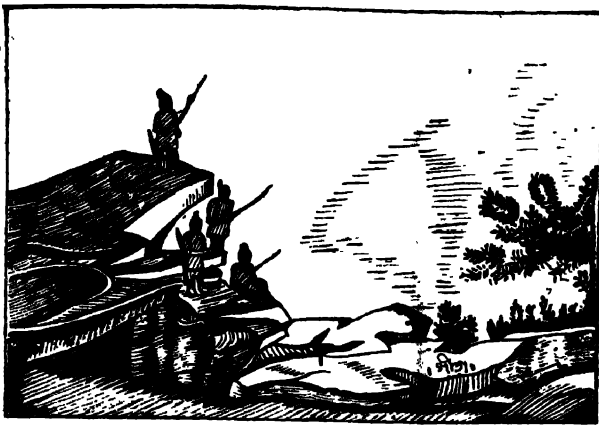
আপ্পিয়া নাটকের উপরে নয়, অপেরার উপরে তাঁর প্রখ্যাত দু'খানি গ্রন্থে তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন এবং পরিকল্পনা এঁকে দেখিয়েছেন। তাঁর এই গ্রন্থ দু'খানি হল ১৮৯৫ খ্রীঃ রচিত "দ্যা স্টেজিং অব্ ভাগনেরিয়ান্ মিউজিক্-ড্রামাজ্" (The Staging of Wagnerian Music-Dramas) এবং তার চার বছর পরে লেখা "মিউজিক্ অ্যাণ্ড স্টেজ প্রোডাক্শন্" (Music and

Stage Production) বইখানি। গর্ডন ক্রেগ, আপ্পিয়ার পরিকল্পনা মত প্রথম নাটক প্রযোজনা করেছেন ১৯০০ খ্রীঃ লণ্ডনে—সেও ছিল একখানি অপেরা "পারসেলের" (Purcell) লেখা "ডিডো অ্যাণ্ড ঈনিস্" (Dido and Aeneas)। ১৯০৫ খ্রীঃ ক্রেগের প্রথম বই প্রকাশিত হয়—"দি আর্ট অব্ দ্যা থিয়েটার" (The Art of the Theatre) এই বইখানির রচনা ভঙ্গি এবং উদাহরণ দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি এক্ষেত্রে অপেরা ধরে নয় নাটক ধরে এগিয়েছেন। আপ্পিয়াও পরে অপেরা ত্যাগ করে শেক্সপীয়র, গ্যেটে, ইব্‌সেন এবং অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনা এবং নকশা অঙ্কন করেন।

আপ্পিয়া চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রোডাকৃশনের উন্নতির চেষ্টা করেননি। তাঁর প্রথম গ্রন্থে কোন উদাহরণ চিত্রও ছিল না। কিন্তু পরে তিনি কতকগুলি অতি উজ্জ্বল মঞ্চ নকশা অঙ্কন করেন ও প্রকাশ করেন। তাঁর রচনার প্রকৃত মূল্য যে সমস্ত তত্ত্ব তিনি নিরূপণ করেন তারি জন্য। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নাট্যিক ক্রিয়াকে জোরালো করে তোলা। তিনি বুঝেছিলেন এটা সেটিং-এর উন্নতি দিয়ে ততটা করা সম্ভব নয় যতটা সম্ভব আলোক সম্পাতের দ্বারা। খুব উত্তেজনাত্মক দৃশ্য রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মঞ্চশিল্পী হিসেবে তিনি অভিনেতাদের শুধু সাহায্য করতে চেয়েছেন। তাঁর মত ছিল—মঞ্চে অভিনেতা উপস্থিত হলেই নাট্যিক অ্যাকৃশন ঘটতে পারে অর্থাৎ নাটক গড়ে ওঠে। অভিনেতা যদি না থাকেন তবে কোন নাট্যিক ক্রিয়াও থাকে না। মিথ্যে বলে তিনি চিত্রিত পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্য রচনা ত্যাগ করলেন। তিনি চেয়েছিলেন "প্লাস্টিক্" (Plastic) অর্থাৎ তিন মাত্রাযুক্ত সেট—কারণ অভিনেতাদের এই গুণ ছিল। তা ছাড়া অভিনেতাদের দৈহিক আচরণের সঙ্গে একমাত্র বাস্তব বস্তুরই সম্পর্ক থাকতে পারে অঙ্কিত দৃশ্য-পটের নয়। এর ফলে আপ্পিয়ার সেটিং পরিকল্পনা একটা কঠিন বাস্তবতার রূপ পেয়েছিল।

এই শান্ত পাণ্ডিত্যভরা জার্মান-সুইস্ ভদ্রলোক আমাদের চোখের সামনে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর কাজ ও সীমারেখা স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সেটিং-এর পরিকল্পনাই ছিল ত্রি-মাত্রিক—অভিনেতারা যাতে মঞ্চের সঙ্গে মিল রেখে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করতে পারেন। তিনি প্রত্যেকটি সিঁড়ি, ধাপ, স্তম্ভ, উঁচু-নীচু স্তর এবং সেটের ছন্দোবদ্ধ রেখা দেখিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের সীমারেখার মধ্যে মঞ্চ শিল্পে যতখানি বৈচিত্র্য আনয়ন এবং

অভিনেতার আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব, তিনি তারি চেষ্টা করেছেন। আপ্পিয়া পরিকল্পিত বৈশিষ্ট্যময় দৃশ্যসজ্জা যখন ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইতালীর মঞ্চে প্রদর্শিত হতে লাগল এবং এই রীতি সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন তিনি নবোদ্যমে সেটের অভ্যন্তরে "ড্রেপারী" (Drapery) বা নানা রকমের বস্ত্রসজ্জা ও পর্দা ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ড্রইং করতে লাগলেন।



আপ্পিয়া : মঞ্চে আলোক সম্পাত দ্বারা চিত্রাঙ্কন।

আপ্পিয়ার অবদান যে কেবলমাত্র সেটের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়,—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানই হল তাঁর সুচিন্তিত আলোকতত্ত্ব। আপ্পিয়া বুঝেছিলেন যে, মঞ্চে ত্রি-মাত্রিক স্থাপত্য রীতির ব্যবহারই যথেষ্ট নয় —কারণ জীবন্ত অভিনেতা এবং মৃত সেটিং-এর বৈপরীত্য তাতে যথার্থভাবে মোচন করা যায় না। তিনি এ কথার উপরে জোর দিলেন যে—তাদের সংযুক্ত করতে এবং নাটকীয় রূপ দিতে পারে একমাত্র "আলোক"। অর্থাৎ ভাল আলোক সম্পাতই অভিনেতা এবং তাঁর পরিবেশকে মিশিয়ে একটি অখণ্ড অস্তিত্বে প্রকাশ করতে পারে। এই আলোক কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্র থেকে চুইয়ে এলেই হবে না, কিংবা আলো ছায়ার বৈপরীত্য দেখালেই চলবে না—এই আলোকে হতে হবে "জীবন্ত-আলোক"। অর্থাৎ তিনি মঞ্চে এমন আলোক চাইলেন যা সময়ের গতির সঙ্গে পরিবর্তিত হবে অথবা যে আলোক

নাট্যকক্রিয়া এবং তার ভাবতাৎপর্যকে তীব্রতর করে তুলবে। মঞ্চে কোন স্থির চিত্র (Static) নেই, নাটকের গতি এবং অভিনেতাদের আচার আচরণের সঙ্গে একটি করে চিত্র গঠিত হচ্ছে এবং পরমুহূর্তে ভেঙ্গে গিয়ে নূতন চিত্র, নূতন কম্পোজিশন গড়ে উঠছে। মঞ্চে নাটকের গতির সঙ্গে অভিনেতারাও গতিশীল, কিন্তু মঞ্চস্থাপত্য স্থির অর্থাৎ মৃত—তাকে জীবন্ত করে তুলে, জীবন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে এক অখণ্ড সূত্রে বাঁধতে পারে একমাত্র গতিশীল, জীবন্ত আলোক। মঞ্চের চিত্রগুলি সময়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, এই চলমান সময়কে এবং পরিবেশের বিবর্তনকে নিয়ে আসবে আলোক। অর্থাৎ আলোর সাহায্যেই মঞ্চে অঙ্কিত হবে এক একখানি চিত্র—পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে যেখানে অভিনেতার মুড্ এবং মনঃসমীক্ষা ফুটে উঠবে।



আপ্পিয়া : আলোর পরিবর্তন।

আপ্পিয়া তাঁর রচনায় "ভাগনারের" গীতিনাট্য থেকে দৃশ্যের পর দৃশ্য তুলে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কি ভাবে সেটের বৈশিষ্ট্যময় প্রভাব, চলমান অভিনেতা এবং পরিবর্তনশীল আলোক এই সবগুলি একই অখণ্ড সত্তায় মিলিত হলে নাটকের অ্যাক্শন ঊর্ধ্বগতি পেতে থাকে। আপ্পিয়ার দৃশ্য পরিকল্পনার একটি সুন্দর উদাহরণ হল—ভাগনারের "সিগ্ফ্রিড্" (Siegfried) নাটকের একটি দৃশ্য। এতে দুই প্রধান চরিত্র কান পেতে বাতাসে বৃক্ষপাতার মর্মরধ্বনি শুনছিল এবং পাতার কম্পন দেখছিল। সেখানে আপ্পিয়া মঞ্চে

অরণ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাননি, তার বদলে চেয়েছেন অরণ্য পরিবেশের মধ্যে একটি মানুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। তাই আপ্পিয়া বলেছেন যে—দর্শকরা দেখবে, সিগ্‌ফ্রিড্‌ চলমান আলো ছায়ায় স্নাত হচ্ছে। সেখানে ক্যান্‌ভাস বা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো নেড়েচেড়ে মঞ্চকৌশল দেখানো হবে না। আপ্পিয়া "ডি ভাল্‌কিয়র্‌" (Die Walküre) নাটকের একটি দৃশ্যের জন্য সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে তেমনি একটি নকশা না করে পরপর ৭টি নকশা করেছেন এবং তাতে আলোর পরিবর্তিত খেলা এবং সঙ্গীতশিল্পীদের সঞ্চরণ গতি দেখিয়েছেন। ক্রেগ্‌ ছিলেন আপ্পিয়ার চাইতে থিয়েটার শিল্পে বেশি শিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। মঞ্চশিল্পের আগেই অভিনয় শিল্প তিনি শিক্ষা করেছিলেন। অভিনয় প্রতিভার উত্তরাধিকার তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—তাঁর মা ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী "এলেন টেরি" (Ellen Terry) এবং কলাকুশলীর প্রতিভা পেয়েছিলেন তাঁর পিতা "এডোয়ার্ড গড্‌উইনের" (Edward Godwin) কাছ থেকে। তিনি ছিলেন স্থপতি ও চিত্রশিল্পী—থিয়েটারের কতকগুলি দৃশ্যও অঙ্কন করেছিলেন। ক্রেগ্‌ নাট্য প্রযোজনা কালের কতকগুলি দৃশ্যসমস্যা নিয়ে চিন্তা করবার জন্য অভিনয় কলা ত্যাগ করলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিডো অ্যাণ্ড ঈনিসের প্রযোজনা কালে মঞ্চে তিনি মঞ্চবিদ্‌ হিসেবে ফিরে আসেন এবং তারপরে তিনি আরো ৬টি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তিনি এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার সময়ে তাঁর রচিত "দি আর্ট অব্‌ দ্যা থিয়েটার" বা অন্যান্য বই ও চিত্রাবলীর পন্থা কিন্তু অনুসরণ করেন নি।

ক্রেগ্‌ কখন চিত্র শিল্পীদের থিয়েটারের উপরে স্থান দিতেন না। তাঁর মতে মঞ্চ মানেই পেছনে একটা বিরাট অঙ্কিত ব্যাক্‌-ড্রপ্‌ থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। তিনি লিখেছেন যে—থিয়েটার যেন দৃশ্য প্রদর্শনীর একটা ক্ষেত্র না হয়ে ওঠে। এ এমনই একটি জায়গা যেখানে পূর্ণ জীবন-সৌন্দর্যের আবরণ উন্মোচিত হবে। অর্থাৎ জীবনের অন্তর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য বোঝা যাবে।

তাঁর এই মত সর্বক্ষেত্রেই খানিকটা প্রযোজ্য এবং উৎসাহবর্ধক কিন্তু তাঁর ছাপানো নকশাগুলি যে কোন প্রোসীনিয়াম্‌ তোরণের তুলনায়ই ছিল বিপুল আয়তন; তা ছাড়া এগুলি একাধারে যেমন ছিল সহজ, সরল, তেমনি ছিল আবার আড়ম্বরযুক্ত। মোটের উপর এ ধরনের নকশা মঞ্চের

পক্ষে মোটেই কার্যকরী ছিল না। ক্রেগ্ সংকেতের শক্তি কতখানি জানতেন। আপ্পিয়ার ত্রি-মাত্রার তাৎপর্যও তিনি বুঝেছিলেন। তাই খুব সুদূর দূরত্বের ক্ষেত্র ছাড়া "পারস্পেকৃটিভের" ব্যবহার তিনি করতেন না। তিনি তাঁর পরিকল্পনায় এবং ডিজাইনে এমন কোন স্থান রাখতেন না যেখানে অভিনেতারা গমন করতে না পারতেন। অবিশ্যি অভিনেতাকে দেখা যায় না এমন দূরত্ব হলে সেখানে তাঁদের গমন বাহুল্যবোধে বাদ থাকত। গর্ডন ক্রেগের মঞ্চ পরিচালনা এবং পরিকল্পনা তত্ত্বের দিক দিয়ে অনেকাংশেই আপ্পিয়ার মত ছিল। যদিও ক্রেগ্ অবাস্তবতা ও চরমপন্থার শেষ সীমানার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন বেশি। পরিকল্পনা ও নকশার দিকে বিশেষ অনুরাগ থাকায় এবং আবেগ প্রবণতার জন্য তিনি অনেক সময় অভিনেতাদের কথা এবং রঙ্গমঞ্চের সীমারেখার কথা দুই-ই ভুলে যেতেন। তবুও এ কথা স্বীকার পেতেই হয় যে, তাঁর রচিত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত উদ্দীপনাময় ও সুন্দর ছিল। অন্যান্য দৃশ্য পরিকল্পনাকারীদের উপর এবং আধুনিক নাট্যাভিনয়ের উপর তাঁর প্রভাব ছিল সুগভীর।

ক্রেগ্ একথা বুঝেছিলেন যে থিয়েটার বহুশিল্প এবং বহুশিল্পীর সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। এ কেবলমাত্র নাচ, গান, অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা বা আলোক সম্পাত নয় এই বিভিন্ন শিল্পের কতকগুলির বা সবগুলিরই সমন্বিত রূপ। তাই তিনি মনে করলেন যে, সবার উপরে এই সমন্বিত রূপটি যার কল্পনায় থাকবে এমন একজন কলাকুশলীর প্রয়োজন। বিষয়টা প্রথমেই তাঁর মনে পরিচালকের ভূমিকা হিসেবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি—কিন্তু ক্রমশঃই পরিচালকের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠতে লাগল।

১৯০৭ খ্রীঃ তিনি হেনরী আরভিং-এর দলে অভিনয় করতেন, তখনি তাঁর মনে হয় যে অভিনেতারা প্রকৃত শিল্পী নন। কারণ তাঁদের দৈহিক ক্রিয়া, তাঁদের মুখের অভিব্যক্তি, তাঁদের কণ্ঠস্বর—এ সব কিছুই বায়ু প্রবাহ এবং ভাবাবেগের উপরে নির্ভরশীল। ক্রেগ্ এর তিনটি পরিপূরক ভাবলেন, প্রথমতঃ অভিনেতার দেহভঙ্গিমা ইঙ্গিতধর্মিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। দ্বিতীয়তঃ মুখোশের পুনঃ প্রবর্তন করা, তৃতীয়তঃ অতি সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে পুতুল নাচানোর মত—কোন সুষমামণ্ডিত মহৎ কৃত্রিমতাকে অনুসরণ করা।

ক্রেগ্ তাঁর গঠন শৈলীতে যে বাহুল্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, আমরা তা ত্যাগ করব। তিনি যে বিপুলায়তন সেটের পরিকল্পনা করেছেন যা

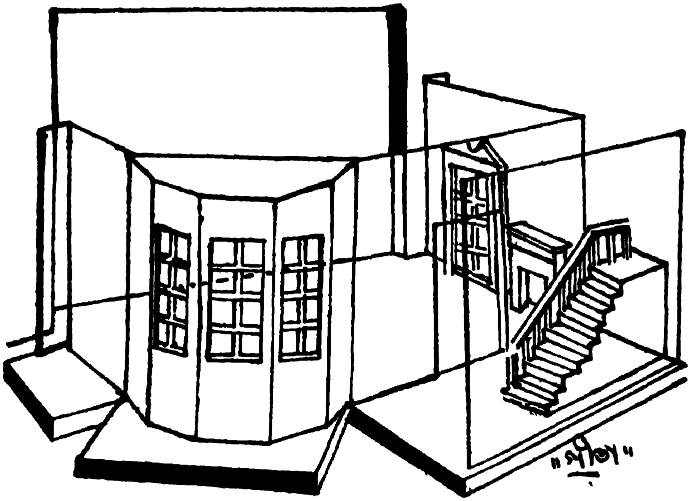
কেবল ডাব্লিন এবং অ্যাবি-থিয়েটারের মঞ্চেই হওয়া সম্ভব ছিল—আমরা তাও ত্যাগ করব। কিন্তু তাঁর রচনা ও পরিকল্পনার মধ্যে যে বিরাট প্রতিভা এবং গভীর অভিব্যক্তি ছিল নবযুগ তাই গ্রহণ করবে।

আপ্পিয়া ও ক্রেগ, স্টেজ-ক্রাফ্‌টের ক্ষেত্রে যে নবপদ্ধতির প্রবর্তন করলেন নাট্যপ্রয়োগের বহিরঙ্গে তা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। সংক্ষেপে সেই সূত্রগুলো হল—

: প্রথমে চাই উপকরণ এবং প্রভাবের সরলীকরণ। একটি সহজসরল সেটিং অভিনেতাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে, অতএব নাটকও অনেক প্রাধান্য পায়। এই সরলীকরণের প্রধান পন্থাই হল প্রতীকধর্মিতা। একটি গথিক স্থাপত্য-স্তম্ভ দর্শকদের কল্পনায় একটি বাস্তব শক্তিসম্পন্ন চার্চ হয়ে উঠবে। যেমন ফাউস্টে "মার্গারাইটের" (Marguerite) প্রতীয়মান হয়েছিল। মূলতঃ চাই সমন্বয়। নাট্য প্রযোজনা অতি পরিচ্ছন্ন হবে, তাতে স্বচ্ছন্দভাবে আসবে সেটিং, পোষাক, দৈহিকগতি এবং সঙ্গীত—যাতে অভিনয় নাটকটিকে যথাসম্ভব সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারে :

নবযুগের মঞ্চে ত্রি-মাত্রিক গঠনভঙ্গিমা যখন এল তখন তা প্রয়োগের জন্য উইংস্, ড্রপ্‌স্, সাটার্‌স্ ইত্যাদি ত্যাগ করতে হল—ফলে প্রয়োগকৌশল বাস্তবানুগ হোক বা না হোক সেটিং অত্যন্ত ওজনে ভারী হয়ে উঠল। সুতরাং তাড়াতাড়ি দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য নূতন যান্ত্রিক পদ্ধতির সন্ধান করতে হল। আগে দৃশ্য পরিবর্তনের সহায়ক ছিল গ্রুভ্‌স, চাকাওয়ালা গাড়ি, স্টেজ-বেকন্, ফ্লাইজের উপরে কপিকল, গ্রিড্-আয়রণ ইত্যাদি—নূতনকালে তা অচল হয়ে পড়ল। এর বিকল্প হিসেবে আর তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা চলেছিল জার্মানীতে। তার প্রথমটি হল "রিভলভিং স্টেজ" (Revolving Stage) বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। এই ধরনের মঞ্চ ১৮৯৬ খ্রীঃ "ল্যাটেন্‌শেইগার্" (Lautenschager) জাপান থেকে মিউনিকে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল চাকাওয়ালা ওয়াগনের ব্যবহার—যাতে পুরো একটা সেট বা একটা সেটের অংশবিশেষ বহন করে মঞ্চে আনা নেওয়া করা যায়। এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন "স্টীল্ ম্যাক্‌কাই" (Steele MacKaye) কিন্তু সার্থক ভাবে তাকে বার্লিনের মঞ্চে ব্যবহার করেন ১৯০০ খ্রীঃ "ফ্রিৎস্ ব্রাণ্ড্" (Fritz Brand)। তৃতীয় পদ্ধতি হল "এলিভেটর্ স্টেজ" (Elevator Stage) এতে ক্রেনের সাহায্যে সেট পরিবর্তন করা হত।

১৮৮০ খ্রীঃ স্টীল্ ম্যাক্‌কাই সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার করেন। ১৯০৪ থেকে ১৯১৩ খ্রীঃ মধ্যে তিনি ড্রেসডেনের দু'টি কোর্ট থিয়েটারে—ওয়াগন্ এবং এলিভেটর্ এই দু'পদ্ধতি যুক্ত করে ব্যবহাব করেন।

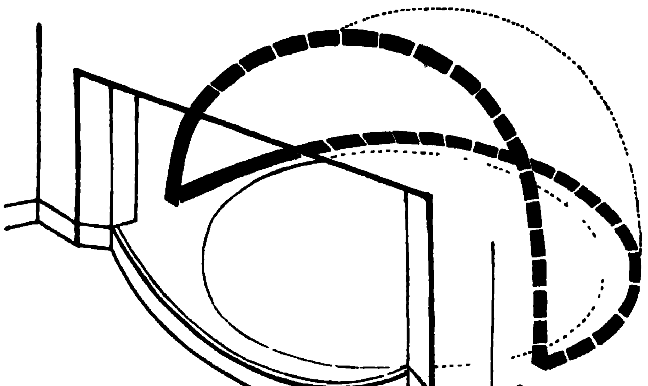


আধুনিক ওয়াগন্ স্টেজ।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বুথ্ তাঁর থিয়েটারে বক্স-সেটেব দেয়ালে এক বিশেষ বৈচিত্র্য আনেন। সেখানে দৃশ্যশিল্পীরা আধুনিক তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একটা বিরাট প্রাসাদের ইঙ্গিত অত্যন্ত বিস্তৃত ও নিখুঁতভাবে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ প্রাসাদের এক অংশ মাত্র অতি চমৎকারভাবে আঁকা হল, সীমাহীন বাকী অংশ দর্শকদেব কল্পনার উপরে ছেড়ে দেওয়া হল।

উনবিংশ শতকে মঞ্চ শিল্পে সবচেয়ে বড সমস্যা হয়ে উঠেছিল বোধ হয় কি করে ফুট্ লাইটের আলোকে বাঁকিয়ে ফেলা যায় অর্থাৎ অভিনেতার মুখে সোজাসুজি প্রখর আলো না পড়ে। দ্বিতীয় সমস্যা হল স্থাপত্য সঙ্গত আলোক কি-করে পাওয়া যায়। যার ফলে বস্তুর ও অভিনেতার ত্রি-মাত্রা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ১৮৮২ খ্রীঃ প্যারিসের "সোভোয়" থিয়েটারে সর্বপ্রথম "ইনক্যান্‌ডেসেন্ট্ বাল্বস্" (Incandescent bulbs) ব্যবহৃত হয় এই একই সময়ে লণ্ডনের মঞ্চেও বিদ্যুতালোকের প্রয়োগ হয়। প্রথম অবস্থায় এগুলি অত্যন্ত

দুর্বল ছিল তাই শক্ত খিলানে ব্যবহার করা যেত না। ক্রমে এর আলোক শক্তি বেড়ে চলল, তাতে রিফ্লেক্টর্ এবং লেন্স্ ব্যবহার করে শক্তি আরো বাড়ানো হল। ১৯১০ সালে এই আলোক প্রেক্ষাগৃহের সিলিং বীমে লাগান হল, ১৯১২ সালে লাগান হল সামনের ব্যালকনির সঙ্গে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে "মারিয়ানো ফর্চুনি" (Mariano Fortuny) নামে একজন ইতালীয়, যিনি জার্মানীর মঞ্চেই কাজ করতেন তিনি ফুট্ লাইট্ ও বর্ডার্ লাইটের আলোকে কোমল করবার জন্য রঙিন সিল্কের ভিতর দিয়ে তাকে প্রতিফলিত করেন ফলে মঞ্চে নানা রঙের আলো এল। এইভাবেই মঞ্চে স্বাধীনভাবে আলোক সম্পাতের বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলি একে একে সংগৃহীত হতে লাগল। মারিয়ানোর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল "সাইক্লোরামা" (Cyclorama) এবং বর্ডার্ লাইটের পরিবর্তন ঘটান। মঞ্চের সাইক্লোরামা হল স্টেজের পশ্চাদ্‌বর্তী ধূসরবর্ণের একটি পর্দা। এরই উপরে বহুবর্ণের আলোক সম্পাত দ্বারা আকাশ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশ রচনা করা হয়। মারিয়ানো এই



ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এবং স্কাই-ডোম্।

সাইক্লোরামার স্থানে নিয়ে আসেন "স্কাই-ডোম্ বা কুপ্পেলহোরিজন্ট্" (Sky-dome or Kuppelhorizont) ব্যবহারের পরিকল্পনা। এটিও আকাশেরই বিকল্প কিন্তু সাইক্লোরামার মত কেবল পশ্চাতে না থেকে—উপরদিক থেকে আপ্-স্টেজের কিনারা পর্যন্ত সমস্ত মঞ্চটি আচ্ছন্ন করে থাকবে। এই ডোমের

আচ্ছাদনের মধ্যে তাড়াতাড়ি দৃশ্যপরিবর্তনের জন্য রিভলভিং স্টেজ বা এলিভেটরই হল বিশেষ উপযোগী।

নূতন যুগের এই মঞ্চশিল্পের একটি মনোরম অংশ হল ভাঙ্গাভাঙ্গা রঙের ব্যবহার। ১৮৭৪ সালের পর থেকেই ইম্প্রেশনিস্ট্ চিত্রশিল্পীরা তাঁদের পেইন্টিং-এ এক নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। শিল্পীরা আগে সব সময়েই ছায়াকে—ব্রাউন, ছাই-রং বা কালো করে আঁকতেন—ইম্প্রেশনিস্ট্রা ছায়ার মধ্যেও বেগুনী, সবুজ, নীল, লাল ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই ইম্প্রেশনিস্ট্দের দলভুক্ত ছিলেন ক্লোদ্ মনে, মানে, দেগা, সেজান, রেনোয়ার্ প্রভৃতি শিল্পীরা। তাঁরাই সর্বপ্রথম পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বসিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলোক ছবিতে আনতে চাইলেন। এই শিল্পীরা দেখালেন যে, বিভিন্ন বর্ণের ছোট বড় ফুটকি, ছোট ছোট আঁচড় বা চাপচাপ খাঁটি রং পাশাপাশি বসিয়ে যে কোন প্রার্থিত বর্ণ-বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করা যায়। পরবর্তীকালের বহু প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীই এই পথে অমর চিত্রাঙ্কন করেন—এই নবপদ্ধতিকে—"নিও-ইম্প্রেশনিজম্," "পয়েন্টিলিজম্," "ডিভিশনিজম্" ইত্যাদি বহুনামেই অভিহিত করা হয়েছে। মারিয়ানো চিত্রশিল্পের এই পরিবর্তনটিই মঞ্চে নিয়ে এলেন। তবে তিনি চিত্র আঁকলেন প্যালেটের রং দিয়ে নয়—আলো দিয়ে। তিনি পুরাতন পদ্ধতির ছায়া তো ত্যাগ করলেনই তদুপরি ফ্লাট্-টোন্ বা একঘেয়ে বর্ণ-প্রলেপও ত্যাগ করলেন—এবং তার পরিবর্তে সেটের উপরে তিনি আলোর সাহায্যে বহু বর্ণের ফুটকি, ছাপ ও ডোরা ফেলতে লাগলেন, এইভাবেই নবধারার আলোক সম্পাতে সেটের ক্যান্ভাস ঢাকা পড়ে গেল এবং আলোক চলমান হওয়ায়, তার প্রভাবও হল জীবনানুগ ও সুন্দর।

॥ রাইনহার্ট ॥

একজন অভিনেতা হিসেবে "রাইনহার্ট" (Reinhardt) তাঁর শিল্পী জীবন আরম্ভ করেন তাঁর স্বদেশ অস্ট্রিয়ায়। অটো ব্রাহ্ম্ ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাশালী শিল্পীকে আবিষ্কার করেন। পরবর্তী ন'বছর রাইনহার্ট "ডয়েশেজ্ থিয়েটারে" (Deutsches Theater)' ব্রাহ্ম্ কম্প্যানীর একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী সভ্য হিসেবেই কাটান। ক্রমে ব্রাহ্মের সঙ্গে রাইনহার্টও নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা করতে সুরু করেন। প্রথমে তিনি সঙ্গীত ও

প্যারোডি বা ব্যঙ্গগীতি পরিচালনা করতেন শেষপর্যন্ত তিনি "নয়েজ্ অ্যাণ্ড স্মোক্ বা শাল্ আণ্ড রাঙ্ক্" (Noise and Smoke or Schall und Ranch) ধারার আধুনিক যুগের নাটক পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯০২ খ্রীঃ "ক্লাইন্‌জ্ থিয়েটার" (Kleines Theater) প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে রাইনহার্ট একের পর এক স্ট্রিণ্ডবার্গের "দেয়ার আর্ ক্রাইমস্ অ্যাণ্ড ক্রাইমস্" (There Are Crimes and Crimes), অস্কার্ ওয়াইল্ডের "সালোমে" (Salome), ওয়েদেকাঁদের "আর্ডগাইস্ট্" (Erdgeist) এবং গোর্কির দ্য লোয়ার্ ডেফ্‌থস্ প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ নববর্ষের দিন তিনি ব্রাহ্‌ম্‌কে ত্যাগ করেন এবং "ন্যুয়েজ্ থিয়েটারে" (Neues Theater) এক নূতন কম্প্যানী খোলেন। ১৯০৫ সালে রাইনহার্ট তাঁর প্রথম সার্থক পরিচালনা দেখান এ মিড্ সামার্ নাইট্‌স্ ড্রিম্ নাটকখানিতে। এই নাটকখানির দৃশ্যাবলী কেবল যে রিভলভিং স্টেজে রচিত হয়েছিল তা নয়—এই নাটকের পরীদের এবং তাদের সঙ্গীসাথী কারুশিল্পীদের দৃশ্যগুলি দেখিয়েছেন স্বপ্নসম্ভব—পরিবর্তনশীল, গতিময় মঞ্চে। এই নাটকে এবং অন্যান্য বাস্তবানুগ নাটকের প্রয়োগকালে তিনি থিয়েটার জগতের সমস্ত প্রাচীন প্রথাকেই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তার পরিবর্তে আনলেন নিখুঁত বিস্তৃত, কল্পনাসম্ভূত প্রয়োগশৈলী। রাইনহার্টের সাফল্য এত বিপুল হল যে ১৯০৫ খ্রীঃ ডয়েশেজ্ থিয়েটার পরিচালনার জন্য তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়—এই থিয়েটারের দায়িত্বই একদিন ছিল তাঁর পুরাতন প্রভু ব্রাহ্‌ম্-এর উপরে।

রাইনহার্ট ডয়েশেজ্ থিয়েটারের মতই আর একটি বিশালাকার থিয়েটার তৈরী করালেন—তার নাম দিলেন "ক্যামার্‌স্পিয়েল্" (Kammerspiele) সেখানে তিনি ওয়েদেকাঁদের দি অ্যাওয়েকেনিং অব্ স্প্রিং নাটক পরিচালনা করে নূতন ও ভিন্ন ধরনের সাফল্য অর্জন করলেন।

ক্যামার্‌স্পিয়েল্ স্থাপন থেকে সুরু করে ১৯৩৮ খ্রীঃ আমেরিকায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন অতি বিচিত্র। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু স্থানে নাটক পরিচালনা করে বেড়ান—মিউনিক্, ভিয়েনা, প্যারিস্, ভেনিস্, স্টকহোল্‌ম্, হোলিউড, লণ্ডন প্রভৃতি শহরের ছোটখাটো রঙ্গালয় থেকে বিপুল আয়তন "সার্কাস শুম্যানে" (Circus Schumann) রাজা অয়দিপউস্ নাটকের অভিনয় পর্যন্ত সকলি করেন।

পরে তিনি সার্কাস শুম্যানের বাড়িটা ভেঙ্গে চুরে নূতন এক রঙ্গালয় তৈরী করেন,—এর রঙ্গমঞ্চে তিনি স্কাই-ডোম, রিভলভিং-স্টেজ, ডিপ্-ফোরস্টেজ ইত্যাদি আধুনিক মঞ্চস্থাপত্যকে গ্রহণ করেন। এই রঙ্গালয়ে ৩৫,০০০ দর্শক বসবার আসন ছিল। লণ্ডন শহরেও এমনি বিপুল আয়োজন করে তিনি দ্যা মিরাক্‌লের প্যান্টোমাইম্ অভিনয় দেখান। ভিয়েনা, বার্লিন, নিউইয়র্ক, প্রভৃতি শহরে চার্চের সম্মুখে তিনি এভ্‌রিম্যান্ ও ফাউস্ট্ নাটকের অভিনয় করেন। এই ভাবেই তিনি সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকা নাটক ও অপেরা দিয়ে জয় করে বেড়ান। যে সমস্ত নাটকে তিনি সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা হল হ্যামলেট, রাজা অয়দিপউস্, গ্যেটের "ক্লাভিগো" (Clavigo), পিরান্‌দেল্লোর "সিক্স ক্যারেক্‌টারস্ ইন সার্চ অব্ অ্যান অথর্" এবং তলস্তয়ের "দ্যা লিভিং ক্রপ্‌স্"। আপ্পিয়া এবং ক্রেগের রচনায় যা ছিল কল্পনা এবং তত্ত্বমাত্র তা অন্যান্য থিয়েটার পরিচালকদের সাহায্য করলেও তার প্রকৃত ভাষ্যকার ছিলেন রাইনহার্ট। রাইনহার্টের মৌলিক প্রতিভা অভিনেতা ও পরিচালকের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক প্রোডাকৃশনের জন্যই তাঁর মনে আলাদা আলাদা চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে—এবং মঞ্চে তিনি তার প্রত্যক্ষরূপ দিয়েছেন। তাঁর কাছে থিয়েটারের কোন অংশই অবহেলিত হয়নি। প্রোডাকৃশনকে উচ্চমার্গে তুলবার জন্য এবং তার মধ্যে নূতনত্ব আনবার জন্য তিনি তার প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত করে গড়তে চেয়েছেন। অভিনয়, প্যান্টোমাইম, নৃত্য, সঙ্গীত, আলোক সম্পাত, মঞ্চপরিকল্পনা—কোনটির প্রতিই তাঁর সামান্য অবহেলা ছিল না। তাঁর চিন্তাকে কার্যে রূপ দিতে পারবেন এমন কলাকুশলীদেরই তিনি খুঁজে বেছে নিতেন। তিনি নিজে কোন নাটক লেখেননি কিন্তু বহু নাট্যকারকেই তিনি নাট্য রচনায় প্রণোদিত করেছেন। সব যুগের সব রকম নাটকই তিনি মঞ্চস্থ করেছেন—সোফোক্লেস্ ও এউরিপিদেসের নাটক প্রযোজনা করেছেন, করেছেন মধ্যযুগের—মিরাক্‌ল্ বা এভ্‌রিম্যান্ গোষ্ঠীর নাটক, আবার করেছেন, আধুনিক যুগের গ্যেটে, শিলার, মাতেরলিঁ্যক, শ', ও' নীল, বুচার্ প্রভৃতি অগণিত প্রখ্যাত ও অখ্যাত নাট্যকারের নাটক।

আপ্পিয়ার পদ্ধতিতে রাইনহার্টের সাফল্যে যে নূতন মঞ্চশিল্পের সৃষ্টি হল তা অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড পার হয়ে আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়ল। নিউইয়র্কে প্রথম আধুনিক মঞ্চ উপস্থাপনা কৌশল দেখান রাইনহার্ট, তাঁর

ওরিয়েণ্টাল্ প্যাণ্টোমাইমে। এই নূতন পদ্ধতি বোস্টনবাসীকে কৌতূহল-দীপ্ত করে তুলল। ১৯১১ সালে অ্যাবি থিয়েটারের "উইলিয়ম্ বাট্‌লার ইয়েট্‌স" (William Butler Yeats) হারভার্ডে গর্ডন ক্রেগ্ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বোস্টনের অপেরা হাউজের জন্য অস্ট্রিয়াবাসী "জোসেফ্ আরবানের" (Joseph Urban) অঙ্কিত দৃশ্যাবলী আনানো হয়, পরে স্বয়ং আরবান্‌কেই মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোক সম্পাতের জন্য আনা হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীঃ সৌখিন "টয় থিয়েটার" (Toy Theatre) আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯১৩ খ্রীঃ হারভার্ডের এক নাট্যকেদল "দ্যা কমেডি অব্ এরার্‌স্" নাটকখানি নব মঞ্চ পদ্ধতিতে প্রযোজনা করেন। এক বছরের মধ্যেই ক্রেগের প্রাক্তন ছাত্র "স্যাম্ হিউম্" (Sam Hume) হারভার্ড থেকে কিছু দূরে নূতন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে দৃশ্যসজ্জা করে অভিনয় দেখান।

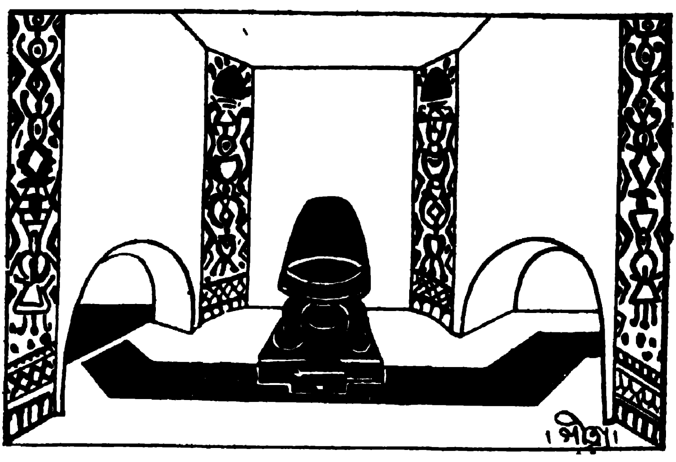
১৯১৫ সালে একজন আমেরিকানের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কে আপ্পিয়া ও ক্রেগের নবপদ্ধতি গ্রহণ করে নাটকের দৃশ্যাবলী রচিত হয়। অভিনীত নাটকটি ছিল "আনাতোল্ ফ্রাঁসের" (Anatol France) মধ্যযুগীয় একটি ফার্স—"দ্যা ম্যান্ হু ম্যারিড্ এ ডাম্ব্ ওয়াইফ্" (The Man Who Married a Dumb Wife) বার্নার্ড শ' এর "অ্যাণ্ড্রোক্লেস্ অ্যাণ্ড দ্যা লায়ন" নাটকটির সঙ্গে এই ফার্সটি দেখানো হয়। এই নাটকের সেটিং করেন—"রবার্ট এডমণ্ড জোন্‌স্" (Robert Edmond Jones) তিনি রাইনহার্টের বার্লিন থিয়েটারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর ধূসর ও সাদা বর্ণের সেটিং-এর সঙ্গে উজ্জ্বল-বর্ণ পোষাকের ব্যবহার যে বিস্ময়কর বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছিল তাই হয়ে উঠল পরবর্তী থিয়েটার শিল্পের পথ প্রদর্শক। এই পন্থায় অগ্রসর হয়ে জোন্‌স্ দ্যা জেস্ট্, রিচার্ড দ্যা থার্ড, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করে নিজেকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মঞ্চ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জোন্‌সের প্রদর্শিত পথেই "লী সাইমন্‌সন্" (Lee Simonson) ওয়াশিংটন স্কোয়ার প্লেয়ারদের জন্য নাটকের ডিজাইন তৈরী করেন। এরপরে লী মঞ্চতত্ত্ব ও আলোক সম্পাত সম্পর্কে কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ "নর্মান্ বেল্ গেডেস্" (Norman Bel Geddes) রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ সুরু করেন। তিনি প্রোসীনিয়াম্ ছাড়াই মঞ্চ নকশা রচনা করেন। অতঃপর তিনি "দ্যা ট্রুথ অ্যাবাউট ব্লেড্‌স্" (The Truth About Blayds) ও "ডেড্ এণ্ড" (Dead

End) নাটক দু'খানিতে রিয়ালিজমের পথেই চলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশি নাম হয় যখন তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে রাইনহার্টের "দ্য মিরাক্‌ল্" একটি ক্যাথিড্রালে প্রদর্শন করেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত প্রখ্যাত আমেরিকান মঞ্চবিদ্‌রা আসেন—তাঁরা হলেন—"ক্লিয়ন থ্রকমর্টন" (Cleon Throckmorton), "ডোনাল্ড ওয়েনস্‌লেজার" (Donald Oenslager), "বোরিস্ অ্যারন্‌সন" (Boris Aronson) এবং "মরডেকাই গোরেলিক্" (Mordecai Gorelik) ইত্যাদি। সাইমন্‌সন্ ও গেড্ডেসের মতই থিয়েটার নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন গোরেলিক্ এবং জোন্‌স্।

১৯১২ খ্রী: নাট্যশিল্পে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেল লিট্‌ল্ থিয়েটারস্ নামে এক সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়। এরা ইউরোপীয় নাটকের অভিনয়



স্টাইলাইজড্ এবং রোমান্টিক নকশার মিশ্রণ।
এম্পেরর জোন্‌সের সিংহাসনগৃহ : প্যারিস্।

দেখাত। স্যাম্ হিউম্ ও তাঁর সহকারীদের চেষ্টায় এই সময়েই প্রখ্যাত নাট্যবিদ্ "শেল্‌ডন্ চেনী" (Sheldon Cheny) থিয়েটার আর্ট নামে পত্রিকার সম্পাদক হয়ে আসেন।

॥ অভিব্যক্তিবাদ

ইউরোপে নাট্যপ্রয়োগ শৈলীগত বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা এইভাবে দিতে পারি—জার্মানীতে ব্রাহ্‌ম্ (Brahm) এবং রাইনহার্ট, রাশিয়ায়—মস্কো আর্ট থিয়েটার, ফ্রান্সে—আঁতোয়ান্ এবং তেয়াত্র লিব্র, ইংল্যাণ্ডে এলেন গ্রেইন্ এবং বার্কার (Barker)। এক কথায় বলা চলে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের নাট্যপ্রচেষ্টা রিয়ালিজমের দিক থেকে গতি পরিবর্তন করে আরো বৃহত্তর, মুক্ততর অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু তবু মুক্তি তার আজো মিলল না—অতি আধুনিক যুগে এসে দেখি—নানা ইজমের গোলক ধাঁধায় সে দিশাহারা—সে এখন প্রভাহীন, নাট্যধর্মিতা এবং বিশৃঙ্খলার কানাগলিতে পথভ্রান্ত।

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধপরাজিত, মোহমুক্ত জার্মানীর সামনে আসে "এক্‌সপ্রেশনিজম্" (Expressionism) বা অভিব্যক্তিবাদ। ১৯২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এক্‌সপ্রেশনিজমের শৈশবকাল কাটে এক ভগ্নজাতির মানসিক অসাম্যের ভিতরে। এই এক্‌সপ্রেশনিজমের শিকড় কিন্তু আরো অনেক গভীরে ছিল। এর কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ওয়েদেকাঁদের নাটকে এবং স্ট্রিণ্ডবার্গের শেষের দিককার নাটকগুলিতে। এই সুইডিস্ লেখকের "টুওয়ার্ড ডামাস্কাস্", "দ্যা স্পূক সোনাটা" এবং "দ্যা ড্রিম্ প্লে" ইত্যাদি নাটকে আমরা দেখি অজানা, অদ্ভুত, ভগ্ন ও অপার্থিব মনুষ্য মূর্তি—তারা চেষ্টা করছে ঘুরানো, পাকানো, ইঙ্গিতময় অভিব্যক্তিতে বিমূর্তভাব ও কল্পনাকে মূর্তিমান করে তুলতে।

সাধারণ লোকের কাছে এক্‌সপ্রেশনিজম্ শব্দটি অত্যন্ত অস্বচ্ছ। আমরা এক্‌সপ্রেশনিজম্‌কে রিয়ালিজমের অর্থাৎ বাস্তববাদের একেবারে বিপরীত কোটির অবাস্তববাদের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের শিল্পশৈলী করতে পারি। সবরকম অবাস্তববাদীরাই হলেন চরমপন্থী। তত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁরা সঙ্গীতকেই খাঁটি শিল্প প্রতীক হিসেবে ধরেছেন। ১৯০১ সালে "মাতিসের" (Matisse) একটি প্রদর্শনীর চিত্রাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে। দশবছর পরে "পিকাসো" (Picasso) এবং "কান্দিন্‌স্কি" (Kandinsky) এই পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করেন। চিত্রশিল্পে এই রীতি যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে—অবশ্যই থিয়েটার শিল্পে তা সম্ভব হয়নি। বরং

বলা চলে চিত্রশিল্পীরাই রঙ্গমঞ্চে পথনির্দেশ করেছেন অভিব্যক্তিবাদের। সঙ্গীতের স্বরলিপিকাররা শব্দকে নিয়ে যেমন সুর গড়েন, ভাঙেন, খেলা করেন—এঁরাও তেমনি আলোকে নিয়ে সুরের খেলায় মেতে উঠলেন।

ধরা যাক, একজন ন্যাচারালিস্ট্, একজন ইম্প্রেশনিস্ট্ এবং একজন এক্‌সপ্রেশনিস্ট্ চিত্রশিল্পী ঠিক করলেন যে মুক্ত প্রান্তরের বুকে এক পুরাতন ঝাউ গাছের ফাঁকে ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটে উঠছে এমন একটি চিত্র আঁকবেন। যিনি ন্যাচারালিস্ট্ তাঁর কাজ অনেক সহজ, সুনিশ্চিত এবং বোধগম্য হবে। তিনি আমাদের কাছে সেই প্রাচীন বৃক্ষটি অতি স্বাভাবিক আকারে পূর্ণ বর্ণ ও সুষমায়, ফটোগ্রাফের মতই যথাযথ ভাবে তুলে দিতে চেষ্টা করবেন। ইম্প্রেশনিস্ট্ আর একটু বাঁকানো পথে যাবেন, তিনি এসে বলবেন—আসল দ্রষ্টব্য এবং ধর্তব্য বিষয় হল গাছটি সম্পর্কে আমার ধারণা অর্থাৎ দেখেই মনে যে ছাপটি পড়ল—"ইম্প্রেশন্" জন্মাল তাই, এটাই হল গাছের আসল রূপ। আমাদের ইম্প্রেশনিস্ট্ বন্ধুর মনে এই গাছটি হয়তো একান্ত শূন্যতাময়, অতিবিষণ্ণ, একাকী হৃদয়ের গৃহকাতরতার ভাবটি জাগিয়ে তুলেছে। সুতরাং তাঁর অঙ্কিত চিত্রে আমরা হয়তো দেখব যে, প্রভাতের সূর্য উঠলেও সেই গাছটি কুয়াশাচ্ছন্ন। বিশেষ ভাবটি ফোটাতে ছবিতে তিনি হয়তো ব্যবহার করবেন—অস্পষ্ট ঘোলাটে নীল, শীতল শান্ত সবুজ, এবং অতিকোমল বেগুনী রং। ছবিতে তিনি জীবনের অস্তিত্ব বাচক কোন উজ্জ্বল বর্ণ অর্থাৎ লাল, হলুদ বা কমলা রং ব্যবহার করবেন না। সর্বত্র ক্লান্ত, ম্লান, একাকী অবসন্নতাকেই ছবির মধ্যে অতিপ্রধান করে দেখানো হবে। তবুও যখন চিত্রটি শেষ হবে তখন কিন্তু সে ঐ বৃক্ষের কোন বৈশিষ্ট্যময় অস্তিত্বের সাক্ষ্য ঠিকই বহন করবে। এরপর যিনি এক্‌সপ্রেশনিস্ট্ তিনি হয়তো বলবেন—আমি আদৌ কোন বৃক্ষই আঁকতে চাই না, শুধু ফুটিয়ে তুলতে চাই বিষণ্ণতা ও একাকিত্বের এক নির্যাস। এই একাকী প্রাচীন ঝাউ গাছটি দেখে আমার মনে যে জটিল ভাবের আবর্ত, যে সুগভীর হতাশা ফুটে উঠেছে চিত্রটি অঙ্কিত হবে সেই হৃদয়-ভাবেরই—বৃক্ষের নয়। অতএব এর ফলস্বরূপ তিনি চিত্রাঙ্কনের সময় রং, স্থান, ওজন, ছন্দ, আকার সকলি ব্যবহার করবেন, কিন্তু তা ঐ বৃক্ষের সঙ্গে ছবির কোন প্রকার আকৃতিগত মিল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে। যেমন উদাসীন থাকেন সঙ্গীত-সুরকার, ঐ বৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবাহিত

হওয়ার শব্দ বা কোন একটা মৃত ডালে একাকী এক চড়াইয়ের ডাকের স্বরলিপি রচনা কালে। সুতরাং এক্সপ্রেশনিস্টের আঁকা ছবিখানি ক্রমশঃ গিয়ে এক অস্তিত্বহীনতায় পৌঁছবে, যেখানে প্রকৃত গাছটির কোন চিহ্নাবশেষই আর নেই, এটা হয়তো অন্য কোন একটা বৃক্ষের মত দেখাবে বা দেখাবে কোন অক্টোপাস আকাশে আঙ্গুল মেলে আছে কিংবা এমন কোন একটি রূপ যাতে শিল্পী তাঁর মনের বিষণ্ণতা ও একাকিত্বের ভাবনির্যাসটুকু প্রকাশ করতে পারেন।

মঞ্চে 'এক্সপ্রেশনিজমের' উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় ১৯১৬ খ্রীঃ "ওয়ালটার হাসেন্‌ক্লেভারের" (Walter Hasenclever) রচিত "ডের্ সোন্" (Der Sohn-The Son—১৯১২ খ্রীঃ) নাটকের অভিনয়ে। এ নাটক পরে ১৯১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সাধারণ প্রদর্শনের জন্য আইন করে বন্ধ করা হয়। রাইনহার্ট নিজে এক্সপ্রেশনিজম্ পছন্দ করতেন না, তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ রীতির একটি নাটক প্রযোজনা করেন। "সোর্‌গের" (Sorge) "ড্যা বেগার্" (Der Bettler-The Beggar), "আর্নস্ট টোলরের" (Ernst Toller) "ড্যা ট্রান্স্-ফর্মেশন" (Die Wandlung-The Transformation) নাটক দু'খানি এই পদ্ধতিতে কার্ল হেইন্‌ৎস্ মার্টিন্ মঞ্চস্থ করেছিলেন। বার্লিন ছাড়াও জার্মানীর অন্যান্য বহু রঙ্গমঞ্চেই এই নব রীতিতে নাট্যাভিনয় হয় কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে অভিব্যক্তিবাদী নাটক মূর্ত ও বিমূর্ত এই দুই ধারার অপূর্ব মিশ্রণে গঠিত। এর প্রচেষ্টা হচ্ছে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন বাড়ান; বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে—ঊর্ধ্বে ও দূরে চলে এসে বিষয়ের কেবলমাত্র ভাবসত্যকে প্রকাশ করা। এই নাটকের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এর মধ্যে রয়েছে এক বিদ্রোহী মন—কখন এ যুদ্ধকে আক্রমণ করেছে, কখন বিংশ শতাব্দীর অতি ব্যস্ততাকে, কখন যান্ত্রিক সভ্যতাকে, আবার কখন বা সমাজ বা পিতামাতার শাসনকে। এর গঠনভঙ্গি বলিষ্ঠ কাহিনীরই উপযুক্ত কিন্তু এর কথোপকথনে গীতিকাব্য থেকে সুরু করে অতি সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাফিক ভাষাও রয়েছে, এর চরিত্রগুলিও সাধারণ মানবচরিত্র না হয়ে টাইপ্ চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ ধরনের নাটক এবং তার প্রয়োগকৌশল মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী, ভাবাশ্রয়ী নয়। ভাবের আশ্রয় যতখানি সার্বজনীন হয়ে ওঠে, ব্যক্তি মানসের মননের প্রকাশ তাও আবার জটিল উপস্থাপনায় ততখানি কখনই

সার্বজনীন হয়ে ওঠে না। এই জন্যই অভিব্যক্তিবাদ, বিমূর্তবাদ, কিমিতি নাটক (Absurd Drama) এবং অন্যান্য বহু বাদই অত্যন্ত উন্নত চিন্তাশীলতার প্রকাশ হলেও সাধারণের সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। নাটকের ঐতিহ্যে দেখা যায় মুষ্টিমেয় পরিশীলিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সে বাঁচেনি আপামর জনসাধারণের সুখদুঃখ ভালমন্দের সে সঙ্গী হয়েছে, পথ দেখিয়েছে সেখানেই তার শক্তি তাই সহজ কথা সহজেই তাকে বলতে হয়েছে।

এক্স্‌প্রেশনিস্ট্‌রা ঠিক অ্যাবস্ট্রাক্ট্‌ অর্থাৎ বিমূর্তবাদী নয়,—তারা একটা রূপ দেয় সত্য কিন্তু সেটা বিকৃত এবং ঘুরানো। বাস্তব রূপগুলোকে অস্বীকার পেয়ে তারা তাদের মনের রূপটাকে প্রকাশ করে—সেটা অনেক সময় মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ধরে হয়। অভিব্যক্তিবাদে বিষণ্ণতা, বেদনা, বিচ্ছেদকাতরতা, সংযত গাম্ভীর্য, তিক্ততা, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রবণতাই বেশি। অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে এমন কোন নিজস্ব উপাদান নেই যার ফলে "কমিক্‌" বা অন্যকোন "মুড্‌" তার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক্‌সপ্রেশনিজম্‌কে "ইঙ্গিত" দ্বারাই বরং প্রকাশ করা যায়—সুঅঙ্কিত, সুগ্রথিত দৃশ্যসজ্জা দ্বারা তা সম্ভব হয় না। যেমন একটি গথিক ধরনের খিলান সমগ্র ক্যাথিড্রালটি বুঝিয়ে দেয়। কিংবা একটি বরফাচ্ছন্ন গাছ মৃত্যুর "সিম্বল" হয়ে ওঠে। এই ধরনের প্রয়োগ শৈলীতে মঞ্চ কোথাও হয় সমতল, কোথাও কৌণিক, কোথাও ভাঙ্গাচোরা। কোন একটি চিন্তাকে প্রকাশ করবার জন্য মঞ্চে অনেক সময় কোন চিহ্ন বা সংখ্যাকেও ব্যবহার করা হয়। এই রীতি অনেক সময়ই দৃষ্টি বিভ্রমকারী হয়ে ওঠে, মনকে সচকিত করে তোলে—এবং তার প্রভাব ক্রমশঃই হয় দুর্বোধ্য। এক্‌সপ্রেশনিস্ট্‌ চিত্রশিল্পীরা যেমন বিভিন্ন রং-এর সাহায্যে তাদের হৃদয়ভাবগুলি চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখে, হয়তো তেমনি মঞ্চবিদ্‌রা একদিন এই সত্যে উপনীত হবে যে, সঞ্চরণশীল আলোকপ্রবাহ দ্বারাই চোখের সম্মুখে সঙ্গীতের নিঃসীম সুর-জাল সৃষ্টি করা যায়। সাধারণতঃ একটি মাত্র স্টেজ সেটিং-এ বা একটিমাত্র অঙ্কিত চিত্রে এই শ্রেণীর ভাবাভিব্যক্তি একান্ত সীমিত এবং স্থির এক রূপ পায়। এই জন্যই রঙ্গমঞ্চে "এক্‌সপ্রেশনিজমের" প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ বিশেষভাবেই আলোকশিল্পের উপর নির্ভরশীল। এই আলোক সম্পাতই বর্ণে এবং আকৃতিতে এক তরল

স্বচ্ছন্দ গতিময় সঞ্চরণশীলতা আনতে পারে। সঙ্গীত যেমন নাট্য বা নৃত্যের ভাব ও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সদা পরিবর্তনশীল থাকে, তেমনি মঞ্চের উপরে আলোক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ও সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রূপ, রেখা এবং বর্ণের সম্মিলিত বিবর্তন ঘটিয়েই ধারাবাহিক ভাবে মঞ্চ পরিকল্পনা ও দৃশ্যসজ্জাকে পরিবর্তিত করে যেতে পারে। মানুষ যদি তার বৈদ্যুতিক শক্তির কিছু অংশও মঞ্চসজ্জায় ব্যয়িত করে, তবে হয়তো সে একদিন তার দৃষ্টির সামনে স্বপ্নলোকের কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলবার প্রকৃত মাধ্যমের সন্ধান পাবে।

এই নূতন পথের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোর্গে এবং হাসেনক্লেভার্ এ ছাড়া ছিলেন "গর্জ কাইজার্" (Georg Kaisèr) তিনি রচনা করেছেন, "ফ্রম্ মর্‌ন টু মিড্‌নাইট্" এবং "গ্যাস" (From Morn to Midnight & Gas) নাটক। আর্নস্ট টোলার্ লেখেন "ম্যাসে মেন্‌শ্‌ অর্ ম্যান্ অ্যাণ্ড দ্যা মাসেস্" (Masse-Mensch or Man and the Masses), "দ্যা মেশিন রেকার্স্" (Die Maschinenstürmer–The Machine wreckers) ইত্যাদি নাটক। "ফ্রিৎস্ ফন্ আন্‌রু" (Fritz Von Unruh) লেখেন "এ ক্লান্" (A Clan) "কারেল্ ক্যাপেক্" (Karel Čapek) ও তাঁর ভাই "জোসেফ্" (Josef) লেখেন কাল্পনিক নাটক "আর. ইউ. আর." এবং রূপক নাটক "দি ইন্‌সেক্ট্ কমেডি" (R U. R. & The Insect Comedy)। "ফ্রান্‌ৎস্ ওয়ার্ফেল্" (Franz Werfel) পুরোপুরিই অভিব্যক্তিবাদী নাটক লেখেন "দ্যা মিরর্ ম্যান্" এবং তাঁর ইঙ্গিতধর্মী নাটক হল "দ্যা গোট্ সঙ্"। "বের্‌টোল্‌ট্ ব্রেশ্‌ট্" (Bertolt Brecht) কাব্যময় ভাষায় অনেকগুলি অভিব্যক্তিবাদী নাটক লেখেন "দ্যা প্রাইভেট লাইফ্ অব্ মাস্টার রেস্" (The Private Life of Master Race) এবং "রাউণ্ড হেডস্, পীক্ হেডস্" (Round Heads, Peak Heads)। জার্মানীতে এপিক্ নাটকের পুরোধা ছিলেন ব্রেশ্‌ট্। তিনি তাঁর নিজের নাটকগুলিকে বলেছেন "এপিক্-ড্রামা", অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে গড়ে ওঠা নাটক নয়। মহাকাব্যের শৈলীতে কাহিনীটি বিবৃত করা হয়েছে।

অভিব্যক্তিবাদী নাটকের শ্রেষ্ঠ দু'জন পরিচালক হলেন "এরউইন্ পিস্‌কেটর্" (Erwin Piscator) এবং "লিওপোল্ড জেস্‌নার্" (Leopold Jessner)—এ দু'জন কোথাও কোথাও রাইনহার্টের প্রতিভাও ম্লান করে দিয়েছেন। পিস্‌কেটর্ বিপ্লবের পরের রাশিয়ায় অনেক মঞ্চকৌশল আনেন। তাঁর সেটে তিনি কেবলমাত্র স্থির পশ্চাৎপট ব্যবহার করেন নি,

—সঞ্চরণশীল অঙ্কিত দৃশ্যাবলীও ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর "দ্য গুড্ সোলজার্ সোয়েইক্" (The Good Soldier Schweik) নাটকের জন্য শিল্পী জর্জ গ্রোসকে নিয়োগ করেন, যাতে পেছনের লম্বা সঞ্চরণশীল ক্যান্‌ভাসে চলচ্চিত্রের সজীবতা এবং নাটকের ব্যঙ্গার্থকে ফুটিয়ে তোলা যায়। এই নাটকের মঞ্চে কতকগুলি আলাদা লেভেলে তিনি মূল কাহিনীর আশেপাশের ঘটনারাজি সংস্থাপিত করেন। পিস্‌কেটর্ ছিলেন এপিক্ নাটকের অন্যতম পুরোধা এবং ভাষ্যকার।

১৯১৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিরাট প্রতিভাধর জার্মান পরিচালক ছিলেন—লিওপোল্ড জেস্‌নার্। অভিব্যক্তিবাদী নাটক হিসেবে তিনি ওয়েদেকাঁদের নাটকেরই অভিনয় করান। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্বই হল—রিচার্ড দ্য থার্ড, ওথেলো প্রভৃতি শেক্‌সপীয়রীয় নাটককে এক্‌সপ্রেশনিস্টিক্ ও সিম্বলিক্ প্রয়োগ কৌশলে মঞ্চস্থ করা। এ কার্যে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন শিল্পী "এমিল্ পির্‌শাঁ" (Emil Pirchan), তিনিই বিচিত্র আঙ্গিকে সেট রচনা করেছেন। মঞ্চে জেস্‌নারের আগাগোড়া সিঁড়ির ব্যবহার তাঁর প্রোডাক্‌শনে একটা বৈশিষ্ট্যময় রূপ আনে। জেস্‌নার্ প্রথম থেকেই ক্লাসিক্ ও শেক্‌সপীয়রীয় নাটকগুলির রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেন। তাঁর আধুনিক পোষাকে হ্যামলেট ছিল তাঁর সমকালীন জার্মানীরই সমালোচনা।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ পরিচালকরা নাটকের বিষয়বস্তু এবং রচনা শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই মঞ্চ প্রয়োগ শৈলী বেছে নেন। আধুনিককালের পরিচালকদের হাতে যেমন প্রাচীনকাল থেকে অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত সমস্ত রকম নাটক আছে, তেমনি আছে সর্বপ্রকার মঞ্চ-শিল্পে জ্ঞান। উপরন্তু আছে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সুযোগ সুবিধা—যা প্রাচীনকালে ছিল না। প্রশ্ন হল তাঁরা যে রীতির নাটক, সেই রীতির মঞ্চেই কি তা প্রয়োগ করবেন? কার্যতঃ এ বাধ্যতা আরোপ করা আজ আর সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিনেতা, মঞ্চশিল্পী এবং পরিচালক এঁরা হলেন নাট্য-সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা। কে কোন নাটককে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করবেন এবং তা করতে গিয়ে কি মঞ্চপদ্ধতি গ্রহণ করবেন তাও বলা যায় না। আধুনিক যুগের মূল নাটকেও আমরা দেখি নানান ইজমের বা মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে—অতএব মঞ্চপদ্ধতির মাঝেও যে নানান শৈলীর মিশ্রণ ঘটতে

পারে তা অবশ্যস্বীকার্য। ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে—সাফল্যের চেয়ে বড় কিছু নেই, নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা তাই বলব—যে শৈলীরই নাটক হোক আর পরিচালক তাকে যে মঞ্চ পদ্ধতিতেই প্রয়োগ করুন—তা যদি সার্থক রসসৃষ্টি করতে পারে তবে কোন বৈয়াকরণেরই সাধ্য নেই তার জয়যাত্রায় বাধা দেয়।

॥ রাশিয়া ॥

রাশিয়ান থিয়েটারে নূতন যুগের মৌলিক পরিবর্তন আনবার জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত কোন বলিষ্ঠ নাট্য বিপ্লবের প্রয়োজন হয়নি। এক সময় সোভিয়েট রাশিয়া যেমন খুশী তেমন পরীক্ষা, নিরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছে আবার তারপরে নূতন পদ্ধতিকে বেশি আঙ্গিকময় বলে অভিসম্পাত জানিয়েছে। ১৯২০ সালের পর কমিউনিস্ট সরকার নাট্যকারদের প্রচার-ধর্মী নাটক লিখবার জন্য প্রণোদিত করেছে।

চারুশিল্পীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পূর্বেই রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন। যেমন "গোলোভিন্" (Golovin), "রোয়েরিখ্" (Roerich) "আনিস্ফেল্ড" (Anisfeld), "বেনওয়া" (Benois), ইত্যাদি। এঁদের বেশির ভাগই অপেরায় কাজ করেছেন—এবং রাশিয়ার ভুবনবিখ্যাত ব্যালের জন্য বিরাট বড় বড় উইংস্ ও পশ্চাৎপট সুঅঙ্কিত করেছেন। বহু বিশিষ্ট শিল্পীই রাশিয়ান থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যময় সত্তায় নিজেদের অবদান মিশ্রিত করেছেন। যেমন কিউবিস্ট্ শিল্পী ছিলেন "অ্যালেক্জান্ড্রা একসটের্" ১৯১৪ খ্রীঃ তিনি "কামেরনি থিয়েটারে" কাজ করেন। তাঁর সালোমে নাটক বিপ্লবের সময়কার। এই নাটকে মঞ্চের মেঝেটা নানা ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঁচুনীচু স্তর তৈরী করা হয়েছিল। অভিনেতারা পরিবর্তনহীন "ফর্মালাইজড্" (Formalized) পোষাক পরেছিলেন—এগুলি সাধারণ মানুষের প্রচলিত পোষাক ছিল না। এই নাটকের সেট কিউবিস্ট্ ধারার হওয়ায় তাতে নানান কোণ, উঁচুনীচু আকার এবং অভিনেতার নানারকম সঞ্চরণের সুবিধা ছিল।

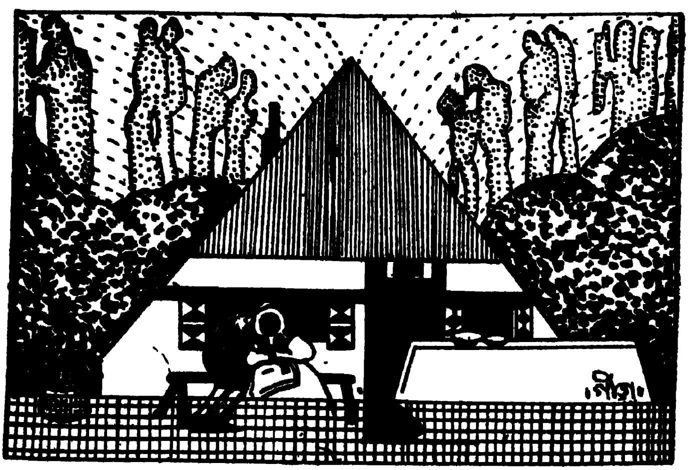
॥ সিম্বলিজম্ ও মাতের্ল্যাঁক ॥

প্যারিস্ রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য অবদান কেবলমাত্র আঁতোয়ান্ ও তাঁর

রিয়ালিস্ট্‌ সঙ্গীরাই যে ছিলেন তা নয়। প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে একজন ছিলেন, যিনি ছিলেন প্রথমে রোমান্টিক পরে ঘুরে গিয়েছিলেন "সিম্বলিজমের" (Symbolism) দিকে এবং আর একজন সিম্বলিস্ট্‌ ছিলেন যিনি ফিরে গিয়েছিলেন "রোমান্টিসিজমের" দিকে। এ*রা দু'জন হলেন "এদমোঁ রস্ত*া" (Edmond Rostand) এবং "মরিস্‌ মাতেরলাঁক" (Maurice Maeterlinck) দু'জনই ছিলেন বিশ্বজনপ্রিয় নাট্যকার। রস্ত*ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি কাব্য-নাট্য লিখতেন। ইব্‌সেনের ক্রমবর্ধমান ছায়ায় আচ্ছন্ন ইউরোপ এই কাব্যগুঞ্জনকে সাদরে গ্রহণ করল। রস্ত*ার প্রথম নাটক ছিল "লে রোমানেস্ক্‌" (Les Romanesques-The Romancers) তিন বছর বাদে তিনি লেখেন "সিরানো দ্য বের্জেরাক্‌" (Cyrano de Bergerac), এ নাটকের অভিনয় ইউরোপ এবং আমেরিকার বহুস্থানেই হয় এবং বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই অংশ গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি লেখেন "লেগ্‌লোঁ (L' Aiglon) নাটক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাও এই নাটকখানিকে অসার্থকতার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি। রস্ত*ার কাব্য প্রতিভার পরবর্তী ফসল হল "শাঁৎক্লের্‌" (Chantecler) নাটক। এই নাটকে তিনি ইঙ্গিতধর্মিতা গ্রহণ করেন, তাতে তিনি গোলাবাড়ির চত্বর-পাখীদের মানুষের সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করেন। ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে অসমাপ্ত নাটকখানি রেখে যান তার নাম হল "দ্য লাস্ট্‌ নাইট্‌ অব্‌ ডন্‌ জুয়ান্‌" (The Last Night of Don Juan)। এই নাটকখানিতে একদিকে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ প্রয়োগ করেন অন্যদিকে তেমনি কোমল স্নেহময়তা ফুটিয়ে তোলেন।

তেয়াত্র লিব্রের আঁতোয়ান্‌ থিয়েটারে কাব্য এবং বাস্তবতা দুই-ই চেয়েছেন। তাঁর হাতে "রস্ত*ার" রচনা পড়লে নিশ্চয়ই তিনি খুশী হতেন কিন্তু আঁতোয়ান্‌ বা প্যারিসের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি এ যুগের পুরোধা ইঙ্গিতধর্মী নাট্যকার মাতেরলাঁককে পছন্দ করতেন না। সুতরাং এই বেলজিয়ান কবি—যিনি গদ্যের মধ্যে কাব্যের ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুলেছিলেন—তাঁকে আপন নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য অন্য কোন বিপ্লবী থিয়েটার খুঁজে নিতে হল। এই রঙ্গালয়টির নাম ছিল—"থিয়েটার দ্য' আর্ট" (Théâtre d' Art)। সত্তর বছরের বৃদ্ধ সিম্বলিস্ট্‌ কবি "পল্‌ ফর্‌" (Paul Fort) ১৮৯০ সালে প্যারিসে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গালয়ের নাট্যকাররা ছিলেন "সিম্বলিস্ট্‌স্‌ বা ইমাজিস্ট্‌স্‌" (Symbolists or Imagists) এইখানেই

মাতেরলিঁকের "দ্যা ইনট্রুডার্" (The Intruder) এবং "দ্যা ব্লাইণ্ড্" (The Blind) নাটকের অভিনয় হয়। পল্ ফর্ এ সময়ে কবিতা লিখতে ব্যস্ত ছিলেন ফলে তাঁর সহকারী "লাগেঁ পোই" (Lugné-Poë) থিয়েটার পরিচালনার ভার নিলেন—পোই একসময় আঁতোয়ানের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন, তিনি সুরু করেন মাতেরলিঁকের "পলেয়াস্ এ মেলিসাঁদ্ (Pelléas et Mélisande) নাটক দিয়ে। তিনি ইব্‌সেন, তলস্তয়, হাউপ্‌ট্‌-ম্যান্, ওয়াইল্ড ইত্যাদি প্রখ্যাত নাট্যকারদের অনেক কাব্যধর্মী নাটককে সিম্বলিকাল পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করেন। এছাড়া তিনি সংস্কৃত নাটক—শকুন্তলা এবং মৃচ্ছকটিকেরও মঞ্চ রূপায়ণ দেখান। এরপরে মাতেরলিঁকের "মোন্না ভান্না" (Monna Vanna—১৯০২ খ্রীঃ) নাটকখানিও মঞ্চস্থ করান। কিন্তু মাতেরলিঁকের শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতধর্মী নাটক—পরীদের কাহিনী নিয়ে লেখা "দ্যা ব্লু বার্ডের" (The Blue Bird—১৯০৮ খ্রীঃ) প্রথম অভিনয় হয়েছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারে—প্যারিসে নয়।



সিম্বলিক্ মঞ্চ। মাতেরলিঁকের দ্যা ব্লু বার্ড : মস্কো।

আমরা বলতে পারি মঞ্চে সিম্বলিজমের প্রথম আবিষ্কর্তা ছিলেন আপ্পিয়া ও গর্ডন ক্রেগ, তাঁরা মঞ্চে বাস্তবকে না এনে চেয়েছেন—ইঙ্গিতের সাহায্যে বাস্তবের প্রতীতি জন্মাতে। অর্থাৎ বাইরের সত্য নয় নাটকের অন্তর্নিহিত

সত্যকে প্রতিভাত করতে। প্রতীকবাদী নাটকও তাই করে। কোন ভাব-সত্যকে বাস্তব রূপের মধ্যে স্পষ্ট করে বিধৃত না করে রূপক ও সংকেতের সাহায্যে তাকে ব্যক্ত করে। সিম্বলিকাল নাটকের প্রধান উপজীব্যই হয় কোন আত্মিক উপলব্ধি কিংবা মনোবিশ্লেষক চিন্তা। একে মঞ্চস্থ করবার বিশেষ সহায় আলো—আলোর সাহায্যে পরিবেশ রচনা করে বাস্তব অনুভূতি শিথিল করে দেওয়া যায়—অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী করে তোলা যায়। এ ছাড়া প্রতীকধর্মী মঞ্চ-উপকরণও এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এমন কোন একটি উপকরণ তুলে আনা—যার সাহায্যে দর্শকের মনে ভিন্নতর চিন্তার উদয় হবে এবং সে অন্য কোন গভীরতর সত্যে গিয়ে পৌঁছবে। যে কথা ব্যাখ্যায় বলতে গেলে শিল্প উৎকর্ষ নষ্ট হয় তাই ইঙ্গিতে বলে দেয়া।

প্রসঙ্গতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকখানি মঞ্চস্থ করার মনোমুগ্ধকর ইতিহাস স্মরণ হয়। এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পক ছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মঞ্চটি রচনা করছিলেন শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। ডাকঘরের অমলের ঘরখানি তৈরী হল সামনে তার বারান্দা—দেখা যাচ্ছে বন্দী অমলের সেই প্রখ্যাত জানালাটি, যা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সব কিছুই "হবে" বলে ভাবে। সবই ঠিকঠাক অবন ঠাকুর দেখে শুনে বললেন—"নন্দ খুঁজে দেখ তো, একটা ভাঙ্গা পাখীর খাঁচাটাচা পাও কি না।" এল পাখীর খাঁচা, বললেন—"টাঙ্গিয়ে দাও বারান্দার এক কোণায়।" শূন্য, ভাঙ্গা খাঁচাটি সমগ্র মঞ্চের রূপই পাল্টে দিল; ভাব-তাৎপর্য গেল অনেক বেড়ে। এই শূন্য খাঁচাটিই হয়ে উঠল মঞ্চে নাটকখানির ভাবসত্যের "সিম্বল"।

প্রতীকধর্মী নাট্যপ্রয়োগ রীতি ,১৮৯০ সালের পর থেকে ইউরোপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বাস্তববাদ কবিদের মঞ্চ থেকে নির্বাসিত করেছিল, এই নব-আন্দোলন তাঁদের আবার রঙ্গালয়ে ফিরিয়ে আনল। তাই ইয়েট্‌স এবং রবীন্দ্রনাথের মত কবিরাও হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এই নবধারার মঞ্চবিদ্‌রা বললেন, মঞ্চ-দৃশ্য বাইরের বস্তু-জগতের কোন চিত্র হবে না—তা হবে মানসলোকের প্রতিবিম্ব। এ ধরনের শিল্পী ছিলেন "রবার্ট এড্‌মণ্ড জোন্‌স্‌" (Robert Edmond Jones), "লী সাইমন্‌সন্‌" প্রভৃতি মঞ্চবিদ্‌রা। প্রতীকধর্মী মঞ্চের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু

ছিল বাস্তববাদী মঞ্চ পরিকল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে আনা—অর্থাৎ সরলীকরণ। এক্ষেত্রে মঞ্চ ঘটনার ব্যাখ্যাতা হবে না হবে হৃদয়-ভাবের জাগরণকারী। প্রতীকধর্মী নাট্যকার এবং মঞ্চবিদ্‌দের প্রধান শক্তি এবং সাধনাই কিন্তু হল সুষমা ও সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনা। সিঞ্জ্‌ প্রভৃতি বাস্তববিরোধীরা বলতে লাগলেন—ইব্‌সেন ও জোলার বাস্তববাদ তার বিষাদঘন রচনায় জীবন থেকে আনন্দ কেড়ে নিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রতীকধর্মী নাট্যকাররা বাস্তববাদের সীমারেখাকে অস্পষ্ট এবং অধরা করে অঙ্কিত করেন এটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। রহস্য-জনক ভাবে তাঁরা আসেন, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং সবকিছুই অনির্দিষ্টভাবে বলেন। বাস্তববাদে "চতুর্থ-দেয়াল প্রথা" এসেছিল—অর্থাৎ ঘরের একটা দেওয়াল সরিয়ে অভিনেতাদের অজানতে যেন দর্শকদের দূর থেকে দেখতে দেওয়া। এই প্রথা রোমান্টিকধর্মীদের এবং প্রতীকবাদীদের সহায়ক হয়ে উঠল—কারণ এতে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতা ও মঞ্চের একটা প্রার্থিত দূরত্ব রক্ষিত হয় ফলে মঞ্চ-মায়া সৃষ্টি সহজ হয়। একে আমরা "সৌন্দর্যবিষয়ক দূরত্ব" বলতে পারি—অর্থাৎ সুন্দর জিনিসকে উপভোগ করতে হলে একটা প্রার্থিত দূরত্ব থাকা দরকার। এই দূরত্বের সাহায্যেই প্রতীক-বাদীরা এক রহস্যময় কাব্যলোক রচনা করেন ও দর্শকদের মনে বিশ্বাস জন্মান যে তারাও এই কল্পলোকেরই অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদীরা বাস্তব পরিবেশ রচনা করেন তবুও দর্শকরা জানে তা অসত্য আবার প্রতীক-বাদীরা অবাস্তবলোক সৃজন করে দর্শকদের মনে প্রতীতি জন্মান যেন তাই সত্য। যেমন—"দ্য সান্‌কেন্‌ বেল্‌" (The Sunken Bell), "দ্য ব্লু বার্ড" (The Blue bird) বা "রাজা" নাটকের সম্পূর্ণ কাল্পনিক পরিবেশকেই প্রযোজনা কালে সত্য বলে ভ্রান্তি জন্মাতে হবে।

প্রতীকবাদ থেকেই আবির্ভূত হয়েছে "গতিহীন নাটক" (Static Drama)। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মাতেরলিঁকের "দি ইনট্রুডার্‌" (The Intruder), "ইন্টিরিয়র্‌" (Interior) বা "দ্য ব্লাইণ্ড্‌" (The Blind) প্রভৃতি একাঙ্ক নাটক। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেই এই ধারার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়—এর চরিত্রগুলির বাইরের কোন ক্রিয়া থাকে না কেবল তারা হৃদয়ের গভীরে, আরো গভীরে ডুবে যাচ্ছে। বলা যায় এ মেলোড্রামার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইরের গতিশীল জগতে এর প্রধান চরিত্র স্থির হয়ে

থাকে তার প্রতিক্রিয়া চলে অন্তর্লোকে। যেমন—আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের সাজাহান চরিত্রে দেখি বাইরের সমস্ত আঘাতে বৃদ্ধ, পঙ্গু অসহায় সম্রাটের অন্তর্লোক কি ভাবে মথিত হচ্ছে। একটি বৃদ্ধ চরিত্র তার ইজিচেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারে কি করে চিরন্তন জাগতিক নিয়মাবলী তার সংসারের ছোট্ট পরিধিতে একের পর এক ঘটে যাচ্ছে। বাস্তববাদী নাট্যকার চেখভের "দ্য সী গাল্" বা "আঙ্কল্ ভানিয়া" নাটকেও আমরা প্রধান চরিত্রের গতিহীন ক্রিয়া দেখতে পাই। এমন কি বাইরের ক্রিয়ার দিক থেকে গোর্কির "দ্য লোয়ার ডেপ্থস্" নাটকও গতিহীন। রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ" নাটকের যতীন চরিত্র তেমনি গতিহীন ক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

॥ কন্স্ট্রাক্টিভিজম্ ॥

আমরা "কিউবিজম্" পেয়েছি চিত্রশিল্পে তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল বস্তুর আকার নিয়ে ভাঙ্গাগড়া—মঞ্চের দৃশ্য পরিকল্পনায় এর ব্যবহার চলে কিন্তু নাটকে এর ব্যবহার সম্ভব হয়নি। আরো দু'টি "ইজম্" বা "বাদ" রয়েছে নাট্য-সাহিত্যে যাদের প্রয়োগ চলে না, চিত্রাঙ্কনেও যথার্থ অর্থজ্ঞাপক হয়ে ওঠে না, কিন্তু মঞ্চে অধিক অর্থজ্ঞাপক হয়। তারা হল "কন্স্ট্রাক্টিভিজম্" (Constructivism) এবং "ফর্মালিজম্" (Formalism)।

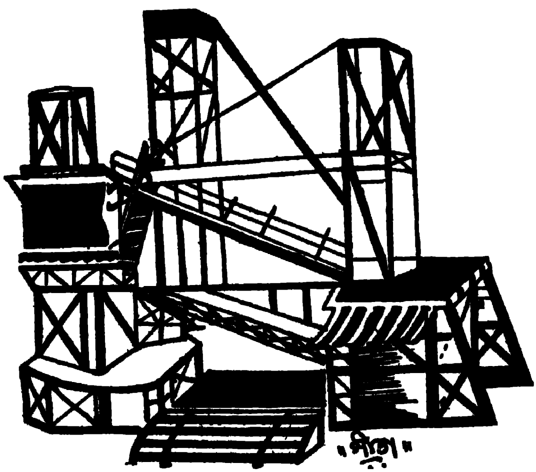
মস্কো আর্ট থিয়েটারের দু'জন উল্লেখযোগ্য পরিচালক ছিলেন—"ভসেভোলোড্ মায়ারহোল্ড্" (Vsevolod Meyerhold) এবং "ইউজিন্ ভাখ্তান্গোভ্" (Eugene Vakhtangov)। ১৯০৫ সালে স্তানিস্লাভ্স্কি এবং ডান্চেনকো বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালাবার জন্য যেমন স্টুডিও করেন ভাখ্তান্গোভ্ ও মায়ারহোল্ড্ দু'জনেই তেমনি এক স্টুডিওতে কাজ করেন। ভাখ্তান্গোভের যেমন নিজস্ব ভাবধারা ছিল তেমনি অন্যের পদ্ধতিও খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারতেন। তাঁর "ম্যাকবেথ" "দ্য ডাইবুক্" (The Dybbuk) ইত্যাদি নাটকের উপস্থাপনায় নূতন ধারার প্রতি আনুগত্য দেখা যায়।

মায়ারহোল্ড্ মস্কো আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না—তিনি ছিলেন তার বাইরের এক বিখ্যাত পরিচালক। বিপ্লবের সময় তিনি তাঁর 'স্টুডিও'তে যে "কমেদিয়া দেল্ আর্তে" ধরনের

নাট্যাভিনয়ের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে নিয়ে "স্টাইলাইজেশনের" (Stylization) পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন—তা ত্যাগ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে প্রচার-মূলক নাট্য পরিচালনা করতে থাকেন। প্রয়োগ-শিল্প সম্পর্কে তাঁর মূল ধারণা রিয়ালিজম্ বা তার কাছাকাছি যে কোন চিন্তাধারা থেকেই বহু দূরবর্তী ছিল। এমন কি কিউবিস্ট্ "তাইরভের" (Tairov) চেয়েও মায়ারহোল্ড্ ছিলেন বেশি নাট্যধর্মী, তাঁর রীতিকে তাই অভিহিত করা হয়েছে—"দ্য থিয়েটার থিয়েট্রিকাল" বলে (The Theater Theatrical)। তিনি দর্শকদের নাট্যানুরূপ পরিবেশে টেনে এনে—চতুর্থ দেয়ালখানি সরিয়ে জীবন কাহিনী দেখানোর একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাইতেন যে, দর্শকরা সদাসর্বদাই থিয়েটার দেখছেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এই প্রথার শেষ সীমানায় এসে তিনি যবনিকাও বরবাদ করে দেন এবং প্রেক্ষাগৃহের আলোকগুলোও প্রজ্জ্বলিত রাখেন। তিনি দর্শকদের অনাবৃত মঞ্চের ইট কাঠের দেয়ালগুলোও দেখাতে চাইতেন। তাঁর অভিনেতাদের পোষাক ছিল একটা ঢোলা আঙরাখা আর ঢিলা পাজামা। অভিনেতারা দৌড়ে মঞ্চে আসা যাওয়া করত এবং কাঠ, খড় ও ধাতব দ্রব্যে তৈরী সেটিং-এর উপর লাফিয়ে ওঠা নামা করত। তাঁর সেটিংটা দেখলে মনে হত একটা বাড়ি যেন গড়ে উঠেছে অথবা যন্ত্রপাতি চলছে কারখানার মত; এই জন্যই এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে—"কন্‌স্ট্রাকৃটিভিজম্"। মঞ্চে কতকগুলি "লেভেল" থাকত, প্লাটফর্ম সাজিয়ে উঁচু করে তোলা হত, থাকত কড়ি-বরগা, ঘোরানো সিঁড়ি—স্প্রিং লাগানো জলে লাফিয়ে পড়বার তক্তা, উঁচু গম্বুজ, চিমনী, মই—ইত্যাদি দিয়ে সাজানো বাড়ির কঙ্কালের মত একটা আকার। এই ধরনের মঞ্চেই মায়ারহোল্ড্ "অস্ট্রোভ্‌স্কির" (Ostrovsky) "দ্য ফরেস্ট্" নাটকটির অভিনয় প্রযোজনা করেন। গোগোলের "দি ইন্সপেকৃটর জেনারেল" ও এই মঞ্চে অভিনীত হয়।

কন্‌স্ট্রাকৃটিভিজমের এই যে সেটিংটা এর তাৎপর্য কি তা নিয়ে বহু তর্ক উঠেছে। অভিনেতাদের পশ্চাতে শোভামাত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এর কোন অর্থ থাকে না। একটা সার্কাসের তাঁবু—তার মধ্যে জন্তুদের খাঁচা, শক্ত করে বাঁধা নানান তার, জাল, ট্রাপিজের দোলনা, দড়ি—সকলি অর্থহীন, প্রাণহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না খেলোয়াড়রা তাতে চড়ে, দোল খায়,

কসরত দেখায়। কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিজমের বিশেষত্ব হল তার এই অভিনব সেটটির উপরেই অভিনেতাদের অভিনয় চলবে যার সঙ্গে অনেক সময়ই নাট্য-কাহিনীর সঙ্গতি থাকছে না। সুতরাং অভিনয় রীতি যে অত্যন্ত প্রথানুগ (Conventional) হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিজম্‌ হল সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা পদ্ধতি (Presentational Style)। এই ধরনের মঞ্চে কেবলমাত্র দেখবার জন্য বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন কিছুই রাখা হয় না—সবকিছুই অভিনেতাদের জন্য—তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মঞ্চে স্থান



কন্‌স্ট্রাক্‌টিভিজম্‌।

পেয়েছে। এর প্রয়োগশৈলীর মধ্য দিয়ে মায়ারহোল্ড্‌ বিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব, তার কল-কারখানা ও যান্ত্রিক সভ্যতার রূপটিই হয়তো তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট তাঁর জন্য এক নূতন ধরনের রঙ্গালয় তৈরী আরম্ভ করে, এই রঙ্গালয়ে প্রোসীনিয়াম্‌ থাকবে না এবং বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে ঠিক ছিল। কিন্তু এই রঙ্গালয় তৈরী হওয়ার পূর্বেই মায়ারহোল্ডের বিরুদ্ধে আঙ্গিক সর্বস্বতার অভিযোগ আনা হয়। জনসভায় তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং রাশিয়ান থিয়েটারকে করুণার যোগ্য ও ভয়াবহ বলেন। মায়ারহোল্ড্‌কে বন্দী করা হয়, পরে মৃত্যু এসে শেষ সমাধান করে দেয়।

রীতি হিসেবে কন্‌স্ট্রাকৃটিভিজম্ প্রকৃতই ছিল গভীরতাহীন। বিংশ শতাব্দীর খুব অল্প মানুষই, যারা এই যন্ত্রযুগকে অভিসম্পাত জানায় কেবল সেই দর্শকরাই এই পদ্ধতিতে খুশী হতে পারে অন্য দর্শকরা নয়। তাও যান্ত্রিক সভ্যতার কোন গভীর তাৎপর্য এতে ব্যাখ্যা করা হয়নি—কেবল ক্লাউনের সাজে অভিনেতাদের দিয়ে সার্কাসের খেলা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই কন্‌স্ট্রাকৃটিভিজম্‌কে সেটের যথাসর্বস্ব না করে তুলে যদি আংশিক ভাবে ব্যবহার করা হয় তবে অনেক বেশি ফললাভ হওয়া সম্ভব। আমেরিকায় লী সাইমন্‌সন্ পরিমার্জিত কন্‌স্ট্রাকৃটিভিজম্ ব্যবহার করে "ইডিয়টস্ ডিলাইট্" নাটকটির সার্থক পরিচালনা করেন। পরিমার্জিত রূপে এই স্থাপত্য গঠন দ্বারা আধুনিক সভ্যতার মূল তত্ত্ব ব্যাখা করা চলে।

॥ ফর্মালিজম্ ॥

ফর্মালিজম্ দৃশ্যসজ্জাগত এক বহু পরিজ্ঞাত আঙ্গিক, বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই। ফর্মালিজম্‌কে আমরা সমস্ত রকম মতবাদ বা ইজমের সমাপ্তিকারক ইজম্‌ও বলতে পারি। বহুপ্রকার দৃশ্যসজ্জাগত আঙ্গিকের বিরাট হট্টগোলের প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপই এই মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে, জগতে নাট্যাভিনয়ের দুই স্বর্ণযুগ—গ্রীক যুগ ও শেক্‌সপীয়রীয় যুগে রঙ্গালয়ে কোন অঙ্কিত দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল না। এই যুগগুলিতে পশ্চাদ্-দেয়াল সম্বলিত রঙ্গমঞ্চেই (Forestage facade) অভিনয় হত। কখন বা মঞ্চের পশ্চাদ্‌বর্তী এই দেয়াল নানান স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অলংকৃত হত, কখন বা তা থাকত সাদামাটা। পশ্চাদ্-দেয়ালটি যেমনি থাক—অভিনেতারা অভিনয় করে যেতেন তাঁদের তৎকালীন পশ্চাৎপটকে আগাগোড়া স্বীকার করে নিয়ে—ধরে নিয়ে। কারণ মঞ্চের পেছনের দেয়াল এবং তার সাজসজ্জা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে তো নয়ই—নাটক থেকে নাটকান্তরেও প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকত। এই পশ্চাৎপটটা নিশ্চয়ই মনোরম এবং আনন্দদায়ক হত কিন্তু সেই একই সঙ্গে এটা হত স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক—অর্থাৎ "ফর্মাল"। সেই রঙ্গমঞ্চে যে কোন পশ্চাৎপটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেকালের প্রখ্যাত গ্রীক, রোমান, শেক্‌সপীয়রীয় নাটকগুলির যে কোন একটির স্বচ্ছন্দ অভিনয় হতে পারত।

পরিবেশের সাধারণ অঙ্গহিসেবে ধরে নিয়ে অভিনয় করে যাওয়া। কোন রকম তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করে নয়—পেছনে যে পশ্চাৎপটটি আছে—সেটা থাকবে বলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আছে, ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নাটক অভিনয় কালে সমানই উদাসীন থাকতে হবে। এ প্রশ্ন এখন উঠতে পারে যে, পশ্চাৎপট যদি কোন ভাবদ্যোতক না হয় তবে আদৌ পশ্চাৎপট ও মঞ্চ-স্থাপত্য রাখার দরকার কি ? এর উত্তরে বলা যায়—আমরা যাত্রার আসরেও দেখেছি যে সেখানে একটা মঞ্চ-বেদী রয়েছে এবং দর্শকরা তার চারদিকে ঘিরে বসে আছে অর্থাৎ স্থানের একটা সীমারেখা অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে খোলা মাঠ এবং অভিনেতাদের পেছনে যদি দিগন্তরেখা থাকে তবে তা অভিনেতা ও দর্শক উভয়েরই রসানুভূতি সৃজনে ও গ্রহণে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ অভিনয়কালে অভিনেতারা যে সমস্ত অঙ্গাভিনয় করে তার দ্বারা পরের পর কতকগুলো চিত্ররূপ এবং কম্পো-জিশনের সৃষ্টি হতে থাকে। পেছনে আদৌ কোন পশ্চাৎপট না থাকলে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ অভিনেতাদের পেছনে বিশাল উন্মুক্ত ব্যাপ্তি এবং দিগন্তরেখা থাকলে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যায়—দর্শকরাও তাদের ভাল করে দেখতে পায় না। তৃতীয়তঃ অভিনেতাদের পেছনে বাধা না থাকলে এবং আশে পাশে মঞ্চোপকরণ ও দেয়াল না থাকলে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্রুতিগম্যতা হারায়। এই সমস্ত কারণ বশতঃই মঞ্চকে এবং পশ্চাৎপটকে এক কথায় সরিয়ে দেওয়া যায় না, অতএব যাঁরা মঞ্চ অতিশয় প্রধান, ব্যয় বহুল ও মুখর হয়ে উঠুক এ চান না তাঁরাই এই দু'য়ের মাঝামাঝি পন্থা হিসেবে ফর্মালিজম্‌কে বেছে নিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু বিভাগেই মানুষ উন্নতির সমুচ্চ শিখরে উঠে গেলেও, সাধারণ রঙ্গালয়ে তার খুব সামান্যই প্রভাব পড়েছিল। এযুগের যান্ত্রিক প্রতিভা আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশ পেয়েছে—চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশ্‌নে কিন্তু মঞ্চকে তা বিশেষ প্রভাবিত করে নি। সেট, দৃশ্যাবলী এবং আলোক সম্পাতে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কিছু নূতনত্বের আগমন হলেও মঞ্চের স্থাপত্যগত পরিবর্তন চতুর্থ দশকের পূর্বে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। এই পরিবর্তনের রূপ আমরা আমেরিকার "ব্রড্‌ওয়ে" রঙ্গালয়গুলিতে দেখতে পাই।

॥ ব্রড্‌ওয়ে রঙ্গালয় ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকার সাধারণ স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা ব্রড্‌ওয়ের ধারা অনুসরণ করেই হত। এই সমস্ত মঞ্চে সৌখিন ভ্রাম্যমাণ দলগুলির অভিনয় দেখানো হত বলেই রঙ্গালয়গুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্রাকার হত—১২০০র বেশি আসন সংখ্যা প্রায়ই থাকত না। এই নাট্যশালাগুলিতে লবি, সামনের গাড়িবারান্দা, সাজঘর সকলি থাকত কিন্তু স্বল্পায়তনে। রঙ্গালয়ের আশেপাশে দোকান পসার করা কিংবা মঞ্চোপকরণের গুদামঘর করা ইত্যাদির সুযোগ বেশি ছিল না। গুদামঘরের প্রয়োজনও বিশেষ হত না, কারণ সেখানে নিত্য নূতন দল, নিত্য নূতন নাট্যাভিনয় দেখাত—দু'এক রাত্র অভিনয়ের পরই তারা জিনিসপত্র গুটিয়ে রঙ্গালয় খালি করে দিয়ে চলে যেত।

"ব্রড্‌ওয়ে রঙ্গালয়ে" (The Broadway Play House) প্রয়োজনের দিকগুলি খুব বেশিই চিন্তা করা হয়েছিল। এতে মঞ্চসম্মুখে দর্শকদের আসন, ব্যালকনি এমন কি গ্যালারীও থাকত। রঙ্গালয় ছোট হওয়ায় সকলেই অভিনেতাদের নিকট-সান্নিধ্য অনুভব করবার সুযোগ পেত। শ্রুতিগম্যতায় এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়গুলি ছিল আদর্শ স্থানীয়। নাট্যাভিনয়ের প্রধান দু'টি গুণ দেখতে ও শুনতে পাওয়া—এখানে চমৎকার ভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিক থেকে আকারে ছোট হলেও বর্তমান কালের প্রকাণ্ড প্রোসীনিয়াম্ থিয়েটারের তুলনায় এগুলিকে ক্ষুদ্রাকার ভ্রাম্যমাণ দলগুলির অনেক বড় সহায় বলে মনে করা যায়।

॥ আধুনিক যুগের রঙ্গমঞ্চের মূল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ॥

স্থাপত্যগত ভাবে একটি নাটশালাকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি তার রঙ্গমঞ্চের অংশ, দ্বিতীয়টি তার প্রেক্ষাগার।

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী ছবির ফ্রেমের মত যে দেয়াল মঞ্চকে প্রেক্ষাগার থেকে তফাৎ বা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাকে "প্রোসীনিয়াম্" (Proscenium) বলে।

প্রোসীনিয়ামেরই যে ফাঁকা অংশের ভিতর দিয়ে মঞ্চের নাট্যাভিনয় দেখা যায়, তাকে বলা হয়—"প্রোসীনিয়াম্ ওপেনিং বা প্রোসীনিয়াম্ আর্চ" (Proscenium Opening or Arch)।

ঠিক "প্রোসীনিয়াম্ ওপেনিং"-এর পশ্চাতেই একটা লোহা বা অ্যাস-বেস্টাসের যবনিকা (পর্দা) থাকে। এই পর্দাটি প্রয়োজন মত ওঠানো নামানো যায়। এটার ব্যবহার দ্বারা অগ্নি উৎপাত ঘটলে রঙ্গমঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চে অনেক সময়েই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে কারণ সেখানে প্রচুর দাহ্য পদার্থ নিয়ে কাজ কারবার চালাতে হয়। এই লৌহ বা অ্যাসবেস্টাস্ যবনিকাটির নাম "স্টীল কার্টেন্" (Steel-Curtain)।

অ্যাসবেস্টাস্ যবনিকার পুরোবর্তী মঞ্চের যে অংশ প্রেক্ষাগারের দিকে প্রোসীনিয়াম্ মুখ পর্যন্ত বর্ধিত থাকে তাকে "এপ্রোন্ স্টেজ" (Apron Stage) বলা হয়। এই অংশটি ব্রড্‌ওয়ে রঙ্গালয়ে প্রায়ই দেখা যেত না।

রঙ্গমঞ্চটি কাঠের তৈরী হয়; তার নীচটা ফাঁপা থাকে। রঙ্গপীঠের উপরে যে দরজা তৈরী করে সিঁড়ি দিয়ে এই ফাঁপা অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়, মঞ্চপীঠের ঢাকা দেওয়া সেই দরজাগুলিকে বলা হয়" ট্র্যাপ্-ডোর্" (Trap-doors)।

প্রোসীনিয়াম্ ওপেনিং-এর পশ্চাদ্‌বর্তী অভিনয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি কাল্পনিক বিভাগ রয়েছে। অভিনয় ক্ষেত্রকে বলা হয় "অ্যাক্টিং এরিয়া" (Acting Area)। অভিনয় ক্ষেত্রে অভিনেতা যদি দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়—তবে অভিনেতার দক্ষিণ দিক হল মঞ্চের দক্ষিণ দিক এবং অভিনেতার বাম দিক হল মঞ্চের বাম দিক। অভিনয় ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিককে বলা হয় "রাইট্ উইং". বা "স্টেজ রাইট্" (Right Wing or Stage Right) এবং বামদিককে বলা হয় "লেফ্‌ট্ উইং" বা "স্টেজ লেফ্‌ট্" (Left Wing or Stage Left)।

অভিনয় ক্ষেত্রের উপর দিকে যে শূন্য স্থান তাকে বলা হয় "ফ্লাই স্পেস্" বা "ফ্লাইজ্" (Fly Space or Flies)।

উপর দিকের এই শূন্য স্থান বা ফ্লাইজের মাঝে রয়েছে "গ্রিড্" অথবা "গ্রিড্ আয়ারন্" (Grid or Gridiron) এটা একটা লোহার বরগা মত এর সঙ্গে ফ্লাইজের শূন্যস্থানে মঞ্চের দৃশ্যাবলী ওঠানো নামানোর জন্য কপিকল, দড়ি ও তারগুলি আটকানো হয়।

গ্রিড্ আয়ারন্ থেকে রঙ্গালয়ের উপরের ছাদের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে বলা হয় "লোফ্‌ট্" (Loft) এখান থেকেই মঞ্চের কর্মীরা

দড়াদড়ি, কপিকল ইত্যাদি নিয়ে অভিনয়ের জন্য পরবর্তী দৃশ্য তৈরী করে রাখেন।

মঞ্চের একদিকে, কোথাও কোথাও বা দু'দিকে রয়েছে "ফ্লাই-গ্যালারী" বা "ক্যাটস্ ওয়ে" (Fly Gallery or Cat's Way)। এটা হল মঞ্চের উপরের দিকে লম্বা, সরু মই-এর মত গ্যালারী। এখান দিয়েই "ফ্লাই-ম্যান্" (Fly man) বা মঞ্চকর্মীরা উপর দিকে যাতায়াত করেন এবং মঞ্চ দৃশ্যাবলী সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

ফ্লাই-গ্যালারীর উপর অর্থাৎ মঞ্চের উপরদিকের পার্শ্ববর্তী অংশে লম্বা পাইপ বা কাঠের বীম আটকানো থাকে, তার গায়ে ছোট ছোট গর্তে হুক বা পেরেক আটকানো থাকে। একে বলা হয় "পিন্-রেল্" (Pin-Rail)—এরই সাহায্যে মঞ্চ দৃশ্যাবলী ওঠানো, নামানো ও সরানো হয়। এই কাজকে বলা হয় "শিফ্‌ট্" (Shift) করা আর যাঁরা এ কাজ করেন তাঁদের বলা হয় "শিফ্‌টার"।

মঞ্চগৃহের আকার অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের পরিমাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে তবুও বহুসংখ্যক মঞ্চ পর্যালোচনা করে তার বিভিন্ন অংশের একটি গড় মাপ ধার্য করা হয়েছে। এটাকেই আদর্শ রূপে ধরে নিয়ে আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা হয়।

প্রোসীনিয়ামের উচ্চতা	প্রোসীনিয়ামের বিস্তৃতি	মঞ্চের গভীরতা	মঞ্চের বিস্তৃতি	গ্রিড্ আয়ারনের উচ্চতা	এপ্রোনের গভীরতা
২৮'ফু ১"ই	৩৭'ফু ৭"ই	৩১'ফু ২"ই	৭০'ফু	৬১'ফু	২'ফু ২"ই
	কোথাও কোথাও ৪০' ফুট	কোথাও কোথাও ৪০' ফুট			

বর্তমানকালের মঞ্চ সম্পর্কে এবং তার বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগশৈলী সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করবার চেষ্টা করলাম। নাটক যেমন ভাবসত্যের দিক দিয়ে এবং গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়ে নানা পথগামী হয়েছে মঞ্চেও তেমনি এসেছে আলোক সম্পাতের বিপুল সম্ভাবনা ও বিভিন্ন শৈল্পিক মতবাদ। তবুও স্থিরতা কোথাও নেই, আধুনিক প্রয়োগ শিল্প নিত্য নূতন আবিষ্কারের পথে পা বাড়াতে চায়। পুরাতন যা কিছু করে রেখে

গেছে তার সামগ্রিক উত্তরাধিকারই আজ আধুনিক কালের হাতে। নূতনের পথ সন্ধান করতে গিয়ে আবর্তিত পথে আধুনিক এবং অতি-আধুনিক প্রয়োগ-কর্তাদেরও অনেক সময়ই পুরাতনের দরজায় ঘা মারতে হয়। বহু শতাব্দী ধরে পুরাতন মঞ্চস্থাপত্যের সম্ভাব্য সকল রূপই প্রায় গোচরীভূত করিয়েছে। কখন এসেছে বৃত্তাকৃতি অ্যারিণা, কখন দোতলা, তিনতলা স্কেনে বিল্‌ডিং সমন্বিত দৃশ্যসজ্জা, এসেছে মধ্যযুগের ওয়াগন্‌ ও যুগপদ্দৃষ্ট মঞ্চদৃশ্য, এসেছে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের অবারিত প্রবাহ ধারণক্ষম মঞ্চ, আবার এসেছে অঙ্কিত দৃশ্যাবলী, ফ্লাইজ্‌, উইংস্‌, সাটারস্‌, এসেছে তিনদিক আবৃত বক্স সেট, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। মোটের উপর মঞ্চস্থাপত্য কখন পাশের দিকে বেড়েছে, কখন উপর দিকে উঠেছে, কখন স্বল্প উপকরণ নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটককে রূপায়িত করেছে, আবার কখন মাঞ্চিক কৌশলের মারপ্যাঁচে নাটকই হারিয়ে গেছে। এই হল এতকালের ইতিহাস, পুরাতন কালের সমগ্র উত্তরাধিকার নিয়ে নূতন এখনো পথ খোঁজে এবং শেষ পর্যন্ত নূতন পুরাতনের এক সংমিশ্রিত রূপে এসে পৌঁছয়। পর্যালোচনা করে নূতন মঞ্চস্থাপত্য গড়ে তোলা যেমন অবশ্য প্রয়োজন তেমনি আর এক বাস্তব সত্য হল এই সকল যুগের নাটককেই যথা স্বরূপ পরিবেশে রূপায়িত করার পন্থা বের করা। এলিজাবেথীয় নাটক অবশ্যই বর্তমান প্রয়োগপদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করা যায়, কিন্তু আজকের দিনে এলিজাবেথীয় ধারার মঞ্চে সে নাটকের রূপায়ণও কিছুমাত্র অবজ্ঞার নয় বরং হবে অধিক উপভোগ্য।

॥ মঞ্চ-সরলীকরণ ॥

এছাড়া আজকের যুগের যে সমস্ত সৌখিন এবং স্কুল-কলেজের দল, তাদের কাছে আরো এক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত সৌখিন-দল বেশির ভাগই ভ্রাম্যমাণ হয়, উপরন্তু পেশাদারীদের মত তাদের অর্থ-সম্পদও থাকে না। কিন্তু এই অপেশাদারী, অস্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ দলগুলিই আজকের ইউরোপ, আমেরিকা এমন কি ভারতেও নিত্য নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এগোচ্ছে। পেশাদারী দল ব্যবসায়িক দিকগুলি চিন্তা করে যে পথে এগোতে ভয় পায়, নির্ভয়ে সে পথে এগোয় অপেশাদারী তরুণের দল। এই সমস্ত অস্থায়ী দলগুলির সামনে একটি সমস্যা সর্বদাই এসে দেখা দেয়, তা হল কি করে অতি স্বল্প মঞ্চ উপকরণ নিয়ে নাটক

প্রযোজনা করা যায়। তাদের আর একটি সমস্যা হল বিভিন্ন নাট্য প্রয়োগপদ্ধতিকে একই মঞ্চ-স্থাপত্যের মধ্যে রূপ দেওয়া। এরই জন্য দেখা দিয়েছে মঞ্চ-সরলীকরণের (Simplification of Stage) বাস্তব প্রয়োজন।

অস্থায়ী এবং অপেশাদারীদের সব সময়ই স্বল্প উপকরণ দিয়ে কাজ চালাতে হয়, যখন যে জায়গায় যে জিনিস জুটবে তারি সার্থক প্রয়োগ করার কথা তাদের ভাবতে হয়। কিন্তু এতে শিল্পের শৈল্পিক উৎকর্ষ যে নষ্ট হবে এমন কথা নিশ্চয় করে ধরে নেওয়াও বুদ্ধিহীনতা। উপকরণের বাহুল্যই সব সময়ে প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচায়ক হয় না, জাপানের "নো" কিংবা কাবুকিতেও আমরা দেখেছি উপকরণের স্বল্পতা, কিন্তু তারি মধ্যে কি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের বিকাশ। বাঁশি যে বাজাতে জানে তার হাতে বাঁশের বাঁশিই বাজে, সোনার বাঁশিতে সে সুর ফোটেও না। অতি স্বল্প উপকরণে সৌন্দর্যকে আবাহন করে নিয়ে আসায়ই সত্যিকার শিল্পীর মুনশীয়ানা। অন্ততঃ মঞ্চশিল্পীকে তো তৈরী থাকতেই হয় সমস্ত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, এই বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন মানেই সরলীকরণ।

যেমন সেট কিংবা ড্রেপারীর জন্য সব সময়ই যে মূল্যবান সিল্ক, ভেলভেট্ আনতে হবে তা নয়, সস্তা দামের জিনিসকেই দরকার হলে মহার্ঘ বস্তুর আকারে সজ্জিত করে তুলে ধরতে হবে। তেমনি বাঁশ, ক্যান্‌ভাস, কি সস্তা দড়িদড়া এবং রং দিয়েই দরজা, জানালা, সিঁড়ি গড়ে তোলা যায়।

আবার মফঃস্বল এলাকায়, অনেক সময় যেখানে বিদ্যুতালোকের সুযোগ পাওয়া যায় না সেখানে মোমবাতি বা লণ্ঠনের আলোক ব্যবহার করেও অনেক বেশি দৃশ্য গুণ ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন বাংলাদেশের নিরন্ন চাষীর ঘর, তা বিদ্যুতালোকিত না করাই উচিত,—ধূমায়িত লণ্ঠনের প্রায়ান্ধকারই সেখানে যথার্থ পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে তবে দর্শকরা দেখতে পাবে এটুকু আলো অনস্বীকার্য প্রয়োজন। মঞ্চ-সরলীকরণের জন্য দরকার হলে মাল্টিপল্ সেটের পদ্ধতিও গ্রহণ করা যায়, কিংবা একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পশ্চাৎপটও রাখা যায়, অথবা নেওয়া যায় সিলেক্টিভ্‌ রিয়ালিজমের পথ। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃত পথের প্রদর্শক।

রবীন্দ্রনাথের দু'খানা প্রখ্যাত নাটকের পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব কবি স্বয়ং নাট্যারম্ভে যে মঞ্চ নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা মঞ্চ-

সরলীকরণের এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আমরা যে উদাহরণ গ্রহণ করছি তার প্রথম নাটক হল "মুক্তধারা"। কবি দত্ত মঞ্চ নির্দেশ রয়েছে—

"উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতেব শিবির।"

এই নির্দেশ অনুযায়ী মঞ্চনির্মাণ কালে বিশেষ কোন ব্যয়বহুল স্থাপত্য উপকরণের প্রয়োজন নেই। কিছু কাঠ, বাঁশ এবং চট বা কাপড় হলেই চলে। এ মঞ্চের আর একটা বড় সুবিধে হল পুরো নাটকের মধ্যে আর কোথাও দৃশ্য পরিবর্তনের বালাই নেই। নাটকে অঙ্ক বিভাগ, দৃশ্য বিভাগ নেই, যবনিকা পতনও নেই—মাঝে মাঝে নির্দেশ দেওয়া আছে প্রবেশ প্রস্থানের। একদল গেল একদল এল এরি সাহায্যে হচ্ছে অদৃশ্য দৃশ্য পরিবর্তন। স্থান—ভৈরব মন্দিরে যাওয়ার পথ, অতএব রাজা থেকে ফকির সকলেই সে পথে অনায়াসে আসে যায়, যুক্তি পারম্পর্য নষ্ট হয় না। নাট্যকার এ ভাবেই সেট পরিবর্তনের ব্যয় ও ঝামেলা এড়ালেন তদুপরি নাটকের গতিবেগ কোথাও থামতে দিলেন না। মঞ্চ দৃশ্যকে আরো তিনি কত সহজ করে আনলেন—পুরো লৌহযন্ত্র বা ভৈরব-মন্দিব তিনি দেখালেন না—মঞ্চের পশ্চাৎপটে দেখা যাচ্ছে যন্ত্রের মাথাটা এবং মন্দির চূড়ার ত্রিশূল। তা ছাড়া পার্বত্য প্রদেশ—তাই মঞ্চে কয়েকটি উঁচু, নীচু লেভেল করে নিলেই দৃশ্যগত গুণ অনেক বেড়ে যায় তাতে প্রবেশ প্রস্থানে সুবিধে আবার কম্পোজিশনের সৌন্দর্যও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটি মঞ্চ-সরলীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তো বটেই—তদুপরি একে আমরা সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়ালি-জমেরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলতে পারি। এখানে বাস্তব ও প্রতীক হাত ধরাধরি করে রয়েছে—বাঁধ, মন্দির, রাস্তা সকলি প্রতীক আবার সকলি বাস্তব। সম্পূর্ণটা না এনে যন্ত্র ও মন্দিরের অংশমাত্র দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণের অনুকরণ করতে গেলে বাস্তববাদী হয়ে উঠত তার অংশমাত্র দেখানোয় প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে এবং ভাবের গভীরতা ও তাৎপর্যও অনেক বেড়ে গেছে। মন্দিরেব চিরন্তন সত্যকে ছাড়িয়ে যন্ত্রের দানবীয় স্পর্ধা উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এর পরের নাটক "রক্তকরবী"। মঞ্চ নির্দেশ রয়েছে—"এই নাট্য ব্যাপার

যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী।...এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করেন। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।"

প্রাসাদের জালের জানালা এবং তার বহির্ভাগ অর্থাৎ "বাহির বারান্দা"—মঞ্চে এইটুকুই সেটের অংশ। নাটকে আর কোন অঙ্কবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ নেই। মাকড়সার জটিল জালের আবর্তে ঢাকা জানালা তার বাইরে বারান্দা ও আনাগোনার পথ—এর চেয়ে সহজ, সরল অনাড়ম্বর সেটিং আর কি হতে পারে? এই মঞ্চ পরিকল্পনাকে আমরা পুরোপুরিই প্রতীকধর্মী বলতে পারি।

এই দু'টি নাটকেই একটি জিনিস লক্ষণীয়—তা হল স্থান, কাল ও কার্যের ঐক্য। স্থানের ঐক্যের কথা তথা সরলীকরণের কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। কালের ঐক্যে দেখা যায় যে, দু'টি নাটকেরই মূল ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ কার্যের ঐক্যও এই নাটকদ্বয়ে কবি অতি সচেতনভাবে রক্ষা করেছেন।

মুক্তধারার কার্য আরম্ভ—মুক্তধারা নদীর উপরে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় বাঁধ গড়ে তোলা হয়েছে এবং উত্তরকূটের মানুষকে জীবন স্বরূপ জলধারা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—প্রকৃতির এ দান জন্মস্বত্ব হিসেবে তারা পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই বাঁধের একটা ত্রুটির কথা অভিজিৎ জানত—সেখানে সে আঘাত করল—বাঁধ ভেঙে গেল এবং অভিজিৎও ভেসে চলে গেল—কার্য শেষ। বাঁধ গড়া হয়েছে সেই বাঁধ ভাঙা হল, এটুকুই কার্য।

রক্তকরবী নাটকেও আমরা দেখি মুখবন্ধের পরেই বলা হচ্ছে রঞ্জন আসবে—কার্য আরম্ভ। দু'পক্ষই প্রস্তুত হতে লাগল—নাটক এগিয়ে চলল—রঞ্জন এল, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে—নাটকের কার্য শেষ।

এই দু'টি নাটকেই কোন উপকাহিনী নেই, কোন জটিলতা নেই। তীরের মত তীব্র বেগে নাটকীয় ক্রিয়া পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্রমান্বয়ে উত্তেজনা বাড়ছে একেবারে সঠিক জায়গায় চরম আঘাত গিয়ে পড়ছে। অতএব এই নাটক দু'খানাকে আমরা ঐক্যের দিক থেকে গ্রীক ক্লাসিকাল নাটকের সমতুল্য বলতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য—ভেতরে যার ঐক্যের এত কঠিন বাঁধন বাইরে তা যাত্রা বা একটি পালা গান। কবি নিজেই

প্রভৃতি রূপকথা বা আরবা উপন্যাসের সমতুল্য কাহিনীরও অভাব নেই। পিস্কেটর্ বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক এপিক্ নাটক লেখেন "দ্যা গুড্ সোলজার্ স্‌োয়েইক্", "পল্ গ্রীন" (Paul Green) উইলসনের যুগ নিয়ে লেখেন "জোনি জন্সন" (Johnny Johnson) কিংবা ব্রেখ্‌ট্ দ্বিতীয় মহাসমরে নাৎসি শক্তির উত্থান ও পতন নিয়ে তথ্য-নাটক লেখেন "দ্যা প্রাইভেট্ লাইফ্ অব্ দ্যা মাস্টার রেস্" (The Private Life of the Master Race)। আবার ব্রেখ্‌টের "মাদার্ কারেজ" (Mother Courage) বা "দ্যা ককেসিয়ান্ সার্কেল্ অব্ চকের" (The Caucasian Circle of Chalk) মত সম্পূর্ণ কাহিনীভিত্তিক এপিক্ নাটকও রয়েছে—রয়েছে ব্রেখ্‌টের চীনদেশীয় উপকথা নিয়ে রচিত "দ্যা গুড্ উম্যান্ অব্ সেৎজুয়ান্" (The Good Woman of Setzuan)। এই নাটকটির মধ্যে দেখা যায় মঞ্চে চীনা দেবতাদের আবির্ভাব এবং নাটক যখন শেষ হয় তখন যুক্তি পারম্পর্যের কোন বালাই থাকে না। এপিক্ নাটকের মধ্যে নৃত্যগীত বহুল অপেরা নাটকেরও সমান প্রাধান্য রয়েছে যেমন দেখি ব্রেখ্‌টের "দ্যা টুপেন্স্-হেপ্‌নী অপেরা" (The Twopence-halfpenny Opera) বা "দ্যা বেগার্স্ অপেরা" (The Beggar's Opera) ইত্যাদি, আবার তারি পাশে রয়েছে ওয়ান্ থার্ড অব্ এ নেশন্। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এপিক্ নাটকের বিষয়বস্তু যা খুশী তাই হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটি গল্পের বুনট থাকবে। এই গল্পটি বলতে গিয়ে কিন্তু নাট্যকাররা স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্য মানেন না। খাঁটি অভিব্যক্তিবাদ থেকে এর চিন্তা এবং বিশ্লেষণ বাস্তব তথ্য আনয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নাটকের গঠনভঙ্গি বাস্তবানুগ হবে না। বাস্তব দৃশ্য যদি কোথাও থাকে তা ও "স্টাইলাইজ্‌ড্" (Stylized) পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ সেই বাস্তবের গুণগত বৈশিষ্ট্যটা রাখা হবে—অবয়বটা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। এর মধ্যে কখন থাকবে বিবৃতি, কখন নাট্য প্রথানুগ অভিনয়। মঞ্চে কখন সামাজিক অর্থ ব্যাখ্যা করে থাকবে বক্তৃতা, কখন খোরাসরা এসে নাটকের ভাবাদর্শ শোনাবে গান গেয়ে আবার নাটকের মধ্যেই সমাজবাদীদের, বা বিপ্লবীদের স্লোগান শোনা যাবে। দেখা যাবে তাদের চার্ট, ফেস্ট্‌ন ও কার্টুন আবার হয়তো পেছনের স্ক্রীনে প্রোজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হল কোন সংখ্যাতত্ত্ব বা ঘটনা। বিস্তৃতভাবে বলা যায় এই ধরনের মঞ্চে বক্তব্য পরিস্ফুট করবার

জন্য সম্ভাব্য সব রকম পদ্ধতিই গ্রহণ করা চলে। আবার নাট্যগঠন পদ্ধতিতেও তারা গ্রহণ করেছে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যেমন দেখা গেছে "দ্যা গুড্ সোলজার্ সোয়েইক্" নাটকের অভিনয়ে অস্ট্রিয়ান সৈন্য বিভাগে সোয়েইক্‌কে ডেকে পাঠান হয়েছে। কিন্তু সে সব কিছুই ভগবান কিংবা চিকিৎসকের মত সমান উদাসীনতায় গ্রহণ করছে নাটকের চরিত্র হয়েও সে নাট্যতত্ত্বকে প্রকাশ করছে খোরাসের মত। এই এপিক্ নাটকে থাকবে পরিবর্তনশীল সমাজ চিত্র—এখানে ব্যক্তি চরিত্রও সমগ্র সমাজের অখণ্ডসত্ত্বা হয়ে দেখা দেবে।

বর্তমান এপিক্ নাট্যকাররা সেই প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যের নিরাসক্তভাবে কাহিনী বিবৃত করার ধারাটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আজকের সত্যকে সেই গঠন ভঙ্গিতে তুলে ধরা। এর আসল উদ্দেশ্য হল দর্শকদের কাছে সত্যকে ব্যাখ্যা করা, বিবৃত করা, তাদের জাগরিত করে তোলা। 'জীবন্ত সংবাদ-পত্র' জনগণকে মাত্র তথ্য সরবরাহ করে কিন্তু এপিক্ নাটক তাদের উদ্বুদ্ধ করে, সমাজকে আবর্জনামুক্ত করে। এপিক্ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন নাটকীয়-উপাদান গ্রথিত করবার জন্য তার মধ্যে কখন বা একজন গল্পবক্তার চরিত্রও নিয়ে আসা হয়। এ নাটক আধুনিক অ্যারিণা মঞ্চেও অভিনীত হতে পারে, আবার অন্য যে কোন মাঞ্চিক পদ্ধতি গ্রহণ করেও রূপায়িত হতে পারে। নানান রকম পদ্ধতি ও উপকরণ গ্রহণের ফলে এ ধরনের নাট্যাভিনয় অত্যন্ত বৈচিত্র্য মণ্ডিত, নমনীয় ও গতিশীল হয়ে ওঠে। একটা মেশিনের কলকব্জার মত সব দিকে আনাগোনা চলতে থাকে। মঞ্চটাই যেন একটা মেশিন এবং তার কারিগররা দর্শকদের কাছ থেকে নিজেদের চলাফেরা কাজ-কর্ম আড়াল করে রাখতেও যেন উৎসুক নয়।

॥ অ্যারিণা মঞ্চ ॥

একদিকে যেমন সমস্ত রকম সম্ভাব্য পদ্ধতি গ্রহণ করে এপিক্ ড্রামার প্রয়োগরীতির সরলীকরণ করা হয়েছে, তেমনি আবার 'অ্যারিণা মঞ্চে' আয়োজন উপকরণ প্রায় সকলি বর্জন করে—মঞ্চ পদ্ধতির সরলীকরণ করার চেষ্টা হয়েছে।

মাঝখানে অভিনয় ক্ষেত্র এবং তার চারপাশ ঘিরে যে অভিনয় দর্শনের "অ্যারিণা পদ্ধতি" এ নিয়ে এ যুগে প্রথম পরীক্ষা চলতে থাকে আমেরিকার

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের "পেন্ট্-হাউজ্ থিয়েটারে" (Pent house Theatre)। এখানকার পেন্ট্ হাউজ্ থিয়েটারের প্রথম পরিকল্পনা করেন নাট্য বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক "গ্লেন হিউয়েস্" (Glenn Hughes)। বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় রঙ্গালয় থাকা সত্ত্বেও নাট্য বিভাগ নূতন বই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্য কিংবা রিহার্সালের পরে কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তা দেখানোর জন্য একটি সাধারণ ঘরের মাঝখানে অভিনয় ক্ষেত্র রেখে দু' তিন সারি চেয়ার চারপাশে বসিয়ে পেন্ট্ হাউজ্ থিয়েটার আরম্ভ করে। পেন্ট্ অর্থাৎ পরিবৃত—চারি দিক ঘিরে ফেলা। এই পেন্ট্ হাউজ্—থিয়েটারই যখন ভ্রাম্যমাণ শিল্পীর দল গ্রহণ করল এবং বেশিরভাগই জীবন্ত সংবাদপত্র বা এপিক্ নাটকের অভিনয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগল, তখনি তাকে বলা হতে লাগল "অ্যারিণা থিয়েটার" (Arena Theatre) অ্যারিণা থিয়েটার প্রয়োগশিল্পীদের কাছে একই সঙ্গে কতকগুলি সুবিধা এবং অসুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

আমরা সহজেই বুঝতে পারি এই প্রথায় দর্শকরা অভিনেতাদের অতি নিকট সান্নিধ্য লাভ করে। আমাদের যাত্রার অভিনেতারা যেমন দর্শকদের অখণ্ড অংশ হয়ে থাকে। এই সুযোগ আজকের অভিনেতারা অনেক সময়ই ছাড়তে চান না। তাই অ্যারিণা পদ্ধতিকেই তাঁরা যথাসম্ভব মার্জিত এবং সব রকম নাটক উপস্থাপনার যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

১। পেন্ট্-হাউজ্ বা অ্যারিণা থিয়েটারে আধুনিক যুগের প্রয়োজনে ইচ্ছে হলে কিছু কিছু চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্র ব্যবহার করা চলে। যবনিকা নেই অতএব দৃশ্য শেষ হলে দর্শকদের চোখের সামনেই সেগুলি পরিবর্তিত করে নিতে হয়। সমগ্র প্রয়োগপদ্ধতিই তাই হয়ে ওঠে নাট্যপ্রথানুগ।

২। দ্বিতীয়তঃ মঞ্চের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েও যবনিকার কাজ চালানো হয়। অর্থাৎ অন্ধকারে দর্শকরা কিছু দেখতে পায় না তখন সেটের কিছু অদল বদল করা চলে।

৩। মঞ্চের আসবাবপত্র খুব অল্প হবে এবং খুব বাছাই করা হবে, তাছাড়া আসবাব পত্রগুলির উচ্চতাও কম হবে—যাতে দর্শকদের দৃষ্টি আড়াল না করে।

৪। অভিনেতারা অবশ্যই দর্শকদের উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হবে। কারণ তাদের চার পাশে নাটকের পরিবেশ না থেকে দর্শকরাই ঘিরে রয়েছে।

৫। পরিচালককেও খেয়াল রাখতে হবে যে চার পাশে দর্শকরা ঘিরে রয়েছে অতএব অভিনেতারা একদিক উন্মুক্ত ভেবে যেন অভিনয় না করে।

৬। আলোক সম্পাতের সময়ও আলোর ঐকীভূত রেখাটি মঞ্চের উপরই কেবল ফেলতে হবে অর্থাৎ আশেপাশে, পেছনের দর্শকদের চোখে গিয়ে একটি রশ্মিও যেন না পড়ে।

৭। রঙ্গালয়টি নাট্য প্রযোজনার জন্যই তৈরী হবে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অত্যন্ত সহজ, সরল এবং বাহুল্যবর্জিত, আড়ম্বরহীন হয়।

অ্যারিণা থিয়েটারের মঞ্চ চারদিক থেকে কিংবা তিন দিক থেকেও দর্শক দ্বারা পরিবৃত থাকতে পারে। আমাদের যাত্রার মত অভিনেতাদের প্রবেশ প্রস্থানের জন্য একটি পথ রাখা হয়।

অভিনেতারা অনেক সময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে দর্শকদের সঙ্গে বসে থাকে এবং দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে এসেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে।

সবদিক বিচার করে এই অ্যারিণা থিয়েটারকেই আমরা মঞ্চ সরলীকরণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলতে পারি। প্রাচীন গ্রীসের খোরাস সঙ্গীতের অর্‌খেস্ত্রা, আমাদের যাত্রা—এ ও অ্যারিণা মঞ্চ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এগুলি ছিল মুক্তাঙ্গন এবং বিপুল জনসমাবেশ ধারণক্ষম কিন্তু আজকের অ্যারিণা গৃহবাসী। প্রাচীন অ্যারিণায় আসবাবপত্রের কোন বালাই ছিল না আজকের অ্যারিণায় সামান্য হলেও মঞ্চোপকরণের ব্যবহার চলে আর গৃহাভ্যন্তরে হওয়ায় রয়েছে আলোক সম্পাত, দর্শক সংখ্যাও অতিশয় কম। বহু পথ পরিক্রমার পরে আধুনিক থিয়েটার সংশোধিত আকারে সেই প্রাচীন অ্যারিণা মঞ্চকেই গ্রহণ করল, আমাদেরও তাই সেনেকার ভাষায়ই আবার বলতে ইচ্ছে হয়—এ জগতে নূতন কিছুই নেই।

মঞ্চ-সরলীকরণের আর এক উপায় হল মঞ্চকে নমনীয় করে তৈরী করা। অর্থাৎ একই মঞ্চের কয়েকটি স্থাপত্য অংশ সরিয়ে আর এক ধরনের মঞ্চ তৈরী করে ফেলা। একই মঞ্চে আধুনিক বক্স সেট, গ্রীক অর্‌খেস্ত্রা, মঞ্চ ও স্কেনে কিংবা মধ্যযুগ বা এলিজাবেথায় যুগের মঞ্চদৃশ্য সকলি সামান্য চেষ্টায় আনা যায়।

এ ধরনের নমনীয় মঞ্চের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল আমেরিকায় "কোয়াল্

গ্যাবল্‌স্ ফ্লোরিডায়" (Coral Gables Florida) অবস্থিত "মিয়ামি" (Miami) বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদ্ধতিতে নির্মিত রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গালয়টি অধ্যাপক "ফ্রেড্ ককের" (Fred Kock) পর্যবেক্ষণে তৈরী হয়েছে। এটির নির্মাণ কার্যে খরচ পড়েছে ১৫০,০০০ ডলার। রঙ্গালয়টির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে ১৯৫১ সালে। ১৯৫২ সালে অধ্যাপক কক্ বিরাট সঙ্গীতমূলক নাটক "ফিনিয়ানের" (Finian) "রামধনু" (Rainbow) নাটক ৩০০০ ডলার খরচ করে মঞ্চায়িত করেন। এই নাটকটিতে ৬০০ ডলার লাভ হয়।

এটি সত্যিই এক নমনীয় মঞ্চ। এতে রয়েছে দু'পাশে দর্শকদের আসন মাঝে ১০০' ফুট মঞ্চ ও তার বিশাল প্রোসীনিয়াম্-মুখ। আবার এর একটু ব্যবস্থা ওলোট পালট করলে হয়ে যায় অ্যারিণা থিয়েটার। মঞ্চটি সঞ্চরণশীল একে যে কোন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, আবার দর্শকদের আসনও সঞ্চরণশীল, যে কোন দিকে তাদেরও ঘোরানো চলে। আবার মাঝখানে রয়েছে 'পিট' বা অর্কেস্ট্রা। প্রেক্ষাগৃহে পর পর বিভিন্ন অংশে দৃশ্যসজ্জিত করে প্রয়োজন মত তার একটা অংশ অনাবৃত করে অন্য অংশগুলো আবৃত রেখেও অভিনয় দেখানো যায়। দর্শকদের আসন ঘূর্ণায়মান হওয়ায় প্রেক্ষাগৃহের যে কোন জায়গায় যে কোন দৃশ্য অভিনীত হলে তারা তা দেখতে পারে। রঙ্গালয়টির বিভিন্ন অংশকেও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে ওঠানো নামানো যায়। এর ফলে মঞ্চ ও দর্শক আসনকে যে কোন ভাবে সজ্জিত করা চলে। এইভাবেই বিপুল ব্যয়সাধ্য হলেও অনন্য এক রঙ্গালয় এই মিয়ামি থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চের সবরকম স্থাপত্য সম্ভাবনাকে একই সঙ্গে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ কিমিতি নাটক ॥

নাট্যরচনা এবং প্রযোজনার সবরকম প্রাচীন স্থান, কাল ও কার্যের বন্ধনকেই অস্বীকার পাচ্ছে আজকের কিমিতি বা উদ্ভট নাটক (Absurd Drama)। অভিব্যক্তিবাদের এক গভীর অন্তর্মুখিন রূপ এতে প্রকাশ পেয়েছে। এ নাটক সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার "ইউজিন্ আইওনেস্কো" (Eugene Ionesco) বলেছেন,—এ নাটকের জগৎ জাগরণের জগৎ নয়, এমন কি স্বপ্নের জগৎও নয়। স্বপ্নও একপ্রকার চিন্তা। স্বপ্নের মধ্যে সব সময় একটা নাটকীয়তা রয়েছে কারণ এ নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানে

তুলছে। কিমিতি নাটক তার চেয়ে অনেক গভীরতর এবং বৃহত্তর সত্যকে প্রকাশ করে। সাধারণ চিন্তার চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে এ অনেক বেশি প্রামাণ্য কারণ এ বাইরের সাজানো রূপ নয়। এতে রয়েছে সেই আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মচিন্তা যা অনেক নিষ্ঠুর, ভয়ংকর, চরম রূপ ফুটিয়ে তোলে—যে সত্যকে আমরা এড়িয়ে যাই বা মার্জিত রূপ দেই তাকে এ স্পষ্টভাষায় স্বীকার করে।

আমাদের যুগ পরিবেশেই আজ যে বিশৃঙ্খলা, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা এবং ভারসাম্যের অভাব—তাই এই নাটকে মানসিক অসঙ্গতি ও অস্তিত্বহীনতার রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। পুরাতন চিন্তা ও মূল্যবোধ আমরা হারিয়েছি কিন্তু নূতন কোন আশ্রয় এখনো খুঁজে পাইনি সেই যুগ যন্ত্রণার কোন নির্দিষ্টরূপ বা অবয়বও তাই নেই। কে জানে, সকল বন্ধনহীন এই অনিশ্চিত যাত্রার শেষ কোথায়?

॥ বঙ্গদেশ ॥

॥ সংস্কৃত নাটকের পরিশেষ ॥

নাট্যকার ভাস এবং মহাকবি কালিদাসের সময়ে জনসাধারণ নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারত, কিন্তু শিক্ষিতদের ভাষা এবং লোক-ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং একাদশ শতাব্দীতে ভাষা সমস্যা একটি মস্তবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই শতাব্দীতেই অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে ভারতীয় ভাষাগুলি স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে ফলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত, লোক-ভাষা থেকে আরো দূরে সরে যেতে লাগল। কিন্তু প্রচলিত প্রথার বাঁধা পথ থেকে পণ্ডিতেরা নেমে আসতে চাননি বলে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে নাটক লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। নাট্য বিষয়ক গ্রন্থ এবং নানান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও নৈয়ায়িক জয়দেবের "প্রসন্ন রাঘব" নাটক (১২০০ খ্রীঃ), কেরল রাজকুমার রবিবর্মার "প্রদ্যুম্নাভ্যুদয়" (১২৬৬ খ্রীঃ), বিশালদেব বিগ্রহরাজের "হরকেলি নাটক" (১১৬৩ খ্রীঃ), বামনভট্টের "পার্বতী পরিণয়" নাটক (১৪০০ খ্রীঃ), জয়সিংহসুরির "হাম্বীরমদমর্দন" নাটক (১২২৯ খ্রীঃ) গঙ্গাধরের "গঙ্গাদাস প্রতাপবিলাস" (১৪৪৩-৫২ খ্রীঃ), রূপগোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব" (১৫৩২ খ্রীঃ), রামভদ্র দীক্ষিতের "জানকী পরিণয়" (সপ্তদশ শতাব্দী), মহাদেবের "অদ্ভুত দর্পণ" (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটক নাটিকার রচনা অষ্টাদশ, উনবিংশ এমন কি বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও বিক্ষিপ্তভাবে চলে এসেছে। কিন্তু যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় তা হল— (ক) কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক কিভাবে অভিনীত হত? ভরত বর্ণিত প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চে হত কি? (খ) পরবর্তী নাটক নাটিকার অভিনয় কি প্রেক্ষাগৃহাভ্যন্তরে রঙ্গমঞ্চের উপর অনুষ্ঠিত হয়েছিল অথবা প্রেক্ষাগৃহ বিবর্জিত রীতিতে অনুষ্ঠিত হত—কিংবা আদৌ অনুষ্ঠিত হয়নি—সাহিত্য হিসেবে পঠিত হয়েছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ একথা আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রকারদের রচনা থেকে পাওয়া যায় যে তৎকালে ভারতে প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের প্রচলন ছিল।[১] তা

ছাড়া নাটকে এমন নির্দেশও বহুস্থানে রয়েছে যা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি ঐ নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। এই অনুমান ছাড়া আর কিছুই আমাদের করবার নেই। একথা ঠিক যে আমরা ভরত থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ পর্যন্ত বহু নাট্যশাস্ত্রকারদের উল্লেখ করতে পারি এবং বহু নাট্যকার ও নাটকের নামও শোনাতে পারি। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাভিনয় রীতির কোন ধারাবাহিক ও নির্দিষ্ট ইতিহাস আমরা দিতে পারি না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র মুখস্ত রাখবার সুবিধার জন্য সূত্র মাত্র ছিল—সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দের বহু প্রকার অর্থ হয়—সুতরাং এই সূত্রের ভাষ্যও বহুপ্রকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভরতের প্রধান টীকাকার অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী যখন রঙ্গালয় তৈরী হয়েছিল সেকালের লোক ছিলেন না, এমন কি সে ধরনের কোন রঙ্গালয় অভিনবগুপ্তের সময়ে (একাদশ শতাব্দী) টিকেও ছিল না যা দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থাপত্যবিদ্ শ্রী ডি. সুব্বা রাও মহাশয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারের সমালোচনা করে বলেছেন যে—

"তাঁর (অভিনবগুপ্ত মহাশয়ের) টীকায় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই প্রয়োগ শিল্পগত জ্ঞানের একান্তই অভাব রয়েছে, তার ফলে তিনি বিভ্রান্তের মত মনগড়া মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি অতি ধৈর্যের সঙ্গে মূলসূত্রের ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্ন অর্থ সামনে তুলে ধরেছেন।"[২]

অভিনবগুপ্ত রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, বিশেষ করে মত্তবারণী সম্বন্ধে টীকা রচনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার চেয়ে গুরুবাক্যের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন এবং তিনি যাঁদের মত উদ্ধৃত করেছেন তাঁরাও ঐ সব বিষয় নির্দিষ্ট জানতেন না। যেখানে একাদশ শতাব্দীতেই প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এত কম সেখানে পরবর্তীকালে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভবভূতির "উত্তররামচরিত" নাটক ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রা প্রসঙ্গে অভিনীত হয়েছিল এবং খুব সম্ভব কালপ্রিয়নাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণেই সাময়িকভাবে তৈরী রঙ্গমঞ্চে অথবা মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরেই অভিনীত হয়েছিল। মন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির বা নাট্যশালা এই জাতীয় "যাত্রা-নাটকের" প্রয়োজনে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই গড়ে উঠেছিল তা যে অনুমানমাত্র নয় তা আমরা দক্ষিণ ভারতের

মন্দির-স্থাপত্য আলোচনা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রা-নাটকের উৎস-মুখ মন্দির প্রাঙ্গণই হয়ে উঠেছে। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সঙ্গীতশালায় কিংবা নাট্যগৃহের অভিনয়ে নেপথ্য-বিধির প্রাধান্য হয়তো ছিল—কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে বা নাটমন্দিরে যে যাত্রাভিনয় হত তার রীতি নিশ্চয়ই ছিল ভিন্নতর এবং জটিলতা বর্জিত। সেখানে প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, নেপথ্য-বিধির রীতিরও অনুসরণ করা চলত না। অন্যদিকে ভারতবর্ষে মুসলমান-আধিপত্য যত সম্প্রসারিত হয়েছিল তত প্রেক্ষাগৃহান্তর্গত ও নেপথ্য-বিধিসংযুক্ত অভিনয় সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কূর্মবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

॥ মুসলমান যুগ ॥

মুসলমান সুলতান, বাদশা এবং অভিজাতরা স্থাপত্য শিল্প ও সঙ্গীতের যতখানি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন—মূর্তিপূজা ধর্ম বিরুদ্ধ বলে একের চরিত্রায়ণ অন্যের মূর্তিতে বা রূপে যে শিল্পে হয় অর্থাৎ নাট্যাভিনয় এবং ভাস্কর্য শিল্পকে ততখানিই বর্জন করেছেন। এই কালে প্রেক্ষাগৃহ বিবর্জিত বাহুপ্রয়োগ হিসেবে অভিনয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে মন্দির প্রাঙ্গণের যাত্রাভিনয়ের মধ্যে কোনভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। দেবতার যাত্রাপ্রসঙ্গে অভিনীত নাটক প্রথমাদকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও, কালক্রমে এই নাটকগুলি জনসাধারণের ভাষায় রচিত হয়েছিল। হনুমান রচিত "মহানাটক", জয়দেবের সুললিত "গীতগোবিন্দম্" এবং রামকৃষ্ণের "গোপাল কেলিচন্দ্রিকা" প্রভৃতি নাটকের মধ্যে আমরা যাত্রাজাতীয় নাটকেরই এক নূতন রূপ দেখতে পেয়েছি। এইসব নাটকে কবির বর্ণনা অংশ এবং পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি অংশ মিলে নূতন এক শ্রব্যকাব্য তৈরী হয়েছিল। এই নবোদ্ভূত শ্রব্যকাব্যের ভাষা যদিও ছিল সংস্কৃত কিন্তু তা এতই প্রাঞ্জল এবং সুমধুর যে জনসাধারণের বোধগম্যতার পথে কোন বাধা রইল না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই নূতন রীতির নাটক অভিনীত অথবা গীত এবং পঠিত হত।

সাংস্কৃতিক সংকটের দিনে যখন প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে নেপথ্য বহুল অভিনয় করার রীতি বিলুপ্তপ্রায়, তখন এই জাতীয় যাত্রানুষ্ঠানেই ভারতীয়দের অভিনয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহান্তর্গত পরিশীলিত

নেপথ্য ও রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে মন্দির প্রাঙ্গণে অভিনয়ের নেমে আসাকে আমরা নিশ্চয়ই প্রগতিশীলতা বলতে পারব না—একে পশ্চাদ্‌গামিতাই বলা উচিত। অবশ্য অন্য একদিক থেকে একে নূতনতর পদক্ষেপও বলতে পারি—এই পর্যায়ে এসেই ভারতীয় নাটক লোকভাষা আশ্রয় করার প্রেরণা পেয়েছিল। নাটকের ভাষা এবং লোকভাষার ব্যবধান এরই ফলে তিরোহিত হয়েছিল। জনগণের রুচির চাহিদা মেটানোর জন্য এই যে প্রবণতা, তা থেকেই ক্রমে ধর্মবিশ্বাসানুসারে স্পষ্টভাষায় রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি নাটক রচিত হয়েছিল, এবং প্রেক্ষাগৃহ বর্জিত রীতিতে অভিনীত হয়েছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দমের সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষায়, বিদ্যাপতির সংস্কৃতে-প্রাকৃতে কথোপকথন এবং মৈথিলী ভাষায় সঙ্গীত রচনার মধ্যে আমরা যেন সন্ধিকালের রূপটি দেখতে পাই। নাটকের ভাষা তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কৃত্রিম স্তর পেরিয়ে লোকভাষার স্তরে নেমে আসার জন্য পা বাড়িয়েছে। চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" এই নোতুন পদক্ষেপেরই একটি ক্রমপরিণাম। কবির বা কথকের বর্ণনার সঙ্গে পাত্রপাত্রীর সংলাপ মিশিয়ে যে জনরুচিকর নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল এ গ্রন্থ তারি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত উপাদান-প্রাধান্যের ভিত্তিতে নাটকে ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী এই চার বৃত্তি কল্পনা করেছেন। এই "বৃত্তি" বা বিশেষ উপাদানের উপর ঝোঁক অহেতুক কোন ব্যাপার নয়; এর মূলে আছে বিশেষ বিশেষ জনপদের "প্রবৃত্তি"। ভরত সমগ্র ভারতবর্ষের জনপদগুলির মাঝে চারটি প্রবৃত্তি বা উপভাষা লক্ষ্য করেছিলেন—যেমন ১। অবন্তী, ২। দাক্ষিণাত্যা, ৩। পাঞ্চালী, ৪। ওড্র-মাগধী। ভরত উল্লেখ করেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ বেশি নাচগান বা সুকুমার বৃত্তি পছন্দ করে, পূর্বভারতের লোকেরা নাটকে অধিকতর সংলাপ বা ভারতী বৃত্তি পছন্দ করে, পশ্চিম ভারতের লোকেরা আরভটী বৃত্তি অর্থাৎ ঘটনা ও যুদ্ধবাহুল্য পছন্দ করে এবং উত্তরাংশের লোকেরা সাত্বতী বৃত্তি বা আবেগোত্তেজনার প্রাধান্য চায়। প্রবৃত্তি সংস্কারের মতই সহজে মরতে চায় না, তাই নাটকের স্রোতে যেদিন ভাঁটা দেখা দিয়েছিল সেদিন তা প্রবৃত্তির খাত ধরে সহজেই প্রবাহিত হয়েছিল। অতএব দেখা যায়, মুসলমান অধিকারের কালে নাট্যাভিনয় যখন মন্দির প্রাঙ্গণে আবদ্ধ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন

ছিল সুতরাং অভিনেতা-অভিনেত্রী, বিশেষ করে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা গোলোকনাথ দাসের পক্ষে খুবই সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব তিনি এর সমাধানকল্পে যাত্রা, ঝুমুর ইত্যাদি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই সাহায্য নিয়েছিলেন। নাট্যাভিনয় বাংলাতেই হয়েছিল সুতরাং নটনটীদের ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞাপনটিতে আমরা দেখি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর পালার প্রেমগীতি গাওয়া হয়েছিল,—এই জাতীয় গান তৎকালে যাত্রাভিনয়ে প্রচুর প্রচলিত ছিল—নাচ, গান, অভিনয়ে দক্ষ নটনটী এখানেই পাওয়া স্বাভাবিক।

বিজ্ঞাপনে টিকিটের যে হার দেওয়া আছে তাতে সর্বনিম্ন ছিল ৪৲ টাকা এবং সর্বোচ্চ ছিল স্বর্ণ মোহর। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে ৪৲ টাকাও কিছু কম মূল্য নয়—সুতরাং এ নাট্যাভিনয় সর্বসাধারণের জন্য হয়নি, হয়েছিল অভিজাত বাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের জন্য। সেক্ষেত্রে বিদ্যাসুন্দরের গান কেন? তা ছাড়াও লেবেডেফ্ মহাশয় ইউরোপীয় ধরনের মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, গ্যালারী, বক্স, পিট ইত্যাদি করে—ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করে, নানান ইউরোপীয় যন্ত্রাদি এনেও—এই বিদ্যাসুন্দর কেন গাওয়ালেন? দু'টি কারণেই তা হতে পারে—প্রথমত: কবিকৃতি বিদ্যাসুন্দরের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সমান জনপ্রিয়তা, দ্বিতীয়ত: নটনটীদের এই গানের উপরেই ছিল বিশেষ দক্ষতা। ইংরেজী নাটকের রঙ্গাভিনয় করাতে গিয়ে সাফল্য সম্পর্কে লেবেডেফের মনে সংশয় থাকাই স্বাভাবিক—তাই তিনি চিত্তবিনোদনের জন্য সর্বতোভাবেই তৈরী ছিলেন। গান ছাড়াও রেখে-ছিলেন কৌতুকাভিনয়—ইউরোপীয় যন্ত্র শিল্পীদের পাশাপাশি রেখেছিলেন বাঙ্গালী যন্ত্র শিল্পীদের।

লেবেডেফ্ ইউরোপীয় ধারায় তাঁর রঙ্গালয় এবং মঞ্চ আড়ম্বরপূর্ণভাবে তৈরী করেছিলেন—আবার তারি সঙ্গে দেখি তিনি তাঁর থিয়েটার বাঙ্গালী রীতিতে সজ্জিত করিয়েছিলেন। এই বঙ্গীয় পদ্ধতির থিয়েটার মণ্ডনশিল্পটি কি ছিল নিঃসংশয়ে বলা মুশকিল। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর "বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থে বলেছেন,—"...মনে হয়, মঞ্চের বহির্দেশ বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্যোতক আলপনা, মঙ্গল কলস, কলাগাছ প্রভৃতির দ্বারাই সজ্জিত হয়েছিল এবং দৃশ্যপটসমূহও বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী অঙ্কিত হয়েছিল।"

লেবেডেফের এই নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টাকে অনেক সমালোচকই বিচ্ছিন্ন, একক প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন—কারণ বাংলাদেশের পরবর্তী ধারাবাহিক রঙ্গালয় ও নাট্যশালার সঙ্গে লেবেডেফের রঙ্গালয়ের কোন ঐতিহ্যগত সংযোগ ছিল না, কিন্তু তবুও একে উপেক্ষা করা যায় না—কারণ এরই মধ্যে সেই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল যার দ্বারা বাংলাদেশ ইউরোপীয় নাট্যসংস্কৃতিকে স্বকীয় করে নিয়েছিল।

প্রথমতঃ—লেবেডেফ ইংরেজী প্রহসনের বঙ্গানুবাদ অভিনয় করিয়েছিলেন তবুও এদেশীয় লোকের মনোরঞ্জনের জন্য তার সঙ্গে দিতে হয়েছে বিদ্যাসুন্দরের বাংলা গান এবং ইউরোপীয় যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীত। একমাত্র অপেরা ছাড়া ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি কিংবা কমেডির যে গঠনভঙ্গি তার মধ্যে যখন তখন গানের প্রয়োগ চলে না। কিন্তু বাংলা দেশের নাটক ইংরেজ আগমনে ইংরেজী গঠনরীতি অনুসরণ করলেও আমরা বরাবরই দেখে এসেছি তাতে গীতিপ্রাধান্য। সখীদের নাচ এবং গান কিংবা "বিবেক" শ্রেণীর কোন চরিত্রের গান বাংলা থিয়েটারের একটি মৌলিক অঙ্গ হয়ে রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনন্য নাট সৃষ্টিতে এই গীতিপ্রাধান্যকে সাদর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ গান যেমন একদিকে ইংরেজী নাট্যরীতিতে ছিল না তেমনিই এ ছিল না সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে। তবে এ এল কোথা থেকে? কেমন করেই বা এ নাট্য আঙ্গিকের সমগ্র ব্যাকরণ উপেক্ষা করে নাট্যকার ও নাট্যামোদীদের অন্তর্লোক প্লাবিত করে চলেছে? তার উত্তর মিলবে উনবিংশ শতকের বাংলার যাত্রা, কবিগান, পাঁচালি, কীর্তন, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির মধ্যে। সংস্কৃত নাটকের বিলোপের পর এই সমস্ত "পালা গানের" লৌকিক ধারাই ছিল ভারতীয়দের আনন্দ উৎসবের মূল কেন্দ্র। বাংলার জলমাটি এবং বাঙ্গালী হৃদয়-মথিত ভাবাবেগের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিল এই শিথিলবন্ধন মধুময় গীতিলহরী। নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত যখন তীব্রতর হয়ে ক্রমোচ্চমার্গে উঠতে থাকে—তখন একমাত্র বাঙ্গালী তথা প্রাচ্য দেশীয়রাই বলতে পারে—রেখে দাও নাটক, আগে গানটা শুনি। বাঃ! বেশ গাইছে তো। এটাই বাংলা নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এখানেই বাংলা নাটক ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেও ইউরোপীয় হয়নি, খাঁটি বাঙ্গালীরই হয়ে রয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই শিল্পের প্রাণ, বৈয়াকরণরা তাঁদের তত্ত্ব নিয়ে থাকুন,

বাংলার নাটক তার নিজস্ব প্রাণ সম্পদের ধারায়ই স্নাত হয়ে চলেছে। বাংলা নাটকের এই ঐতিহ্যগত সূচনা আমরা লেবেডেফের প্রচেষ্টার মধ্যেই দেখতে পাই। লেবেডেফ্ এবং তাঁর নাটক দুই-ই ছিল বিদেশী, কিন্তু বাংলার অস্থিমজ্জার আহ্বান তিনি অস্বীকার পেতে পারেননি।

দ্বিতীয়তঃ—প্রায় একই কারণে বাঙ্গালী ধরনের মঞ্চসজ্জা তাঁকে করতে হয়েছিল। লেবেডেফ্ যাত্রার আসরে অভিনয় করাননি। তিনি রঙ্গালয় তৈরী করেছেন, তার একদিকে ইউরোপীয় পদ্ধতির মঞ্চ নির্মাণ করেছেন, অভিনেতা অভিনেত্রীরা যাত্রার আসরের মত মঞ্চে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেনি —যথারীতি প্রবেশ প্রস্থান করেছে। তবুও বাঙ্গালী রীতির মঞ্চসজ্জা ছিল। অর্থাৎ বাংলায় অনূদিত নাটককে তিনি যথাসম্ভব বাংলার পরিবেশেই উপস্থিত করতে চেয়েছেন। লেবেডেফের বাস্তববুদ্ধি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। ইংরেজী ধরনের মঞ্চ পরিকল্পনা হলেও দেশভেদে, কালভেদে, নাটকীয় ঘটনার পরিবেশ অবশ্যই আলাদা হয়। ইংরেজের ড্রয়িং রুমের যে সাজসজ্জা বাঙ্গালীর "বৈঠকখানা" ঘরের সাজসজ্জা, এমন কি রীতি প্রকৃতিও আলাদা। যদি সে বাঙ্গালী ইংরেজীয়ানার লোক হয় এবং বৈঠকখানার পরিবর্তে সেও ড্রয়িং রুম সাজায় তবুও সেখানে ইংরেজের ড্রয়িং-রুমের মত একটা "ফায়ার্ প্লেস্" রাখতে গেলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতএব বলা চলে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের গঠনপ্রকৃতি অর্থাৎ স্থাপত্যরীতি গ্রহণ করেছে, ইউরোপের বিজ্ঞানকে নিয়েছে,—কেবল বাংলা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং চীন, জাপান—এককথায় বলা চলে প্রাচ্যভূখণ্ডকেই তাদের পুরাতন ঐতিহ্য ত্যাগ করে যুগধর্ম অনুসারে ইউরোপীয় বাস্তববাদিতা গ্রহণ করতে হয়েছে কিন্তু তবুও তারা সবাই এক হয়ে যায়নি, তাদের জাতীয় ঐতিহ্য, প্রথা, শিল্পবোধ ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আলাদা আলাদা হয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চের গঠনরীতি বাংলায় ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করলেও, বাংলা নাটকের পরিবেশ রচনায় ঐতিহাসিক সততা রক্ষা করতে গিয়ে এবং বাঙ্গালীর রুচিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে তাকে আলাদা হতে হয়েছে। ইউরোপীয় ধারার রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালী ধরনের মণ্ডন-শিল্প লেবেডেফ্ই প্রথম নিয়ে আসেন। এই ঐতিহ্যেরই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছিলাম নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী যখন "নাট্যমন্দির" প্রেক্ষাগৃহে "সীতা" নাটকের প্রথম রজনী অভিনয় করেন। সেদিন হাজার হাজার

পদ্মফুলে সমগ্র রঙ্গমঞ্চ এবং প্রেক্ষাগার আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়েই "দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের" পরিচালনায় "স্টার থিয়েটার" রঙ্গালয়ে বহু রজনী ধরে "কর্ণার্জুন" নাটকের অভিনয় হয়। নাটকখানি রচনা করেছিলেন নাট্যাচার্য শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাতে অভিনয় করেছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিরা। কর্ণার্জুনের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীপরেশ বসু (পটলবাবু)। পোষাক পরিচ্ছদ ও গয়নার ডিজাইন করেছিলেন শ্রীপ্রবোধ বাবু ও শ্রীঅহীন্দ্র বাবু। এই সমস্ত পরিকল্পনায় গিরিশযুগেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে যে ইংরেজী ধারাব চোগা-প্যান্টলুন বা ভেলভেটের হাফ-জামা ব্যবহৃত হত তা পরিত্যাগ করে, যথাসম্ভব পৌরাণিক কাহিনীর যোগ্য ভারতীয় পরিবেশ ও পরিচ্ছদ রচনার চেষ্টা হয়েছিল। এই নাটকের সার্থকতার মূল কারণ কিন্তু ছিল অনন্য অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের অস্ত গমনের পর বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঘনীভূত অন্ধকার অপসারিত করে এই নবীনের দল নিয়ে এসেছিলেন নূতন উদ্দীপনা এবং প্রাণের আলোক। লক্ষণীয় যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই দু'খানি অতিসার্থক নাটক, দু'খানিই ছিল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, ইউরোপীয় নাট্যভঙ্গির হলেও একেবারেই বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী খাঁটি বাংলা নাটক। যথারীতি তাদের উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং পরিবেশ রচনা, কিংবা চরিত্র চিত্রণ সকলই ছিল বাঙ্গালীর নিজস্ব।

॥ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত বাংলা রঙ্গালয় ॥

এবার আমরা বাংলা নাটক এবং রঙ্গালয়ের একটি আনুক্রমিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করব। লেবেডেফ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালার সঙ্গে তার পরবর্তী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইংরেজী বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জীবনে এক বিরাট যুগ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কলেজী শিক্ষার সঙ্গে রুচি প্রকৃতি সকলই পরিবর্তিত হতে লাগল। যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাফ-আখড়াই ইত্যাদিই ছিল বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদের উপকরণ—কিন্তু নব্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এতে আর খুশী হতে পারলেন না, এ

সকলই তাঁদের কাছে অরুচিকর ও ঘৃণারযোগ্য হয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নব্য বাংলার থিয়েটার প্রচেষ্টার অগ্রগতি সহজে অনুধাবন করতে পারব। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরেজদের অভিনীত ইংরেজী নাটক দেখতেন এবং সাহিত্য হিসেবেও ইউরোপীয় নাটক পাঠ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছিল প্রাচীনের পুনরাবির্ভাব অর্থাৎ বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃত নাটকের পঠন পাঠন। এই সমস্ত বাঙ্গালীরা নিজেদের বাড়িতে এবং স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালায় যোগ্য বাংলা নাটক না থাকায় শেক্‌সপীয়রের নাটক এবং ভবভূতির নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই প্রথম বাঙ্গালীর নাট্যশালাটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তার দ্বার উন্মোচিত হয় শেক্‌সপীয়র রচিত "জুলিয়াস্ সিজার্" নাটকের অংশ বিশেষ এবং উইলসন্ কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির "উত্তররামচরিতের" অভিনয় দ্বারা। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই নাটক একেবারে মুষ্টিমেয়র জন্য চিহ্নিত হয়ে রইল, জন-মনোরঞ্জন করতে পারল না। আসল কথা বাঙ্গালীর কোন প্রাণের সংযোগ ঘটল না এই নাট্যপ্রচেষ্টার সঙ্গে।

প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল আরো এক বছর পরে। এই নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু। আশ্চর্য এই—সেই "বিদ্যাসুন্দর" কাহিনী নিয়েই ১৮৩৫ খ্রীঃ ৬ই অক্টোবর প্রথম অভিনয় হয় এই রঙ্গালয়ে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রাথমিক যুগে বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর কারণই হল তৎকালে বাংলা নাটকের একান্ত অভাব এবং বিদ্যাসুন্দরের কাব্য ও রসের প্রতি আপামর জনসাধারণের প্রবল আকর্ষণ। বিদ্যাসুন্দর নাটক নয় তবুও আদিযুগের বাংলা থিয়েটার যখনি নিজেকে বিপন্ন মনে করেছে তখনি এর শৃঙ্গার রসে তরুণী ভাসিয়েছে। এই নাটকেই আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাই যে নারী চরিত্রের অভিনয় রমণীদের দ্বারাই হয়েছিল। যাত্রায় কিন্তু মাঝে মাঝে নারীদের ভূমিকায় নারীদেরই দেখা যেত। পরবর্তী ২২শে অক্টোবর "হিন্দু পাইয়োনিয়র" পত্রিকায় এই নাট্যাভিনয়ের এক বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছিল—তার কয়েকটি অংশ উল্লেখযোগ্য—

…"অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর।…

সুমধুর ঐক্যতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়।…এই বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন,…। যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু-প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির "পারস্পেকৃটিভ" মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত, ইহার মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল।"[৪]

উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে আমরা কয়েকটি বাংলা নাটকের প্রয়োগ শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই।

১। গীত ও বাদ্যের প্রাধান্য। বেহালা শুনে শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিচ্ছে। বেহালা কিন্তু ইউরোপীয় বাদ্য যন্ত্র। ঐক্য সঙ্গীতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটছে। ঐক্যতান অর্থাৎ "অর্কেস্ট্রা" কিন্তু ইউরোপীয় রীতিসিদ্ধ।

২। যবনিকা উত্তোলন অর্থাৎ ফ্রন্ট্ কার্টেন্ ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তী অংশে যে মঞ্চসজ্জার বিবরণ পাই তাতে হয়তো "দৃশ্য-যবনিকা" বা "অ্যাক্ট্-কার্টেন্" ও ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩। হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ। রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয় রীতি, সকলি ইউরোপীয় ধারার—তবুও মুদ্রাঙ্কিত হয়ে আছে আমাদের বাঙ্গালীয়ানা 'বিদ্যাসুন্দরের' পালাগানে; মুদ্রাঙ্কিত হয়ে আছে আমাদের ভারতীয়ত্ব হিন্দু স্তোত্রপাঠে অর্থাৎ নান্দী পাঠে। এই স্তোত্রপাঠের কিন্তু পরবর্তী কালের নাট্যাভিনয়ে বিশেষ প্রয়োগ হতে দেখা যায়নি—তবুও তার সংযোগের মধ্যে বাংলা থিয়েটারের স্বকীয় পন্থা আবিষ্কারের প্রয়াস রয়েছে।

৪। দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় ধারার অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর ব্যবহার হয়েছিল। কেবল মেঘ ও জলের দৃশ্যাবলীই নয় দেশীয়

কারিগরদের দ্বারা রাজা বীরেন্দ্র সিংহের প্রাসাদ ও তাঁর কন্যার কক্ষ অঙ্কিত হয়। কারিগর অর্থে চিত্রশিল্পী নয় কারুশিল্পী বা ছুতোর মিস্ত্রীই বোঝায়। সুতরাং তারা হয়তো প্রাসাদ ও কক্ষের 'সেট' রচনারই প্রয়াস পেয়েছিল। যদিও স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে তা ভাল হয়নি। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ইউরোপীয় ধারার মঞ্চ এবং 'সেটের' গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে দেশীয় মিস্ত্রীদেব কোন ধারণাই ছিল না। ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে মঞ্চের সঙ্গে সংলগ্ন একদল কারিগরের উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয় ধারার ত্রি-বেধ নীতি এবং পরিপ্রেক্ষিত তখনও পর্যন্ত চিত্রাঙ্কনে এদেশীয় শিল্পীরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পাবেননি। তাই তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু নবধাবার প্রবর্তন স্পষ্টই দেখা যায়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুবের অনুসৃত পথে ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ কিন্তু একেবারে লোপ পেল না, এর পবে তা দেখা গেল স্কুল-কলেজে ইংবেজী কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়ে। ১৮৪৮ সালে সাঁসুসি (বর্তমান সেণ্টজেভিয়ার্স) নাট্যশালায় বৈষ্ণব কুমার আঢ্য মহাশয় ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। অন্যান্য বহু স্কুল-কলেজেই শেক্‌সপীয়বেব বিভিন্ন নাটকের অভিনয় হতে থাকে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে একটি পুবোদস্তুর নাট্যশালাই প্রতিষ্ঠিত হয়, এর নাম দেওয়া হয়—"ওরিয়েণ্টাল থিয়েটাব"। ডেভিড হেয়াব একাডেমীর ছাত্রদের মতই এখানকার ছাত্ররাও শেক্‌সপীয়রেব অভিনয় কবতে থাকে।

এবপর যে নাট্যশালায় শেক্‌সপীয়রের নাটকের অভিনয় হয় তা কোন স্কুল কলেজেব সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। এই নাট্যশালাটি নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে এখানে জুলিয়াস্ সিজার্ নাটকেব অভিনয় হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ থেকে বাংলা দেশে বাংলা নাটকের অভিনয় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যে নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয় তা হল আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) বাড়িতে "শকুন্তলা" নাটকের অভিনয়। অবিশ্যিই অভিনয় হয়েছিল শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। এরপর এই নাট্যশালায় "মহাশ্বেতা" নাটক রূপে—কাদম্বরী কাব্যের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়। লক্ষণীয় যে বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা চললেও তখন পর্যন্ত খাঁটি বাংলা নাটকের আবির্ভাব বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ঘটেনি। বাঙ্গালীরা ইউরোপীয়

রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যপ্রয়োগ পদ্ধতিই প্রথম গ্রহণ করেছে—তাতে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়েছে—অভিনয়ের প্রয়োজন মেটাতে ক্রমে এগিয়ে এসেছেন নাট্যকারগণ, গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় গঠনরীতিতে রচিত বাংলা নাটক।

॥ সৌখিন থিয়েটারগোষ্ঠী ও বাংলা নাটকের অভিনয় ॥

খাঁটি বাংলা নাটক মঞ্চে সর্বপ্রথম দেখতে পাই নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় কালে। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে। এই নাটকের অভিনয় এরপর গদাধর শেঠের বাড়িতে ও চুঁচুড়ায় হয়। চুঁচুড়ার অভিনয় সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখেছেন যে—...প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল। "অধীনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?"...খাঁটি বাংলা নাটকেও দেখছি গানেরই প্রথম অধিকার।

বাংলা দেশে এ সময়ে কয়েকটি সখের নাট্যশালা দেখা গেল, তারাই ছিল পেশাদারীদের পথপ্রদর্শক এবং বাংলা নাট্যরচনার প্রধান উৎসাহ দাতা।

এর প্রথমটি হল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ১৮৫৩ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য সভা গঠন করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাও তিনিই ছিলেন। ১৮৫৬ সালে নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হয় পরের বছর ভট্টনারায়ণ কৃত "বেণীসংহার" নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৫৭ সালে হয় "বিক্রমোর্বশী" নাটকের অভিনয়। "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রিকা বিক্রমোর্বশীর নেপথ্য বিধি ও নাট্য-শালার সুসজ্জার বিশেষ প্রশংসা করেছে। বহু সম্ভ্রান্ত ও সুরুচিসম্পন্ন লোকের এখানে আগমন হয়েছিল।

এই সৌখিন নাট্যশালাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল "বেলগাছিয়া নাট্য শালা"। বহুদিক দিয়েই এই রঙ্গালয়টি বাংলা নাট্য সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান বাড়িতে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়। বহু

ইংরেজী শিক্ষিত নবীন বাঙ্গালীই এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে অনুষ্ঠিত "রত্নাবলী" নাটকের প্রশংসা করে সকলেই বলেছেন, কি রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাংলা দেশে আর দেখা যায় নি। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের লিখিত স্মৃতিকথায় এই রঙ্গালয় সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়।

১। বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম দেশীয় ঐক্যতান বাদনের প্রবর্তন হয়।

২। নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়েছিল, এক "রত্নাবলী" নাটকেই রাজারা দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। নাট্যশালা নির্মাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরামর্শদাতা ছিলেন।

৩। নাট্যশালার অভিনেতারা সকলেই ছিলেন সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী। শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" নাটক অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা রত্নাবলী লেখেন,—১৮৫৮ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই এই নাটকের অভিনয় হয়।

৪। রত্নাবলী নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদের ভার পড়েছিল শ্রীমধুসূদন দত্তের উপর। রাজাদের কাছ থেকে তিনি পাঁচ শত টাকা দক্ষিণা পান। এই নাট্যশালাই বঙ্গ সাহিত্যে নিয়ে এল মধুসূদন প্রতিভার বিমল জ্যোতি। এতকাল ধরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রধানতঃ ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকেরই বঙ্গানুবাদ অভিনীত হচ্ছিল—তার কারণ যোগ্য বাংলা নাটক ছিল না। এই অভাব পূরণ করলেন শ্রীমধুসূদন দত্ত। তিনিই হলেন উনবিংশ শতকের বাঙলা নাট্যকারদের প্রকৃত পথ প্রদর্শক। শ্রীমধুসূদন "শর্মিষ্ঠা" নাটক লিখলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই যুগান্তকারী নাটকখানির অভিনয় হয়।

১৮৫৯ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল "মেট্রোপলিটন থিয়েটারে" উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় হয়। এটিও ছিল সখের নাট্যশালা। বিধবা-বিবাহ তখন বাংলা দেশ জুড়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। এই নাটকের মঞ্চায়ন সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা' ২৭শে এপ্রিল লিখেছে—

"…দৃশ্যপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতটা যে সুচিত্রিত হইবে তাহা আশা করা যায় নাই।" নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী ছিলেন বাবু মুরলীধর সেন। অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন কেশবচন্দ্র।

লক্ষণীয় যে প্রয়োগ শিল্প এবং দৃশ্যপট অঙ্কন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে ক্রমেই উন্নতমানের হয়ে উঠছে।

এরপরে এল আরো চারটি উচ্চাঙ্গের নাট্যশালা—তারা সাধারণ রঙ্গালয় না হলেও বাংলা নাটক, রঙ্গালয় এবং উন্নত ধরনের মঞ্চসজ্জার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। এরাই সাধারণ নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন করে এবং শিক্ষা দেয়।

১। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়—১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম অভিনয় হয় "বিদ্যাসুন্দরের"। ১৮৫৯ সালে হয় "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের অভিনয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালাই ছিল এই রঙ্গালয় এবং প্রয়োগ পদ্ধতির আদর্শ-স্বরূপ এখানে "যেমন কর্ম তেমনি ফল", "বুঝলে কি না", "চক্ষুদান", "উভয়-সঙ্কট" ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসনেরও সার্থক অভিনয় হয়। আর ইংরেজী বা সংস্কৃতের প্রখ্যাত নাটকের অনুবাদ নয়, বাংলা নাটক ক্রমশঃই তার নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

২। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি—শোভাবাজার রাজবাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে ১৮ই জুলাই এর প্রথম নাটক শ্রীমধুসূদন দত্ত বিরচিত "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনটির অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই নাট্যশালায়ই মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটকেরও অভিনয় হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকখানিই ছিল তৎকালে বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মৌলিক নাটক। এই নাটকখানিই বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী নাট্য তত্ত্বের আদর্শে রচিত প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি।

৩। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা—এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং একজন নাট্যকার ছিলেন এবং বহু সংস্কৃত নাটকেরই সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন।

ঠাকুর বাড়িতে সর্বপ্রথম মধুসূদন দত্তের "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের অভিনয় হয় এবং কিছুদিন পরেই হয় "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনের অভিনয়।

উনবিংশ শতকের নবজাগরণ কালে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে—এঁদের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, তিনি সতীদাহ নিবারণ করেন। এই পথ অনুসরণ করে আসে বহু

বিবাহ রোধের চেষ্টা এবং বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করা। নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। এরি পরিপ্রেক্ষিতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ খ্রীঃ "ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" পত্রিকায় বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই নাটক রচনার ভার নেন এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ "নব-নাটক" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। তর্করত্ন মহাশয়কে বহু জ্ঞানী-গুণীর প্রকাশ্য সভায় পুরস্কৃত করা হয়, সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর। রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত দুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণকে দেওয়া হয়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়—তাতে আছে······"দোতলার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ আঁকিতে আরম্ভ করিল। "ড্রপ-সীনে" রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ "জগমন্দির" প্রাসাদ অঙ্কিত হইল" (পৃঃ ১০৪)।

······"তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকার বনের মতই বোধ হইত" (পৃঃ ১০৮)।

এই রঙ্গমঞ্চে "নব-নাটকের" অভিনয়ের আলোচনা আমরা পাই "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায়।

···"নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত।" "সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার" উল্লেখে মনে হয় এই বিশেষ পরিবেশ আলোক সম্পাত দ্বারা রচনা করা হয়েছিল। এই সময়ে মঞ্চে গ্যাসের আলোক দ্বারাই সম্ভবতঃ আলোক সম্পাতের চেষ্টা হয়।

সোমপ্রকাশের সমালোচনায় যে "প্রকৃত-রীতি" তাই হল বাস্তব রীতি। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় বাস্তবানুগ রূপায়ণের চেষ্টা যে কতদূর পর্য্যন্ত

উঠেছিল তা আটা দিয়ে বনের দৃশ্যে জোনাকী পোকা আটকানোর চেষ্টাতেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এদেশীয় শিল্পীরাই এরূপ দৃশ্যাঙ্কনে সমুন্নত পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। বাংলা নাটক ও নাট্যপ্রয়োগ রীতি ক্রমেই স্বাধীন ও সাবলীল গতিপ্রবাহ লাভ করতে লাগল।

৪। বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়—বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে স্থাপিত হয়। ১৮৬৮ সালে এখানে মনোমোহন বসুর "রামাভিষেক" নাটকের অভিনয় হয়। এর অভিনয় সম্পর্কে "ন্যাশনাল পেপারে" আছে,—

…"অর্থব্যয়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছিল এবং দৃশ্যপটগুলিও প্রয়োজনানুযায়ী হইয়াছিল।"

পাঁচ বছর পরে কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় "বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়" নামে বহুবাজার নাট্যসমাজের নূতন নাট্যমন্দির নির্মিত হয়।

॥ বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার ও সাধারণ বঙ্গালয় ॥

অর্থশালী ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের নাট্য প্রচেষ্টার সমকালেই কলকাতা এবং মফঃস্বলের বহু স্থানেই সৌখিন তরুণের দল নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং নাট্যাভিনয় করতে লাগলেন। কলকাতার এমনিই এক সখের থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল "বাগবাজার অ্যামেচাব থিয়েটার"। পরে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় "শ্যামবাজার নাট্যসমাজ"।

বাগবাজারের কয়েকজন যুবক—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ইত্যাদিরা মিলে নাট্যাভিনয়ের বাসনা নিয়ে দল গড়েন। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

বাগবাজারের এই সখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৬৮ সালে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে—বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখুজ্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে তাঁদের প্রথম অভিনয় হয়। ১৮৭০ সালে সরস্বতী পূজার রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়। দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং এই অভিনয় দেখতে আসেন। এ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :—

"অর্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।"

দীনবন্ধুর এই উক্তি নাট্যকার বার্ণার্ড শ'এর কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—অভিনেতারা অনেক সময়ই আপন প্রতিভা বলে নাট্যকারের নাটকের অজানিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারেন—তেমনিই আবার নাট্যকারদের রচনার সীমারেখা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন মঞ্চপ্রয়োগ শিল্পীরা।

এই নাট্যাভিনয়ে "নিমচাঁদের" ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, তাঁর অভিনয়ে সেদিনকার দর্শকজনকে যুগপৎ বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এরপরে বাগবাজারের দলই ১৮৭২ সালে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের বহির্বাটির প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত করে দীনবন্ধুর "লীলাবতী" নাটকের অভিনয় করে। এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতি কথা "পুরাতন প্রসঙ্গে" লিখেছেন,—

…"মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়া গেল। সেই ভিজা চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন।"

এই বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায় বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে যে নাটক এবং নাট্যাভিনয় ইংরেজী শিক্ষার পথ ধরে এসেছিল—তা প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করেছিল স্কুল-কলেজ এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে। বাগবাজার দলের অভ্যুদয়েই আমরা পেলাম নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ। নিতান্তই নাটকের এবং অভিনয়ের টানে ঘর-ছাড়া, অর্থসম্পদহীন বাউণ্ডুলে ছেলের দল—উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অতি সামান্য উপকরণ নিয়ে নাট্যাভিনয়ে মেতে উঠলেন। এবং তাঁদের প্রাণ প্রাচুর্যের উদ্দামতায় সমস্ত বাধা বিঘ্নই অতিক্রম করে বাংলায় নাট্য-লক্ষ্মীকে আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

"লীলাবতী" নাটকের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দলের কয়েকজন

টিকিট বিক্রি করে নাট্যশালাটিকে স্থায়ী করার প্রস্তাব করেন। এই হল সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূল।

বহু মতান্তর ও মনান্তরের পর এই নূতন নাট্যশালার নামকরণ হয় "ন্যাশনাল থিয়েটার"। এই প্রস্তাবে নেতৃদলের অনেকেই রাজী হলেন কেবল গিরিশচন্দ্র ছাড়া। গিরিশচন্দ্র তাঁর এই বিরূপতার কারণ উল্লেখ করে "বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী" গ্রন্থে লিখেছেন যে,—"ন্যাশনাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে, ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল।"

এই ছিল মতভেদের কারণ। পরিশেষে টিকিট বিক্রির মত বজায় রইল, গিরিশবাবু দল ছাড়লেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি "নীলদর্পণ" অভিনয়ের আয়োজন করলেন। ভুবনমোহন নিয়োগীর আনুকূল্যে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবনবাবুর বাড়ির দোতলায় মহলা বসল। এই সময়ে অমৃতলাল বসু মহাশয়ও এসে দলে জুটলেন।

রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে ঘড়িওয়ালা বাড়ি নামে মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটির উঠান নেওয়া হল। এই স্থানে বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে লাগল। ধর্মদাস সুর স্টেজ তৈরী করলেন। ধর্মদাস সুরই ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। বিদেশী মঞ্চ স্থাপত্য ও মঞ্চ সজ্জায় তাঁর হাতে কলমে জ্ঞান ছিল না, তবুও লিউইস্ থিয়েটারে সাহেবদের অভিনয় দেখে এবং দরকার হলে চিত্র এঁকে এমন কি পর্দায় ভাঁজকটি পর্যন্ত গুণে নিয়ে আসতেন এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অতি সামান্য উপকরণে তাকেই বাস্তবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আপন প্রতিভা বলে তিনি তাতেই সফলকাম হয়েছিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭২ সনে ৭ই ডিসেম্বর "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় করে। বঙ্গীয় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের ঐতিহ্যপূর্ণ দিন হিসেবে এই দিনটি চির চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এডুকেশন গেজেটে (১৮৭২ সাল ১৩ ডিসেম্বর) এই নাট্যাভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে আছে,...ন্যাশনাল থিয়েটারের রঙ্গমন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চও মন্দ নয়। তাহার দুই

পার্শ্বে ও 'ফুটপাথে' অর্থাৎ বহির্ভাগে গ্যাসের আলো ছিল। তাহাই কেবল দর্শক মণ্ডলীর আলোকের ভরসা মাত্র। রঙ্গগৃহের উপরিভাগে একটি আলোকময় Crown অর্থাৎ রাজমুকুট শোভা পাইয়াছিল। আলোক বিহনে শ্রোতৃবর্গের সে দিবস যে কি অপরিসীম কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেবল যাঁহারা সেই দিবস ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন।...

পরিশেষে অভিনয়াগারের দৃশ্যগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধিকাংশ দৃশ্যগুলি "ন্যাশনাল থিয়েটারের" উপযুক্ত হয় নাই। কারণ জাতীয় চিত্রের আদর্শ সকল স্থাপন করাই কর্তব্য। 'গোলাঘরের সম্মুখে' ও "কুটীর দপ্তরখানার সম্মুখের" চিত্র দুইখানি মন্দ নহে। অনেক গৃহের পার্শ্ববর্তী দৃশ্য (Wings) না থাকাতে গৃহের সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছিল এবং কোন কোন গৃহের দৃশ্যও অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।...

এই সমালোচনার কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে। প্রথমতঃ তখন জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীয়ানার যুগ। 'ন্যাশনাল' কথা বড় বড় বিষয়ে ব্যবহার হয়,—'ন্যাশনাল' নামে কোন খেলো কাজ হয় বা সামান্য কাজ হয় এ অনেকেরই পছন্দ ছিল না। 'ন্যাশনাল' নামের যোগ্য জিনিস তাঁদের বিবেচনায় বোধ হয় কিছুই ছিল না। গিরিশচন্দ্রের আপত্তি এই নামেই ছিল।

দ্বিতীয়তঃ ধর্মদাস সুর মহাশয়ের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা—উপকরণ এবং অর্থ দুই-ই স্বল্প। গ্যাসের আলোক—তাও রাস্তার আলোক ভরসা, সুতরাং দর্শকদের যে প্রায় অন্ধকারেই দেখা অভ্যাস করতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

তৃতীয়তঃ ধর্মদাসের আদর্শ ছিল বিলাতী থিয়েটার,—নীলদর্পণের মত গ্রাম্যপরিবেশ সেই বিদেশী বিন্যায় সহজেই আনয়ন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই উপকরণের অভাব নীলদর্পণের অভিনয় ভুলিয়ে দিয়েছিল, তা এতই ভাল হয়েছিল যে দর্শকদের মনে হত—"এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।"

ন্যাশনাল থিয়েটার এরপরে "সধবার একাদশী" নাটকের অভিনয় করে এবং তারপরে করে দীনবন্ধুরই "নবীন-তপস্বিনী", এই নাটকের অভিনয়ে দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখি। তার একটি হল অমৃত বাজার পত্রিকা বলেছে—"পটক্ষেপণ ও পটোত্তোলনাদি কার্য্যে আরো তৎপরতা আবশ্যক।" অর্থাৎ অঙ্কিত দৃশ্যপট উঠানো বসানোর ব্যাপারে তৎপর হওয়া আবশ্যক।

এতে মনে হয় অভিনয়ে কেবল অঙ্ক-যবনিকা নয় দৃশ্য-যবনিকারও ব্যবহার হয়েছিল, না হলে বারবার পটক্ষেপণ ও পটোত্তোলনের কথা আসে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—এই সময় হতেই নাট্যশালায় "প্রম্পটার্" রাখবার প্রথা হয়। কারণ ন্যাশনাল-থিয়েটার প্রতি সপ্তাহেই তখন নূতন নূতন নাটকের অভিনয় দেখাত, ফলে সব অভিনেতা সব ভূমিকাই পূর্বাপর মুখস্ত রাখতে পারতেন না—তাই প্রম্পটারের আবির্ভাব। ইতিপূর্বে যে সমস্ত অভিজাত অভিনেতাদের সখের থিয়েটার হয়েছে, তাতে ন'মাসে ছ'মাসে, একটা নাটক নেমেছে—দীর্ঘদিন ধরে মহলা দেওয়ায় পার্ট সকলেরই মুখস্ত হত। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তা চলে না তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান চাই —নোতুন নোতুন নাটক চাই অতএব সহজ পথ খুঁজে নিতে হল। এই মধ্যবিত্ত নাট্য-পাগল ছেলেদের নাটকের সখ ছিল কিন্তু অভিজাতদের মত প্রভূত অর্থ ছিল না—তাই তাঁরা টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, বলা যায় প্রয়োজনের কারণেই। অভিজাতদের সখের থিয়েটার দর্শনের পথ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে সকলেই আসতে পারল। ফলে এদেশে থিয়েটার মাটির সংযোগ পেল এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ও ধারা গড়ে উঠতে লাগল।

এরপর নাটকের সঙ্গে "মুস্তাফী সাহেবকা পাকা তামাশা" নামে প্যান্টোমাইম্ এসে যুক্ত হতে লাগল। এই মুস্তাফী সাহেব ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর—মঞ্চে তাঁর পাকা তামাশার জুড়ি আজো পর্যন্ত বিরল। অভিনয়ে কোন বাধা উপস্থিত হলে, রাত বাকী থাকলে, বৃষ্টি নামলে দর্শকরা কোন কারণে বিরক্ত হয়ে উঠলে মুস্তাফী সাহেবই ছিলেন দলের একমাত্র সহায়। তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে বেহালা, ফ্লুট ইত্যাদিও থাকত, কৌতুকের আকারে তিনি তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সব কিছুরই ব্যঙ্গ করতেন। মুস্তাফী সাহেব কাফ্রি সেজে উদ্ভট পোষাকে মঞ্চে আসতেন, এ সব ক্ষেত্রে প্রায়শঃই তাঁর সাদামাটা বালিকা বধূর ভূমিকা নিতেন বিনোদিনী এবং সাহেবের মা সাজতেন ক্ষেত্রমণি তারপর সাহেব হয়তো স্বরচিত গান গাইতেন—

"হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—

Mr Mastfee name হামারা
চাটগাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom & etc.

* * *

Coat পিনি Pantaloon পিনি, পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom & etc.

চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I [eat]
চারপাই is my palang posh, Morah is my Royal [seat]
Rom-ti-tom & etc.

কোরাস— I am a gentleman

এই পাকা তামাশার দৃশ্যসজ্জায় দেখানো হত একখানা ভাঙ্গা একতলা ঘর। ইট সাজিয়ে পায়া করে তার উপর তক্তা পেতে টেবিল করা হত। সাদা থানের খানিকটা অংশ কেটে হত তার ঢাকনা।

১৮৭৩ সালে ৮ই মার্চ কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ের পর অভিনেতারা কাতর অন্তরে দর্শকদের/ কাছ থেকে বিদায় চান, ন্যাশনাল থিয়েটার তখনকার মত বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ ছিল নিজেদের মধ্যে দলাদলি। গিরিশচন্দ্র প্রথমে বিরুদ্ধবাদী থাকলেও পরে পরিচালক ও অভিনেতা-রূপে দলে যোগ দিয়েছিলেন। নাট্যশালার প্রধান ছিলেন চার জন—অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর। টাকা কড়ি, স্বত্বাধিকার, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়েই কলহ আরম্ভ হয়। নগেন্দ্রবাবু, অমৃতবাবু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর, ছিলেন একদলে, ধর্মদাস সুর, মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু অন্য দলে তাঁরা দলের সকলকেই সমান টাকার ভাগ দেওয়ার কথা তোলেন। ধর্মদাস ছিলেন ম্যানেজার, তাঁর হাতেই টাকা-কড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল—তিনি তা নিয়ে গিরিশচন্দ্রের শরণ নিলেন। শেষ অভিনয়ের পরে বৃষ্টির ভয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর সান্যাল বাড়ি থেকে স্টেজ মুটের মাথায় পাঠালেন—কিন্তু তা যথা সময়ে তাঁর কাছে না পৌঁছে শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দিরে চালান হল, অতএব তিনি ধর্মদাস ও মতিবাবুর কাছে লোক পাঠালেন, তাঁরা বলে দিলেন—"আমাদের নিকট স্টেজ থাক, তোমাদের কাছে ড্রেস আছে।"

ধর্মদাসের দল ভারি ছিল বেশি, স্টেজ এবং টাকা কড়িও তাঁর হাতে, গিরিশচন্দ্রকে কর্তৃত্ব দিয়ে তাঁরা নূতন দল গড়লেন এবং অচিরেই এই দলের নাম ন্যাশনাল থিয়েটার বলে রেজেস্ট্রি করে নিলেন। এই দল টাউন হলে প্রথম অভিনয় করে, পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে স্টেজ খাটিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে। একে গিরিশচন্দ্র সহায়,—তার উপরে স্টেজের জোর বড জোর বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ করাই যেখানে উদ্দেশ্য। এ দলে স্টেজও আছে ধর্মদাস সুরও আছেন। দ্বিতীয় দলের স্টেজও নেই সীন্‌ও নেই অতএব তাঁরা লিণ্ডসে স্ট্রীটে অপেরা হাউজ্‌ ভাডা নিয়ে অভিনয় দেখানো সঙ্কল্প করেন। ন্যাশনাল কথাটি এঁরাও ছাডতে চাইলেন না, এঁদের দলের নাম হল "হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার"। ১৮৭৩ সালে ৫ই এপ্রিল—হিন্দু ন্যাশনালের প্রথম অভিনয় হয়—তাতে উৎকৃষ্ট প্যান্টোমাইমের ব্যবস্থা ছিল—কারণ এ দলে স্বয়ং মুস্তাফী সাহেব ছিলেন। হিন্দু ন্যাশনালের নিজের রঙ্গমঞ্চ না থাকায় তারা মফঃস্বল এলাকার বিভিন্ন জায়গায়ও অভিনয় দেখিয়ে বেডাতে লাগল।

১৮৭২ সালে, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছুকাল মধ্যেই আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় কলকাতায় অভিনয় দেখাতে আরম্ভ করে—তার নাম হল "ওরিয়েন্টাল থিয়েটার"। প্রথম রাত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের "মালতীমাধব" অভিনয় হয়, অভিনয় ভাল হয়নি, ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের স্থায়িত্বও বেশি দিন ছিল না। কারণ এ ন্যাশনালের অনুকরণমাত্র ছিল।

এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য থিয়েটার ছিল "বেঙ্গল থিয়েটার"। এর ম্যানেজার ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, সাতু বাবুর দৌহিত্র। বেঙ্গল থিয়েটার নিজের রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদর্শে নির্মাণ করিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে। এ বাড়ির মেঝে ছিল মাটির এবং খুঁটী ছিল শালের—উপরে ছিল খোলার চাল। এই রঙ্গমঞ্চের আর একটি নূতনত্ব ছিল যে, এ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে নারী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষই অভিনয় করে এসেছে, বেঙ্গল-থিয়েটারই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করে। শ্রীমধুসূদন দত্তের পরামর্শেই নাকি অভিনেত্রী নেওয়ার দুঃসাহসী প্রচেষ্টা এই থিয়েটার করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাতে আপত্তি তোলেন। বিডন স্ট্রীটের ডাকঘর যেখানে এই রঙ্গালয় সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম যে অভিনেত্রীদের আনয়ন

করেছিল তাঁরা হলেন—এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যামা এবং গোলাপ (সুকুমারী)। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়।

১৮৭৩ সালে "হিন্দু ন্যাশনাল" এবং "ন্যাশনাল" দুই দলই মফঃস্বল ভ্রমণ শেষে কলকাতায় ফিরে আসে। এই সময় হিন্দু ন্যাশনাল দল "গ্রেট ন্যাশনাল" নাম ধারণ করে। গ্রেট ন্যাশনাল ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে, বর্তমান "মিনার্ভা থিয়েটারের" জমিতে গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের অনুকরণে সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্মাণ করে। রঙ্গালয় তৈরীর কর্মভার ছিল ধর্মদাস সুরের উপর। ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এই রঙ্গালয় নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি কোন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়রের সহায়তা গ্রহণ করেননি, তবে দু'চারখানি সীন্ মিঃ গ্যারিককে দিয়ে আঁকানো হয়। ১৮৭৩ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়, তিনমাস লেগেছিল নাট্যশালা নির্মাণ শেষ হতে। অবিশ্যিই তৈরী হতে এত কম সময় লাগায় বোঝা যায় রঙ্গালয়টি কাঠনির্মিতই ছিল—এর ছাদ ছিল করগেটের। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথম রাত্রিতেই আগুন লেগে "কাম্যকানন" নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৪ সালের জানুয়ারীতে পুনরায় অভিনয় আরম্ভ করে—তা ছিল "কৃষ্ণকুমারী" নাটক। ন্যাশনাল থিয়েটারের দলও কালক্রমে গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে মিলিত হল। গ্রেট ন্যাশনালে তখন ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর ইত্যাদি অভিনেতারা তো ছিলেনই তৎসঙ্গে ছিলেন ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেত্রীরা। গ্রেট ন্যাশনাল তখন কেবল কলকাতায় নয়, বাংলা দেশ ছাড়িয়ে ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে তার দিগ্‌বিজয়ে বের হল। বিনোদিনী প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারেরই অভিনেত্রী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র শরৎবাবুকে অনুরোধ করে তাঁকে নিজ দলে নিয়ে আসেন।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড (প্রিন্স অব্ ওয়েল্স) তখন কলকাতা ভ্রমণে আসেন, হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিজ বাড়িতে আহ্বান করে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ইত্যাদি ভারতীয় প্রথায় অভ্যর্থনা জানায় এতে কলকাতার বাঙ্গালী সমাজের স্বদেশী চেতনায় প্রবল আঘাত লাগে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ" নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখায়। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি অভিনয়ের

পরই পুলিশ এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। এর পরে "কর্ণাটকুমার" নাটকের সঙ্গে "গজদানন্দ ও যুবরাজ" প্রহসনটি "হনুমান চরিত্র" নাম দিয়ে আবার অভিনীত হয়। নাট্যশালাকে সংযত করবার জন্য ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ সালে ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। গ্রেট ন্যাশনালের কর্মকর্তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসে। গ্রেট ন্যাশনালে তখন "সতী কি কলঙ্কিনী" গীতিনাট্যের অভিনয় চলছিল, সদলবলে পুলিস কমিশনার এসে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু ও মতিলাল সুর, বেল বাবু প্রভৃতি আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করে নেয়। বিচারে তাঁদের কারো কারো বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাংলা দেশের রঙ্গালয়ের উপর আঘাত হানল প্রথম সরকারী নিষেধাজ্ঞা এবং এল পুলিসী শাসন। কলকাতার অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে "নাট্যাভিনয় নিষেধাজ্ঞা বিল" (Dramatic Performance Control Bill) নামে আইনটির খসড়া হয় এবং বছরের শেষের দিকে সেটি আইনে পরিণত হয়।

এতক্ষণ আমরা বাংলা দেশে কি করে অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে পেশাদারী রঙ্গালয়ের আবির্ভাব ঘটল এবং তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হল তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। রঙ্গালয়ের সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্কে সম্পর্কিত রয়েছে নাটক, এই কালের মধ্যে বাংলাদেশে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা বাংলা নাটককে পূর্ণায়ত রূপ দান করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলার কৌলিন্য প্রথার মর্মান্তিকতা নিয়ে লেখেন "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটক। ১৮৬৬ খ্রীঃ লেখেন "নব নাটক"। এর পর "যেমন কর্ম তেমনি ফল" ইত্যাদি কয়েকটি প্রহসনও লেখেন।

শ্রীমধুসূদন দত্ত "শর্মিষ্ঠা"র পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন গ্রীক পুরাণের আখ্যানের আদর্শে হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে "পদ্মাবতী" নাটক এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় "কৃষ্ণকুমারী"। এর পরে তিনি লেখেন দু'খানি প্রহসন—"একেই কি বলে সভ্যতা"? ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" (১৮০৬ খ্রীঃ)।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "নীলদর্পণ" হাতে নিয়ে মরমী দীনবন্ধু নাট্য রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তারপর লেখেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী (১৮৬৭ খ্রীঃ,)

বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী (১৮৬৬ খ্রীঃ), জামাই-বারিক (১৮৭২ খ্রীঃ)। তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে হাস্যরস যথেষ্ট থাকলেও এগুলি ছিল সমাজের মর্মবেদনার এক একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এর পরে আসেন মনোমোহন বসু, তিনি লেখেন পৌরাণিক নাটক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "রামাভিষেক" (১৮৬৭ খ্রীঃ), "সতী নাটক" (১৮৭৩ খ্রীঃ), "হরিশ্চন্দ্র নাটক" (১৮৭৫ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইতিমধ্যে পুরুবিক্রম (১৮৭৪ খ্রীঃ), সরোজিনী (১৮৭৫ খ্রীঃ) ইত্যাদি নাটক লেখেন, কিন্তু তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার ছিলেন না।

আবার আমরা থিয়েটারে ফিরে আসি। ১৮৭৫ খ্রীঃ পর থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারী পরিবর্তিত হতে থাকে, তাদের অধীনে কখন অধ্যক্ষ হন ধর্মদাস সুর, কখন অবিনাশচন্দ্র কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বসু, কেদার চৌধুরী এমন কি অমৃতলাল বসু মহাশয়ও ম্যানেজার হয়েছিলেন। এ পর্যন্তও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অভিনয় প্রতিভা ছাড়া অন্য কোন প্রতিভার প্রকাশ ঘটেনি। তাছাড়া তিনি কোন দলের সঙ্গেই সামঞ্জস্য বিধান করে, অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকতে পারছিলেন না। অন্য দিকে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনও রঙ্গমঞ্চের উপর এক কঠিন আঘাত হেনেছিল। ভিতরে ও বাইরে যখন এরূপ স্থিতাবস্থা তখন বাংলাদেশের থিয়েটার শিল্প বহু হাত ঘুরে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর হাতে এসে পড়ল। থিয়েটার ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হল। আসল কারণ কেবলমাত্র তাই ছিল না। নাট্যাভিনয়ে অভিনেত্রীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকাওয়ালা কাপ্তেন লোকেরও এই শিল্পের উপর ঝোঁক বেড়ে গেল। তাঁদের টাকা ছিল কিন্তু থিয়েটার শিল্পের উপর কোন মমত্ববোধ কিংবা শিল্প-সৃজন ক্ষমতা ছিল না। তবুও সাময়িকভাবে তাঁরা নট-নটী ও থিয়েটার শিল্পকে কিনে নিতেন। অতঃপর যখন সখ এবং পৈতৃক অর্থ দুই-ই ফুরাত তখন আবার থিয়েটারের হাত বদল হত।

এমনি এক সখের ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন, ভারি আগ্রহে গিরিশবাবু চাকরী ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে পাকাপাকি ভাবে যোগ দিলেন। ভাল নাটকের অভাব ছিল বলে গিরিশচন্দ্রকে তখন নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয়—তবুও

যোগ্য নাটক পাওয়া গেল না। এক প্রকার বাধ্য হয়েই গিরিশচন্দ্র নাট্য রচনায় হাত দিলেন, তাঁর প্রথম নাটক "রাবণ বধ" (১৮৮১ খ্রীঃ) এখানেই অভিনীত হয়। এই সময় হতেই আমরা গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও অধ্যক্ষ রূপে দেখতে পাই। ক্রমশঃ বাংলাদেশের পেশাদারী থিয়েটার শিল্প একটা স্থায়ী রূপ পেল. গিরিশচন্দ্রই হলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের পিতৃস্বরূপ (The father of the native stage.)।

॥ স্টার থিয়েটার ও বিনোদিনী ॥

পাঞ্জাবী গুরমুখ রায় ১৮৮৩ সালে স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। স্টার থিয়েটার ছিল বিডন স্ট্রীটে, পরবর্তীকালে সেখানেই "কোহিনূর" এবং "মনোমোহন থিয়েটারের" প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে সেই জমির উপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চলে গেছে। থিয়েটারের মালিক ছিলেন গুরমুখ রায় কিন্তু জমির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্র। স্টার থিয়েটারটি গুরমুখ বিনোদিনীর নামেই "বি" থিয়েটার রাখবেন কথা ছিল। কিন্তু নাম রেজিস্ট্রি করার সময় রাখা হল "স্টার"। কারণ একজন অভিনেত্রীর নামে রঙ্গালয়ের নাম হোক দলের অনেকেই তা চাইলেন না।

ইতিমধ্যে গিরিশবাবু "ন্যাশনালের" সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর সঙ্গে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনী ইত্যাদিও ন্যাশনাল ত্যাগ করে এলেন, এই সম্প্রদায় স্টার থিয়েটারে এসে যোগ দিলেন। গিরিশচন্দ্র হলেন কর্ণধার—নাট্যাচার্য। স্টারে গিরিশচন্দ্রের "দক্ষযজ্ঞ" প্রথম অভিনীত হয়। পরে ১৮৮৪ খ্রীঃ ২রা অগাস্ট গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় হয় সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ভাগ্য ফিরে গেল। একে বাংলাদেশের ভাবুকতা ও ধর্মপ্রাণতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সুগভীর সংযোগ, অন্যদিকে নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের সুরধুনী প্রস্রবণ—শুধু তাই নয় চৈতন্যলীলায় নিমাই ও নিতাইর ভূমিকায় বিনোদিনী ও গঙ্গামণির ভাবোদ্দীপক অপূর্ব অভিনয়—এই সমস্ত কিছু মিলে দেশের তাবৎ দর্শককে আকর্ষণ করতে লাগল। এই নাটকের অভিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "পায়ের ধুলো" পেয়ে রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ধন্য হল। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন—সাধারণ রঙ্গালয়ের নট-নটীরা আর অচ্ছুৎ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে রইল না।

রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনী তাঁর ৯।১০ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করতে আসেন তারপরে মাত্র ১২ বছর তিনি অভিনেত্রী জীবন যাপন করেন—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল তাঁর কর্মকাল। এই স্বল্প কালের মধ্যে তিনি প্রায় অর্ধশত নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ করেন। তিনি যে কেবল নারী চরিত্রেই অভিনয় করেছেন তাই নয় "চৈতন্যলীলা" নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ছিল চির অবিস্মরণীয়। এই অভিনয় কালের মধ্যে বিনোদিনী চারটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই রঙ্গশালাগুলো হল—১। গ্রেট ন্যাশনাল (১৮৭৪ খ্রী: ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ খ্রী: ডিসেম্বর), ২। বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৬ খ্রী: ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ খ্রী: জুলাই), ৩। ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭ খ্রী: জুলাই থেকে ১৮৮৩ খ্রী: জুলাই), ৪। স্টার (১৮৮৩ খ্রী: জুলাই থেকে ১৮৮৬ খ্রী: ডিসেম্বর)। এই রঙ্গালয়গুলো এই সময়ের মধ্যে নানান মালিকের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই তিনি সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিনোদিনী যখন ন্যাশনালে আসেন তখন ঐ থিয়েটার কেদারনাথ চৌধুরীর নামে লীজ নেওয়া ছিল। এ বছরের জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চ "ন্যাশনাল থিয়েটার" নামে লীজ নেন। কেদার চৌধুরী হলেন ম্যানেজার। এখানে "আগমনী," "অকাল বোধন" এবং "মেঘনাদ বধ" অভিনীত হয়। ১৮৭৮ খ্রী: ন্যাশনালের আবার মালিক হন কেদারনাথ চৌধুরী। কিছু দিনের মধ্যেই এই থিয়েটার নিলামে বিক্রি হয়, কিনে নেন প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারী। গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার হলেন—মাসিক মাইনে হল ১০০৲ টাকা।

বেঙ্গল থিয়েটার থেকে গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে বিভিন্ন বিষয়ে অতি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে পার্টগুলির ভাবার্থ বুঝিয়ে দিতেন এবং তার পরে মুখস্ত করতে বলতেন। অবসর সময়ে গিরিশবাবু,—অমৃত মিত্র, ছুনীবাবু প্রমুখের সঙ্গে বিনোদিনীর বাড়িতে এসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের এবং শেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন, বায়রণ, পোপ ইত্যাদির লেখা পড়ে অথবা গল্পচ্ছলে শুনাতেন। বিলেতী বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা কলকাতার ইংরেজী থিয়েটারে অভিনয় করতে এলেও বিনোদিনীকে তা দেখতে নিয়ে যাওয়া হত। বিনোদিনীও অতি যত্নের সঙ্গে অভিনয় শিক্ষা

করতেন এবং অভ্যাস করতেন। অভিনয়ের পারদর্শিতা ছাড়াও বিনোদিনীর আর একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল তা হল চরিত্রানুযায়ী মেক্-আপ করা, এবং তেমনি সাজপোষাক করা। অনেক সময় এমন হত যে, একই নাটকে তিনি বিপরীত-ধর্মী একাধিক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—এ সমস্ত ক্ষেত্রেও তিনি এমন যত্নের সঙ্গে পোষাক এবং মেক্-আপ করতেন যে, জানা না থাকলে দর্শকরা বুঝতেই পারত না যে একই ব্যক্তির অভিনয়। সব সময় তিনি নিজের হাতেই এই কাজগুলো করতেন—ড্রেসাররা কেবল যোগান দিত। বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বহুবিধ কেশবিন্যাসেও তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয় অত্যন্ত কালো ছিলেন তাঁকে সাহেব সাজাতে সাহেব মেক্ আপ ম্যান্ আসত—পরে এ কাজের ভার বিনোদিনীই নিলেন। তাঁর এ গুণটি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি প্রচুর সুখ্যাতি করে লিখে রেখে গেছেন। নাট্যাভিনয়ে উপযুক্ত পোষাক এবং অঙ্গসজ্জা একটি চরিত্রের বয়স, পরিবেশ, আর্থিক সঙ্গতি, মনোভাব ইত্যাদি বহুকিছুরই অর্থজ্ঞাপক হয়—এই আহার্যিক অভিনয়কে অনেকেই অবহেলা করেন কিন্তু একেই অভিনয়ের একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে বিনোদিনী তার চর্চা করেছেন। বিনোদিনীর বহু পরে এসেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়—বিনোদিনীর হাতে গড়া স্টার থিয়েটারেই তাঁর অভিনেতা জীবনের সুরু—চরিত্রানুগ রূপসজ্জায় তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা এবং সুনামও ছিল বহুবিদিত।

প্রথম দিককার ভাঙ্গাগড়ার কালে মঞ্চবিদ্‌রা তাঁদের সাধ্যমত কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত "সরোজিনী" নাটকে রাজপুত ললনাদের চিতারোহণের একটি দৃশ্য ছিল। এই দৃশ্যটিকে বাস্তবানুগ করার জন্য মঞ্চে টিন পেতে তার উপর কাঠ জ্বালিয়ে আগুন করা হত—মাঝে মাঝে তাতে ভেতর থেকে পিচ্‌কারী করে কেরোসিন দেওয়া হত—শিখা লক্ লক্ করে জ্বলে উঠত। তখনও আমাদের মঞ্চে বিদ্যুতা-লোক আসেনি—গ্যাসের আলোই ভরসা তাই আজকের মত সহজে অগ্নি-শিখা দেখানো সম্ভব ছিল না। এর ফলে অনেক সময় অভিনেত্রীদের বসন, ভূষণও জ্বলে উঠত।

স্টারে নল-দময়ন্তী নাটকের অভিনয়ে জহর ধর মহাশয় একটি ট্রিক্ শীন্ করেছিলেন—তাতে দেখা যেত একটি সরোবরে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে

মাঝের পদ্মটি থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন—বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি হিন্দোলিত পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন এই ভাবে একের পর এক ছ'জন কমলাবাসিনীর নাচ ও গান ছিল—এই কমলবাসিনীদের সঞ্চরণ ক্রেনের সাহায্যে করানো হত।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরমুখের মৃত্যুর পর অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ইত্যাদি কয়েকজন মিলে রঙ্গমঞ্চটি ক্রয় করেন কিন্তু ক্রমে টাকার দায়ে স্টার থিয়েটারের মালিক পক্ষ রঙ্গমঞ্চের সুনাম (Good will) ছাড়া বাড়ি এবং রঙ্গমঞ্চ দুই-ই ত্রিশ হাজার টাকায় গোপাল লাল শীলের কাছে বিক্রি করলেন।

॥ এমারেল্ড, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভা ॥

গোপাল লাল শীল রঙ্গমঞ্চের নূতন নামকরণ করলেন "এমারেল্ড থিয়েটার"। গ্রেট ন্যাশনাল দলের অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি এমারেল্ড থিয়েটারে যোগদান করেন। অমৃতলাল বসু প্রভৃতি হাতিবাগানে জায়গা কিনে স্টার থিয়েটারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালবাবু দেখলেন স্টারের মত তাঁর অভিনয় জমছে না—শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছে, সুতরাং থিয়েটারের 'শিব' গিরিশচন্দ্রকে আনবার জন্য একান্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। স্টারের তখন টাকার খুব টানাটানি, গিরিশবাবু তাই গোপাল শীলের ২০,০০০৲ টাকা অগ্রিম বোনাস ও ৩৫০৲ টাকা মাসিক পারিশ্রমিকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। ২০,০০০৲ হাজার টাকার ১৬,০০০৲ টাকা তিনি স্টারকে বিনা স্বত্বে দান করলেন। তবুও প্রশ্ন রইল গিরিশচন্দ্র গেলে স্টার নাটক পাবে কোথায়—তার সমাধানও গিরিশচন্দ্র করলেন—তিনি বেনামীতে নাটক লিখে দেবেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ স্টার দর্শক-বৃন্দকে সর্ব প্রথম অভিবাদন জানায় "নসীরাম" নাটকের অভিনয় দিয়ে। ঐ নাটক "সেবক প্রণীত" ও অমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত বলে বিজ্ঞাপিত হয়—আসলে নাটক রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। এমারেল্ডে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের "পূর্ণ চন্দ্র"। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই গোপালবাবুর সখ মিটে গেল। খেয়ালী বড়লোক, খেয়াল মিটতে থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি এমারেল্ড লীজ নিয়ে চালাতে লাগলেন। স্টার তখন স্বাবলম্বন শিখেছে 'সরলা' ও 'তাজ্জব-ব্যাপার'

প্রভৃতি নাটকের অভিনয় চলছে। অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসুকে সরিয়ে গিরিশচন্দ্র অধ্যক্ষ হলেন—এখানে গিরিশবাবুর "প্রফুল্ল" নাটকের অভিনয় হয়। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বনিবনা হচ্ছিল না। স্টার থিয়েটার থেকে নীলমাধব চক্রবর্তী কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে ভাঙ্গিযে আনেন এঁদের সঙ্গে দানীবাবু (গিরিশচন্দ্রের পুত্র), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অঘোর পাঠক ইত্যাদিরাও ছিলেন। এই নূতন দল ছোট স্টেজ—"বীণা" রঙ্গমঞ্চ নিয়ে "সিটি থিয়েটার" (City theatre) খোলেন। বীণার ক্ষুদ্রমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্থান সঙ্কুলান হল না স্টারের সঙ্গেও বনছে না গিরিশচন্দ্র অসহ্য হয়ে নূতন থিয়েটার গঠনের সংকল্প করলেন। "মিনার্ভা" সৃষ্টির এই ছিল কারণ।

বহুকাল পূর্বে গ্রেট ন্যাশনাল যেখানে খোলা হয়েছিল সেখানেই মিনার্ভার ভিত্তি স্থাপিত হল (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। সিটি থিয়েটারের দল নিয়েই মিনার্ভার প্রথম অভিনয় হয়। এখানে গিরিশবাবু "ম্যাকবেথের" বঙ্গানুবাদ "মুকুল-মুঞ্জরা" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৮৬ খ্রী: তিনি আবার স্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন, সেখানে "কালাপাহাড়", "মায়াবসান" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়,—তার পরে তিনি "ক্লাসিক থিয়েটারে" চলে যান।

॥ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এমারেল্ড রঙ্গালয় ভাড়া নিয়ে "ক্লাসিক থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ সালে "নলদময়ন্তী" ও "বেল্লিক বাজার" দিয়ে অভিনয় আরম্ভ হয়। অমরবাবু সুপ্রসিদ্ধ বংশের ছেলে ছিলেন, শৈশব কাল থেকেই গিরিশচন্দ্রের কাছে যাতায়াত করতেন। মাত্র ২০।২১ বছর বয়সে ক্লাসিকের অধ্যক্ষ হন। অমরবাবু "আলিবাবা", নাটকের অভিনয় (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) আরম্ভ করার পর থেকেই তাঁর ভাগ্যোদয় হয়।

তৎকালীন থিয়েটার পরিবেশও অমরেন্দ্রবাবুকে খুব বেশি সাহায্য করেছিল, ১। মিনার্ভা তখন হতশ্রী, ২। বেঙ্গল থিয়েটারের পূর্ব আড়ম্বর নেই, ৩। স্টার প্রবীন অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ৪। গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধ, অস্থায়ী ভাবে কখন মিনার্ভা কখন ক্লাসিকে ঘুরছেন। এই পরিবেশের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ নিয়ে

এলেন যৌবনের শক্তি এবং উদ্দীপনা। স্টারের শিষ্টাচার ভেঙে গেল, ক্লাসিক থিয়েটার সর্বশ্রেণীর লোকের প্রমোদাগারে পরিণত হল। দর্শকরা অসঙ্গত ইয়ার্কি দিয়ে, শীষ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের ধারাও পাল্টে ফেললেন—হ্যাণ্ডবিলে ছাপা হতে লাগল "হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার।" স্টার থিয়েটারের গাম্ভীর্য, মিতব্যয়িতা এবং সংযমের শৃঙ্খলা এতদিনে ভাঙল। অমরেন্দ্রনাথের সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল যে কোন প্রকারে থিয়েটার জমিয়ে তোলা। এজন্য তিনি ভাল ভাল অভিনেতাদের অনেক বর্ধিত বেতন দিয়ে নিজের থিয়েটারে টেনে আনলেন। হ্যাণ্ডবিলে ছাপা হতে লাগল—"হৈ হৈ, রৈ রৈ, ব্যাপার নাট্য জগৎ স্তম্ভিত, নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে মানব জীবন দোদুল্যমান। সারি সারি, সখীর সারি। নাচে গানে ধূলপরিমান। ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ"—ইত্যাদি, এ যেন সার্কাসের ভাষা। যে বাংলা দেশ কবি, হাফ আখড়াই, তর্জার সমঝদার ছিল তাদের রুচির সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ একাত্ম হয়ে উঠলেন।

এছাড়া মিনার্ভার গিরিশকে হেয় প্রতিপন্ন করে অমরবাবু বহু কার্টুনও বের করতে লাগলেন। অভিনয় কৌশল এবং মঞ্চ উপস্থাপনা রীতিতেও সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি আনয়ন করলেন। নীল কাপড়ের তরঙ্গ দেখিয়ে তিনি নদী সৃষ্টি করলেন। আবার সরোবর থেকে সিক্ত রোহিনীকে তুলে আনলেন। এমন কি ঘোড়ায় চেপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন।

১৮৭২ খ্রী: থেকে ১৮৯৭ খ্রী: পর্যন্ত, এই পঁচিশ বছর, বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয় যাঁদের নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরাই বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে এসেছেন। এক ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল দল ভেঙেই স্টার, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা জন্মগ্রহণ করেছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র তাদের পুরানো চাল শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। এই পুরাতনের মাঝে নবীনের মোহমন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। কোন ভাবেই যুদ্ধে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নি, অর্থকে অর্থ জ্ঞান করেন নি। সাধারণের সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনিই রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় কাগজ সর্ব প্রথম বের করেন—তাঁর এ পত্রিকাগুলির নাম ছিল "রঙ্গালয়" ও "নাট্যমন্দির"।

॥ জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন ॥

১৮৮১—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে এবং শান্তিনিকেতনে কতকগুলি নাট্যাভিনয় হয়েছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির নাট্যশালাটি কৃষ্ণকুমারী, নব-নাটক ইত্যাদির অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল পর এখানে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাতে গীতবাদ্য, আবৃত্তি এবং কখন কখন নাট্যাভিনয় চলত। রবীন্দ্রনাথ তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ১৮৮১ খ্রীঃ এই মঞ্চে দেশী ও বিদেশী সুরের সহযোগে বাল্মীকি-প্রতিভা নাটকখানির অভিনয় হয়। এই মঞ্চে কিন্তু বহু দড়ি-দড়া, গাছ-পালা দিয়ে দস্যুদের অরণ্য পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। স্ত্রী ভূমিকায় পরিবারের কুমারীরাই প্রকাশ্যে অভিনয় করেন। ১৩১৫ সালের শারদীয় অবকাশে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য নাট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন—তৈরী হল স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত "শারদোৎসব" নাটকখানি। শারদোৎসবের অভিনয়াঙ্গিকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এর পর শান্তিনিকেতনের 'রাজা' নাটকে তিনি স্বয়ং ঠাকুরদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৩২০ সালে শান্তিনিকেতন দল 'অচলায়তনের' অভিনয় করে তারপরে করে 'ফাল্গুনী'।

এই সমস্ত নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের যে আদর্শ নির্দিষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথ তা ভেঙ্গে দিয়ে নূতন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করে এক নূতনত্বের সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মঞ্চে সাজ পোষাক ও মঞ্চোপকরণ একেবারে বাদ দিতে পারেননি কিন্তু পরে যখন শান্তিনিকেতনের বালকদের নিয়ে স্বল্প অর্থে নাটক প্রযোজনা করতে হল তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে মঞ্চোপকরণ, সাজ পোষাক নিখুঁত না হলে তা ব্যবহার করতে যাওয়া অর্থহীন। বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ নাটকই নাট্যধর্মী প্রয়োগরীতিতে মঞ্চে সার্থকতা অর্জন করেছে। এই নবধারার প্রয়োগ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যিকার শিল্পীর তুলির আঁচড় পড়ল, পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বর কমে গিয়ে নিপুণতা ও সৌন্দর্য বাড়ল। যা আমরা জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি ভবনে "ডাকঘর" নাটকের প্রযোজনা কালে দেখেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে

পশ্চাৎপটে আর কোন চিত্র রইল না, তা ঘন-নীলবর্ণের হল। জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ "তপতী" নাটকের অভিনয় এভাবে করান। এটা কোন কিছুরই অস্তিত্ব জ্ঞাপক নয়—পরিবেশ কল্পনার ভার দর্শকদের উপর। এ ভার বহুকাল ধরেই দর্শকরা ভারতের যাত্রা-থিয়েটারে, চীনে, জাপানে, গ্রীসে, রোমে, শেক্সপীয়রীয় মঞ্চে কম বেশি বহন করে এসেছে। অতি আধুনিক কালের আমেরিকা যে অ্যারিণা মঞ্চ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে, তাতেও নাট্যোল্লিখিত পরিবেশ রচনা করে নিতে দর্শকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

॥ গিরিশোত্তর যুগ ॥

গিরিশ উত্তর যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চে একমাত্র অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন নূতন প্রতিভা না আসায় গিরিশচন্দ্রের যুগই আবর্তিত হয়ে চলেছিল। এ যুগের নাট্যকার ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তাঁরা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেই অতীতচারী ছিলেন। এইভাবে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক অতিক্রান্ত হল। নূতন ভাবে, নূতন আঙ্গিক ও প্রয়োগ কৌশল দেখা দিল তৃতীয় দশকে—"আর্ট থিয়েটার" ও "নাট্যমন্দিরের" প্রতিষ্ঠায়। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা নাট্যাভিনয় ধারাকে বজায় রেখেছিলেন তাঁরা হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ, মনোমোহন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাঁড়ে, মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি।

১। এই সময়ে "মিনার্ভায়" অভিনীত হয় ক্ষীরোদ প্রসাদের "কিন্নরী" (সম্ভবতঃ ১৯১৮ খ্রীঃ)। তাছাড়া "উজ্জ্বলে মধুর", "হেস্তনেস্ত", হুলুস্থুলু", "বিদায় অভিশাপ", "ক্লিওপাত্রা", "মিশরকুমারী" প্রভৃতি নাটকের ও একের পর এক অভিনয় হতে থাকে।

২। "স্টারে" অভিনীত হয়—দ্বিজেন্দ্রলালের "আনন্দ বিদায়",—ভূপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "সওদাগর", "ওথেলো", "অযোধ্যাবেগম" প্রভৃতি।

৩। "মনোমোহন" থিয়েটারে—"মোগল পাঠান" ও "দেবলাদেবী" উল্লেখযোগ্য অভিনয় ছিল বলা যায়। মিনার্ভায় তখন প্রধান নাট্যকার ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং স্টারের ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মিনার্ভার কিন্নরী ছিল একটি গীতিনাট্য; তবে সাধারণ গীতিনাট্যের সঙ্গে এর তফাৎ হল এই যে, এটি সাধারণ অপেরা নয় এর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ছিল। এতে এক বিশেষ মঞ্চকৌশল দেখানো হয়েছিল—তাতে বনের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছিল ভালুক-সদৃশ এক মানুষ, নায়ক সুধনকে আক্রমণ করছে—সহসা দর্শকরা 'দুম' করে আওয়াজ শুনল,—এর পরেই দেখা গেল মঞ্চের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাতে ভালুক বেশধারী রাজ-সিংহাসনে বসে সুধনকে সভায় আহ্বান করছে। এই দৃশ্য পরিবর্তনটি ঠিক কি মঞ্চ কৌশলে হয়েছিল নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় আবৃতকে অনাবৃত করে দেওয়ার পদ্ধতি (Cover Discover Process) গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ রাজসভার সেটটি পেছনের দিকে সজ্জিত রেখে সামনে আড়াগোড়া বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমে কাপড় আটকে তার গায়ে চিত্র অঙ্কিত করে এবং দু' একটি হালকা উপকরণ দিয়ে বনের দৃশ্য রচনা করা হয়েছিল। আলোক ছিল স্বল্প, সামনের অংশের রাজসভার সামান্য উপকরণগুলিকেও আবৃত করে অন্য রূপ দেওয়া হয়। আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির কৌশলে সম্পূর্ণ সামনের দৃশ্যটি দুই ভাগ হয়ে দু'পাশে কিংবা এক পাশেই সরে গিয়ে পেছনের দৃশ্যটি বেরিয়ে আসে। যেমন করে যবনিকা সরিয়ে দেওয়া হয় এর কৌশল অনেকটা তেমনি। এই নাটকের মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীপরেশচন্দ্র বসু বা পটলবাবু, পরবর্তীকালের স্টার থিয়েটারের মঞ্চশিল্পী শ্রীঅনিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা। পটলবাবু তৎকালীন পার্শি থিয়েটার "করিন্থিয়ান" রঙ্গমঞ্চে কাজ করতেন। করিন্থিয়ানে যে সমস্ত দর্শক-বুদ্ধির অগোচর মঞ্চকৌশল দেখানো হত বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা ছিল না—পটলবাবুই তা নিয়ে আসেন।

কিন্নরীতে আরো একটি মঞ্চকৌশল দেখানো হয়েছিল, তা হল মঞ্চের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া। মিনার্ভার সবচেয়ে বড় সম্পদ তখন ছিল "সখী" সম্পদ, এদের মত সুন্দরী সুগায়িকা সখী অন্য কোন থিয়েটারে ছিল না। আর সখীদের নৃত্য গীত ছাড়া বাংলা দেশের নাট্যাভিনয় তখন তো জমতই না। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক সখীর গান চাই নাট্যকাররাও নাটক সে দিকে নজর রেখেই লিখতেন। প্রথমে কিন্নরীতে সখীদের খুব স্বল্প বেশভূষায় নামানো হয়। কেউ কেউ আপত্তি তোলায় পুলিস এসে আইন জারি করে সখীদের সঙ্গত পোষাকের ব্যবস্থা করে। যাই হোক, কিন্নরীর তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে ছিল—নায়িকা কিন্নরী হিমালয়ের ঝরণায়

তীরে গান গাইছে—এবং গান গাইতে গাইতে কিন্নর-লোকে ভেসে ভেসে উঠে যাচ্ছে—

"উত্তর উত্তর চ'লে এস নরবর,
তুঙ্গ হিম-গিরিবর-শিরে।
উত্তর উত্তর মুনিজন মনোহর
মানস সরোবর তীরে।"

কিন্নরীর উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি সত্যিই ছিল অদ্ভুত। সম্ভবতঃ ক্রেনের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল—পশ্চাৎপটের বর্ণের সঙ্গে ক্রেনের দড়িদড়া মিশে যাওয়ায় কৌশলটা দর্শকদের চোখে পড়েনি। কিন্নরী স্টারেও অভিনীত হয়। মিনার্ভায় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের "ক্লিওপাট্রা" দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। অ্যান্টনী হন দানীবাবু এবং তারাসুন্দরী ক্লিওপাট্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯১৯ সালে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের "মিশর কুমারী" নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাদ্য ও সঙ্গীত সর্বোপরি মনোরম পারিপার্শ্বিকতায় দর্শকদের মন হরণ করে। তা ছাড়াও "মিশর কুমারীর" মধ্যে সাদাকালোর যে দ্বন্দ্ব ছিল তা তৎকালের স্বদেশী মনোভাবকে জাগরিত করে তুলেছিল। উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন শিক্ষিত ও দূরদর্শী। তিনি বুঝেছিলেন এযুগের শিক্ষিত যুবকরাই নবকালের কর্ণধার হবেন—তাই তিনি নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মিনার্ভায় আনেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবযুগকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" নাটক মঞ্চস্থ করেন। স্টারেও বশীকরণের অভিনয় হয়। মিনার্ভায় "বশীকরণে" রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—প্রথম উচ্চ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন।

এরপরে মিনার্ভায় "শকুন্তলার" মহলা চলছে ১৯২২ খ্রীঃ ১৮ই অক্টোবর বুধবার তখন হঠাৎ রঙ্গালয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথের অভিনয় দিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়েছিল। ত্রিশ বছর একটানা চলার পরে মিনার্ভা কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হল।

মনোমোহন থিয়েটারের নায়ক ছিলেন দানীবাবু। অমরেন্দ্রনাথের পরে আনন্দমোহন হালদার স্টার রঙ্গমঞ্চ লীজ নিলেন। তারপরে লেসী হন গিরি মল্লিক, সেই সময়েই অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজারী ছেড়ে স্টারে আসেন, সঙ্গে ছিলেন তারকনাথ পালিত ও তারাসুন্দরী। গিরিবাবু

স্টার ছেড়ে দিলেন তখন স্বয়ং অপরেশচন্দ্র স্টার লীজ নেন ও স্টারকে নবরূপে সাজিয়ে তোলেন। স্টারেও ১৯২১ সালে "অযোধ্যার বেগম" নাটকের অভিনয়ে পটলবাবু মনোহর দৃশ্যাঙ্কন ও মঞ্চসজ্জা করেন।

এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তিনি বহু সংখ্যক নাটক রচনা করেন তার মধ্যে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীরই রচনা ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে ছিল জনা (১৮৯৪), পাণ্ডব গৌরব (১৯০০), চৈতন্য লীলা (১৮৮৪), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৮), প্রফুল্ল (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫), সিরাজদ্দৌল্লা (১৯০৬) ইত্যাদি।

এরপরে আসেন নাট্যকার অমৃতলাল বসু। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মতই তিনিও প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘকাল রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরেরই অনুগামী, তিনি সমসাময়িক এবং নানান সামাজিক ঘটনা নিয়ে প্রহসন রচনা করে গেছেন। "হীরকচূর্ণ" ছিল তাঁর প্রথম নাটক ১৮৭৫ খ্রীঃ রচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রহসন ছিল —"চোরের উপর বাটপাড়ি" (১৮৭৬), তিল তর্পণ (১৮৮১), "চাটুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে" (১৮৮৪), বিবাহ-বিভ্রাট (১৮৮৪), বাবু (১৮৯৪), খাস দখল (১৯১২), দ্বন্দ্বে মাতনম্ ও ব্যাপিকা-বিদায় (১৯২৬) ইত্যাদি।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বেশির ভাগই পৌরাণিক, রোমান্টিক এবং অপেরা শ্রেণীর নাটক লেখেন, তাঁর এই ধরনের নাটক হল আলিবাবা (১৮৯৭), বেদৌরা (১৯০৩), কিন্নরী (১৯১৮), বরুণা (১৯০৮), এ ছাড়া লেখেন ভীষ্ম (১৯১৩), রঘুবীর (১৯০০), বাঙ্গালার মসনদ (১৯১০), আলমগীর (১৯২১) নর-নারায়ণ (১৯২৬) ইত্যাদি।

এই সময়ে বাংলাদেশে আসেন অন্যতম মঞ্চে সার্থক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রথমে তিনি বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি প্রহসন রচনা করেন। তারপরে লেখেন পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক। এরপরে যুগচেতনার সঙ্গে আসে তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকগুলি,—লেখেন প্রতাপসিংহ (১৯০৫), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার-পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসাময়িক কালেই আসেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ

তাঁর বশীকরণ, গৃহ প্রবেশ প্রভৃতি নাটক মঞ্চায়িত করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকার ছিলেন না। নাটক রচনার মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের অভিনয় করাতে গিয়ে। বলা যায় তাঁর নাটক সর্বপ্রথম জনসাধারণের সংবর্ধনা লাভ করে "বহুরূপীর" রক্তকরবী নাটকের অভিনয়ে।

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ও সতু সেন ॥

স্টারে "আর্ট থিয়েটারের" উদ্বোধন হয় "কর্ণার্জুন" নাটকের অভিনয়ের দ্বারা ১৯২৩ খ্রীঃ ৩০শে জুন। কর্ণার্জুনের ভূমিকা লিপিতে ছিলেন কর্ণ—তিনকড়িবাবু, অর্জুন—অহীন্দ্রবাবু, দ্রৌপদী—নিভাননী, নিয়তি—নীহারবালা ইত্যাদি। এই নাটকে দ্রৌপ্রদীব বস্ত্রহরণ একটি ট্রিক-সীন ছিল। পেছনে একটি তারের বাক্সে কাপড় ভাঁজ করে রাখা হত এবং দ্রৌপদীর চুল খোলা থাকত,—এতে কাপড়ের অঞ্চল টানলেই ভেতর থেকে বস্ত্র বেরিয়ে আসত তারি সাহায্যে বস্ত্রহরণ দেখানো হত। আর একটি ট্রিক-সীন্ ছিল, বৃষকেতুর মস্তক কর্তন। এই দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর "নিজেরে হারায়ে খুঁজি" গ্রন্থে—

বৃষকেতুকে বসানো হত একটি রিভলভিং চেয়ারে। চেয়ার ছিল ঘন নীল…। তার পেছনের পর্দাটি ছিল কালো। চেয়ারের উপর হাই-লাইট্ ফেলা থাকত। মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার দৃশ্যে আলো নিভিয়ে দেওয়া হত। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আসল বৃষকেতুকে পেছনে পাঠিয়ে নকল বৃষকেতুকে সামনে আনা হত। নকল বৃষকেতু ছোট খাট তার মাথাটা পেপার মাস্ দিয়ে তৈরী এই নকল মাথাসহ সে আসল বৃষকেতুর সমান। এর পরে অন্ধকারে মাথা কাটা হত ও স্টিরাপ পাম্প দিয়ে লাল রং ছিটিয়ে দেওয়া হত। পর্দা সরিয়ে পরে বৃষকেতু ও নরমাংস লোলুপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রবেশ করত।

নাট্যমন্দিরে আরম্ভ হয় 'সীতা' নাটকের অভিনয় শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিচালনায়। তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সখের নাট্যাভিনয় ছেড়ে পেশাদারী মঞ্চে তাঁর অলৌকিক অভিনয় প্রতিভা নিয়ে অবতরণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রীঃ আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী "চন্দ্রগুপ্তের" পরে করলেন "সাজাহান" নাটকের অভিনয়। সাজাহান নাটকের নাম চরিত্রে অভিনয় করলেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্রবাবু সাজাহানের

চরিত্রটিকেই নবরূপে তুলে ধরলেন, করলেন—"পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান" এবং সাজাহান পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন কিনা এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য তিনি নামুচির এবং বার্ণিয়েরের ইতিহাস বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাখলেন, কারণ "রাখালদা" অর্থাৎ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোন সময়ে আক্রমণ চালাতে পারেন। সাজাহান চরিত্রটি শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাঁর অনন্য শিল্পদক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করলেন—বাংলার নাট্য রসিকরা দেখলেন এক অপূর্ব চরিত্রায়ণ।

এরপর আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির বিলুপ্ত প্রায়; তখন সৌভাগ্যবশতঃ কলকাতার কয়েকজন নাট্যশিল্পানুরাগী সমবায় ভিত্তিতে "রঙমহল" থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। রঙমহলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন প্রভৃতি। শিশির কুমার প্রধান অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষকরূপে রঙমহলে যোগদান করেন। প্রযোজনা ও সম্পাদনার ভার নেন শ্রীসতু সেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিনয় দিয়ে ১৯৩১ খ্রীঃ ৮ই অগাস্ট রঙমহলের উদ্বোধন হয়। এই সময় কলকাতায় চারটি রঙ্গমঞ্চ ছিল—স্টার, মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন এবং রঙমহল।

এই পর্বে রঙ্গমঞ্চে শিশির কুমারের অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় সতু সেনের প্রযোজনা রীতি। সতু সেন নিউ-ইয়র্কের "ভ্যাণ্ডারবিল্ট" থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে মঞ্চ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে আসেন। শিশির কুমার যখন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ-ইয়র্কের "ব্যালটিমুর থিয়েটারে" সীতা নাটকের অভিনয় দেখান তখন সতুবাবু তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। "ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ" সতুবাবুই সর্বপ্রথম এদেশে আনয়ন করেন। রঙমহল মঞ্চে "মহানিশা" নাট্যাভিনয়ে দেশবাসী স্তম্ভিত চিত্তে এই অত্যাশ্চর্য মঞ্চ কৌশল প্রত্যক্ষ করল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সঙ্গে শ্রী সেন অপূর্ব দৃশ্যসজ্জা এবং সেট আনয়ন করেন। মহানিশায় আলোর কৌশলে এক বিদ্যুৎ চমকিত ঝড়ের আকাশ তিনি দেখান। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তিনিই আনেন "মুড্ লাইট্", সমগ্র পরিবেশটি বর্ণাঢ্য ও মধুরতর করে তোলেন। মহানিশার এই সাফল্যই রঙমহলকে স্থায়িত্ব দান করে। মহানিশার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যনিকেতন "জননী" নাটকে ওয়াগন্ স্টেজ ব্যবহার করে।

এরপরে শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হয় তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের "জীবনরঙ্গ"

নাটকের অভিনয় দ্বারা (১৯৪২ খ্রীঃ)। শ্রীরঙ্গমে "মাইকেল" অভিনীত হলে রঙমহলও "মধুসূদন" মঞ্চস্থ করে, নাম ভূমিকায় দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের বিধিদত্ত ঐশ্বর্যাবলী ছিল। তাঁর ছিল সুললিত কণ্ঠস্বর, সুকুমার বাচনভঙ্গি এবং দৃষ্টি আকর্ষণী রূপ—তদুপরি ছিল উচ্চশিক্ষা। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। থিয়েটারের বহু বিষয়েই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি এসে যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করলেন তখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ তৎকালীন শিক্ষিত পণ্ডিত এবং যুব-সম্প্রদায় তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এতকাল রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরা সমাজে ব্রাত্য বলেই পরিগণিত হত, শিশিরকুমারের আগমনে নূতন যুগ এল—রঙ্গালয় পাতিত্য থেকে রক্ষা পেল। শিশিরকুমারের সহজাত শিল্পপ্রতিভা এবং উচ্ছলিত প্রাণধর্মই তাঁকে অভিনেতা জীবনে টেনে এনেছিল। তাঁর মধ্যে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল তা ছেলে পড়ানোর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়নি, কিছু সৃষ্টি না করে তাঁর মুক্তি ছিল না সেই আবেগ নিয়েই তিনি রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন।

শিশিরকুমার নাট্যাভিনয় এবং নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে পুরাতন ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে বহু অভিনবত্বের সৃষ্টি করেন। আগের যুগে যখন দু'জন অভিনেতা অভিনয় করতেন তখন মঞ্চের উপর উপস্থিত অন্য অভিনেতাদের কিছু করবার ছিল না—তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শিশিরকুমারের "সীতা" নাটকেই প্রথম দেখা গেল যে মঞ্চে যাঁরা সংলাপ বলছেন না তাঁদের মধ্যেও ভাবাবেগের টানা-পড়েন চলছে। প্লের সঙ্গে বাই-প্লে এসে যুক্ত হয়ে দৃশ্যকে নব প্রাণে স্পন্দিত করে তুলল। বিলেতে এই রীতি প্রথম চালু করেন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে টমাস্ উইলিয়ম্ রবার্টসন্। এই রীতির ফলে নাট্যাভিনয়ে আর কৃত্রিম পরিবেশ রইল না—সেখানে বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি হল। শিশিরকুমারের কৃতিত্ব যেমন ছিল এই সংলাপের ভঙ্গি বদলে তেমনি তাঁর কৃতিত্ব ছিল নোতুন আনাড়ি শিল্পীদের সযত্নে শিক্ষা দেওয়ায়। এঁরা সকলেই ছিলেন একটি অখণ্ড পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং এই দক্ষতার সাহায্যেই তিনি অনেক নিকৃষ্টশ্রেণীর নাটককেও মঞ্চ-সফল করে তুলেছেন।

বাংলা দেশের সকল খ্যাতিমান শিল্পী সাহিত্যিকই তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। "সীতার" সঙ্গীত ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নাটকের পোষাক, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি বহু বিষয়ে বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিশিরকুমারের চরিত্রচিত্রণ কেবল যে অন্যদের চাইতে তফাত হত তাই নয়—অনেক সময় তিনি একই চরিত্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ দিয়েছেন। যেমন তাঁর চাণক্য চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গিতেও তিনি অভিনয় করেছেন—এতে তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি এবং দুঃসাহসী প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে।

শিশিরকুমার যখন নাট্যমন্দিরে "সীতা", "নর-নারায়ণ" ইত্যাদি নাটকের অন্তঃস্পর্শী অভিনয় করেন তখন আর্ট থিয়েটার "কর্ণার্জুন", "শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদির গৌরবোজ্জ্বল অভিনয় চালায়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার হন অহীন্দ্র চৌধুরী। স্টার থিয়েটারে অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তির" অভিনয় চলে। তারপরে হয় অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র"—১৯৩২ খ্রীঃ পোষ্যপুত্রের শ্যামাকান্তই ছিল দানীবাবুর শেষ অভিনয়। এই সময়ে শিশিরকুমার "নব-নাট্যমন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন। নব-নাট্যমন্দির মাত্র চার বছর টিকে ছিল। শিশিরকুমার এখানে বিরাজ বৌ, বিজয়া, রীতিমত নাটক, দশের দাবী, প্রফুল্ল, বলিদান, চন্দ্রগুপ্ত, সীতা, শেষরক্ষা ইত্যাদি নাটকের অভিনয় করেন। নাট্যমন্দির বন্ধ হওয়ার কয়েক বছর পরেই সদ্যোবিলুপ্ত "নাট্যনিকেতনের" ভাঙ্গা মঞ্চে তাঁর নটজীবনের শেষ শ্রেষ্ঠ কীর্তি "শ্রীরঙ্গম" গড়ে তোলেন। এখানে তাঁর প্রতিভা একাদিক্রমে ১৪।১৫ বছর অভিনয়ের দুর্লভ ফসল ফলিয়েছে। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ স্মরণীয় অভিনয় ছিল "আলমগীর" (১০ই ডিসেম্বর ১৯৫১)—রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের ত্রিশ বছর তখন পূর্ণ হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রীঃ ২৭শে জানুয়ারী বেদনাবিধুর চিত্তে শিশিরকুমারকে শ্রীরঙ্গম ছেড়ে আসতে হয়। আজ সেখানে "বিশ্বরূপা থিয়েটার" সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগ গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন সবকটি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গেই তিনি কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিলেন, সর্বত্রই ছিল তাঁর শিষ্য কিংবা বন্ধু গোষ্ঠী—প্রথমে তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা এবং নাট্য-পরিচালক হিসেবে দেখা দিলেও বাংলা নাটকের একান্ত অভাব থাকায় তিনি নিজেই নাটক রচনা করতে বসেন। যেমন

তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করেন তেমনি তাঁকে কেন্দ্র করে বহু নাট্য কারেরও আবির্ভাব হয়, তাঁরি বন্ধুস্থানীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও ছিলেন নট এবং নাট্যকার। এ ছাড়াও বহু নাট্যকার তখন নাটক রচনায় প্রণোদিত হন। এরপরে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে যখন একদিকে আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে শিশিরকুমার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ আলোড়ন জাগান তখনো কিন্তু তাঁরা পূর্বসূরীদের মতই ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের উপরই প্রধান ভরসা রেখেছিলেন। আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুন, সাজাহান, এবং শিশির কুমারের সীতা, চন্দ্রগুপ্ত ও আলমগীরই তার প্রমাণ। শিশিরকুমার একজন দক্ষ নটই কেবল ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত তিনি স্বয়ং নাট্য রচনা করেন নি, এমন কি তাঁকে ঘিরে নবচিন্তা ধারার প্রবক্তা কোন নাট্যকার গোষ্ঠীও গড়ে ওঠেনি। আমাদের এটাই মনে হয় তিনি নিজে নাটক না লিখলেও যদি লেখনী ধরে নাট্য পরিচালনা, অভিনয় শৈলী, কিংবা তাঁর অভিনীত প্রখ্যাত নাটকগুলির পরিচালকের স্ক্রিপ্ট (Directorial Script) ইত্যাদি কিছু রচনা করে রেখে যেতেন তবে উত্তর কালের লোকেরা যারা তাঁর অলৌকিক অভিনয় দক্ষতা প্রত্যক্ষ করতে পারল না তারা তাঁর প্রতিভার প্রত্যক্ষ আলোকে তাঁকে ভালভাবে দেখতে পেত।

বর্তমান কালে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় রয়েছে, স্টার, রঙমহল, মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, প্রতাপ মেমোরিয়াল, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ, রামমোহন মঞ্চ, নেতাজী মঞ্চ ইত্যাদি। রঙ্গনা, মুক্তাঙ্গন থিয়েটার, রবীন্দ্রসদন, অবনমহল, কলামন্দির, আকাদেমির মঞ্চ—এগুলোকেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্তর্ভুক্তই বলা যায় কারণ এই সমস্ত রঙ্গালয়ে সর্বদাই টিকিট বিক্রি করে কিছু না কিছু নাটকের অভিনয় দেখানো হয়।

শ্রীরঙ্গমের ধ্বংসাবশেষের উপর "আরোগ্য নিকেতনের" অভিনয়ের দ্বারাই "বিশ্বরূপা" বাংলা নাট্যজগতে প্রবেশ লাভ করে।

বিশ্বরূপা তারপরে করে 'ক্ষুধা' ও 'সেতু' নাটকের অভিনয়। 'সেতু' নাটকে তাপস সেনের আলোক সম্পাত দর্শকদের আর একবার বিস্ময়চকিত করে তোলে। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশের সামগ্রিক ভাবে নাট্য উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাতে আছে

১। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা, ২। সৌখিন দলকে মঞ্চ ভাড়া দেওয়া, এবং ৩। গিরিশ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বরূপাও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছে এক নব মঞ্চ-আঙ্গিক। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার মহাশয় তাকে "থিয়েটার স্কোপ" বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে যেখানে সবরকম থিয়েটার আঙ্গিক এমন কি পশ্চাৎপটে সিনেমার দৃশ্যও প্রতিফলিত করে দেখানো চলে। এখানে তিনি এপিক্ থিয়েটারের মত সবকিছুর মিশ্রণ ঘটানোর পক্ষপাতী অবশ্য যদি রূপায়ণ সার্থক হয়।

শ্রীযুক্ত সতু সেন বাংলা দেশে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেল। গ্যাস আলোকের পর, তখনও কলকাতা শহরে বিদ্যুতালোক আসেনি, গোপাল লাল শীল ব্যক্তিগত খরচে ডায়নামো বসিয়ে প্রথম রঙ্গমঞ্চে বিদ্যুতালোক এনেছিলেন। তারপরে শহরে বিদ্যুৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম স্টার তার সুযোগ গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে স্টার এবং পরে নাট্যনিকেতন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে উন্নত ধরনের প্রয়োগ-কৌশল এবং অভিনয় রীতি আনয়ন করে তা বাংলাদেশের থিয়েটার শিল্পকে এক শ্রেষ্ঠ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। শিল্পীরা এ যুগে বেশির ভাগই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং কিছু কিছু অপেরা জাতীয় নাটকের অভিনয় করে এসেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে পরিবেশ, চরিত্রায়ণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে তাঁরা যথাসম্ভব ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও তাঁরা সর্বদাই যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব দৃশ্যমায়া রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন আমরা একালের আর্ট থিয়েটারের প্রয়োগ কৌশলের কথা শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের রচনায় পেয়েছি—কেমন করে বৃষকেতুর মস্তক কর্তন হল, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কিংবা সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করতে ঘূর্ণিত চক্রের মঞ্চে প্রবেশ ঘটল, আবার শিশিরকুমারের "সীতা" নাটকে পেয়েছি সীতার পাতাল প্রবেশের মঞ্চকৌশল ইত্যাদি। এই সমস্ত ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক কাহিনীর যুক্তিসঙ্গত সত্য পরিবেশ রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রয়োগ কৌশলে "রিয়ালিজম্" বা বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা। বাস্তবানুগ রূপায়ণ প্রচেষ্টাকেই শ্রীযুক্ত সতু সেনের নূতন মঞ্চকৌশল ও আলোক-কৌশল আরো অনেকটা এগিয়ে নিয়ে

এল। এতদিন একই মঞ্চে যবনিকা পাতের পরে প্রয়োজন মত দৃশ্য বা সেটের পরিবর্তন হচ্ছিল সত্য—কিন্তু নাটকের কাহিনী এগিয়ে চলেছিল সব সময়েই ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে সম্মুখ দিকে। বিগত ঘটনার সূত্র চরিত্রগুলিকে সংলাপের মধ্য দিয়েই গ্রথিত করতে হয়েছে, একই সঙ্গে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে আনয়ন করে একই বিন্দুতে অর্থাৎ একই প্রতিপাদ্যে যুক্ত করা যায় নি। যেমন গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকে কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটকে, ধনে, মানে, ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত চরিত্রটির ধীরে ধীরে "পতন" দেখানো হয়েছে—এখানে ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করে এগিয়েছে—একের পরে দুই, তিন, চার ইত্যাদি। ঘটনা কখন একের পরে তিন,—তিনের পরে পাঁচ, মাঝে চার আবার একে—ফিরে আসেনি। নাটকে যেমন ভাবে ঘটনা বিবৃত রয়েছে মঞ্চে তারই যথাসম্ভব বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই—প্রথমেই যে নাট্যরচনার কৌশল পরিবর্তিত হল তা নয়, তবে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের নবতর প্রয়োগ কৌশল নাটকের নূতনতম আঙ্গিকের পথ উন্মুক্ত করে দিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আপন অক্ষদণ্ডের উপরে বিদ্যুৎশক্তিতে ধীরে ধীরে আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তন প্রয়োজন মত দক্ষিণে কিংবা বামে ঘটানো যায়। একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চে সাধারণতঃ তিনটি সেট রচনা করা চলে। সুতরাং মঞ্চ ঘুরিয়ে অতীতে আমরা যে ঘটনা এবং স্থানকে রেখে এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়া যায়। এর জন্য যবনিকা পতন, সেট পরিবর্তন ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না, আলোক স্বল্প করে দিলে অভিনেতা তাঁর বর্তমান স্থান কাল পরিত্যাগ করে মঞ্চ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে কিংবা অতীতের দিকে পিছিয়ে যেতে পারেন। ফলে এতদিন উপন্যাসের মধ্যে যে সুযোগ ছিল কিন্তু নাটকে ছিল না, তাই আংশিক ভাবে মঞ্চে এসে গেল অর্থাৎ বিভিন্ন স্থান, কাল, ঘটনাকে টেনে এনে একই ঘটনায় কেন্দ্রান্বিত করা সম্ভব হল। এই সুযোগ চলচ্চিত্রের ছিল এখন তা মঞ্চের হল, তবুও স্মরণ রাখতে হবে আংশিকভাবে হল। মঞ্চের এই গতিশীলতা, এই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানকে কেন্দ্রীভূত করার ত্রিকালদর্শিতা নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মোচিত করে দিল। মঞ্চে অঙ্ক-যবনিকা থাকলেও আর *দৃশ্য*-যবনিকার প্রয়োজন রইল না মঞ্চ ঘূর্ণিত হয়েই *দৃশ্যান্তর* ঘটছে।

সেট পরিবর্তনের জন্য যবনিকা পতনের প্রয়োজন হল না ফলে দর্শকদেরও আর নূতন দৃশ্যের জন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। ঘটনার এই অব্যাহত প্রগতি নাটককে আরও বাস্তবানুগ করে তুলল। পর পর তিনটি সেট একক্ষেত্রে একই সঙ্গে সজ্জিত করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ফলে যখন এক সেটে অভিনয় চলছে, তখন নেপথ্যের অংশে "শিফ্টাররা" পরবর্তী দৃশ্য সজ্জিত করে ফেলতে পারেন। এতে নাটকের গতিবেগ কোথাও বাধা পায় না এবং দর্শকদের মধ্যে যে নাট্যমায়ার সৃষ্টি হয় রস নিষ্পত্তির মূল কারণ হিসেবে যে ভাবাবেগের জাগরণ হয়, বারবার যবনিকা পতন, আলো জলে ওঠা, অপেক্ষা করে থাকা, সাংসারিক কথাবার্তা বলা ইত্যাদির জন্য তাও ব্যাহত হয় না। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আসার ফলে ছোট কিংবা বড় সকল প্রকার দৃশ্যই বিনা বাধায় দেখানো চলত, ফলে নাট্যকাররাও নির্ভয়ে তাঁদের নাটকে ছোট ছোট দৃশ্য, আনতে লাগলেন।

দ্বিতীয়তঃ সতুবাবু মঞ্চে "মুড্ লাইট্" এনেছিলেন। বক্স-সেটের মধ্যে মঞ্চের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ আলোছায়ায় অঙ্কিত না করে ত্রি-মাত্রিক বস্তুর আকারে রাখা হত—অভিনেতা স্বয়ং ত্রি-মাত্রিক তার সঙ্গে এগুলি খাপ খেয়ে বাস্তব পরিবেশ রচনা করত। কিন্তু আলোক সম্পাত যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী না হয় তবে বস্তু এবং ব্যক্তির ত্রি-মাত্রাকেও বিনষ্ট করে দিতে পারে। শ্রীযুক্ত সেন তাঁর আলোক সম্পাতে বস্তুর এই ত্রি-মাত্রিক আকার যেমন রক্ষা করে চললেন, তেমনি করলেন মনস্তত্ত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টি। আলোকের সাহায্যে প্রভাত, সন্ধ্যা, ঝড়ের রাত্রি, এমন কি সাইক্লোরামায় ছায়া সম্পাত করে অরণ্য পরিবেশ রচনা করে তুললেন ফলে যেমন উদ্দীপন-বিভাবের সৃষ্টি হল,—তেমনি আবার চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেও আলোক কথা বলতে লাগল। চরিত্রের উপরে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাব ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন আলোকের সাহায্যে চরিত্রের মর্মও উদ্ঘাটিত করা যায়। মঞ্চোপকরণগুলির বর্ণ, অভিনেতাদের মেক্-আপ ও পোষাক-পরিচ্ছদের রং, তাঁদের দেহরেখা এ সব কিছু হিসেব করেই আলোক নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। আলোর মায়ায়. বেড়ালটাও রাজকন্যা হয়ে যায়। এই নূতন ধরনের আলোক সম্পাত আর একটি নূতনত্বেরও আনয়ন করল, তা হল বিশেষ করে অভিনেতার মুখের উপরে তীব্রতর আলোক নিক্ষেপ করা। এও একটি যুগান্তকারী উপকরণ। সিনেমায় "ক্লোজ্-আপের"

সাহায্যে যেমন ঘটনার সংঘাতে বিশেষ চরিত্রের মানসিক ভাবাভিব্যক্তিটি তুলে ধরা যায়, মঞ্চে কেবল মুখের উপরে বিশেষ আলোক-পাত অভিনেতার কাছে সেই সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যক্তির সুযোগ এনে দিল। ফলে নাট্যরচনার রীতি প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসে গেল। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে, কিংবা অন্যান্য তৎকালীন পৌরাণিক নাটকগুলিতে—যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি, অথবা বড় বড় কাব্যময় বর্ণনার প্রয়োগ চলছিল,—নবনাট্যরীতি এ সকলই পরিত্যাগ করল। শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় ইত্যাদিরা নাটক রচনা করতে লাগলেন, কাটা কাটা ভাঙ্গা গদ্যে, যার মধ্যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রইল বেশি, আবেগময়তা এবং উচ্ছ্বাসের আতিশয্য কম। ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের ঘটনার উদ্দীপনা ও সংঘাত চলে গেছে এসেছে বক্স সেটের ড্রয়িং-রুমে বসে আলাপ-আলোচনা। কথার সংঘাতই চরিত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে এবং নূতন কথাকে নিয়ে আসছে। নূতন মঞ্চে এবং নবপদ্ধতির আলোকে গদ্যময় দৈনন্দিন জীবনের নাট্যাভিনয় সার্থক ভাবেই রূপায়িত হওয়ার সুযোগ পেল।

এ যুগের চেতনায় নাট্যকারদের সামনে প্রধান হয়ে এসেছে আজকের জীবন সমস্যা ও তাতে জর্জরিত বর্তমান কালের মানুষ। এর আগে যে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল, যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা ছিল, আজ আর তা নেই,—আজ ব্যক্তি মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নূতন সমস্যা, নূতন সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক চেতনা, এযুগের নাট্যকাররা তাকেই রূপায়িত করতে লেখনী ধরলেন, তাঁদের এই নব নব বিষয় ও উপস্থাপনার পথ ধরেই এল নবনাট্য আঙ্গিক। এঁরা কিন্তু সংখ্যায় আগেকার মত আর মুষ্টিমেয় নয়, বহুতর। একক প্রতিভার কাল শেষ হয়ে গেছে—নব চেতনা নিয়ে আসছে নিত্য নূতন লেখনী।

এযুগের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও তাঁদের নাটক হল—

প্রমথ নাথ বিশী:—ঋণং কৃত্বা (১৯৩৫), ঘৃতং পিবেৎ (১৯৩৬), মৌচাকে ঢিল (১৯৩৮), পরিহাস বিজল্পিতম (১৯৪০), ডিনামাইট (১৯৪২)।

শচীন সেনগুপ্ত:—ঝড়ের রাতে (১৯৩১), গৈরিক পতাকা (১৯৩০), স্বামী-স্ত্রী (১৯৩৮), সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮), জননী (১৯৩৩), দশের দাবী (১৯৩৪), তটিনীর বিচার (১৯৩১)।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য:—ব্রতচারিণী (১৯৩৫), চক্রব্যূহ (১৯৩৪)।

মন্মথ রায় :—মুক্তির ডাক (১৯২৩), কারাগার (১৯৩০), খনা (১৯৩৫), সতী (১৯৩৭), রূপকথা (১৯৩৯), মরা হাতী লাখটাকা (১৯৫৭)।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী :—মহানিশা (১৯৩৩), পথের সাথী (১৯৩৫), নন্দরাণীর সংসার (১৯৩৬), পরিণীতা (১৯৪০)।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা :—বীর্যশুল্কা (১৯৩৫), সর্বহারা, বভ্রুবাহন (১৯৩৬) বিষ্ণুমায়া, বাংলার বোমা (১৯৩৮), জননী জন্মভূমি (১৯৩৯), রণদাপ্রসাদ (১৯৪০), কালীয় দমন, সুবল মিলন, কলঙ্কভঞ্জন, রাই রাজা (১৯৪৮)।

বিজন ভট্টাচার্য :—নবান্ন (১৯৪৪), জীয়নকন্যা (১৯৪৮)।

বিধায়ক ভট্টাচার্য :—বিশ বছর আগে (১৯৪০), রত্নদীপ (১৯৪১), তুমি আর আমি, চিরন্তনী (১৯৪২), কা তব কান্তা (১৯৫৩), মাটির ঘর, ঝান্সীর রাণী (১৯৫৪), ক্ষুধা (১৯৫৭)।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় :—অন্নপূর্ণা (১৯৪০)।

তুলসী লাহিড়ী :—পথিক (১৯৪৮), ছেঁড়া তার (১৯৫৩) ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই নাট্যকারদের এবং অন্যান্য বহু নাট্যকারের বহু নাটক রচিত হয়েছে।

ইতিহাসের মতই শিল্পও কোথাও থেমে থাকে না। আমরা ইউরোপে দেখেছি নাটকে এবং মঞ্চে বহু প্রকার মতবাদ এবং রীতিপদ্ধতির আনাগোনা চলেছে—বাংলাদেশেও পেশাদার এবং অপেশাদার মঞ্চ সেই রকম যুগের দাবী মিটিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে যেমন বহু সুবিধা ছিল তেমনি কয়েকটি অসুবিধাও ছিল। প্রথমতঃ ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ একমাত্র স্থায়ী পেশাদার গোষ্ঠী ছাড়া অন্যদের পক্ষে পাওয়া সহজ নয়। এই মঞ্চ তৈরী করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন সে ভার একমাত্র পেশাদার গোষ্ঠীই বহন করতে পারে। কিন্তু পেশাদাররা আবার সৌখিনদের মত নাটকের বিভিন্ন রীতি প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে সহজে এগোতে চান না। অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই তাঁরা ব্যবসায়ের দিকটা প্রথম বিবেচনা করেন। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের আর একটি অসুবিধা হল যে, বিরাট এলাকা জুড়ে রঙ্গমঞ্চ এবং নেপথ্য না রাখলে এই পদ্ধতি সার্থক হয়ে ওঠে না। যথেষ্ট স্থান নিয়ে মঞ্চ করলেও, তিনটি সেট বসাতে হলে মঞ্চবৃত্তকে মাঝখান দিয়ে কেটে তিন ভাগ করতে হয় ফলে বৃত্তের পরিধি বৃহৎ থাকায় প্রোসীনিয়ামের অংশে কোন অসুবিধা হয় না কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্রের অংশে এসে মঞ্চের গভীরতা

কমে যায়। সব নাটকই যে বাস্তবানুগ সামাজিক নাটক হবে এমন কোন কথা নেই, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের জন্য বিপুলাকার সেট রচনা করাও প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে স্বল্প গভীরতা থাকায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ ছাড়া ছিল তৃতীয় এক বাধা—ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নাটকে যতই গতিবেগ আনুক না কেন তা বর্তমান কালে চলচ্চিত্রের গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই পারে না। তাই চলচ্চিত্র যে বাস্তব পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ-প্রচেষ্টার পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না। আমরা বরাবরই দেখেছি বাস্তবরীতির দিকে এগোতে এগোতে যখনি আমাদের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে তখনি আমরা আবার নাট্যধর্মিতার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। বাংলাদেশের অতি-আধুনিক থিয়েটারে—কি মঞ্চে কি নাট্যরচনা রীতিতে তাই আমরা ধীরে ধীরে দেখি নাট্যধর্মিতার আবির্ভাব।

মঞ্চে দেখা দিল বিভিন্ন স্তর বিভাগ, এর সাহায্যে একই সঙ্গে একই মঞ্চে অতি ক্ষিপ্রগতিতে ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলল। যে যুগপদ্দৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ আমরা ইউরোপে মধ্যযুগে বা শেক্‌সপীয়রের কালে পার হয়ে এসেছি আধুনিক যুগে বক্স-সেটের পাশাপাশিই মঞ্চের এই বিভিন্ন স্তর বিভাগ ভিন্নরূপে আবার এসে দেখা দিয়েছে। স্তর বিভাগ অর্থাৎ একই মঞ্চে একই সময়ে একাধিক সেট উপস্থিত করা। যেমন মঞ্চের এক পাশে একটি সিঁড়ি রেখে দোতলা এবং তার বারান্দা দেখিয়ে দেওয়া যায়, তার পরেই দ্বিতীয় স্তর দেখানো যায় মঞ্চের পেছনের অংশটা হয়তো সেটা সম্মুখ অংশ থেকে এক ফুট উঁচু, অতএব সামনের অংশটা হয়ে যায় তৃতীয় স্তর। এই ধরনের স্তর বিভাগ অভিনেতাদের অভিনয় কার্যেরও এক বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ আলাদা আলাদা স্তর থাকায় নূতন ধরনের "কম্পোজিশন" এবং "অ্যাক্‌শন" মঞ্চে নিয়ে আসা সহজ। এই যুগপদ্দৃষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনার এক প্রধান সহায় হল আলোক। আলোকই এখানে যবনিকার কাজ করছে। অর্থাৎ যখন যেখানে নাটকের অংশ অভিনীত হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানেই আলোক সম্পাতের ফলে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে এবং মনোযোগ থেকে অন্য অংশগুলি মুছে যাচ্ছে। মঞ্চের এই সমস্ত কলা-কৌশলগুলিই নূতন আঙ্গিকে নাট্যরচনায় নাট্যকারদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। যেমন অতি-আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম প্রমথনাথ বিশীর "পরিহাস বিজল্পিতম্"।

নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় যে, এক ধনীর কন্যার জন্মতিথিতে "নাটকের পার্টির" নাটক করতে আসার কথা ছিল কিন্তু তারা এল না, এই সঙ্কট জনক পরিস্থিতিতে নায়িকার প্রণয়ী এক বিচিত্র নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অর্থাৎ সম্পাদক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, আধুনিকা, রাজনৈতিক, ফিল্ম ডিরেকটর ইত্যাদিকে সে মঞ্চে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসাল, তারা তখন রাষ্ট্রভাষা, সাহিত্য, স্বদেশ-সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ইত্যাদি বর্তমান বিষয়গুলি নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু করল। নেপথ্যে ক্রিটিক, মেয়র, প্রকাশক, রিপোর্টার এরা দর্শক হিসেবে বসে রইল। এরা সামনের ঘটনাকে সত্যকার নাট্যাভিনয় ভেবেই দেখছিল। এখানে আমরা দেখি স্বয়ং নাট্যকারই মঞ্চের উপরে অভিনেতা ও দর্শকদের দু'টি স্তর বিভাগের উল্লেখ করছেন। পরিচালক বা প্রযোজকরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বা মঞ্চে-স্তরবিভাগ—যে কোন নাটকের জন্যই যেমন সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, তেমনি আবার এই পদ্ধতিগুলির সুযোগ নিয়ে নাট্যকাররাও নাটকের আঙ্গিক পাল্টে ফেললেন।

স্তর বিভাগ ছাড়াও যুগপদ্দৃষ্ট সেট দেখানো যায় যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গৃহপ্রবেশ" নাট্যাভিনয় কালে স্টার থিয়েটার মঞ্চে একই সময়ে পাশাপাশি দু'টি কক্ষ দেখানো হয়েছিল। গৃহপ্রবেশই ছিল রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়। আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠী এই নাট্যাভিনয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছিলেন। মঞ্চে একই সঙ্গে পাশাপাশি দু'টি কক্ষের একটি ছিল যতীনের শয়নকক্ষ অন্যটি তার পাশে বসবার ঘর।

॥ নবনাট্য আন্দোলন ও আধুনিক যুগ ॥

বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগ কেটেছে নবজাগরিত শিক্ষিত অভিজাত বাঙ্গালীদের সৌখিন নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা এলেন—বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নাট্যাভিনয় আর সৌখিন প্রচেষ্টা মাত্র রইল না তা হল পেশাদারী, ফলে নানান ব্যবসায়িক স্বার্থ দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। গিরিশচন্দ্র থেকে পরবর্তী যে সমস্ত প্রখ্যাত নাট্যকাররা এলেন তাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত থাকায় কিছুটা রক্ষণশীল হয়েই রইলেন। নাট্য প্রযোজক এবং রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরা নোতুন বিষয়ের দিকে হাত বাড়ানোর ঝুঁকি সহসা

নিতে চাইতেন না। তাই আমরা আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠীকে বা শিশির বাবুকেও দেখেছি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের উপরই বেশি নির্ভর করতে। আজো আমরা দেখি পেশাদারী মঞ্চ বক্স-অফিসের কথাই ভাবে। কোন তত্ত্ব বা আদর্শবাদ নয় লাভালাভই তাদের প্রধান কথা। যে সাধারণ রঙ্গালয়ের "নীল-দর্পণ" দিয়ে যাত্রারম্ভ হয়েছিল সে আত্মবিস্মৃত হয়ে কোন পরিবর্তনে আর উৎসাহী রইল না। নূতন জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটকের সে পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল না। ইতিমধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ইব্‌সেন, গোর্কি, ওয়েদেকাঁদ্‌, স্ট্রিণ্ডবার্গ, মাতেরলাঁক, বার্ণার্ড শ', ও'নীল অনেকেই এসে গেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু আদিবাসীদের জীবনযাত্রা থেকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জগৎ সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আঁতোয়ান্‌, ব্রাহ্‌ম্‌, গ্রেইন্‌, স্তানিস্লাভ্‌স্কি, রাইনহার্ট থেকে ব্রেখ্‌ট্‌ পর্যন্ত বহু পরিচালক, প্রযোজকের দলই পরীক্ষা নিরীক্ষার বিদ্যুচ্চমক দেখিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বাঁধাধরা পথের প্রাচীর ভাঙতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দীর্ঘকাল ধরে আর কেউ এগিয়ে আসেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা দেশের ভাগ্যাকাশে ঘন ঘন পট পরিবর্তন চলতে লাগল। এল '৪২শের আন্দোলন, এল দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ। যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে গভীর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল তাকেই অবলম্বন করে নবনাট্য আন্দোলন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের শাসন ও শৃঙ্খল ভেঙে আধুনিকতম জীবনের সমাজ-চেতনা নিয়ে নাট্য রচনা আরম্ভ করল। নবনাট্য আন্দোলনের কর্মীরা মূলতঃ ছিলেন মার্ক্‌সীয় দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু সকলেই যে মার্ক্‌সবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্য রচনা করেছেন তা নয়—যুগপ্রভাবে এবং মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও অনেকে লেখনী ধরেছেন।

এদেশে নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা ছিল "ভারতীয় গণনাট্য সংঘ"—১৯৪৪ সালে এর শিল্পীরা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটক উপস্থাপন করেন। এতে মন্বন্তরের পটভূমিকায় এক গ্রাম্য কৃষক পরিবারের দুঃখ-বেদনা ও সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। বলা যায়, "নীল দর্পণের" পর বাংলার নিরন্ন কৃষক জীবনের স্বপ্ন ও বেদনার এমন একখানি চিত্র বিরল। এ নাটকের বক্তব্য যেমন ছিল নূতন, বাস্তব এবং নির্ভীক, তেমনি অপেশাদারী নটনটীদের প্রাণের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল ছিল এর অভিনয় ও প্রযোজনা। বক্তব্যের নূতনত্বের

সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঁদের প্রয়োগ পদ্ধতিও হল নূতন। দরিদ্র কৃষকের জীবন তুলে ধরবার জন্য বিচিত্র দৃশ্যপট, উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোষাক, সাজসজ্জা বা আলোক সম্পাত কোন কিছুরই প্রয়োজন রইল না। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁরা মঞ্চ-আঙ্গিকে কোথাও বা "সিলেক্‌টিভ্‌ রিয়ালিজম্‌" কোথাও বা প্রতীকধর্মিতা গ্রহণ করলেন। পশ্চাৎপটে এল কালো পর্দা কিংবা খড়ের চাল বা চটের আবরণ বা একটি গাছের ডাল। বক্তব্যের বলিষ্ঠতা এবং কর্মীদের আন্তরিকতা উপকরণের সকল দৈন্য ঘুচিয়ে দিল। আজকের বাংলা রঙ্গমঞ্চের বহু প্রথিতযশা নট-নটী এবং কর্মীকেই আমরা এই "নবান্ন" মঞ্চে সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছি—যেমন ছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র (ভাদুড়ী), গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, সুধী প্রধান, ইত্যাদি।

"নবান্ন" থেকে নবনাট্য আন্দোলনের যে ধারা উন্মুক্ত হল তা আজো রুদ্ধ হয়নি। গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে এবং নূতন শাখা স্থাপিত করে ফলে স্থানীয় প্রতিভা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। কেবল নাটকেই নয় সঙ্গীতে এবং নৃত্যে—বহু বিচিত্র পথেই তারা সমকালীন সমস্যার শিল্পরূপ দিতে থাকে।

আমরা আমেরিকায় যে "পেণ্ট্‌-হাউজ্‌" বা "অ্যারিণা" রঙ্গমঞ্চ অতি-আধুনিক নাট্যপরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি তারি অনুরূপ গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করল আমাদের প্রাচীন যাত্রার পদ্ধতিকে তার "রাহুমুক্ত" পালা গানের অভিনয়ে। আমাদের প্রাচীন যাত্রার মঞ্চ এবং অভিনয় রীতি আজকের আমেরিকার অ্যারিণা পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পথ ধরেই আজকের যাত্রা-মঞ্চে আমরা হিটলার, লেনিন বা মাও-ৎসে-তুংএর মত যাত্রা-নাটকের অভিনয় দেখতে পাচ্ছি। এতে উপস্থাপনার খরচ অনেক কম এবং গ্রাম-বাংলার মেহনতী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সহজ।

বর্তমানকালের নাট্য আন্দোলনে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি আমরা সৌখিন এবং অর্ধ-ব্যবসায়ী বহু নাট্যগোষ্ঠীকে দেখতে পাই। তাঁরা বহু নাটক রচনা ও অনুবাদ করছেন এবং বহু মঞ্চপদ্ধতিতেই তার সার্থক ও ব্যর্থ রূপায়ণ করছেন।

এসেছে অতি-আধুনিক প্রকৃতির নাটক, বলা যায় এ নাটকে একই সঙ্গে মিশেছে অভিব্যক্তিবাদ, ইঙ্গিতধর্মিতা ও প্রতীকধর্মিতা এবং চরিত্র ও

উপস্থাপনা পদ্ধতির স্টাইলাইজেশন্। এই পদ্ধতির নাটক নূতন ধরনের মঞ্চ সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতির সহায়তায় মঞ্চ বাস্তববাদের দিকে এগিয়ে চলেছিল, চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার অগ্রগমনের রেখা সীমিত হয়ে গেল। একই সঙ্গে একই বিন্দুতে সে ঘরের ঘটনা, রাস্তার ঘটনা, অফিসের ঘটনা চলচ্চিত্রের মত কেন্দ্রীভূত করতে পারল না। আবার একই ব্যক্তির বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য বিশ্বাসযোগ্য ভাবে একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করতে পারছে না। তখনি প্রয়োজন হল সর্বৈব নাট্যধর্মী প্রথার। যখন একই কুশীলব অর্থাৎ নটনটী এক নাটকে যার মা সাজছে অন্য নাটকে তার স্ত্রী সাজলে দর্শকরা আপত্তি করছেন না তখন একই নাটকে একই ব্যক্তির মা এবং স্ত্রী হওয়া যাবে না কেন? ধরে নেওয়া নিয়ে কথা—এখন স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে, পরে আমি এরি মা হয়েছি বলে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেই চলে। তবে এ ধারার অভিনয়ে কিন্তু পরিচালক এবং অভিনেতার অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বহু চরিত্রের ভিড়ে রূপসজ্জা না পাল্টানোয়—চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় এবং বক্তব্য দর্শকরা গুলিয়ে ফেলতে পারেন। এতে তাঁরা স্বভাবতঃই বিবক্ত হয়ে ওঠেন।

বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর "খেলাঘর" নাটকখানি রচনা করেছেন এক ধরনের সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে। যবনিকা উত্তোলনের পর নাট্যকার সেখানে পরম অপরাধীর মত প্রবেশ করে জানালেন যে নাটকখানি লেখা হয়নি। দর্শকরা চিৎকার সুরু করল, নাট্যকার তখন বললেন সব পণ্ড করবেন না, আসুন আমরা এখনি আমাদের "খেলাঘর"টি রচনা করি। অর্থাৎ নাট্যাভিনয় তো সত্য নয়—"খেলা"। নাট্যকার তখন অভিনেতা অভিনেত্রীদের একে একে ডাকলেন—একটা নাটক তৈরী করতে হবে, তোমরা আমাকে সাহায্য কর। ধীরাজ, তুমি মনে কর একটা খবরের কাগজের সাব-এডিটর রাত্রি জেগে কাজ কর। একটু আধটু নাটকটাটকও লেখ। এর পরেরটা তুমি তৈরী করগে, যাও। তোমার নায়কের নাম ধর গোকুল। তুমি রমা। তুমি যাও, ওই ধীরাজ অর্থাৎ গোকুলের স্ত্রী হওগে, যাও। শান্ত মেয়ে, ভালবাসতে জানো, কাঁদতে জানো—কিন্তু প্রতিবাদ করতে জানো না। নরেশদা! তুমি মনে কর একজন সমাজকর্মী, যে বস্তিতে ওই ধীরাজ থাকে, সেখানকার লোকদের সুখ দুঃখের খবর তুমি রাখ; যাও।"

এইভাবে নাট্যকার প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় জানিয়ে তাদের ভূমিকা বণ্টন করে দিয়ে বললেন,—"এবার আমি যাই। ওরা গল্প তৈরী করুক, আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দেখিগে। যদি কোথাও গোলমাল দেখি—অর্থাৎ গল্পটি ওরা নষ্ট করবার উপক্রম করে—তবেই আমি এসে ঠিক করে দিয়ে যাব নইলে নয়।" এরপরে নাটকের যেখানে যেখানে গোলমাল ঘটেছিল নাট্যকার এসে তা ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন।

তেমনি এক অভিনব আঙ্গিকে আমরা অভিনয় হতে দেখেছি—মুক্তাঙ্গন মঞ্চে "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটকের। এখানে গুটি কয়েক মাত্র নট-নটী আপন আপন পরিচয় দিয়ে একাধিক চরিত্রের অভিনয় করে যাচ্ছে। তারজন্য তাদের অঙ্গসজ্জা, রূপসজ্জা কোনটাই পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে না। নাটকের মধ্যে এর পূর্বপর্যন্তও আমরা নাট্যকারের উপস্থিতি পাই নি। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের উপস্থিতি ছিল—কিন্তু নাটকে নাট্যকারের সকল বক্তব্যই চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে, এই নব আঙ্গিকে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত নাট্যকার স্বয়ংই এক চরিত্রে হয়ে মঞ্চে আসছেন—এবং একই অভিনেতা কখন ছাত্র হচ্ছে, কখন শিক্ষক হচ্ছে, কখন বড়বাবু হচ্ছে কখম বেয়ারা হচ্ছে। চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পোষাকে নয় সে তার আচরণে ও প্যান্টোমাইমে ফুটিয়ে তুলছে। চরিত্রগুলি এক একটি টাইপ্ চবিত্র অর্থাৎ চরিত্রের নির্যাস হয়ে উঠছে। এখানেই হচ্ছে চরিত্রের 'স্টাইলাইজেশন্'। এই নব পদ্ধতির নাটক মঞ্চ-পদ্ধতিরও নবরূপায়ণ ঘটাচ্ছে। মঞ্চ পরিকল্পনা এবং আলোক সম্পাতও হয়ে উঠছে নাট্যধর্মী। কোথাও এসে যাচ্ছে প্রতীকধর্মিতা কোথাও এসে যাচ্ছে "সিলেক্‌টিভ্ রিয়ালিজম্"—অর্থাৎ একটি গার্ডের আলো দেখিয়ে পুরো রেল স্টেশনটাই বোঝানো হচ্ছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস্তববাদের পরে যে সমস্ত মতবাদের আগমন নির্গমন চলেছে আমাদের বাংলাদেশের রঙ্গ-মঞ্চ—বিশেষ করে অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চ তারি সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার নিজস্ব ধারা ও ঐতিহ্য অনুযায়ীই নবনব আঙ্গিকের প্রবর্তন ঘটাচ্ছে। আর এরই সহযোগী হয়ে এগিয়ে চলেছেন বাংলা দেশের অতি-আধুনিক নাট্যকাররা—তাঁদের নাটকের মধ্যে নব নব চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। যে চলে সেই তো হয় সদাই নূতন। এই চলার পথে বাংলার নাট্যাভিনয় অন্তর প্রকৃতিতে

এবং সমাজ ও জীবন পরিবেশে বাংলা দেশেরই ঐতিহ্যবাহী এক অনন্য সৃষ্টি—ইউরোপের রীতি প্রকৃতি গ্রহণ করেও যেখানে সে বাংলার মাটির ঋণ স্বীকার পেয়ে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছে, সেখানেই ঘটেছে তার সৃষ্টির প্রকৃত সার্থকতা।

॥ পাদটীকা ॥

॥ আদিম যুগ ॥

১। "Imitation is natural to man from childhood, one of his advantages over the lower animals being this, that he is the most imitative creature in the world, and learns at first by imitation. And it is also natural for all to delight in work of imitation."

Aristotle : On The Art of Poetry. pp 28-29.

Tran : By Ingram Bywater : with a preface by Gilbert Murray. Oxford : At The Clarendon Press : Reprinted 1938.

২। "মানুষের ঠিকানা"—অমল দাশগুপ্ত। 'নতুন সাহিত্যভবন' পৃ: ১২২—১২৩। কলিকাতা—২০। প্রথম সংস্করণ।

॥ মিশর ॥

১। ওবেরমেরগাউ :—১২১০ খ্রী: পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট্ চার্চে মিস্ট্রি, মিরাক্ল্ ও মরালিটি নাটকের অভিনয়ে—অত্যন্ত নীচুস্তরের আমোদ প্রমোদ হত বলে তা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে একশ্রেণীর বিশপরা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে কতকগুলি মিস্ট্রি নাটক তার প্রাচীন ধারা বজায় রাখতে পেরেছিল—ব্যাভেরিয়া ও অস্ট্রিয়ান আল্পসের গ্রামে গ্রামে এগুলি আমরা "প্যাশান প্লে" হিসেবে দেখি। ১৬৩৩ খ্রী: ওবেরমেরগাউ গ্রামে মড়ক দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসীরা "ক্রুশিফিক্শনের" কাহিনী নিয়ে প্যাশান প্লের অনুষ্ঠান করে; এবং মড়ক কমে যাওয়ায় তারা তাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রতি দশবছর পরপর এই প্যাশান প্লের অভিনয় অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে থাকে, আজো এই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সমগ্র বিশ্বের কাছেই ব্যাভেরিয়ার এই প্যাশান প্লে এক আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু। ওবেরমেরগাউর এই প্যাশন প্লেতে মধ্যযুগীয় শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং নরকের বিদ্ঘুটে ও হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলী কিছুই দেখানো হয় না—অনুষ্ঠানটি হয় অত্যন্ত শুচিস্নিগ্ধ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

২। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে রাধাবেশে নৌকা-বিলাস পালাভিনয়ের কথা স্মরণযোগ্য। সেখানেও অভিনয় ক্ষেত্র ছিল প্রকৃত নদী, প্রকৃত নৌকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অভিনেতা রাধাভাবের অবতার স্বয়ং শ্রীচৈতন্য।

৩। আফ্রোদিতে (Aphrodite)—"Goddess of beauty and love. Also associated with cults of lust and fertility. First of the female deities to be represented in the nude". (P. 27. The Pocket Book of "Greek Art" by Thomas Craven.)

আফ্রোদিতে—দেবী ভেনাসের (Venus) অন্যতম নাম।

৪। চার রকম উপাদানের সংযোগে অভিনয় হয়—(ক) আঙ্গিক, (খ) বাচিক, (গ) আহার্যিক, (ঘ) ও সাত্ত্বিক। যে সমস্ত উপাদান আহরণ বা সংগ্রহ করে নেওয়া হয় তাই আহার্যিক—যেমন, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, মেক্-আপ ইত্যাদি।

॥ গ্রীস ॥

১। "The ultimate origin to which Greek Tragedy traces up is the Ballad-Dance, the fundamental medium out of which all varieties of literature have been developed—a sort of literary protoplasm. It consists in the combination of speech, music and the imitative gesture which, for lack of a better word, we are obliged to call dancing. Modern dances in which men and women joined are almost unknown to Greek antiquity. It was an art which used bodily motion to convey thought; as in speech the tongue articulated words, so in dancing the body swayed and gesticulated into meaning. It was perhaps the supreme art of an age which was the great period of world for bodily development." (Page 1. The Ancient Classical Drama by Richard G. Moulton, M. A.)

২। ......the Acropolis, or highest point of the city...The Acropolis, Athens...remains of the most famous hilltop in history. (Illustration No. 10—The pocket Book of Greek Art by Thomas Craven—Pocket Books, Inc. New york.)

৩। Gilbert Murrayর মতে সহচরীদের নিয়ে এই কোরাসের সংখ্যা ৫০ এর দ্বিগুণ বা তারো অধিক ছিল।

৪। "Zeus! Lord and guard of suppliant hands!
Look down benign on us who crave
Thine aid—whom winds and waters drave
From where, through drifting, shifting sands,
Pours Nilus to the wave."...

(pp. 27-28, World Drama by Allardyce Nicoll.)

৫। "And Danaus, our sire and guide,
The King of counsel, pond'ring well
The dice of fortune as they fell,
Out of two griefs the kindlier chose,
And bade us fly, with him beside,
Heedless what winds or waves arose,
And o'er the wide sea waters haste,
Until at Argos' shore at last
Our wandering pinnace came."
(P. 28. World Drama by Allardyce Nicoll.)

৬। "Justice, the daughter of right-dealing Zeus,
Justice, the queen of suppliants, look down,
That this our plight no ill may loose
Upon your town"
(P. 29. World Drama by A. Nicoll.)

৭। "Not at my private hearth ye sit and sue ;
And if the city bear a common stain,
Be it the common toil to cleanse the same :
Therefore no pledge, no promise will I give,
Ere counsel with the commonwealth be held."
(P. 29. World Drama by A. Nicoll.)

৮। স্যাটার :—অর্ধমনুষ্য ও অর্ধ ছাগাকৃতি কল্পিত দেবতা।

৯। Silenus :—"A jovial old satyr, companion of Bacchus. He is represented as bald-headed, with short horns and a flat nose and riding on an ass". (Classical Mythology, Page 1506.)

১০। The scene is laid in Argos before the palace of Agamemnon. An altar is in the center of the foreground. On the roof stands a Watchman. It is night. (A Treasury of the Theatre. Volume One. World Drama. Page. 11. From : Aeschylus to Turgenev. Revised Edition).

১১। Watchman :—Oh God, for an end to this weary work. A year long I have watched here, head on arm, crouched like a dog on Agamemnon's roof. The stars of night have kept me company. I know them all, and when they rise and set. Those that bring winter's cold and summer's heat for they have power, those bright things in the sky. And what I watch for is a beacon fire, a flash of flame to bring the word from Troy,

word that the town has fallen. It is a woman's hope, for a woman is master here, but her heart is as stout as ever was a man's. No rest for me by night, I wander up and down. My bed is wet with dew. Dreams keep away. Fear is up here, no sleep. I never close my eyes. Singing and whistling helps a sleepy man, but if I try to make a sound I groan for all the evil happenings down there. Things once were right in this house, but no more, Oh, for a bit of luck to free me now, that fire to bring good news out of the night.

(A pause. He stands silent, watching. In the dark a spark of light is seen. It grows brighter, spreading into a blaze.) Page. 11. From :—A Treasury of the THEATRE, Volume One. World Drama From Aeschylus to Turgenev. Revised Edition, Edited by John Gassner. Simon and Schuster ; New-york (1951). Agamemnon : by Aeschylus, Translated from the Greek by Edith Hamilton.

১২। Attendants enter from the palace with torches, and kindle fire on the altar and sprinkle incense. Clytemnestra with Women in attendance enters and kneels before the altar. From the side a band of Old Men march in. They chant the chorus as they slowly march around the altar. During the song the day begins to dawn. (Ibid Page. 11.)

১৩। Clytemnestra still takes no notice of them but goes silently into the palace. The marching song, in Greek tragedy sung as the chorus entered and took their positions, comes here to an end the chorus proper begins They sing of the Omen shown to the two leaders of the army, Agamemnon and Menelaus, as they were starting for Troy—two eagles that tore a hare to pieces. (Ibid. Page. 12)

১৪। "We wear and waste him ; blood atones for blood, New pain for ancient wrong." (P. 49. World Drama—Nicoll.)

১৫। Odeion :—এই সঙ্গীতাগারটি ৪৪০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পেরিক্লেস্ তৈরী করিয়েছিলেন সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য। এটিতে দশ হাজার আর্কেডিয়ান সমবেত হতে পারতেন। এই কক্ষের স্তম্ভশ্রেণী কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রেখার মত সাজানো ছিল, ফলে যে কেউ মধ্য বিন্দুতে এসে দাঁড়ালে তাকে প্রত্যেক দিক থেকেই সমভাবে ও সুন্দররূপে দেখা যেত। এই আবৃত কক্ষটিও পরবর্তীকালে একটি অন্যতম "থিয়েট্রোন" হয়ে উঠেছিল।

১৬। Agon :—মোরগের লড়াই প্রতিযোগিতার ব্যক্তিরূপ।

১৭। The most important thing to bear in mind is that in the classical age there was no such thing as a raised stage. (P. 139—The Development of the Theatre Building in the Classical Period. The History of The Greek And Roman Theater by Margarete Bieber, Ph. D.)

১৮। Revolving Stage = ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। লক্ষণীয় যে এই পেরিয়াক্‌তোই-র মাঝেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চের একটি সুন্দর ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া গেছে। যান্ত্রিক কৌশল কিন্তু মূলতঃ ছিল একই। পাথরের স্থায়ী মঞ্চ ঘোরানোর প্রশ্ন ওঠে না। গ্রীসে তাই এই পদ্ধতিতে কেবল দৃশ্য পরিবর্তনই করা হত।

১৯। "A wedded wife, she slays her lord,
Helped by another hand !" W. D. Nicoll. P. 45.

২০। Slave :—(Opening the door and poking his head out.) Who's there ?

Dicæopolis :—Is Euripides at home ?

Slave :—He is and he isn't : understand that, if you can.

Dicæopolis ;—What's that ? He is and he isn't ?

Slave :—Certainly, old man, busy gathering subtle fancies here and there, his mind is not in the house, but he himself is ; perched aloft, he is composing a tragedy."

W. D. Nicoll. P. 92.

২১। "When you wish to know what you are, look at the tombs in the cemeteries. There are bones there, and the ashy dust of men who were monarchs, tyrants, sages, men proud of their birth and their riches, their estates and their handsome figures. Naught of these defended them against Time : Death comes to all things mortal Look on these and learn what you are." P. 110, World Drama—Nicoll.

২২। ......"No sane or skilled author writes plays that present impossibilities to the actor or to the stage engineer...... ....Thus may authors advance the arts of acting and of staging plays. But the actor also may enlarge the scope of the drama by his playing powers not previously discovered by the author." P. 564 : Bernard Shaw : Complete plays with Prefaces. Great Catherine ; Author's Apology, Vol. IV.

২৩। "ফ্লা ফ্ল্যায়াকেস্‌" (The Phlyakes) :—হেলেনীয় যুগে গ্রীক

সাম্রাজ্যের বিস্তার দক্ষিণ ইতালিতে হয়েছিল সেখানে "এউরিপাইডিয়ান" ও পরবর্তী-এউরিপাইডিয়ান নাটকের অভিনয় হত, তখনকার ট্র্যাজেডির প্যারোডি অভিনেতাদের "ন্ত্যা ফ্ল্যায়াকেস্" বলত।

॥ রোম ॥

১। লুদি (Ludi) :—ক্রীডা ও তৎসহ সাধারণ ছুটির দিন। রোমে তখন আনন্দ উৎসব ও নাটকের অভিনয় চলত। এগুলি সংখ্যায় ছিল অনেক। খ্রীঃ পূঃ ২২০ অব্দে "লুদি প্লেবিয়ান্" (Ludi Plebeian) নামে জনপ্রিয় ক্রীডা বা "পপুলার গেমস্" এর প্রবর্তন হয়। এই জনসাধারণের উৎসব "লুদি রোমানি" (Ludi Romani) বা অভিজাত রোমানদের উৎসবের সমতুল্য আসন গ্রহণ করল। এর সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানও এসে যুক্ত হতে লাগল। "অ্যাপোল্লো" দেবতার সম্মানে এল "লুদি অ্যাপোলিনারেস্" (Ludi Apollinares) এবং "মাগনা মাতের্" বা মহাজননী (Magna Mater) উৎসবে এল "লুদি মেগালেন্সেস্" (Ludi Megalenses)। মূল "লুদি রোমানি"তে চারদিন ধরে নাট্যাভিনয় হত। খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে ৪৮ দিন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল "লুদি ফুনেব্রেস্" (Ludi Funebres) বা "ফিউনেরল্ গেমস্" (Funeral Games) আর ছিল "লুদি উয়োতিভিউই" (Ludi Votivi) বা উৎসর্গ ও বিজয় অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত নাটক।

২। "There's nothing new under the sun ; everything one says has been said before." Terence (W. D. Nicoll P. 125.)

৩। "Will all great Neptune's ocean wash this blood
Clean from my hand ? No, this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red."
Hercules Furens : Seneca. (W. D. Nicoll P. 135)

॥ ভারতবর্ষ ॥

১। "The school of Nandikeswar seems to be older than Bharata and from the available works learning on Nandi one is tempted to say that he has developed conventional side of Natya ; Sangeet and Nṛtya to a remarkable degree." (from Natyasastra. with commentary of Avinaba Gupta : Baroda Edition : 2nd Volume edited by : Prof. M. Ramkrishna Kabi.)

২। অনেকের মতে, এ সংযোজনা পরে দ্বিতীয় নাটক "ত্রিপুর দাহ"

অভিনয় কালে হয়েছিল। এই নাটকটি বিশেষভাবে মহাদেবকে দেখানোর জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিমালয়ের সানুদেশে এবং মহাদেবের অনুরোধে পার্বতীই কৈশিকী বৃত্তির শিক্ষা দেন। আমরা মনে করতে পারি সেখানে স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক "গ্যালারী" পাওয়া গিয়েছিল। এখানে গ্রীসের প্রভাব ছিল বলতে যাওয়া কিন্তু ভুল। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করা, অথবা "অ্যারিণা"র মত চারদিকে ঘিরে বসা এগুলি সকল সভ্যজাতিই উদ্ভবের কাল থেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে আবিষ্কার করে এসেছে।

৩। সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ (সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শ্লোক ৪-৫।

৪। সাহিত্যদর্পণে আরো দু'টি বেশি রসের এবং তার অনুষঙ্গ ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর নবম রসটি হল "শান্ত" তার ভাব "সম" এবং দশম রস হল "বাৎসল্য" তার ভাব "স্নেহ"।

৫। দেখা যাচ্ছে রঙ্গপীঠের পবিমাপ নিয়ে অভিনবগুপ্তের সময় থেকেই মতভেদ দেখা দিয়েছিল পরে এর জটিলতা ক্রমশঃ আরো বেড়ে যায়।

৬। বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকে রাজা ও বিদূষকের পরিক্রমা করে সোপান অবতরণের উল্লেখ রয়েছে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী : তৃতীয় ভাগ : বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, পৃঃ ২৪০)।

৭। "মত্তবারণানি শিলাভিঃ সুধেষ্টকাভির্মৃদ্ভির্বানির্মিতা দীর্ঘবর্তুলাকারাঃ স্থূলবেদিকা কোণচতুষ্টয় ক্রিয়মাণাস্থা উপাধানবিশেষাঃ॥" (চমৎকার তরঙ্গিনী : সুন্দরী ও কমলা)।

৮। সম্ভবতঃ সম্মুখবর্তী যবনিকার উদ্ভব পরবর্তীকালে হয়েছিল। এই সম্মুখ যবনিকা প্রতি অঙ্কের শেষে পড়ত। আমরা "যবনিকান্তর" কথাটি সংস্কৃত নাটকে পাই। এর মানে একটি অঙ্কের শেষ হল।

॥ জাপান ॥

১। এই ধরনের সংস্কৃতি সম্পন্ন, কলাশাস্ত্রবিশারদ্ বারাঙ্গনা চরিত্র কেবল যে মধ্যযুগের জাপানেই ছিল তা নয়। এর উদাহরণ আমাদের ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায়ও যথেষ্ট রয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাই বিশাখদত্ত বিরচিত প্রখ্যাত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বসন্তসেনা চরিত্র অথবা পাই দণ্ডীর "দশকুমার চরিতের" দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস : অপহার বর্মার চরিত-কাহিনীতে। সেখানে বারাঙ্গনা "কামমঞ্জরীর" সর্বকলা পারদর্শিতা—এমন কি ব্যাকরণ, তর্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানের কথাও তার মাতা উল্লেখ করেছেন। এই সব বারাঙ্গনাদের যোগ্যতার পরিচয় রাজসভায় দিতে হত। তাদের প্রতি দিগ্‌বিদিকের জ্ঞানীগুণিরাই যে কেবল আকৃষ্ট হতেন তাই নয়—ধ্যান ভাঙ্গি মুনি, ঋষিরাও দিত পদে সাধনার ধন।

২। চীন ও জাপানের লম্বাটে ধরনের জলরঙের আঁকা দৃশ্যপট—মানচিত্রের মত এগুলি গুটিয়ে নেওয়া যায়। ঘরের যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে এই স্ক্রোল ছবি টাঙিয়ে রাখা হত সেই স্থানটির নাম "তোকোনোমা" (Tokonoma)।

৩। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে জাপানের জীবন জিজ্ঞাসা এবং দর্শনকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল বৌদ্ধধর্ম, শিন্তোধর্ম এবং কনফুসিওর মতবাদ। জাপানের এই প্রধান তিন ধর্মমতের মধ্যে কাবুকি নাটকে বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল বৌদ্ধধর্ম। নাটকীয় চরিত্র, নাটকীয় কাহিনী এবং মঞ্চের প্রতীক ও ইঙ্গিত-ধর্মিতার মাঝে ক্ষণে ক্ষণেই বৌদ্ধধর্ম মতবাদের প্রকাশ দেখা যেত।

॥ মধ্যযুগ ॥

১। "Whom do ye seek in the sepulture, O Christian woman?" Three Maries :—"Jesus of Nazarth who was crucified, O Heavenly One."

২। "He is not here : He has arisen even as He said. Go, announce that He has arisen from the sepulture."

৩। "With the saint plays, the churchly drama written in Latin and enacted in the Church reached the limit of its potentialities, and the drama could move forward only by employing vernacular dialogue and by providing free play for the common tastes and interests."

(Masters of the Drama by John Gassner, p. 144.)

৪। "If the mysteries provided the element of high seriousness and vastness of conception, the miracles taught men how to give theatrical expression to domestic scenes and legends of adventure." (World Drama : Allardyce Nicoll. P. 164.)

॥ ইতালি : রেনেসাঁস্ ॥

১। "It was an audience of scholars who were often pedants, churchmen who were sometimes far too worldly, and courtiers who were usually intemperate in all things."

The Living Stage, A History of the World Theatre by Kenneth Macgowan and William Melnitz. Page—104.

॥ ইংল্যাণ্ড : রেনেসাঁস্ ॥

১। "The truth is rather that Burbage and his companions, just as Shakespeare himself, were well abreast of the Italians and the French but moving along lines which, springing from an original Continental source, were bearing them to new ideas and fresh experiments."

The Development of the Theatre—Allardyce Nicoll: Page 126.

২। "If the storm scene is enacted on a bare stage it can achieve its effect; if painted seenery is set behind the aged Lear his figure becomes tawdry and his words mere rant."

(World Drama.—Allardyce Nicol.)

॥ আধুনিক যুগ ॥

১। "We now have plays, including some of my own, which begin with discussion and end with action, and others in which the discussion interpenetrate the action from the beginning to the end."—(Major Critical Essays : Shaw—1932. London : Constable Co, Page—136.)

২। ......"Hammered all the beauties of Chekhov into my head. He could talk of a play so well that one had to like it before he was through."—(My Life in Art—Stanislavsky.)

৩। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই মাল্টিপল্ সেটের প্রয়োগ আমাদের বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ" নাটকখানি আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় "স্টার" রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকখানির মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাটকে মঞ্চের উপরে একই সঙ্গে দু'খানি পাশাপাশি কক্ষ দেখানো হয়েছিল—একখানি রোগী বা যতীনের ঘর এবং অন্যখানি পাশের ঘর। রোগীর ঘরে রোগী বরাবরই শুয়ে আছেন সেখানকার অভিনয়ে যখন ছেদ পড়ছে, পাশের ঘরে তখন মাসি, মণি, হিমি, ডাক্তার ইত্যাদির যাতায়াত—রোগীর নেপথ্যে কথাবার্তা চলছে। আমরা এখন অনেক সময়ই মঞ্চের একটা অংশে আলোক সম্পাত করে অন্য অংশে অন্ধকারের পর্দা টেনে মাল্টিপল্ সেটের ব্যবহার করতে দেখি—গৃহপ্রবেশে তা হয়নি দু'টি কক্ষই সমানভাবে আলোকিত ছিল। নাটকের রস তাতে কিছুমাত্র ব্যাহত তো হয়ই নি বরং খুব উন্নত ধরনের সূক্ষ্ম রুচি সম্পন্ন হয়েছিল—যা সেকালের

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা চলে। এ সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত বর্ণনা পেয়েছি আমাদের নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রচিত—"নিজের হারায়ে খুঁজি" নামক আত্মকথায়। এই নাটকে যতীনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী বিস্ময়কর অভিনয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।

॥ বঙ্গদেশ ॥

১। প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহের একটী মাত্র নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা হল রামগিরি পর্বতে শৈলগুহাকার প্রেক্ষাগৃহটি—এ ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন নিদর্শনই পাওয়া যায় নি।

২। 'His Commentary, most undoubtedly bears out lack of his technical knowledge, consequently beats about the bush in a theoretical way and simply but patiently puts forth all possible alternatives arising from the varied philology of the texts." (Page 424 A critical survey of the Ancient Indian Theatre in accordance with the second chapter of the Bharata Nātyaśāstra.)

৩। শ্রীচৈতন্যদেব ১৫২৬ খ্রীঃ চন্দ্রশেখরের গৃহে "রুক্মিনী-সংবাদ" অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

৪। অনুবাদ :—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। পৃঃ ২৩।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

॥ বাংলা ॥

॥ শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)। শ্রীসুশীল কুমার দে, এম. এ. ডি. লিট. লিখিত ভূমিকা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—১৩৫৩।

॥ ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ. পি-এইচ. ডি ॥ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।
প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-১২।

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী ॥ বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৫৭ সালের গিরিশ বক্তৃতামালা।
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৬।

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী ॥ নিজেরে হারায়ে খুঁজি।
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-৭। (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)।

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী ॥ বাঙালীর নাট্যচর্চা। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ স্মরণে।
পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স। কলিকাতা-১২। শঙ্কর প্রকাশন। কলিকাতা-৮।

॥ শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য্য ॥ এরিষ্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব (প্রথম প্রকাশ) বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২।

॥ শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ. ডি. ফিল ॥ নাটক লেখার মূলসূত্র। (প্রথম প্রকাশ) "জিজ্ঞাসা"। কলিকাতা-২৯।

॥ ডঃ শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য, এম. এ. ডি. ফিল. কাব্যতীর্থ। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা ॥
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ। ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯। ১৯৬৩।

॥ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ গ্রন্থাবলী ॥ প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ। তৃতীয় ভাগ। চতুর্থ ভাগ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

॥ গিরিশ রচনাবলী ॥ প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ড। সম্পাদনা রথেন চৌধুরী।
ধ্রুপদী সাহিত্য সংসদ। ১৪ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড। কলিকাতা-৩২। ১৩৬৯ সাল।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী ॥ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ষষ্ঠ খণ্ড। গদ্য নাটক।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২৫শে বৈশাখ—১৩৬৮ সাল।

॥ অমৃত-গ্রন্থাবলী ॥ অমৃতলাল বসু প্রণীত।
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। ১৩৫৭ সাল। ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ।

॥ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী ॥ ১ম ও ২য় খণ্ড।
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। কলিকাতা-১২

॥ ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ॥ ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. প্রণীত।
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ভাগ)। ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী ॥ (কাব্য ও নাটক)।
বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ। চত্বারিংশ সংস্করণ। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

॥ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ॥ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১ম ও ২য় খণ্ড।
জীবন কথা ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় সম্বলিত। ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা-৯। ১৯৬৬।

॥ শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় ॥ সোফোক্লেস। শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. লিট. লিখিত ভূমিকাসহ। গ্রীক নাটক গ্রন্থমালা।
গঙ্গা পাবলিশার্স লিমিটেড। ৫২-৯ বহুবাজার স্ট্রীট। কালকাতা-১২। ১৩৫৫।

॥ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত ॥ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। ১৩৬৪।

॥ পরিমল গোস্বামী ॥ আমি যাঁদের দেখেছি। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী।

॥ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু ॥ শিশির সান্নিধ্য।
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ। গ্রন্থজগৎ। ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২।

॥ বিনোদিনী দাসী ॥ আমার কথা ও অন্যান্য রচনা। সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য আচার্য। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
সুবর্ণরেখা। কলিকাতা-৯। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড।

॥ শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬।

॥ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ডি. লিট ॥ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিঃ, এলাঃ, বোম্বাই। ১৯৬৯।

॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ ॥ ঘরোয়া।
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে।
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

॥ অশোক মিত্র ॥ পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা।
"সাক্ষর"। (প্রথম সংস্করণ)। কলিকাতা-২০।

॥ শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ যুগে যুগে ভারত শিল্প। (প্রথম সংস্করণ)।
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯।

॥ অমল দাশগুপ্ত ॥ মানুষের ঠিকানা।
নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা-২০। (প্রথম সংস্করণ)।

॥ রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা ॥ শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্পাদিত।
প্রথম বর্ষ: চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা।

॥ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ।

॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। ১৯৭০।

॥ সংস্কৃত ॥

॥ বিশ্বনাথ কবিরাজ ॥ সাহিত্য-দর্পণঃ ॥ মূল, সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ও শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ কৃত টীকাসহ। সম্পাদনা—অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় এম এ. (ইং, বাং), ডি. ফিল (সং) কাব্যতীর্থ।
পুস্তক শ্রী। ৩০।১ কলেজ রো। কলিকাতা-৯। ১৩৭৬ সাল।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

। ইংরেজী ।

General and Theatre Histories

The Holy Bible.
Containing Hebrew and Greek Scriptures : Publishers. Watchtower Bible and Tract Society. inc, U.S.A.

H. G. Wells : The Outline of History.
Being a plain history of life and mankind (Containing all maps, charts, illustrations, diagrams etc. 1200 pages). Garden City Publishing Co. inc. New York—1930.

Conversations with Eugene Ionesco :
Edited by Claude Bonnefoy.

Glenn Hughes : The Pent-house Theatre.
Its History and Technique. University of Washington Press Seattle —1950.

George Attman, Ralph Freud, Kenneth Macgowan, William Melnitz. Theater Pictorial. A History of World Theater.
as Recorded in Drawings, Paintings, Engravings and Photographs. Berkley and Los Angeles, 1953.

H. D. Albright, William P. Halstead, Lee Mitchell. Principles of Theatre Art.
Houghton Mifflin Company. The Riverside Press, Cambridge Massachusetts. Printed in the U.S.A. 1955.

Sheldon Cheney—The Theatre : Three Thousand Years of Acting and Stage Craft.
New York, 1929 : rev. & enl. ed. 1952.

James Cleaver, The Theatre Through The Ages,
London—1948.

George Freedly and John A. Reeves—A History of the Theater. New York—1947.

James Laver—Drama, Its Costume and Decor.
London—1957.

Allardyce Nicoll—The Development of the Theatre : A Study of Theatrical Art.
From the Beginning to the Present Day. (London, 1927, new and rev. ed 1948).

: Tom Prideanx: 'World' Theatre in Pictures' from Ancient Times to Modern Broadway. New York—1953.

: Lee Simonson. The Stage is Set.
New York 1932, Reprint Ed. 1946.

: Lee Simonson. Stages of the World, A Pictorial Survey Of the Theatre.
(Introduction by Aline Bernstein). New York, 1941, New Ed. 1949.

: Kenneth Macgowan (University of California, Los Angeles), and William Melnitz (University of California, Los Angeles). The Living Stage—A History of the World Theater.

: Frank M. Whiting—An Introduction to the Theatre, 1961.

: Vera Mowry Roberts. On Stage.
A History of Theatre, Harper and Row. Publication, New York.

: John Gassner. Form and Idea in Modern Theatre.
The Dryden Press. New York—1956.

: John Gassner and Philip Barber. Producing the Play
Holt, Rinehart and Winston, Inc. Revised Edition—1953

HISTORY OF DRAMA :

: Barrel H. Clark and George Freedley. A History Of Modern Drama. New York — .947.

: John Gassner. Masters of the Drama.
Third Revised and enlarged Edition 1954. Dover Publications, Inc.

: Allardyce Nicoll. British Drama.
An historical survey from the beginning to the present time.
London : 1925 — 4th Ed. 1947. G. G. Harrap & Co. Ltd.

: Allardyce Nicoll. World Drama From Aeschylus to Anonilh.
George G. Harrap & Co. Ltd. London — 1949 — Reprinted 1951.

THE PRIMITIVE THEATER :

: James George Fraser. The Golden Bough.
A Study in Magic and Religion—New York—1922.

: Kenneth Macgowan and Herman Rosse: Masks and Demons. New York—1923.

: William Ridgeway. The Dramas and Dramatic Dances of Non European Races.
In special reference to the origin of Greek tragedy with an appendix on the origin of the Greek comedy. Cambridge University Press, 1915.

: Mikhail Nesturkh. The Origin of Man.
Academy of Sciences of the U.S.S R. Foreign Languages Publishing House. Moscow—1959.

THE CLASSIC THEATER :

: Richard G. Moulton, M. A. :
The Ancient Classical Drama :
Cambridge University (Extension) Lecturer in Literature. At the Clarendon Press—1890.

: William Beare. : The Roman Stage :
London—1955.

: Margarete Bieber. :
The History of the Greek and Roman Theatre :
Princeton University Press. London, 1939.

: S. H. Butcher. : Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, with a Critical Text and Translation of the POETICS :
London, 1895, 4th Ed. with a prefactory essay by John Gassner—New York, 1951.

: Aristotle : On the Art of Poetry : Translated by Ingram Bywater with a preface by Gilbert Murray.
Oxford : At the Clarendon Press, London—1938.

: Gilbert Murray : Aeschylus, the Creator of Tragedy :
Oxford — 1940.

: Gilbert Murray. : Euripides and his Age :
London and New York, 1918. 2nd Ed. 1946.

: A. W. Pickard Cambridge. :
The Dramatic Festivals of Athens :
Oxford—1953.

: Vitruvius. : The Ten Book on Architecture.
Translated from the Latin by M. H. Morgan—Cambridge, Mass—1914.

THE MEDIEVAL THEATER :

: Grace Frank. · The Medieval French Drama :
Oxford — 1954.

: Alfred W. Pollard. : English Miracle Plays, Moralities and Interludes : Oxford, 1927.

RENAISSANCE—ITALY.

: George R. Kernodle. : From Art to Theatre Form and Convention in the Renaissance. : Chicago, 1944.

: K. M. Lea. :
Italian Popular Comedy, A Study in the Commedia dell' Arte. 1560—1620 : 2 Vols—Oxford 1934.

SPAIN. (The Spanish Theater During The Golden Age.)

: J. P. W. Crawford. : Spanish Drama Before Lope de Vega. : London and Philadelphia, 1922 Rev. Ed. 1937.

: Alexander A. Parker. : The Allegorical Drama of Calderón : An Introduction to the Autos Sacramentales. Oxford, 1943.

THE ELIZABETHAN THEATER :

: John Ganford Adams. : The Globe Playhouse, Its Design and Equipments. (Cambridge—1942).

: Frederick S. Boas. : Christopher Marlowe. : Oxford 1940.

: Marchette Chute. : Shakespeare of London. : New York—1949.

: Alfred Harbage. . Shakespeare's Audience. : New York—1941.

: C. Walter Hodges. : The Globe Restored. : London—1953,

: Inigo Jones. : Design for Masques and Plays at a Descriptive Catalogue of Drawings for Scenery and Costume. Introduction and Notes by Percy Simpson and E. F. Bell, Oxford—1924.

: Allardyce Nicoll. : Stuart Masques and Renaissance Stage : London—1937.

: Leslie Hotson. : Shakespear's Wooden 'O'.—1959.

FRENCH :

: John Palmer : Molière, His Life and Works. : London and New York—1930.

RESTORATION AND THE 18TH CENTURY IN ENGLAND :

: Eleanore Boswell. : The Restoration Court Stage : Cambridge—Mass—1932.

: Allardyce Nicoll. : A History of Restoration Drama : (1660-1700) : Cambridge, 1923 : 3rd Rev. Ed. 1940.

: James J Lynch. : Box, Pit and Gallery, Stage and Society in Johnson's London. : Berkeley and Los Angeles, 1953.

THE GERMAN THEATER : 1500—1800.

: W. H. Bruford. : Theater, Drama and Audience in Goethe's Germany. : London—1952

THE ORIENTAL THEATER : (INDIA).

: Mulk Raj Anand. : The Indian Theatre : New York, 1950.

: A. Berriedale Keith, D. C. L., D. Litt. : The Sanskrit Drama (in its Origin, Development, Theory and Practice). Oxford and New York, 1959.

: Bharata Muni : The Nāṭyaśāstra : (A Treatise on Ancient Indian Dramaturgy and Histrionics). Vol I (Chapter I—XXVII). English Translated for the first time—by Manomohan Ghosh, M.A. Ph. D. Asiatic Society.

: Bharata Muni : The Nāṭyaśāstra : A Treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics. Vol. II. (Chapter XXVIII—XXXVI) Translated by Manomohan Ghosh The Asiatic Society. 1, Park Street, Cal.-16. 1961.

: Bharata Muni : The Nāṭyaśāstra (Sanskrit) : Edited by Manomohan Ghosh, M. A. Ph. D. Kavyatirtha. Manisha Granthalaya Private Ltd. Cal.-12.

: Nandikesvara's : Abhinaya Darpanam. Edited by Dr. Manomohan Ghosh (M. A. Ph. D Kavyatirtha) with illustrations. Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta-1957.

: Manomohan Ghosh, M. A., Ph. D. : Contributions to the History of the Hindu Drama : Its Origin, Development and Diffusion. 1958. Firma K. L. Mukhopadhyay. 6/1 A, Banchharam Akur Lane, Calcutta-12.

CHINA :

: L. C. Arlington. : The Chinese Drama From the Earliest Times Until Today : Shanghai—1930.

: Jack Chen. : The Chinese Theatre. : London—1925.

: A. E. Zucker : The Chinese Theatre :
Boston and London—1925.

JAPAN :

: Faubion Bowers. : Japanese Theatre. :
Foreword by Joshua Logan. Peter Owen Limited, London. Made and Printed in the U. S. A. 1951.

: A. C. Scott. : The Kabuki Theatre of Japan : 1955.

: Francis Hoor. : Japanese Theatre in High Light. :
A Pictorial Commentary, text by Earle Ernest, introduction by Faubion Bowers. Tokyo, 1952.

FAR EAST

: Maung Htin Aung : Burmese Drama. :
A Study with Translation of Burmese Play.

: Faubion Bowers. : Theatre in the East :
A Survey of Asian Dance and Drama. 1958.

: R. C. Majumder. : Hindu Colonies in Far East. :

NINETEENTH CENTURY :

: St. John Ervine : Oscar Wilde. :
New York—1952.

: Ellen Terry. : The Story of My Life. :
London 1908. Reprinted 1933.

RUSSIA :

: David Magarshock. : Stanislavsky, A Life :
New York 1951.

: Constantin Stanislavsky. : My Life in Art :
Translated from Russian by J. J. Robbins New York and London 1924,

BEST PLAYS :

: Clark, Barert H. : World Drama :
Appleton, 1933,

: John Gassner : A Treasury of the Theatre :
Vol. 1 From Aeschylus to Turgenev ; Vol. 2 From Henrik Ibsen to Arthur Miller ; College Edition, Dryden, 1950-51.

: Barnard Shaw. :
Complete Plays with Prefaces—Vol. I, II, III, IV, V, VI :
DODD, MEAD & Company. New York—1963.

: Shakespeare : Hamlet :
Edited by A. W. Verity. Cambridge : At the University Press 1939.

: William Shakespeare. : Othello :
Edited by J. L. Banerjee. Sen Brothers & Co. 1948.

: William Shakespeare. : Complete Works :
Edited with an introduction and glossary by Peter Alexander. University Glasgow. The English language Book Society & Collins. London and Glasgow—1965.

: Ben Jonson. : The Complete Plays :
London : J. M. Dent & Sons Ltd. New York. E. P. Dutton & Co inc—1940.

: Henrik Ibsen. : The League of Youth, A Doll's House, The Lady from the Sea. :
Translated by Peter Watts. Penguin Books Ltd.—1965.

: Henrik Ibsen. : Ghosts, The Warriors at Helgeland, An Enemy of the People. :
Translated by R. Farquharson Sharp. Every man's Library. Dent. London Dutton. New York—1963.

: Eugene O'Neill. : Plays :
Introduced and edited by E. Marlin Browne. Penguin Books—1970.

ART AND ARCHITECTURE :

: Percy Brown. (M. B. E , A R. C. A , F. R. A. S. B.) :
Indian Architecture : (Buddhist and Hindu).
Over 500 Illustrations—Bombay D. B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd.—1959.

: Percy Brown. (M. B. E., A. R. C. A., F. R. A. S. B.) :
Indian Architecture : (Islamic Period).
Fourth Edition. With over 250 Illustrations. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd. Treasure House of Books, 210, Dr. Dadabhai Neoroji Road—1959

: Thomas Craven. : Greek Art :
Pocket Books, Inc. New York.

: William Gaunt. : The Observer's Book of Modern Art. :
From Impressionism to the Present Day. With 16 plates in full colour and 52 monochrome reproduction from origin. Frederich Warne & Co. Inc., London, New York.

॥ নির্দেশিকা ॥

ভ্রমশুদ্ধি

পৃঃ পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৬ পং ২০	ধরণ	ধরন
পৃঃ ৯ পং ১৫	থিয়টোর	থিয়েটার
পৃঃ ১৫ পং ১০	"থিয়টোরের"	"থিয়েটারের
পৃঃ ৬৫ পং ১৯	পশ্চাদ্পট	পশ্চাৎপট

পৃঃ ১২০—প্রথম লাইনটি ভুল ছাপা হয়েছে—এখানে হবে না,

পৃঃ ১২২ পং ১ এর স্থানে হবে।

পৃঃ ৩৭৪ পং ১৫	ডেফ্থ	ডেপ্থ
পৃঃ ৩৭৭ পং ২	Colderón	Calderón
প্লেট নং ১	দেলকির	দেলফির
প্লেট নং ৪	ফেকোস	ফোকাস